সূচী।

বঙ্গদর্শন।

সমাজভেদ।

গত জানুয়ারী মাসের 'কন্‌টেম্পোরারি রিভিয়ু' পত্রে ডাক্তার ডিলন 'ব্যাঘ্র চীন এবং মেষশাবক য়ুরোপ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে যুদ্ধ উপলক্ষে চীনবাসীদের প্রতি য়ুরোপের অকথ্য অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। জঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুর লং প্রভৃতি লোকশত্রুদিগের ইতিহাসবিখ্যাত নিদারুণ-কীর্ত্তি সভ্য য়ুরোপের উন্মত্ত বর্ব্বরতার নিকট নতশির হইল।

য়ুরোপ নিজের দয়াধর্ম্মপ্রবণ সভ্যতার গৌরব করিয়া এসিয়াকে সর্ব্বদাই ধিক্কার দিয়া থাকে। তাহার জবাব দিবার উপলক্ষ্য পাইয়া আমাদের কোন সুখ নাই। কারণ, অপবাদ রটনা করিয়া দুর্ব্বল সবলের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু সবল দুর্ব্বলের নামে যে অপবাদ ঘোষণা করে, তাহা দুর্ব্বলের পক্ষে কোন না কোন সময়ে সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

সাধারণত এসিয়াচরিত্রের ক্রূরতা, বর্ব্বরতা, দুর্জ্জেয়তা, য়ুরোপীয় সমাজে একটা প্রবাদবাক্যের মত। এইজন্য, এসিয়াকে য়ুরোপের আদর্শে বিচার করা কর্ত্তব্য নহে, এই একটা ধুয়া আজকাল খৃষ্টানসমাজে বেশি করিয়া উঠিয়াছে।

আমরা যখন য়ুরোপের [illegible] পাইলাম, তখন, মানুষে মানুষে [illegible] ধুয়াটাই সে শিক্ষা হইতে গ্রহণ [illegible] ছিলাম। সেইজন্য আমাদের নূতন শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রভেদ [illegible] যায়, আমরা সেই ভাবেই [illegible] হইয়া উঠিতেছিলাম। এমন সময় খৃষ্টানসমাজ তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র বন্ধ করিয়া বলিলেন, পূর্ব্ব পশ্চিমে এমন প্রভেদ যে, সে আর লঙ্ঘন করিবার জো নাই।

আচ্ছা বেশ, প্রভেদ আছে, প্রভেদ থাক্। বৈচিত্র্যই সংসারের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। পৃথিবীতে শীতাতপ সব জায়গায় সমান নহে বলিয়াই, বায়ু চলাচল করে। সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সার্থক হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে থাক্,—তাহা হইলে সেই স্বাতন্ত্র্যে পরস্পরের নিকট শিক্ষার আদান-প্রদান হইতে পারে।

তাহাকে মিলাইয়া বিচার না করিলে, আমাদের মনেও অনেক সময় অন্যায় অবজ্ঞার সঞ্চার হয়। তাহার সাক্ষী, বিলাতী সমাজে কন্যাকে অধিকবয়স পর্য্যন্ত কুমারী রাখার প্রতি আমরা কটাক্ষপাত করি—আমাদের নিকট এ প্রথা অভ্যস্ত নহে বলিয়া, আমরা এ সম্বন্ধে নানা প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া থাকি। অথচ বালবিধবাকে চিরজীবন অবিবাহিত রাখা যে তদপেক্ষা

কার করিবে, না চাবি দিয়া তাহার সিংহদ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে?

মিশনারীদের প্রতি চীনবাসীদের আক্রমণ হইতে চীনে বর্ত্তমান বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। য়ুরোপ এ কথা সহজেই মনে করিতে পারে যে, ধর্ম্মপ্রচার বা শিক্ষা-বিস্তার লইয়া অধৈর্য্য ও অনৌদার্য্য চীনের বর্ব্বরতা সপ্রমাণ করিতেছে। মিশনারী ত চীনরাজত্ব জয় করিতে যায় নাই।

এইখানে পূর্ব্বপশ্চিমে ভেদ আছে এবং সেই ভেদ য়ুরোপ শ্রদ্ধার সহিত, সহিষ্ণুতার সহিত, বুঝিতে চেষ্টা করে না—কারণ, তাহার গায়ে জোর আছে।

চীনের রাজত্ব চীনের রাজার। যদি কেহ রাজ্য আক্রমণ করে, তবে রাজায় রাজায় লড়াই বাধে, তাহাতে প্রজাদের যে ক্ষতি হয়, তাহা সাংঘাতিক নহে। কিন্তু য়ুরোপে রাজত্ব রাজার নহে, তাহা সমস্ত রাজ্যের। রাষ্ট্রতন্ত্রই য়ুরোপীয় সভ্যতার কলেবর;—এই কলেবরটিকে আঘাত হইতে রক্ষা না করিলে তাহার প্রাণ বাঁচে না। সুতরাং অন্য কোনপ্রকার আঘাতের গুরুত্ব তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। বিবেকা-

প্রচলিত হয়, ক্রমে তাহার সহিত ভাবের সৌন্দর্য্য জড়িত হইয়া পড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত কুমার-কুমারীর স্বাধীন প্রেমাবেগের সৌন্দর্য্য য়ুরোপীয় চিত্তে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা য়ুরোপের সাহিত্য পড়িলেই প্রতীতি হইবে। সেই প্রেমের আদর্শকে য়ুরোপীয় কবিরা দিব্যভাবে উজ্জ্বল করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে পতিব্রতা গৃহিণীর

সভ্যতার কলেবর ধর্ম্ম। ধী[illegible]মধুর হইয়া হিন্দু-নহে, সামাজিক কর্ত্তব্যতন্ত্র,—তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন্ পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই তাহার মর্ম্মস্থান, তাহার জীবনী শক্তির অন্য কোন আশ্রয় নাই। শিথিল রাজশক্তি বিপুল চীনের সর্ব্বত্র আপনাকে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারে না। রাজধানী হইতে সুদূরবর্ত্তী দেশগুলিতে রাজার আজ্ঞা পৌঁছে, রাজপ্রতাপ পৌঁছে না, কিন্তু তথাপি সেখানে শান্তি আছে, শৃঙ্খলা আছে, সভ্যতা আছে। ডাক্তার ডিলন ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পই বল ব্যয় করিয়া এত বড় রাজ্য সংযত রাখা সহজ কথা নহে।

কিন্তু বিপুল চীনদেশ শস্ত্রশাসনে সংযত হইয়া নাই, ধর্ম্মশাসনেই সে নিয়মিত। পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, প্রতিবেশী পল্লীবাসী, রাজা প্রজা, যাজক যজমানকে লইয়া এই ধর্ম্ম। বাহিরে যতই বিপ্লব হোক, রাজাসনে যে কেহই অধিরোহণ করুক, ধর্ম্ম বিপুল চীনদেশের অভ্যন্তরে থাকিয়া অখণ্ড

এখন ত দেখিতেছি, গালাগালি গোলা-গুলির আদান-প্রদান চলিয়াছে। নূতন খৃষ্টান শতাব্দী এমনি করিয়া আরম্ভ হইল।

ভেদ আছে স্বীকার করিয়া লইয়া বুদ্ধির সহিত, প্রীতির সহিত, সহৃদয় বিনয়ের সহিত, তাহার অভ্যন্তরে যদি প্রবেশ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে খৃষ্টীয় শিক্ষায় উনিশ-শত বৎসর কি কাজ করিল? কামানের গোলায় প্রাচ্য দুর্গের দেয়াল ভাঙিতে [illegible] ...হত সম্বন্ধযুক্ত। আমাদের পরিবার কুলের অঙ্গ। এইটুকু প্রভেদে সমস্তই তফাৎ হইয়া যায়। ইংরাজ এই প্রভেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, হিন্দুপরিবারের দরদ কিছুই বুঝিতে পারিবে না এবং অনেক বিষয়ে অসহিষ্ণু ও অবজ্ঞা-পরায়ণ হইয়া উঠিবে। কুলসূত্রে হিন্দু-পরিবারে জীবিত, মৃত ও ভাবী অজাতগণ পরস্পর সংযুক্ত। অতএব হিন্দুপরিবারের মধ্য হইতে কেহ যদি কুলত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যায়, তাহা পরিবারের পক্ষে কিরূপ গুরুতর আঘাত, ইংরাজ তাহা বুঝিতে পারে না। কারণ, ইংরাজপরিবারে দাম্পত্য-বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন দৃঢ় নহে। এইজন্য হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ বৈধ হইয়াও সমাজে প্রচলিত হইল না;— কারণ, জীবিত প্রাণী যেমন তাহার কোন সজীব অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, হিন্দুপরিবারও সেইরূপ বিধবাকে ত্যাগ করিয়া নিজেকে বিকৃত করিতে প্রস্তুত নহে। বাল্যবিবাহও হিন্দুপরিবার এইজন্যই আহ্বান করে। কারণ প্রেমসঞ্চারের উপযুক্ত বয়স হইলেই স্ত্রীপুরুষে মিলন হইতে

নন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন এবং ধর্ম্মপাল যদি সেখানে ইংরাজ বৌদ্ধ-সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গা রাষ্ট্র-তন্ত্র। জিব্রল্টরের পাহাড়টুকু সমস্ত ইংলণ্ড প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবে, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সে আবশ্যক বোধ করে না।

পূর্ব্বদেশে তাহার বিপরীত। পোলা- [illegible] সেইরূপ পরিবারের দৃঢ়তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে. হিন্দুকে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও এই সকল নিয়ম পালন করিতে হয়।

এইরূপ সুদৃঢ়ভাবে পরিবার ও সমাজ গঠন ভাল কি না, সে তর্ক ইংরা[illegible] পারে। আমরা বলি, রাষ্ট্রীয় [illegible] সর্ব্বোচ্চে রাখিয়া পোলিটিকাল দৃঢ়তাসা[illegible] ভাল কি না, সেও তর্কের বিষয়। দেশের অন্য সমস্ত প্রয়োজনকে উত্তরোত্তর খর্ব্ব করিয়া সৈনিকগঠনে য়ুরোপ প্রতিদিন পীড়িত হইয়া উঠিতেছে—সৈন্যসম্প্রদায়ের অতিভারে তাহার সামাজিক সামঞ্জস্য [illegible] হইতেছে। ইহার সমাপ্তি কোথায়? নিহিলিষ্টদের অগ্ন্যুৎপাতে, না, পরস্পরের প্রলয়সংঘর্ষে? আমরা স্বার্থ ও স্বেচ্ছা-চারকে সহস্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া মরিতেছি, ইহাই যদি সত্য হয়, য়ুরোপ স্বার্থ ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া চিরজীবী হইবে কি না, তাহারো পরীক্ষা বাকি আছে।

যাহাই হউক, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের এই সকল প্রভেদ চিন্তা করিয়া বুঝিয়া দেখিবার [illegible] য়ুরোপের প্রথাগুলিকে যখন বিচার করিতে হয়, তখন য়ুরোপের সমাজতন্ত্রের [illegible]

বঙ্গদর্শন।

সমাজভেদ।

আশঙ্কাজনক, সে কথা আমরা বিচারের মধ্যেই আনি না। কুমারীর বেলায় আমরা বলি, মনুষ্যপ্রকৃতি দুর্ব্বল, অথচ বিধবার বেলায় বলি, শিক্ষা-সাধনায় প্রকৃতিকে বশে আনা যায়। কিন্তু আসল কথা, এ সকল নিয়ম কোন নীতিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয় নাই, প্রয়োজনের তাড়নে দাঁড়াইয়া গেছে। অল্পবয়সে কুমারীর বিবাহ হিন্দুসমাজের পক্ষে যেন প্রয়োজনীয়, চিরবৈধব্যও সেইরূপ। সেইজন্যই আশঙ্কাসত্ত্বেও বিধবার বিবাহ হয় না এবং অনিষ্ট-অসুবিধা-সত্ত্বেও কুমারীর বাল্যবিবাহ হয়। আবশ্যকের নিয়মেই য়ুরোপে অধিকবয়সে কুমারীর বিবাহ এবং বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। সেখানে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে লইয়া স্বাধীন গৃহস্থাপন সম্ভবপর নহে, সেখানে বিধবা কোন পরিবারের আশ্রয় পায় না বলিয়া, তাহার পক্ষে অনেক সময়েই দ্বিতীয়বার বিবাহ নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম য়ুরোপীয় সমাজতন্ত্ররক্ষার অনুকূল বলিয়াই মুখ্যত ভাল, ইহার অন্য ভাল যাহা কিছু আছে, তাহা আকস্মিক, তাহা অবান্তর।

সমাজে আবশ্যকের অনুরোধে যাহা কল্যাণপরায়ণ ভাবটিই ... চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। সেই ভাবে সৌন্দর্য্য আমাদের সাহিত্যে অন্য সকল সৌন্দর্য্যের উচ্চে স্থান পাইয়াছে। সে আলোচনা আমরা অন্য প্রবন্ধে করিব।

কিন্তু, তাই বলিয়া যে স্বাধীন প্রেমের সৌন্দর্য্যে সমস্ত য়ুরোপীয় সমাজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে অনাদর করিলে আমাদের অন্ধতা ও মূঢ়তা প্রকাশ হইবে। বস্তুত, তাহা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। যদি না করিত, তবে ইংরাজি কাব্য উপন্যাস আমাদের পক্ষে মিথ্যা হইত। সৌন্দর্য্য হিন্দু বা ইংরাজের মধ্যে জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলে না। ইংরাজিসমাজের আদর্শগত সৌন্দর্য্যকে সাহিত্য যখন পরিস্ফুট করিয়া দেখায়, তখন তাহা আমাদের জাতীয় সংস্কারকে অভিভূত করিয়া হৃদয়ে দীপ্যমান হয়। তেমনি আমাদের হিন্দু পারিবারিক আদর্শের মধ্যে যে একটি কল্যাণময়ী সৌন্দর্য্যশ্রী আছে, তাহা যদি ইংরাজ দেখিতে না পায়, তবে ইংরাজ সেই অংশে বর্ব্বর।

য়ুরোপীয় সমাজে অনেক মহাত্মালোকের সৃষ্টি করিয়াছে; সেখানে সাহিত্য-

ন-বিজ্ঞান প্রত্যহ উন্নতিলাভ করিয়া চলিতেছে; এ সমাজ নিজের মহিমা নিজে পদে পদে প্রমাণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে; ইহার নিজের অশ্ব উন্মত্ত হইয়া না উঠিলে, ইহার রথকে বাহির হইতে কেহ প্রতিরোধ করিবে, এমন কল্পনাই করিতে পারি না। এমনতর গৌরবান্বিত সমাজকে শ্রদ্ধার সহিত পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া ইহাকে যাহারা ব্যঙ্গ করে, বাংলাদেশের সেই সকল সুলভ লেখক অজ্ঞাতসারে নিজের প্রতিই বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

অপর পক্ষে, বহুশত বৎসরের অনবরত বিপ্লব যে সমাজকে ভূমিসাৎ করিতে পারে নাই; সহস্র দুর্গতি সহ্য করিয়াও যে সমাজ ভারতবর্ষকে দয়াধর্ম্ম-ক্রিয়াকর্ত্তব্যের মধ্যে সংযত করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে,—রসাতলের মধ্যে নামিতে দেয় নাই; যে সমাজ হিন্দুজাতির বুদ্ধিবৃত্তিকে সতর্কতার সহিত এমন ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে যে, বাহির হইতে উপকরণ পাইলেই তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে; যে সমাজ মূঢ় অশিক্ষিত জনমণ্ডলীকেও পদে পদে প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরিবার ও সমাজের হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিতে বাধ্য করিয়াছে; সেই সমাজকে যে মিশনরি শ্রদ্ধার সহিত না দেখেন, তিনিও শ্রদ্ধার যোগ্য নহেন। তাঁহার এইটুকু বোঝা দরকার যে, এই বিপুল সমাজ একটি বৃহৎ প্রাণীর ন্যায়—আবশ্যক হইলেও, ইহার কোন এক অঙ্গে আঘাত করিবার পূর্ব্বে সমগ্র প্রাণীটির শরীরতত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।

বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে;—সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে, তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে শিক্ষা ও অভ্যাসে সেই প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহা বর্ব্বরতার সোপান। তাহাতেই অন্যায় অবিচার নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করিতে থাকে। প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ কি? সেই সভ্যতা যাহাকে অধিকার করিয়াছে—স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ—তিনি সকলকে জানেন ও সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সর্ব্বদাই উপহাস করে ও ধিক্কার দেয়, তাহা হিঁদুয়ানী, কিন্তু হিন্দুসভ্যতা নহে। তেমনি যাহা প্রাচ্যসভ্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, তাহা সাহেবিয়ানা, কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা নহে। যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে।

সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধবিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমণ্ডপ হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেই জন্যই বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।

সদানন্দ।

সদানন্দদাসের বাড়ী বীরভূম জেলায়—লোকটি পরম বৈষ্ণব। আমেদপুর ষ্টেসনের অন্তর্গত যে গ্রামে তাঁর বাস, আমরা তাহাকে হরিপুর নামে পরিচিত করিব। তমাল-তালী-বনরাজিতে গ্রামের বড় বড় দীর্ঘিকা-গুলি সমাচ্ছন্ন হইলেও, ইহার বাহিরে ছায়া বড় নাই, প্রায় চারিদিকে বীরভূমসুলভ ডাঙাল বা প্রস্তরকঙ্করময় দূরবিস্তৃত প্রান্তর। গ্রামখানি বর্দ্ধমানের রাজার জমিদারীভুক্ত, অথচ তিন পুরুষ ধরিয়া দাসগোষ্ঠীই ইহার প্রকৃত মালিক। কেন না, সদানন্দের পিতামহ-ঠাকুর, পত্তনি গ্রহণ করার পর স্বর্গারোহণ করিলেও, আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর সনীল দস্তাবেজের ভাষায় পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে তালুকের ভোগ-দখল করিতেছেন।

সদানন্দ নিজে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছেন। রাত্রিদিন হরিনাম করেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তালুকটুকুর উন্নতি-কামনাও সর্ব্বদা তাঁর মনে জাগিতেছে। বসতবাটীর সংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত প্রকাণ্ড খোলাবাড়ীতে তাঁর অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। সেখানে পিতামহের স্বহস্তরোপিত প্রাচীন মাধবীলতার বিপুল ছায়াতলে ইষ্টক-রচিত বেদিতে বসিয়া বসিয়া তিনি হরিনামের মালা ঘুরাইতেছেন, অথচ তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্মুখে গরুর রাখাল হইতে গোমস্তা পর্য্যন্ত সকলেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কাজ ঘড়ির কাঁটার মত চলিয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্মণ এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা সদানন্দের জীবনের একটি প্রধান সুখ। ইহাতে ছোট বড় প্রভেদ নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে হরিপুরের খবর আসিল, জেলার প্রান্তে একটা খুনী মোকদ্দমার সরজমীন তদারক শেষ করিয়া ডেপুটী-সাহেব ফিরিয়া যাইতে-ছেন, সঙ্গে পুলিস-মোক্তার উকীলে বিস্তর লোকজন। সদররাস্তার কাছে তেমন সুবিধা-গোছের আশ্রয়স্থান না দেখিয়া হাকিম বরাবর চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে স্বয়ং সদানন্দ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। সাধারণত লোকে পরপালের মত হাকিম-পুলিসের এই অভিযানকে দূর হইতে নমস্কার করে, কিন্তু সদানন্দ সেই চৈত্রমাসের মধ্যাহ্নে ক্রোশখানেক হাঁটিয়া গিয়া এই বিপদকে গৃহে ডাকিয়া আনিলেন। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত, নিবিড়-কণ্ঠী-পরিহিত দাসজীর নধর দেহখানি আইন-আদালতের সংস্পর্শে কখন আসে নাই, উকীল মোক্তারেরা সকলেই একবাক্যে হাকিমকে জানাইল যে, সত্যসত্যই সদানন্দের মামলা-মোকদ্দমা থাকে না। অতএব সদলবলে ডেপুটীসাহেব ঘণ্টাকয়েকের জন্য দাসজীর গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। সদানন্দ

সকলকে স্নানাহার করাইয়া পুনরায় হাকিমের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন যে, হাতকড়িবদ্ধ আসামীটিকে ক্ষণকালের জন্ত মুক্ত করিয়া দিতে কনষ্টেবলদের প্রতি হুকুম হউক, নহিলে অভুক্ত কেহ গৃহে থাকিতে নিজে তিনি অন্নগ্রহণ করিতে পারেন না। ডেপুটীবাবুর আদেশে ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর খুনী আসামীকে আহার করাইয়া সদানন্দ যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেদিনকার সমস্ত অভ্যাগতের শুশ্রূষায় তেমন আনন্দ তিনি অনুভব করেন নাই।

গোসেবাতেও সদানন্দের বড় আনন্দ। তাঁর নিজের গাই-বলদ অনেকগুলি, সমস্তদিন বৃক্ষচ্ছায়ার আশ্রয়ে দুই দীর্ঘশ্রেণীতে প্রোথিত মাটীর বড় বড় "ডাবায়" তাহারা "জাব্না" খাইতেছে, দিনের ভিতর চারিপাঁচ বার স্বচক্ষে না দেখিলে তিনি স্থির হইতে পারেন না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিজে গোশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিয়া আসেন, যথাস্থানে প্রত্যেককে বাঁধিয়া "ছানি" দেওয়া হইয়াছে কি না। বাটী হইতে কিছু দূরে বিস্তৃত "সারকুড়ে" সমস্ত বৎসরের সঞ্চিত গোময়, দাসজীর ইক্ষু ধান্ত ও তরকারীর ক্ষেত্রগুলিকে সরস ও উর্ব্বর করে। হাসিয়া যখন-তখন সদানন্দ বলেন, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কেন গরু চরাইতেন, তার মর্ম্ম এখন বুঝ্‌তে পারি। গোধন তাঁর বড় প্রিয়, তাঁর মতন হিসাবী সংসারী আর কে? কোন জিনিষটি এ দুনিয়ায় অপচয় তিনি হইতে দেন না।"

বিপত্নীক দাসমহাশয়ের দাম্পত্যপ্রেমের ঘটাটা কেমন ছিল, এখন তাহা জানিবার তেমন উপায় নাই, কিন্তু ইদানীং পৌত্রী ও দৌহিত্রীদের সঙ্গে গৃহিণীর সম্বন্ধ পাতাইয়া যেরূপ প্রেমাভিনয় তিনি করেন, তাঁহাকে মনে হয় বটে যে, "এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে তায়!" বাস্তবিক রোজ সন্ধ্যার সময় নাতিপুতিগুলিকে সঙ্গে লইয়া, গৃহদেবতা রাধাকান্তজীউর আরতি দেখার পর, দণ্ডদুই তাদের কাছে গানগল্প ও রঙ্গভঙ্গ না করিলে, সদানন্দের রাত্রি কাটে না। কোনদিন হয় ব্রজের যাত্রা, তাতে নিজে তিনি সাজেন বৃন্দাসখী; কোনদিন 'চোর চোর' খেলা হয়, তাতে তিনি বুড়ী হয়ে বসেন। এই ছেলেখেলার পর যথানিয়মে প্রতিনিশায় গ্রামের ভক্ত বৈরাগীর দল লইয়া তিনি কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হন—তখন আর নাতি-নাতিনীদের মনে থাকে না।

প্রত্যূষে স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া দাসমহাশয় যখন গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন, তখনও তাঁর করধৃত হরিনামের ঝুলিতে মালাসঞ্চালন বন্ধ হয় না। এই প্রাতর্ভ্রমণোপলক্ষে গ্রামের ভদ্র ইতর সকলেরই গৃহ রোজ একবার তাঁর দেখা হয়—অতএব কোন খবর তাঁর অগোচর থাকে না। এই সময়ে সদানন্দকে সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামসুলভ বিস্তর খুঁটিনাটি ও ক্ষুদ্র কলহ-কচকচির মীমাংসা সরাসরি-মতে সম্পন্ন করিতে হয়।

এইরূপ আইনবিগর্হিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী এক্তিয়ারের একচেটিয়া সেকালে জমিদার-তালুকদারদের খোজা পাইত, কিন্তু সম্প্রতি গ্রামে দুইতিন জন "শিক্ষিত" লোকের আবির্ভাব হওয়ায়, সদানন্দের সে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। শিউড়ির বক-

বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তিপাস্ মথুরযশ মোক্তারীপরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হওয়ায়, পিতৃভিটা হরিপুরে কয়বছর যাবৎ আসর জমকাইয়া বসিয়াছিলেন এবং কৃষিকার্য্য ও টাঁণিগিরি দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বিধবা ভ্রাতৃবধূর লাখেরাজ পাঁচ বিঘার উপর তাহার নজর পড়িল। দুঃখিনী বিধবা দাসজীর কাছে কাঁদিয়া পড়িল যে, দেবর তাহাকে খাইতে পরিতে দেয় না, অধিকন্তু লাখেরাজটুকু আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সদানন্দ মথুরকে ডাকাইয়া এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করিলেন, এবং তাহাকে মিষ্টভাষায় বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার হরিপুরে কোনরূপ অত্যাচার-অনাচার প্রশ্রয় পাইবে না। মথুর বহুপূর্ব্বে অধীত পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগের কবিতা সংগ্রহ করিয়া এবং আইন-কানুনের নজীর দেখাইয়া, যুগপৎ সদানন্দের বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদনের সংকল্প করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে দাসজীউর কাছে কেবল ধমকের উপর ধমক খাইল।

লোকে সদানন্দকে অজাতশত্রু বলিয়া জানিত, কিন্তু সেই অবধি তাঁহার একটি শত্রুসঞ্চয় হইল। উগ্রক্ষত্রিয় মথুরযশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ অপমান ও পরাজয়ের প্রতিশোধ একদিন না একদিন সে অবশ্য লইবে।

ইহার পর চারি পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে। মথুরানাথ যশ গ্রামে বড় এসে না, যদিও কালেভদ্রে বাড়ীমুখো হয়, দাসজীর ছায়া সর্পবৎ প্রত্যাখ্যান করে। সে তৃতীয়ভাগ পদ্যপাঠের কবিতা ভুলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দাশরথি-রায়ের পাঁচালিতে যথেষ্ট অভ্যস্ত হইয়াছে, এবং বটতলার কবি-ঔপন্যাসিকদের গল্পপদ্যময় বিস্তর গল্প বলিয়া লোক হাসায়। ইহার ফলে মফঃস্বলের নিরীহ লোক অনেকে এই জীবন্ত বিজ্ঞাপনটির আকর্ষণে প্রলুব্ধ হইয়া, ইহার সঙ্গে জেলার সদরে যাতায়াত করিতে শিখিতেছে। তাহাতে আদালতের আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মথুরের টাঁণিগিরি বেশ দু'পয়সা লাভযুক্ত হইতেছে।

এদিকে সদানন্দ এতকাল তালুকের উন্নতি এবং হরিনামের মাহাত্ম্য যুগপৎ এই পরস্পরবিরোধী স্রোতের ভিতর স্থির ছিলেন বটে, কিন্তু ইদানীং মাঝে মাঝে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রার জন্য রাধাজীর আহ্বান স্বপ্নযোগে শুনিতে পাইতেছিলেন। আগে গ্রামের বাহিরে বড় যাইতেন না, কিছুদিন হইতে মধ্যে মধ্যে একাকী শ্রীপাট নানুরে চলিয়া যান. ফিরিতে কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, কখন রাত্রি হয়। ক্রমে সকলেই জানিল, রাধাজী তাঁর ভক্তকে সত্যসত্যই শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার আর দুই দিন বাকী। তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রালোকে হরিপুরের সুদূর-বিস্তৃত উত্তরের ডাঙ্গালভূমি অসীম-সাগর-তুল্য প্রতিভাত হইতেছিল। প্রান্তর জনশূন্য, শব্দমাত্রশূন্য—কেবল কদাচিৎ কোন 'ডাঙ্গালে' গীতের শেষ তানটুকু শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া, অদূরে লোকসমাগম সূচিত করিতেছে। সদানন্দ অপরাহ্নে সেই পথে একাকী চণ্ডীদাসের শ্রীপাট দর্শনে গিয়াছিলেন, একাকী প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, চন্দ্ররেখা অস্তগমনোন্মুখ, গ্রাম তখনও অর্দ্ধ-ক্রোশ ব্যবধান, এমন সময় 'ডাঙালে' গীতের সুরে কে গাহিল,—

"বলি তোর লেগে যমুনা-পার,
তুই হলি না গ—লা—র হার!"

ভক্ত সদানন্দ অন্তমনস্কভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, এই পানে নীল-সলিলা যমুনার তটভূমি তাঁর মানসচক্ষে জাগিয়া উঠিল, আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্রজবিহারীর সেই সাভিমান বংশীরবে শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি গ্রামপ্রান্তবর্ত্তি-দীর্ঘিকার পথে উপস্থিত হইলেন। সহসা মোহ ভাঙিয়া গেল, দীঘির ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে সহসা কেহ দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আঘাতের উপর আঘাত করিল। সদানন্দ চিনিলেন মথুর—হাতের লাঠি দিয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে ধীর স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"মথুর, কি অনিষ্ট তোর করেছি বাবা যে আমার প্রাণে মারিবি!" পৃষ্ঠে গুরুতর আহত হইয়া সদানন্দ রক্তস্রাবে দুর্ব্বল হইতেছিলেন, মথুরকে চিনিতে পারিয়াই পড়িয়া গেলেন।

মথুরের নাম ও সেই পতনশব্দ একজন দীর্ঘিকার সোপান অবতরণ করিতে করিতে শুনিতে পাইল। সে দৌড়িয়া সদানন্দের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে আঘাতকারী অন্তর্হিত হইয়া গেল। তারপর যথাসময়ে সদানন্দ গৃহে আনীত হইলেন—কথা কহিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু সকলের কথাবার্ত্তা শুনিতে বুঝিতে পারিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা সেই রাত্রেই মথুরঘণকে আসামী করিয়া থানায় খবর দিবার পরামর্শ করিলে, অনেক চেষ্টায় তিনি ক্ষীণ হস্ত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন।

সদানন্দ অনেকদিন কষ্ট পাইয়া আরোগ্যলাভ করিলেন, তাঁহার আজ্ঞা-লঙ্ঘন করিয়া আত্মীয়বন্ধুরা কেহ মথুরকে শাস্তি দিতে পারিল না। ছেলেরা জেদ করিলে সদানন্দ বলিতেন—"আমি ঘোর বিষয়াসক্ত হয়ে রাধাজীর আদেশ পালন করিতে বিলম্ব করেছিলাম, তাই তিনি শিক্ষা দিলেন। তোমরা উদ্‌যোগ কর, একটু উট্‌তে হাঁট্‌তে পারিলেই যেন আমি শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শন কর্ত্তে পারি।"

শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া দীর্ঘকাল পরে সদানন্দ গৃহে ফিরিয়াছেন। মথুরঘণ ফৌজদারীতে পড়িল না বটে, কিন্তু তাহার কুকীর্ত্তির কথা সকলেই শুনিয়াছিল, মক্কেলেরা বিশ্বাস করিয়া আর তাহাকে মোকদ্দমা দেয় না। সকলের হেয় হইয়া, সদানন্দের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর, নির্লজ্জ আবার হরিপুরে আসিয়া চাষ-আবাদ সুরু করিয়া দিল, নহিলে দিন যায় না। শুনিয়া অশ্রুমোচন করিয়া সদানন্দ বারংবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—সে কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না। বাবাজী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "মথুরকে বলো, সে কেন মনে রাখে, আমি ত তাকে তখুনি ক্ষমা করেছি।" মথুর চিরদিন মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া রহিল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সাগর-কথা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরোপকার সাধনে আপনার সর্ব্বনাশ করিতে ইতস্তত করিতেন না। একবার এক ভদ্রসন্তান (নাটোরের পুলিস্ সব্ ইন্স্পেক্টর) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "গত কল্য অপরাহ্ণে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। এই ভদ্রলোক বড়ই বিপন্ন হইয়াছেন। এক মকদ্দমায় ইনি নিরপরাধী হইয়াও ছয়মাসের জন্য কারাবাসের আদেশ পাইয়া অব্যাহতি-লাভের জন্য হাইকোর্টে মোশন করিয়াছেন। শত শত টাকায় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে ইহার পক্ষসমর্থনের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাটী হইতে গত কল্য টাকা আসিবার কথা, কিন্তু আসে নাই। আজ প্রথম শুনানির দিন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঘোষসাহেবকে একটু পত্র দিলে, তিনি অদ্যকার কাজটি করেন, ইত্যবসরে টাকা আসিলেই তাঁহাকে দেওয়া হইবে। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা অবশ্যই দিব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাপারটি অবগত হইয়া ক্ষণকাল নীরবে অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ কর্ম্ম আমার দ্বারা হইবে না। একজনের এক পা জেলে, আর এক পা বাহিরে, তাহার টাকা বাকি রাখিয়া কাজ করিতে বলা কেমন দেখায়? আর সেই বা কি মনে করিবে? তাহার পর ঘোষের বিলাত যাওয়ার সময়েই তাঁহার সহিত আত্মীয়তা, তাহার পর আর বড় বেশী দেখা-সাক্ষাৎ নাই, এরূপ স্থলে সহসা এরূপ একটা অনুরোধ করিয়া পাঠান কেমন-কেমন দেখায়, এটা কি করা যায়? তুমিই কেন ঘোষকে গিয়া ইহার কথা বল না? তিনি ত শুনি পরোপকারী এবং বিপন্নের বন্ধু। আমি এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখন কাহারও জন্য তাঁহার নিকট এরূপ অনুরোধ করিলে, আজ অসঙ্কোচে তাঁহাকে এ কথা বলিতে পারিতাম।"

বিপন্ন ভদ্রলোক এই কথা শুনিয়া সাশ্রুনয়নে সাগরের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি কোথাও যাহার কিনারা না হয়, সে এখানে আশ্রয় পায়, আমার তাহাও গেল!" সাগর সঙ্কুচিত হইলেন। আর্দ্রহৃদয়ে চিঠির কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিলেন। "My dear Ghose" পর্য্যন্ত লিখিয়া আর লেখনী অগ্রসর হয় না। একমিনিট দু'মিনিট করিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। তখন বলিলেন, "এ কর্ম্ম আমার দ্বারা হইবে না।" বিপন্ন ব্যক্তি পুনরায় বলিলেন, "তবে কি আমি জেলেই যাইব?" আর্ত্তের এই নিদারুণ হতাশবাক্য বিদ্যাসাগরহৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল, তিনি দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া কি করিলেন, পাঠক শুনিতে চাও? সে দিনকার কপর্দ্দকশূন্য বিদ্যাসাগর বাক্স হইতে ব্যাঙ্কের বই বাহির করিয়া, সাতশত

টাকার একখানি চেক্ হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার ব্যাঙ্কেও টাকা নাই, এই চেক্‌খানি ঘোষকে দিয়া বলগে যে, তিনি যেন কাল বেলা ১১॥• টার পূর্ব্বে এই চেক্ ব্যাঙ্কে না পাঠান। আমি আজ দিনের মধ্যে যেমন করিয়া হউক, এই টাকা ব্যাঙ্কে মজুত করিয়া দিব!" এখন জিজ্ঞাসা করি, বাংলা-দেশে এ হৃদয়ের অভিনয় কি একবারে নির্ব্বাপিত হইবে?

সব্‌ইন্‌স্পেক্টর বাবু সুকৃতিবলেই হউক, আর তাঁহার স্বপক্ষে প্রবল প্রমাণ ছিল বলিয়াই হউক, তিনি হাইকোর্টের বিচারে অব্যাহতি পাইয়া চতুর্থ দিবসে সাতশত টাকা লইয়া দয়ার সাগরের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে সেই বন্ধুটি। প্রণামান্তে টাকাগুলি সম্মুখে রাখিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আমি হাইকোর্টের বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছি, আর আজ প্রাতঃকালে বাড়ী হইতে এই টাকা আসিয়াছে, তাই সংবাদটি আর টাকাগুলি দিতে আসিলাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দপ্রকাশ করিবেন প্রত্যাশায় বন্ধুসহ দারোগাবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "তুমি ভদ্রসন্তান হইয়া আমাকে বঞ্চনা করিলে? আর তুমি (বন্ধুটিকে) আমার পরিচিত হইয়া আমার সঙ্গে চাতুরী করিলে?" দুইজনেই হতবুদ্ধি ও শুষ্কতালু হইয়া দণ্ডায়মান। অল্পক্ষণ পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "তুমি না বলেছিলে, তুমি পুলিসে কর্ম্ম কর?" (সভয়ে উত্তর—"আজ্ঞে হাঁ") "না, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না, তুমি আমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছ।" উত্তর—"আজ্ঞে না, মহাশয় অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আমি নাটোরের পুলিস্ সব্ ইন্‌স্পেক্টর।" বন্ধুটি তখন কথার ভঙ্গিমায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান্?" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা ছাড়া আর কি মনে করিব? এই দীর্ঘকালে অনেক লোক 'দিব' বলিয়া টাকা লইয়া আর দেখা দিল না, নিরুপায় লোকদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু সুপরিচিত সম্পন্ন ব্যক্তিরাও ত প্রয়োজন-সাধনের জন্য টাকা লইয়া সকল সময়ে ফিরাইয়া দেন নাই, আর অন্তরঙ্গের ত কথাই নাই। যে দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে দেশে তুমি পুলিসের দারোগা হইয়া সাতদিনের কড়ারে টাকা লইয়া চতুর্থ দিবসে ফেরত দিতে আসিয়াছ, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?" দারোগাবাবু উচ্চ পুরস্কারে পুরস্কৃত হইয়া নতমস্তকে দণ্ডায়মান, তখন তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন, "হাইকোর্টের জজেরা অনেক সময়ে মকদ্দমা না বুঝিয়া ছাড়িয়া দেয়—তোমারও দেখ্‌ছি, তাই হয়েছে। তোমার ত জেল হওয়া উচিত ছিল। সাতদিনের কড়ারে টাকা লইয়া চারদিনের দিন যে ফেরত দেয়, সে পুলিসের দারোগাগিরি চাকরি ক'রে জেলে যাবে না ত জেলে যাবে কে?" রহস্যের সুযোগ পাইলে পরিচিত-অপরিচিত-বিচার ছিল না। লোককে অপ্রস্তুত করিতেও ছাড়িতেন না। উপর্য্যুক্ত ভদ্রলোকের নিষ্কৃতিলাভে অপেক্ষ

প্রকারে আনন্দপ্রকাশ করিয়া পরে টাকাটি তুলিবার সময়ে বলিলেন, "ওহে! আট আনা কম দিলে কেন?" দারোগাবাবু অপ্রস্তুত হইয়া ভাবিতেছেন, বোধ হয় টাকার মধ্যে কোনপ্রকারে একটা আদুলি থাকিয়া গিয়াছে। সঙ্গের বন্ধুটি বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিবামাত্র বলিলেন, "আমি যার নিকট টাকা লইয়াছিলাম, তাহাকে টাকা দিয়াছি, এখন এই টাকা ব্যাঙ্কে রাখিতে গেলে গাড়িভাড়াটা কি আমাকে দিতে হবে?" দারোগাবাবুর হলো "সাপের ছুঁচো ধরা!" সাহস করিয়া বল্‌তেও পারেন না যে, গাড়িভাড়ার আট আনা আমি দিতেছি, আবার দিবনা-ও বল্‌তে পারেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "আর আট আনা না পেলে আমি ও টাকা বাক্সে তুলিব না।" ক্ষণকাল এইরূপ রঙ্গরসে সময়াতিপাত করিয়া বলিলেন, "যখন আমার লোক্‌সান করিলে, তখন আর কিছু লোক্‌সান কর!" পাঠক! এখন বুঝিয়া লউন, এ লোক্‌সানে দারোগাবাবুর রসনার কিরূপ পরিতৃপ্তি হইয়াছিল।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা

ইংরাজের আমলে আমাদের সেই আত্ম-শ্রদ্ধার উপরে ঘা লাগিয়াছে। আমরা সুখে আছি, স্বচ্ছন্দে আছি, নিরাপদে আছি; কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই অযোগ্য, এই ধারণা বাহির হইতে ও ভিতর হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এমন আত্মঘাতি-ধারণা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধারক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা লড়াই চলিতেছে। ইহা আত্মরক্ষার লড়াই। আমাদের সমস্তই ভাল, ইহাই আমরা প্রাণ-পণে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই নিজের প্রতি শ্রদ্ধা মনের মাংসপেশী। তাহা মনকে ঊর্দ্ধে খাড়া করিয়া রাখে এবং কর্ম্মের প্রতি চালনা করে। যে জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বসে, সে চলৎ-শক্তিরহিত হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর অভাব নহে; কারণ, ভারত-বর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্র তেমন ব্যাপক ও প্রাণবৎ ছিল না। মুসলমানের আমলে আমরা রাজ্য-ব্যাপারে স্বাধীন ছিলাম না, কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

চেষ্টার মধ্যে যেটুকু সত্য আশ্রয় করিয়াছে, তাহা আমাদের মঙ্গলকর, যেটুকু অন্ধভাবে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহাতে আমাদের ভাল হইবে না। জীর্ণবস্ত্রকে ছিদ্রহীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য যতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিব, ততক্ষণ শেলাই করিতে বসিলে কাজে লাগে।

আমরা ভাল, এ কথা রটনা করিবার লোক যথেষ্ট জুটিয়াছে। এখন এমন লোক চাই, যিনি প্রমাণ করিবেন, আমরা বড়। আচার্য্য জগদীশ বসুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। আজ আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার দিন আসিয়াছে,—লজ্জিত ভারতকে যিনি সেই সুদিন দিয়াছেন, তাঁহাকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত প্রণাম করি।

আমাদের আচার্য্যের জয়বার্ত্তা এখনো ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে নাই. য়ুরোপেও তাঁহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হইতে এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। যে সকল বৃহৎ আবিষ্কারে বিজ্ঞানকে নূতন করিয়া আপন ভিত্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করে, তাহা একদিনেই গ্রাহ্য হয় না। প্রথমে চারিদিক্ হইতে যে বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহাকে নিরস্ত করিতে সময় লাগে; সত্যকেও সুদীর্ঘকাল লড়াই করিয়া আপনার সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়।

আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়াছিল, য়ুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাধা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হক্‌সলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে।

আচার্য্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্য্যকে কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন, আপনি ত ধাতব-পদার্থের কথা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন. জীবশরীরে চিম্‌টির সহিত যাহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি!

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুতে চিম্‌টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বত লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্‌টির ফলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই।

জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ীদ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনী শক্তির নাড়ীস্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষপ্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

বিগত ১০ই মে তারিখে আচার্য্য জগদীশ রয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুশনে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—

যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া (The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus)। এই সভায় ঘটনাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রিন্স্ ক্রপট্‌কিন্ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্ লোকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় উপস্থিত কোন বিদুষী ইংরাজ-মহিলা, সভার যে বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসু-জায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহাদের পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল, এবং সর্ব্বপশ্চাতে আচার্য্যবসু নিজে। তিনি শান্তনেত্রে একবার সমস্ত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিত ভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন-চিত্রিত বড় বড় পট টাঙান রহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

তুমি জান, আচার্য্যবসু বাগ্মী নহেন। বাক্যরচনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে; এবং তাঁহার বলিবার ধরণও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,—এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব তাহাকেই ত জীবিত বলে;—অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিমদশা উপস্থিত, তখন ঔষধ-প্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্ম্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের

ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলকসঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন,—কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল,—এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি!

I have shown you this evening the autographic records of the history of Stress and Strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

"They who behold the one, in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else."

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মনে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় স্বীকার করিলেন।

আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ—শিষ্যভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-সভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল,—পদার্থতত্ত্বসন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।

লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহঙ্কার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন, "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হইতেছে. সেই ঋষিমণ্ডলীকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্‌গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্ব্বাণ রহিয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ! তোমরা আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দিবে না, আমাদিগকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহত্ত্ব আমরা যেন যথার্থভাবে বুঝিতে পারি। সে মহত্ত্ব অতিক্ষুদ্র আচার-বিচারের তুচ্ছসীমার মধ্যে বদ্ধ নহে,—আমরা অদ্য যাহাকে "হিঁদুয়ানি" বলি,

তোমরা তাহা লইয়া তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সমস্তই পতিত ভারতবর্ষের আবর্জ্জনামাত্র ;—তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই লোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বরহস্যের অন্তরনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া যতক্ষণ আমাদের বিনয় না জন্মিয়া গর্ব্বের উদয় হয়, কর্ম্মের চেষ্টা জাগ্রত না হইয়া সন্তোষের জড়ত্ব পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের উদ্যম ধাবিত না হইয়া অতীতের মধ্যে সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া লোপ পায়, ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নাই।

আচার্য্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ—তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধর্ম্মে কর্ম্মে, সেই পথ ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

কিন্তু আচার্য্য জগদীশ যে কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব আছে। বাধাও বিস্তর। প্রথমত, আচার্য্যের নূতন সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা অনেকগুলি পেটেন্ট অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে এবং একদল বণিক্‌সম্প্রদায় তাঁহার প্রতিকূল হইবে। দ্বিতীয়ত, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবনকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বলিয়া জানেন,তাঁহাদের বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র পদার্থতত্ত্ব, এ কথা তাঁহারা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তৃতীয়ত, কোন কোন মূঢ়লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞানদ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না, তাঁহারা পুলকিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খৃষ্টান্ বৈজ্ঞানিকেরা তটস্থ, এজন্য অধ্যাপক কোন কোন বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং একাকী তাঁহাকে অনেক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তবে, যাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারের অধিকারী, তাঁহারা উল্লসিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এমন ঘটনা হইয়াছে যে, যে সিদ্ধান্তকে রয়াল্ সোসাইটি প্রথমে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহারা আদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ যে মহৎ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার পরিণাম বহুদূরগামী। এক্ষণে আচার্য্যকে এই তত্ত্ব লইয়া সাহস ও নির্বন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাকে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে তিনি বিশ্রাম করিতে পাইবেন। এ কাজ যিনি আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ করা তাঁহারই সাধ্যায়ত্ত ইহার ভার আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আচার্য্য জগদীশ বর্ত্তমান অবস্থায় যদি ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, তবে ইহা নষ্ট হইবে।

কিন্তু তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল শীঘ্রই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে যোগ দিতে আসিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার অন্য কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন।

কেবল অবসরের অভাবকে তেমন ভয় র না। এখানে সর্ব্বপ্রকার আনুকূল্যের াব। আচার্য্য জগদীশ কি করিতেছেন, মরা তাহা ঠিক বুঝিতেও পারি না। এবং তিপ্রাপ্ত জাতির স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা বশত মরা বড়কে বড় বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে রি না, শ্রদ্ধা করিতে চাহি-ও না। আমা-র শিক্ষা, সামর্থ্য, অধিকার যেমনই থাক, মাদের স্পর্দ্ধার অন্ত নাই। ঈশ্বর যে ল মহাত্মাকে এ দেশে কাজ করিতে চান, তাহারা যেন বাংলা গবর্মেণ্টের রাখালি-জেলায় কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়। াষ্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই,—ত্তর সঙ্গ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জনশূন্য মরু-মও ইহা অপেক্ষা কাজের পক্ষে অনুকূল ;—এই ত স্বদেশের লোক—এদেশীয় াজের কথা কিছু বলিতে চাহি

এ ছাড়া যন্ত্র-গ্রন্থ, সর্ব্বদা বিজ্ঞানের লাচনা ও পরীক্ষা ভারতবর্ষে সুলভ নহে।

আমরা অধ্যাপক বসুকে অনুনয় করি-তেছি, তিনি যেন তাঁহার কর্ম্ম সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন! আমাদের অপেক্ষা গুরুতর অনুনয় তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমরা জানি। সে অনুনয় সমস্ত ক্ষতি ও আত্মীয়বিচ্ছেদ-দুঃখ হইতেও বড়। তিনি সম্প্রতি নিঃস্বার্থ জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত প্রচুর ঐশ্বর্য্যপ্রলোভনকে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার, আমাদের আছে না আছে, দ্বিধা করিয়া আমরা মৌন রহিলাম। অতএব এই প্রলোভনহীন পণ্ডিত জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্ব্বোচ্চে রাখিয়া জ্ঞানে, সাধনায়, কর্ম্মে, এই হতচারিত্র হতভাগ্য দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয় হইবেন, ইহাই আমরা একান্তমনে কামনা করি।

জগদীশ চন্দ্র বসু।

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষি-ধূলায় প্রস্তরে,—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক'পরে

দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে! মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোক-লোকান্তের অন্তরালে,—যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে!
হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!" ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক্ তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক্ ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,—বসুক্ সে অপ্রমত্ত চিত্তে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!

কবিজীবনী।

কবি টেনিসনের পুত্র তাঁহার পরলোকগত পিতার চিঠিপত্র ও জীবনী বৃহৎ দুইখণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাচীন কবিদের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন জীবনীর সখ লোকের ছিল না—তাহা ছাড়া তখন বড় ছোট সকল লোকেই এখনকার চেয়ে অপ্রকাশ্যে বাস করিত। চিঠিপত্র, খবরের কাগজ, সভাসমিতি, সাহিত্যের বাদ-বিরো[ধ] এমন প্রবল ছিল না। সুতরাং প্রতিভা[-]শালী ব্যক্তির জীবনব্যাপারকে নানাদি[ক] হইতে প্রতিফলিত দেখিবার সুযোগ তখ[ন] ঘটিত না।

অনেক ভ্রমণকারী বড় বড় নদীর উৎ[স] খুঁজিতে দুর্গম স্থানে গিয়াছে। বড় কা[ব্য] নদীর উৎস খুঁজিতেও কৌতূহল হ[য়]

আধুনিক কবির জীবনচরিতে এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে, এমন আশা মনে জন্মে। মনে হয়, আধুনিক সমাজে কবির আর লুকাইবার স্থান নাই ;—কাব্যস্রোতের উৎপত্তি যে শিখরে, সে পর্য্যন্ত রেলগাড়ি চলিতেছে।

সেই আশা করিয়াই পরমাগ্রহে বৃহৎ দুইখণ্ড বই শেষ করা গেল। কিন্তু কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবন-চরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয়-সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসঙ্গীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশীতে ভ্যাস করিয়া লইলেন ?

যখন ব্রাউনিংয়ের জীবনচরিত পড়িয়াছিলাম, তখন কবির পরিচয় পাই নাই। মানবজীবনের এমন বিপুল অভিজ্ঞতা কবি কবে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার একটিমাত্র জীবনে কি উপায়ে তিনি অসংখ্যহৃদয়ের নিগূঢ়বার্ত্তা সংগ্রহ করিতে পারিলেন ? তাঁহার চিঠিপত্র পড়িলাম, জীবনের ঘটনাবলীও দেখিলাম, কিন্তু কোন খবর পাইলাম না। এ সমস্ত জীবনচরিত অন্য কাহারও হইলেও, আশ্চর্য্য বোধ করিতাম না।

তবে এ লইয়া কি হইবে ? কাব্যে যাঁহাদিগকে বড় করিয়া দেখিতেছিলাম, কবি বলিয়া চিনিতেছিলাম—জীবনচরিতে তাঁহাদিগকে ছোট করিয়া দেখি—তাঁহারা জনসাধারণের সহিত সমান হইয়া যান। সেখানে তাঁহারা বত্রিশ সিংহাসন হইতে নামিয়া অন্য রাখালের সহিত একাকার হইয়া দেখা দেন! জীবনচরিতে তাঁহারা চিঠিপত্র লেখেন, দেখাসাক্ষাৎ করেন, ভালমন্দ বকেন, স্তুতিনিন্দায় টলেন, অবশেষে ব্যামো হইয়া বিশেষ তারিখে মরিয়া নিঃশেষিত হইয়া যান। আরও অনেকে এমন কাজ করিয়া থাকে—দুই খণ্ডে তাহাদের জীবনচরিত বাহির হইতে থাকিলে, গ্রন্থভার হইতে ধরণীকে রক্ষা করিবার জন্য একাদশ অবতারের প্রয়োজন হয়।

বাস্তবিক পক্ষে, কবির কাব্যে এবং কবির জীবনে যদি কোন নিগূঢ় যোগ থাকে, তবে সে যোগরহস্য উদ্ঘাটন চরিতাখ্যায়কের কর্ম্ম নহে। গাছের রস ও খাদ্য এবং তাহার মূল হইতে পল্লব পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিয়াও, এটুকু বাহির করা গেল না যে, মাধবীলতায় মাধবীফুল কেমন করিয়া ফুটিল। জীবনচরিতে যাহার কথা পড়িলাম, সে যে কেমন করিয়া কখন্ কাব্য লিখিল, তাহাও কিছুতে ঠাহর হইল না!

কবি কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে। যাঁহারা কর্ম্মবীর, তাঁহারা নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। কবি যেমন ভাষার বাধার মধ্য হইতে ছন্দকে গাঁথিয়া তোলেন, যেমন সামান্য ভাবকে অসামান্য সুর এবং ছোট কথাকে বড় অর্থ দিয়া থাকেন, তেমনি কর্ম্মবীরগণ সংসারের কঠিন বাধার মধ্যে নিজের জীবনের ছন্দ নির্ম্মাণ করেন, এবং চারিদিকের ক্ষুদ্রতাকে অপূর্ব্ব ক্ষমতাবলে বড় করিয়া লন। তাঁহারা

হাতের কাছে যে কিছু সামান্য মালমসলা পান, তাহা দিয়াই নিজের জীবনকে মহৎ করেন এবং তাহাদিগকেও বৃহৎ করিয়া তোলেন। তাঁহাদের জীবনের কর্ম্মই তাঁহাদের কাব্য, সেইজন্য তাঁহাদের জীবনী মানুষ ফেলিতে পারে না।

কিন্তু কবির জীবন মানুষের কি কাজে লাগিবে? তাহাতে স্থায়ী পদার্থ কি আছে? কবির নামের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উচ্চে টাঙাইয়া রাখিলে, ক্ষুদ্রকে মহতের সিংহাসনে বসাইয়া লজ্জিত করা হয়। জীবনচরিত মহাপুরুষের, এবং কাব্য মহাকবির।

দৈবক্রমে মহাকবির সহিত মহাপুরুষের লক্ষণ মিলিতে পারে। কোন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্ম্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন—কাব্য ও কর্ম্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে,তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে, জীবন এবং কাব্যের মর্য্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।

টেনিসনের জীবন সেরূপ নহে। তাহা সৎলোকের জীবন বটে, কিন্তু তাহা কোন অংশেই প্রশস্ত, বৃহৎ বা বিচিত্রফলশালী নহে। তাহা তাঁহার কাব্যের সহিত সমান ওজন রাখিতে পারে না। বরঞ্চ তাঁহার কাব্যে যে অংশে সঙ্কীর্ণতা আছে, বিশ্বব্যাপকতার অভাব আছে, আধুনিক বিলাতী সভ্যতার দোকান-কারখানার মদ্য গন্ধ কিছু অতিমাত্রায় আছে, জীবনীর মধ্যে সেই অংশের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়, কিন্তু যে ভাবে তিনি বিরাট্, যে ভাবে তিনি মানুষের সহিত মানুষকে, সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্ত্তাকে একটি উদার সঙ্গীতরাজ্যে সমগ্র করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার সেই বৃহৎ ভাবটি জীবনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন কবির জীবনচরিত নাই। আমি সে জন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমার মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বাল্মীকির পাঠকগণ বাল্মীকির কাব্য হইতে যে জীবনচরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, তাহা বাল্মীকির প্রকৃত জীবনের অপেক্ষা অধিক সত্য। কোন্ আঘাতে বাল্মীকির হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্য-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল?—করুণার আঘাতে। রামায়ণ করুণার অশ্রুনির্ঝর। ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকার্ত্ত ক্রন্দন রামায়ণকথার মর্ম্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মত প্রেমিকযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে—লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধব্যাপার উন্মত্ত বিরহীর পাখার ঝট্পটি। রাবণ যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল, মৃত্যুবিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। মিলনের পরেও এ বিচ্ছেদের প্রতিকার হইল না।

সুখের আয়োজনটি কেমন সুন্দর হইয়া আসিয়াছিল! পিতার স্নেহ, প্রজাদের প্রীতি, ভ্রাতার প্রণয়—তাহারই মাঝখানে ছিল নব পরিণীত রামসীতার যুগলমিলন। যৌবরাজ্যের অভিষেক এই সুখসম্ভোগকে সম্পূর্ণ এবং মহীয়ান্ করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়া-

চল। ঠিক এমনি সময়েই ব্যাধ শর লক্ষ্য রিল—সেই শর বিদ্ধ হইল সীতাহরণ-ালে। তাহার পরে শেষপর্য্যন্ত বিরহের ার অন্ত রহিল না। দাম্পত্যসুখের নিবিড়-ম আরম্ভের সময়েই দাম্পত্যসুখের দারুণ-ম অবসান।

ক্রৌঞ্চমিথুনের গল্পটি রামায়ণের মূল াবটির সংক্ষিপ্ত রূপক। স্থূল কথা এই, লাকে এই সত্যটুকু নিঃসন্দেহ আবিষ্কার রিয়াছে যে, মহাকবির নির্ম্মল অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ-প্রবাহ করুণার উত্তাপেই বিগলিত হইয়া ন্দমান হইয়াছে,—অকালে দাম্পত্যপ্রেমের চরবিচ্ছেদঘটনই ঋষির করুণার্দ্র কবিত্বকে ন্মথিত করিয়াছে।

আবার, আর একটি গল্প আছে রত্না-রের কাহিনী। সে আর এক ভাবের থা; রামায়ণের কাব্যপ্রকৃতির আর এক কের সমালোচনা। এই গল্প রামায়ণের মচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে। এই ল্পে বলিতেছে, রামসীতার বিচ্ছেদদুঃখের পরিসীম করুণাই যে রামায়ণের প্রধান বলম্বন, তাহা নহে, রামচরিত্রের প্রতি ক্তিই ইহার মূল। দস্যুকে কবি করিয়া লিয়াছে, রামের এমন চরিত্র,—ভক্তির এমন বলতা! রামায়ণের রাম যে ভারতবর্ষের ক্ষে কত বড় হইয়া দেখা দিয়াছেন, এই গল্পে যন তাহা মাপিয়া দিতেছে।

এই দুটি গল্পেই বলিতেছে, প্রতিদিনের থাবার্ত্তা, চিঠিপত্র, দেখাসাক্ষাৎ, কাজকর্ম্ম, ক্ষাদীক্ষার মধ্যে কবিত্বের মূল নাই—াহার মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মত—তাহা কবির আয়ত্তের অতীত। কবিকঙ্কণ যে কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাও স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া,—দেবীর প্রভাবে।

কালিদাসের সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তাহাও এইরূপ। তিনি মূর্খ, অরসিক, ও বিদুষী স্ত্রীর পরিহাসভাজন ছিলেন। অকস্মাৎ দৈবপ্রভাবে তিনি কবিত্বরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বাল্মীকি নিষ্ঠুর দস্যু ছিলেন, এবং কালিদাস অরসিক মূর্খ ছিলেন, এই উভয়ের একই তাৎপর্য্য। বাল্মীকির রচনায় দয়াপূর্ণ পবিত্রতা এবং কালিদাসের রচনায় রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যের অদ্ভুত অলৌকিকতা প্রকাশ করিবার জন্য ইহা চেষ্টামাত্র।

এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। কবির জীবন হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত, কবির কাব্যের সহিত তাহার কোন গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না। বাল্মীকির প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তা-কাজকর্ম্ম কখনই তাঁহার রামায়ণের সহিত তুলনীয় হইতে পারিত না, কারণ সেই সকল ব্যাপার সাময়িক, অনিত্য;—রামায়ণ তাঁহার অন্তর্গত নিত্যপ্রকৃতির—সমগ্র প্রকৃতির সৃষ্টি, তাহা একটি অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ—তাহা অন্যান্য কাজকর্ম্মের মত ক্ষণিক-বিক্ষোভ-জনিত নহে।

টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত একটি লেখা যাইতে পারে—বাস্তবজীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তাহা সমূলক। কল্পনার সাহায্য ব্যতীত তাহাকে সত্য করা যাইতে পারে না। তাহাতে লেডি শ্যালট্‌ ও রাজা আর্থরের

কালের সহিত ভিক্টোরিয়ার কালের অদ্ভুত-রকম মিশ্রণ থাকিবে;—তাহাতে মার্লিনের যাদু এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার একত্র হইবে। বর্ত্তমান যুগ বিমাতার ন্যায় তাঁহাকে বাল্য-কালে কল্পনারণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল—সেখানে প্রাচীনকালের ভগ্নদুর্গের মধ্যে একাকী বাস করিয়া কেমন করিয়া আলাদিনের প্রদীপটি পাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া রাজকন্যার সহিত তাঁহার মিলন হইল—কেমন করিয়া প্রাচীনকালের ধনসম্পদ্ বহন করিয়া তিনি বর্ত্তমান কালের মধ্যে রাজবেশে বাহির হইলেন, সেই সুদী[র্ঘ] আখ্যায়িকা লেখা হয় নাই। যদি হইত, তা[হা] একজনের সহিত আর একজনের লেখা[র] ঐক্য থাকিত না,—টেনিসনের জীবন ভি[ন্ন] ভিন্ন কালে ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে নূত[ন] নূতন রূপ ধারণ করিত।

কবির জীবনী কাল্পনিক ও [সে]ই কাল্পনিক জীবনী তাঁহার কাব্যসমালোচনা[র] রূপকস্বরূপ হওয়া উচিত। কারণ, কবি[র] মধ্যে কাব্যই সত্য অংশ, জীবন তাহা[র] তুলনায় অসত্য।

আমার কন্যার প্রতি।

(Victor Hugo হইতে)

শোন বলি বাছা ওরে!
দেখিছ তো, নত-শিরে
সহিতেছি কত অত্যাচার।
এমনি তুমিও সহ!—
থাকো গিয়া বহুদূরে
লোকালয় করি' পরিহার।
হবে সুখ?—না রে বাছা;
—সিদ্ধি-লাভ?—তা-ও না, তা-ও না।
যা হবার হোক্ বলি'
মন বাঁধো—তবেই সান্ত্বনা।
দয়ার্দ্রা মধুরা হও,
ভক্তি-স্নিগ্ধ ভাল উর্দ্ধে
কর উত্তোলন।

দিবা যথা নভোমাঝে
জ্বলন্ত রবির দীপ
করয়ে রক্ষ[ণ]
—ও-আঁখি-নীলিমা-মাঝে
আপন আত্মার জ্যোতি
করহ স্থাপন।
কেহ নহে সুখী হেথা,
সিদ্ধি-লাভ কারো নাহি হ[য়],
সকলেরি পক্ষে কাল
অসম্পূর্ণ জানিবে নিশ্চয়।
কাল সে তো শুধু ছায়া,
আর বাছা, মোদের জীবন,
সে-ও তো রে ছায়াময়
—ছায়াতেই তাহার গঠন

দ ভাগ্যে দেখ
সকলেই ক্লান্ত—বীতরাগ
·পক্ষে হায়!
সবাকারি সকলি অভাব
সে সামান্য কিছু
যাতে যার গাঢ় অনুরাগ।
"সামান্য-কিছু"
বে খোঁজে হেথা
যার তরে প্রাণের পিয়াস
টি কথা শুধু,
নাম, অর্থ,
একটি কটাক্ষ, মৃদু-হাস।
জা যিনি
অভাব   হয় প্রেমাভাবে।
বিন্দু জল বিনা
নন্ত সে মরু-হৃদে
সদা ক্ষোভ জাগে।
ব বৃহৎ কূপ
যত কেন দেও না ভরিয়া
হার শূন্যতা নিত্য
আরম্ভে' গো নূতন করিয়া।
ন্তাশীল মহাজ্ঞানী
দেবসম যাঁহারা পূজিত,
সই সব মহাবীর
যার বলে আমরা শাসিত,
সই সব খ্যাত-নামা

যার নামে দিক্ উদ্ভাসিত
—ক্ষণেক, মশাল-সম
জ্বলি উঠি' অগণ্য শিখায়
কিঞ্চিৎ ছায়ার তরে
শেষে আসি' শ্মশানে মিলায়।
প্রকৃতি-জননী জানি'
আমাদের দুখ-কষ্ট-রাশি
শূন্য এ জীবন-'পরে
অনুকম্পা সতত প্রকাশি'
উষায় করেন সিক্ত
প্রতি ... নালোকে
—প্রতি পদে আমাদের—
তিনি কেবা—আমরাই বা কে।
এই মর্ত্ত্য অধোলোকে
চরাচর সকলেরি মাঝে
—কিবা জড়, কিবা নর—
মহান্ নিয়ম এক রাজে।
সে বিধি পবিত্র অতি
—করে যেন সবাই পালন,
সকলেরি পক্ষে তাহা
অতিমাত্র সুলভ সুগম।
সে বিধিটি এই বাছা :—
ঘৃণা-চক্ষে দেখো না কাহারে,
সবারেই ভালবেসো
কিংবা দয়া কোরো গো সবারে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচনা।

—o—

(ক)

হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা।

গত মাসে "হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা"-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুদের হিন্দুত্ব কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অতি প্রাঞ্জল ও যথাযথ রূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, "হিন্দুত্বের সার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা।" এই একনিষ্ঠতা অর্থাৎ "কর্ত্তা ও কার্য্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি" তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তৎপ্রণোদিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। এই হেতু একনিষ্ঠতা হইতে কি প্রকারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রণোদন হয় এবং কিরূপেই বা এই "বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম ভারতের অধঃপতনের" কারণ হইল, এ সম্বন্ধে উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমাদের আর এক প্রবন্ধের দাবী রহিল।

উপাধ্যায় মহাশয়কে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিবার কারণ এই যে, হিন্দু বর্ণবিভাগপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে অনেকগুলি সমস্যা উপস্থিত হইতেছে। এইগুলির মীমাংসায় উপাধ্যায়মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের সাহায্য পাইলে, বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

মনুষ্যসমাজমাত্রেই জাতিভেদ অর্থাৎ বৃত্তি ও ব্যবহার ভেদে মানবসাধারণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ত স্বাভাবিক এবং ইহা কোন না কোন আকারে সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে। এই শ্রেণীবিভাগগুলি ব্যক্তি ও [illegible] কৃত্রিম ও স্বাভাবিক নানাবিধ নিয়মবন্ধনে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। হিন্দু বর্ণবিভাগপদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, ভিন্ন বর্ণগুলি পরস্পর হইতে অতি কঠিন ব্যবধানে পৃথক্কৃত এবং বর্ণবিশেষে জন্মগ্রহণ ব্যতীত তন্মধ্যে প্রবেশের অন্য উপায় নাই। এই প্রথাকেই কি উপাধ্যায়মহাশয় হিন্দুজাতির পক্ষে এত মহামূল্য জ্ঞান করেন? ইহার সম্বন্ধে কি বলা যায় যে, "ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে একীভূত করা, বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য?" বরং অনেক সময়ে ত মনে হয় যে, ভারতবাসীর নবাঙ্কুরিত মিলনপ্রবণতার পরিণতিতে এই প্রথা বিশেষ বাধা দিতেছে।

আর্য্যরা যখন প্রথম ভারতখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন বর্ব্বর অনার্য্য প্রভাবে জাতীয় অবনতি হইতে আত্মরক্ষার্থে বিবাহাদি-ব্যবহার-সম্বন্ধে দৃঢ় নিয়মগণ্ডি রচনার কারণ সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ভালই হৌক আর মন্দই হৌক, সে কৃত্রিম বন্ধন

অতি অল্পকালমধ্যেই বিনষ্ট হইয়া স্বাভাবিক মানবপ্রবৃত্তিই জয়লাভ করিল।

একণে কথা এই যে, এই অনিবার্য্য আর্য্য-অনার্য্য-সম্মিলনে যে বর্ত্তমান হিন্দুজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার মধ্যে সেই সকল কঠিন কৃত্রিম বন্ধনের সার্থকতা বা উপকারিতা কোথায়? এখন বর্ণে বর্ণে এমন কি চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষিত হয়, যাহার কুল পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি নিষেধ করিয়া উহাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা এত আবশ্যক? যাহা কিছু তারতম্য দেখা যায়, তাহা অবস্থা ও সুযোগ ভেদে ঘটে, এবং তাহাও শিক্ষা ও বৃত্তির সমতা হেতু দিন দিন লোপ পাইতেছে।

শুধু সার্থকতা নাই, তাহা নহে, বর্ত্তমান প্রথার বিশেষ অপকারিতা দৃষ্ট হইতেছে। প্রবল পাশ্চাত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিষ্পেষণে আত্মরক্ষার্থে ভারতবর্ষের সকল স্থানীয় হিন্দুদের পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধস্থাপন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত জাতিগত পূর্ব্ব নিয়মাবলী ক্রমেই অধিক কষ্টদায়ক ও অসুবিধাজনক হইয়া পড়িতেছে। তাহার ফলে অনেকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে পাশ্চাত্য রীতিনীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছে। বিবাহের ক্ষেত্র অযথাভাবে সঙ্কীর্ণ রাখার দরুণ পণগ্রহণ প্রভৃতি নানা কুপ্রথা বঙ্গসমাজে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম করিতেছে। এ অবস্থায় পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে বর্ণবিভাগের অক্ষুণ্ণতার যে পরিমাণ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কি বাঞ্ছনীয় এবং আশাপ্রদ নহে?

আর যদিই বা আমরা সকল অসুবিধা ও কষ্ট উপেক্ষা করিয়া কোন গতিকে বর্ত্তমান বর্ণবিভাগপ্রণালী বজায় রাখিতে পারি, তাহাতেই বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষার কি সুবিধা হইবে? এখনকার এক একটি বর্ণের মধ্যে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির লোক অলঙ্ঘনীয় জন্মগত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে বৃত্তি, প্রবৃত্তি, স্বভাব ও চরিত্র বশত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অন্তর্গত হইবার উপযোগী। তাহারা কি প্রকারে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত কোন এক বর্ণের কর্ত্তব্যসমষ্টি ধর্ম্মস্বরূপ পালন করিবে? আধুনিক হিন্দুর সেই অসাধ্যসাধন করিতে হয় বলিয়াই, অদ্যকার দিনে কেহই প্রকৃত হিন্দু হইতে পারে না। চতুর্দ্দিকে কেবল কপটতা ও শৈথিল্য বিরাজমান এবং তাহারই ফলে অনেক শ্রেষ্ঠ লোকে হিন্দুত্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভাঙ্গন যখন রীতিমত ধরিয়াছে, তখন তাহা নিবারণের বৃথা চেষ্টা না করিয়া, ঘর তুলিয়া একণে নূতন কোন্ স্থানে লইয়া যাইব, তাহা চিন্তা করাই অধিক ফলপ্রদ হইবে। অবশ্য ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন এক নিয়মাবলীর শাসন পরিত্যাগ করিবার পর, অপর কোন উপযুক্ত নিয়মাবলী সুসম্বদ্ধ হইয়া উঠিতে কিছু সময় লাগে। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল হইয়া উঠিবার অবসর পায়। এই নিমিত্ত অতিশয় ধীরগতিতে এবং সতর্কতার সহিত নূতনের উদ্দেশে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু পথ বিপৎসঙ্কুল বলিয়া যদি পুরাতন গণ্ডির মধ্য হইতে বাহির হইতেই সাহস না হয়, তবে ত উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি

দিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। শুধু তাহা নহে—সময় থাকিতে পূর্ব্ব হইতেই যদি আমরা নূতন আবাস প্রস্তুত করিয়া না রাখি, তাহা হইলে যখন কালের অনিবার্য্য স্রোতে পুরাতন ঘর ভাঙিয়া আমাদিগকে ঠেলিয়া বাহির করিবে, তখন আমরা আশ্রয় কোথায় পাইব?

আমাদের এই নূতন আশ্রয় অন্বেষণের কাল ঘনাইয়া আসিয়াছে—অনেক সম্প্রদায় অকালে ঘর হইতে ঠেলা খাইয়া বিশৃঙ্খলতার জঙ্গলে আশ্রয়হীনভাবে ভ্রমণ করিতেছেন—যাঁহারা এখনো ঘরে আছেন, তাঁহাদের চিন্তার সময় উপস্থিত। আশা করি, এ বিষয়ে তাঁহারা উপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(খ)

['নকলের নাকাল' সম্বন্ধে

"নকলের নাকাল" প্রবন্ধে লেখক সাহেবিয়ানার নকল লইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

সমস্ত জাতি ও সমাজের মধ্যে চিরকাল অনুকরণশক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে। খ্যাতনামা ইংরাজ লেখক ব্যাজট্‌ সাহেব তাঁহার 'ফিজিক্‌স্‌ এণ্ড পলিটিক্‌স্‌' গ্রন্থে জাতিনির্ম্মাণকার্য্যে এই অনুকরণশক্তির ক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

গোড়ায় একটা জাতি কি করিয়া বিশেষ একটা প্রকৃতি লাভ করে, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু তাহার পরে কালে কালে তাহার যে পরিবর্ত্তনের ধারা চলিয়া আসে—প্রধানত অনুকরণই তাহার মূল। ইংলণ্ডে রাজ্ঞী অ্যানের রাজত্বকালে ইংরাজ সমাজ সাহিত্য আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল, জর্জরাজগণের সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অথচ জ্ঞানবিজ্ঞানের নূতন প্রসার এমন কিছু হয় নাই, যাহাতে অবস্থা-পরিবর্ত্তনের গুরুতর কারণ কিছু পাওয়া যায়।

ব্যাজট্‌ সাহেব বলেন, এই সকল পরিবর্ত্তন তুচ্ছ অনুকরণের দ্বারা সাধিত হয়। একজন কিছু একটা বদল করে, হঠাৎ কি কারণে সেটা আর পাঁচজনের লাগিয়া যায়, অবশেষে সেটা ছড়াইয়া পড়ে। হয় ত সেই বদলটা কোন কাজের নহে, হয় ত তাহাতে সৌন্দর্য্যও নাই; কিন্তু যে লোক বদল করিয়াছে, তাহার প্রতিপত্তিবশত বা কি কারণবশত, সেটা অনুকরণবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে পারে। এইরূপে পরিবর্ত্তনের বৃহৎ কারণ না থাকিলেও, ছোটখাট অনুকরণের বিস্তারে কালে কালে জাতির চেহারা বদল হইয়া যায়

ব্যাজট্‌ সাহেবের এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যেমন সবল সুস্থ শরীর বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত প্রভাব নিজের অনুকূল করিয়া লয়, অস্বাস্থ্যকর যাহা কিছু অতি শীঘ্র পরিত্যাগ

রিতে পারে, তেমনি সবলপ্রকৃতি জাতি ভাবতই এমন কিছুই গ্রহণ করে না বা র্ঘকাল রক্ষা করে না, যাহা তাহার জাতীয় প্রকৃতিকে আঘাত করিতে পারে। দুর্ব্বল-জাতির পক্ষে ঠিক উল্টা। ব্যাধি তাহাকে টু করিয়া চাপিয়া ধরে এবং তাহা সে শীঘ্র ছাড়িয়া ফেলিতে পারে না। বাহিরের ভাব তাহাকে অনেকসময় বিকারের দিকে ইয়া যায়, এইজন্য তাহাকে অতিশয় সাব-ধানে থাকিতে হয়। সবল লোকের পক্ষে হা বলকারক—স্বাস্থ্যজনক, রোগা লোকের ক্ষে তাহাও অনিষ্টকর হইতে পারে।

মোগলরাজত্বের সময়েও কি মুসলমানের অনুকরণ আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হয় নাই? নিশ্চয়ই তাহাতে ভালমন্দ দুইই ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজিয়ানার নকলের সহিত তাহার একটি গুরুতর প্রভেদ ছিল, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

মুসলমানরাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহিরে তাহার মূল ছিল না। এইজন্য মুসলমান ও হিন্দু সভ্যতা পরস্পর জড়িত হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে স্বাভা-বিক আদান-প্রদানের সহস্র পথ ছিল। এই জন্য মুসলমানের সংস্রবে আমাদের সঙ্গীত সাহিত্য শিল্পকলা বেশভূষা আচারব্যবহার, দুই পক্ষের যোগে নির্ম্মিত হইয়া উঠিতেছিল। উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণগত ভিত্তি ভারতবর্ষীয়, তাহার অভিধান বহুলপরিমাণে পারসিক ও আরবী। আধুনিক হিন্দুসঙ্গীতও এইরূপ। অন্য সমস্ত শিল্পকলা হিন্দু ও মুসলমান কারিকরের রুচি ও নৈপুণ্যে রচিত। চাপকান-জাতীয় সাজ যে মুসল-মানের অনুকরণ, তাহা নহে, তাহা উর্দ্দু ভাষার ন্যায় হিন্দুমুসলমানের মিশ্রিত সাজ—তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লেখক লিখিয়াছেন, বিলাতীয়ানার মূল আদর্শ বিলাতে,—ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে। সুতরাং এই আদর্শ আমরা অবলম্বন করিলে বরাবর তাহাকে জীবিত রাখিতে পারিব না, মূলের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকাতে, আজ না হউক কাল, তাহা বিকৃত হইয়া যাইবে।

বিলাতের যাহা কিছু সম্পূর্ণ আমাদের করিয়া লইতে পারি, অর্থাৎ যাহাতে করিয়া আমাদের মধ্যে অন্যায় আত্মবিরোধ না ঘটে, চারিদিকের সহিত সামঞ্জস্য নষ্ট না হয়, যাহা আমাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদিগকে পোষণ করিতে পারে, ভারাক্রান্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত না করে, তাহাতেই আমাদের বলবৃদ্ধি হয়—এবং তাহার বিপরীতে আমাদের আয়ুক্ষয়মাত্র।

সাহেবিয়ানা আমাদের পক্ষে বোঝা। তাহার কাঠখড় অধিকাংশ বিলাত হইতে আনাইতে হয়, তাহার খরচ অতিরিক্ত। তাহা আমাদের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। তাহাতে আমাদের নিজের আদর্শ—নিজের আশ্রয় নষ্ট করে, অথচ তৎপরিবর্ত্তে যে আদর্শ—যে আশ্রয় দেয়, তাহা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে—বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করিতে পারি না। তীর ছাড়িয়া যে নৌকায় পা দিই, সে নৌকার হাল অন্যত্র। মাঝে হইতে স্বেচ্ছাচার-অনাচার প্রবল হইয়া উঠে।

সেইজন্য প্রতিদিন দেখিতেছি, আমাদের দেশী সাহেবিয়ানার মধ্যে কোন ধ্রুব আদর্শ

নাই ;—ভালমন্দ শিষ্ট-অশিষ্টর স্থলে সুবিধা-অসুবিধা ইচ্ছা-অনিচ্ছা দখল করিয়া বসিয়াছে। কেহ বা নিজের সুবিধামতে একরূপ আচরণ করে, কেহ বা অন্যরূপ ; কেহ বা যেটাকে বিলাতী হিসাবে কর্ত্তব্য বলিয়া জানে, দেশী সমাজের উত্তেজনার অভাবে আলস্যবশত তাহা পালন করে না ; কেহ বা যেটা সকল সমাজের মতেই গর্হিত বলিয়া জানে, স্বাধীন আচারের দোহাই দিয়া স্পর্দ্ধার সহিত তাহা চালাইয়া দেয়। একদিকে অবিকল অনুকরণ, একদিকে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা। একদিকে মানসিক দাসত্ব, অন্যদিকে স্পর্দ্ধিত ঔদ্ধত্য। সর্ব্বপ্রকার আদর্শচ্যুতিই ইহার কারণ।

এই আদর্শচ্যুতি এখনো যদি তেমন কুদৃশ্য হইয়া না উঠে, কালক্রমে তাহা উত্তরো-ত্তর কদর্য্য হইতে থাকিবে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইংরাজের টাট্‌কা সংস্রব হইতে নক- করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও যদি ইংরাজ- সামাজিক শিষ্টতার বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষি- না হয়, তবে তাঁহাদের উত্তরবংশীয়দের মধ্যে বিকার কিরূপ বিষম হইয়া উঠিবে, তা কল্পনা করিতেও লজ্জাবোধ হয়।

ব্যাজট্‌ বলেন, অনুকরণের প্রভাবে জা- গঠিত হইতে থাকে, কিন্তু তাহা সঙ্গত অ- করণে,—জাতীয়প্রকৃতির অনুকূল অনুকরণে। যে জাতি অসঙ্গত অনুকরণ করে—

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ।

(গ)

['ভাষাতত্ত্ব' সম্বন্ধে *]

বৈশাখের বঙ্গদর্শনে বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে 'ভাষাতত্ত্ব'-নামক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

সমালোচকের উক্তি।—"প্রাকৃত বলিতে লোকে শকুন্তলাদির ভাষাই বুঝিয়া আসিতেছে, বুঝিয়া থাকে এবং বুঝিতে থাকিবে ; পৃথিবীশুদ্ধ শ্রীনাথবাবু এবং পৃথিবীশুদ্ধ সাহিত্যসভা মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও, বাঙলা ও হিন্দি প্রভৃতি বুঝাইতে 'প্রাকৃত'-শব্দ ব্যবহৃত হইবে না।"

উত্তর।—এই বিষয়ে 'ভাষাতত্ত্বে' যা- লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই—সভ্যদে- মাত্রেই ভাষা দ্বিবিধ ;—লিখিত এবং কথিত। তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, লিখিতভা- ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অবিকৃত, আর কথিত ভাষাতে ব্যাকরণ ভুল থাকে এবং শব্দ সকল কুঞ্চিত হইয়া উচ্চারিত হয়। আর্য্যদে- ভাষার একটি বিশেষ নাম ছিল না। ইহাকে ভাষাই বলিত এবং ভাষা-শব্দেই আর্য্যভা- বুঝাইত। পরে যখন ব্যাকরণের দ্বা- ভাষার সংস্কার করা হয়, তখন ইহা-

* সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-সমালোচনার প্রতিবাদ লওয়া হয় না। কিন্তু 'ভাষাতত্ত্বের' আলোচনায় লাভ আছে, এইজন্যই এ প্রতিবাদ পত্রস্থ করা হইল। ব° স°।

নাম সংস্কৃতভাষা হইল এবং সাধারণ লোকে ব্যাকরণদ্বারা অনুশাসিত না হইয়া যেরূপ স্বাভাবিক ভাষাতে কথা বলিত, তাহার নাম ভাষা অথবা 'প্রাকৃত'-ভাষা হইল।

প্রাকৃত-শব্দের অর্থ স্বাভাবিক অর্থাৎ স্ত্রীলোক এবং সাধারণ লোকে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া স্বভাবত যেরূপ কথা বলে, তাহার নাম প্রাকৃত-ভাষা। আর শিক্ষিত লোকে যেরূপ মার্জ্জিতভাষাতে কথা বলে এবং লেখে, তাহার নাম সংস্কৃতভাষা। প্রাকৃত মনুষ্য বলিলে তাহাকে বুঝায়, যাহার শিক্ষা-দ্বারা জ্ঞানবুদ্ধির উৎকর্ষ জন্মে নাই। আর অপ্রাকৃত মনুষ্য তাহাকে বলে, যাহার শিক্ষা-দ্বারা জ্ঞানবুদ্ধি বিশিষ্টরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ভাষাতত্ত্ব' বাঙলা, হিন্দি প্রভৃতিকে সংস্কৃতের কথিতভাষা বলিতেছে। আর সংস্কৃতের কথিতভাষার নাম প্রাকৃত, অতএব বাঙলা, হিন্দি প্রভৃতিকে 'প্রাকৃত' বলিবে না কেন?

স্থানে স্থানে কালে কালে ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ বিশেষ কারণে কথিতভাষা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হয়, কিন্তু লিখিতভাষা ব্যাকরণের শাসনে স্থির থাকে। এইজন্য আমাদের লিখিত সংস্কৃতভাষা স্থির আছে, কিন্তু তাহার কথিতভাষা বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন কালে মাগধী, শৌরসেনী, পালি, বাংলা, হিন্দি, ব্রজবুলী, উৎকলী ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করিয়াছে। ইহারা সকলই সংস্কৃতের কথিতভাষা এবং সকলই প্রাকৃত-শব্দবাচ্য।

শকুন্তলার দেশে তাহার সময়ে যেরূপ কথা বলিত, তাহাও প্রাকৃত; আমাদের দেশে আমাদের কালে যেরূপ কথা বলে, তাহাও প্রাকৃত; এবং মগধদেশে এখন যেরূপ কথা বলে, তাহা, এবং সেই দেশে পূর্ব্বে যেরূপ কথা বলিত, তাহা, উভয়ই সংস্কৃতের কথিতভাষা এবং উভয়ই প্রাকৃতসংজ্ঞাবাচ্য।

'প্রাকৃত' কোন একটি বিশেষ ভাষার নাম নহে। সমস্ত ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কতপ্রকার প্রাকৃত যে প্রচলিত ছিল, তাহার সংখ্যা নাই। সেই সকল প্রদেশের সকল কালের কথিতভাষার নামই প্রাকৃত। ইহা সংস্কৃতের কথিত-ভাষার সাধারণ নাম। প্রাকৃতভাষার অর্থ সংস্কৃতের কথিতভাষা, তাহা যে দেশেরই হউক বা যে কালেরই হউক। অতএব বাংলা হিন্দি প্রভৃতি সকলই প্রাকৃতশব্দ-বাচ্য।

চন্দ্রবাবু বলিয়াছেন আমরা "মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও" তিনি বাংলাকে 'প্রাকৃত' বলিবেন না। কিন্তু ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল বাংলা পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পর্য্যন্ত বাংলাকে 'প্রাকৃত' বলা হইয়াছে। যথা,—

> শনির মাহাত্ম্য আছে স্কন্দ-পুরাণেতে,
> 'পরাকৃত' বিনে কেহ না পারে বুঝিতে,
> অতএব পয়ারপ্রবন্ধে তাহা বলি,
> একচিত্তে শুন সবে শনির পাঁচালী।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত 'শনির পাঁচালী'। বাবু দীনেশচন্দ্র সেনও তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-নামক পুস্তকে বলিতে বাধ্য হইয়া-ছেন, "পূর্ব্বে ভারতের কথিতভাষামাত্রই, বোধ হয়, প্রাকৃত-সংজ্ঞায় অভিহিত হইত, এবং এই বাঙ্গলা ভাষাকেও প্রাকৃত বলিত, যথা—

ভারতের পুণ্যকথা শ্রদ্ধা দুর নহে।
'পয়াকৃত' পদবন্ধে রাজেন্দ্রদাসে কহে॥
(২০০ দুইশত বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত সঞ্জয়কৃত মহাভারত।)"

'প্রকৃতিবাদ' প্রভৃতি অভিধানেও বাংলা শব্দগুলিকে প্রাকৃত বলিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যন্ত এই ভাষাকে প্রাকৃত বলিয়াছে.—তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায় এবং আবশ্যক হইলে ক্রমে দেওয়া যাইবে। 'বাঙলা-ভাষা'-নাম নিতান্ত আধুনিক। এই নাম দেওয়াতেই আমাদের ভাষাকে এখন আর অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকেও প্রাকৃত বলিতে চাহেন না এবং এই ভাষাকে যে কখনও প্রাকৃত বলিত, তাহাও জানেন না। বাঙলাভাষা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় প্রাকৃতভাষা এবং তাহাকে তাহাই বলা উচিত।

সমালোচকের উক্তি।—"শ্রীনাথবাবু বলেন যে, 'বঙ্গভাষা কথিতাকারে লিখিত সংস্কৃতভাষা। লোকে যে ইহাকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র একটি মিশ্রভাষা মনে করে, তাহা ভ্রম।'" * * * * "কিন্তু অনেক পারসিক, আরবীয়, ইংরেজি, ফরাশী প্রভৃতি শব্দ যে বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই সকল শব্দের উন্মূলনও এক্ষণে অসম্ভব। তবে কি বলিয়া বাংলাকে মিশ্রভাষা না বলিব? পরের কাছে ধার করায় যে মর্য্যাদার হানি আছে, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু ধার যখন করিতেই হইয়াছে, তখন তাহা লুকাইবার চেষ্টা করা কেন?"

উত্তর।—ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পর সংসর্গে আসিলে দীর্ঘকাল একত্র বাস হেতু যে দুই চারিটি শব্দ অলক্ষিতভাবে একের ভাষা হইতে অন্যের ভাষাতে প্রবেশ করে না পৃথিবীতে এমন ভাষা নাই, যাহাতে এই প্রকার কতক পরকীয় ভাষা প্রবেশ করিয়াছে। ইহা প্রায় বাণিজ্যাদি উপলক্ষে এবং রাজ্যবিস্তার হেতু সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রাজ্যবিস্তারফল ভয়ঙ্কর, কারণ, বিজিতজাতি বিজেতৃগণের ভা[illegible] অজস্র ব্যবহার করিতে থাকে। মুসলমানে[illegible] যখন আমাদের দেশের রাজা ছিলেন, ত[illegible] তাঁহাদের ভাষা আমরা শিক্ষা করিতাম এ[illegible] তাঁহাদের অনেক শব্দ আমরা কথোপকথ[illegible] ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করিতাম। বিচারাল[illegible] তাঁহাদের ভাষা ব্যবহার না করিলে, তাঁহা[illegible] বুঝিতেন না। সেইপ্রকার এক্ষণেও আ[illegible] ইষ্টাম্প, ইন্ডেমনিটী বণ্ড, রেজেষ্টা[illegible] উইল ইত্যাদি বলিতেছি, আর সাধ[illegible] কথোপকথনে অনেক সময় অপ্রয়োজ[illegible] ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করি।

পরভাষা শিখিয়াছি বলিয়া কথোপকথনে ঐরূপ করি। তাহা বলিয়া, লিখিবার সময় নিষ্প্রয়োজনে ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ ঐ সকল শব্দ ত আমাদের ভাষা নহে। এবং ঐ সকল শব্দ আমাদের শব্দ বলিয়া অভিধানে স্থান পাইতে পারে না। দেল, কলিজা, শুরু প্রভৃতি শব্দ আমাদের অভিধানে থাকিলেই তাহা বাঙলা শব্দ বলিয়া পুস্তকে ব্যবহার করিবার অধিকার জন্মে; কিন্তু আজকাল বঙ্গাভিধানসকল এইপ্রকার যাবনিক ভাষাতে পরিপূর্ণ। যে অভিধানে শব্দসংখ্যা অধিক, তাহারই

ক গৌরব। অতএব ইংরেজী, ফারশী, বী ইত্যাদি শব্দসকল অজস্র অভিধানে শ করিতেছে, কে তাহা বারণ করে? ধানের কলেবরবৃদ্ধির জন্য সকল ানেই যাবনিক-শব্দের সংখ্যা, যতদূর পারে, বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং বাধা ইলে ক্রমে আরও বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু বৃদ্ধি হইয়াও ঐ সকল শব্দের সংখ্যা দের অভিধানের মোট শব্দসংখ্যার াংশের অধিক হয় নাই। একশত মধ্যে ৬।৭টি পরকীয় শব্দ থাকিলে, ক মিশ্রভাষা বলা যায় না। 'ভাষা- যে সকল শব্দাদির আলোচনা করা ছ, যথা—সংখ্যাবাচক শব্দ, বিভক্তি- র্বনাম, ক্রিয়া-বিভক্তি, ণিজন্ত, কৃদন্ত, প্রত্যয়াদি, ইহাদিগকে ভাষার প্রাণ । 'ভাষাতত্ত্বে' দেখান গিয়াছে যে, ল শব্দাদির মধ্যে একটিও পরকীয়- হইতে গৃহীত নহে। যদি প্রাণিক শব্দ- স্থির থাকে, তবে অপ্রাণিক শব্দের শতেকে ৬।৭টি কেন, তাহার দ্বিগুণ কি ণ পরকীয় শব্দ থাকিলেও, তাহাকে ভাষা বলা যায় না।

সমালোচকের উক্তি।—"শ্রীনাথবাবুর সংস্কৃত 'আসীৎ'-শব্দ লিখিতে যখন দীর্ঘ র লাগে, তখন বাঙলাতেও 'আছিল' বা না লিখিয়া, 'আছীল' বা 'ছীল' লেখা —'দীর্ঘ ঈকার না দিয়া আমরা হ্রস্ব দিয়া থাকি, তাহা অবিহিত।' রহস্য য, শ্রীনাথবাবু নিজে এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই 'অবিহিত' কার্য্য করিয়াছেন। এক র উপদেষ্টা আছেন, তাঁহারা বলেন যে —আমি যাহা করি, তাহা করিও না, আমি যাহা বলি, তাহাই কর। এইরূপ উপদেষ্টার উপদেশ যে ভাসিয়া যাইবে,ইহা অবশ্যম্ভাবী।"

উত্তর।—এই রহস্যের উত্তর 'ভাষা- তত্ত্বে'ই ত আছে। উহার ১২ পৃষ্ঠার নীচে মন্তব্যে লেখা আছে যে, 'আছিল' ও 'ছিল' শব্দে হ্রস্ব ইকার দেওয়া যদিচ আমরা অবি- হিত বলিতেছি, "তথাপি এই পুস্তকে আমরা হ্রস্ব ইকারই ব্যবহার করিতে বাধ্য আছি, কারণ যতক্ষণ পাঠকগণ ইহা অবিহিত বলিয়া স্বীকার না করিবেন, ততক্ষণ আমাদের দীর্ঘ ঈকার ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। এইপ্রকার অনেক শব্দ আমরা এই পুস্তকে অশুদ্ধ বলিয়া দেখাইয়াছি এবং দেখাইব, অথচ সেই সকল শব্দ উল্লিখিত কারণে এই পুস্তকে আমরা সেই প্রচলিত-ব্যবস্থানুসারে অশুদ্ধরূপেই লিখিয়াছি এবং লিখিব;" যথা –

শুদ্ধ।	অশুদ্ধ।
তা	তাহা
বলার	বলিবার
ধরার	ধরিবার
ছীল	ছিল
বাড়	বার
তেড়	তের
	ইত্যাদি।

সমালোচকের উক্তি।—"বাঙলা-লেখক- দিগের মধ্যে এমন স্থূলচর্ম্মী নির্ব্বোধ কে আছে যে, শ্রীনাথবাবুর ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করিয়া (অর্থাৎ 'ছিল'-শব্দে দীর্ঘ ঈকার দিয়া) অনর্থক হাস্যাস্পদ হইবে?"

উত্তর।—দীর্ঘ ঈকার দিতে ইচ্ছা না হয়,

না দিবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, জানিয়া শুনিয়া এখন আর অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিতে লোকের কখনই প্রবৃত্তি হইবে না। কিপ্রকার ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য হইতে বঙ্গভাষা সমুদ্ভুত হইয়াছে, তাহা 'ভাষাতত্ত্ব' প্রথম খণ্ড আদ্যন্ত প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিলেই কথঞ্চিৎ জানা যায়। তাহা দেখিয়াও চন্দ্রবাবু কি এইপ্রকার অশুদ্ধ শব্দগুলিকে আর্ষপ্রয়োগের সহিত তুলনা করিবেন?

চন্দ্রবাবু বলেন, "ইংরেজী ব্যাকরণের একটা সূত্র এই যে, ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন আপিল নাই।" কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে। সেই ইংরেজী ভাষার দিনদিন পরিবর্ত্তন হইতেছে। দোষ দেখিতে পাইলে, তাহা সংশোধন না করিয়া, দূষিত পঙ্কিলজলে ডুবিয়া থাকা কি স্বভাবের কার্য্য? চন্দ্রবাবু কি জানেন না, আজকাল ইংরেজী ভাষার সংশোধনের জন্য কি ভয়ানক আন্দোলন চলিতেছে? মতভেদ এক স্বতন্ত্র কথা। যদি 'ছিল' লিখিতে দীর্ঘ ঈকার দেওয়া অনুচিত হয়, তবে কেন দিবেন? কিন্তু যদি বলেন, "অবিহিত হইলেও ব্যবহার আছে বলিয়া, আমরা হ্রস্ব ইকারই দিব," তাহা ঠিক নহে; কারণ, ব্যবহার যদি নির্দ্দোষ হয়, তবেই তাহা মাননীয়, কিন্তু দূষিত হইলে তাহা মাননীয় নহে।

সমালোচকের উক্তি।—"বাঙলা জীবিত ভাষা; তাহাকে কি মৃত সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের খুঁটিনাটিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব?"

উত্তর।—বাঙলা যখন সংস্কৃতের ক[...] ভাষা, তখন ইহাকে লিখিতে হইলে, সংস্কৃ[...] 'খুঁটিনাটিতে' আবদ্ধ না রাখিলে চ[...] কেন? আপনারা কি এখনও 'অধীন[...] 'অধীনী', 'আলস্য'-স্থলে 'অলস', 'জ্যো[...] স্থলে 'চন্দ্রিমা', 'তৎকালে'-স্থলে 'তৎক[...] লিখিবেন? আমাদের অভিধানে[...] 'কুৎসা'কে 'কুচ্ছা', 'আচম্বিত'কে 'আচ[...] 'আকর্ষী'কে 'আকড়শি' বলিয়া লিখিত[...] ঐ সকল শব্দ কি ঐপ্রকারই থাকিবে?

সমালোচকের উক্তি।—"বাঙলায় অ[...] 'কাজ'-কথাটা বর্গীয় 'জ' দিয়া [...] থাকেন। শ্রীনাথবাবু বলেন, এটা ভুল; [...] না, সংস্কৃত কার্য্যশব্দের 'য'টা অন্তস্থ [...] ভরসা করি, 'ভাষাতত্ত্ব'লেখক শ্রী[...] জানেন যে, সংস্কৃতকথাটি যদিও [...] কিন্তু প্রাকৃতকথাটা 'কজ্জ'। [...] কথাটা যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রাকৃত [...] উৎপন্ন নহে, তাহা কে বলিল?"

উত্তর।—সংস্কৃত শব্দসকল [...] চলিতকথায় যেরূপ উচ্চারিত হয়, [...] উচ্চারণব্যতিক্রমের নিয়মসকল [...] তত্ত্বের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকটিত হইয়[...] তাহার চতুর্থ নিয়ম এই যে, কত[...] নিত্যব্যবহৃত শব্দে অন্ত্য যুক্তবর্ণের আ[...] লোপ করিয়া পূর্ব্বস্বরকে গুরু ক[...] উচ্চারণ করা হয়, এবং লুপ্তবর্ণ বর্গীয় [...] বর্ণ হইলে তাহার স্থানে চন্দ্রবি[...] যথা—চন্দ্র=চাঁদ, সপ্ত=সাত, ইত্য[...] ঐ নিয়মানুসারে, কার্য্য=কায [...] সুতরাং ঐ শব্দে অন্তস্থ 'য'ই ব্যব[...] করা উচিত। চন্দ্রবাবু প্রশ্নচ্ছলে স[...]

ন যে, প্রাকৃত 'কজ্জ'-শব্দ হইতে 'কাজ'-ট উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। তিনি য়াছেন, "বাঙলা কথাটা যে সাক্ষাৎ-দ্ধ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা বলিল?" ইহার উত্তর এই যে, সমগ্র াতত্ত্ব'-গ্রন্থে ইহাই প্রমাণ করিবার করা গিয়াছে যে, বাঙলা সংস্কৃতেরই তাকার এবং ইহা অন্য কোন ভাষা ত সমুদ্ভূত নহে। ইহা যদি ঐ পুস্তকে ণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, তবে ়'-শব্দে বর্গীয় 'জ' ব্যবহার করা উচিত ।

আর এক কথা বলি, চন্দ্রবাবু যে প্রাকৃতের কথা বলিতেছেন, সেই প্রাকৃতে অন্তস্থ 'য'র ব্যবহার আদৌ নাই; কিন্তু বাঙলাভাষাতে অন্তস্থ 'য'র ব্যবহার আছে। যাহার ভাষায় 'য' নাই, সে সুতরাংই 'জ' ব্যবহার করিবে; যাহার ভাষায় আছে, সে করিবে কেন? এই যে 'যাহার'-শব্দ লিখিলাম, ইহাকেও সেই প্রাকৃতের নিয়মানুসারে 'জাহার' লিখিতে হয়, 'যে'কে 'জে' লিখিতে হয়। আমরা আমাদের বর্ণমালাতে অন্তস্থ 'য'টাকে রাখিয়া তাহার ব্যবহার কি প্রকারে ত্যাগ করিব?

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

নক কথা। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখো-াধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি া।

ভিন্ন ভিন্ন সামযিক পত্রে লিখিত কয়েকটি গল্প পুনর্মুদ্রিত হইয়া এই পুস্তকখানি াছে। গ্রন্থকার প্রভাতবাবুর ক্ষুদ্র গল্প ধবার ক্ষমতা আছে। তবে, তাঁহার ন গল্পই যে ভাল হয় নাই, এ কথা লে, ভরসা করি গুণগ্রাহীরা এমন মনে াবেন না যে, আমরা গ্রন্থকারের নিন্দা াতেছি। লেখক যত কেন ক্ষমতাশালী ন না, তাঁহার রচনামাত্রই যে সমান কর্ষ লাভ করিবে, ইহা কেহ প্রত্যাশা ে না; ইহা সম্ভবও নহে। 'হিমানী' গল্পটি আমাদের বড় সুন্দর বোধ হইয়াছে। হিমানী আদর্শ-চরিত্র—এই কঠোর বাস্তবিকতার সংসারে এমন মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আদর্শ-চরিত্র বলিয়াই আমাদের চক্ষে ইহার গরিমা। হিমানীর প্রেম অতি উচ্চ অঙ্গের প্রেম; এই প্রেম-চিত্রের জন্য প্রভাতবাবুর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তবে, প্রভাতবাবু তাঁহার সকল গল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। 'পত্নীহারা' গল্পটা নিতান্ত হাস্যজনক হইয়াছে—সে হাসি পতির জন্যও নহে, পত্নীর জন্যও নহে; গ্রন্থকারের জন্য। 'ভূত না চোর' গল্পটা কিছুই হয় নাই। 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত' একটি ইংরেজি গল্পের ব্যর্থ অনুকরণ।

'বিষবৃক্ষের ফল'—নিতান্ত অস্বাভাবিক গল্প। তথাপি পুস্তকখানির জন্য প্রভাতবাবুর প্রশংসা করিতে পারি। পরিহাস-প্রিয়ের কেমন একটু তীব্র অথচ মিষ্ট হাস্য এই সকল গল্পে আছে, যাহা বাঙলা ক্ষুদ্র গল্পে প্রায় দেখিতে পাই না। সম্ভবত লোকে পুস্তকখানি কিনিয়া পড়িবে।

পত্রাবলী। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই পুস্তকখানির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। অবিনাশবাবু রচনা করিতে শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু কাব্য কাহাকে বলে, কাব্য কিসে হয়, তাহা আজিও বুঝেন নাই। তাই এই চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ ভাবশূন্য, আবেগশূন্য, প্রাণশূন্য কবিতা লোকের ঘাড়ে চাপান কেন? বঙ্গীয় পাঠক অতি নিরীহ শ্রেণীর জীব। নিরীহের উপর কি অত্যাচার করিতে হয়! দশানন সীতাদেবীকে পত্র লিখিতেছেন; ইহাতে হাস্য সম্বরণ করা নিতান্তই অসম্ভব। অবিনাশবাবু অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে, অন্যের চিত্তরঞ্জন করিতে হইলে, নিজের চিত্তে সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী শক্তির বিকাশ প্রয়োজনীয়।

স্মৃতি-মন্দির। শ্রীকেদারেশ্বর সেন বি, এ, প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই উপন্যাসখানি সুকল্পিত বটে, কিন্তু সুলিখিত নহে। উপন্যাসখানি পড়িয়া মোটের উপর প্রীত হইয়াছি, এ কথা বলিতে পারি; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হয় যে, পড়িতে পড়িতে অনেক সময় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে।

চরিত্র-কল্পনায় গ্রন্থকারের কৃতিত্ব প্রশংসার্হ; কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার হাত আজিও কাঁচা। সর্ব্বাণী ও হরিনাথ, দুইটি আদর্শমূলক চরিত্র; কিন্তু এই দুইটি চরি[illegible] কেদারেশ্বরবাবুর হাতে কতক ফুটিয়াছে কতক ফুটে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও [illegible] শ্রেণীর গ্রন্থের আমরা পক্ষপাতী। যাঁহ[illegible] বাস্তবমূলক (realistic) চিত্র অঙ্কিত ক[illegible] তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা আদর্শমূ[illegible] (idealistic) চরিত্র চিত্রণ করেন, তাঁ[illegible] দিগকে আমরা উচ্চতর স্থান দিয়া থাকি। পৃথিবীতে এমিলি জোলার এবং তাঁহা[illegible] শিষ্যপ্রশিষ্যদিগের যতই কেন খ্যাতি থা[illegible] না, এবং তাঁহাদের রচিত উপন্যাস য[illegible] কেন বিক্রীত হউক না, আমরা কখ[illegible] তাঁহাকে ও তাঁহাদিগকে প্রথমশ্রে[illegible] প্রতিভাশালী উপন্যাস-লেখক বলিয়া [illegible] করি না। বাস্তবমূলক উপন্যাসও ভাল ক[illegible] লিখিতে ক্ষমতার আবশ্যক; কিন্তু আ[illegible] মূলক উপন্যাস ভাল করিয়া লিখিতে প্রতিভা প্রয়োজন।

গ্রন্থকার কেদারেশ্বর বাবু উচ্চ কল্প[illegible] করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাল করি[illegible] সাজাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধ[illegible] দোষ এই যে, উপযোগিতা-জ্ঞান তাঁহা[illegible] আজিও পরিস্ফুট হয় নাই; সেইজ[illegible] তাঁহাকে শেষকালের মিলন যোড়াতা[illegible] দিয়া ঘটাইতে হইয়াছে। প্রেমানন্দ-ঠাকু[illegible] এই উপন্যাসের বিকাশ ও পরিণতির জ[illegible] সম্পূর্ণ অনাবশ্যক চরিত্র। তেলিনী বৌ[illegible] দস্যুপতির অবতারণার উদ্দেশ্য, বোধ ক[illegible] উপন্যাসের বৈচিত্র্য সম্পাদন করা। কি[illegible] ইহাতে অদ্ভুতত্ব সম্পাদিত হইয়াছে মা[illegible]

বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয় নাই। গ্রন্থকার যদি আন্তরিক অনুরাগের সহিত অনুশীলন করেন এবং নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশের নেশায় আত্মোৎকর্ষবিধানে অবহেলা না করেন, তাহা হইলে তিনি যে কালে উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

প্রয়াস। শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

এই পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রের জন্য লিখিত হইয়াছিল এবং প্রকাশিত হইয়াছিল। সাময়িক পত্রের জন্য লিখিতে হইলে অনেক সময়েই দ্রুত-রচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; এবং দ্রুত-রচনায় ভাষার গাঢ়তা, ভাবপারম্পর্য্যের পরিস্ফুটতা ধারাবাহিকতা এবং রচনা-লীলার সরসতা সম্পাদনের অবসর থাকে না। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমাদের এইরূপ মনে হইয়াছে যে, শিবাপ্রসন্ন বাবু কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্ ও ভাবুক। তবে, উপরি উক্ত কারণেই বোধ হয় তাঁহার ভাবুকতা পরিস্ফুট হইতে পায় নাই।

আর একটা কথা। সাময়িক পত্রে যাহা কিছু লিখিত হয়, তাহাই স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত হয় না; অথচ লেখক যদি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁহার রচিত প্রবন্ধ-গুলিকেই স্বপ্রকাশিত পুস্তকে স্থান দেন, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, তিনি সে সকল-গুলিকেই স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। অথচ এই পুস্তকে এমন দুই একটা প্রবন্ধ আছে, যাহা পুস্তকে সন্নিবেশিত না হইলেই ভাল হইত—অর্থাৎ তাহা স্থায়ী সাহিত্যে স্থানলাভ করিবার উপযুক্ত নহে। ভূমিকালেখক গিরিজাবাবুও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন, এবং অধিকন্তু স্বীকার করিয়াছেন যে, এই অপরাধের সমস্ত দোষটাই গ্রন্থকারের নহে।

তথাপি এই পুস্তকখানি আমরা লোককে পড়িতে পরামর্শ দিতে পারি। ইহাতে যে কল্পনার বিকাশ আছে, তাহাতে লোকের চিত্তবিনোদন হইবে। ইহাতে যে সাংসারিক জ্ঞানের কথা আছে, তাহাতে অনেকের শিক্ষা হইবে। অবশেষে গ্রন্থকারকে এইমাত্র বলিতে চাই যে, সংসারের পাঁচ কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃজন কদাচিৎ ঘটে—একই সময়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের সফল সেবা হইতে পারে না। এ পৃথিবীতে ঐকান্তিক সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি-লাভ দুর্লভ—বুঝি অসম্ভব।

ত্রিবেণী। তিনটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। শ্রীবঙ্কিমবিহারী দাস-প্রণীত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসের জ্বালায়, এবং বলিতে কি, আজকালকার বৃহৎ উপন্যাসের জ্বালায়ও, আমাদিগকে বড় জ্বালাতন অনুভব করিতে হয়। এই সকল পড়িয়া সমালোচনা করা যে কি যন্ত্রণা, তাহা, প্রাচীনকালে যাঁহারা তুষানল করিতেন, বোধ হয় তাঁহারাই কেবল বুঝিতেন। এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে 'সহপাঠী'-নামক গল্পটির কতক উল্লেখ করা যায়, কিন্তু ইহারও কল্পনাটি অতি পুরাতন, অতি জীর্ণ। গ্রন্থকার 'বিজ্ঞাপনে' লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান 'ত্রিবেণী' কেবলমাত্র

পাঠক সংগ্রহার্থে লিখিত—অন্য উদ্দেশ্য সাধনার্থে নহে।" ইহাতে পাঠকসংগ্রহ কি হইবে? যদি হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমরা বাহবা দিব; কিন্তু সে বঙ্গীয় পাঠক-মহোদয়দিগের বিচার-শক্তি ও গুণগ্রাহিতাকে, গ্রন্থকারকে নহে।

গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত। কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

নানাকারণে এই গ্রন্থাবলীর সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। পরিচিত ব্রাহ্মণের উপবীত দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। সাময়িক পত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার উদ্দেশ্য, নূতন গ্রন্থকে সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজগুণে এত সুপরিচিত যে, তাঁহার আবার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তদ্ব্যতীত, ৺ বঙ্কিমবাবুর লিখিত যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার পর আমাদের আর বড় কিছু বলিবারও নাই।

বঙ্কিমবাবুর সম্পাদকতায় ইতিপূর্ব্বে যখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ' প্রকাশিত হয়, তখন অনেক কবিতা অশ্লীলতা-দোষে দূষিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদক মণীন্দ্রকৃষ্ণ-বাবু লিখিয়াছেন—"আমরা তাঁহার সম্পূর্ণ রচনা খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতেছি।" ভালই করিতেছেন। অশ্লীল বলিয়া ঈশ্বরগুপ্তের রচনাবলী কাটিয়া ছাঁটিয়া বাহির করা যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কালিদাস ও শেক্ষপীয়রকেও কাটিয়া ছাঁটিয়া নাজেহাল করিয়া বাহির করিতে হয়। এপ্রকার কাজটা আমরা নিতান্তই অসঙ্গত মনে করি। মণীন্দ্রকৃষ্ণবাবু তাঁহার 'দাদামহাশয়ের' সম্পূর্ণ রচনা প্রকাশের যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে বাংলা সাহিত্যে এমন কদর্য্য উন্মুক্ত ঘৃণিত অশ্লীলতাও আছে, যাহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়; কিন্তু এরূপ অশ্লীলতা ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় বড় দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে এবং দাশরথিরায়ের পাঁচালীতে যে প্রেতোচিত অশ্লীলতার ছড়াছড়ি দেখা যায়, ঈশ্বরচন্দ্রে সেরূপ অশ্লীলতা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এইখানে ইহাও বলিয়া রাখিতে হয় যে, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত তাঁহার যে কবিতাযুদ্ধ হইয়াছিল, এবং যাহার কদর্য্যতা দেশপ্রসিদ্ধ, তাহার কোন কবিতা আমরা পড়ি নাই।

এই সংস্করণে কেবল যে কবিতাই প্রকাশিত হইবে, এরূপ নহে; কবিতা, নাটক এবং অন্যান্য সকল রচনাই প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক মণীন্দ্রবাবু এরূপ আশা দিয়াছেন আশীর্ব্বাদ করি, তিনি এই সাধুসংকল্পে সফলকাম হউন।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। ক্ষকার। কৃস্‌টবুক্‌ কমিটি ক্ষকারকে বাঙলা বর্ণমালা
ত নির্ব্বাসন দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশ-
বিদ্যাভূষণ অনেক পুরাতন নজির দেখা-
ক্ষকারের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন।
ংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দলে ক্ষ কেমন করিয়া
মে প্রবেশ করিয়াছিল জানি না, কিন্তু সে
য়ে দ্বাররক্ষক যে সতর্ক ছিল, তাহা বলিতে
না। আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্য্য-
য় মূর্দ্ধন্য ষ-এর উচ্চারণ খ হইয়া গিয়া-
—সুতরাং ক্ষকারে মূর্দ্ধন্য ষ-এর বিশুদ্ধ
রণ ছিল না। না থাকিলেও উহা যুক্ত
এবং উহার উচ্চারণ ক্‌খ। শব্দের
ন্ত অনেক যুক্ত অক্ষরের যুক্ত উচ্চারণ
না—যেমন জ্ঞান-শব্দের জ্ঞ—কিন্তু
শব্দে উহার যুক্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে
হ থাকে না। ক্ষকারও সেইরূপ—
এবং অক্ষয় শব্দের উচ্চারণে তাহা প্রমাণ
। অতএব অসংযুক্ত বর্ণমালায় ক্ষকার
ষ্ট একঘরে,' তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই
পংক্তির মধ্যে উহার অনুরূপ সঙ্করবর্ণ
একটিও নাই। দীর্ঘকালের দখল
ণ হইলেও, তাহাকে আরো দীর্ঘকাল
য় অধিকার রক্ষা করিতে দেওয়া উচিত
? যাহা হউক্‌, এই উপলক্ষ্যে বিদ্যা-
। মহাশয় বর্ণমালাসম্বন্ধে যে আলোচনা
পন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ কৌতূহল-
ক। অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু এবং হলন্ত
ম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন,
আমরা তাহা স্বীকার করি। **বাঙ্গলা শব্দের দ্বিরুক্তি।** সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় বঙ্গদর্শনসম্পাদক "শব্দদ্বৈত"-নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ফাল্গুন-মাসের প্রদীপে তাহার একটি সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী সেই সমালোচনা অবলম্বন করিয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মূল-প্রবন্ধলেখকের নিকট এই আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্য। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া বলিতে গেলে, সংক্ষিপ্ত সমালোচনার সীমা লঙ্ঘন করিবে। কেবল একটা উদাহরণ লইয়া আমাদের বক্তব্যের আভাসমাত্র দিব।—আমরা বলিয়াছিলাম, "চার চার" "তিন তিন" প্রকর্ষবাচক। অর্থাৎ যখন বলি "চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির," তখন একেবারে চার পেয়াদা আসায় বাহুল্যজনিত বিস্ময় প্রকাশ করি। প্রদীপের সমালোচক মহাশয় বলেন, এই স্থলের দ্বিত্ব বিভক্ত-বহুলতা-জ্ঞাপক। অর্থাৎ যখন বলা হয়, "তাহাদিগকে ধরিবার জন্য চার চার জন পেয়াদা আসিয়া হাজির", তখন সমালোচক মহাশয়ের মতে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত, ইহাই বুঝায়। আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না। বিহারীবাবুও দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইয়াছেন, একজনের জন্যও "চার চার পেয়াদা" বাঙলাভাষা অনুসারে আসিতে পারে। বিহারীবাবু বলেন, দৃষ্টান্ত অনুসারে

দুই অর্থই সঙ্গত হয়। অর্থাৎ প্রকর্ষ এবং বিভক্তবহুলতা, দুই বুঝাইতে পারে। তাহা ঠিক নহে—প্রকর্ষই বুঝায়, সেই প্রকর্ষ এক-জনের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, সুতরাং উভয়বিধ প্রয়োগের মধ্যে প্রকর্ষভাবই সাধারণ।

সাহিত্য। চৈত্র। মহাপুরুষ রাণাডে। এই মহাত্মার জীবনী প্রকাশ করিয়া সাহিত্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বাঙালী স্বাভাবিক-ক্ষুদ্রতা-বশত সাধারণত অন্যপ্রদেশীয়দের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ। দুর্ভাগ্যবশত বর্ত্তমানকালে যে কয়েকজন বাঙালী কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মুখ্য-ভাবে রাষ্ট্রতন্ত্র লইয়াই ব্যাপৃত। এই কারণে রাষ্ট্রতন্ত্রিগণকেই আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ম্মীর আদর্শ করিয়া লইয়াছেন। সভাস্থলকেই তাঁহারা প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র এবং ইংরাজি ভাষায় বাগ্মিতাকেই তাঁহারা জীবনের প্রধান উদ্যোগ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বঙ্গেতরবাসী শিক্ষিতবর্গের ইংরাজি বাক্য-প্রবাহ ও উচ্চারণের সহিত তাঁহাদের স্ব-প্রদেশীয় আদর্শের তুলনা করিয়া তাঁহারা গর্ব্ব অনুভব করেন ও মনে করেন, বাংলা-দেশ ভারতবর্ষের অন্য সকল বিভাগ অপেক্ষা সকলপ্রকারে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বাঙালী নব্যবঙ্গের এই সঙ্কীর্ণ আদর্শকে আঘাত করিয়া নষ্ট করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র অভিমান আমা-দিগকে প্রতিদিন পথভ্রষ্ট করিতেছে। মহা-রাষ্ট্রী মহাপুরুষ রাণাডের জীবনী যদি আমা-দিগকে সচেতন করিতে না পারে, তবে তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্রতারই পরিচয় হইবে। এই মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিয়া আমাদের যদি অনুকরণের প্রবৃত্তি না জন্মে, তথাপি আমরা যেন নম্রতা শিক্ষা করিতে পারি,—আমরা যেন স্বীকার করি, রাণাডের ন্যায় সর্ব্বতোব্যাপী মহত্ত্বের আদর্শ আমাদের বাংলা দেশে নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রীয় ব্যাপারে রাণাডের উদ্যোগ তাঁহার দেশহিতকর উদ্যমের একাংশমাত্র। রাষ্ট্রতন্ত্রে মহাত্মা রামমোহন রায়ও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। পরাধীন দেশে রাষ্ট্রতন্ত্র কোন [illegible] হৃদয়কে কখনই সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারে না। সেখানে তাহার চেষ্টা অল্প সীমাবদ্ধ এবং সকল সময় গৌরবজনক নয়। রাণাডের মাহাত্ম্য,—ধর্ম্ম, সমাজ, লোকশিক্ষা, রাষ্ট্রতন্ত্র,—সর্ব্বত্রই আপনাকে প্রচার করিয়াছিল। রামমোহন রায় যেমন সমস্ত নব্য বঙ্গকে আপন মহত্ত্বদীপ্তিতে বিকশিত করিয়াছিলেন, রাণাডে সেইরূপ সমস্ত নব্যমহারাষ্ট্রকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে পরিপুষ্ট করিতেছিলেন। তিনি নব্যমহারাষ্ট্রকে কেবল বাগ্মিতা, কেবল আবেদনকুশলতা, শিখাইতেছিলেন না, কিন্তু তাহাকে মানুষ করিতেছিলেন। দেউ[illegible] মহাশয় লিখিতেছেন, "স্বদেশের উন্নতিসাধ[illegible] যাবতীয় বিভিন্ন পন্থাই তাঁহার সর্ব্বতো[illegible] প্রতিভাগুণে তিনি নির্দ্ধারণ করিতে স[illegible] হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সমাজ, বাণিজ্য, শিল্পকলা, মাতৃভাষা সাহিত্য, রাজনীতির চর্চ্চা, রাজকীয় [illegible] ব্যবস্থা, নিম্নসমাজে শিক্ষার প্রসার প্রভৃ[illegible]

ল বিষয়ের সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন শান্নতি সম্ভবপর নহে। ভগবানের ণায় অগাধ বুদ্ধির ন্যায় তিনি অসাধারণ ঠতাও লাভ করিয়াছিলেন। তাই তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও, অতি অল্প সময়ের া রাজনীতিচর্চ্চার যন্ত্রস্বরূপ পুণার সার্ব্ব-ত সভা, জেনেরাল-লাইব্রেরি-নামক রেণ পাঠাগার, পঞ্চায়তী আদালত, তাসভা, দেশীয় কাপড়ের দোকান, য় শিল্পপ্রদর্শনী, মিউজিয়ম, সঙ্গীত-জ, দেশীয় শিল্পসমিতি, বেদপাঠশালা, ান এডুকেশন সোসাইটি, ডেকান্ ক্লাব্, সমাজ, এবং জ্ঞানপ্রকাশ-নামক হিক পত্র ও সার্ব্বজনিক সভার এক-ত্রৈমাসিক পত্র প্রভৃতি বহুবিধ লোক-কর অনুষ্ঠানের সূত্রপাত, পরিপুষ্টি ও পোষণ করিতে পারিয়াছিলেন।” এই পুরুষের বিপুল প্রাজ্ঞতার সহিত গভীর য়তা, বিচিত্র কর্ম্মশীলতার সহিত অটল ন্তি, অগাধ বিদ্যাবত্তার সহিত পরিপূর্ণ মিশ্রিত হইয়া এবং তাঁহার সমস্ত জ্ঞান, ও চেষ্টার উর্দ্ধভাগে একটি নির্ম্মল ও ধর্ম্মভাবের জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া যে ট উন্নত উজ্জ্বল উদার আদর্শের সৃষ্টি ছে, মুখরগর্ব্বিত বাঙালিকে তাহার প্রান্তে প্রণত হইতে আহ্বান করি। মহাত্মার মৃত্যুতে সমস্ত ভারতের যে হইয়াছে, সে ক্ষতির পূরণ কবে হইবে?

প্রদীপ। বৈশাখ। রাজবিদ্যা।

:ত ব্রহ্মবিদ্যা যখন পরা বিদ্যা বলিয়া ত ছিল, তখন তাহা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-মধ্যেই বদ্ধ ছিল না, হীরেন্দ্রবাবু এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। তখন অনেক সময় ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে ক্ষত্রিয় রাজার দ্বারস্থ হইতেন। গীতায় যে কর্ম্মযোগের উপদেশ আছে, তৎ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন:—“পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিরা অবগত ছিলেন।” হীরেন্দ্রবাবু বলেন, “এই বিদ্যা বিশেষভাবে রাজর্ষিসম্প্রদায়ে প্রবাহিত ছিল বলিয়াই, বোধ হয়, ইহার নামকরণ হইয়াছিল রাজ-বিদ্যা।” আমরা হীরেন্দ্রবাবুর এই অনু-মান শ্রদ্ধেয় বলিয়া বিবেচনা করি। ব্রহ্ম-বিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগের মনের মধ্যে স্বভাবতই একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল, গীতা-পাঠে তাহা উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্মবিদ্যা যেমন স্থলবিশেষে কর্ম্মে অনাসক্তি আনয়ন করিয়াছিল, তেমনি ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তাহা কর্ম্মযোগে অভিব্যক্ত হইয়াছিল. গীতা ও মহাভারত পাঠে এইরূপ প্রতীতি হয়। ব্রহ্মবিদ্যা যে কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না. ভক্তিতে ও কর্ম্মে তাহার সফলতা, ব্রাহ্মণের উপনিষদে স্থানে স্থানে তাহার আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু গীতায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সর্ব্বা-ঙ্গীন ব্রহ্মবিদ্যাই বোধ করি রাজবিদ্যা।

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় “বায়ু-নভোবিদ্যা”-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পূর্ব্বে প্রদীপে লিখিয়া-ছিলেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কয়েকটি বিষয়ে তাহার প্রতিবাদ করেন—বর্ত্তমান সংখ্যায় জগদানন্দবাবু তাহার উত্তর দিয়াছেন। বাঙলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই—অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা

অসঙ্গত। ইংরাজি মিটিয়রলজির বাঙলা প্রতিশব্দ এখনো প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং জগদানন্দবাবু যদি আপ্তের সংস্কৃত অভিধানের দৃষ্টান্তে "বায়ুনভোবিদ্যা" ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন, তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। যোগেশবাবু 'আবহ'-শব্দ কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ ভূবায়ু। কিন্তু এই ভূবায়ু বলিতে প্রাচীনেরা কি বুঝিতেন, এবং তাহা আধুনিক অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার শব্দের প্রতিশব্দ কি না, তাহা বিশেষরূপ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে—এক কথায় ইহার মীমাংসা হয় না। অগ্রে সেই প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত যখন স্বর্গলোক হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছেন, তখন মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আমরা কোন্ বায়ুর অধিকারে আসিয়াছি ?" মাতলি উত্তর করিলেন, "গগনবর্ত্তিনী মন্দাকিনী যেখানে বহমানা, চক্রবিভক্তরশ্মি জ্যোতিষ্কলোক যেখানে বর্ত্তমান, বামনবেশধারী হরির দ্বিতীয় চরণপাতে পবিত্র এই স্থান ধূলিশূন্য প্রবহ-বায়ুর মার্গ।" দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে প্রবহ প্রভৃতি বায়ুর নাম তৎকালীন একটি কাল্পনিক বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে প্রচলিত ছিল—সেগুলি একটি বিশেষ শাস্ত্রের পারিভাষিক প্রয়োগ। দেবীপুরাণে দেখা যায়—

> প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্বহঃ সংবহস্তথা।
> বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ।
> অন্তরীক্ষে চ বাহ্যে তে পৃথঙ্‌মার্গবিচারিণঃ॥

এই সকল বায়ুর নাম কি আধুনিক মিটিয়রলজির পরিভাষার মধ্যে স্থান পাইতে পারে? বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ মত সংজ্ঞার দ্বারা তাহার পরিভাষাগুলির অ সীমাবদ্ধ—তাহাদিগকে নির্ব্বিচারে অন্য প্রয়োগ করা যায় না। অপর পক্ষে নভঃশ পারিভাষিক নহে—তাহার অর্থ আকা এবং সে আকাশ বিশেষরূপে মেঘের সহি সম্বন্ধযুক্ত ;—সেই জন্য নভঃ ও নভস্য শ শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস বুঝায়। কিন্তু ন শব্দের সহিত পুনশ্চ বায়ুশব্দ যোগ করি প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার ক আপ্তেও তাঁহার অভিধানে তাহা ক নাই ; তাঁহার আভিধানিক সঙ্কেত অনুস নভো-বায়ু-বিদ্যা বলিতে নভোবিদ্যা বা ব বিদ্যা বুঝাইতেছে। নভোবিদ্যা মিটিয় জির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইলে, স রণের সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ। শিক্ষার উন্ন ও তন্নিমিত্ত দান একটি সুলি প্রবন্ধ,—ইহাতে চিন্তা করিবার বিষয় অ আছে। বস্তুত লেখকমহাশয় দেখাইয়া শিক্ষাকার্য্য ব্যাপারটি বহুবিস্তৃত, তা শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই। য়ুরোপে অ কাল শিক্ষার অঙ্গ অত্যন্ত বাড়িয়া গে তাহার তুলনায় আমাদের দেশের বিদ্যা ও বিদ্যাশিক্ষাপ্রণালী কিছুই নহে। কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এ কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হই য়ুরোপীয় সভ্যতায় শিক্ষা, খেলা, আ জীবনযাত্রা, সমস্তই অত্যন্ত বিচিত্র এবং সাধ্য ও শ্রমসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এক তানপুরা কাঁধের উপর ফেলিয়া আমরা গাহি ;—য়ুরোপের ঘরজোড়া এক

যন্ত্রের মূল্যে আমাদের একটা
লোকের গানবাজনা চলিয়া যায়।
আমাদের সঙ্গীত বর্ব্বরসঙ্গীত নহে,
বৈচিত্র নিয়মে বদ্ধ, দুরূহ রহস্যে
উপকরণ সুলভ বলিয়া আসল ব্যাপারটা
হ। আজকাল য়ুরোপে নাট্যকলা
আয়োজন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের
করে যে, আমরা তাহা অনুমান
পারি না ;—কিন্তু অভিনয় যদি উত্তম
কথানি উৎকৃষ্ট হয়, তবে বহুমূল্য
ভূতিকে উপেক্ষা করিতে শেখা
য়ুরোপ আজকাল যে পরিমাণে
য ও অর্থব্যয় করে, তাহার ফললাভ
পরিমাণের নহে। আমাদের দেশে
আদর্শ চলিয়াছে, কিন্তু সেই আদর্শ
শক্তি নাই, ভিত্তি নাই। এখন,
চিন্তার বিষয় এই যে, কি করিলে
জীবনযাত্রা সরল ও তাহার উপকরণ
ইবে। আমাদের দেশে টোলে
য়রূপ প্রণালী ছিল, সেই সরল প্রণা-
আদর্শ করিয়া যদি শিক্ষাবিধানের
নিয়ম উদ্ভাবিত হয়, তবে তাহাতে
যথার্থ স্থায়ী উপকার হইবে।
র ধনীরা বিলাতের ধনীর ন্যায় নহে;
র ধন আমাদের পরিবার ও বংশের
ক; আমাদের ধনীরা সচ্ছল অবস্থায়
করিতে পারে, কিন্তু সম্পত্তি ত্যাগ
পারে না; কারণ, আমাদের সমাজের
অনুসারে সম্পত্তির উপরে গৃহস্থ
ধনীর ঠিক যেন স্বাধীনতা নাই। অতএব
য়ুরোপে যেমন অজস্র টাকা বিদ্যালয়ে
আকৃষ্ট হয়, আমাদের দেশে তেমন হইবার
জো নাই। আমাদের বিদ্যালয় আমাদের
দেশীয় প্রকৃতির অনুকূল করিয়া যদি প্রতি-
ষ্ঠিত হয়, তবে শিক্ষাকার্য্য দেশে ব্যাপ্ত হইতে
পারে, নতুবা গবর্মেণ্টের মুখের দিকে
তাকাইতে হয়, অথবা ব্যবসাদার বিদ্যা-
বণিকের হাতে গিয়া পড়িতে হয়—যত অল্প
শিক্ষায় যত অধিক পাস করানো যায়, ইহাই
বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। বিদ্যা-
বিস্তারের জন্য দেশের ধনীদের নিকট টাকা
চাওয়া হউক্, কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবিতে
হইবে, কি করিলে আমাদের দেশে শিক্ষা
উচ্চ অঙ্গের অথচ তাহার উপকরণ যথাসম্ভব
সুলভ হইতে পারে!

প্রসঙ্গত একটি কথার উল্লেখ করি।
লেখকমহাশয় ইংরাজি ফসিল্‌শব্দের বাংলা
করিয়াছেন,'প্রস্তরীভূত কঙ্কাল'। কিন্তু উদ্ভিদ-
পদার্থের ফসিল-সম্বন্ধে কঙ্কালশব্দের প্রয়োগ
কেমন করিয়া হইবে? 'পাতার কঙ্কাল'
ঠিক বাংলা হয় না। পূর্ব্বসংখ্যায় ফসিলের
প্রতিশব্দ শিলাবিকার হইতে পারে, এরূপ
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু
মহলানবিশ মহাশয়ের সহিত আলোচনা
করিয়া দেখিয়াছি, 'শিলাবিকার' metamorphosed rock-এর উপযুক্ত ভাষান্তর হয়,
এবং 'জীবশিলা'-শব্দ ফসিলের প্রতিশব্দরূপে
ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রাকৃত ও সংস্কৃত।

শ্রীনাথবাবু তাঁহার 'ভাষাতত্ত্ব'-সমালোচনার প্রতিবাদে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য হইতে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে, জনসাধারণে্য প্রচলিত ভাষা 'প্রাকৃত'-নামে অভিহিত হইত। মারাঠি ভাষায় এখনো 'প্রাকৃত'-শব্দের সেইরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

কিন্তু 'প্রাকৃত'-শব্দের এই প্রয়োগ আধুনিক বাঙলায় চলে নাই, চলা প্রার্থনীয় কি না, সন্দেহ।

পুরাকালে যখন গ্রন্থের ভাষা—পণ্ডিতদের ভাষা, সাধারণ-কথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল, তখন সংস্কৃত ও প্রাকৃত, এই দুই পৃথক্ নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন যাহা সংস্কৃত ছিল এবং তখন যাহা প্রাকৃত ছিল, তাহাই বিশেষরূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে বাচ্য।

এখনো বাঙলায় লিখিত-ভাষা, কথিত-ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ আকার ধারণ করিতেছে। আমরা যদি ধাতুগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণ-কথিত বাঙলাকে প্রাকৃত বলি, তাহা হইলে লিখিত গ্রন্থের বাঙলাকে সংস্কৃত বলিতে হয়। বস্তুত এখনকার কালের প্রাকৃত ও সংস্কৃত কিন্তু এরূপ হইলে বিপাকে হইবে।

কালিদাস প্রভৃতি কবিদের নাট প্রাকৃত ব্যবহার হইয়াছে, তাহা তাঁ সময়ের চলিত ভাষা নহে। চলিত প্রদেশভেদে ভিন্ন হয়, অথচ সা প্রাকৃত একই এবং সে প্রাকৃতে ব্যাকরণ। ইহা হইতে অনুমান অন্যায় হয় না যে, বিশেষ সময়ের ও দেশের চলিত ভাষা অভিধানে 'প্রাকৃ বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেছে; আ কালের প্রাকৃতকে 'প্রাকৃত' বলিতে কেঁচোকেও উদ্ভিদ্ বলা যাইতে পারে।

যদি প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ শব্দের পূর্ব্বে বিশেষণরূপে জুড়িয়া ব করা হয়, যদি লিখিত বাঙলাকে ' বাঙলা' ও কথিত বাঙলাকে 'প্রাকৃত ব বলা যায়, তাহা হইলে আমরা অ করিতে পারি না। কিন্তু সংস্কৃতভা প্রাকৃতভাষা অন্যরূপ। প্রাকৃ বাঙলা ভাষা নহে, বররুচি তাহার দিবেন।

সম্পাদক।

বঙ্গদর্শন।

(নবপর্য্যায়)

মাসিকপত্র।

সূচী।

নিবেদন।

১২৯০ সালের কার্ত্তিক মাসে বঙ্কিম বাবুর যত্নে সঞ্জীব বাবুর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন যখন আমি গ্রহণ করি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তখন ইহার সম্পাদন কার্য্যে প্রধান সহায় ছিলেন। ইহা সাধারণতঃ সকলের জানা নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে বঙ্গদর্শনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দিনে সে কথা স্বীকার করিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমি আমার প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি। বঙ্গদর্শন স্থায়ী হইলে তিনিই তখন প্রকাশ্যে সম্পাদকতা গ্রহণ করিতেন এবং সেজন্য বঙ্কিম বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতিও লইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালে আমি বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক-পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্যসংসারে একটী ঋণমুক্ত হইলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

৺ সঞ্জীব বাবুর একমাত্র পুত্র আমার প্রিয় সুহৃৎ বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্রকেও এই উপলক্ষে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি বঙ্গদর্শনের সেবায় সর্ব্বদা সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার পিতার সময় বঙ্গদর্শনের তিনি একজন প্রধান সহকারী ছিলেন।

এক্ষণে রাজকার্য্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি, পূর্ব্ববৎ স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। সেইজন্য অনুজ শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।

ডাল্টনগঞ্জ ; পালামৌ
১লা বৈশাখ।
সন ১৩০৮।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গদর্শন।

সূচনা।

১২৭৯ বঙ্গাব্দে, বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন-জলবুদ্‌বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে।" চারি বৎসর পরে, বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণকালে, লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্‌বুদ জলে মিশাইল।" এই নশ্বর জগতে জলবুদ্‌বুদের সহিত কাহার তুলনা না হয়? ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রের ত কথাই নাই, অতুলপ্রতাপান্বিত রোমসাম্রাজ্য, বিপুল-বৈভবশালী মোগলসাম্রাজ্য কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উদয় হইয়াছিল, বুদ্‌বুদের ন্যায় লীন হইয়াছে। কিন্তু জলবুদ্‌বুদ উঠে, মিশায়; আবার উঠে, আবার মিশায়, আবার উঠে। আবির্ভাব, তিরোভাব, পুনরায় আবির্ভাব, ইহাই বিশ্বের নিয়ম; বিনাশ কিছুরই নাই।

চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শন জলবুদ্‌বুদ জলে মিশাইল বলিয়া যে আর কখন পুনরুদিত হইবে না, এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নাই। সেই সময় বঙ্গদর্শনের প্রচার রহিত হওয়াতে যাঁহারা আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, অথবা যাঁহাদিগের আহ্লাদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—"তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না, এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বত বা অন্যত ইহা পুনর্জ্জীবিত করিব, ইচ্ছা রহিল।" ফলেও ঘটিয়াছিল তাহাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ সাহায্যে, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। পরে সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র, দুই ভাই, বঙ্গদর্শন শ্রীশবাবুকে দিয়া যান।*

---

* বঙ্গদর্শন-প্রচারের সংকল্প-সময়ে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই ইহার সম্পাদক হইবেন কথা ছিল। কিন্তু তিনি এক্ষণে সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় আমাদের সানুনয় অনুরোধে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই ভার গ্রহণ না করিলে, সে সংকল্প এত সত্বর কার্য্যে পরিণত হইত কি না, সন্দেহ। তাঁহাকে সম্পাদকরূপে পাইয়া আমরা অধিকতর উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

পঞ্চমবর্ষে বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রচার-সময়ে ভূমিকায় বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন- "বঙ্গদর্শনের লোপজন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। * * *

যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে, ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্বসম্পাদন করাই আমার উদ্দেশ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এ উদ্দেশ্য কি সফল হইবে না? বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন কি বাঙ্গালীর হইবে না?

গ্রন্থরচনায় ও সাময়িকপত্র-সম্পাদনে প্রভেদ আছে। গ্রন্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ফল। কিন্তু সাময়িকপত্র বহু লোকের সমবেত উদ্যমে জীবিত থাকে। ইংলণ্ডে বা ইউরোপে অনেক সংবাদপত্রের বয়ঃক্রম শতাধিক বর্ষ হইয়া গিয়াছে। টাইম্‌সপত্রের যে কখনও আয়ুক্ষয় হইবে, তাহা মনে হয় না। যতদিন ইংরাজজাতি থাকিবে, ততদিন ইংরাজের প্রধান সংবাদপত্র থাকিবে। এই দীর্ঘজীবনের মূলে পারম্পর্য্যের নিয়ম। রাজার অভাবে রাজকার্য্য যেরূপ স্থগিত বা রহিত হয় না, সেইরূপ প্রসিদ্ধ পত্রের প্রচার কখন বিলুপ্ত হয় না; কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে লেখক, পাঠক ও গ্রাহকের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এইমাত্র। কেবল কি এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ জাতীয় গৌরবের নিদর্শন এই পরম্পরা রক্ষা করিবে না?

এ কথা কেহ কেহ বলিবেন, এখন ত বঙ্গদর্শন একটা নামমাত্র। যিনি বঙ্গদর্শনের প্রাণ ছিলেন, তিনিই যখন বর্ত্তমান নাই, তখন কোন মাসিকপত্রের পক্ষে 'বঙ্গদর্শন' নামও যাহা, অন্য নামও তাহাই। কিন্তু আমরা নামকে নামমাত্র মনে করি না। যে নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই স্বর্গীয়-প্রতিভার একটি শক্তি রহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের ব্যবহারে লাগিবে, সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।

বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পাদক যিনিই হউন না কেন, 'বঙ্গদর্শন' নামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। বঙ্গদর্শনের যে সকল প্রাচীন মহারথী এখনও ইহলোকে আছেন, তাঁহারা এই নামের পতাকা উড্ডীন দেখিলে, ইহার তলে সমবেত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এবং যে সকল আধুনিক লেখক বঙ্গদর্শনের গৌরবকালের ইতিহাস শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, বঙ্গদর্শনের নামে তাঁহারা নিজের রচনার আদর্শকে যথাসাধ্য চেষ্টায় উন্নত রাখিবার প্রয়াস পাইবেন।

পাঠকের দাবী যত কঠিন হয়, সম্পাদকের চেষ্টাও তত একান্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদর্শনের নামে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককেও সর্ব্বদা সচেষ্ট সচেতন থাকিতে

হইবে। সম্পাদক এ কথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন—সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।

অধুনা বঙ্গদেশে যে কেহ সুলেখক আছেন, বঙ্গদর্শন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ঐতিহাসিক সূত্রে বঙ্কিমের কালের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে, ইহা বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালী লেখকদিগের পক্ষে প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কালের সহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে, ভাবের পথ ততই সুদূরবিস্তৃত এবং সাহিত্যের আদর্শ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন যদি কেবল বঙ্কিমের কালের মধ্যেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, জীবিতকালের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তবে স্বভাবের নিয়মে তাহা কালক্রমে ধূলিসমাচ্ছন্ন ইতিহাসের বিবরমধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া আমাদের নিত্যব্যবহারের অতীত হইয়া যাইবে। মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তি এক কালকে অন্য কালের সহিত বাঁধিবার জন্য যোগসূত্রের কাজ করে। যাঁহারা জাতিগত মাহাত্ম্যের প্রার্থী, তাঁহারা সেইরূপ কোন যোগসূত্রকেই নষ্ট হইতে দিতে চাহেন না। তাঁহারা অতীতকে ভবিষ্যতের সহিত আবদ্ধ করিয়া জাতীয় জীবনের লীলাভূমিকে সুবিস্তীর্ণ করিবার জন্য সকলপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করেন। বঙ্গদর্শনকে বহন করিয়া চলা-ও, বঙ্গসাহিত্যকে অপরিচ্ছিন্ন ও প্রশস্ত রাখিবার একটি উপায়। এই সূত্রযোগে বঙ্গসাহিত্যের যদি একটি মালা গাঁথা যায়, তবে তাহা ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইবে না, বঙ্গলক্ষ্মীর কণ্ঠে চিরভূষণ হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবে।

অবশ্য এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এক কালের সহিত অন্যকালের প্রভেদ অনিবার্য্য। যদিও দীর্ঘকালের ব্যবধান নহে, তথাপি প্রথম বঙ্গদর্শনের কালের সহিত বর্ত্তমান কালের অনেক প্রভেদ হইয়াছে। সে প্রভেদ উন্নতির দিকে কি অবনতির দিকে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; কিন্তু সে প্রভেদ যে ব্যাপকতার দিকে, তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তখন ইংরাজিরচনার দুরাকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবল ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালী লেখক এবং পাঠক অল্পই ছিল। সেই সঙ্কীর্ণ খাতের মধ্যে বঙ্কিম আপন প্রবল-প্রতিভা প্রবাহিত করিয়া সাহিত্যের স্রোতঃপথকে গভীর ও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখনকার সেই নির্ঝর-ধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; তিনিই তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিক্‌ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাটীর মধ্যে সর্ব্বত্রই যেন তিনি দৃশ্যমান ও বহমান ছিলেন।

সঙ্কীর্ণধারার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাবের বেগ ও সৌন্দর্য্য সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়। আধুনিক সাহিত্যে আমরা প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপভোগ করিবার প্রত্যাশা আর করিতে পারিব না। এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা গণিয়া উঠা কঠিন। এখন রচনা বিচিত্র, রুচি বিচিত্র। এখন লেখক-পাঠকের মধ্যে নানাপ্রকার

৫

ওরে মৌন মূক, কেন আছিস নীরবে
অন্তর করিয়া রুদ্ধ ? এ মুখর ভবে
তোর কোন কথা নাই, রে আনন্দহীন ?
কোন সত্য পড়ে নাই চোখে ? ওরে দীন,
কণ্ঠে নাই কোন সঙ্গীতের নব তান ?
তোর গৃহপ্রান্ত চুম্বি' সমুদ্র মহান্
গাহিছে অনন্ত-গাথা পশ্চিমে পূরবে,
কত নদী নিরবধি ধায় কলরবে
তরল-সঙ্গীতধারা হয়ে মূর্ত্তিমতী !
শুধু তুমি দেখ নাই সে প্রত্যক্ষ জ্যোতি
[illegible] সত্যে, যাহা গীতে, আনন্দে, আশায়,
ফুটে উঠে নব নব বিচিত্র-ভাষায় !
তব সত্য তব গান রুদ্ধ হয়ে রাজে
রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে শুষ্কপত্রমাঝে !

৬

শক্তি-দম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন !
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময়-পল্লী যত করে ছারখার !
শুচি শান্ত, সরলতা-জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নিগ্ধ স্নেহে রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল এই ভারতের তপোবনতলে
বস্তুভারহীন মন ; সর্ব্ব জলেস্থলে
পরিব্যাপ্ত করি' দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্ব্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে ! আজি তাহা নাশি',
চিত্ত যেথা ছিল,—সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল,—সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল,—সেথা স্বার্থের সমর।

৭

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসি,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক্‌বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন !
শুনো না কি বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের পরে
অদৃশ্য মুকুট তব ! দেখিতে যা' বড়,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায় ! স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি' চিত !

৮

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার !
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে !
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে-সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে !

৯

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মত, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য যত! আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্র-রুধির-পুষ্ট বিলাস-লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জ্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্ব্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্দ্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ!
কে রাখিবে ভরি' নিজ অন্তর-আগার,
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার!

১০

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত; তাই সর্ব্ব গায়ে
ক্ষুধার্ত্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন;
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর; নাহি ধ্যানবল
শুধু জপমাত্র আছে; শুচিত্ব কেবল,
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার;
সন্তোষের অন্তরেতে বীর্য্য নাহি আর;
কেবল জড়ত্বপুঞ্জ,—ধর্ম্ম প্রাণহীন
ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন!
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য! বৃথা চেষ্টা, ভাই,
সব সজ্জা লজ্জাভরা, চিত্ত যেথা নাই!

১১

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি;
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ-চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত!

১২

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে! প্রত্যেকের পরে
দিয়েছ শাসনভার, ওগো রাজরাজ!
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ,
প্রণমি' তোমারে যেন শিরোধার্য্য করি
সবিনয়ে! তব কার্য্যে কারে নাহি ডরি
কোন দিন! ক্ষমা যেথা ক্ষীণ-দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে! যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজস্থান!
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে!

হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা।

"হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনতরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্ব চরাচরে,
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য! সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি! যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয় সরলপ্রাণ বন্ধনবিহীন,
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্য্যজ্যোতিষ্মান
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্ব্বত পাষাণ
তাঁরা এক মহান্ বিপুল সত্যপথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে,
কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ!"

করতলচট্‌চটাধ্বনি-মুখরিত সভাগৃহে হিন্দুজাতির মহিমা, সময়ে অসময়ে, পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। চাটুবাদলোলুপ বাগ্মিগণ "আমরা হিন্দু", "আমরা আর্য্য", "আমরা শ্রেষ্ঠ" এবঞ্জাতীয়ক গৌরববচনমধু শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আর্য্যদিগের গৌরব কোন্ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোন্ মন্ত্রে পরিরক্ষিত, তাহা হইলে কেবল একটা বাঙ্‌নিষ্পত্তিবিহীন মস্তককণ্ডূয়নসূচনা দৃষ্ট হয় মাত্র।

কোন বিষয় বলিতে গেলে, দুই প্রকারে বলা যায়। "নেতি" "নেতি", ইহা নয়, উহা নয়, তাহা নয়, ইহাকে বলে বস্তুর নঞ্‌সংজ্ঞক পরিচয়। আবার বস্তুটি এইরূপ, ওইরূপ, ইহাকে বলে স্বরূপপরিচয়।

হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহাই অগ্রে বলা যাউক। হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন ধর্ম্মমতের অপেক্ষা করে না। সাংখ্যদর্শন বেদান্তের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তত্রাচ সাংখ্য-প্রণেতা একজন পূজনীয় হিন্দু ঋষি। বৈষ্ণব-চূড়ামণি রামানুজ বেদান্তের অদ্বৈতবাদী আচার্য্যদিগকে মায়াবাদী ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বা নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখনও দাক্ষিণাত্যে কোন বৈষ্ণব শিবমন্দিরের ছায়াস্পর্শ এবং শৈবদিগের সহিত আহারাদি করেন না। মাধ্বাচার্য্য

আবার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া দ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চ-মকারসাধক ছাগমহিষহননকারী শাক্তের সহিত নিরামিষাশী জৈনের এত প্রভেদ যে বর্ণনায় কুলাইয়া উঠে না। কিন্তু শৈবও হিন্দু, শাক্তও হিন্দু, বৈষ্ণবও হিন্দু এবং জৈনকেও ফেলিয়া দেওয়া যায় না। যদি মতামত লইয়া হিন্দুত্ব গঠিত হইত তাহা হইলে হিন্দুসংজ্ঞা অনেকদিন লুপ্ত হইয়া যাইত।

হিন্দুর হিন্দুত্ব আহারপান বিচারের উপরেও নির্ভর করে না। এক মহামাংস ভক্ষণ ব্যতীত খাদ্যাখাদ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। শিখেরা শূকর মাংস ভক্ষণ করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা ও পাঞ্জাবের অধি-বাসীরা কুক্কুটমাংস ভোজন করে। শিখেরা তাম্রকূট সেবন করে না কিন্তু মদিরা পান করে। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা মৎস্যাশী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলকে পতিত ও ভ্রষ্ট মনে করে। এমন কি পুরাতন সংহিতাকারগণ মহামাংস ভোজনেরও বিধি দিয়াছিলেন। এখন কাহাকে হিন্দু বলিব এবং কাহাকে হিন্দুত্ব হইতে অপসারিত করিব? মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে বা শিখদিগকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দু-জাতি যে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যদি হিন্দুত্ব ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিধি-সাম্যের উপর নির্ভর না করে তবে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা কোথায়? কোন্ আলম্বে হিন্দুর জাতীয়তা আলম্বিত আছে।

হিন্দুত্বের ভিত্তি, হিন্দুত্বের সার, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা। এই প্রবন্ধে হিন্দুর একনিষ্ঠতা সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু কিরূপে সেই একমুখীন আর্য্যবুদ্ধি বর্ণাশ্রমবিভাগে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিকে ঘোরবিপ্লবসমূহ হইতে বার বার রক্ষা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে তাহা যথাসময়ে পর্য্যালোচিত হইবে।

দর্শনশাস্ত্রে বলে মানুষ নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে চিন্তা করে। সেই সকল অপরি-বর্ত্তনীয় বিধি অতিক্রম করিলেই ভ্রম প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচ্যই হউক আর প্রতীচ্যই হউক দর্শনচিন্তাবিধি একই। এই নির্দ্ধারণ একান্ত শিরোধার্য্য। তথাপি হিন্দুচিন্তা-প্রণালীর বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উপরে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে বিধিগত পার্থক্য নাই বটে কিন্তু প্রণালীগত ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

দুইটি পক্ষী এক নীড়ে বাস করিত। একটি পক্ষপুট বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধে অনন্তের দিকে উঠিল। মেঘাকাশ ছাড়াইয়া গ্রহতারক-মণ্ডিত নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া ছায়াপথে পঁহুছিল। এই দিগ্বিহীন শূন্যে আনন্দের গভীরতায় ডুবিয়া বলিল, অনন্তপরমব্যোমে ভূমানন্দ, অসঙ্গানন্দ প্রতিষ্ঠিত। আর একটি পক্ষী উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দিগ্-দিগন্তর পরিক্রম করিল, অনন্তের আবাস অনুসন্ধানে। কত সৌন্দর্য্য, কত সম্বন্ধ, কত কার্য্যকারণঘটিত সুষমা দেখিল। প্রকৃতির মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্থির করিল—অনন্তের অখণ্ডত্ব সমন্বয়ে, সংশ্লেষে, সঙ্গমে নিহিত আছে। প্রথমটি আর্য্যঋষি, দ্বিতীয়টি যুনানী বা গ্রীক দ্রষ্টা।

দুইটি মৎস্য জলধির স্বরূপনির্ণয়োদ্দেশে

তীর্থ যাত্রা করিল। একটি ডুবিল, গভীরতা হইতে গভীরতায় প্রবেশ করিল। শেষে অতল-তলদেশে আগত এবং তুষ্ণীম্ভূত। অপরটি পারদৃশ্বজ্ঞানলাভ বাসনায় ক্রম-বন্ধন করিল। প্রখরস্রোতপ্রতিরোধী বলের সহিত উত্তালতরঙ্গাঘাতকে তুচ্ছ করিয়া সন্তরণ করিতে করিতে অকূল পাথারে হারাইয়া গেল। হতবুদ্ধি হইয়া অনন্তের বিস্তারহীন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। প্রথমটি প্রাচ্য হিন্দু, দ্বিতীয়টি প্রতীচ্য জর্ম্মণ।

কোন একটি বস্তুর অবলম্বনে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা হিন্দুর বিশেষত্ব। আর একের সহিত অপরের সম্বন্ধ জানা এবং সম্বন্ধের ভিতর দিয়া একতা দর্শন করা য়ুরোপীয় দর্শনের বিশেষত্ব। প্রথমের লক্ষণ একনিষ্ঠতা বা অন্তর্দ্ধান, দ্বিতীয়ের বহুনিষ্ঠতা বা সমাধান। হিন্দু, সূর্য্যের স্বর্ণ-কবাট উদ্ঘাটন করিয়া সূর্য্যের সারভূত নিষ্কল বিরজ হিরণ্ময় পুরুষকে দেখেন। আর য়ুরোপীয়েরা সূর্য্যের সহিত গ্রহের উপগ্রহের সম্বন্ধ দর্শন করিয়া বহুত্বনিহিত সুষমা অবলোকন করেন।

অনেকে হিন্দুচিন্তার সহিত হিন্দুধর্ম্মমত সমূহ মিশাইয়া ফেলেন। তদ্রূপ য়ুরোপীয় চিন্তা বলিতে য়ুরোপে প্রচলিত ধর্ম্মমত বোঝেন। এইরূপ অন্যান্যধর্ম্মারোপ ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। য়ুরোপীয় চিন্তাপ্রণালীর প্রভবস্থান পুরাতন গ্রীকদেশ। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, চিন্তাপ্রণালী ধর্ম্মমত হইতে পৃথক্। হিন্দুস্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে;—বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং—কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় যে একই চিন্তাস্রোত, সকল বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিকক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সেই একনিষ্ঠচিন্তার গতি নির্দ্ধারণ করা যাউক।

বৈদিক কালে যখন যজ্ঞশালায় কালী-করালীমনোজবাপ্রভৃতি সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রজ্জলিত হুতাশন আহুত ভোজন করিত তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশের মধ্যস্থিত জাতবেদা পুরোধা অগ্নিদেবকে "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ঋষিরা পূজা করিতেন। যখন মহাবিক্রম-শালী প্রভঞ্জন ধরিত্রীকে আলোড়িত করিত তখন পবনদেবকে "শংনো বায়ু" বায়ু আমাদের মঙ্গল করুন—এবম্প্রকারে স্তুতি করিতেন। গভীরনির্ঘোষী ওজস্বান্ সিন্ধুনদের বীচি-বিক্ষোভে বরুণদেবের ক্রীড়া দেখিতেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন বালক যেরূপ চলনশীল জড়বস্তুতে জীবন আরোপ করে সেইরূপ ঋষিরা জড়শক্তি ও চৈতন্যের ভেদ বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চভূতকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। এই সিদ্ধান্ত সমীচান নহে। আর্য্য ঋষিদের আধ্যাত্মিক দর্শনে একনিষ্ঠতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা কার্য্যকারণপরম্পরার সুদীর্ঘ সূত্র ধরিয়া আদিকারণে উপনীত হইতেন না। কোন শক্তিশালী বা জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিলে সেই প্রকাশের অন্তরে প্রকাশ

কর্ত্তাকে দেখিতে পাইতেন। ঘোরকৃষ্ণজলদজালের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে যদি বলা যায় যে তপনতপ্ত-জলকণার সম্বায়ে এই পয়োবাহের জন্ম হইয়াছে তাহা-হইলে মীমাংসার কোন ব্যবস্থা হয় না। প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যাহা ছিল না তাহা কি রূপে হইল। মেঘ ছিলনা মেঘ হইয়াছে, মেঘের উৎপাদক পূর্ব্ববর্ত্তী জড়প্রক্রিয়া ছিল না হইয়াছিল; এইরূপে যতই আমরা পশ্চাত্তাপে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যাই না কেন অসতের হাত হইতে এড়াইতে পারিবনা। যদি কোটি যোজন ভ্রমণ করি বা কোটি যুগকে অতিক্রম করি তথাপি নাস্তির রাজ্য অনুল্লঙ্ঘনীয়। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে আমি ছিলাম না হইয়াছি, আমি আদিতে অসৎ অন্তেতে অসৎ কেবল মধ্যেতে সদ্রূপে প্রতিভাত। কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল অবলম্বন্ করিয়া চলিলে এক মহতী অব্যবস্থার মধ্যে হারাইয়া যাইতে হয়। অন্ধকে চলিতে দেখিলে চক্ষুষ্মান্ চালকের অনুসন্ধান করিতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অন্ধের সমষ্টিতে চক্ষুষ্মতার উৎপত্তি হয় না। অসৎ, জঙ্গম, অস্থাবর, নামরূপ-সমন্বিত প্রপঞ্চের অন্তরেই সৎ, স্থির, স্থাবর, অনাম, অরূপ সারতত্ব বাস করে। ঋষিরা ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের অপেক্ষা না করিয়া দৃশ্য বস্তুর গর্ভে একবারেই অদৃশ্য হিরণ্যগর্ভকে দেখিতেন। এই দৃষ্টিকে একনিষ্ঠতা বলে। আর্য্য একনিষ্ঠতায় আর একটি গভীরতর লক্ষণ আছে।

অগ্নির দেবতা অগ্নিনামে কেন অভিহিত হইল? বায়ু বরুণ তপনাদিদেবতা কর্ত্তা হইয়াও কার্য্যের নামে সংজ্ঞিত কেন হইল? কার্য্যেরও যে নাম কর্ত্তারও সেই নাম। এই সমনামতা দেখিয়া অনেকে মনে করেন আর্য্যঋষিরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতিপূজক ছিলেন না, প্রকৃতি ও পুরুষের অভিন্নতার দ্রষ্টা ছিলেন। তজ্জন্যই তাহাদিগকে ঋষি (দৃশি) বলা হইত। কর্ত্তা কোন অপূর্ব্ব মায়াশক্তি বলে কার্য্যরূপে প্রতিভাত হয়, কার্য্যকারণে ব্যবহারতঃ ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ তাহারা অভিন্ন—এই অভেদতত্ব সমগ্র বেদ গাথায় গীত হইয়াছে। কর্ত্তা এবং কার্য্যের অভেদভাব, বিম্বরূপী স্রষ্টার প্রতিবিম্বরূপী সৃষ্টিতে প্রতিভাতি, অদ্বিতীয়ের মায়িক বহুত্ব, বৈদিক ঋষিদিগের একমুখীন অন্তর্দৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই একনিষ্ঠ দর্শন ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সাংখ্য দর্শনে দেখা যায় যে সমস্ত ভূততত্ব এক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হিন্দু চিন্তা অগ্রসর হইতে হইতে এই প্রকৃতিবাদের একত্বে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ঋষিরা যে অভেদ দেখিয়াছিলেন তাহা সাংখ্যে পূর্ণতা লাভ করে নাই। সাংখ্যের একত্ব দ্বৈতান্ধকারাবৃত। প্রকৃতি এক পুরুষাতিরিক্ত বস্তু, আপনাতে আপনি অবস্থিত, অস্তিত্বের জন্য সদ্রূপী পুরুষের অপেক্ষা করে না। সমগ্রভূতপ্রপঞ্চকে সত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতিতে একীভূত করা একনিষ্ঠার ফল বটে, কিন্তু দ্বৈতাপত্তি ইহাতে মেটে না। পুরুষ ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, এই বহুত্ব হিন্দুজাতিকে সন্তুষ্ট

করিতে পারে নাই। আজ হিন্দুস্থানে সাংখ্য-দর্শনের সম্মান আছে বটে কিন্তু সাংখ্যমতের পোষক একবারেই নাই বলিলে হয়।

প্রকৃতিবাদের একত্ব অপেক্ষা বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের একত্ব গভীরতর। ব্রহ্ম একমাত্র জগতের কারণ। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মের একতার মধ্যেই অনেকতা নিহিত। যেমন বৃক্ষ এক, কিন্তু মূল ও শাখা প্রভেদে বহু, সমুদ্র এক, কিন্তু লহরীলীলাবহুত্বময়, মৃত্তিকা এক, কিন্তু ঘট শরাবদৃষ্টে বহু, সেইরূপ ব্রহ্ম এক, অথচ বহু। রামানুজের এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যের একত্ব হইতে উচ্চতর সন্দেহ নাই, তথাপি আর্য্য একনিষ্ঠার উচ্চতম বিকাশ নহে। ব্রহ্মের স্বরূপে যদি বহুত্ব অন্তর্নিহিত থাকে তাহা হইলে একত্বের কেবলতা বা শুদ্ধতা থাকে না। ব্রহ্মের সত্বায় যদি বহুতার অপেক্ষা থাকে, অনেকতার আকাঙ্ক্ষা থাকে, সম্বন্ধের প্রয়োজন থাকে; যদি ভূমানন্দে কামনা থাকে, তবে সেই অপেক্ষার সিদ্ধি, আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, কামনার পরিতৃপ্তি কে করিবে? আবার যদি বহুত্বের বীজ পূর্ণব্রহ্মে পারমার্থিকভাবে নিহিত থাকে তাহা হইলে সেই বীজের ক্রমবিকাশ হইলে সদ্বস্তুর পরি-ণাম স্বীকার করিতে হয়। পরিণামী ব্রহ্ম ইহা এক অসঙ্গত কথা। ব্রহ্ম যদি পরি-ণামী হন, তাহা হইলে সেই পরিণামের কারণ কোথায়? ব্রহ্মের বাহিরে ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মই আপনার পরিণামের আপনি কারণ। কিন্তু কারণের যোজনা হইলে ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে ব্রহ্মপরিণাম যতদূর হইবার সম্ভাবনা ততদূরই হওয়া ন্যায্য। ক্রমান্বয়ের স্থান থাকিতে পারে না। অধিকন্তু পরিণামের চূড়ান্ততাই পূর্ণতা বা অপরিণামিতা। তবেই সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রহ্ম যদি নিজের স্থিতির নিজে কারণ হন তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বহুত্বপরিণামের সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈতে একনিষ্ঠতা আছে কিন্তু ঋষিপ্রণোদিত হিন্দুর একমুখীন বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। হিন্দুস্থানে শতকরা দশজন ও বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী দুষ্প্রাপ্য।

শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে হিন্দুর এক-নিষ্ঠতার চরমতৃপ্তি হইয়াছে। বস্তু এক ভিন্ন পরমার্থতঃ দুই হইতে পারে না। এবং সেই বস্তুর মধ্যে বহুত্বের বীজ অসম্ভব। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, অখণ্ড, অপরিণামী, আপ্ত-কাম, সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ আত্মরত, অসঙ্গ, শুদ্ধ, কৈবল্যময়। তিনি জগতের কারণ বটেন কিন্তু সেই কারণবীজ তাঁহার সত্বাতে পাওয়া যায় না। তাঁহার জগৎকারণত্ব বা স্রষ্টৃত্ব স্বরূপগত নহে। তাঁহার স্বরূপ কেবল সচ্চিদানন্দময়। তিনি চিদ্বিহীন হইলে অস্তিত্ববিহীন হইয়া যান, কারণ চিৎ এবং অস্তিত্বে কোন ভেদ নাই। কিন্তু তাঁহার স্রষ্টৃত্ব বা কারণত্ব একটা বাহুল্য বা ঐশ্বর্য্য মাত্র, তাঁহার স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্রষ্টৃত্বকে অপসারিত করিলে তাঁহার সত্বার উপচয় বা অপচয় হয় না। বাস্তবিকই বেদান্ত একত্বের উচ্চতম আকাশে আরোহণ করিয়াছে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, যত-দিন ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব জ্ঞানদৃষ্টিতে অপগত না হয়, ততদিন মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই জগৎ মায়াময়, অনৃত, অলীক, সদ্রূপে প্রতিবিম্বিত মাত্র। ইহার অস্তিত্বের ভিত্তি

কোথাও দেখা যায় না। বিবর্ত্তনশীল ভূতগ্রাম নিজেতে ত অবস্থিত নহেই আর ব্রহ্মসত্বা মধ্যেও ইহার অবস্থিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ইহা গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় এক অঘটঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। সেই মায়াশক্তি ব্রহ্মেতে অবস্থিত কিন্তু স্বরূপতঃ নহে। বাহুল্যভাবে ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া আছে। একই বহু হইয়াছে কিন্তু কেবল ব্যবহারতঃ। একের পরিবর্ত্তন হয় না, পরিণাম হয় না, অথচ বহুরূপে প্রতিভাতি হয়। ঋষিরা যে অগ্নিদেবতাকে অগ্নি বলিতেন, কার্য্যের নামে কারণকে অভিহিত করিতেন, সেই একত্বের পরাকাষ্ঠা বৈদান্তিক মায়াবাদেই দৃষ্ট হয়।

একনিষ্ঠচিন্তাপ্রবণতা, বস্তুর বস্তুত্ব দর্শন, কর্ত্তা এবং কার্য্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি, বহুত্বের মায়িকতা জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে পরিণতি। এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছিল। ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে একীভূত করা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য। যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠচিন্তাশীলতার হ্রাস হইতে লাগিল, যে দিন হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন। আজ কোথায় সেই একনিষ্ঠতা! পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আর্য্যসন্তানেরা বহুনিষ্ঠ ও বর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ঋষিদিগের অভেদদৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম্ম পুনরাবিভূর্ত না হয় ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব। অনুকরণে যতদূর উৎকর্ষ হইতে পারে, হইবে, কিন্তু অস্থিমজ্জাগত উন্নতি হইবে না।

একনিষ্ঠার অভ্যুদয়-চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা যেন য়ুরোপীয় বহুনিষ্ঠার বিরোধী না হই। এই বহুনিষ্ঠা আমাদের জাতীয়তাকে পোষণ করিবে। যেমন আমাদের দেশে বৃক্ষ সকল য়ুরোপীয় বিজ্ঞানপ্রভাবে পরমশ্রীসম্পন্ন হয়, সেইরূপ আমাদের চিন্তাপ্রণালী প্রতীচ্য চিন্তার সংস্পর্শে বলীয়সী হইবে। কিন্তু ভূমি ছাড়িলে জীবন ও তেজ শুষ্ক হইয়া যাইবে। অশ্বত্থকে ইংলণ্ডে রোপণ করিলে বিজ্ঞানের সহায়তা তাহার কোন কাজে আসে না। হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং য়ুরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর,একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহাদের ইহপরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, অপ্রতিষ্ঠ হইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিও। তবেই হিন্দুর হিন্দুত্ব পরিরক্ষিত হইবে, সংবর্দ্ধিত হইবে, এবং সুফলসম্পন্ন হইবে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

চোখের বালি।

১

বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রর মাতা রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল। দুই জনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন—বাবা মহীন, গরীবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড় সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে—তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।

মহেন্দ্র কহিলেন, মা, আজকালকার ছেলেত আমি ছাড়াও আরো ঢের আছে।

রাজলক্ষ্মী। মহীন্, ঐ'তোর দোষ, তোর কাছে বিয়ের কথাটি পাড়িবার যো নাই।

মহেন্দ্র। মা ওকথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না! অতএব ওটা মারাত্মক দোষ নয়।

মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। মা সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মত ছিল না। বয়স প্রায় বাইশ হইল, এম্, এ, পাশ করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; তবু মাকে লইয়া তাহার প্রতিদিন মান অভিমান আদর আব্দারের অন্ত ছিল না। কাঙারু-শাবকের মত মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মার সাহায্য ব্যতীত তাহার আহার বিহার আরাম বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার যো ছিল না।

এবারে মা যখন বিনোদিনীর জন্য তাহাকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িলেন তখন মহেন্দ্র বলিলেন, আচ্ছা, কন্যা একবার দেখিয়া আসি।

দেখিতে যাইবার দিন বলিল, দেখিয়া আর কি হইবে? তোমাকে খুসি করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি, ভালমন্দ বিচার করা মিথ্যা।

কথাটার মধ্যে একটু রাগের উত্তাপ ছিল কিন্তু মা ভাবিলেন শুভ দৃষ্টির সময় তাঁহার পছন্দর সহিত যখন পুত্রের পছন্দর নিশ্চয় মিল হইবে, তখন মহেন্দ্রের কড়ি সুর কোমল হইয়া আসিবে।

রাজলক্ষ্মী নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আসিতে লাগিল মহেন্দ্রের মন ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল—অবশেষে দুই চা'র দিন আগে সে সে বলিয়া বসিল, না, মা, আমি কিছুতেই পারিব না।

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র, দেবতা ও মানবের কাছে সর্ব্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে, এই জন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অনুরোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহ প্রস্তাবের প্রতি তাহার অকারণ

বিতৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আসন্নকালে সে একেবারেই বিমুখ হইয়া বসিল।

মহেন্দ্রের পরম বন্ধু ছিল বিহারী; সে মহেন্দ্রকে দাদা এবং মহেন্দ্রের মাকে মা বলিত। মা তাহাকে, ষ্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মত মহেন্দ্রের একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে বলিলেন, বাবা, একাজ ত তোমাকেই করিতে হয়, নহিলে গরীবের মেয়ে—

বিহারী যোড়হাত করিয়া কহিল—মা ঐটে পারিব না। যে মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভাল লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয় সে মেঠাই তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি অনেক খাইয়াছি কিন্তু কন্যার বেলায় সেটা সহিবে না।

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, বিহারী আবার বিয়ে করিবে! ও কেবল মহীনকে লইয়াই আছে, বৌ আনিবার কথা মনেও স্থান দেয় না।—এই ভাবিয়া বিহারীর প্রতি তাঁহার কৃপামিশ্রিত মমতা আর একটুখানি বাড়িল।

বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারী মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়া শুনা ও কারুকার্য্য শিখাইয়াছিল। কন্যার বিবাহ বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল তবু তাহার হুঁস ছিল না। অবশেষে তাহার মৃত্যুর পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। টাকা কড়িও নাই, কন্যার বয়সও অধিক।

তখন রাজলক্ষ্মী তাঁহার জন্মভূমি বারাশতের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত উক্ত কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

অনতিকাল পরে কন্যা বিধবা হইল। মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে ত এক দণ্ডও টিকিতে পারিতাম না!

বছর তিনেক পরে আর একদিন মাতাপুত্রে কথা হইতেছিল।

"বাবা, লোকে যে আমাকেই নিন্দা করে!"

"কেন মা লোকের তুমি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ?"

"পাছে বৌ আসিলে ছেলে পর হইয়া যায় এই ভয়ে তোর বিবাহ দিতেছি না, লোকে এইরূপ বলাবলি করে।"

মহেন্দ্র কহিল,—ভয় ত হওয়াই উচিত। আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না। লোকের নিন্দা মাথায় পাতিয়া লইতাম!

মা হাসিয়া কহিলেন,—শোন, একবার ছেলের কথা শোন!

মহেন্দ্র কহিল,—বৌ আসিয়া ত ছেলেকে জুড়িয়া বসেই। তখন এত কষ্টের এত স্নেহের মা কোথায় সরিয়া যায় এ যদিবা তোমার ভাল লাগে আমার লাগে না!

রাজলক্ষ্মী মনে মনে পুলকিত হইয়া তাঁহার সদ্য সমাগতা বিধবা যা'কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—শোন ভাই মেজ বৌ, মহীন্ কি বলে শোন! বৌ পাছে মাকে ছাড়াইয়া উঠে এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না। এমন সৃষ্টি ছাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ?

কাকী কহিলেন,—এ তোমার বাছা বাড়াবাড়ি! যখনকার যা, তখন তাই শোভা পায়। এখন মার আঁচল ছাড়িয়া বৌ লইয়া ঘর করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ছোট ছেলেটির মত ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়!

এ কথা রাজলক্ষ্মীর ঠিক্ মধুর লাগিল না এবং তিনি যে ক'টি কথা বলিলেন, তাহা সরল হইতে পারে, কিন্তু মধুমাখা নহে। কহিলেন—আমার ছেলে যদি অন্যের ছেলেদের চেয়ে মাকে বেশী ভালবাসে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন মেজ বৌ? ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম্ম বুঝিতে!

রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন, পুত্র-সৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষ্যা করিতেছে।

মেজ বৌ কহিলেন,—তুমিই বৌ আনিবার কথা পাড়িলে বলিয়া কথাটা উঠিল,—নহিলে আমার অধিকার কি?

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—আমার ছেলে যদি বৌ না আনে তোমার বুকে তাহাতে শেল বেঁধে কেন? বেশত এতদিন যদি ছেলেকে মানুষ করিয়া আসিতে পারি এখনো উহাকে দেখিতে শুনিতে পারিব আর কাহারো দরকার হইবে না।

মেজ বৌ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র মনে মনে আঘাত পাইলেন এবং কালেজ হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াই তাঁহার কাকীর ঘরে উপস্থিত হইলেন।

কাকী তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে স্নেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ইহা সে নিশ্চয় জানিত। এবং ইহাও তাহার জানা ছিল, কাকীর একটি পিতৃমাতৃহীনা বোন্‌ঝি আছে—এবং মহেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সন্তানহীনা বিধবা কোন সূত্রে আপনার ভগিনীর মেয়েটিকে কাছে আনিয়া সুখী দেখিতে চান। যদিচ বিবাহে সে নারাজ, তবু কাকীর এই মনোগত ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত করুণাবহ বলিয়া মনে হইত।

মহেন্দ্র তাঁহার ঘরে যখন গেল তখন বেলা আর বড় বাকী নাই। কাকী অন্নপূর্ণা তাঁহার ঘরের কাটা জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া শুষ্ক বিমর্ষমুখে বসিয়াছিলেন। পাশের ঘরে ভাত ঢাকা পড়িয়া আছে এখনো স্পর্শ করেন নাই।

অল্প কারণেই মহেন্দ্রের চোখে জল আসিত। কাকীকে দেখিয়া তাহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল,—কাকীমা!

অন্নপূর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, আর মহীন্, বোস্!

মহেন্দ্র কহিল—ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে প্রসাদ খাইতে চাই!

অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের কৌশল বুঝিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু কষ্টে সম্বরণ করিলেন এবং নিজে খাইয়া মহেন্দ্রকে খাওয়াইলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয় তখন করুণায় আর্দ্র ছিল। কাকীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আহারান্তে হঠাৎ মনের ঝোঁকে বলিয়া বসিল—কাকী, তোমার সেই যে বোন্‌ঝির কথা বলিয়াছিলে তাহাকে একবার দেখাইবে না?

কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে ভীত হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিলেন—তোর আবার বিবাহে মন গেল নাকি মহীন?

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল,—না, আমার জন্ম নয় কাকী, আমি বিহারীকে রাজি করিয়াছি। তুমি দেখিবার দিন ঠিক করিয়া দাও!

অন্নপূর্ণা কহিলেন, আহা, তাহার কি এমন ভাগ্য হইবে? বিহারীর মত ছেলে কি তাহার কপালে আছে?

কাকীর ঘর হইতে বাহির হইয়া মহেন্দ্র দ্বারের কাছে আসিতেই মার সঙ্গে দেখা হইল। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মহেন্দ্র, এতক্ষণ তোদের কি পরামর্শ হইতেছিল?

মহেন্দ্র কহিল—পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আসিয়াছি।

মা কহিলেন—তোর পান ত আমার ঘরে সাজা আছে।

মহেন্দ্র উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া অন্নপূর্ণার রোদন-স্ফীত চক্ষু দেখিবামাত্র অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইলেন। ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কি গো মেজ ঠাকরুণ, ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি?

বলিয়া উত্তরমাত্র না শুনিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

(২)

মেয়ে দেখিবার কথা মহেন্দ্র প্রায় ভুলিয়াছিল অন্নপূর্ণা ভোলেন নাই। তিনি শ্যামবাজারে মেয়ের অভিভাবক জ্যাঠার বাড়ীতে পত্র লিখিয়া দেখিতে যাইবার দিনস্থির করিয়া পাঠাইলেন।

দিনস্থির হইয়াছে শুনিয়াই মহেন্দ্র কহিল—এত তাড়াতাড়ি কাজটা করিলে কেন কাকী? এখনো বিহারীকে বলাই হয় নাই।

অন্নপূর্ণা কহিলেন—সে কি হয় মহীন্? এখন না দেখিতে গেলে তাহারা কি মনে করিবে?

মহেন্দ্র বিহারীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। কহিল—চল ত, পছন্দ না হইলে ত তোমার উপর জোর চলিবে না!

বিহারী কহিল, সে কথা বলিতে পারি না। কাকীর বোন্‌ঝিকে দেখিতে গিয়া পছন্দ হইল না বলা আমার মুখ দিয়া আসিবে না।

মহেন্দ্র কহিল—সে ত উত্তম কথা!

বিহারী কহিল—কিন্তু তোমার পক্ষে অন্যায় কাজ হইয়াছে মহিন্ দা! নিজেকে হাল্‌কা রাখিয়া পরের স্কন্ধে এরূপ ভার চাপান তোমার উচিত হয় নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইবে।

মহেন্দ্র একটু লজ্জিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল, তবে কি করিতে চাও!

বিহারী কহিল, যখন তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছ তখন আমি বিবাহ করিব—দেখিতে যাইবার ভড়ং করিবার দরকার নাই।

অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মত ভক্তি করিত।

অবশেষে অন্নপূর্ণা বিহারীকে নিজে ডাকিয়া কহিলেন, সে কি হয় বাছা! না দেখিয়া বিবাহ করিবে সে কিছুতেই হইবে না। যদি পছন্দ না হয় তবে বিবাহে সম্মতি

দিতে পারিবে না এই আমার শপথ রহিল!

নির্দ্ধারিত দিনে মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে কহিল—আমার সেই রেশমের জামা এবং ঢাকাই সাড়িটা বাহির করিয়া দাও!

মা কহিলেন, কেন, কোথায় যাবি?

মহেন্দ্র কহিল, দরকার আছে মা, তুমি দাওনা, আমি পরে বলিব।

মহেন্দ্র একটু সাজ না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরের জন্য হইলেও কন্যা দেখিবার প্রসঙ্গ মাত্রেই যৌবনধর্ম্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।

দুই বন্ধু কন্যা দেখিতে বাহির হইল।

কন্যার জ্যাঠা শ্যামবাজারের অনুকূল বাবু। নিজের উপার্জ্জিত ধনের দ্বারায় তাঁহার বাগানসমেত তিনতলা বাড়ীটাকে পাড়ার মাথার উপর তুলিয়াছেন।

দরিদ্র ভ্রাতার মৃত্যুর পর পিতৃমাতৃহীনা ভ্রাতষ্পুত্রীকে তিনি নিজের বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। মাসী অন্নপূর্ণা বলিয়াছিলেন, আমার কাছে থাক্।—তাহাতে ব্যয়লাঘবের সুবিধা ছিল বটে কিন্তু গৌরবলাঘবের ভয়ে অনুকূল রাজি হইলেন না। এমন কি, দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যও কন্যাকে কখনো মাসীর বাড়ী পাঠাইতেন না,. নিজেদের মর্য্যাদাসম্বন্ধে তিনি এতই কড়া ছিলেন।

কন্যাটির বিবাহভাবনার সময় আসিল। কিন্তু আজকালকার দিনে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" কথাটা খাটে না। ভাবনার সঙ্গে খরচও চাই। কিন্তু পণের কথা উঠিলেই অবিনাশ বলেন, আমার ত নিজের মেয়ে আছে, আমি একা আর কত পারিয়া উঠিব। এমনি করিয়া দিন বহিয়া যাইতেছিল। এমন সময় সাজিয়া গুজিয়া গন্ধ মাখিয়া রঙ্গভূমিতে বন্ধুকে লইয়া মহেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।

তখন চৈত্র মাসের দিবসান্তে সূর্য্য অস্তোন্মুখ। দোতলার দক্ষিণ বারান্দায় চিত্রিত চিক্কণ চীনের টালি গাঁথা; তাহারি প্রান্তে দুই অভ্যাগতের জন্য রূপার রেকাবি ফলমূল মিষ্টান্নে শোভমান এবং বরফজলপূর্ণ রূপার গ্লাস শীতল শিশিরবিন্দুজালে মণ্ডিত। মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলজ্জিত ভাবে খাইতে বসিয়াছেন। নীচে বাগানে মালী তখন ঝারীতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল; সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রর দক্ষিণবাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র কুঞ্চিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দ্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের দ্বার জানালার ছিদ্রান্তরাল হইতে একটু আধটু চাপা হাসি, ফিস্ ফিস্ কথা, দুটা একটা গহনার টুং টাং যেন শুনা যায়।

আহারের পর অনুকূল বাবু ভিতরের দিকে চাহিয়া কহিলেন—চুনি, পান নিয়ে আয় ত রে?

কিছুক্ষণ পরে সঙ্কোচের ভাবে পশ্চাতের একটা দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি বালিকা কোথা হইতে সর্ব্বাঙ্গে রাজ্যের লজ্জা জড়াইয়া আনিয়া পানের বাটা হাতে অনুকূলবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, লজ্জা কি মা! বাটা ঐ ওঁদের সাম্নে রাখ!

বালিকা নত হইয়া কম্পিত হস্তে পানের বাটা অতিথিদের আসনপার্শ্বে ভূমিতে রাখিয়া দিল। বারান্দার পশ্চিমপ্রান্ত হইতে সূর্য্যাস্ত আভা তাহার লজ্জিত মুখকে মণ্ডিত করিয়া গেল। সেই অবকাশে মহেন্দ্র সেই কম্পান্বিতা বালিকার করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া লইল।

বালিকা তখনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অনুকূল বাবু কহিলেন একটু দাঁড়া চুনি। বিহারী বাবু, এইটি আমার ছোট ভাই অপূর্ব্বর কন্যা। সে ত চলিয়া গেছে, এখন আমি ছাড়া ইহার আর কেহ নাই! বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন।

কেহ তাহার বয়স স্পষ্ট করিয়া বলিত না। আত্মীয়েরা বলিত এই বারো তেরো হইবে—অর্থাৎ চোদ্দ পোনেরো হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক! কিন্তু অনুগ্রহপালিত বলিয়া একটি কুণ্ঠিত ভীরুভাবে তাহার নবযৌবনারম্ভকে সংযত সম্বৃত করিয়া রাখিয়াছে।

আর্দ্রচিত্ত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম কি? অনুকূল বাবু উৎসাহ দিয়া কহিলেন—বল মা, তোমার নাম বল! বালিকা তাহার অভ্যস্ত আদেশ পালনের ভাবে নতমুখে বলিল, আমার নাম আশালতা।

আশা! মহেন্দ্রের মনে হইল, নামটি বড় করুণ, এবং কণ্ঠটি বড় কোমল! অনাথা আশা!

দুই বন্ধু পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মহেন্দ্র কহিল, বিহারী, এ মেয়েটিকে তুমি ছাড়িয়ো না।

বিহারী তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল, মেয়েটিকে দেখিয়া উহার মাসিমাকে মনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লক্ষ্মী হইবে!

মহেন্দ্র কহিল—তোমার স্কন্ধে যে বোঝা চাপাইলাম এখন বোধ হয় তাহার ভার তত গুরুতর বোধ হইতেছে না।

বিহারী কহিল—না, বোধ হয় সহ্য করিতে পারিব।

মহেন্দ্র কহিল—কাজ এত কষ্ট করিয়া! তোমার বোঝা না হয় আমিই স্কন্ধে তুলিয়া লই! কি বল?

বিহারী গম্ভীর ভাবে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। কহিল, মহিন্‌দা, সত্য বলিতেছ? এখনো ঠিক করিয়া বল! তুমি বিবাহ করিলে কাকী ঢের বেশি খুসি হইবেন—তাহা হইলে তিনি মেয়েটিকে সর্ব্বদাই কাছে রাখিতে পারিবেন।

মহেন্দ্র কহিল—তুমি পাগল হইয়াছ? সে হইলে অনেককাল আগে হইয়া যাইত!

বিহারী অধিক আপত্তি না করিয়া চলিয়া গেল, মহেন্দ্রও সোজা পথ ছাড়িয়া দীর্ঘপথ ধরিয়া বহুবিলম্বে ধীরে ধীরে বাড়ী গিয়া পৌঁছিল।

মা তখন লুচিভাজা ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন্‌ কাকী তখনো তাঁহার বোন্‌ঝির নিকট হইতে ফেরেন নাই।

মহেন্দ্র একা নির্জ্জন ছাদের উপর গিয়া মাদুর পাতিয়া শুইল। কলিকাতার হর্ম্ম্যশিখরপুঞ্জের উপর শুক্লসপ্তমীর অর্দ্ধচন্দ্র নিঃশব্দে আপন অপরূপ মায়ামন্ত্র বিকীর্ণ

করিতেছিল। মা যখন খাবার খবর দিলেন মহেন্দ্র অলসস্বরে কহিল, বেশ আছি এখন আর উঠিতে পারি না।

মা কহিলেন, এইখানেই আনিয়া দিই না।

মহেন্দ্র কহিল—আজ আর খাইব না আমি খাইয়া আসিয়াছি।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় খাইতে গিয়াছিলি?

মহেন্দ্র কহিল—সে অনেক কথা, পরে বলিব।

মহেন্দ্রের এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারে অভিমানিনী মাতা কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া অনুতপ্ত মহেন্দ্র কহিল মা আমার খাবার এই খানেই আন।

মা কহিলেন, ক্ষুধা না থাকেত দরকার কি?

এই লইয়া ছেলেতে মায়েতে কিয়ৎক্ষণ মান অভিমানের পর মহেন্দ্রকে পুনশ্চ আহারে বসিতে হইল।

৩

রাত্রে মহেন্দ্রের ভাল নিদ্রা হইল না। প্রত্যূষেই সে বিহারীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত। কহিল, ভাই ভাবিয়া দেখিলাম, কাকীমার মনোগত ইচ্ছা, আমিই তাঁহার বোন্‌ঝিকে বিবাহ করি।

বিহারী কহিল, সে জন্যত হঠাৎ নূতন করিয়া ভাবিবার কোন দরকার ছিল না। তিনিত ইচ্ছা নানা প্রকারেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

মহেন্দ্র কহিল, তাই বলিতেছি, আমার মনে হয়, আশাকে আমি বিবাহ না করিলে তাঁহার মনে একটা খেদ থাকিয়া যাইবে।

বিহারী কহিল—সম্ভব বটে।

মহেন্দ্র কহিল—আমার মনে হয় সেটা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইবে।

বিহারী কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক উৎসাহের সহিত কহিল বেশ কথা, সেত ভাল কথা তুমি রাজি হইলেত আর কোন কথাই থাকে না। এ কর্ত্তব্যবুদ্ধি কাল তোমার মাথায় আসিলেইত ভাল হইত।

মহেন্দ্র। একদিন দেরীতে আসিয়া কি এমন ক্ষতি হইল! যেই বিবাহের প্রস্তাবে মহেন্দ্র মনকে লাগাম ছাড়িয়া দিল সেই তাহার পক্ষে ধৈর্য্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আর অধিক কথাবার্ত্তা না হইয়া কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলেই ভাল হয়।

মাকে গিয়া কহিল—আচ্ছা মা, তোমার অনুরোধ রাখিব। বিবাহ করিতে রাজি হইলাম।

মা মনে মনে কহিলেন, বুঝিয়াছি, সেদিন মেজ বৌ কেন হঠাৎ তাহার বোন্‌ঝিকে দেখিতে চলিয়া গেল এবং মহেন্দ্র সাজিয়া বাহির হইল।

তাঁহার বারম্বার অনুরোধ অপেক্ষা অন্নপূর্ণার চক্রান্ত যে সফল হইল ইহাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববিধানের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, একটি ভাল মেয়ে সন্ধান করিতেছি।

মহেন্দ্র আশার উল্লেখ করিয়া কহিল, কন্যাত পাওয়া গেছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন,—সে কন্যা হইবে

না, বাছা, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি!

মহেন্দ্র যথেষ্ট সংযত ভাবে কহিল,—কেন মা মেয়েটি ত মন্দ নয়!

রাজলক্ষ্মী। তাহার তিনকুলে কেহ নাই, তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমার কুটুম্বের সুখ কি হইবে?

মহেন্দ্র। কুটুম্বের সুখ না হইলেও, আমি দুঃখিত হইব না, কিন্তু মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে মা!

ছেলের জেদ্ দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর চিত্ত আরো কঠিন হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন—বাপ-মা-মরা অলক্ষণা কন্যার সহিত আমার এক ছেলের বিবাহ দিয়া তুমি আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙ্গাইয়া লইতে চাও? এত বড় সয়তানী।

অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া কহিলেন, মহীনের সঙ্গে বিবাহের কোন কথাই হয় নাই, সে আপন ইচ্ছামত তোমাকে কি বলিয়াছে আমিও জানি না।

মহেন্দ্রের মা সে কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না। তখন অন্নপূর্ণা বিহারীকে ডাকাইয়া সাশ্রুনেত্রে কহিলেন তোমার সঙ্গেইত সব ঠিক হইয়াছিল, আর কেন উল্‌টাইয়া দিলে। আবার তোমাকেই মত দিতে হইবে।

তুমি উদ্ধার না করিলে আমাকে বড় লজ্জায় পড়িতে হইবে। মেয়েটি বড় লক্ষ্মী, তোমার অযোগ্য হইবে না।

বিহারী কহিল, কাকীমা, সে কথা আমাকে বলা বাহুল্য। তোমার বোন্‌ঝি যখন, তখন আমার অমতের কোন কথাই নাই। কিন্তু মহেন্দ্র—

অন্নপূর্ণা কহিলেন, না বাছা, মহেন্দ্রের সঙ্গে তাহার কোন মতেই বিবাহ হইবার নয়। আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি তোমার সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হই। মহীনের সঙ্গে সম্বন্ধে আমার মত নাই।

বিহারী কহিল, কাকী, তোমার যদি মত না থাকে তাহা হইলে কোন কথাই নাই।

এই বলিয়া সে রাজলক্ষ্মীর নিকট গিয়া কহিল, মা, কাকীর বোন্‌ঝির সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে, আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই, কাজেই লজ্জার মাথা খাইয়া নিজেই খবরটা দিতে হইল।

রাজলক্ষ্মী। বলিস্ কি বিহারী। বড় খুসি হইলাম। মেয়েটি লক্ষ্মী মেয়ে তোর উপযুক্ত। এমেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিস্‌নে।

বিহারী। হাতছাড়া কেন হইবে? মহিন্‌দা নিজে পছন্দ করিয়া আমার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই সকল বাধা বিঘ্নে মহেন্দ্র দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে মা ও কাকীর উপর রাগ করিয়া একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে গিয়া আশ্রয় লইল।

রাজলক্ষ্মী কাঁদিয়া অন্নপূর্ণার ঘরে উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, মেজ বৌ, আমার ছেলে বুঝি উদাস হইয়া ঘর ছাড়িল, তাহাকে রক্ষা কর!

অন্নপূর্ণা কহিলেন—দিদি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক—দু'দিন বাদেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—তুমি তাহাকে জাননা সে যাহা চায়, না পাইলে যাহা খুসি করিতে পারে। তোমার বোন্‌ঝির সঙ্গে যেমন করিয়া হোক্ তার—

অন্নপূর্ণা। দিদি সে কি করিয়া হয়—বিহরীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা একপ্রকার পাকা হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, সে ভাঙ্গিতে কতক্ষণ? বলিয়া বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, বাবা, তোমার জন্য ভাল পাত্রী দেখিয়া দিতেছি এই কন্যাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ তোমার যোগ্যই নয়।

বিহারী কহিল—না মা সে হয় না। সে সমস্তই ঠিক হইয়া গেছে।

তখন রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, আমার মাথা খাও মেজ বৌ, তোমার পায়ে ধরি, তুমি বিহারীকে বলিলেই সব ঠিক হইবে।

অন্নপূর্ণা বিহারীকে কহিলেন, বিহারী, তোমাকে বলিতে আমার মুখ সরিতেছে না, কিন্তু কি করি বল? আশা তোমার হাতে পড়িলেই আমি বড় নিশ্চিন্ত হইতাম কিন্তু সব ত জানিতেছই—

বিহারী। বুঝিয়াছি কাকী। তুমি যেমন আদেশ করিবে তাহাই হইবে। কিন্তু আমাকে আর কখনো কাহারো সঙ্গে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়ো না, বলিয়া বিহারী চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, মহেন্দ্রের অকল্যাণ আশঙ্কায় মুছিয়া ফেলিলেন। বারবার মনকে বুঝাইলেন, যাহা হইল তাহা ভালই হইল।

এইরূপে রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা এবং মহেন্দ্রের মধ্যে নিষ্ঠুর নিগূঢ় নীরব ঘাত প্রতিঘাত চলিতে চলিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল। বাতি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিল, সানাই মধুর হইয়া বাজিল, মিষ্টান্নে মিষ্টের ভাগ লেশমাত্র কম পড়িল না।

আশা সজ্জিতসুন্দর-দেহে, লজ্জিতমুগ্ধ-মুখে আপন নূতন সংসারে প্রথম পদার্পণ করিল; তাহার এই কুলায়ের মধ্যে কোথাও যে কোন কণ্টক আছে তাহা তাহার কম্পিত কোমল হৃদয় অনুভব করিল না; বরঞ্চ জগতে তাহার একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আসিতেছে বলিয়া আশ্বাসে ও আনন্দে তাহার সর্ব্বপ্রকার ভয় সংশয় দূর করিয়া দিল।

বিবাহের পর রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি বলি, এখন বৌমা কিছুদিন তাঁর জ্যাঠার বাড়ি গিয়াই থাকুন।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—কেন মা?

মা কহিলেন—এবারে তোমার এগ্‌জামিন আছে, পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতে পারে!

মহেন্দ্র। আমি কি ছেলেমানুষ? নিজের ভালমন্দ বুঝে চলিতে পারি না?

রাজলক্ষ্মী। তা হোক্ না বাপু, আর একটা বৎসর বইত নয়!

মহেন্দ্র কহিল—বৌয়ের বাপ মা যদি কেহ থাকিতেন তাঁহার কাছে পাঠাইতে আপত্তি ছিল না—কিন্তু জ্যাঠার বাড়িতে আমি উহাকে রাখিতে পারিব না!

রাজলক্ষ্মী (আত্মগত) ওরে বাস্‌রে! উনিই কর্ত্তা, শাশুড়ি কেহ নয়! কাল বিয়ে করিয়া আজই এত দরদ! কর্ত্তারা ত আমা-

দেরও একদিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্ত্রৈণতা এমন বেহায়াপনাত তখন ছিল না!

মহেন্দ্র খুব জোরের সহিত কহিলেন—কিছু ভাবিয়ো না মা! এগ্‌জামিনের কোন ক্ষতি হইবে না!

(৪)

রাজলক্ষ্মী তখন হঠাৎ অপরিমিত উৎসাহে বধূকে ঘরকন্নার কাজ শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, ঠাকুরঘরেই আশার দিনগুলি কাটিল, রাত্রে রাজলক্ষ্মী তাহাকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া তাহার আত্মীয় বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা অনেক বিবেচনা করিয়া বোন্‌ঝির নিকট হইতে দূরেই থাকিতেন। একমাত্র শাশুড়ি বসিয়া বসিয়া অহরহ সংসারের জাঁতাকল ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং স্নেহতৃষাতুরা আশাকে পিষিয়া পিষিয়া কাজ বাহির হইতে লাগিল।

যখন কোন প্রবল অভিভাবক একটা ইক্ষুদণ্ডের সমস্ত রস প্রায় নিঃশেষপূর্ব্বক চর্ব্বন করিতে থাকে, তখন হতাশ্বাস লুব্ধবালকের ক্ষোভ উত্তরোত্তর যেমন অসহ্য বাড়িয়া উঠে মহেন্দ্রের সেই দশা হইল। ঠিক তাহার চোখের সম্মুখেই নবযৌবনা নববধূর সমস্ত মিষ্টরস যে কেবল ঘরকন্নার দ্বারা পিষ্ট হইতে থাকিবে ইহা কি সহ্য হয়?

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিল—কাকীমা বৌকে যেরূপ খাটাইয়া মারিতেছেন আমি ত তাহা দেখিতে পারি না।

অন্নপূর্ণা জানিতেন রাজলক্ষ্মী বাড়াবাড়ি করিতেছেন কিন্তু বলিলেন—কেন মহীন্, বৌকে ঘরের কাজ শেখান হইতেছে ভালই হইতেছে। এখনকার মেয়েদের মত কেবল নভেল পড়িয়া কার্পেট বুনিয়া বাবু হইয়া থাকা কি ভাল?

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল—এখনকার মেয়ে এখনকার মেয়ের মতই হইবে, তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্। আমার স্ত্রী যদি আমারই মত নভেল পড়িয়া রসগ্রহণ করিতে পারে তবে তাহাতে পরিতাপ বা পরিহাসের বিষয় কিছুই দেখি না!

অন্নপূর্ণার ঘরে পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া রাজলক্ষ্মী সব কর্ম্ম ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি! তোমাদের কিসের পরামর্শ চলিতেছে?

মহেন্দ্র উত্তেজিত ভাবেই বলিল—পরামর্শ কিছু নয় মা, বৌকে ঘরের কাজে আমি দাসীর মত খাটিতে দিতে পারিব না!

মা তাঁহার উদ্দীপ্ত জ্বালা দমন করিয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণধীরভাবে কহিলেন—তাঁহাকে লইয়া কি করিতে হইবে?

মহেন্দ্র কহিল—তাহাকে আমি লেখাপড়া শেখাইব।

রাজলক্ষ্মী কিছু না কহিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন ও মুহূর্ত্তপরে বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া কহিলেন—এই লও, তোমার বধূকে তুমি লেখাপড়া শেখাও!

এই বলিয়া অন্নপূর্ণার দিকে ফিরিয়া গলবস্ত্র যোড়করে কহিলেন—মাপ কর, মেজগিন্নি, মাপ কর! তোমার বোন্‌ঝির

মর্য্যাদা আমি বুঝিতে পারি নাই; উঁহার কোমল হাতে আমি হলুদের দাগ লাগাইয়াছি, এখন তুমি উঁহাকে ধুইয়া মুছিয়া বিবি সাজাইয়া মহিনের হাতে দাও—উনি পায়ের উপর পা দিয়া লেখাপড়া শিখুন, দাসীবৃত্তি আমি করিব!

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঝঙ্কার শব্দে শিকল টানিয়া দিলেন।

অন্নপূর্ণা ক্ষোভে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। আশা এই আকস্মিক গৃহ-বিপ্লবের কোন তাৎপর্য্য না বুঝিয়া লজ্জায় ভয়ে দুঃখে বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগিয়া মনে মনে কহিল, আর নয়, নিজের স্ত্রীর ভার নিজের হাতে লইতেই হইবে, নহিলে অন্যায় হইবে।

ইচ্ছার সহিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি মিলিত হইতেই হাওয়ার সঙ্গে আগুন লাগিয়া গেল। কোথায় গেল কালেজ, এক্‌জামিন্‌, বন্ধুকৃত্য, সামাজিকতা; স্ত্রীর উন্নতি সাধন করিতে মহেন্দ্র তাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল—কাজের প্রতি দৃক্‌পাত বা লোকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করিল না।

অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী মনে মনে কহিলেন, মহেন্দ্র যদি এখন তার বৌকে লইয়া আমার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়ে তবু আমি তাকাইব না, দেখি সে তার মাকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কেমন করিয়া কাটায়?

দিন যায়—দ্বারের কাছে কোন অনুতপ্তর পদশব্দ শুনা গেল না।

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন—ক্ষমা চাহিতে আসিলে ক্ষমা করিবেন—নহিলে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত ব্যথা দেওয়া হইবে।

ক্ষমার আবেদন আসিয়া পৌঁছিল না। তখন রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন তিনি নিজে গিয়াই ক্ষমা করিয়া আসিবেন। ছেলে অভিমান করিয়া আছে বলিয়া কি মাও অভিমান করিয়া থাকিবে?

তেতালার ছাদের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র গৃহে মহেন্দ্রের শয়ন এবং অধ্যয়নের স্থান। এ কয়দিন মা তাহার কাপড় গোছানো, বিছানা তৈরি, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করায় সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছিলেন। কয়দিন মাতৃস্নেহের চিরাভ্যস্ত কর্ত্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাঁহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন দ্বিপ্রহরে ভাবিলেন, মহেন্দ্র এতক্ষণে কলেজে গেছে, এই অবকাশে তাহার ঘর ঠিক করিয়া আসি—কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিলেই সে অবিলম্বে বুঝিতে পারিবে তাহার ঘরে মাতৃহস্ত পড়িয়াছে।

রাজলক্ষ্মী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। মহেন্দ্রের শয়নগৃহের একটা দ্বার খোলা ছিল—তাহার সম্মুখে আসিতেই যেন হঠাৎ কাঁটা বিঁধিল, চমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন নীচের বিছানায় মহেন্দ্র নিদ্রিত এবং দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বধূ ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে উন্মুক্ত দ্বারে দাম্পত্যলীলার এই অভিনয় দেখিয়া রাজলক্ষ্মী লজ্জায় ধিক্কারে সঙ্কুচিত হইয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিলেন।

ক্রমশঃ—

ব্যাধি ও প্রতীকার।

ইংরাজিশিক্ষার প্রথম উচ্ছ্বাসে আমাদের বক্ষ যতটা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আর ততটা নাই, এমন কি কিছুকাল হইতে নাড়ী স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও যেন দাবিয়া গেছে। জ্বরের মুখে যে উত্তাপ দেখিতে দেখিতে একশো চার পাঁচ ছয়ের দিকে উঠিতেছিল, এখন যেন তাহা আটানব্বইয়ের নীচে নামিয়া চলিয়াছে এবং সমস্তই যেন হিম হইয়া আসিতেছে। এমন অবস্থায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত সুযোগ্য ভাবুক ব্যক্তি "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার" সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিবেন তাহা আমাদের ঔৎসুক্যজনক না হইয়া থাকিতে পারে না।

তথাপি আমরা লেখক মহাশয়ের এবং তাঁহার প্রবন্ধের নামের দ্বারা স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়াও অতিশয় অধিক প্রত্যাশা করি নাই। কারণ, আমরা নিশ্চয় জানি, সামাজিক ব্যাধির কোন অভূতপূর্ব্ব পেটেণ্ট ঔষধ কবি বা কবিরাজের কল্পনার অতীত। আসল কথা, ঔষধ চিরপরিচিত, কিন্তু নিকটে তাহার ডাক্তারখানা কোথায় পাওয়া যায় সেইটে ঠাহর করা শক্ত। কারণ, মানসিক ব্যাধির ঔষধও মানসিক এবং ব্যাধি থাকাতেই সে ঔষধ দুষ্প্রাপ্য।

তবে এ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আসিয়াছে; কেননা, আমাদের মধ্যে একটা দ্বিধা জন্মিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আধুনিক সভ্যজগতের চৌমাথার মোড়ে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছি।

কিছু পূর্ব্বে এরূপ আন্তরিক দ্বিধা আমাদের শিক্ষিত সমাজে ছিল না। স্বদেশাভিমানীরা মুখে যিনি যাহাই বলিতেন আধুনিক সভ্যতার উপর তাঁহাদের অটল বিশ্বাস ছিল। ফরাসীবিদ্রোহ, দাসত্ববারণ চেষ্টা এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যূষকালীন ইংরাজিকাব্যসাহিত্য বিলাতী সভ্যতাকে যে ভাবের ফেণায় ফেণিল করিয়া তুলিয়াছিল তখনো তাহা মরে নাই—সে সভ্যতা জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে সমস্ত মনুষ্যত্বকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছে এমনি একটা আশ্বাসবাণী ঘোষণা করিতেছিল।

আমাদের তাহাতে তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা সেই সভ্যতার ঔদার্য্যের সহিত ভারতবর্ষীয় সঙ্কীর্ণতার তুলনা করিয়া য়ুরোপকে বাহবা দিতেছিলাম।

বিশেষতঃ আমাদের মত অসহায় পতিত জাতির পক্ষে এই ঔদার্য্য অত্যন্ত রমণীয়। সেই অতিবদান্য সভ্যতার আশ্রয়ে আমরা নানাবিধ সুলভ সুবিধা ও অনায়াসমহত্ত্বের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। মনে আশা হইতে লাগিল কেবল স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া আমরা বীরপুরুষ হইব, এবং কালেজ হইতে দলে দলে উপাধি গ্রহণ করিয়াই আমরা সাম্যসৌভ্রাত্র্যস্বাতন্ত্র্যমন্ত্রদীক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট হইতে স্বাধীন শাসনের দাবী করিব।

চৈতন্য যখন ভক্তিবন্যায় ব্রাহ্মণচণ্ডালের ভেদবাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার কথা বলিলেন তখন যে হীনবর্ণসম্প্রদায় উৎফুল্ল হইয়া ছুটিল তাহারা বৈষ্ণব হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ হইল না।

আমরাও সভ্যতার প্রথম ডাক শুনিয়া যখন নাচিয়াছিলাম তখন মনে করিয়াছিলাম এই পাশ্চাত্যমন্ত্র গ্রহণ করিলেই আর জেতা বিজেতার ভেদ থাকিবে না—কেবল মন্ত্রবলে গৌরেশ্যামে একাঙ্গ হইয়া যাইবে।

এই জন্যই আমাদের এত বেশি উচ্ছ্বাস হইয়াছিল এবং বায়রণের সুরে সুর বাঁধিয়া এমন উচ্চ সপ্তকে তান লাগাইয়াছিলাম। এমন পতিতপাবন সভ্যতাকে পতিত জাতি যদি মাথায় করিয়া না লইবে তবে কে লইবে?

কিন্তু আমরা বৈষ্ণব হইলাম ব্রাহ্মণ হইলাম না। আমাদের যাহা কিছু ছিল ছাড়িতে প্রস্তুত হইলাম কিন্তু ভেদ সমানই রহিয়া গেল। এখন মনে মনে ধিক্কার জন্মিতেছে;—ভাবিতেছি, কিসের জন্য

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর?

বাঁশী বাজিয়াছিল মধুর কিন্তু এখন মনে হইতেছে

যে ঝাড়ের তরল বাঁশি তারি লাগি পাও
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও!

এখন বিলাতী শিক্ষাটাকে ডালে মূলে উপড়াইবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কথা এই যে, কেবলমাত্র বাঁশির আওয়াজে যিনি কুলত্যাগ করেন তাঁহাকে অনুতাপ করিতেই হইবে। মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব লাভ এত সহজ মনে করাই ভুল। আমরা কথঞ্চিৎ পরিমাণে ইংরাজের ভাষা শিখিয়াছি বলিয়াই যে ইংরাজ জেতা বিজেতার সমস্ত প্রভেদ ভুলিয়া আমাদিগকে তাহার রাজতক্তায় তুলিয়া লইবে এ কথা স্বপ্নেও মনে করা অসঙ্গত। জাতীয় মহত্ত্বের দুর্গম শিখরে কণ্টকিত পথ দিয়া উঠিতে হয়—কেমন করিয়া উঠিতে হয় সে ত আমরা ইংরাজের ইতিহাসেই পড়িয়াছি।

আমি এই কথা বলি, যে, ইংরাজ যদি আমাদিগকে সমান বলিয়া একাসনে বসাইত তাহা হইলে আমাদের অসমানতা আরও অধিক হইত। তাহা হইলে ইংরাজের মহত্ত্বের তুলনায় আমাদের গৌরব আরও কমিয়া যাইত। তাহারা পৌরুষের দ্বারা যে আসন পাইয়াছে, আমরা প্রশ্রয়ের দ্বারা তাহা পাইয়া যদি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকিতাম, আমাদের আত্মাভিমান শান্ত হইত তবে তদ্দ্বারা আমাদের জাতির গভীরতর দারুণতর দুর্গতি হইত।

কিছু আদায় করিতে হইবে এই মন্ত্র ছাড়িয়া কিছু দিতে হইবে কিছু করিতে হইবে এই মন্ত্র লইবার সময় হইয়াছে। যতক্ষণ আমরা কিছু না দিতে পারিব ততক্ষণ আমরা কিছু পাইবার চেষ্টা করিলে এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলেও তাহা ভিক্ষাবৃত্তিমাত্র—তাহাতে সুখ নাই, সম্মান নাই।

সে কথাটা আমাদের মনের মধ্যে আছে বলিয়াই আমরা ভিক্ষার সময় কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ গৌতম কপিলের কথা পাড়িয়া থাকি। বলি যে, আমাদের পিতামহ জগতের সভ্যতার অনেক খোরাক জোগাইয়াছিলেন। অতএব ভিক্ষা দে বাবা!

পিতামহদের মহিমা স্মরণ করা খুবই দরকার, কিন্তু সে কেবল নিজেকে মহিমা লাভে উত্তেজিত করিবার জন্য, ভিক্ষার দাবীকে উচ্চ সপ্তকে চড়াইবাঁর জন্য নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি হতভাগা তাহার সকলি বিপরীত।

যাহাই হোক, পৃথিবীতে আমাদের একটা কিছু উপযোগিতা দেখাইতে হইবে। দরখাস্ত লিখিবার উপযোগিতা নহে—দরখাস্ত পাইবার। কিছু একটার জন্য পৃথিবীকে আমাদের দেউড়িতে উমেদারী করিতে হইবে তবে আমাদের মুখে আস্ফালন শোভা পাইবে।

রাষ্ট্রনীতিতে মহত্বলাভ আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে অসম্ভব। সেই পথেই আমাদের সমস্ত মনকে যদি রাখি তবে পথের ভিক্ষুক হইয়াই আমাদের চিরটা কাল কাটিবে। যে শক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় গৌরবের অধিকারী হওয়া যায় সে শক্তি আমাদের নাই, লাভ করিবার কোন আশাও দেখি না। কেবল ইংরাজকে অনুরোধ করিতেছি তিনি যে শাখায় দাঁড়াইয়া আছেন সেই শাখাটাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ছেদন করিতে থাকুন। সেই অনুরোধ ইংরাজ যেদিন পালন করিবে সে দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে কালবিলম্ব হইবার আশঙ্কা আছে।

যেখানে আমাদের অধিকার নাই সেখানে কখনো কপট করযোড়ে কখনো কপট সিংহনাদে ধাবমান হওয়া বিড়ম্বনা সে কথা আমরা ক্রমেই অনুভব করিতেছি। বুঝিতেছি, নিজের চেষ্টার দ্বারা নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী স্থায়ী যাহা কিছু করিয়া তুলিতে পারিব তাহাতেই আমাদের নিস্তার। যে-জিনিষটা এবৎসর একজন কৃপা করিয়া দিবে পাঁচ বৎসর বাদে আর একজন গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া লইবে, সেটা যত বড় জিনিষ হোক্ আমাদিগকে এক ইঞ্চিও বড় করিতে পারিবে না।

কোন বিষয়ে একটা কিছু করিয়া তুলিতে যদি চাই তবে উজান স্রোতে সাঁতার দিয়া তাহা পারিব না। কোথায় আমাদের বল, আমাদের প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে তাহা বাহির করিতে হইবে। তাহা বাহির করিতে হইলেই নিজেকে যথার্থরূপে চিনিয়া লইতে হইবে।

হতাশ ব্যক্তিরা বলেন, চিনিব কেমন করিয়া? বিদেশী শিক্ষায় আমাদের চোখে ধূলা দিতেছে।

ধূলা নহে তাহা অঞ্জন। বিপরীত সংঘাত ব্যতীত মহত্বশিখা জ্বলিয়া উঠে না। খৃষ্টধর্ম্ম য়ুরোপীয় প্রকৃতির বিপরীত শক্তি। সেই শক্তির দ্বারা মথিত হইয়াই য়ুরোপীয় প্রকৃতির সারভাগ এমন করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

তেমনি য়ুরোপীয় শিক্ষা ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির পক্ষে বিপরীত শক্তি। এই শক্তির দ্বারাই আমরা আপনাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিব এবং ফুটাইয়া তুলিব।

আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা গিয়াছে। অন্ততঃ নিজেকে আদ্যোপান্তভাবে জানিবার জন্য আমাদের একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। প্রথম আবেগে অনেকটা হাতড়াইতে হয়, উদ্যমের অনেকটা বাজে খরচ হইয়া যায়। এখনো আমাদের সেই হাস্যকর অবস্থাটা কাটিয়া যায় নাই।

কিন্তু কাটিয়া যাইবে। পূর্ব্বপশ্চিমের

আলোড়ন হইতে আমরা কেবলি যে বিষ পাই তাহা নহে—যে লক্ষ্মী ভারতবর্ষের হৃদয় সমুদ্র তলে অদৃশ্য হইয়া আছেন তিনি এক-দিন অপূর্ব্ব জ্যোতিতে বিশ্বভুবনের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবেন।

নতুবা, যে ভারতে আর্য্য সভ্যতার সর্ব্ব-প্রথম উন্মেষ দেখা দিয়াছিল সেই ভারতেই সুদীর্ঘকাল পরে আর্য্যসভ্যতার বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ কি করিতে আসিয়াছে?

জাগাইতে আসিয়াছে। প্রাচীন ভারত তপোবনে বসিয়া একদিন এই জাগরণের মন্ত্র পাঠ করিয়াছিল—

উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! প্রাপ্যবরাণ্ নিবোধত!
ক্ষুরস্য ধারানিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

উঠ! জাগ! যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হও! কবিরা বলিতেছেন সেই পথ ক্ষুরধারা শানিত দুর্গম।

য়ুরোপও আমাদের রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া সেই মন্ত্রের পুনরুচ্চারণ করিতেছে, বলিতেছে, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হও। যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা আর কেহ ভিক্ষাস্বরূপ দান করিতে পারে না; আবেদন পত্রপুটে তাহা ধারণ করিতে পারে না—তাহা সন্ধান করিতে হইলে দুর্গম পথেই চলিতে হয়।

সে পথ কোথায়? অরণ্যে সে পথ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে তবু পিতামহদের পদচিহ্ন এখনো সে পথ হইতে লুপ্ত হয় নাই।

কিন্তু হায় পথের চেয়ে সেই পথলোপ-কারী অরণ্যের প্রতিই আমাদের মমতা। আমাদের প্রাচীন মহত্ত্বের মূলধারাটি কোথায় এবং তাহাকে নষ্ট করিয়াছে কোন্ বিকার-গুলিতে, ইহা আমরা বিচার করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিনা। স্বজাতিগর্ব্ব মাঝে মাঝে আমাদের উপর ভর করে তখন যেগুলি আমাদের স্বজাতির গর্ব্বের বিষয় এবং যাহা লজ্জার বিষয় যাহা সনাতন এবং যাহা অধুনাতন, যাহা স্বজাতির স্বরূপগত এবং যাহা আকস্মিক ইহার মধ্যে আমরা কোন ভেদ দেখিতে পাইনা। যাহা আমাদের আছে তাহাকেই ভাল বলিয়া যাহা আমাদের ছিল তাহাকে অবমানিত করি।

একথা ভুলিয়া যাই, ভালর প্রমাণ সে ভালকে যাহারা আশ্রয় করিয়া আছে তাহারাই। সবই যদি ভাল হইবে তবে আমরা ভ্রষ্ট হইলাম কি করিয়া?

এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে আদর্শ যথার্থ মহৎ, তাহা কেবল কালবিশেষ বা অবস্থা বিশেষের উপযোগী নহে। তাহাতে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব দান করে—সে মানুষ সকল কালে সকল অবস্থাতেই আপন শ্রেষ্ঠতা রাখিতে পারে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতে যে আদর্শ ছিল তাহা ক্ষণভঙ্গুর নহে; বিলাতে গেলে তাহা নষ্ট হয় না, বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা বিকৃত হয় না, বর্ত্তমানকালোপযোগী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে গেলে তাহা অনাবশ্যক হইয়া উঠে না। যদি তাহা হইত তবে সে আদর্শকে মহৎ বলিতে পারিতাম না।

সকল সভ্যতারই মূল মহত্ত্বসূত্রটি চিরন্তন এবং তাহার বাহ্য আয়তনটি সাময়িক তাহা মূলসূত্রকে অবলম্বন করিয়া কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার বাহ্য অবয়বটি যদি

আমরা অবলম্বন করি তবে আমরা ভুল করিব কারণ, যাহা ইংলণ্ডের ইতিহাসে বাড়িয়াছে ভারতের ইতিহাসে তাহার স্থান নাই। এই কারণেই বিলাতে গিয়া আমরা ইংরাজের বাহ্য আচারের যে অনুকরণ করি এদেশে তাহা অস্থানিক অসাময়িক বিদ্রূপমাত্র। কিন্তু সেই সভ্যতার চিরন্তন অংশটি যদি আমরা গ্রহণ করি তবে তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই কাজে লাগিবে।

তেমনি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আদর্শের মধ্যেও একটা চিরন্তন এবং একটা সাময়িক অংশ আছে। যেটা সাময়িক সেটা অন্য সময়ে শোভা পায় না। সেইটেকেই যদি প্রধান করিয়া দেখি তবে বর্ত্তমানকাল ও বর্ত্তমান অবস্থা দ্বারা আমরা পদে পদে বিড়ম্বিত উপহসিত হইব। কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।

এ কথা যিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় আদর্শে লোককে কেবলি তপস্বী করে কেবলি ব্রাহ্মণ করিয়া তুলে তিনি ভুল বলেন এবং গর্ব্বচ্ছলে মহৎ আদর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ যখন মহৎ ছিল তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্র ভাবেই মহৎ ছিল। তখন সে বীর্য্যে ঐশ্বর্য্যে জ্ঞানে এবং ধর্ম্মে মহৎ ছিল, তখন সে কেবলি মালা জপ করিত না।

তবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার আদর্শের বিভিন্নতা কোন্ খানে? কে কোনটাকে মুখ্য এবং কোন্টাকে গৌণ দেখে তাহা লইয়া। ভালকে সব সভ্য দেশেই ভাল বলে কিন্তু সেই ভালকে কেমন করিয়া সাজাইতে হইবে, কোন্টা আগে বসিবে এবং কোন্টা পরে বসিবে সেই রচনার বিভিন্নতা লইয়াই প্রভেদ।

যেমন সকল জীবের কোষ উপাদান একই জাতীয়, কিন্তু তাহার সংস্থান নানাবিধ ইহাও সেইরূপ। কিন্তু এই সংস্থানের নিয়মকে অবজ্ঞা করিবার যো নাই। ইহা আমাদের প্রকৃতির বহুকালীন্ অভ্যাসের দ্বারা গঠিত। আমরা অন্য কাহারো নকল করিয়া এই মূল উপাদানগুলিকে যেমন খুসি তেমন করিয়া সাজাইতে পারিনা—চেষ্টা করিতে গেলে এমন একটা ব্যাপার হইয়া উঠে যাহা কোন কর্ম্মের হয় না।

এই জন্য কোন বিষয়ে সার্থকতালাভ করিতে হইলে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিকে উড়াইয়া দিতে পারিব না। তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহারই আনুকূল্যে আমাদিগকে মহত্বলাভ করিতে হইবে।

কেহ বলিতে পারেন তবে ত কথাটা সহজ হইল। নিজের প্রকৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টার দরকার হয় না ত?

হয়। তাহারো সাধনা আছে। স্বাভাবিক হইবার জন্যও অভ্যাস করিতে হয়। কারণ, যে লোক দুর্ব্বল তাহাকে নানাদিকে নানা শক্তি বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। সে নিজেকে রক্ষা না করিয়া পাঁচজনেরই অনুকরণ করিতে থাকে। পাঁচ জনের আকর্ষণ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইলে নিজের প্রকৃতিকে সবল সক্ষম করিয়া তুলিতে হয়—সে একদিনের কাজ নহে—বিশেষতঃ বাহিরের শক্তি যখন প্রবল।

কবি প্রথম বয়সে এ'র ও'র নকল করিয়া

মরে,—অবশেষে প্রতিভার বিকাশে যখন সে নিজের সুরটি ঠিক ধরিতে পারে তখনই সে অমর হয়। তখনই সে স্বকীয় কাব্য-সম্পদে তার নিজেরও লাভ অন্য সকলেরও লাভ। আমরা যতদিন ইংরাজের নকলে সব কাজ করিতে যাইব ততদিন এমন কিছু হইবে না যাহাতে আমাদের সুখ আছে যা ইংরাজের লাভ আছে যখন নিজের মত হইব, স্বাভাবিক হইব তখন ইংরাজের কাছ হইতে যাহা লইব তাহা নূতন করিয়া ইংরাজকে ফিরাইয়া দিতে পারিব।

সে দিন নিঃসন্দেহই আসিবে। আসিবে যে তাহার শুভ লক্ষণ এই দেখিতেছি আমাদের পোলিটিকাল আন্দোলনের নেশা অনেকটা ছুটিয়া গেছে—এখন আমরা স্বাধীন চেষ্টায় স্বাধীন সন্ধানে আমাদের ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদের ধর্ম্ম আমাদের সমাজের প্রতিও দৃষ্টি পড়িয়াছে।

ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন, অস্বাভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি। অর্থাৎ ইংরাজি-শিক্ষাকে আমরা প্রকৃতিগত করিতে পারি নাই সেই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিতেছে—সেই জন্যই বিলাতী সভ্যতার বাহ্যভাগ লইয়া আছি তাহার মূল মহত্বকে আয়ত্ত করিতে পারি নাই।

কিন্তু তিনি আর একটা কথা বলেন নাই। কেবল ইংরাজি সভ্যতা নহে, আমাদের দেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধেও আমরা অস্বাভাবিক। আমরা তাহার বাহ্যিক ক্ষণিক অংশ লইয়া যে আড়ম্বর করিতেছি তাহা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, স্বাভাবিক হইতেই পারে না। কারণ মনুর সময়ে যাহা সাময়িক আমাদের সময়ে তাহা অসাময়িক, মনুর সময়ে যাহা চিরন্তন আমাদের সময়েও তাহা চিরন্তন।

এই যে নিত্যানিত্য কালাকাল বিবেক ইহাই আমাদের হয় নাই। কেবল সেই জন্যই ইংরাজের কাছ হইতে আমরা ভালরূপ আদায় করিতে পারিতেছি না, ভারতবর্ষের কাছ হইতেও পারিতেছি না।

কিন্তু আমার এ কথার মধ্যে অত্যুক্তি আছে। কালের সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চক্ষে পড়ে না। যে শক্তি কাজ করিতেছে তাহা অলক্ষ্যে সমাজ গড়িয়া তোলে বলিয়া তাহাকে প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ পঞ্চাশ বৎসরে ভাগ করিয়া দেখিলে তবেই তাহার কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যখন হতাশের আক্ষেপ গাহিতেছি তখনো সে বিনা জবাবদিহীতে কাজ করিয়া যাইতেছে। আমরা পরশিক্ষাবলেই পরশিক্ষা পাশ হইতে নিজেকে কিরূপে ধীরে ধীরে এক এক পাক করিয়া মুক্ত করিতেছি তাহা পঞ্চাশ বৎসর পরবর্ত্তী বঙ্গদর্শনের সম্পাদক অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পাইবেন।

তখনো যে সমস্তটা সম্পাদকের সম্পূর্ণ মনোমত হইবে তাহা নহে—কারণ, সংসারে হতাশের আক্ষেপ অমর—কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয়ের পুস্তিকার সহিত মিলাইয়া সুসময়ের আলোচনা করিলে তিনি অনেকটা পরিমাণে সান্ত্বনা পাইবেন এ কথা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদক জোর করিয়া বলিতে পারেন।

বাঙ্গালা প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য।

পদকল্পতরুতে বৈষ্ণবদাস, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির বন্দনাসূচক একটি পদে লিখিয়াছেন ;—

"যাকর রচিত মধুর রস
নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র
আস্বাদিল রায় স্বরূপ সহিত॥"

এই "গদ্যময় গীত" কি জানিতে কৌতূহলী হইয়া আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, বৈষ্ণব সাহিত্যজ্ঞ, শ্রদ্ধাস্পদ ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়কে প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম ; তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন, এই ছত্রোক্ত গদ্যময় গীত একরূপ মিত্রাক্ষরেরই ভেদ, উহা পদ্য-সাহিত্যের অন্তর্বর্ত্তী।

এ উত্তর আমার নিকট সমীচীন বোধ হয় নাই। আমার বিশ্বাস, রাধাকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি কোন কোন লেখক গদ্য-ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন ; অন্ততপক্ষে "সহজিয়া" মতের অনেক কথা গদ্যভাষায় বিরচিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমরা যদিও চণ্ডীদাসের রচিত তদ্রূপ গদ্যের নমুনা না পাইয়া থাকি, তথাপি পরবর্ত্তী বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্যপুস্তিকা পাইয়াছি, তাহার অনেকগুলিতেই "সহজিয়া" মতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই গদ্য কঠোর সমাসাবদ্ধ, জটিল ভাবসমাচ্ছন্ন পণ্ডিত মহাশয়দের গদ্যের মত নহে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত "রাজময়ী কণা" নামক পুস্তক হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"রূপ তিন, কি কি রূপ ৩ শ্যাম ১ শ্বেত ২ গৌর ৩ ধ্যান কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণ জিউর পঞ্চ নাম। গুণ তিন মত হয়ে। কি কি গুণ। ব্রজলীলা ১। দ্বারকলীলা ২। গৌর-লীলা ৩।" বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত "দেহকড়চ" পুস্তিকা খানি ১৩০৪ সালের ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, —ইহার রচনাও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সম্পূর্ণ-রূপে ভাবপ্রকাশক, যথা,—"তুমি কে। আমি জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ব বস্তু হইতে। তত্ত্ব বস্তু কি কি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র। ছয় রিপু ইচ্ছা। এই সকল য়েক যোগে ভাণ্ড হইল। পঞ্চ আত্মা কে কে॥ পৃথিবী। আপ। তেজঃ। বাউ। আকাশ। একাদশীন্দ্র কে কে। কর্ম্ম-ইন্দ্র পাঁচ। জ্ঞানীন্দ্র পাঁচ। আবরণ এক।" রূপ গোস্বামীর কারিকার ভাষাও ঠিক এইরূপ, যথা,—"পূর্ব্বরাগের মূল দুই। হঠাৎ দর্শন ও অকস্মাৎ শ্রবণ। আগে তার সেবা। তার ইংগিতে তৎপর হইয়া কার্য্য করিবে। আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে।" এরূপ গদ্যের নমুনা অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনীয়। 'সহজিয়া' সম্প্রদায়ের গদ্যের বিরুদ্ধে অন্য যে

আপ ত্ত থাকে থাকুক, উহা যে নিতান্ত সহজ তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

যাহারা প্রাচীন বঙ্গীয় পুঁথির অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, বহু-সংখ্যক কবিতা-গ্রন্থের মধ্যে দু এক খানি পূর্ব্বোক্তরূপ গদ্য পুস্তিকা অনেক সময়েই হস্তগত হয়। যাহারা শিশুবোধকে স্বামী স্ত্রীর পত্র লিখিবার ধারায় "শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধনপ্রয়াসী" কিম্বা "পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীর তীর নিবাসিত, কলেবরাঙ্গ সম্মিলিত" প্রভৃতি উৎকট গদ্যের আদর্শ স্মরণ করিয়া অনুমান করেন, বাঙ্গলা প্রাচীন গদ্য সর্ব্বত্রই এইরূপ কুপাঠ্য ছিল, তাঁহাদিগের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য আমরা অনেকগুলি 'সহজিয়া' পুঁথির গদ্যের নমুনা দেখাইতে পারি। আমরা পুরাতন কাগজ খুঁজিতে খুঁজিতে বহুসংখ্যক চিঠি পাইয়াছি, তাহাতে গদ্যের যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাচীন গদ্য রচনা হতাদর করিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ নাই। ত্রিপুরা-রাজ্যের অনেকগুলি বাঙ্গলা ভাষায় রচিত দানপত্র (তাম্র ফলক) পাইয়াছিলাম, তাহাতে তৎপ্রদেশ প্রচলিত প্রাচীন কথাবার্ত্তার ভাষার নমুনা বিদ্যমান রহিয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্য দেব প্রদত্ত একখানি তাম্র-শাসনের ভাষা এইরূপ;—" ৭ স্বাস্ত শ্রীশ্রীযুক্ত গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমর বিজই মহা মহোদধি রাজনামদেশোহয়ং শ্রী-কারকোনবর্গে বিরাজতে হনতে। রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহের-কুল মৌজে ষোলনল অজ হামিলা জমা ১৵ আটার কাণি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্ম উত্তর দিলাম। এহার পাঁঠা পক্ষক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা সুখে ভোগ করোক। ইতি সন ১০৭৭ তে ১৯ কার্ত্তিক।" মৎ-সংগৃহীত এইরূপ একখানি প্রাচীন তাম্রফলক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লইয়া গিয়াছেন; সেখানি এখনও ফিরিয়া পাই নাই।

পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথির শেষে কখনও কখনও লেখকগণের বাঙ্গলা গদ্যরচনা পাওয়া যায়। সঞ্জয়রচিত মহাভারতের একখানি প্রাচীন পুঁথির শেষভাগে এই-রূপ লেখা আছে—"এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের এ-কোন পত্র অঙ্ক সাত শত উননর্ব্বই সমাপ্ত হইয়াছে। স্ব অক্ষরমিদং শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মাঃর ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামান্যতাক্রমে অন্ন পত্রে প্রতিপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধাহ হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম। নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম। তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাই-বারহ আজ্ঞা হইল। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬০৬ সন ১১২৪ তারিখ ২৫শে কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতি বার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত। মোকাম শ্রী.লগ্রাম, লেখকের নিজ গ্রাম।"

কিন্তু দুই তিন শত বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন গদ্যের নমুনা আমরা পাই নাই। এসিয়াটিক সোসাইটির ভ্রমণকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ "দেবভামরতন্ত্র" নামক একখানি তন্ত্রের মধ্যে বিকট শব্দ-সম্বলিত একরূপ গদ্যের কিছু নিদর্শন আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি মন্ত্রতন্ত্রের ভাষা বলিয়াই হউক, কিম্বা নিতান্ত

প্রাচীন বলিয়াই হউক, তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে আমরা নিতান্ত অক্ষম। ভাষা ভাবকে লুকাইবার জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই প্রবাদটি উক্ত রচনা সার্থক করিয়াছে।

'সহজিয়া' মতের পুঁথিগুলি ছাড়া আরও কয়েকখানি সহজ বাঙ্গালা গদ্যে রচিত পুঁথি সম্প্রতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র বিরচিত "গৌরীমঙ্গল" নামক একখানি পুঁথির প্রারম্ভে লিখিত আছে, "স্মৃতিভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মন" এই স্মৃতির গ্রন্থখানি অতি সহজ গদ্যে রচিত। অল্পদিন হইল 'বৃন্দাবনলীলা' নামক একখানি ১৫০ বৎসরের প্রাচীন গদ্য পুস্তক (খণ্ডিত) আমার হস্তগত হইয়াছে, আমি নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চারণ পাহাড়ি পর্ব্বতের উপরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন ধেনুবৎসের এবং উঠের এবং ছেলির এবং মহিশের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন জে দিবস ধেনু লইয়া শেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাসান গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিহ্ন হইয়াছিলেন। গয়াতে গোবর্দ্ধনে এবং কাম্যবনে এবং চরণ পাহাড়েতে এই চারি স্থানে চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু তরতম (তারতম্য?) নাঞী চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড় বেস শাহি তাহার উত্তরে ছোট বেস শাহি তাহাতে এক লক্ষীনারায়ণের এক সেবা আছেন, তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণে সেরগড়। * * * গোপিনাথজীর ঘেরার দক্ষিণ পশ্চিম নিধুবন চতুর্দ্দিগে পাকা প্রাচীর পূর্ব্বপশ্চিমা বন পশ্চিমদিগের দরওয়াজা কুঞ্জের ভিতর জাইতে বামদিগে এক অট্যালিকা অতি গোপনিয় স্থান অতি কোমল নানান পুষ্প বিকশিত কোকীলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন, বনের শৌন্দর্য্য কে বর্নন করিবেক শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে মহন্তের ও মহাজনের ও রাজাদিগের বহু কুঞ্জ আছেন। নিধুবনের পশ্চীমে কিছু দুর হয় নিভৃত নিকুঞ্জ যে স্থানে ঠাকুরাণীজী ও সখি সকল লইয়া বেশবিন্যাষ করিতেন, ঠাকুরাণিজীউর পদচিহ্ন অদ্যাবধি আছেন নিত্য পূজা হয়েন।" অচেতন পদার্থের প্রতি গভীর সম্মানসূচক ক্রিয়ার ব্যবহার এবং "নাঞী" প্রভৃতিরূপ অদ্ভুত বর্ণবিন্যাসদৃষ্টে বিস্মিত না হইলে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এ রচনা অনাড়ম্বর ও সহজ গদ্যের নমুনা। পরমভক্ত বৈষ্ণবলেখক যে শ্রীধাম বৃন্দাবনের অলিগলির প্রতি সম্মানসূচক পদ প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ নাই।

১৮৯২ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ক্যালকাটা ম্যাগাজিন পত্রিকায় মিঃ বেভারিজ সাহেব মহারাজ নন্দকুমারের যে কয়েকখানি বাঙ্গলা পত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, সেগুলির ভাষা অতি সহজ কিন্তু উহা দরবারের ভাষা, সমধিক পরিমাণে উর্দ্দু শব্দ মিশ্রিত।

একদিকে অধ্যাপক মহাশয়গণ বাঙ্গলা-ভাষা সমাস বিড়ম্বিত করিয়া এক হাস্যাস্পদ প্রহেলিকার সৃষ্টি করিতেছিলেন, যথা— "রে পাষণ্ড ষণ্ড এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড

দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ডভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসী-ন্যায় ভক্তিভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছে এবং গবাপণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জন্মিয়া গণ্ডকীস্থ গণ্ডশিলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছ,” এই অনুপ্রাস ভাষার কণ্ঠে অলঙ্কার হয় নাই, গলগণ্ড স্বরূপ হইয়াছে। অপরদিকে বৈষ্ণবগণ গদ্যকে অতি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত করিয়া সাহিত্যে প্রচলিত করিতেছিলেন, আমরা তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু সমাজের উর্দ্ধভাগে যেখানে হিন্দু বড়লোক মুসলমান সম্রাটের অনুগ্রহপ্রার্থী, যেখানে ব্রাহ্মণের মস্তকের টীকিটি পর্য্যন্ত মুসলমানী পাগড়ীর মধ্যে বিলীন হইয়াছিল, সেখানে যে বাঙ্গলা গদ্যে উর্দ্দু ভাষা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবেশলাভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মহারাজ নন্দকুমারের লিখিত পত্রের ভাষার নমুনা এইরূপ,—“অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া, আমার উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মকরর জানিবা। নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত, মজুমদারের লিখন-সম্বলিত মানুষ কাসেদ এথা পৌঁছে তাহা করিবা এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষাধিক জানিবা।” এই পত্র ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লিখিত হইয়াছিল।

ভাষার এই মিশ্ররূপ বাঙ্গলাখতের ধারায় যে ভাবে দৃষ্ট হয়, তদপেক্ষা হাস্যাস্পদ ও উদ্ভট রচনা কোন দেশের সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। ব্যক্তির নামটী লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী স্বার্থে “ক”টি “কস্য কর্জ্জপত্রমিদং” প্রভৃতি অংশে শুধু পূর্ব্বসংস্কারের খাতিরে বজায় রহিয়াছে। এ যেন হিন্দু-আমলের একটি সংস্কৃতের ঢেউ নবাবী দরবারের উর্দ্দুর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। এখানে ব্যাকরণ নিতান্তই অসমর্থ; সংস্কৃতের অনুস্বর ও বিসর্গ, টালমটাল প্রভৃতি উর্দ্দু শব্দের সহিত একাসনে বসিয়াছে, ব্রাহ্মণ যেন উপবীত ছিঁড়িয়া যবনের করমর্দ্দন করিতেছেন।

রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত, পুরুষ-পরীক্ষার অনুবাদ এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত “প্রবোধচন্দ্রিকা” প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকের ভাষা অনেকটা শিশুবোধকের স্বামী-স্ত্রীর পত্র লিখিবার আদর্শের মত। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়, এই কলেজের সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপকগণ বঙ্গভাষাকে সাধারণ পাঠকের অনধিগম্য করিতে বিশেষ প্রয়াস স্বীকার করেন, তাহা না করিলে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যাভিমান বৃথা হয়। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়গণ স্বীয় ঔদার্য্যগুণে বাঙ্গালার উপর এই যে একটু কৃপাকটাক্ষপাত করেন, দুঃখিনী বঙ্গভাষা কি তাহা চিরদিন মনে রাখিবে? ইতিমধ্যেই তাঁহাদের সাধুকীর্ত্তি লুপ্ত হইবার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত রাজীবলোচন কৃত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত সরল কথাবার্ত্তার ভাষায় লিখিত একখানি অতি মূল্যবান গদ্যপুস্তক। এই পুস্তকের ঐতিহাসিক বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে দু এক স্থলে আমাদের সন্দেহ জন্মিতে পারে, কিন্তু ইহা যে একজন সরল ও স্পষ্টভাষী, অনুসন্ধিৎসু প্রাজ্ঞ ব্যক্তির লেখা তাহা

আমরা অনায়াসে প্রচার করিতে পারি। এই পুস্তকখানি ঠিক বাঙ্গালীর নিজ ধরণে রচিত হইয়াছে, ইহার উপাখ্যানবস্তু এত সরস ও কৌতুকাবহ যে ইহা আরম্ভ করিলে শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া থাকা যায় না। ইহাতে ইংরেজশক্তির অভ্যুদয় সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান্ ও গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি, সিরাজউদ্দৌলার যৌবনকালের উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র, ইংরেজদিগের সঙ্গে নানাবিষয় লইয়া বিবাদের সূত্রপাত, পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় মৃত্যু প্রভৃতি বহু বিষয় অতি সুন্দর সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লেখক মহাশয় ইংরেজদিগের প্রতি অশেষ ভাবে অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াও অন্ধকূপহত্যার বিবরণটি বাদ দিয়াছেন।

এই প্রাচীন গদ্য পুস্তকখানি হইতে আমরা নিম্নে একটী অংশ উদ্ধৃত করিলাম;—"পরে ইঙ্গরাজের যাবদীয় সৈন্য পলাশীর বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। নবাবি সৈন্য সকল দেখিল যে প্রধান ২ সৈন্যেরা মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইঙ্গরাজের অগ্নি বৃষ্টিতে শত ২ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উন্মাক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেক আপনি কি করেন আপনার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব কহিলেন সে কেমন। মোহনদাস কহিল সেনাপতি মিরজাফরালি খান ইঙ্গরাজের সঙ্গে প্রনয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশীর বাগানে পাঠান আমি যাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন পূর্ব্বের দ্বারে যথেষ্ঠ লোক রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহনদাসকে পচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশিতে প্রেরিত করিলেন। মোহনদাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। মোহনদাসের যুদ্ধেতে ইঙ্গরাজ সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল। মীরজাফরালি খান দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না যদ্যপি মোহনদাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আমাদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবেক অতএব মোহনদাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে। ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া একজন লোককে পাঠাইলেন সে মোহনদাসকে কহিল আপনাকে নবাবসাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহনদাস কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না। মোহনদাস বিবেচনা করিল এসকল চাতুরী এ সময় নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল। মীরজাফরালিখান বিবেচনা করিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় একজনকে আজ্ঞা করিল তুমি ইঙ্গ-

রাজের সৈন্য হইয়া মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া মোহনদাসকে নষ্ট করহ। আজ্ঞা পাইয়া একজন মনুষ্য মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণ মোহনদাসকে মারিল সেই বাণে মোহনদাস.পতন হইল। পরে নবাবি যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল ইঙ্গরাজের জয় হইল॥

পরে নবাব স্রাজেরদোলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইঙ্গরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালিখান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইঙ্গরাজী পতাকা উঠাইয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল। তখন সমস্ত লোক জয় ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। যাবদীয় প্রধান ২ মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই২ কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন। মীরজাফরালিকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধানপূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিবা রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজালোক দুঃখ না পায়। সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পরে নবাব স্রাজেরদোলা পলায়ন করিয়া যান তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকট এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নবাব কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিত খাদ্য সামগ্রী দেও একজন মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিত আহার করিবেক। ফকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকট আসিয়া দেখিল অত্যন্ত নবাব স্রাজেরদোলা বিসন্নবদন। ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ণ করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ঠ নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনোমধ্যে করিয়া করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকিরের প্রিয় বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকিরের বাটিতে গমন করিলেন। ফকির খাদ্য সামগ্রির আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালী খানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাব স্রাজেরদোলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব জাফরালিখানের লোক এ সম্বাদ পাবামাত্রে অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া নবাব স্রাজেরদোলাকে ধরিয়া মুরসদাবাদে আনিলেক॥”

এইরূপ সরস, সহজ ও ভাবপ্রকাশোপযোগী গদ্য রাজা রামমোহনরায়ের পূর্ব্বেও এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ‘কামিনীকুমার’ নামক পদ্যগ্রন্থে একটি গদ্যাংশ আছে, তাহার অল্প একটুক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি;—“কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার আর কি কর্ম্ম করিবে কেবল হুঁকার কর্ম্মে সর্ব্বদা

নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোমাকে চোর চোর বলিয়া সর্ব্বদা বা কাঁহাতক ডাকি আজি হৈতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম। সদাগর কহিলেক যে আজ্ঞা মহাশয় এইরূপ কথোপকথনান্তে ক্ষণেক বিলম্বে কামিনী কহিলেক ওহে রামবল্লভ একবার তামাক সাজ দেখি রামবল্লভ যে আজ্ঞা বলিয়া তামাক সাজিয়া আলবোলা আনিয়া ধরিয়া দিলেক এই প্রকার রামবল্লভ তামাক সাজা কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজায় এমত অভ্যাস হইল যে রামবল্লভ যদ্যাপি ভোজনে কিম্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে যদি কামিনী বলে ওহে রামবল্লভ কোথায় গেলেহে রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি!"

এইরূপ নিদর্শন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ নহে! ইংরেজ প্রভাবে বঙ্গীয়গদ্যের সূচনা হইয়াছে—এধারণা নিতান্ত ভুল।

প্রাচীন কালে রচনা পদ্ধতিটা অনেক পরিমাণে পোষাকী গোছের ছিল, চলিত কথাবার্ত্তার ভাষা লিখিবার উপযুক্ত একথা যেন তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। এইজন্য কবিতাই তাঁহাদের মূলতঃ অবলম্বনীয় ছিল! ছেলেদের শিক্ষার জন্য আবশ্যক বিষয় গুলি যাহাতে সহজে মুখস্থ হয়,—সেদিকেও তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, এই হিসাবেও তাঁহারা কবিতার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন "কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিখো। কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিখো।" প্রভৃতি পদ উৎকট হউক না কেন, মুখস্থ করিবার পক্ষে ততদূর কঠিন নহে।

দ্বিতীয়তঃ ব্যাপার বাণিজ্য ও সংবাদ প্রচার উদ্দেশে গদ্য লেখার বিস্তৃত প্রচলন প্রয়োজনীয় হয়। এই দুই বিষয়েই হিন্দুগণ কতকটা উদাসীন ছিলেন, অন্ততঃ এই জীবন সংগ্রামে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুবিধার জন্য বাগ্দেবীর শরণাপন্ন হইতে হইবে, এই আবশ্যকতা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষমতা বিচ্যুত হইয়াছিলেন সুতরাং রাজগর্ব্বজ্ঞাপক ইতিহাস রচনা অথবা দরবারের আদেশ প্রচার জন্য অনুশাসন অথবা লিপি দেশে দেশে প্রেরণের আবশ্যক হয় নাই। ভগবানের প্রতি সরল ভক্তি প্রণোদিত, অনুরাগে দীপিত গান, ধর্ম্ম-কথা পূর্ণ পুরানোপথান, বেশী হইলে দেবদেবীর গৌরব প্রচারের জন্য স্বীয় গার্হস্থ জীবনের সুখ দুঃখ প্রেমময় কাহিনী—ইহাই তাঁহারা লেখনী দ্বারা সাধন করিতেন। গদ্যসাহিত্য যে হতাদৃত ছিল তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া গদ্যসাহিত্যের প্রচুর নিদর্শন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নাই ইহা বিবেচনা করা ভুল। ইংরেজী ভাবাজ্ঞ লেখকগণের রচনা অনেক স্থলে সহজ ও সুন্দর ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের সমকালিক এক ব্যক্তি তৎগ্রন্থ সমূহের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন ;—

"সর্ব্বদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দারা তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন।" এই রচনার সঙ্গে তুলনা করিলে প্রাচীন-গদ্য রচকগণের যশের কোন হানি হইবার আশঙ্কা নাই।

প্রাচীন গদ্যের কয়েকটি বিশেষ প্রণালী ছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। অনেক স্থলে গদ্য

রচনার পূর্ব্বে "গদ্যছন্দঃ" এই কথাটি লিখিত দেখা যায়। পদ্য রচনার যেরূপ ভণিতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল, গদ্য পুস্তকেও মধ্যে মধ্যে সেরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়, যথা কালীকৃষ্ণদাস রচিত কামিনী কুমারে— "কালীকৃষ্ণ দাস বলে পশ্চাৎ রামবল্লভের এমনি কস্ত হইল যে কামিনীকে আর পষ্ট রামবল্লভ বলিতে হয় না রাম বলিবা মাত্রেই রামবল্লভ তামাক সাজাইয়া মজুত।"

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচন্দ্র চরিতে দৃষ্ট হয় এক একটি প্যারাগ্রাফের শেষে দুইটি দাঁড়ি (॥) প্রদত্ত হইয়াছে এবং অধ্যায়াংশের মধ্যবর্ত্তী রচনায় যে সকল স্থানে সম্পূর্ণ বিরাম চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে সেই সকল স্থানে এক একটি দাঁড়ি (।) প্রদত্ত হইতে দেখা যায়। প্রাচীণ গদ্যরচনা গুলিতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ যে এখন অপ্রচলিত কিম্বা ভিন্নার্থ বোধক হইবে তাহা স্বাভাবিক; গদ্য পুস্তকে আমরা "সমাধান" —গুছান, "প্রকরণ"—কার্য্য,ঘটনা,— "খোদিত"- বিমর্ষ;"সমভিব্যাহৃত"—সঙ্গযুক্ত, "অন্তকরণে করা"—মনে করা, প্রভৃতি ভাবের অর্থে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। "দিগের" এই বিভক্তিটির পূর্ব্বে প্রায়শই একটি "র" প্রযুক্ত হইত, যথা "লোকের--দিগের" "ভৃত্যের দিগের" "পণ্ডিতের দিগের" এইরূপ প্রয়োগ রাজা রাম মোহন রায়ের গ্রন্থবলীতে এবং প্রাচীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সমূহেও অনেক পাওয়া যাইবে। প্রাচীন—পুঁথির বর্ণ বিন্যাসগুলির অদৃষ্ট পূর্ব্বরূপে এখন আমাদের আর বিস্ময় হয় না মনোনীত শব্দের স্থলে "মনোম্বিত" থাকিবে না—'থাখিবে না", কুটুম্ব—"কুতুম্ব", বটে—"ভটে", এক—"যেক", প্রভৃতি অনেক স্থলে দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষে সহিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র চরিতে কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই "মহামোহপধ্যায়" শব্দ ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই উপাধি সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেও সাবেকী বাঙ্গালায় ইহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল স্বীকার করিতে হইবে।

প্রাচীনকালের পত্র লিখিবার প্রণালী দেখাইবার জন্য আমরা এইস্থলে দুইখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব; প্রথম পত্রাংশ ৺দুর্গাপ্রসাদ মিত্রের লেখা ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এই পত্র লিখিত হয়*—দ্বিতীয় পত্রখানি ড্রেক সাহেবের নিকট সিরাজ উদ্দলা লিখিয়াছিলেন, উহা রাজীবলোচন যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল।

প্রথম পত্রাংশ—

সেবকস্য প্রণামা নিবেদনাঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে সেবকের মঙ্গল পরন্তু।—

সম্প্রতি একজন দেশস্থ লোক দ্বারা জানিলাম যে মহাশয় পুনর্ব্বার সংসার করিবেন এমত অভিলাষ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী পাত্রী অন্বেষণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতেছেন। এ বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়া যে প্রকার

* লিপি-সংগ্রহ গ্রন্থ

অন্তঃকরণে উদয় হইল তাহা নিষ্কপটে নিবেদন করিতেছি। ইহাতে যদি কিছু অপরাধ হয়, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

২য় পত্র।

"ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক অনেক শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন এবং পূর্ব্বে যেমন যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন এ সকলি প্রমাণ বটে কিন্তু সর্ব্বত্রেই রাজারদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তার রাজ্যের বাহুল্য হয় না এবং পরাক্রমেরও ত্রুটি হয়। আপনি রাজা নহেন মহাজন কেবল ব্যাপার বানিজ্য করিবেন ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন অতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠান তবে ভালই নতুবা আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন, কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণ তাহাই দিবেন আমি আপন চাকরের দিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুক্ত কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবেক কিন্তু আর আর যত সাহেব লোকেরা বানিজ্য করিতেছেন তাহারদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেচক সৎপরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি।

সমগ্র মহাভারতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিষ্কলঙ্ক মহচ্চরিত্রে এক মাত্র কলঙ্কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের প্ররোচনায় দ্রোণাচার্য্যের বধসৌকর্য্যার্থ যুধিষ্ঠির আচার্য্যকে মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন। পুত্রস্তে দয়িতো নিতং সোঽশ্বত্থামা নিপাতিতঃ॥ শেতে বিনিহতো ভূমৌ বনে সিংহশিশুর্যথা। 'আপনার সেই প্রিয়তম পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়া অরণ্যশায়ী সিংহ শিশুর ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।' স্পষ্টাক্ষরে এই মিথ্যা কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা নামাক হস্তী সেই সময় নিহত হইয়াছিল। অব্যক্তমব্রবীদ্রাজা হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত। 'রাজা অস্পষ্টাক্ষরে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন।'

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের শেষোক্ত অস্ফুট বাক্য আচার্য্যের শ্রুতিগোচর হয় নাই। ভীম যখন বলিয়াছিলেন যে অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন তখন দ্রোণাচার্য্য সংশয়ান্বিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সংশয়ভঞ্জনের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করেন। সত্যসন্ধ, সত্যপ্রাণ, চিরসত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের কথায় সংশয়শূন্য হইয়া আচার্য্য ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু এই ঘটনা মৌলিক অথবা প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা ভাষণে প্রবৃত্তি দিয়া কৃষ্ণের চরিত্রে যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে তাহা মহাভারতের আদি মহাকবির অভিপ্রেত মনে হয় না, কারণ মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রের সহিত এরূপ আচরণের কোন মতে সামঞ্জস্য হয় না। শিক্ষাগুরু আচার্য্য ব্রাহ্মণকে নিধন করিবার জন্য যে যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলিবেন, ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যুধিষ্ঠিরের চরিত্র আলোচনা করিলে তাঁহার পক্ষে এরূপ আচরণ কোন মতে সম্ভবপর বোধ হয় না। যিনি রাজ্যরক্ষার্থ বা কোনরূপ স্বার্থের জন্য ধর্ম্মের সরল, সূক্ষ্ম পথ হইতে কোন কালে কেশমাত্র বিচলিত হয়েন নাই, তিনি যে এক দিনের যুদ্ধ জয়ের জন্য, কুরু-পাণ্ডবপূজিত অস্ত্রাচার্য্য দ্রোণকে মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহার মৃত্যু সাধন করিবেন ইহা অত্যন্ত অপ্রাকৃত ও অসম্ভব। যে কালে লোকের বিকৃত কল্পনায় কৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্ক প্রবেশ করে, ও ন্যায়ের অপেক্ষা কৌশলের অধিক মর্য্যাদা হয় সেই সময় দ্রোণবধের এই বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

যুধিষ্ঠিরের আদর্শ চরিত্রে দ্যূত ক্রীড়ায় অনুরাগ প্রধান ও একমাত্র দুর্ব্বলতা। এ বিষয়ে সংশয়ের স্থান নাই, কারণ কুরুপাণ্ডবে বিবাদ ও কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের ভিত্তি এই দ্যূত ক্রীড়ায়। যুধিষ্ঠিরের দ্যূতানুরাগ মিথ্যা হইলে মহাভারতের মূল ঘটনাই প্রমাণশূন্য হইয়া পড়ে। যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে আর কোন দোষ ছিলনা কেবল দ্যূতাশক্তিই একটী মহৎ দোষ ছিল। এই দোষই রাজ্যনাশ প্রভৃতি সকল অনর্থের মূল, এবং ঘোর যুদ্ধে প্রবল রক্তপাতে এই আসক্তির প্রায়শ্চিত্ত হয়। মহাভারতে এবং অপর প্রাচীন গ্রন্থে রাজাদিগের চতুর্ব্বিধ ব্যসনের উল্লেখ আছে —প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দুরোদর অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়া, চতুর্থ অথবা বিষয়ে অত্যনুরাগ। যুধিষ্ঠিরের এই তৃতীয় ব্যসন ব্যতীত আর কোন দোষ ছিল না। কিন্তু এই ব্যসন এত প্রবল ছিল যে দ্যূত ক্রীড়ায় একবার মত্ত হইলে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। তাঁহার এই আসক্তিই মহাভারতের ঘটনাবলীর কেন্দ্রস্থল।

সভাপর্ব্বের দ্যূত পর্ব্বাধ্যায় হইতে প্রকৃত পক্ষে মহাভারতের ঘটনাচক্রের আবর্ত্তন আরম্ভ হইল। শকুনি ও যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়া কিরূপে সমাপ্ত হয় সেই সম্বন্ধে কিছু সন্দিহান হইতে হয়। মহাভারতের প্রথম রচনাকালে অনুদ্যূত পর্ব্বাধ্যায় ছিল কি না, অথবা ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত, এই প্রশ্ন বিচার ও মীমাংসা যোগ্য। একবার দ্যূতে পরাজিত হইয়া, দ্রৌপদীর দারুণ অপমান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুগ্রহে রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, যুধিষ্ঠির রাজধানীতে

প্রত্যাগমন করিলেন। পুনর্ব্বার দুর্য্যোধন ও শকুনির নিমন্ত্রণে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা সহসা সম্ভবপর মনে হয় না। দ্যূতে অত্যন্ত আসক্তি থাকিলেও যুধিষ্ঠির শকুনি ও দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি জানিতে না পারিয়াই ক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার কিন্তু তাঁহার সে অজ্ঞতা ছিল না। এবং দ্রৌপদী ও অপর পাণ্ডবগণ যে দ্বিতীয়বার যুধিষ্ঠিরকে নিষেধ করিবার চেষ্টা করেন নাই, ইহাও অসম্ভব বোধ হয়। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের স্বভাব যেরূপ ক্রূর তাহাতে তিনিও যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার পাত্র ছিলেন না। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব পণের পরিবর্ত্তে বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের পণ হয় ও তাহাতে যুধিষ্ঠির পুনরায় পরাজিত হন। দ্যূত পর্ব্বাধ্যায়ের তুলনায় অনুদ্যূত পর্ব্বাধ্যায় বৈচিত্র্যশূন্য ও রসহীন, এবং প্রধান ঘটনাগুলি পূর্ব্ব পর্ব্বাধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

এই দ্যূত পর্ব্বাধ্যায় যদি মহাভারতের ভিত্তিস্বরূপ বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে যেমন আকাশভেদী অটল অট্টালিকা তাহার উপযুক্ত ভিত্তি হইয়াছে। অল্প পরিসরের মধ্যে, এই কয়েক পৃষ্ঠায়, যেরূপ নানা রসের সমাবেশ, ঘাত প্রতিঘাত, মানবহৃদয়ের স্ফুলিঙ্গক্ষেপী সংঘর্ষ, ক্রীড়ার ছলনা হইতে সর্ব্বনাশের পরিণতি, রমণীর নিগ্রহ, পণবদ্ধ বীরের ভবিষ্য প্রতিশোধের ভীষণ শপথ, এবং অলৌকিক শক্তির বিকাশ রহিয়াছে, কাব্যে ও সাহিত্যে তাহা স্বভাব বিরল। এই এক অধ্যায়ে মহাকাব্যের বহুবিধ উপাদান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বাল্যকাল হইতে দুর্য্যোধন পাণ্ডবশ্রী-কাতর। যুধিষ্ঠিরের রাজগৌরব তাহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছিল। ধূর্ত্তশ্রেষ্ঠ মাতুল শকুনির সহিত অন্ধ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, পাণ্ডবদিগের রাজ্যসম্পত্তি আমি আর দর্শন করিতে পারি না, হয় তাহাদিগের রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিব, না পারি যুদ্ধে শরীরপাত করিব। দুর্য্যোধন ঈর্ষাপূর্ণ হইলেও যুদ্ধ ব্যতীত রাজ্যলাভের আর কোন উপায় তাহার মনে উদিত হয় নাই। ক্ষত্রিয়াধম শকুনি জানিতেন যে, যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়া ব্যাসক্ত, সেই ক্রীড়ায় তাঁহার রাজ্যহরণ করা সহজ হইবে। অক্ষবিদ্যায়, শঠতায় শকুনি অদ্বিতীয়। ক্ষাত্র ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দ্যূতধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। নির্লজ্জের মত বলিলেন, 'পণ আমার ধনু, অক্ষ শর।'

ধৃতরাষ্ট্র প্রথম কিঞ্চিৎ আপত্তি করিলেন, কিন্তু পুত্রের রাজ্যলাভ আশায় অন্ধও লুব্ধ হইয়াছিলেন। পাছে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হয় এই তাঁহার ভয়, ধর্ম্মভয় বড় ছিল না। তাঁহার আদেশেই হেমবৈদূর্য্যখচিত, সহস্রস্তম্ভশোভিত সভা নির্ম্মিত হইল। বিদুর অন্ধ রাজাকে এই সংকল্প হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন, ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

দ্যূত যে অনর্থের মূল, কলহের আকর, যুধিষ্ঠির তাহা অবগত ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত বিদুরকে এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি অক্ষদেবন উচিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন? বিদুর স্পষ্ট বলিলেন, তিনি অক্ষক্রীড়া অনুমোদন করেন

না, ধৃতরাষ্ট্রকেও নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের পক্ষে আত্মশ্লাঘা ও আত্মনিন্দা তুল্য নিন্দনীয়। যুধিষ্ঠির সে উপদেশ বিস্মৃত হইয়া, অক্ষক্রীড়ায় স্বীয় নিপুণতা স্মরণ করিয়া সহসা আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ব্যতীত কোন্ কোন্ অক্ষদেবী তথায় বিদ্যমান আছেন? বলুন, আমি তাহাদিগকে শতবার পরাজয় করিব।' অবশেষে বলিলেন, পুত্রপক্ষপাতী ধৃতরাষ্ট্রের কথায় তিনি দ্যূতক্রীড়ায় স্বীকৃত হইতেছেন না, কেবল বিদুরের কথায় সম্মত হইতেছেন! বিদুর আদৌ তাঁহাকে সে পরামর্শ দেন নাই, ধৃতরাষ্ট্রের নিয়োগে তাঁহাকে আহ্বান করিতে আসিয়াছিলেন। অবশেষে দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির আপনার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। 'যদি আমাকে সভামধ্যে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না; যখন আহূত হইয়াছি তখন নিবৃত্ত হইব না; ইহাই আমার সনাতন ব্রত।' এই ক্রীড়ায় যে অনর্থ ঘটিবে, তাহা দূরদর্শী, ধীমান্ যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কারণ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে হস্তিনানগরে গমনকালে বলিলেন, 'তেজ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, দৈব সেইরূপ প্রজ্ঞাকে হরণ করে; সমস্ত মনুষ্যই পাশবদ্ধের ন্যায় বিধাতার বশবর্তী হইয়া থাকে।'

হস্তিনাপুরে উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠির প্রথমে শকুনিকে দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। পাশক্রীড়া রাজনীতি নহে, ধূর্তের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া পাপজনক, যুদ্ধে জয়লাভ শ্রেয়স্কর, ইত্যাকার কয়েকটা কথা বলিলেন। কিন্তু এগুলি মুখের কথামাত্র, হৃদয়ের নহে। যেরূপ মদ্যপায়ী পানের পূর্বে সুরার নিন্দা করে, ও তৎপরেই সুরাপানেই উন্মত্ত হয়, সেইরূপ। যদি দুরোদরে অভিরুচি না থাকিবে তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃবৃন্দসহকারে স্বীয় রাজধানী হইতে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন কেন? শকুনি যুধিষ্ঠিরকে ব্যঙ্গ ও শ্লেষপূর্বক বলিলেন 'যদি আমাকে নিতান্তই ধূর্ত বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি দ্যূতক্রীড়ায় একান্তই ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে দ্যূত হইতে বিরত হও।'

যুধিষ্ঠিরের মৌখিক অনিচ্ছা তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইল। কহিলেন, 'দ্যূতে আহূত হইলে নিবৃত্ত হইব না, এই আমার নিত্যব্রত।' অতঃপর ক্রীড়ার আয়োজন আরম্ভ হইল। দুর্যোধন কহিলেন, আমি সমুদয় ধন ও রত্ন প্রদান করিব, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'একজনের প্রতিনিধি হইয়া অন্যের ক্রীড়া আমার মতে নিতান্ত অসঙ্গত; যাহা হউক, ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।' অসঙ্গত বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, অথবা দুর্যোধনের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রতিনিধি নিয়োগ করিলেন না। যে ব্রতের তিনি বার বার উল্লেখ করিতেছিলেন, সেই সনাতন ব্রতের অনুসারে তিনি দুর্যোধনের সহিত ক্রীড়া করিতে বাধ্য, দুর্যোধনের প্রতিনিধির সহিত নহে। দুর্যোধন পণের সামগ্রী দিবেন, অথচ দুর্যোধনের ধূর্ত মাতুল ক্রীড়া করিবেন এ কিরূপ

দ্যূত হইল? এরূপ অবস্থায় যদি যুধিষ্ঠির ক্ষান্ত হইতেন অথবা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন দোষ স্পর্শ করিত না। কিন্তু ব্যসনকে কে ত্যাগ করিতে পারে? একবার দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে যুধিষ্ঠিরের হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না। গৃধ্র, শকুনি, ঋক্ষ ব্যাঘ্র যে কেহ সম্মুখে আসুক, তিনি তাহারই সহিত দ্যূতে মত্ত হইতেন। কপটচারী শকুনি ও ক্রূরকর্মা দুর্যোধন এ বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।

দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরে অক্ষক্রীড়া হইলে দুর্যোধন নিশ্চিত পরাজিত হইতেন। শকুনি কেবল ক্রীড়ায় পারদর্শী নহেন, কপটতা ও ছলনায় সিদ্ধহস্ত। এই ক্রীড়া যে স্নায়সঙ্গত হয় নাই, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যেমন নলের শরীরে কলি প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অক্ষমালায় দুর্দৈব অধিষ্ঠিত হইলেন। শকুনি যে অক্ষবলেও কিছু কৌশল করিয়া থাকিবেন এরূপ মনে হয়, কারণ দ্যূতক্রীড়ায় যেরূপ অনিশ্চিয়তা থাকে এ ক্রীড়ায় তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যতবার অক্ষ বিক্ষিপ্ত হইবে, ততবার শকুনির জয় হইবে ইহাই স্থির। এমন কি পণ ও প্রতি-পণ ব্যতীত অক্ষক্রীড়া হয় না, কিন্তু এ ক্রীড়ায় তাহারও কোন উল্লেখ নাই। প্রথম বার অক্ষবিক্ষেপের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমি যাহা দ্বারা ক্রীড়া করিবে, সে প্রতিপণের বস্তু কৈ?' দুর্যোধন কহিলেন, 'আমার বহুতর মণি ও অন্যান্য ধন আছে, কিন্তু তন্নিমিত্ত অহঙ্কার করি না।' অথচ প্রতিপণ করিলেন না। অতঃপর প্রতিপণের নামোল্লেখও হইল না। যুধিষ্ঠির একবারও অক্ষ বিক্ষেপ করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি কেবল পণ করিতে লাগিলেন ও শকুনি অক্ষবিক্ষেপে জয় করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অক্ষবিক্ষেপ বা দুর্যোধন কর্ত্তৃক প্রতিপণ-করণও একবারও ঘটে নাই।

এই প্রথম বার অক্ষদেবনের, অর্থাৎ বন ও অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া ক্রীড়া করি-বার পূর্ব্বে, বিংশতিবার অক্ষ বিক্ষিপ্ত হইয়া-ছিল। এই বিংশতি বিক্ষেপ আবার দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম দশ বার অক্ষ বিক্ষেপ হইলে বিদুর, দুর্যোধন ও শকুনিকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়া, যুধিষ্ঠিরকে ক্রীড়া হইতে বিরত হইতে বলিলেন। এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বিরোধের আশঙ্কা হয় নাই। যুধিষ্ঠির রাজভাণ্ডারের নানাবিধ ধনরত্ন পণ রাখিতেছিলেন এবং শকুনি একে একে জিনিয়া লইতেছিলেন। সভাস্থলে চারিজন পাণ্ডব নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন; দ্রৌপদী পুরমধ্যে কুরুবধূদিগের সহিত প্রীতিপূর্ণ আলাপ করিতেছিলেন। ক্রীড়ার এই সন্ধি ও বিচ্ছেদস্থলে, এবং এই সভার শান্তি মধ্যে বিদুর দুর্নিমিত্ত দেখিতে পাইতেছিলেন। ঝটিকার পূর্ব্বে যেমন আকাশ শান্ত হয় সেইরূপ প্রথম দশবার অক্ষবিক্ষেপের সময় কাহারও মনে কোন শঙ্কা হয় নাই। ক্রমশঃ যুধিষ্ঠিরের পণ ভিন্ন আকার ধারণ করিতে লাগিল। দ্বাদশ বারে তিনি পশুসমূহ পণ রাখিলেন। ত্রয়োদশ পণে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্ত প্রজা গেল, চতুর্দশে সভাস্থিত চারি পাণ্ডবের অঙ্গভূষণ ও অলঙ্কার গেল। পঞ্চ-দশ বারে নকুলকে পণ রাখিলেন। এতক্ষণ

শকুনি কেবল আমি জিতিলাম এই কথা বলিয়া অক্ষবিক্ষেপ করিতেছিলেন, কিন্তু এখন যুধিষ্ঠিরকে হৃতসর্ব্বস্ব দেখিয়া ও ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ উৎপাদন করিবার মানসে কহিলেন, 'এই তোমার প্রিয়, রাজপুত্র নকুল আমাদের বশীভূত হইল, এক্ষণে আর কি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিবে?'

এ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের মনে কোনরূপ আত্মগ্লানি বা নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় নাই। গো, অশ্ব, ধেনু, ছাগ প্রভৃতি যে সকল পণ রাখিয়াছিলেন, নকুলকেও সেইরূপ পণ করিলেন। কিন্তু সহদেবকে পণ রাখিবার সময় বিচলিত হইলেন, শকুনিকে বলিলেন, 'সহদেব আমার নিতান্ত প্রিয় ও পণের অযোগ্য হইলেও ইহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।' অযোগ্য পণ বলিয়া যুধিষ্ঠির ক্ষণমাত্র বিরত হইলেন না। মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে জয় করিয়া শকুনি পুনরায় ভ্রাতৃবিচ্ছেদের চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, 'ভীম ও ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দনদ্বয় অপেক্ষাও প্রিয়তর। উহাঁদিগকে কখনই পণ রাখিতে পারিবে না।' সুবলনন্দনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'রে নয়ানভিজ্ঞ মূঢ়! আমরা সাতিশয় সরলস্বভাবসম্পন্ন; তুমি আমাদিগের পরস্পর ভেদ করিয়া দিবার অভিলাষ করিয়া নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ।' শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বিদ্রূপ করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় ও ভীমসেন পণে গৃহীত হইলে শকুনি বলিলেন, 'হে কৌন্তেয়! তুমি বহুবিধ ধন, হস্তী ও অশ্বসমুদয় এবং অনুজগণকে দুরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে যদি অন্য কিছু ধন থাকে ত বল।'

যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ আপনাকে পণ রাখিয়া স্বয়ং জিত হইলেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ক্রীড়ারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মূকের ন্যায় ছিলেন। যুধিষ্ঠির যে দ্যূতে মত্ত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিয়াও তাঁহারা কোন কথা কহেন নাই। ভীমার্জ্জুন গো মেষের ন্যায় দ্যূতের পণস্বরূপ জিত হইলেন। কিন্তু অগ্রজের প্রতি তাঁহাদিগের এমন অচলা ভক্তি যে তাঁহারা কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক কথা পর্য্যন্তও কহিলেন না। পুরুষানুক্রমে যে শিক্ষায় গুরুজনের প্রতি এরূপ ভক্তি জন্মিয়াছিল এক্ষণে তাহা স্বপ্নতুল্য বিবেচনা হয়। কিন্তু পাণ্ডবদিগের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা এ পর্য্যন্ত সমাপ্ত হয় নাই।

যুধিষ্ঠিরকে জয় করিয়া শকুনি ক্ষান্ত হইলেও হইতে পারিতেন, কিন্তু দুর্য্যোধন প্রভৃতির মনস্তুষ্টি সাধন এবং পাণ্ডবদিগের মর্ম্মান্তিক অপমান করিবার নিমিত্ত তিনি সে অবস্থাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে রাজন্! তোমার প্রণয়িনী দ্রৌপদী ত এখনও পরাজিত হয়েন নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত কর।'

দ্যূতোন্মত্ততা যুধিষ্ঠিরকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল। দ্রৌপদীকে পণ রাখা কতদূর গর্হিত কর্ম্ম তাহা বিবেচনা করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। শকুনির বাক্য শ্রবণ মাত্র দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন। অপমান জ্ঞান দূরে থাকুক, পাঞ্চালীকে সগর্ব্বে সভামধ্যে বর্ণনা করিলেন। দ্রুপদনন্দিনীর অলোকসামান্য রূপ গুণ সাহঙ্কারে ঘোষিত করিলেন।

কিন্তু তিনি যে পণের অযোগ্য সে কথার একবারও উল্লেখ করিলেন না। 'যাঁহার রূপ লক্ষ্মীর ন্যায়; গাত্রে পদ্মগন্ধ; যিনি অনৃশংসতা, সুরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদিতা ও ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির হেতুভূতা প্রভৃতি ভর্ত্তার অভিলষিত গুণসমুদায়ে বিভূষিতা; যাঁহার সস্বেদ মুখপঙ্কজ মল্লিকার ন্যায়; সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।' অক্ষ বিক্ষেপমাত্র শকুনির জয় হইল।

অক্ষগর্ভে যে অনর্থের উপায় হইতেছিল তাহা বজ্রের ন্যায় সহসা পতিত হইল। সেই শব্দশূন্য মহতী সভা সহসা সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গিত, চঞ্চল, কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল। বৃদ্ধদিগের ধিক্কার, ভূপতিগণের শোকোচ্ছ্বাস, ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবদিগের আনন্দ, এককালে বহুবিধ শব্দ সভা হইতে উত্থিত হইল। কেবল পাণ্ডবগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির রহিলেন।

দুর্যোধনের আদেশক্রমে সূতপ্রতিকামী যখন দ্রৌপদীকে সভায় আহ্বান করিতে গমন করিল, কহিল দ্যূতক্রীড়ায় দুর্যোধন তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের নিকট জয় করিয়াছেন, ও দুর্যোধনের গৃহে তাঁহাকে কিঙ্করীরূপে থাকিতে হইবে তখন দ্রৌপদী সে কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মনে করিলেন প্রাতিকামী প্রলাপ বাক্য কহিতেছে। 'কোন্ রাজপুত্র পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাজা দ্যূতমদে মত্ত হইয়াছেন; তাঁহার কি অন্য কোন পণ রাখিবার দ্রব্য ছিল না?' প্রাতিকামী যখন বুঝাইয়া বলিল যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পত্নীপণ রাখিয়াছিলেন, তখন দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজের হৃদয়ের গতি জানিতে চাহিলেন। 'তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন?'

যুধিষ্ঠিরের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া দ্রৌপদী সভাগণের নিকট স্বীয় কর্ত্তব্য জানিতে চাহিলেন। এই স্থলে পাণ্ডবদিগের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'মহাত্মা পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা 'বমূঢ় হইলেন।' প্রাতিকামী দ্রৌপদীর প্রতি বল প্রকাশ করিতে পারিবে না জানিয়া দুর্যোধন দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন, 'তুমি স্বয়ং গিয়া যাজ্ঞসেনীকে আনয়ন কর, অবশ শত্রুগণ তোমার কি করিতে পারিবে?' পাণ্ডবগণ যদি অবশ না হইবে তাহা হইলে কি দুঃশাসন বা দুর্যোধন দ্রৌপদীর অপমান করিয়া জীবিত থাকিত? দুঃশাসন একবসনা, স্ত্রীস্বভাবসম্পন্না পাঞ্চালীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভায় আনয়ন করিল। সভামধ্যে আনীত হইয়া, যুগপৎ লজ্জায় ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া দ্রৌপদী সভাস্থ সকলকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কেবল যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিলেন না। দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি তাঁহাকে দাসী দাসী বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। সভার মূর্ত্তি ভিন্নরূপ হইয়া গেল।

শকুনি ও দুর্যোধনের মন্ত্রণা, যুধিষ্ঠিরকে সুহৃদের ন্যায় দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ ও এই ভীষণ পরিণাম মহাভারত মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ। যে হুতাশন কুরুক্ষেত্রে শোণিত-স্রোতে নির্ব্বাপিত হইল তাহার প্রথম শিখা এই সভাগৃহে দ্যূতক্রীড়ায় জ্বালিত হইয়াছিল।

যে অর্জ্জুন ত্রয়োদশ বর্ষ পরে গোগৃহ

যুদ্ধে সমবেত কুরুসৈন্য ও মহারথীদিগকে একাকী নির্জ্জিত করিয়াছিলেন তিনি পত্নী দ্রৌপদীর এই অপমান দেখিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। কিন্তু পাণ্ডবেরা সকলে তুল্যভাবে ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণসম্পন্ন ছিলেন না। প্রচণ্ড কোপনস্বভাব ভীম পণে পরাজিত বলিয়া দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনকে কিছু বলিতে পারিলেন না, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদনমুক্ত অগ্নির ন্যায় তাঁহার ক্রোধ অকস্মাৎ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়া যুধিষ্ঠিরকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। যুধিষ্ঠিরকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, গৃহস্থিত সামান্যা নারীকেও, দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না। আমাদের সমুদায় সম্পত্তি এবং 'তোমাকে ও আমাদিগকে শত্রুগণ দ্যূতে পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অধীশ্বর বলিয়া আমি তাহাতেও ক্রোধ করি নাই।' কিন্তু পাণ্ডবপ্রনয়িনী বালা দ্রৌপদীর ক্লেশ তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সহদেবকে কহিলেন, ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর, যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিব। যুধিষ্ঠিরের বাহুর প্রতি ক্রোধ কারণ হস্ত দ্বারা অক্ষবিক্ষেপ করিতে হয়। দুই বাহু ভস্মসাৎ হইলে যুধিষ্ঠির আর কখন দ্যূতক্রীড়া করিতে পারিবেন না।

অর্জ্জুন বৃকোদরকে কহিলেন; তোমার আত্মবিস্মৃতি হইতেছে, শত্রুগণের দ্বারা তোমার ধর্ম্মগৌরব বিনষ্ট হইবে। 'শত্রুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না, ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করিও না।' ভীমের ক্রোধ শান্ত হইল। ইহাই বীরত্বের পরাকাষ্ঠা। শত্রুদিগের ইচ্ছা ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পাণ্ডবেরা কিছুতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। সর্ব্বস্ব গেল, স্বাধীনতা ঘুচিল, সভামধ্যে পত্নীর অপমান হইল কিন্তু ভ্রাতৃপ্রণয় গেল না পাণ্ডবের ভ্রাতৃস্নেহ, ভক্তি ও প্রণয় জগতে আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিল।

দৈত্যকুলে যেমন প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে বিকর্ণ ছিলেন। তিনি বয়ঃ কনিষ্ঠ, একজন্য বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে দ্রৌপদীর অবস্থা বিচার করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা কেহ কিছু বলেন না দেখিয়া তিনি বলিলেন, ব্যাসক্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম হইতে দূরীভূত হয়েন। এরূপ ব্যক্তির কার্য্য অপ্রামাণিক। তৎপরে বিকর্ণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কূট ন্যায়ের কয়েকটী কথা বলিলেন। 'এই অনিন্দিত রমণী পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্য্যা অধিকন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার পূর্ব্বে স্বয়ং পরাজিত হইয়া উহাতে স্বত্ববর্জ্জিত হইয়াছেন; এদিকে শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণার নামোল্লেখ করিতেছেন; এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।' বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মাধিকরণে এরূপ যুক্তি উপস্থিত হইলে তাহা অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানা তর্ক উপস্থিত হইত সে বিষয়ে সংশয় নাই।

বিকর্ণের এই কথায় সভা মধ্যে অত্যন্ত কোলাহল সমুত্থিত হইল। যাঁহারা স্বয়ং কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই তাঁহারাও শকুনির নিন্দা করিতে লাগিলেন। সভায় মতভেদ উপস্থিত হইয়া শকুনির দ্যূতক্রীড়ায় ফল ব্যর্থ হয় এই আশঙ্কায় কর্ণ বিকর্ণের যুক্তি খণ্ডন করিলেন। কর্ণকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া মহাকবি

অতি গূঢ় কোশলের পরিচয় দিয়াছেন। দ্রৌপদী কর্ণের মুখ্যাতুল্য ভ্রাতৃবধূ. কিন্তু আত্মজন্মবৃত্তান্ত অবগত না থাকাতে রাধেয় ভ্রাতৃবধূকে অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া রহস্য করিতে লাগিলেন। অজ্ঞাতকৃত অপরাধ মার্জ্জনীয়, কিন্তু কাব্যাংশে এই ঘটনা অতুলনীয়। প্রাতঃস্মরণীয়া সেই সাধ্বীকে কর্ণ বারস্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তাঁহাকে বিবসনা করা আশ্চার্য্যের বিষয় নহে। দুঃশাসনকে পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর সমুদায় বস্ত্র গ্রহণ করিতে বলিলেন। পাণ্ডবেরা এই কথা শুনিবা মাত্র উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিয়া, একমাত্র বহির্ব্বাস ধারণ করিয়া সভা মধ্যে অবনত মস্তকে উপবিষ্ট হইলেন। তখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর এক মাত্র পরিধেয় বসন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইল।

মহাকবির তুলিকা চিত্রিত সেই সর্ব্বলোক-বিস্ময়কর অপূর্ব্ব চিত্র যুগে যুগে জগতের চক্ষে সমোজ্জল বর্ণে জাগিয়া রহিবে। শ্লোকা-বলী পরিকীর্ত্তিত সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য যেন কল্পনার প্রয়োজন হয় না। সহস্র স্তম্ভশোভিত, হেমবৈদূর্য্য-খচিত, শতদ্বার-বিশিষ্ট তোরণস্ফটিকা নাম্নী মহতী সভায় ভূপতিগণ এবং ভারতবংশীয় কুরুপাণ্ডব উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বিক্ষিপ্ত অক্ষবলের সম্মুখে কুটিল চক্ষু, হাস্যমুখ শকুনি তাঁহার সম্মুখে লজ্জাবনত মুখে যুধিষ্ঠির। দ্যূতোন্মত্ততা পূর্ণ হইয়াছে, দুয়োদর মুখে সর্ব্বস্ব গিয়াছে, পত্নীর লজ্জারক্ষণ স্বরূপ পতিধর্ম্মও যায়, আর কি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিবেন? এক পরলোক মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন যদি দুর্য্যোধন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন নূতন দ্যূতক্রীড়ায় তিনি কি প্রতিপণ রাখিবেন তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দিবেন? উত্তরীয়শূন্য পাণ্ডবগণ এক পার্শ্বে আসীন, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছেন, কেবল ভীমসেনের ওষ্ঠাধর বিস্ফুরিত ও মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে এবং ঘূর্ণায়মান চক্ষু দুঃশাসন ও দ্রৌপদীর অভিমুখে ফিরিতেছে। সভাসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, বিস্ফারিত স্পন্দহীন লোচনে চাহিয়া রহিয়াছেন। সভা মধ্যস্থলে দুঃশাসন হস্ত প্রসারিত পূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিহিত এক মাত্র বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করি-তেছে। কৌরবগণ, শকুনি, রাধেয় প্রভৃতি হাস্য করিতেছে, কেবল এক মাত্র বিকর্ণ মুখ বিবর্ত্তন করিয়াছেন। দ্বারে সূত প্রাতি-কামীগণ ত্রস্তলোচনে চাহিয়া রহিয়াছে। লোচনহীন ধৃতরাষ্ট্র উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। সেই ক্ষুব্ধ সভার মধ্যমণিস্বরূপ পাঞ্চালনন্দিনী! বেপমান শরীরযষ্টি, প্রাণ ভয়ে নহে, লজ্জা ভয়ে। বহু সহস্র বর্ষ পরে রাজস্থানে রমণীগণ লজ্জা রক্ষার্থ হাস্যমুখে অনল কুণ্ডে আত্মসমর্পণ করিতেন তাঁহারও ক্ষত্রিয়বধূ, কিন্তু দ্রৌপদীর তেজের নিকট তাঁহাদিগের তেজ কোথায়? প্রাণত্যাগ ত তুচ্ছ কথা, লজ্জাত্যাগের ভয়ে দ্রৌপদী ভীতা হইতেছেন। তাঁহার এক মাত্র লজ্জাবস্ত্র দুরাত্মা দুঃশাসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। একবস্ত্রা, অধোনিবী, আলুলায়িত, আকর্ষণ-ক্ষুব্ধকুন্তলা, অবগুণ্ঠিতাননা, রোরুদ্যমানা পাণ্ডবদয়িতা সেই মহা বিপদের সময় কি করিতেছেন? ত্রয়োদশ বর্ষ পরে কীচক

যখন তাঁহার অপমান করে তখন তিনি নিশা কালে ভীমসেনকে কীচক বিনাশের ভার দিয়া আসিলেন। এক্ষণে পতিগণের সাক্ষাতে দ্রৌপদী অশরণা, পাণ্ডবদিগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই। ঘোর বিপদের সময় যাঁহাকে ডাকিতে হয়, যিনি অশরণের শরণ তাঁহাকেই দ্রৌপদী ডাকিতেছেন। 'হে মহাযোগিন্! বিশ্বাত্মন্! জনার্দ্দন, গোবিন্দ, দুঃখনাশন, লজ্জানিবারণ, আমার লজ্জা রক্ষা কর! আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর! দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিল। কৌরবগণ ব্যতীত সভাস্থ সকলে দ্রৌপদীকে আসন্নবগ্নতা আশঙ্কা করিয়া চক্ষু নত করিলেন। সহসা একি হইল! দুঃশাসনের হস্তে বস্ত্র আসিল বটে কিন্তু দ্রৌপদী ত বিবস্ত্রা হইলেন না। দুঃশাসন আবার টানিল, আরও বস্ত্র আসিল, কিন্তু দ্রৌপদীর কোন অঙ্গ ত বস্ত্রশূন্য হইল না! বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া দুঃশাসন আবার টানিল, দুই হস্তে ক্রমাগত বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল, তথাপি তদ্রূপ। একবসনা দ্রৌপদী অক্ষয়বসনা হইলেন। আকর্ষণ করিয়া দুঃশাসন নানা বর্ণের নানাবিধ বস্ত্র স্তূপাকার করিল, কিন্তু দ্রৌপদীর লজ্জাবস্ত্র হরণ করিতে সক্ষম হইল না। সভাসুদ্ধ লোক চমৎকৃত হইয়া, নির্নিমেষ নয়নে মায়েশ্বরের এই মায়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া, লজ্জিত হইয়া, দুঃশাসন নিরস্ত হইল।

এই অলৌকিক কার্য্যে, সেই উৎকট আনন্দের সময়েও, কৌরবের অদৃষ্টাকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার হইল। মেঘ গর্জ্জনের তুল্য ভীমসেন কহিলেন, 'যদ্যপি আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই ভারতাধম পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুধির পান না করি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্ব্বপুরুষগণের গতিপ্রাপ্ত না হই।' এই ভীষণ শপথ শ্রবণ করিয়া ভীমকে নরশোণিতপায়ী রাক্ষস মনে হয় না, পরন্তু ভীষণ অপমানের ভীষণ প্রতিশোধগ্রাহী বীর মনে হয়। আবার যখন দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে উরু প্রদর্শন করিলেন তখন ভীম সেই উরু গদাঘাতে ভগ্ন করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। ক্ষত্রিয়ের অভিশাপ ক্ষত্রিয় স্বহস্তে পূর্ণ করিতেন। কি দ্যূতক্রীড়ায়, কি গৃহকার্য্যে, কি রণক্ষেত্রে, কথা কখন টলিত না। দেবতার বজ্র ব্যর্থ হইত, পুরুষের বাক্য কদাপি ব্যর্থ হইত না।

কৌরবের অদৃষ্টাকাশ এই দ্যূত সভায় গর্জ্জিত মন্দ্রীভূত মেঘে আবৃত হইল; উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে তাহাদের মস্তকে অশনিসম্পাত হইল; কুরুক্ষেত্রে তাহারা দগ্ধভস্ম হইয়া গেল।

দ্রৌপদীর অপমান দূর করিবার নিমিত্ত যখন ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিতে চাহিলেন তখন দ্রুপদনন্দিনী আত্মমুক্তি প্রার্থনা করিলেন না, যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন এই বর চাহিলেন। উদার চরিত্রের এতদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ রমণীকুলে কেন, মানবকুলে দুর্লভ।

বনবাস পূর্ণ হইলে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে বিরাট রাজভবনে অজ্ঞাত বাসের নিমিত্ত উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠির আপনাকে যুধিষ্ঠিরের রাজ সভাস্থ কঙ্ক নামক অক্ষদেবী বলিয়া পরিচয় দিলেন।

সে পর্য্যন্ত তাঁহার দ্যূতাসক্তি বিরক্তিতে পরিণত হয় নাই, অথবা সেই ব্যসনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি এই কর্ম্ম স্বীকার করিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু তিনি যে দ্যূতে পারদর্শী এ জ্ঞান অপনীত হয় নাই।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই চরিত্রদুর্ব্বলতা মহাভারতকার মহাকবির অনভিপ্রেত নহে'। কিন্তু ইহা কলঙ্কস্বরূপ নহে। ইহাতে যুধিষ্ঠিরের মানবত্ব প্রমাণিত হইতেছে। কিছু মাত্র ত্রুটী না থাকিলে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র মানব চরিত্র অতিক্রম করিত। এই দুর্ব্বলতা ছিল বলিয়াই আমরা বলিতে সাহস পাই যে যুধিষ্ঠির মনুষ্য, দেবতা নহেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

(ক)

আলোচনা।

(রচনাসম্বন্ধে জুবেয়ারের বচন।)

রসজ্ঞ ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ ফরাসী ভাবুক জুবেয়ারের সহিত ইংরাজি পাঠকদের প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন।

যখন যাহা মনে আসিত জুবেয়ার তাহা লিখিতেন কিন্তু প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার রচনা প্রবন্ধরচনা নহে, এক একটি ভাবকে স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। পদ্যে যেমন সনেট, যেমন শ্লোক, গদ্যে এই লেখাগুলি তেমনি।

জুবেয়ারের বাক্সে দেরাজে এই লেখা কাগজ সকল স্তূপাকার হইয়াছিল; তাঁহার মৃত্যুর চোদ্দ বৎসর পরে এ গুলি ছাপা হয়; তাহাও পাঠকসাধারণের জন্য নহে, কেবল বাছা বাছা অল্প গুটিকয়েক সমজদারের জন্য।

জুবেয়ার নিজের রচনার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন আমি কেবল বপন করি, নির্ম্মাণ বা পত্তন করি না। অর্থাৎ তিনি ভাবগুলিকে পরস্পর গাঁথিয়া কিছু একটা বানাইয়া তোলেন না, সজীব ভাবের বীজকে এক একটি করিয়া রোপন করেন।

সংসার সর্ব্বদাই চারিদিকে মুঠা মুঠা করিয়া ভাবের বীজ ছড়াইয়া দিতেছে—কিন্তু সকল ক্ষেত্র উর্ব্বর নহে, সকল ক্ষেত্র চষা হয় নাই, সকল ক্ষেত্র খোলা পড়িয়া নাই। সেই জন্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শত সহস্র বীজ মাটি হইয়া যায়।

জুবেয়ার তাঁহার চিত্তক্ষেত্রটি খোলা হাওয়া এবং খোলা আলোকে এমনি করিয়া চষিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সংসার অহরহ যে বীজ বৃষ্টি করিতেছে তাঁহার মনে তাহা ভাবে

অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত, এবং ছোট ছোট লেখা গুলি এক একটি সোনার শীষের মত সম্পূর্ণ হইয়া ফলিয়া থাকিত।

কোন কোন মনস্বী আপনার মনটিকে ফলের বাগান করিয়া রাখেন, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ চিন্তা ও চর্চ্চার দ্বারা চিত্তকে আবৃত করেন; চতুর্দ্দিকের নিত্যবীজবর্ষণ তাঁহাদের মনের মধ্যে অনাহূত ও অবারিত ভাবে স্থান পায় না।

জুবেয়'রের মন সে শ্রেণীর ছিল না, তাঁহার চিত্ত ফলের বাগান নহে,ফসলের ক্ষেত্র। সে ফসল নানাবিধ। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কলারস, সাহিত্য কত কি তাহার ঠিক নাই।

অদ্য আমরা সাহিত্য ও রচনাকলা সম্বন্ধে এক অঞ্জলি সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।

জুবেয়ার নিজের সম্বন্ধে বলেন, "যাহা জানিবার ইচ্ছা ছিল তাহা শিক্ষা করিতে বৃদ্ধবয়সের প্রয়োজন হইল, কিন্তু যাহা জানিয়াছি তাহা ভালরূপে প্রকাশ করিতে যৌবনের প্রয়োজন অনুভব করি।"

অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য চেষ্টাজাত অভিজ্ঞতা চাই কিন্তু প্রকাশকের জন্য নবীনতা আবশ্যক। লেখার বিষয়টির মধ্যে চিন্তার পরিচয় যত থাকে ততই তাহার গৌরব বাড়ে কিন্তু রচনার মধ্যে চেষ্টার লক্ষণ যত অল্প থাকিবে তাহার প্রকাশশক্তি ততই অধিক হইবে।

জুবেয়ার নিজে যে রচনাকলা অবলম্বন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বলিতেছেন:— তোমরা কথার ধ্বনির দ্বারা যে ফল পাইতে চাও আমি কথার অর্থদ্বারা সেই ফল ইচ্ছা করি; তোমরা কথার প্রাচুর্য্যের দ্বারা যাহা চাও আমি কথার নির্ব্বাচনের দ্বারা তাহা চাই, তোমরা কথার সঙ্গতির দ্বারা যাহা চাও আমি কথার পৃথক্‌করণের দ্বারা তাহা লাভ করিতে প্রয়াসী। অথচ সঙ্গতিও (harmony) ইচ্ছা করি কিন্তু তাহা স্বভাবসিদ্ধ যথাযোগ্য সঙ্গতি; জোড়া গাঁথার নৈপুণ্যমাত্রের দ্বারা যে সঙ্গতি রচিত তাহা চাই না।

বস্তুতঃ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ও লিপিকুশল লেখকের প্রভেদ এই যে এক জনের রচনায় সঙ্গতি এমন স্বাভাবিক এবং অখণ্ড যে, তাহা বিশ্লেষণ করাই শক্ত, অপরের রচনায় সঙ্গতি ইটের উপর ইটের ন্যায় গাঁথা ও সাজানো। প্রথমটি অজ্ঞাতসারে মুগ্ধ করে, দ্বিতীয়টি বিন্যাসনৈপুণ্যে বাহবা বলায়।

তর্কযুদ্ধ সম্বন্ধে জুবেয়ার বলেন—তর্ক বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা যতটুকু তাহার ঝঞ্ঝাট তদপেক্ষা অনেক বেশি। বিরোধ মাত্রেই চিত্তকে বধির করিয়া ফেলে। যেখানে অন্য সকলে বধির আমি সেখানে মূক।

জুবেয়ার বলেন, কোন কোন চিত্ত নিজের জমিতে ফসল জন্মাইতে পারে না কিন্তু জমার উপরিভাগে যে সার ঢালা থাকে সেইখান হইতেই তাহার শস্য উঠে।

আমাদের কথা মনে পড়ে। আজকাল আমাদের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইতেছে সে কি যথার্থ আমাদের মনের ভিতর হইতে—না, ইংরাজি য়ুনিবার্সিটি গাড়ি বোঝাই করিয়া আমাদের প্রকৃতির উপরিভাগে যে সার বিছাইয়া দিয়াছে সেইখান হইতে? এ সম্বন্ধে তর্ক তুলিলে বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে অতএব মূক থাকাই ভাল।

সমালোচনা সম্বন্ধে জুবেয়ারের কতক-

গুলি মত নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"পূর্ব্বে যাহা সুখ দেয় নাই তাহাকে সুখকর করিয়া তোলা এক প্রকার নূতন সৃজন।" এই সৃজনশক্তি সমালোচকের।

"লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য্য। লেখার বিশুদ্ধ নিয়ম রক্ষা হইয়াছে কিনা তাহারই খবরদারী করা তাহার ব্যবসাগত কাজ বটে কিন্তু সেইটেই সব চেয়ে কম দরকারী"

"অকরুণ সমালোচনায় রুচিকে পীড়িত করে এবং সকল দ্রব্যের স্বাদে বিষ মিশাইয়া দেয়।"

"যেখানে সৌজন্য এবং শান্তি নাই সেখানে প্রকৃত সাহিত্যই নাই। সমালোচনার মধ্যেও দাক্ষিণ্য থাকা উচিত—না থাকিলে তাহা যথার্থ সাহিত্য শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না।"

"ব্যবসাদার সমালোচকরা আকাটা হীরা বা খনি হইতে তোলা সোনার ঠিক দর যাচাই করিতে পারে না। তাহারা বণিক্ কিনা সেইজন্য সাহিত্য টাঁকশালের চলতি টাকা পয়সা লইয়াই তাহাদের কারবার। তাহাদের সমালোচনায় দাঁড়িপাল্লা আছে কিন্তু নিকষপাথর অথবা সোনা গলাইয়া দেখিবার মুচি নাই।"

"সাহিত্যের বিচারশক্তি অতি দীর্ঘকালে জন্মে এবং তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ অত্যন্ত বিলম্বে ঘটে।"

"কাঁচ লইয়া সমালোচকদের উন্মত্ত উৎসাহ, তাহাদের আক্রোশ, উত্তেজনা, উত্তাপ হাস্যকর। বাক্যসম্বন্ধে তাহারা এমন ভাবে লেখে, কেবল ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধেই যাহা শোভা পায়! সাহিত্য মনোরাজ্যের জিনিষ, তাহার সহিত মনোরাজ্যের আচার অনুসারেই চলা উচিত, রোষের উদ্দীপনা পিত্তের দাহ সেখানে অসঙ্গত।"

রচনাবিদ্যার সম্বন্ধে জুবেয়ারের উপদেশগুলি নিম্নলিখিত হইল :—

"অধিক ঝোঁক দিয়া বলিবার চেষ্টাতেই নবীন লেখকদের লেখা নষ্ট হয়, যেমন অধিক চড়া করিয়া গাহিতে গেলে গলা খারাপ হইয়া যায়। বেগ, কণ্ঠ, ক্ষমতা এবং বুদ্ধির মিতপ্রয়োগ করিতে শেখাই রচনাবিদ্যা—এবং উৎকর্ষলাভের সেই একমাত্র রাস্তা।"

"সাহিত্যে মিতাচরণেই বড় লেখককে চেনা যায়। শৃঙ্খলা এবং অপ্রমত্ততা ব্যতীত প্রাজ্ঞতা হইতে পারে না এবং প্রাজ্ঞতা ব্যতীত মহত্ত্ব সম্ভবপর নহে।"

"ভাল করিয়া লিখিতে গেলে স্বাভাবিক অনায়াসতা এবং অভ্যস্ত আয়াসের প্রয়োজন।"

পূর্ব্বোক্ত কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, ভাল লেখকের লিখন শক্তিটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই শক্তিটাকে বিচারের দ্বারা পদে পদে নিয়মিত করাটা অভ্যাসসাধ্য। সেই স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে যখন এই অভ্যস্ত শক্তির সম্মিলন হয়, তখনি যথার্থ ভাল লেখা বাহির হয়। ভাল লেখক অনায়াসেই লিখিতে পারে, কিন্তু লিখিবার জন্য পদে পদে আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে।

"প্রাচুর্য্যের ক্ষমতাটা লেখকের থাকা চাই, অথচ তাহা ব্যবহার করিয়া যেন সে অপরাধী না হয়! কারণ, কাগজ ধৈর্য্যশীল, পাঠক ধৈর্য্যশীল নহে; পাঠকের ক্ষুধা

অপেক্ষা পাঠকের মুখ মরিয়া যাওয়াকেই বেশি ভয় করা উচিত।

"প্রতিভা মহৎকার্য্যের সূত্রপাত করে কিন্তু পরিশ্রম তাহা সমাধা করিয়া দেয়।"

"একটা ভাল বই রচনা করিতে তিনটি জিনিষের দরকার:—ক্ষমতা, বিদ্যা এবং নৈপুণ্য। অর্থাৎ স্বভাব, পরিশ্রম এবং অভ্যাস।

"লিখিবার সময় কল্পনা করিতে হইবে যেন বাছা বাছা কয়েকজন সুশিক্ষিত লোকের সম্মুখে উপস্থিত আছি অথচ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছি না।"

অর্থাৎ লেখা কেবল বাছা বাছা লোকের পড়িবার যোগ্য হইলে হইবে না; তাহা জনসাধারণের উপযুক্ত হইবে অথচ বিশিষ্ট মণ্ডলীর পছন্দ সই হওয়া চাই।

"ভাবকে তখনি সম্পূর্ণ বলা যায় যখন তাহা হাতের কাছে প্রস্তুত হইয়া আসে—অর্থাৎ যখন তাহাকে যেমন ইচ্ছা পৃথক্ করিয়া লওয়া এবং যেখানে ইচ্ছা স্থাপন করা যায়।"

অধিকাংশ লোকেরই মনে অধিকাংশ ভাব জড়িতমিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তাহাদিগকে আকারবদ্ধ ও পৃথক্ করিয়া লইতে না পারিলে বিশেষ কাযে লাগানো যায় না। জুবেয়ার নিজে সর্ব্বদাই তাঁহার ভাবগুলিকে আকার ও স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটিকে যেন ব্যবহার যোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার মনের প্রত্যেক ভাবের সহিত স্পষ্ট পরিচয় স্থাপন করাই তাঁহার কাজ ছিল।

"রচনা কালে, আমরা যে, কি বলিতে চাই তাহা ঠিকটি জানি না, যতক্ষণ না বলিয়া ফেলি। বস্তুতঃ কথাই ভাবকে সম্পূর্ণতা এবং অস্তিত্বদান করে।"

"ভাল সাহিত্য গ্রন্থে উন্মত্ত করে না—মুগ্ধ করে।"

"যাহা বিস্ময়কর তাহা একবার মাত্র বিস্মিত করে, যাহা মনোহর তাহার মনোহারিতা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে।"

লেখার ষ্টাইল্ সম্বন্ধে জুবেয়ারের অনেকগুলি বচন আছে। কিন্তু ষ্টাইলকে বাঙ্গলায় কি বলিব?

চলিত শব্দ হইলেই ভাল হয়,—আলঙ্কারিক পরিভাষা সর্ব্বদা ব্যবহার যোগ্য হয় না। বাঙ্গলা "ছাঁদ" কথা ষ্টাইলের মোটামুটি প্রতিশব্দ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার দোষ এই যে শুধু ছাঁদ কথাটা ব্যবহার বাঙ্গলায় রীতি নহে। বলিবার ছাঁদ, লিখিবার ছাঁদ ইত্যাদি না বলিলে কথাটা সম্পূর্ণ হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় স্থল বিশেষে রীতিশব্দে ষ্টাইল বুঝায়। যথা, মাগধীরীতি, বৈদর্ভীরীতি ইত্যাদি। মগধে যে বিশেষ ষ্টাইল প্রচলিত তাহাই মাগধীরীতি, বিদর্ভের প্রচলিত ষ্টাইল বৈদর্ভীরীতি। এইরূপ, ব্যক্তিবিশেষের লেখায় তাঁহার একটি স্বকীয় রীতিও থাকিতে পারে—য়ুরোপীয় অলঙ্কারে সেই ষ্টাইলেরই বহুল আলোচনা দেখা যায়।

তথাপি অনুবাদ করিতে বসিলে দেখা যাইবে—রীতি অথবা ছাঁদ সর্ব্বত্রই ষ্টাইলের প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ করিলে ভাষার প্রথাবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। একটি উদাহরণ দিই—জুবেয়ার বলিয়াছেন, ষ্টাইলের চালাকিতে ভুলিয়ো না (Beware of tricks of

Style) এস্থলে "রীতি" অথবা "ছাঁদ" ঠিক এভাবে চলেনা। কিন্তু একটু ঘুরাইয়া বলিলে কাজ চালান যায়;—লেখার ছাঁদের মধ্যে যদি চালাকী থাকে তাহা দেখিয়া ভুলিয়ো না—অথবা, লিখনরীতির চাতুরীতে ভুলিয়ো না! কিন্তু যেখানে ষ্টাইল কথাটা ব্যবহার করিলে সুবিধা পাওয়া যাইবে, সেখানে আমরা প্রতিশব্দ বসাইবার চেষ্টা করিব না।

"ডুসোল্ট বলেন, মনের অভ্যাস হইতে ষ্টাইলের উৎপত্তি। কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির অভ্যাস হইতে যাহাদের ষ্টাইল গঠিত তাহারাই ধন্য।"

অনুবাদে আমরা সাহস করিয়া "প্রকৃতি" শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি। মূলে যে কথা আছে তাহার ইংরাজি প্রতিশব্দ "Soul"। এ স্থলে "আত্মা" কথা বলা যায় না তাহার দার্শনিক অর্থ অন্য প্রকার। এখানে "সোল্" শব্দের অর্থ এই যে, তাহা মনের ন্যায় আংশিক নহে। মন তাহার অধীন। মন হৃদয় ও চরিত্র তাহার অঙ্গ—এই "সোল্" শব্দ দ্বারা মানসিক সমগ্রতা প্রকাশ হইয়েছে। "অন্তঃপ্রকৃতি" শব্দ দ্বারা যদি এই অখণ্ড মানসতন্ত্রের ঐক্যটি না বুঝায় তবে পাঠকরা উপযুক্ত শব্দ ভাবিয়া লইবেন। জুবেয়ারের কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, মন ত চিন্তার যন্ত্র, তাহার চালনা দ্বারা কৌশল শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন মানুষটির দ্বারা যে ষ্টাইল গঠিত হয় তাহাই ষ্টাইল্ বটে। সেই লিখনরীতির মধ্যে কেবল চিন্তার প্রভাব নহে, সমস্ত মানুষের একটি সম্পূর্ণ প্রভাব পাওয়া যায়।

'মনের অভ্যাস হইতে নৈপুণ্য, প্রকৃতির অভ্যাস হইতে উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণতা।"

ভাল লেখকমাত্রেরই একটি স্বকীয় লিখনরীতি থাকে—কিন্তু বড় লেখকের সেই রীতিটি পরিষ্কার ধরা শক্ত। তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ অনির্দ্দিষ্টতা থাকে। এ সম্বন্ধে জুবেয়ার লিখিতেছেন: "যাহাদের ভাবনা ভাষাকে ছাড়াইয়া যায় না, যাহাদের দৃষ্টি ভাবনাকে অতিক্রম করে না, তাহাদেরই লিখনরীতি অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"

মহৎ লেখকদের ভাষা অপেক্ষা ভাবনা বড় হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের মানসদৃষ্টি তাঁহাদের ভাবনাকেও অতিক্রম করিয়া যায় তাঁহারা যুক্তিতর্ক চিন্তাকে লঙ্ঘন করিয়া অনেক জিনিষ সহজে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহাদের রীতি বাঁধা ছাঁদা কাটা ছাঁটা নহে, তাহার মধ্যে একটি অনির্দ্দেশ্যতা অনির্ব্বচনীয়তা থাকিয়া যায়।

"সুকথিত রচনার লক্ষণ এই যে, ঠিক যেটুকু আবশ্যক তার চেয়ে সে অধিক বলে অথচ যেটি বলিবার নিতান্ত সেইটিই বলে; ভাল লেখায় একই কালে প্রচুর এবং পরিমিত, ছোট এবং বড় মিশ্রিত থাকে। এক কথায় ইহার শব্দ সংক্ষিপ্ত, অর্থ অসীম।"

"অতিমাত্রায় ঠিকঠাকের ভাবটা ভাল নয়, —কি সাহিত্যে কি আচরণে শ্রী রক্ষা করিয়া চলিতে গেলে এই নিয়ম স্মরণ রাখা আবশ্যক।"

"কোন কোন রচনারীতির এক প্রকার পরিষ্কার খোলাখুলি ভাব আছে, লেখকের মেজাজ হইতে তাহার জন্ম। সেটা আমাদের ভাল লাগিতে পারে কিন্তু সেটা চাইই চাই এমন কথা বলা যায় না।

ভল্টেয়ারের লেখার এই গুণ, কিন্তু পুরাতন লেখকদের রচনায় ইহা দেখা যায় না। অতুলনীয় গ্রীক সাহিত্যের ষ্টাইলে সত্য, সুষমা, এবং সৌহার্দ্দ্য ছিল কিন্তু এই খোলা খুলি ভাবটা ছিলনা। সৌন্দর্য্যের কতকগুলি মুখ্য উপাদানের সঙ্গে এই গুণটি ঠিক মিশে না। প্রবলতার সঙ্গে ইহা খাপ খাইতে পারে কিন্তু মর্য্যাদার সঙ্গে নহে। এই গুণটির মধ্যে এক প্রকার সাহসিকতা ও স্পর্দ্ধা আছে বটে কিন্তু তেমনি ইহার মধ্যে কেমন একটা খাপ ছাড়া খিট্‌খিটে ভাবও আছে।"

"যাহারা অর্দ্ধেক বুঝিয়াই সন্তুষ্ট হয় তাহারা অর্দ্ধেক প্রকাশ করিয়াই খুসি থাকে; এমনি করিয়াই দ্রুত রচনার উৎপত্তি।"

"নবীন লেখকেরা মনটাকে টহলায় বেশি কিন্তু খোরাক অতি অল্পই দেয়।"

"কাচ যেমন, হয়, দৃষ্টিকে সাহায্য করে, নয়, ঝাপ্‌সা করিয়া দেয়, কথা জিনিষটিও তেমনি।"*

"এক প্রকারের কেতাবী ষ্টাইল্ আছে যাহার মধ্যে কাগজেরই গন্ধ পাওয়া যায়, বিশ্বসংসারের গন্ধ নাই; পদার্থের তত্ত্ব যাহার মধ্যে দুর্ল্লভ, আছে কেবল লেখকীয়ানা।"

বই জিনিষটা ভাব প্রকাশ ও রক্ষার একটা আধারমাত্র। কিন্তু অনেক সময় সেই নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। তখন সে বই পড়িয়া মনে হয় এ কেবল বই পড়িতেছি মাত্র, এ শুধা কেবল লেখা। ভাল বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি; ভাব এবং তত্ত্বের সহিত মুখামুখী পরিচয় হয়, মধ্যস্থ পদার্থটা চোখেই পড়ে না।

"অনেক লেখক আপনার ষ্টাইলটাকে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজাইতে থাকে, লোককে জানাইতে চায় তাহার কাছে সোনা আছে বটে।"

এ রকম লেখক আপনার ভাব সম্পত্তি লইয়া স্থির থাকিতে পারে না। একটা ভাল কিছু হাতে আসিলে সেটাকে শান্তভাবে ধরিয়া তৃপ্তি পায় না—সেটাকে বারবার বাজাইয়া তুলিতে চায়। আমাদের দেশে একদল লেখকের মধ্যে উচ্চধর্ম্মনীতি এবং হরিভক্তি লইয়া কিছু বেশি ঝমঝমানি শুনা যায়—তাহাতে, যে হরিভক্তি ভাল জিনিষ তাহার প্রমাণ হয় না কিন্তু লেখকের যে তাহা আছে ইহাই জাহির করিবার চেষ্টা প্রকাশ পায়।

"দুর্ল্লভ আশাতীত ষ্টাইল্ ভাল, যদি জোটে কিন্তু আমি পছন্দ করি যে ষ্টাইলটিকে ঠিক প্রত্যাশা করা যায়।"

এ কথাটির মধ্যে গভীরতা আছে। অভাবনীয় আশাতিরিক্ত সৌন্দর্য্যকে ভাল বলিতেই হইবে তথাপি তাহা মনের ভারস্বরূপ, তাহাতে শ্রান্তি আনে। কিন্তু যেখানে যেটি আশা করা যায় ঠিক্ সেইটি পাইলেই মন শান্তি ও স্বাস্থ্য অনুভব করে, তাহাকে বিস্ময় বা সুখের ধাক্কায় বারম্বার আহত করিয়া ক্ষুব্ধ করে না। বাঙ্গলায় যে বচন আছে, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। তাহারও এই অর্থ। স্বস্তির মধ্যে যে শান্তি ও গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ধ্রুবত্ব আছে, সুখের মধ্যে তাহা নাই। এইজন্য বলা যাইতে পারে সুখ ভাল বটে কিন্তু স্বস্তি তাহার চেয়েও প্রার্থনীয়।

(খ)

অনুবাদ।

"ভালবেসো চিরকাল"

(Victor Hugo হইতে)

ভালবেসো চিরকাল, ভালবাসো অনুক্ষণ,
চলে' গেলে ভালবাসা আশা করে পলায়ন।
ভালবাসা সেতো সেই ঊষার প্রাণের তান,
ভালবাসা যামিনীর বিমল মঙ্গল গান।

তটিনী তটের কানে, যে গান গাহিয়া বয়,
প্রাচীন গিরির কাছে, যে কথা অনিল কয়,
তারকা মেঘের পানে, যে কথাটি কয় হাসি
—কথাতীত কথা সেই 'এসো দোঁহে ভালবাসি'।

ভালবাসা দেয় প্রাণ—দেয় চিন্তাবল,
ভালবাসা আনে প্রাণে বিশ্বাস অটল।
মধুর কিরণ দিয়া, তোলে হৃদি উত্তেজিয়া,
যশো ভাতি হতে তাহা অধিক উজ্জ্বল
—সে শুধু আনন্দছটা—আনন্দ বিমল।

ভালবাসো স্তুতিনিন্দা না করি' খেয়াল
মহান্ হৃদয় ভালবাসে চিরকাল।
প্রাণের তারুণ্য আর বুদ্ধির যৌবন
উভয়ে উভয়সহ কর সম্মিলন।

ভালবাসো—সুখে যাতে কাটেগো জীবন,
দেখা যায় যাতে তব ও চারু নয়নে
নিগূঢ়-নিহিত যত বিলাস-বিভ্রম
—গভীর রহস্য যত তব স্মিতাননে।

এসো ভালবাসি দোঁহে আরো বেশি করি',
প্রতিদিন গাঢ়তর হউক মিলন।
পল্লবেতে দিন দিন তরু যায় ভরি'
—তেমনি মোদের প্রেম হউক বর্দ্ধন।

যেন মোরা দুই দোঁহে ছায়া দরপণ
যেন দুই দোঁহে মোরা কুসুম সৌরভ।
এক ছায়াতলমাঝে যুগল মিলন
—দুই ভিন্ন প্রাণী কিন্তু একই অনুভব।

রূপসীর রূপ খোঁজে কবি চারিদিকে,
নারী সে যে দেবী—চাহে বিশুদ্ধ প্রেমিকে।
—আপনি অঞ্চলছায়ে করে প্রশমন
সুবিপুল ললাটের চিন্তার দহন।

এসো কাছে সুন্দরি লো চিত্ত-পরশিনি!
তুমি নিধি, তুমি বিধি, মম হৃদিপুরে।
এসো কাছে দেবি ওগো! গাহিবে যখনি,
যখন কাঁদিবে দুখে—থেকো নাগো দূরে।

আমরাই বুঝি তব প্রাণের উল্লাস,
কবি-প্রাণে নাহি রুচে কভু উপহাস।
কবিরাই রমণীর মঙ্গল-কলস
—যাহে ঢালি দেয় নারী হৃদি-প্রেমরস।

আমি যে গো এ জগতে, ধ্রুব চিরসত্য শুধু
করি অন্বেষণ,
আর সব শূন্যগর্ভ, তরল তরঙ্গ জানি
করিগো বর্জ্জন।

চাহিনা চাহিনা আমি উন্মাদী বিভব,
সৈনিকের যশ কিম্বা রাজার গৌরব,
আমি চাহি শুধু তব তনু-স্নিগ্ধছায়া
—পুঁথি মোর ঢাকো যবে নোয়াইয়া কায়া।

যশোমান উচ্চ আশা আঁখির নিমেষে
হুহু করি ওঠে জলি' হৃদয়-প্রদেশে।
পরে সব ভস্মপ্রায়, ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়,
তখন বলিগো "হায়! কি রহিল শেষে।"

সুখ সে কুসুমসম বসন্তে বিকাশে,
ফুটিয়া অমনি ঝরে নিঠুর বাতাসে
—কি গোলাপ, কি পঙ্কজ, কিবা নাগেশ্বর—
তখন বলিগো "হায়! সব হল শেষ"।

প্রীতি শুধু বাকি এবে—নারি! দেবী তুমি,
মলিন জঘন্য অতি এই মর্ত্ত্যভূমি।
যদি চাও ইষ্টদেবে করিতে রক্ষণ,
রক্ষিতে চাহগো যদি আত্মারে আপন,
যদি চাহ রাখিবারে ধরম অক্ষত,
পবিত্র প্রেমেরে রক্ষা কোরোগো সতত।

হৃদিমাঝে রক্ষা কর নির্ভীক-পরাণ
—হোক্‌না যতই কষ্ট—হৃদয়-বেদন—
সেই হুতাশন যাহা না হয় নির্ব্বাণ
—সেই সে কুসুম যাহা না জানে মরণ॥

গ্রন্থ-সমালোচনা।

(গ)

লিপি সংগ্রহ। ৺ দুর্গাপ্রসাদ মিত্রের পত্র। শ্রীবিনোদ বিহারী মিত্র সঙ্কলিত। মূল্য ॥৵০ আনা।

এই পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বাবু যে বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। পত্রলেখক ৺ দুর্গাপ্রসাদ মিত্র, রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক লোক। সঙ্কলনকারী বিনোদ বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে "এই সকল পত্র ইংরাজী ১৮২১ সাল হইতে ১৮২৫ সালের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। তখন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়গণ নিতান্ত শিশু ছিলেন।" সেই সময়েও কেমন সুন্দর বাঙ্গালা লিখিত হইতে পারিত, তাহার পরিচয় আমরা রাজা রামমোহন রায়ের রচনা হইতে ও সমালোচ্য পুস্তক হইতে পাইতে পারি। রচনার প্রশংসা করিতেছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, এই পুস্তকের রচনাপদ্ধতি ও বর্ত্তমান রচনা-পদ্ধতি ঠিক্ একই জিনিষ। তাহা হইলে ত এই পত্রগুলিকে আমরা জাল মনে করিতাম। কিন্তু এগুলি যে জাল নহে, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। রচনার শালীনতাও এই সকল পত্রের প্রধান গুণ নহে। ইহাদের প্রধান গুণ—সংসার জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা ও প্রগাঢ়তা এবং লেখকের ভাবের উদারতা ও সমীচিনতা এই "লিপিসংগ্রহে" যে সকল উপাদেয় ও সুন্দর কথা আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান আমাদের নাই। থাকিলেও, বোধ হয় তাহা করিতাম না। আমাদের অভিলাষ, আমাদের পাঠকবর্গ ও সাধারণে এই পুস্তকক্রয় করিয়া পাঠ করেন। অর্থনাশ ও মনস্তাপ, ইহার কোনটারই বেদনা অনুভব করিতে হইবে না।

ষটচক্র ও ষটচক্র গীতাবলি। শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যে যোগ-শাস্ত্রের একটি নিগূঢ় বিষয়াত্মক, তাহা পুস্তকের নামেই বুঝা যায়। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীর নাম এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান প্রভৃতি বায়ুর নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু এই সকল নামে কি বুঝায়, তাহা কেহ জানেন

কি? গ্রন্থকার স্বয়ং কি এই সকল নাড়ী ও বায়ুর অবস্থান, প্রকৃতি ও কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন ও বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পুস্তকে তাহা বুঝাইয়া বলা কর্ত্তব্য ছিল। যদি না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পুস্তক লিখিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন –

"যোগীগণ জানে যোগবলে।"

আমরা যোগী নহি, যোগবলেরও কোন দাবি রাখি না, কাজেই কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না।

ভাষাতত্ত্ব। ভারতবর্ষীয় আর্য্যভাষার তত্ত্বানুশীলন। শ্রীশ্রীনাথ সেন প্রণীত। প্রথম খণ্ড। মূল্য ১৲ এক টাকা।

গ্রন্থকার মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী এবং তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। গ্রন্থ-প্রণয়নে মস্তিষ্কচালনাও যে অনেক করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তথাচ অনেক স্থলে গ্রন্থকারের সহিত আমরা এক মত হইতে পারিলাম না। এই পুস্তকের 'অনুবন্ধে' শ্রীনাথ বাবু বলিতেছেন—"প্রাকৃত বলিলে অনেকে 'শকুন্তলা' প্রভৃতির প্রাকৃত মনে করেন, কিন্তু তাহা নয়। 'শকুন্তলা' যে প্রকার বলিতেন তাহাও প্রাকৃত ছিল, আমরা এখন যেরূপ বলি তাহাও প্রাকৃত। এই পুস্তকে আমরা যখন প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ করিব তখন যেন পাঠকগণ 'বঙ্গভাষা' ভিন্ন শকুন্তলাদির প্রাকৃত মনে না করেন।" এই পুস্তক সম্বন্ধে তাহা না হয় নাই করিলাম; কিন্তু প্রাকৃত বলিলে যখন একটী স্বতন্ত্র ভাষাকে বুঝায়, তখন বাঙ্গালা, হিন্দি প্রভৃতিকে প্রাকৃত বলিবার কি যে প্রয়োজন, তাহা বুঝা গেল না। ল্যাটিন হইতে উৎপন্ন হইলেও ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয় ভাষা যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেও প্রাকৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা*। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অভিধান ও ব্যাকরণ আছে এবং থাকা আবশ্যক। প্রাকৃত বলিতে লোকে শকুন্তলাদির ভাষাই বুঝিয়া আসিতেছে, বুঝিয়া থাকে এবং বুঝিতে থাকিবে; পৃথিবীশুদ্ধ শ্রীনাথবাবু এবং পৃথিবীশুদ্ধ সাহিত্য-সভা মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও বাঙ্গালা, ও হিন্দি প্রভৃতি বুঝাইতে 'প্রাকৃত' শব্দে ব্যবহৃত হইবে না।

শ্রীনাথ বাবু বলেন যে, বঙ্গভাষা কথিতাকারে লিখিত সংস্কৃত ভাষা—লোকে যে ইহাকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র একটি মিশ্র ভাষা মনে করে তাহা ভ্রম। সংস্কৃত ভাষাই যে বাঙ্গালা ভাষার মূল, তদ্বিষয়ে কেহ কোন কালে স্বপ্নেও সন্দেহ করে নাই; কিন্তু তথাপি বাঙ্গলা যে মিশ্র ভাষা, তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের স্থান নাই, বোধ হয় প্রয়োজনও নাই; কিন্তু অনেক পারসিক, আরবীয়, ইংরেজি, ফরাসী প্রভৃতি শব্দ যে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই সকল শব্দের উন্মূলন ও এক্ষণে অসম্ভব। তবে কি বলিয়া

*—"প্রাকৃত ও আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ভাষাগুলি সাক্ষৎ ভাবে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন কিনা এসম্বন্ধে মতভেদও আছে।" লেখক।

বাঙ্গালাকে মিশ্রভাষা না বলিব? পরের কাছে ধার করায় যে মর্য্যাদার হানি আছে, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু ধার যখন করিতেই হইয়াছে, তখন তাহা লুকাইবার চেষ্টা করা কেন?

এক আধটি মন্তব্য কিঞ্চিৎ হাস্যজনকও হইয়াছে। শ্রীনাথ বাবুর মতে, সংস্কৃত 'আসীৎ'শব্দ লিখিতে যখন দীর্ঘ ঈকার লাগে, তখন বাঙ্গলাতেও 'আছিল' বা 'ছিল' না লিখিয়া 'আছীল' বা 'ছীল' লেখা কর্ত্তব্য—"দীর্ঘ ঈকার না দিয়া আমরা হ্রস্ব ইকার দিয়া থাকি তাহা অবিহিত।" রহস্য এই যে, শ্রীনাথ বাবু নিজে এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এই 'অবিহিত' কার্য্য করিয়াছেন। এক শ্রেণীর উপদেষ্টা আছেন, তাঁহারা বলেন যে—আমি যাহা করি তাহা করিও না, আমি যাহা বলি তাইাই কর। এরূপ উপদেষ্টার উপদেশ যে ভাসিয়া যাইবে, ইহা আবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গলা লেখকদিগের মধ্যে এমন স্থূলচর্ম্মী নির্ব্বোধ কে আছে যে, শ্রীনাথ বাবুর ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করিয়া অনর্থক হাস্যাস্পদ হইবে? ইংরেজী ব্যাকরণের একটা সূত্র এই যে, ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন আপিল নাই (There is no appeal against the decree of usage)। জীবিত ভাষা মাত্রের সম্বন্ধেই এই সূত্র খাটে। সংস্কৃত মৃত ভাষা; তাহাকে ব্যাকরণের নাগপাশে বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হইতে পারে। তথাপি তাহাতে আর্ষ প্রয়োগ স্বীকৃত, বিকল্প সিদ্ধি স্বীকৃত; অর্থাৎ, সকল স্থলে ব্যাকরণ, খাটে না, চলে না, কবুল জবাব দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গলা জীবিত ভাষা; তাহাকে কি মৃত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের খুঁটি নাটিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব? এই অসাধ্য সাধনের জন্য আজকাল যাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহাদের বিদ্যার প্রশংসা অনায়াসেই করা যায়, কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা করিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়।

বাঙ্গালায় অনেকে "কাজ' কথাটা বর্গীয় 'জ' দিয়া লিখিয়া থাকেন। শ্রীনাথ বাবু বলেন, এটা ভুল, কেননা, সংস্কৃত কার্য্য শব্দের যটা অন্তঃস্থ য। কার্য্য লিখিতে যে অন্তঃস্থ য লাগে, তাহা সামান্য বঙ্গ বিদ্যালয়ের অতি নিম্ন শ্রেণীর বালকেও জানে। ভরসা করি, ভাষাতত্ত্ব লেখক শ্রীনাথ বাবু জানেন যে, সংস্কৃত কথাটা যদিও 'কার্য্য," কিন্তু প্রাকৃত কথাটা 'কজ্জ"। বাঙ্গলা কথাটা যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা কে বলিল?

তথাপি এই গ্রন্থ পাঠ করিতে সকলকেই অনুরোধ করি। ইহাতে জ্ঞাতব্য কথা অনেক আছে। ইহার গুণ আছে বলিয়াই এত কথা আমরা বলিলাম। এখানি প্রথম খণ্ড। ভরসা করি, অনতিবিলম্বে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড দেখিতে পাইব।

উমা। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য ১৵৹ এক টাকা দুই আনা।

এই, উপন্যাসখানি পড়িয়া আমাদের মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হইয়াছে। হর্ষ, গ্রন্থকারের ক্ষমতা দেখিয়া। বিষাদ, গ্রন্থকার যেরূপ ক্ষমতাশালী, গ্রন্থখানি তেমন ভাল হয় নাই।

এই উপন্যাসের প্রধান গুণ, ইহার ভাষা! এমন সুন্দর ভাষা, এমন সুন্দর রচনা-কৌশল

এমন সুন্দর করিয়া বক্তব্য কথা বলিবার ভঙ্গী, আজকাল্‌কার উপন্যাসে বড় দেখিতে পাই না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কিত করিতে পাঁচকড়ি বাবুর বেশ ক্ষমতা আছে। প্রথম পরিচ্ছেদেই যে চিত্রখানি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সুন্দর হইয়াছে—যেন একখানি ফোটোগ্রাফ। এই রূপ সুন্দর সুন্দর ক্ষুদ্র চিত্র আরও আছে।

কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড চিত্র অঙ্কিত করিতে পারা এক; ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকে অন্তর্গত করিয়া একটা বিশাল চিত্রপট আঁকা আর। পাঁচকড়ি বাবু প্রথমোক্ত রকমে কৃতকার্য্য; দ্বিতীয়োক্ত রকমে ব্যর্থ-প্রয়াস। এই পুস্তকের ক্ষুদ্র চিত্রগুলি বিশেষ প্রশংসনীয়, কিন্তু পুস্তকখানি মোটের উপর তেমন প্রশংসনীয় নহে।

উপন্যাস লেখকের ও নাটকীয় ক্ষমতা থাকা আবশ্যক, কেননা তাঁহাকে মানব-চরিত্র চিত্রিত করিতে হয়। পাঁচকড়ি বাবু সে ক্ষমতা আছে; কিন্তু তাহা আজিও বিকশিত হয় নাই। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র উমাকেই দেখ। গ্রন্থকার তাঁহাকে যেরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে উমা একটি আস্ত জীবন্ত মানুষ হয় নাই—একটি রক্ত মাংসের বেদান্ত দর্শন হইয়াছে মাত্র। পাঁচকড়ি বাবুর সাংসারিক মানবত্ব ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান একত্র করিলে যাহা হয়, উমা তাই। এক স্থলে উমা সকল অবস্থা জানিয়াও স্বামীকে বলিতেছে—"তোমার দেখা করতেই হবে। কেবল দেখা নয়, * * *।" পাঁচকড়ি বাবু স্বর্গের চিত্রই আঁকিতে গিয়াছিলেন; আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, তাহা নরকের চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাঁচকড়ি বাবুর দোষ এই যে, তিনি চরিত্র চিত্রনে, সেই চরিত্র হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারেন না। উদাহরণ স্বরূপ এই উপন্যাসের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের উল্লেখ করিতে পারি। এখানে অনেক বিদ্যার কথা, বুদ্ধির কথা, জ্ঞানের কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু যে অবস্থায় (situation) যাহাদের মুখে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে, সে অবস্থায় তাহাদের মুখে তাহা ব্যক্ত হইতে পারে না। এখানে চরিত্র-বিকাশ হয় নাই; পাঁচকড়ি বাবুর নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে মাত্র।

সুনীতির হিসাবে এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারি না। বিনোদিনী ও যোগেশ্বর-সম্বলিত যে চিত্র গ্রন্থকার আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে—এমন অবস্থায় এমন ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটে। কিন্তু পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে, তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যে পাপচিত্র পাঁচকড়ি বাবু আঁকিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাই নাই। কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা। তাই আবার পাঁচকড়ি বাবুর ন্যায় ক্ষমতাশালী লেখকে করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য!

এই যে একটা মহাপাপ হইয়া গেল, ইহার ফলভোগ করিবে কে? বিনোদিনী মরিল বটে; কিন্তু বিনোদিনীই কি একা পাপিষ্ঠা—বিনোদিনীই কি প্রধান পাপিষ্ঠা?

বিনোদিনীর সহিত যোগেশ্বরের মিলনের গুরু ত উমা নিজে। সর্ব্বাপেক্ষা যাহার অপরাধ অধিক, সেই মহাপাপিষ্ঠ যোগেশ্বরের কি হইল—উমার কি হইল? তাহারা ত আপনাদের সুখের সংসার ফিরিয়া পাইল। ইহাই কি কবিজনোচিত ন্যায়পরতা! ইহাই কি কাব্য! যাহাতে বিশ্বজনীননীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে?

সংবাদপত্রের সম্পর্কে পাঁচকড়ি বাবু সুপরিচিত; কিন্তু গ্রন্থকাররূপে তিনি এই নূতন। নূতনের ও নবীনের অনেক জিনিষ মার্জ্জনা করা যায়। পাঁচকড়ি বাবুকে যে মার্জ্জনা করিলাম না, তাহার কারণ পাঁচকড়ি বাবুর ক্ষমতা। তিনি অক্ষম লেখক হইলে তাঁহার সম্বন্ধে এত কথা বলিবার কোনই আবশ্যক হইত না। তাঁহার ক্ষমতা আছে বলিয়াই তাঁহার দোষ দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়।

এই পুস্তকে যে গুণপনা দেখিলাম, তাহাতে আমরা পাঁচকড়ি বাবুর পরিণত বুদ্ধি হইতে অনেক সুফলের আশা করিতে পারি। আশীর্ব্বাদ করি, তিনি দীর্ঘজীবি হইয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবা করুন, এবং সেই মাতৃসেবায় শ্রমশীল, ভক্তিশীল সংযমশীল হউন।

(খ)

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ। উড়িষ্যার মঠ।—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিং[illegible] তাতে উড়িষ্যার যে সকল লোকচিত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহা বড়ই সরস হইতেছে। লেখক উড়িষ্যাখণ্ডকে বেশ করিয়া জানিয়াছেন কোন দেশে বেশি দিন বাস করিলেই যে তাহাকে জানা যায় তাহা নহে, জানিবার শক্তি অতি অল্পলোকেরই আছে। স্বদেশ স্বগ্রামকেই বা কয়জন লোক জানে? সচেতন চিত্ত এবং সর্ব্বদর্শীকল্পনা বিধাতার দুর্লভ দান। আবার, জানিলেই জানানো যায় না। যতীন্দ্রবাবুর জানিবার শক্তি এবং জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গেছে। এবারে তিনি উড়িষ্যার মঠের ছবি দিয়াছেন—তাঁহার মঠের করুণ-হৃদয় ভক্ত মোহান্তের সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া রহিলাম।

ছট্‌পরব ও চক্‌চন্দা বেহারে প্রচলিত দুটি মেয়েলি ব্রতের বিবরণ লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই সকল পরবও ব্রতকথা [illegible] ব্রতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ [illegible] বিশেষ আবশ্যক। ইহাদের ভিতরকার [illegible] মনস্[illegible] বৈচিত্র্য ও ঐক্য, [illegible] [illegible]সা করি[illegible] এ[illegible] না করিবার পরম বিষয় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় গুটিকয়েক বাঙ্গলা ব্রত সংগ্রহ করিয়া একটি ছোট গ্র[ন্থ] প্রকাশ করিয়াছেন—কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে সাহিত্য পরিষদ্‌ যদি এই সংগ্রহ কার্য্যে অযোগ্য জ্ঞান না করেন তবে বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ব্রতকথা সংকলন করিয়া একটি প্রকৃত কাজের পত্তন করিতে পারেন বিজ্ঞান পিপাসুগণ সমুদ্র বেলা হইতে শামুক গুগ্‌লি নুড়ি কুড়াইয়াও সঞ্চয় করেন, অ[থচ] লোকহৃদয়ের সমুদ্রবেলায় এই যে চিত্রবিচি[ত্র]

পদার্থ সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এগুলি কি বিজ্ঞমণ্ডলীর উপেক্ষার যোগ্য? সাহিত্য পরিষদ্ একবার শিশু ভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিবার উপক্রম করিয়া অতি সত্বর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; আশাকরি, এ সকল কার্য্য গাম্ভীর্য্যের হানিজনক বলিয়া তাঁহারা লজ্জিত হন নাই! **ঐতিহাসিক পত্রাবলী** শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের রচিত ঔৎসুক্যজনক প্রবন্ধ। পত্রগুলি মারাঠা রাজত্বকালীন দপ্তর হইতে সংগৃহীত। এরূপ পত্র বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই যে মারাঠা রাজ্যকালে পত্র ব্যবহারের ভাষা মারাঠী এবং রাজপুরুষদিগের পদবী সংস্কৃত-নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা হইতে শিবাজির প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বজাতিকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে, ভাষার স্বাধীনতা, আচারের স্বাধীনতা, মনের স্বাধীনতা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। যাবনিক বন্যার প্রবল প্লাবন হইতে স্বজাতিকে তাঁহারা প্রাচীন মহত্ত্বের তীরে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহাদের রাজত্ব যে একটা খাপ্‌ছাড়া ভুঁইফোঁড়া আকস্মিক উৎপাত, এরূপ ভাবনা তাঁহাদের পক্ষে অশান্তিকর—সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাচীন স্বজাতীয় মহৎ আদর্শের সহিত আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া একটি ধ্রুব প্রতিষ্ঠার উপর আপন গৌরব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা মারাঠী ইতিহাসের প্রধান গৌরব নহে, কিন্তু এই নববীর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বৃহৎ ভাবের অভ্যুত্থান, স্বজাতীয় আদর্শলাভের জন্য জাগ্রত হৃদয়ের প্রবল আবেগ—ইহাই শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেউস্কর মহাশয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত পত্র কয়েকটি পড়িয়া এই কথাটাই বিশেষ করিয়া মনে উঠিল। (আনুষঙ্গিক একটা ছোট কথা বলিয়া লই। "অনুবাদিত" কথাটা বাঙ্গলায় চলিয়া গেছে—আজকাল পণ্ডিতেরা অনূদিত লিখিতে সুরু করিয়াছেন। ভয় হয় পাছে তাঁহারা "সৃজন" কথার জায়গায় "সর্জ্জন" চালাইয়া বসেন।)

নব্যভারত। চৈত্র। **বেঙ্গল গেজেট ও সমাচারদর্পণ।** এই প্রবন্ধে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম দুইটি সংবাদপত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথম পত্র বেঙ্গল গেজেট ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এক বৎসর কাল থাকে। তাহার সম্পাদকের নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। মাসিক মূল্য এক টাকা। দ্বিতীয় পত্র সমাচারদর্পণ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের পাদ্রিগণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাসিক মূল্য এক টাকা। তৃতীয় পত্র রাজা রামমোহন রায়ের সংবাদকৌমুদী, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সাধারণের ধারণা প্রথম সংবাদ পত্র মিশনারীরা বাহির করে, বিদ্যানিধি মহাশয় সেই ভ্রম দূর করিয়াছেন। এখনকার দুই টাকার সংবাদপত্রগণ সেই সত্যযুগের কথা স্মরণ করিবেন তখন সংবাদপত্রের মূল্য ছিল বারো টাকা, গ্রাহকদিগকে উপহার দিয়া ভুলাইতে হইত না। বিদ্যানিধি মহাশয় দুই একটা লেখা যাহা উদ্ধৃত করিয়া-

ছেন, তাহা পড়িলে বুঝা যায় ভাব প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষাকে তখন কিরূপ গলদ্‌ঘর্ম্ম চেষ্টা করিতে হইত। কিন্তু উদ্ধৃত রচনাংশের ভাষা তুলনা করিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে পাদ্রির কাগজ সমাচার দর্পনের বাঙ্গালাভাষা সমাচার চন্দ্রিকার অপেক্ষা স্বচ্ছ সরল এবং বিশুদ্ধ। যুগান্তরে প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁহার বালককালে বঙ্গ সমাজের যে চেহারা দেখিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। লেখাটি সরস এবং কৌতুহলজনক হইয়াছে। এখনকার পাঠকদের পক্ষে ইহার অনেক খবর নূতন। প্রবন্ধটি উপাদেয়।

সাহিত্য। ফাল্গুন। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। মহলানবিশ মহাশয়ের মত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গলা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা একটি সুসংবাদ। যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতিশয় প্রাঞ্জল, তাহার মধ্যে পারিভাষিক বিভীষিকা নাই। বাঙ্গলায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এমন ভাবে লিখিত হইয়া থাকে যাহা অবোধ লোকের পক্ষে অবোধ্য এবং জ্ঞানী লোকের পক্ষে অনাবশ্যক। মহলানবিশ মহাশয়ের মত পারদর্শী লোক প্রবৃত্ত হইলে জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই উপযুক্ত করিয়া লিখিতে পারেন। ইংলণ্ডে হক্সলি প্রভৃতি যশস্বী লোকে শিশুদের জন্য বিজ্ঞান প্রাথমিকা লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই—বাঙ্গালী পাঠকদের সহিত বিজ্ঞানের প্রথমপরিচয়সাধন প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তির পক্ষেই সমুচিত। প্রবন্ধে যে দুই একটি পারিভাষিক শব্দ আছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাঙ্গালায় "এভোল্যুশন থিওরী"র অনেকগুলি প্রতিশব্দ চলিয়াছে। লেখক মহাশয় তাহার মধ্যে হইতে "ক্রমবিকাশ তত্ত্ব" বাছিয়া লইয়াছেন। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এরূপ স্থলে অভিব্যক্তিবাদ শব্দ ব্যবহার করেন। অভিব্যক্তি শব্দটি সংক্ষিপ্ত; ক্রমে ব্যক্ত হইবার দিকে অভিমুখ ভাব অভি উপসর্গযোগে সুস্পষ্ট; এবং শব্দটিকে "অভিব্যক্ত" বলিয়া বিশেষণে পরিণত করা সহজ। তা ছাড়া "ব্যক্ত" হওয়া শব্দটির মধ্যে ভালমন্দ উন্নতি অবনতির কোন বিচার নাই—বিকাশ শব্দের মধ্যে একটি উৎকর্ষ অর্থের আভাস আছে। লেখক মহাশয় Natural Selectionকে বাঙ্গলায় "নৈসর্গিক মনোনয়ন" বলিয়াছেন। এই সিলেক্‌শন্ শব্দের চলিত বাঙ্গলা "বাছাই" করা। বাছাই কার্য্য যন্ত্রযোগেও হইতে পারে,—বলিতে পারি, চা বাছাই করিবার যন্ত্র কিন্তু চা মনোনীত করিবার যন্ত্র বলিতে পারি না। মনশব্দের সম্পর্কে মনোনয়ন কথাটার মধ্যে ইচ্ছা অভিরুচির ভাব আসে। কিন্তু প্রাকৃতিক সিলেক্‌শন্ যন্ত্রবৎ নিয়মের কার্য্য—তাহার মধ্যে ইচ্ছার অভাবনীয় লীলা নাই। অতএব বাছাই শব্দ এখানে সঙ্গত। বাঙ্গলায় বাছাই শব্দের সাধুপ্রয়োগ "নির্ব্বাচন"। "নৈসর্গিক নির্ব্বাচন" শব্দে কোন আপত্তির কারণ আছে কি না জানিতে ইচ্ছুক আছি। Fossil শব্দকে সংক্ষেপে শিলাবিকার বলিলে কিরূপ হয়? Fossilized শব্দকে বাঙ্গলায় শিলাবিকৃত অথবা শিলীভূত বলা

যাইতে পারে। "চরিত্রনীতি" প্রবন্ধটির লেখক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। চারিত্রদর্শনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইংরাজি Ethics শব্দকে তিনি বাঙ্গলায় "চরিত্রনীতি" নাম দিয়াছেন। অনেকে ইহাকে নীতি ও নীতিশাস্ত্র বলেন—সেটাকে লেখক পরিত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন কারণ নীতি শব্দের অর্থ সকল সময়ে ধর্ম্মানুকূল নহে।

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ংব্রূয়াৎ,প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম্,
অপি চাস্য শিরশ্ছিত্বা রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ।

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো!
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পার!

ইহাও একশ্রেণীর নীতি কিন্তু এথিক্স্ নহে। সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্ম বলিতে মুখ্যতঃ এথিক্স্ বুঝায় কিন্তু ধর্ম্মের মধ্যে আরো অনেক গৌণ পদার্থ আছে। মৌনী হইয়া ভোজন করিবে ইহা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হইতে পারে কিন্তু ইহা Ethics নহে। অতএব "চরিত্রনীতি" শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে কিন্তু ইহাকে আর একটু সংহত করিয়া চারিত্র বলিলে ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। চরিত্র নীতি শিক্ষা, চরিত্র নীতি বোধ, চরিত্র নৈতিক উন্নতি অপেক্ষা চারিত্রশিক্ষা, চারিত্র-বোধ, চারিত্রোন্নতি আমাদের কাছে সঙ্গত বোধ হয়। খগেন্দ্রবাবু চারিত্র দর্শনের মূল সমস্যাগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে গিয়া বিষয়টিকে পাঠকসাধারণের পক্ষে দুরূহ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই একটি প্রবন্ধ ভাঙ্গিয়া তিনি যদি তিনটি করিতেন তবে বক্তব্য বিষয়টিকে বিশদ করিতে পারিতেন। আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য Metaphysics শব্দের বাঙ্গলা কি তত্ত্ববিদ্যা নহে? শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর পণ্ডিত প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী লিখিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় সাধু ও ভক্ত ছিলেন ইহজীবন নিষ্ঠুর দারিদ্রের সহিত সংগ্রামে পদে পদে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও উপাস্য দেবতার প্রতি সরল ভক্তিকে দৃঢ় রাখিয়াছিলেন। লেখক মহাশয় তাঁহার রচিত অনেকগুলি শ্যামা-বিষয়ক গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই গানগুলির মধ্যে অনেক স্থলেই ভাবের গভীরতা আছে সন্দেহ নাই কিন্তু ভাষা ও ছন্দের অসম্পূর্ণতায় ইহারা সাহিত্যের মধ্যে উচ্চস্থান পাইবেনা। রামপ্রসাদের গান কেবল ভাবের গৌরবে নহে ভাষার গুণে কালে কালে মুখে মুখে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বহুমূল্য দ্রব্যও নৌকার দোষে ঘাট ছাড়িয়াই ডুবিয়া থাকে। সাহিত্যেও অনেক সময় সুলভ মালের নৌকাও বহুদূরে চলিয়া আসে, মূল্যবান্ দ্রব্যও অর্দ্ধপথে নষ্ট হয়। আমাদের দেশে অনেক অশিক্ষিত সহজ ভক্ত খাঁটি ভক্তি খাঁটি ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গেছে, সেই সরল সম্পূর্ণ গানগুলি বাঙ্গলা পল্লীর চিরসম্পত্তি হইয়া আছে; ভক্ত প্রসন্নকুমারের ভাবপূর্ণ গানে রচনায় ও বাঙ্গলা ভাষার সেই সহজ সম্পূর্ণতা না দেখিয়া মনে আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ফাল্গুন।

রাঙ্গামাটি বা কর্ণ সুবর্ণ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন,

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রাঙ্গামাটি পল্লী প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের ধ্বংশাবশেষ। এ সম্বন্ধে তিনি প্রবাদ ও ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মহাভারতের বীর কর্ণের সহিত কর্ণসুবর্ণের কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ছিল, নাম সাদৃশ্য ছাড়া সে প্রবাদের ভিত্তি আছে বলিয়া পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় বিশ্বাস করেন না; আমরাও একথা বিশ্বাস করিবার কোন হেতু দেখিনা। বানান লইয়া কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রাঙা, ভাঙা, ডাঙা, আঙুল প্রভৃতি শব্দ "ঙ্গ" অক্ষর যোগে লেখা নিতান্তই ধ্বনিসঙ্গতি বিরুদ্ধ। গঙ্গা শব্দের সহিত রাঙা, তুঙ্গ শব্দের সহিত ঢ্যাঙা শব্দের তুলনা করিলে একথা স্পষ্ট হইবে। মূল শব্দটিকে স্মরণ করাইবার জন্য ধ্বনির সহিত বানানের বিরোধ ঘটানো কর্ত্তব্য নহে। সে নিয়ম মানিতে হইলে চাঁদকে চান্দ, পাঁককে পাঙ্ক, কুমারকে কুম্ভার লিখিতে হয়। অনেকে মূল শব্দের সাদৃশ্য রক্ষার জন্য সোনাকে সোণা, কর্ণকে কাণ বানান করেন, অথচ শ্রবণ শব্দজ শোনাকে শোণা লেখেন না। যে সকল সংস্কৃতশব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পূরা বাঙলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত। প্রাকৃত ভাষার বানান ইহার উদাহরণ স্থল। জোড়া, জোয়ান্, জাঁতা, কাজ প্রভৃতি শব্দে আমরা স্বাভাবিক বানান গ্রহণ করিয়াছি অথচ অন্য অনেক স্থলে করি নাই। পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় বাঙলা বানানের নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব। জগন্নাথ বিজয় ও কবি মুকুন্দ, ভাষা ও ছন্দের অপরিণতি আলোচনা করিয়া রসিক বাবু জগন্নাথ বিজয় রচয়িতাকে অত্যন্ত প্রাচীন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সে যুক্তি অবলম্বন করিলে মাইকেলের পরবর্ত্তী অমিত্রাক্ষর লেখক ও বঙ্কিমের পরবর্ত্তী উপন্যাস-লেখকদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মানিতে হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রবন্ধ শেষে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন আমরা তাহা সঙ্গত বোধ করি।

প্রদীপ। চৈত্র। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্যারিচাঁদ মিত্রের রচনা ও জীবনী সমালোচন করিয়াছেন। প্যারীচাঁদের ভাষা ও রচনারীতি এমনি তাঁহার স্বকীয় যে আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার নকল করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার লেখা হইতে সমালোচক স্থানে স্থানে তুলিয়া দিয়াছেন, তাহ দেখিলেই বুঝা যাইবে, চলিত ভাষা হইতে ঠিক কথাটি চুনিয়া লইবার ক্ষমতা তাঁহার যেমন ছিল চারিদিকের প্রাত্যহিক ব্যাপারের মধ্য হইতে ছবির ঠিক রেখাগুলি আদায় করিবার শক্তিও তাঁহার তেমনি ছিল। যে দৃশ্য অতি পরিচিত তাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি তেমন করিয়া পড়ে না—তাহার আগা গোড়াই সমান তুচ্ছ বোধ হয়—সেই সামান্যতার মধ্য হইতে একটি চেহারা বাহির করা রসের অপূর্ব্বতা জাগাইয়া তোলা অসামান্য ক্ষমতার কাজ। সৃষ্টির বিশালত্ব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা। অবৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রে যদি বৈজ্ঞানিক কিছু লিখিতে হয় তবে তাহার ভাষা এইরূপ

সহজ হওয়াই উচিত। যে বিষয়টা সাধারণের অপরিচিত তাহা স্বভাবতই দুরূহ, তাহার ভাষাকেও যদি নীরস দুর্বোধ করিয়া তোলা যায় তবে নিতান্তই হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। অবৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রে পাঠকদিগকে যেরূপ ভোজ দিবার রীতি তাহাতে এরূপ কড়া জিনিষ তাহারা আশাই করে না এমন স্থলে নিঃশঙ্কচিত্ত পাঠকের পাতে এত বড় উপদ্রব নিরীহ জামাতার প্রতি শ্বশুরান্তঃপুরের কঠিন কৌতুকের মত হইয়া পড়ে,—কিন্তু সেরূপ কৌতুক শ্বশুরালয়ে যেমন সহ্য হয় অন্যত্র তেমন হয় না। লেখক মহাশয় সেন্ট্রিপীটাল্ ও সেন্ট্রিফ্যুগাল ফোর্স্‌কে কেন্দ্রাভিসারিণী ও কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি বলিয়াছেন কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগশক্তি আমাদের মতে সংক্ষিপ্ত ও সঙ্গত। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের **সাহাজানের দৈনিক জীবন** প্রবন্ধটি মনোহর হইয়াছে।

সাহিত্য-সংহিতা। চৈত্র। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে **জাতীয় সাহিত্য** প্রবন্ধে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মমত চলিতে উত্তেজনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নচেৎ আদর্শের ঐক্য থাকে না। তিনি বলেন, "কেন চট্টগ্রামবাসী নবদ্বীপবাসীর ব্যবহৃত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে?" আমরা বলি, কেহ ত জবরদস্তি করিয়া বাধ্য করিতেছে না,—স্বভাবের নিয়মে চট্টগ্রামবাসী আপনি বাধ্য হইতেছে। নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার কাব্যে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার না করিয়া নবদ্বীপের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার বিপরীত করিবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল কিন্তু নিশ্চয়ই কাব্যের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া সেই স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সকল দেশেই প্রাদেশিক প্রয়োগের বৈচিত্র্য আছে, তথাপি এক একটি বিশেষ প্রদেশ ভাষাসম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। ইংরাজি ভাষা লাটিন নিয়মে আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করে না। যদি করিত তবে এ ভাষা এত প্রবল এত বিচিত্র এত মহৎ হইত না। ভাষা সোনা রূপার মত জড়পদার্থ নহে যে তাহাকে ছাঁচে ঢালিব—তাহা সজীব। তাহা নিজের অনির্ব্বচনীয় জীবনীশক্তির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে থাকে। সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারকে প্রাধান্য দেয়। লোকাচারের অসুবিধা অনেক, তাহাতে এক দেশের আচারকে অন্য দেশের আচার হইতে তফাৎ করিয়া দেয়—তা হউক, তবু লোকাচারকে ঠেকাইবে কে? লোককে না মারিয়া ফেলিলে লোকাচারের নিত্য পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্র্য কেহ দূর করিতে পারে না। কৃত্রিম গাছের সব শাখাই এক মাপের করা যায় সজীব গাছের করা যায় না। ভাষারও লোকাচার শাস্ত্রের অপেক্ষা বড়। সেই জন্যই আমরা "ক্ষান্ত" দেওয়া বলিতে লজ্জা পাই না। সেই জন্যই ব্যাকরণ যেখানে "আবশ্যকতা" ব্যবহার করিতে বলে আমরা সেখানে "আবশ্যক" ব্যবহার করি। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যদি চোখ রাঙাইয়া আসে, লোকাচারের হুকুম দেখাইয়া আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।

প্রবাসী। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সুদৃশ্য সচিত্র পত্রের সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে ইহা প্রকাশিত হইতেছে। আমরা নবীন পত্রটিকে সাদরে অভর্থনা করিয়া লইতেছি। আমাদের প্রবাসী কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমাশ্রুজলে ইহার অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীও ধন্য, প্রবাসী বাঙ্গালীর কবিও ধন্য! স্বর্গীয় কমলাকান্ত শর্ম্মা লোকান্তর হইতে ইহলোকে এবং বঙ্গের বঙ্গদর্শন হইতে প্রবাসে গেলেন, এ ইন্দ্রজাল কে ঘটাইল? মায়াবী তাঁহার নাম গোপন করিয়া ফাঁকি দিতে পারিবেন না—কবির লেখনী ছাড়া এ যাদু আর কোথায়? যে কবি অশোকমঞ্জরী হইতে তাহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণঝঙ্কার হইতে তাহার রহস্য কথাটী চুরি করিয়া লইতে পারেন তিনি যে রাতারাতি বঙ্গদর্শন হইতে তাহার কমলাকান্তটিকে হরণ করিয়া প্রবাসে পালাইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু চোরকে যদি আমাদের বঙ্গদর্শনে বাঁধিতে পারি তবেই তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে। **অজণ্টা-গুহ চিত্রাবলী** মনোহর সচিত্র প্রবন্ধ। নিশ্চয় বলিতে পারি না কিন্তু আমাদের ধারণা, উচ্চারণ অনুসারে অজণ্টার স্থলে অজন্তা হওয়া উচিত। বিজ্ঞানবিশারদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় **জীববিদ্যা** সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মিবারের রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ **কীরাৎকুম্ভ** সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন "কোনও কাগজের প্রথম সংখ্যা মনের মত করা বড়ই কঠিন। আশা করি কেহ আমাদের প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই কাগজের দোষ গুণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন না।" বস্তুতঃ কাগজের প্রথম সংখ্যা জিনিষটা বড়ই অসহায়। সে নিতান্তই একা; স্থান সংক্ষেপ ও প্রথম আয়োজনের ঝঞ্ঝাটে অল্প নমুনাই সে দেখাইতে পারে—পাঠকদের চক্ষু ভরিয়া দিবার মত পুঁজি তাহার থাকে না। অতএব প্রথম সংখ্যা লইয়া নানা লোকে নানা অভিযোগ উপস্থিত করিলে নিরুত্তর থাকিতে হয়—কালে তাহা আপনি থামিয়া যায় এবং পাঠকেরা আপনাদের কাগজটিকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে পারেন। আমাদের বিবেচনায় প্রথম সংখ্যাটিকে অত্যুজ্জল করিয়া তুলিলে পরিচয়কে ক্রমশঃ অগ্রসর করিবার পথে ব্যাঘাত ঘটে, সে উপায়ে, ক্রমশঃ পাঠকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করিয়া ক্রমশঃই তাঁহাদিগকে হতাশ করিয়া ফাঁকি দিতে বাধ্য হইতে হয়। যাহাই হউক প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

সম্পূর্ণ নহে। সাহিত্যে ও শিল্পে ভাবের পরিস্ফুটতা, সরলতা ও ঐক্য হইতেই রচনার সৌন্দর্য্য উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপে ভাব ও চিন্তার অপরিসীম বহুলতায়, রচনার এই মহৎ বিশুদ্ধ সারল্য রক্ষা করা উত্তরোত্তর কঠিন হইতেছে।

আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অংশে প্রত্যংশেই আমরা এই বিচিত্র প্রকৃতি দেখিতে পাই। নিঃসন্দেহ ইহার অসুবিধাও আছে। ইহার কোন একটা অংশকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে গেলে, হয় ত, প্রাচীনকালের তুলনায় খর্ব্ব দেখিতে পাইব—কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে, ইহার ঐশ্বর্য্য আমাদের কাছে প্রতীয়মান হইবে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা পঞ্চদশ-শতাব্দ-কাল টিঁকিয়া আছে এবং বরাবর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহা গ্রীক্‌সভ্যতার ন্যায় তেমন দ্রুতবেগে চলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পদে পদে নব নব অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া এখনো ইহা সম্মুখে ধাবমান। অন্যান্য সভ্যতায় এক ভাব—এক আদশের একাধিপত্যে অধীনতাবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু য়ুরোপে কোন এক সামাজিক শক্তি অপর শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে না পারায়, এবং ঘাতপ্রতিঘাতে পরস্পরকে সচেতন অথচ সংযত করিয়া রাখায়, য়ুরোপীয় সভ্যতায় স্বাধীনতার জন্ম হইয়াছে। ক্রমাগত বিবাদে এই সকল বিরোধি-শক্তি আপসে একটা বোঝাপড়া করিয়া সমাজে আপন আপন অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে; এইজন্য ইহারা পরস্পরকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে না, এবং নানা প্রতিকূলপক্ষ আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।

ইহাই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলপ্রকৃতি, ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব।

গিজো বলেন, বিশ্বজগতের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যের সংগ্রাম। ইহা সুস্পষ্ট যে, কোন একটি নিয়ম, কোন এক প্রকারের গঠনতন্ত্র, কোন একটি সরল ভাব, কোন একটি বিশেষ শক্তি, সমস্ত বিশ্বকে একা অধিকার করিয়া, তাহাকে একটিমাত্র কঠিন ছাঁচে ফেলিয়া, সমস্ত বিরোধী প্রভাবকে দূর করিয়া, শাসন করিবার ক্ষমতা পায় নাই। বিশ্বে নানা শক্তি, নানা তত্ত্ব, নানা তন্ত্র, জড়িত হইয়া যুদ্ধ করে, পরস্পরকে গঠিত করে, কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে না, সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় না।

অথচ এই সকল গঠন, তত্ত্ব ও ভাবের বৈচিত্র্য—তাহাদের সংগ্রাম ও বেগ, একটি বিশেষ ঐক্য—একটি বিশেষ আদর্শের অভিমুখে চলিয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতাই এইরূপ বিশ্বতন্ত্রের প্রতিবিম্ব। ইহা সঙ্কীর্ণরূপে সীমাবদ্ধ, একরত ও অচল নহে। জগতে সভ্যতা এই প্রথম নিজের বিশেষ মূর্ত্তি বর্জ্জন করিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রথম ইহার বিকাশ বিশ্বব্যাপারের বিকাশের ন্যায় বহুবিভক্ত, বিপুল এবং বহুচেষ্টাগত। য়ুরোপীয় সভ্যতা এইরূপে চিরন্তন্ সত্যের পথ পাইয়াছে, তাহা জগদীশ্বরের কার্য্যপ্রণালীর ধারা গ্রহণ করিয়াছে, ঈশ্বর যে পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এ সভ্যতা সেই পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সভ্যতার শ্রেষ্ঠতাতত্ত্ব এই সত্যের উপরেই নির্ভর করে।

গিজোর মত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

য়ুরোপীয় সভ্যতা এক্ষণে বিপুলায়তন ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। য়ুরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া—তিন মহাদেশ এই সভ্যতাকে বহন ও পোষণ করিতেছে। এত ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক দেশের উপরে এক মহাসভ্যতার প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য্য বৃহদ্‌ব্যাপার, ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। সুতরাং কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার বিচার করিব? কোন্‌ ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণাম নির্ণয় করিব? অন্য সকল সভ্যতাই একদেশের সভ্যতা, এক জাতির সভ্যতা। সেই জাতি যতদিন ইন্ধন জোগাইয়াছে, ততদিন তাহা জ্বলিয়াছে, তাহার পরে তাহা নিবিয়া গেছে, অথবা ভস্মাচ্ছন্ন হইয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা-হোমানলের সমিধ্‌কাষ্ঠ জোগাইবার ভার লইয়াছে—নানা দেশ নানা জাতি। অতএব এই যজ্ঞ-হুতাশন কি নিবিবে, না, ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে? কিন্তু এই সভ্যতার মধ্যেও একটি কর্তৃভাব আছে,—কোন সভ্যতাই আকারপ্রকার-হীন হইতে পারে না। ইহার সমস্ত অবয়বকে চালনা করিতেছে, এমন একটি বিশেষ শক্তি নিশ্চয়ই আছে। সেই শক্তির অভ্যুদয় ও পরাভবের উপরেই এই সভ্যতার উন্নতি ও ধ্বংস নির্ভর করে। তাহা কি? তাহার বহুবিচিত্র চেষ্টা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্য-তন্ত্র কোথায়? উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আভাস দিয়াছেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মেই হিন্দুসমাজের ঐক্যভিত্তি। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নানা বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি মোটের উপরে বর্ণাশ্রমই হিন্দুসমাজকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—ইহাই তাহার মূল-প্রকৃতিগত।

তেমনি য়ুরোপীয় সভ্যতাকেও দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

ইংলণ্ডে বল, ফ্রান্সে বল, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মতবিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেই খানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। জাতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মত হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয়স্বার্থরক্ষা য়ুরোপের সর্ব্বসাধারণের তেমনি একটি অন্তর্নিহিত সংস্কার।

ইতিহাসের কোন্‌ গূঢ়নিয়মে দেশবিশে-ষের সভ্যতা ভাববিশেষকে অবলম্বন করে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, যখন সেই ভাব তাহার অপেক্ষা উচ্চতর ভাবকে হনন করিয়া বসে, তখন ধ্বংস অদূরবর্ত্তী হয়।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম্ম আছে, তেমনি জাতিধর্ম্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যখন 'সেই

উচ্চতর ধর্ম্মকে আঘাত করিল, তখন ধর্ম্ম তাহাকে আঘাত করিল—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

একসময় আর্য্যসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণশূদ্রে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উচ্চতর ধর্ম্মকে পীড়িত করিল। বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু ধর্ম্মকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল না। সে যখন উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বচর্চ্চা হইতে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত করিল, তখন ধর্ম্ম তাহার প্রতিশোধ লইল। তখন ব্রাহ্মণ্য আপন জ্ঞানধর্ম্ম লইয়া পূর্ব্বের মত আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অজ্ঞানজড় শূদ্রসম্প্রদায় সমাজকে গুরুভারে আকৃষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়া বাখিল। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নীচে নামাইল। আজিও ভারতে ব্রাহ্মণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের সংস্কারে, নিকৃষ্ট অধিকারীর অজ্ঞানতায়, ব্রাহ্মণসমাজ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন আবিষ্ট।

ইংরাজের আগমনে যখন জ্ঞানের বন্ধনমুক্তি হইল, যখন সকল মনুষ্যই মনুষ্যত্বলাভের অধিকারী হইল, তখনি ব্রাহ্মণধর্ম্মের মূর্চ্ছাপগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আজ ব্রাহ্মণ-শূদ্রে সকলে মিলিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত আদর্শের বিশুদ্ধমূর্ত্তি দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্রেরা আজ জাগিতেছে বলিয়াই, ব্রাহ্মণধর্ম্মও জাগিবার উপক্রম করিতেছে।

যাহাই হউক, আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা নিত্যধর্ম্মকে নানাস্থানে খর্ব্ব করিয়াছিল বলিয়াই, তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথেই গেল।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে, ধর্ম্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্ব্বসূচনা দেখা যাইতেছে।

ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্ম্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'জোর যার মুলুক তার' এ নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না।

ইহাও স্পষ্ট দেখিতেছি, যে ধর্ম্মনীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বরণীয়, তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জ্জনীয়, এ কথা একপ্রকার সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা, এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্য্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদের ধর্ম্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেই জন্য ফরাসী, ইংরাজ, জর্ম্মাণ, রুশ, ইহারা পরস্পরকে কপট, ভণ্ড, প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক

প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্দ্ধিত হইয়া ধ্রুবধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাসবাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন খৃষ্টান্ মিসনারীদের মুখেও 'ভাই'কথার মধ্যে ভ্রাতৃভাবের সুর লাগে না।

জগদ্বিখ্যাত পরিহাসরসিক মার্কট্বেয়েন গত ফেব্রুয়ারি মাসের নর্থ আমেরিকান্ রিভিয়ু পত্রে "তিমিরবাসী ব্যক্তিটির প্রতি" (To the person sitting in darkness) নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আধুনিক সভ্যতার ব্যাধিলক্ষণ কিছু কিছু চোখে পড়িবে। তীব্র পরিহাসের দ্বারা প্রখরশাণিত সেই প্রবন্ধটি বাঙলায় অনুবাদ করা অসম্ভব। লেখাটি সভ্যমণ্ডলীর রুচিকর হয় নাই; কিন্তু শ্রদ্ধেয় লেখক স্বার্থপর সভ্যতার বর্ব্বরতার যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার এবং হানাহানি-কাড়াকাড়ির যে চিত্র তিনি উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহার বিভীষিকা তাঁহার উজ্জ্বল পরিহাসের আলোকে ভীষণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা যে য়ুরোপের সাহিত্য ও ধর্ম্মকে ক্রমশ অধিকার করিতেছে, তাহা কাহারও অগোচর নাই। কিপ্লিং এক্ষণে ইংরাজি সাহিত্যের শীর্ষস্থানে, এবং চেম্বর্লেন ইংরাজ রাষ্ট্রব্যাপারের এক জন প্রধান কাণ্ডারী। ধূমকেতুর ছোট মুণ্ডটির পশ্চাতে তাহার ভীষণ ঝাঁটার মত পুচ্ছটি দিগন্ত ঝাঁটাইয়া আসে—তেমনি মিশনরির করধৃত খৃষ্টান্ ধর্ম্মালোকের পশ্চাতে কি দারুণ উৎপাত জগৎকে সন্ত্রস্ত করে, তাহা এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত হইয়া গেছে। এ সম্বন্ধে মার্কট্বেয়েনের মন্তব্য পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।*

*The following is from the "New York Tribune" of Christmas Eve. It comes from that Journal's Tokio Correspondent. It has a strange and impudent sound, but the Japanese are but partially civilized as yet. When they become wholly civilized they will not talk so:

"The missionary question, of course, occupies a foremost place in the discussion. It is now felt as essential that the Western Powers take cognizance of the sentiment here, that religious invasions of Oriental countries by powerful Western organizations are tantamount to filibustering expeditions, and should not only be discountenanced but that stern measures should be adopted for their suppression. The feeling here is that the missionary organizations constitute a constant menace to peaceful international relations."

Shall we? That is, shall we go on conferring our Civilization upon the peoples that sit in darkness, or shall we give those poor things a rest? Shall we bang right ahead in our old-time, loud, pious way, and commit the new century to the game; or shall we sober up and sit down and think it over first? Would it not be prudent to get our Civilization-tools together, and see how much stock is left on hand in the way of Glass Beads and Theology, and Maxim Guns and Hymn Books, and Trade-Gin and Torches of Progress and Enlightenment (patent adjustable ones, good to fire villages

প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক সভ্যতারও মূলে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল। সেই জন্য রাষ্ট্রীয়-মহত্ত্ব-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক্ ও রোমক সভ্যতার অধঃপতন হইয়াছে। হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই জন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।

'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল্ মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশনগঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজমহারাজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ লাভ করি। আমাদের গৃহস্থের কর্ত্তব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতি কর্ত্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—

> ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
> যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল্ কর্ত্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই, আমরা য়ুরোপকে ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবে মউজর্ বন্দুক্ ও দম্‌দম্ বুলেটের সাহায্যে বড় হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব, স্বতন্ত্র হইব, আমাদের বিজেতাদের অপেক্ষা ন্যূন হইব না। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে দরখাস্তের দ্বারা যাহা পাইব, তাহার দ্বারা আমরা কিছুই বড় হইব না।

পনেরো ষোলো শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল নহে। নেশন্‌ই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি, তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চারিত্র আদর্শ উচ্চতম

with, upon occasion), and balance the books, and arrive at the profit and loss, so that we may intelligently decide whether to continue the business or sell out the property and start a new Civilization Scheme proceeds ?

Extending the Blessings of Civilization to our Brother who Sits in Darkness has been a good trade and has paid well, on the whole ; and there is money in it yet, if carefully worked—but not enough, in my judgment, to make any considerable risk advisable. The people that Sit in Darkness are getting to be too scarce—too scarce and too shy. And such darkness as is now left is really of but an indifferent quality, and not dark enough for the game. The most of those People that Sit in Darkness have been furnished with more light than was good for them or profitable for us. We have been injudicious.

নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।

এই ন্যাশনাল্ আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই? আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাগুলির মধ্যে কি নানাপ্রকার মিথ্যা, চাতুরী ও আত্মগোপনের প্রাদুর্ভাব নাই? আমরা কি যথার্থ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে শিখিতেছি? আমরা কি পরস্পর বলাবলি করি না যে, নিজের স্বার্থের জন্য যাহা দূষণীয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য তাহা গর্হিত নহে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেই কি বলে না?—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাৎ ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতো বধীৎ॥

বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, তাহাই বিচার্য্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্ম্মকে পীড়িত করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকে যেন ঈর্ষা এবং তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া বরণ না করি।

আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন্ গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।

খুশ্‌রোজ্।

মোগল বাদশাহদিগের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে 'খুশ্‌রোজ্ ও নওরোজা' পর্ব্ব একটি প্রধান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাদশাহদিগের সময় বিভিন্ন আকারে ইহা প্রচলিত থাকিলেও, সম্রাট্‌কুলগৌরব সূর্য্যোপাসক আক্‌বরশাহ ইহাতে আমোদের সঙ্গে ধর্ম্মের একটুখানি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন ও তাঁহার রাজ্যত্বকালেই ইহা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত সমাধা হইত। নববর্ষের প্রারম্ভে আমীর-ওম্‌রাহদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া ভোজ দেওয়া একটি প্রাচীন প্রথা বটে; কিন্তু সম্রাট্ আক্‌বর এই প্রথার সহিত পারসীকদের সূর্য্যোপাসনার যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর বৈশাখের প্রথমদিনে সূর্য্য যখন

মেষরাশিতে প্রবেশ করেন, তখন এই নওরোজা পর্ব্ব আরম্ভ হইত। প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ মাসের উনবিংশ দিন পর্য্যন্ত এই উৎসব থাকিত। এই উনবিংশতি দিবস রাজ্যময়, বিশেষত রাজধানী আগ্রায়, আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইত। পুষ্পমালায়, বিবিধবর্ণের কেতনে, বিবিধ দেশ হইতে সমাগত বণিক্‌দিগের নয়নরঞ্জন পণ্যবীথিকায়, শোভন আলোকমালায়, বিচিত্র তোরণসজ্জায়, রাজধানী অভিনববেশে সজ্জিত হইয়া নববৈশাখের বিকসিত বাসন্তী শ্রীকে আরও মনোরম করিয়া তুলিত। ইহার সহিত হরিণনেত্রের কটাক্ষ, স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিতধ্বনি, কলকণ্ঠের তাললয়পরিশুদ্ধ সঙ্গীতমাধুরী মিশিয়া রাজপ্রাসাদে যে উৎসব উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিত, তাহা আজ তিনশত বৎসরের পর অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

খুশ্‌রোজ্ অর্থাৎ আনন্দের দিন, নওরোজা বা নববর্ষের প্রথমদিবস। আক্‌বরের চরিতাখ্যায়ক বদৌনি শেষোক্ত পর্ব্বকে আর একটি বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন, "নওরোজা জলালি।" "জলালি"-শব্দের শব্দগত অর্থ—গৌরবময়, উজ্জ্বল, বিখ্যাত, শক্তিপূর্ণ ইত্যাদি। আমাদের ক্ষুদ্র বোধে এ অর্থ না করিয়া আক্‌বরের জলাল্‌উদ্দীন্ নাম হইতে ইহার অর্থ করা আরও সঙ্গত।* এ অর্থ করিলে 'আক্‌বরের সাময়িক বা আক্‌বর-কর্তৃক প্রচলিত' বুঝায়। 'জলালির' উৎপত্তি যাহা হইতে হউক, বৎসরের প্রথম উৎসবের দিন বলিয়া ইহাকে 'নওরোজা' নাম দেওয়া হইয়াছিল। বসন্তের সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একটা না একটা পর্ব্ব প্রচলিত দেখা যায়। এ সময় বাহ্যপ্রকৃতি যখন নবীন শ্যামলিমায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, যখন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, তখন মানবমনও স্বতই উল্লাসাবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে। প্রাচীন রোমানেরা এজন্য এ সময় 'ল্যুপার্কেলিয়া' উৎসবে মত্ত হইতেন। ইংরাজদের 'মে ফেষ্টিভাল্' ও আমাদের দেশের হোলিকোৎসবও প্রকৃতির বসন্তলীলার সহিত যোগদান। আক্‌বর এ দেশের এই বসন্তোৎসবের সহিত পার্শী সম্প্রদায়ের সূর্য্যোপাসনা মিশাইয়া এই অভিনব নওরোজা পর্ব্বের সৃষ্টি করেন।

নববর্ষের প্রথম দিনে সম্রাট্ একটি বৃহৎ ভোজ দিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রথম দিন হইতে উনবিংশ দিবস পর্য্যন্ত এই পর্ব্ব প্রচলিত থাকিত। তাহার মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও উনবিংশ দিবসে বিশেষ উৎসব হইত। প্রথম ও উনবিংশ দিবসে সম্রাট্ রাজ্যের প্রধান প্রধান আমীর্-ওম্‌রাহ্‌দিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া একটি বৃহৎ ভোজ দিতেন। এতদ্ব্যতীত ঐ দুই দিবসে দীনদরিদ্রদিগকে অনেক অর্থ বিতরণ করা হইত। মাসের তৃতীয় দিনের ব্যাপারবর্ণনাই আমাদের প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়।

* আকবরের পুরা নাম—সুলতান্ মহম্মদ জলালুদ্দীন্ পাদিশা-ঈ-গাজী।

আইন-ঈ-আক্‌বরীর ব্লক্‌ম্যান্-কৃত অনুবাদের একস্থলে কিন্তু এই পুরা নাম একটু পৃথক্ আকারে দেখা যায়, যথা—আবুল্ ফথ্ জলালুদ্দীন্ মহম্মদ আক্‌বর পাদিশা-ঈ-গাজী।

বাঙলার ঐতিহাসিকেরা খুশ্‌রোজ ও নওরোজার মধ্যে প্রভেদ করেন না, কিন্তু এক-পর্ব্বসংক্রান্ত হইলেও দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিবসের ঘটনা। ইহার প্রথম দিবসের নাম 'নওরোজ্' অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিন ও তৃতীয় দিবসের নাম 'খুশ্‌রোজ্' আনন্দের দিন। আবার 'নওরোজা' বা নববর্ষের ভোজ বৎসরে একদিন হইত, কিন্তু 'খুশ্‌রোজ্' প্রত্যেক মাসেই হইত। আবুল্‌ফজল্ বলেন, এই দিনে দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট্ আক্‌বর রাজ্যের গুপ্ত রহস্য, বিভিন্ন প্রদেশের প্রজাদের চরিত্র ও অভাব এবং নানাদেশের বিবিধ তথ্য অবগত হইবার জন্য এক বৃহতী মেলা আহ্বান করিতেন। এই মেলা পাশ্চাত্য Fancy-Bazar ধরণের হইত। (ব্লক্‌ম্যান্ সাহেব এ কথার এই অনুবাদই দিয়াছেন।) এই বৃহতী মেলায় অসম্ভব অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবার আশায় বহুদূর দেশ হইতে বহুদেশের বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য লইয়া সওদাগরেরা সমাগত হইত। এই খুশ্‌রোজ্ উৎসবের বর্ণনা করিতে গিয়া যদিও আবুল্‌ফজল্ এই সমস্ত দ্রব্যের কোনও বিশেষ বর্ণনা করেন নাই, তথাপি তাঁহার ও বদৌনির ইতিহাসের অন্যান্য স্থানের বর্ণনায়, ও বর্ণিয়ে, ট্যাভারনিয়ে প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ভাস্বর বর্ণনায়, সে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের কতক উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সমস্ত দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা, বোধ হয়, আধুনিক পাঠকদের নিকট অপ্রীতিকর হইবে না। পারস্য, সীরিয়া, বেরুট্ হইতে উৎকৃষ্ট গালিচা ও রেশ্‌মী দ্রব্য, সিরাজ হইতে উৎকৃষ্ট 'সিরাজী'নামক-মদিরা, কাশ্মীর হইতে মহার্ঘ বিবিধ বর্ণের শাল, হীরাট, গুর্জ্জর, য়ুরোপ প্রভৃতি স্থান হইতে জরিখচিত সুন্দর মখ্‌মল্, পারস্য ও কাবুল হইতে উৎকৃষ্ট কিংখাব্, বঙ্গদেশ হইতে উৎকৃষ্ট রেশ্‌মী বস্ত্র, গন্ধগোকুল-নামক জন্তুর গাত্রোৎপন্ন গন্ধদ্রব্য, লাক্ষা, মরীচ, মোম, অহিফেন, নানাপ্রকারের ওষধি, বিবিধ প্রকারের পক্ষী, দিল্লী ও মুরশিদাবাদের হস্তিদন্তনির্ম্মিত খেলানা, সুদূর মলয়াচল হইতে আনীত শ্বেত, রক্ত পীত, তিন প্রকারের চন্দন, * জয়পুর ও রাজধানী আগ্রায় নির্ম্মিত শ্বেতপ্রস্তরের (সঙ্ মর্ম্মর) খেলানা, সমুদ্রতল হইতে সংগৃহীত অম্বর-নামক সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য, সাইপ্রাস্ হইতে আনীত লাদন, চীন ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত কর্পূর, আচীন ও মধ্যভারত হইতে আনীত অগুরু, গুগ্‌গুল্, গোরা, মীদ্, চুয়া, শিলারস, লুবান, কলাম্বক প্রভৃতি বাদশাহী গন্ধদ্রব্য লইয়া কত দেশ হইতে কত সওদাগর আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করিত। ইহা ছাড়া, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক ও নানাবিধ মণিমুক্তার দোকান সজ্জিত হইত। মোগল বাদ্‌শাহেরা, বিশেষত সম্রাট্ আক্‌বর, পুষ্পের বড় ভক্ত ছিলেন ও বহুযত্নে তিনি বিবিধ পুষ্প সংগ্রহ করাইতেন। ভারতবর্ষের ন্যায় এত বিভিন্ন উৎকৃষ্ট সুগন্ধি পুষ্প পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আছে কি না, সন্দেহ। আবুল্‌ফজল্

* আবুল্‌ফজল্ চন্দনের উৎপত্তিস্থল চীনদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় জানা যায়, মলয়াবারই ইহার প্রধান উৎপত্তিস্থান।

তাঁহার ইতিহাসগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই পুষ্পবহুল দেশেও পুষ্পের উৎপাদনে কোন যত্ন করা হইত না, কিন্তু সম্রাট্‌ বাবরের সময় এখানকার পুষ্পোদ্যান বহুযত্নে তৈয়ারি করা হইত। এরূপ প্রাসাদসংলগ্ন নয়নাভিরাম উদ্যানমালা বৈদেশিক পর্য্যটকের ভূয়সী প্রশংসার বিষয়ীভূত হইয়াছে। এই উৎসবে যে সব পুষ্পের বিপণি বসিত, সে বিচিত্র বর্ণের বিবিধ পুষ্পরাজির নাম পর্য্যন্তও আজকাল শুনিতে পাই না। তাহারা মোগলরাজত্বের অন্যান্য ঐশ্বর্য্যগৌরবের সহিতই যেন ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেঁউতি, চম্পা, কেতকী, কেওড়া, * চাল্‌তা, তস্‌বীগুলাল্‌, চামেলি, রায়বেল, কপূরবেল, সিঙারহর (হরশিঙ্গার বা শেফালিকা), পাদল্‌, মুঙ্‌রা, যূহী (যূথিকা), নিওয়ারী, জাফ্রাণ, আফ্‌তাবী ও কম্বাল (বিভিন্ন প্রকারের সূর্য্যমুখী), জফরী, রত্নমঞ্জরী, রত্নমালা, কেশু, কনের, কদম্ব, নাগকেশর, সুর্‌পন্‌, শ্রীখণ্ডী, হেনা, হুপহরিয়া, ভূচম্পা (ভূমিচম্পক), সুদর্শন, সেনবেল, সুন্‌জার্দ্দ, মালতী, ধনন্তর, শিরীষ ইত্যাদি পুষ্পের হাট বসিয়া যাইত। আবুল্‌ফজল্‌ আরও কত পুষ্পের উৎকট পারসী নাম দিয়াছেন, তাহার তালিকা দিয়া পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না।

ফলের বাজারে—ইরাণ, তুরাণ, সমর্খন্দ, কাবুল ও কান্দাহার হইতে ফলবিক্রেতা আসিত—অনেক সুস্বাদু মহার্ঘ ফল আনিত। অরহুও ও কাবুলের তরমুজ, আবজোস, সমরখন্দের আপেল, কান্দাহার ও কাশ্মীরের সুমিষ্ট রসপূর্ণ দ্রাক্ষাফল, সিঞ্জিদ্‌, খোবানি, নাস্‌পাতি, মনক্কা, চিলগুজা, ভোল্‌সিরি, পনিয়ালা, গুস্তী, তারী, পিয়ার, আম্র, শালক, পিণ্ডালু, শিয়ালি, অমলবেৎ, কর্ণা প্রভৃতি বিচিত্র সুস্বাদু ফলসমূহের অনেকগুলির নাম কেবল ইতিহাসগত হইয়া আছে—এতকাল পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়াও ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ফল কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, অথচ আবুল্‌ফজল্‌ সেগুলিকে অতি সুস্বাদু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বাজার বোধ হয় প্রাসাদের নিকটেই বসিত। আবুল্‌ফজল্‌ ও বদৌনি প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা কোন্‌ স্থানে যে এ মেলা বসিত, তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই। তবে যখন বেগম ও অন্যান্য হারেমের লোকেরা এই উৎসবে যোগ দিতেন, তখন বোধ হয় যে, প্রাসাদের সমীপস্থ কোন স্থানে অথবা প্রাসাদের ভিতরের বৃহৎ প্রাঙ্গণে এই বৃহৎ বাজার বসিত। রমণীদের মেলার দিন বেগমেরা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত আমীর-ওম্‌রাহদের পরিবারেরা এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইতেন। সে দিন বাদ্‌শাহ ব্যতীত অন্য পুরুষের সম্পর্কমাত্র থাকিত না—শাহজাদারাও এই দিনে মেলায় আসিতে অনুমতি পাইতেন না। রমণীতে কিনিত, রমণীতেই বেচিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্ব্ব বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন—

* কেতকী ও তাহার অপভ্রংশ কেওড়া আমরা একবিধ পুষ্প বলিয়া জানি; কিন্তু আবুল্‌ফজল্‌ ইহাদের মধ্যে এই প্রভেদ দেখাইয়াছেন যে, কেতকী ক্ষুদ্র ও কেওড়া আকারে উহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃহৎ ও কেওড়ার পাতায় কাঁটা আছে। তবে আর আর বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য দেখা যায়।

রমণীতে বেচে রমণীতে কেনে
লেগেছে রমণীরূপের হাট !

বস্তুত সে এক বিচিত্র দৃশ্য ! সেই অমরাবতীলাঞ্ছিত রাজধানীর বিচিত্র প্রাসাদে, সেই নন্দননিন্দি-উদ্যানমালায়, সেই উর্ব্বশী-রম্ভা-মেনকার গর্ব্বখর্ব্বকারিণী সুন্দরীদিগের সমাগমে, সেই বিবিধ বর্ণের বিচিত্রকারু-কার্য্যখচিত-স্ফাটিকাধারবর্ত্তি-সুগন্ধি-দীপাবলীর আলোকচ্ছটায়, সৌন্দর্য্যের যে তরঙ্গ উঠিত, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য ! উৎসবের এ দিনে সম্রাটের অগণিত অর্থব্যয় হইত। অনেক সম্ভ্রান্ত আমীর-ওমরাহের পত্নীরা সমাগত হইতেন—তাঁহাদের অনেক দোকান বসিত। বেগমেরা ও স্বয়ং সম্রাট্ যখন ক্রেতা, তখন পণ্যদ্রব্য অত্যধিক অসম্ভব মূল্যে বিক্রীত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? সম্রাটের অনেক অন্তঃপুরিকা আবার নানা-কারুকার্য্যনিপুণা। তাঁহাদের হস্তনির্ম্মিত অনেক দ্রব্য আবার তাঁহাদের পরিচারিকাদের দ্বারায় বিক্রীত হইত। স্বয়ং বাদশাহ এই সব দ্রব্য ক্রয় করিয়া বেগমদের শিল্প-বিদ্যার উৎসাহ দিতেন। ইহা ছাড়া, বদৌনি বলেন, এ দিনে হারেমের (রাজান্তঃপুরের) অন্যান্য গুরুতর কার্য্যের মীমাংসা ও অবরোধ-বাসিনীদের পুত্রকন্যার পরিণয়সম্বন্ধের কথা স্থির হইত। কথিত আছে যে,জাহাঙ্গীর-মাতা মরিয়ম্ উজ্ঝমানীকে (হিন্দুনাম দুষ্প্রাপ্য) এই খুশ্‌রোজ উৎসবে দেখিয়া, তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, আক্‌বর তাঁহাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। *

এই উৎসবে সম্ভ্রান্ত আমীর-ওমরাহ ও অধীন রাজাদের পরিবারস্থ মহিলাদের যে উপস্থিত থাকিতে হইত, ইহাতে শুভফল উৎপন্ন হয় নাই। ইহাতে যে অনেক রাজ-সভাসদ্ আন্তরিক বিরক্ত হইতেন, এরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আইন্-ঈ-আকবরী-লেখক আবুল্‌ফজল্, এ উৎসবে সম্রাট্ রাজ্যের গুপ্ত বৃত্তান্ত প্রভৃতি অবগত হইতেন, এই বলিয়া তাঁহার বুদ্ধি-বিচক্ষণতার প্রশংসা করিয়াছেন ; তথাপি বিরুদ্ধমত আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, উৎসবে এরূপ স্ত্রীলোক আনয়ন করিয়া দিল্লীশ্বর রাজ্যে অনেক অন্তঃসলিল বিদ্বেষস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেক হিন্দু মুসল্‌মান্ ওমরাহ ইহাতে আন্তরিক বিরক্ত ছিলেন। আবুল্‌ফজল্ এই বিরক্তির—এই অসন্তোষের আভাসমাত্রও দেন নাই। তবে তিনি যেরূপ সম্রাটের অনুরক্ত ভক্ত, (এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বলিবেন—নীচ চাটুকার) তাহাতে তাঁহার সকল কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব। অন্তত সত্য বিচার করিতে হইলে দুপক্ষের কথা শুনা উচিত। বিপক্ষপক্ষের মধ্যে ঐতিহাসিক বদৌনি একজন প্রধান। তিনি বলেন যে, অন্তঃপুরিকাদের এরূপ মেলায় আসিতে দিয়া আক্‌বর ইস্‌লামধর্ম্মের মূলে আর এক কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। বস্তুত

* আমাদের দেশের ও বিদেশের অনেক ঐতিহাসিক আক্‌বরের এই মহিষীকে 'যোধবাই' নাম দিয়াছেন। অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যান্ দেখাইয়াছেন যে, যোধবাই জাহাঙ্গীরের মাতা নহেন, পত্নী। তিনি যোধপুরের রাজা উদয়-সিংহের দুহিতা ও সাহাজাহানের জননী। জাহাঙ্গীরের জননী রাজা বিহারী মল্লের দুহিতা ও রাজা ভগবান্‌দাসের ভগিনী। (Vide the translation of Ayin-i-Akbari p. 619).

নিজের ঘরের অসূর্য্যম্পশ্যা কুলললনা সহজ অপর পুরুষের নেত্রপথবর্ত্তিনী হইবেন, ইহা অনেকেরই অসহ্য হইয়াছিল। কথিত আছে, রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের নিকট যখন আক্‌বর সন্ধিপ্রস্তাব করিয়া পাঠান, তাহাতে খুশ্‌রোজ্‌ উৎসবে নিজের অন্তঃপুরবাসিনীদের উৎসবে যোগ দিতে দিবেন, এ সর্ত্ত থাকায়, সেই বীরকেশরী অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন।

স্ত্রীলোকদের এই বাজারের পর, পুরুষদের এই 'ফ্যান্সি বাজার' বসিত। উহার বিশেষ কিছু বর্ণনা করিবার নাই। ইহাতে যে সব দ্রব্য বিক্রীত হইত, তাহার তালিকা পূর্ব্বে দিয়াছি। যে সমস্ত লোকেরা দরবারে আশা যতগুলা লাইনে চোখ বুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেন্দ্র ক্ষুণ্ণস্বরে বলে— ঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা তত্ত্বাবধি দেখিবে?" বলিয়া তাহার ডাক্তারী তাও, সম্রাট একটা অধ্যায়ের শিরোনামাটুকু প্রতিরুদ্ধ না হইয়া,!—আশা বিস্ময়ে চোখ দেখাইতে,—স্বীয় দুঃখ "তবে এতক্ষণ কি পারিত। বাদশাহ অবস্থা র চিবুক ধরিয়া সাধু বিক্রেতাদিগকে পুরস্কার তছিলাম, অসৎ বিক্রেতাদিগকে শাস্তি দিতেন। সেই স্থলেও সওদাগরেরা জিনিষ বেচিয়া প্রচুর লাভ করিত। সম্রাট্‌ বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যাদি সম্বন্ধে তদারক ও মূল্যাদির হিসাব রাখিতে স্বতন্ত্র কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারী রাখিয়াছিলেন।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

চোখের বালি

(৫)

কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শস্যদল শুষ্ক পীতবর্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া দেয়, দুর্ব্বলনতভাব ত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অসঙ্কোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আশার সেইরূপ হইল। যেখানে তাহার রক্তের সম্বন্ধ ছিল, সেখানে সে কখনো আত্মীয়তার দাবী করিতে পায় নাই; আজি পরের ঘরে আসিয়া সে যখন বিনা প্রার্থনায় এক নিকটতম সম্বন্ধ এবং নিঃসন্দিগ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হইল, যখন সেই অযত্নলালিতা অনাথার মস্তকে স্বামী স্বহস্তে লক্ষ্মীর মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরবপদ গ্রহণ করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না, —নববধূযোগ্য লজ্জাভয় দূর করিয়া দিয়া সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল;—তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি তোমার পড়ার কি বাধা দিয়াছি?"

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি তাহার কি বুঝিবে? আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না!"

গুরুতর দোষারোপ! ইহার পরে স্বভাবতই শরতের একপস্‌লার মত একদফা কান্নার সৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি সজল উজ্জ্বলতা রাখিয়া সোহাগের সূর্য্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হয়, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কি, বিদ্যারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে? মাঝে মাঝে মাসীমার তীব্র ভর্ৎসনা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হয়—বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা-মাত্র; শাশুড়িকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাশুড়ি তাহাকে কোন কাজ করিতে বলেন না, কোন উপদেশ দেন না; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শাশুড়ির গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে গেলে, তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন—"কর কি, কর কি, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে!"

অবশেষে অন্নপূর্ণা আশাকে কহিলেন, "তোর যা শিক্ষা হইতেছে, সে ত দেখিতেছি, এখন মহিন্‌কেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না?"

শুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল—মহেন্দ্রকে বলিল, "তোমার এগ্‌জামিনের পড়া হইতেছে না—আজ হইতে আমি নীচে মাসীমার ঘরে গিয়া থাকিব!"

এ বয়সে এত বড় কঠিন সন্ন্যাসব্রত! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসীমার ঘরে আত্মনির্ব্বাসন! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোখের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য ক্ষুদ্র অধর কাঁপিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তাই চল, কাকীর ঘরেই যাওয়া যাক্—কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে উপরে আমাদের ঘরে আসিতে হইবে।"

আশা এত বড় উদার গম্ভীর প্রস্তাবে পরিহাস প্রাপ্ত হইয়া রাগ করিল। মহেন্দ্র কহিল—"তার চেয়ে তুমি স্বয়ং দিনরাত্রি আমাকে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দাও, দেখ আমি এগ্‌জামিনের পড়া মুখস্ত করি কি না!"

অতি সহজেই সেই কথা স্থির হইল। চোখে চোখে পাহারার কার্য্য কিরূপ ভাবে নির্ব্বাহ হইত, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক—কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে বৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল্ করিল এবং চারুপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা-সত্ত্বেও পুরুভুজসম্বন্ধে আশার অনভিজ্ঞতা দূর হইল না!

এইরূপ অপূর্ব্ব পঠন-পাঠন-ব্যাপার যে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বিহারী মাঝে মাঝে আসিয়া অত্যন্ত গোল বাধাইয়া দিত। "মহিন্ দা, মহিন্ দা" করিয়া সে পাড়া মাথায়

করিয়া তুলিত। মহেন্দ্রকে তাহার শয়ন-গৃহের বিবর হইতে টানিয়া না বাহির করিয়া সে কোনমতেই ছাড়িত না। পড়ায় শৈথিল্য করিতেছে বলিয়া, সে মহেন্দ্রকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিত। আশাকে বলিত, "বোঠা'ণ, গিলিয়া খাইলে হজম হয় না, চিবাইয়া খাইতে হয়—এখন সমস্ত অন্ন এক-গ্রাসে গিলিতেছ, ইহার পরে হজমিগুলি খুঁজিয়া পাইবে না।"

মহেন্দ্র বলিত, "চুনি, ও কথা শুনিয়ো না—বিহারী আমাদের সুখে হিংসা করিতেছে।"

বিহারী বলিত—"সুখ যখন তোমার হাতেই আছে, তখন এমন করিয়া ভোগ কর, যাহাতে পরের হিংসা না হয়!"

মহেন্দ্র উত্তর করিত, "পরের হিংসা পাইতে যে সুখ আছে! চুনি, আর একটু হইলেই আমি গর্দ্দভের মত তোমাকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিতেছিলাম!"

বিহারী রক্তবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিত—"চুপ!"

এই সকল ব্যাপারে আশা মনে মনে বিহারীর উপরে ভারি বিরক্ত হইত। এক সময় তাহার সহিত বিহারীর বিবাহপ্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়াই বিহারীর প্রতি তাহার এক-প্রকার বিমুখ ভাব ছিল, বিহারী তাহা বুঝিত এবং মহেন্দ্র তাহা লইয়া আমোদ করিত।

রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকিয়া দুঃখ করিতেন। বিহারী কহিত, "মা, পোকা যখন গুটি বাঁধে, তখন তত বেশি ভয় নয়—কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায়, তখন ফেরানো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও তোমার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে?"

মহেন্দ্রের ফেল্‌ করা-সংবাদে রাজলক্ষ্মী গ্রীষ্মকালের আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের মত দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার গর্জ্জন এবং দাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন অন্নপূর্ণা। তাঁহার আহার-নিদ্রা দূর হইল।

(৬)

একদিন নববর্ষার বর্ষণমুখরিত মেঘাচ্ছন্ন সায়াহ্নে গায়ে একখানি সুবাসিত ফুর্‌ফুরে চাদর এবং গলায় একগাছি জুঁইফুলের গোড়ে মালা পরিয়া মহেন্দ্র আনন্দমনে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। হঠাৎ আশাকে বিস্ময়ে চকিত করিবে বলিয়া জুতার শব্দ করিল না। ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, পূবদিকের খোলা জানালা দিয়া প্রবল বাতাস বৃষ্টির ছাঁট লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে;—বাতাসে দীপ নিবিয়া গেছে এবং আশা নীচের বিছানার উপরে পড়িয়া অব্যক্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে!

মহেন্দ্র দ্রুতপদে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

বালিকা দ্বিগুণ আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র ক্রমশ উত্তর পাইল যে, মাসীমা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পিস্‌তুত ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেছেন।

মহেন্দ্র রাগিয়া মনে করিল—"গেলেন যদি, এমন বাদলার সন্ধ্যাটা মাটি করিয়া গেলেন!"

শেষকালে সমস্ত রাগ মাতার উপরে পড়িল। তিনিই ত সকল অশান্তির মূল!

মহেন্দ্র কহিল—"কাকী যেখানে গেছেন, আমরাও সেখানে যাইব, দেখি, মা কাহাকে লইয়া ঝগড়া করেন!"

বলিয়া অনাবশ্যক সোর্‌গোল্ করিয়া জিনিষপত্র-বাঁধাবাঁধি মুটে-ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলেন। ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতে'ছস্?"

মহেন্দ্র প্রথমে কোন উত্তর করিল না। দুইতিন বার প্রশ্নের পর উত্তর করিল, "কাকীর কাছে যাইব।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তোদের কোথাও যাইতে হইবে না, আমিই তোর কাকীকে আনিয়া দিতেছি।"

বলিয়া তৎক্ষণাৎ পাল্কী চড়িয়া অন্নপূর্ণার বাসায় গেলেন। গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া কহিলেন—"প্রসন্ন হও মেজবৌ, মাপ কর!"

অন্নপূর্ণা শশব্যস্ত হইয়া রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলা লইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "দিদি, কেন আমাকে অপরাধী করিতেছ? তুমি যেমন আজ্ঞা করিবে, তাই করিব!"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তুমি চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া আমার ছেলে-বৌ ঘর ছাড়িয়া আসিতেছে।" বলিতে বলিতে অভিমানে ক্রোধে ধিক্কারে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দুই জা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের ঘরে যখন গেলেন, তখন আশার রোদন শান্ত হইয়াছে এবং মহেন্দ্র নানা কথার ছলে তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, বাদলার সন্ধ্যাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না যাইতেও পারে।

অন্নপূর্ণা কহিলেন—"চুনি, তুই আমাকে ঘরেও থাকিতে দিবি না, অন্য কোথাও গেলেও সঙ্গে লাগিবি? আমার কি কোথাও শান্তি নাই?"

আশা অকস্মাৎ বিদ্ধমৃগীর মত চকিত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র একান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন কাকী, চুনী তোমার কি করিয়াছে?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বৌ-মানুষের এত বেহায়াপনা দেখিতে পারি না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার শাশুড়িকে কাঁদাইয়া কেন আমাকে ধরিয়া আনিল পোড়ামুখী?"

জীবনের কবিত্ব-অধ্যায়ে মা-খুড়ী যে এমন বিঘ্ন, তাহা মহেন্দ্র জানিত না!

পরদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাছা, তুমি একবার মহীন্‌কে বল, অনেকদিন দেশে যাই নাই, আমি বারাসতে যাইতে চাই।"

বিহারী কহিল—"অনেকদিনই যখন যান নাই, তখন আর নাই গেলেন। আচ্ছা, আমি মহীন্‌দাকে বলিয়া দেখি, কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হইবে, তা বোধ হয় না!"

মহেন্দ্র কহিল, "তা, জন্মস্থান দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে! কিন্তু বেশিদিন মার সেখানে না থাকাই ভাল—বর্ষার সময় জায়গাটা ভাল নয়।"

মহেন্দ্র সহজেই সম্মতি দিল দেখিয়া বিহারী বিরক্ত হইল। কহিল—"মা একলা যাইবেন, কে তাঁহাকে দেখিবে? বোঠা'ণ-

কেও সঙ্গে পাঠাইয়া দাও না!" বলিয়া একটু হাসিল।

বিহারীর গূঢ় ভর্ৎসনায় মহেন্দ্র কুণ্ঠিত হইয়া কহিল—"তা বুঝি আর পারি না!" কিন্তু কথাটা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইল না।

এমনি করিয়াই বিহারী আশার চিত্ত বিমুখ করিয়া দেয়, এবং আশা তাহার উপরে বিরক্ত হইতেছে মনে করিয়া, সে যেন এক-প্রকারের শুষ্ক আমোদ অনুভব করে।

বলা বাহুল্য, রাজলক্ষ্মী জন্মস্থান দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন না। গ্রীষ্মে নদী যখন কমিয়া আসে, তখন মাঝি যেমন পদে পদে লগি ফেলিয়া দেখে, কোথায় কত জল,—রাজলক্ষ্মীও তেমনি ভাবান্তরের সময় মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে লগি ফেলিয়া দেখিতে-ছিলেন। তাঁহার বারাসতে যাওয়ার প্রস্তাব যে এত শীঘ্র এত সহজেই তল পাইবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই। মনে মনে কহিলেন, "অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগে এবং আমার গৃহত্যাগে প্রভেদ আছে,—সে হইল মন্ত্র-জানা ডাইনি, আর আমি হইলাম শুদ্ধমাত্র মা, আমার যাওয়াই ভাল!"

অন্নপূর্ণা ভিতরকার কথাটা বুঝিলেন, তিনি মহেন্দ্রকে বলিলেন, "দিদি গেলে আমিও থাকিতে পারিব না!"

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে কহিল, "শুনিতেছ মা? তুমি গেলে কাকীও যাইবেন, তাহা হইলে আমাদের ঘরের কাজ চলিবে কি করিয়া?"

রাজলক্ষ্মী বিদ্বেষবিষে জর্জ্জরিত হইয়া কহিলেন, "তুমি যাইবে মেজ বৌ? এও কি কখন হয়? তুমি গেলে চলিবে কি করিয়া? তোমার থাকা চাইই!"

রাজলক্ষ্মীর আর বিলম্ব সহিল না। পর-দিন মধ্যাহ্নেই তিনি দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত। মহেন্দ্রই যে তাঁহাকে দেশে রাখিয়া আসিবে, এ বিষয়ে বিহারীর বা আর কাহারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল, মহেন্দ্র মার সঙ্গে একজন সরকার ও দরোয়ান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বিহারী কহিল, "মহিন্‌দা, তুমি যে এখনো তৈরি হও নাই?"

মহেন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, "আমার আবার কালেজের—"

বিহারী কহিল—"আচ্ছা তুমি থাক, মাকে আমি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।"

মহেন্দ্র মনে মনে রাগিল। বিরলে আশাকে কহিল, "বাস্তবিক বিহারী বাড়া-বাড়ি আরম্ভ করিয়াছে! ও দেখাইতে চায়, যেন ও আমার চেয়ে মার কথা বেশী ভাবে!"

অন্নপূর্ণাকে থাকিতে হইল, কিন্তু তিনি লজ্জায় ক্ষোভে ও বিরক্তিতে সঙ্কুচিত হইয়া রহিলেন। খুড়ীর এইরূপ দূরভাব দেখিয়া মহেন্দ্র রাগ করিল এবং আশাও অভিমান করিয়া রহিল।

(৭)

রাজলক্ষ্মী জন্মভূমিতে পৌঁছিলেন। বিহারী তাঁহাকে পৌঁছাইয়া চলিয়া আসিবে, এরূপ কথা ছিল, কিন্তু সেখানকার অবস্থা দেখিয়া সে ফিরিল না।

রাজলক্ষ্মীর পৈতৃক বাটীতে দুই একটি

অতিবৃদ্ধা বিধবা 'বাঁচিয়া ছিলেন মাত্র। চারিদিকে ঘন জঙ্গল ও বাঁশবন, পুষ্করিণীর জল সবুজবর্ণ, দিনে দুপুরে শৃগালের ডাকে রাজলক্ষ্মীর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

বিহারী কহিল, "মা, জন্মভূমি বটে, কিন্তু 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কোনমতেই বলিতে পারি না। কলিকাতায় চল! এখানে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমার অধর্ম্ম হইবে।"

রাজলক্ষ্মীরও প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিল এবং আশ্রয় করিল।

বিনোদিনীর পরিচয় প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। এক সময়ে মহেন্দ্র এবং তদভাবে বিহারীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। বিধিনির্ব্বন্ধে যাহার সহিত তাহার শুভবিবাহ হয়, সে লোকটির সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে প্লীহাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। সেই প্লীহার অতিভারেই সে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারিল না।

তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মত, নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মুহ্যমানভাবে জীবন-যাপন করিতেছিল। অদ্য সেই অনাথা আসিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী পিস্‌-শাশ ঠাকরুণকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিল।

সেবা ইহাকেই বলে! মুহূর্ত্তের জন্য আলস্য নাই! কেমন পরিপাটি কাজ, কেমন সুন্দর রান্না, কেমন সুমিষ্ট কথাবার্ত্তা!

রাজলক্ষ্মী বলেন—"বেলা হইল মা, তুমি দুটি খাওগে যাও!"

সে কি শোনে! পাখা করিয়া পিসিমাকে ঘুম না পাড়াইয়া সে উঠে না।

রাজলক্ষ্মী বলেন, "এমন করিলে যে তোমার অসুখ করিবে মা!"

বিনোদিনী নিজের প্রতি নিরতিশয় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলে—"আমাদের দুঃখের শরীরে অসুখ করে না পিসিমা। আহা, কতদিন পরে জন্মভূমিতে আসিয়াছ, এখানে কি আছে, কি দিয়া তোমাকে আদর করিব!"

বিহারী দুইদিনে পাড়ার কর্ত্তা হইয়া উঠিল। কেহ তাহার কাছে রোগের ঔষধ, কেহ বা মকদ্দমার পরামর্শ লইতে আসে, কেহ বা নিজের ছেলেকে বড় আপিসে কাজ জুটাইয়া দিবার জন্য তাহাকে ধরে, কেহ বা তাহার কাছে দরখাস্ত লিখাইয়া লয়। বৃদ্ধদের তাস-পাশার বৈঠক হইতে বাগ্‌দিদের তাড়ি-পানসভা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সে তাহার সকৌতুক কৌতূহল এবং স্বাভাবিক হৃদ্যতা লইয়া যাতায়াত করিত—কেহ তাহাকে দূর মনে করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান করিত।

বিনোদিনী অন্তঃপুরের অন্তরাল হইতে, এই অস্থানে পতিত কলিকাতার ছেলেটির নির্ব্বাসনদণ্ড যথাসাধ্য লঘু করিবার চেষ্টা করিত। বিহারী প্রত্যেকবার পাড়া পর্য্যটন করিয়া আসিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে প্রত্যেকবার পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, একটি কাঁসার গ্লাসে দুচারটি ফুল এবং পাতার তোড়া সাজাইয়াছে এবং তাঁহার গদির একধারে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী গুছাইয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থের ভিতরের

মলাটে মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে বিনোদিনীর নাম লেখা।

পল্লীগ্রামের প্রচলিত আতিথ্যের সহিত ইহার একটু প্রভেদ ছিল। বিহারী তাহারি উল্লেখ করিয়া প্রশংসাবাদ করিলে রাজলক্ষ্মী কহিতেন—"এই মেয়েকে কি না তোরা অগ্রাহ্য করিলি!"

বিহারী হাসিয়া কহিত—"ভাল করি নাই মা, ঠকিয়াছি। কিন্তু বিবাহ না করিয়া ঠকা ভাল—বিবাহ করিয়া ঠকিলেই মুস্কিল।"

রাজলক্ষ্মী কেবলি মনে করিতে লাগিলেন, "আহা, এই মেয়েই ত আমার বধূ হইতে পারিত! কেন হইল না!"

রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় ফিরিবার প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করিলে, বিনোদিনীর চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিত। সে বলিত, "পিসিমা, তুমি দুদিনের জন্যে কেন এলে? যখন তোমাকে জানিতাম না, দিন ত একরকম করিয়া কাটিত! এখন তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?"

রাজলক্ষ্মী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিতেন, "মা, তুই আমার ঘরের বউ হলিনে কেন? তা হইলে তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিতাম!"

সে কথা শুনিয়া বিনোদিনী কোন ছুতায় লজ্জায় সেখান হইতে উঠিয়া যাইত।

রাজলক্ষ্মী কলিকাতা হইতে একটা কাতর অনুনয়পত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহার মহীন্ জন্মাবধি কখনো এতদিন মাকে ছাড়িয়া থাকে নাই—নিশ্চয় এতদিনে মার বিচ্ছেদ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। রাজলক্ষ্মী তাঁহার ছেলের অভিমান এবং আবদারের সেই চিঠিখানির জন্য তৃষিত হইয়া ছিলেন।

বিহারী মহেন্দ্রের চিঠি পাইল। মহেন্দ্র লিখিয়াছে, "মা বোধ হয় অনেক দিন পরে জন্মভূমিতে গিয়া বেশ সুখে আছেন!"

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, "আহা, মহেন্দ্র অভিমান করিয়া লিখিয়াছে! সুখে আছেন! হতভাগিনী মা না কি মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া কোথাও সুখে থাকিতে পারে!"

"ও বিহারী, তার পরে মহীন্ কি লিখিয়াছে, পড়িয়া শোনা না বাছা!"

বিহারী কহিল, "তার পরে কিছুই না মা!—" বলিয়া চিঠিখানা মুঠার মধ্যে দলিত করিয়া একটা বহির মধ্যে পূরিয়া ঘরের এক কোণে ধপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী কি আর স্থির থাকিতে পারেন! নিশ্চয় মহীন্ মার উপর এমন রাগ করিয়া লিখিয়াছে যে, বিহারী তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইল না।

বাছুর যেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া দুগ্ধ এবং বাৎসল্যের সঞ্চার করে—মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া তাঁহার অবরুদ্ধ বাৎসল্যকে উৎসারিত করিয়া দিল! তিনি মহেন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। কহিলেন, "আহা, বৌ লইয়া মহীন্ সুখে আছে, সুখে থাক্—যেমন করিয়া হোক্, সে সুখী হোক্! বৌকে লইয়া আমি তাহাকে আর কোন কষ্ট দিব না! আহা, যে মা কখনো তাহাকে একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সেই মা চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মহীন্ মার পরে রাগ করিয়াছে!—"

বারবার তাঁর চোখ দিয়া জল উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে বারবার আসিয়া বলিলেন, "যাও বাবা, তুমি স্নান করগে যাও! এখানে তোমার বড় অনিয়ম হইতেছে!"

বিহারীরও সেদিন স্নানাহারে যেন প্রবৃত্তি ছিল না—সে কহিল—"মা, আমার মত লক্ষ্মীছাড়ারা অনিয়মেই ভাল থাকে!"

রাজলক্ষ্মী পীড়াপীড়ি করিয়া কহিলেন—"না বাছা, তুমি স্নান করিতে যাও!"

বিহারী সহস্রবার অনুরুদ্ধ হইয়া নাহিতে গেল। সে ঘরের বাহির হইবামাত্রই রাজলক্ষ্মী বহির ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি সেই কুঞ্চিত দলিত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইলেন।

বিনোদিনীর হাতে চিঠি দিয়া কহিলেন, "দেখ ত মা, মহীন্ বিহারীকে কি লিখিয়াছে!"

বিনোদিনী পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। মহেন্দ্র প্রথমটা মার কথা লিখিয়াছে, কিন্তু সে অতি অল্পই—বিহারী যতটুকু শুনাইয়াছিল, তাহার অধিক নহে।

তার পরেই আশার কথা! মহেন্দ্র রঙ্গে রহস্যে আনন্দে যেন মাতাল হইয়া লিখিয়াছে।

বিনোদিনী একটুখানি পড়িয়া শুনাইয়াই লজ্জিত হইয়া থামিয়া কহিল, "পিসিমা, ও আর কি শুনিবে!"

রাজলক্ষ্মীর স্নেহব্যগ্র মুখের ভাব এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই পাথরের মত শক্ত হইয়া যেন জমিয়া গেল! রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, "থাক্!" বলিয়া চিঠি ফিরৎ না লইয়াই চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী সেই চিঠিখানা লইয়া ঘরে ঢুকিল। ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িতে লাগিল!

চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কি রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বারবার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মত জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল!

মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন, ইহাই তাহার মনের মধ্যে কেবলি পাক খাইতে লাগিল! চিঠিখানা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া পা ছড়াইয়া দেয়ালের উপর হেলান্ দিয়া অনেকক্ষণ সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের সে চিঠি বিহারী আর খুঁজিয়া পাইল না!

সেইদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ অন্নপূর্ণা আসিয়া উপস্থিত। দুঃসংবাদের আশঙ্কা করিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল—কোন প্রশ্ন করিতে তিনি সাহস করিলেন না, অন্নপূর্ণার দিকে পাংশুবর্ণমুখে চাহিয়া রহিলেন।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, কলিকাতার খবর সব ভাল।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"তবে তুমি এখানে যে!"

অন্নপূর্ণা কহিলেন—"দিদি, তোমার ঘরকন্নার ভার তুমি লও'সে! আমার আর

সংসারে মন নাই! আমি কাশী যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তাই তোমাকে প্রণাম করিতে আসিলাম। জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো। আর তোমার বৌ (বলিতে বলিতে চোখ ভরিয়া উঠিয়া জল পড়িতে লাগিল)—সে ছেলেমানুষ, তাহার মা নাই, সে দোষী হোক্ নির্দ্দোষী হোক্, সে তোমার।”—আর বলিতে পারিলেন না।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। বিহারী খবর পাইয়া গদাই ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ছুটিয়া আসিলেন। অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, “কাকীমা, সে কি হয়? আমাদের তুমি নির্ম্মম হইয়া ফেলিয়া যাইবে!”

অন্নপূর্ণা অশ্রুদমন করিয়া কহিলেন, “আমাকে আর ফিরাইবার চেষ্টা করিস নে বেহারী—তোরা সব সুখে থাক্, আমার জন্যে কিছুই আটকাইবে না।”

বিহারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে কহিল—“মহেন্দ্রের ভাগ্য মন্দ, তোমাকে সে বিদায় করিয়া দিল।”

অন্নপূর্ণা সচকিত হইয়া কহিলেন, “অমন কথা বলিস্ নে। আমি মহিনের উপর কিছুই রাগ করি নাই। আমি না গেলে সংসারের মঙ্গল হইবে না।”

বিহারী দূরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা অঞ্চল হইতে একযোড়া মোটা সোনার বালা খুলিয়া কহিলেন, “বাবা এই বালাযোড়া তুমি রাখ—বৌমা যখন আসিবেন, আমার আশীর্ব্বাদ দিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিও।”

বিহারী বালাযোড়া মাথায় ঠেকাইয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বিদায়কালে অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বেহারী, আমার মহীনকে আর আমার আশাকে দেখিস!” রাজলক্ষ্মীর হস্তে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন—“শ্বশুরের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে, তাহা এই দানপত্রে মহেন্দ্রকে লিখিয়া দিলাম। আমাকে কেবল মাসে মাসে পনেরোটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়ো।”

বলিয়া ভূতলে পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং বিদায় হইয়া তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

(৮)

আশা কেমন ভয় পাইয়া গেল। এ কি হইল! মা চলিয়া যান, মাসীমা চলিয়া যান! তাহাদের সুখ যেন সকলকেই তাড়াইতেছে, এবার যেন তাহাকেই তাড়াইবার পালা! পরিত্যক্ত শূন্য গৃহস্থালীর মাঝখানে দাম্পত্যের নূতন প্রেমলীলা তাহার কাছে কেমন অসঙ্গত ঠেকিতে লাগিল!

সংসারের কঠিন কর্ত্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মত ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্ষ ও বিকৃত হইয়া আসে। আশাও মনে মনে দেখিতে লাগিল, তাহাদের অবিশ্রাম মিলনের মধ্যে একটা শ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা আছে। সে মিলন যেন থাকিয়া থাকিয়া কেবলি মুষড়িয়া পড়ে—সংসারের দৃঢ় ও প্রশস্ত আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে

টানিয়া খাড়া রাখাই কঠিন হয়। কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না।

মহেন্দ্রও আপনার বিমুখ সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আপন প্রেমোৎসবের সকল বাতিগুলাই একসঙ্গে জ্বালাইয়া খুব সমারোহের সহিত শূন্যগৃহের অকল্যাণের মধ্যে মিলনের আনন্দ সমাধা করিতে চেষ্টা করিল। আশার মনে সে একটুখানি খোঁচা দিয়াই কহিল, "চুনি, তোমার আজকাল কি হইয়াছে বল দেখি? মাসী গেছেন, তা লইয়া অমন মন ভার করিয়া আছ কেন? আমাদের দু'জনার ভালবাসাতেই কি সকল ভালবাসার অবসান নয়?"

আশা দুঃখিত হইয়া ভাবিত, "তবে ত আমার ভালবাসায় একটা কি অসম্পূর্ণতা আছে! আমি ত মাসীর কথা প্রায়ই ভাবি; শাশুড়ি চলিয়া গেছেন বলিয়া ত আমার ভয় হয়!—" তখন সে প্রাণপণে এই সকল প্রেমের অপরাধ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করে।

এখন গৃহকর্ম্ম ভাল করিয়া চলে না—চাকর-বাকররা ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে! একদিন ঝি অসুখ করিয়াছে বলিয়া আসিল না, বামুনঠাকুর মদ খাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া রহিল। মহেন্দ্র আশাকে কহিল—"বেশ মজা হইয়াছে, আজ আমরা নিজেরা রন্ধনের কাজ সারিয়া লইব।"

মহেন্দ্র গাড়ি করিয়া নিউমার্কেটে বাজার করিতে গেলেন। কোন্ জিনিষটা কি পরিমাণে দরকার, তাহা তাঁহার কিছুমাত্র জানা ছিল না—কতকগুলা বোঝা লইয়া আনন্দে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সেগুলা লইয়া যে কি করিতে হইবে, আশাও তাহা ভালরূপ জানে না। পরীক্ষায় বেলা দুটা তিনটা হইয়া গেল এবং নানাবিধ অভূতপূর্ব্ব অখাদ্য উদ্ভাবন করিয়া মহেন্দ্র অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। আশা মহেন্দ্রের আমোদে যোগ দিতে পারিল না, আপন অজ্ঞতা ও অক্ষমতায় মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভ পাইল।

ঘরে ঘরে জিনিষপত্রের এমনি বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে যে, আবশ্যকের সময় কোন জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। মহেন্দ্রের চিকিৎসার অস্ত্র একদিন তরকারী কুটিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আবর্জ্জনার মধ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করিল এবং তাঁহার নোটের খাতা হাতপাখার একটিনি করিয়া রান্নাঘরের ভস্মশয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এই সকল অভাবনীয় ব্যবস্থাবিপর্য্যয়ে মহেন্দ্রের কৌতুকের সীমা রহিল না, কিন্তু আশা ব্যথিত হইতে থাকিল। উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারের স্রোতে সমস্ত ঘরকন্না ভাসাইয়া হাস্যমুখে ভাসিয়া চলা বালিকার কাছে বিভীষিকাজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় দুইজনে ঢাকা-বারান্দায় বিছানা করিয়া বসিয়াছেন। সম্মুখে খোলা ছাদ। বৃষ্টির পরে কলিকাতার দিগন্তব্যাপি-সৌধশিখরশ্রেণী জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। বাগান হইতে রাশীকৃত ভিজা বকুল সংগ্রহ করিয়া আশা নতশিরে মালা গাঁথিতেছে। মহেন্দ্র তাহা লইয়া টানাটানি করিয়া বাধা ঘটাইয়া প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া অনর্থক একটা কলহ সৃষ্টি করিবার

উদ্‌যোগ করিতেছিলেন। আশা এই সকল অকারণ উৎপীড়ন লইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিবার উপক্রম করিবামাত্র মহেন্দ্র কোন একটি কৃত্রিম উপায়ে আশার মুখ বন্ধ করিয়া শাসনবাক্য অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেছি লন!

এমন সময় প্রতিবেশীর বাড়ীর পিঞ্জরের মধ্য হইতে পোষা কোকিল কুহুকুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তখনি মহেন্দ্র এবং আশা তাঁহাদের মাথার উপরে দোদুল্যমান খাচার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহাদের কোকিল, প্রতিবেশী কোকিলের কুহুধ্বনি কখনো নীরবে সহ্য করে নাই, আজ সে জবাব দেয় না কেন?

আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "পাখীর আজ কি হইল?"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার কণ্ঠ শুনিয়া লজ্জা বোধ করিতেছে।"

আশা সানুনয় স্বরে কহিল, "না, ঠাট্টা নয়, দেখনা উহার কি হইয়াছে!"

মহেন্দ্র তখন খাচা পাড়িয়া নামাইলেন। খাচার উপরের আবরণ খুলিয়া দেখিলেন, পাখী মরিয়া গেছে। অন্নপূর্ণা যাওয়ার পর বেহারা ছুটি লইয়া গিয়াছিল, পাখীকে কেহ দেখে নাই।

দেখিতে দেখিতে আশার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাহার আঙুল চলিল না—ফুল পড়িয়া রহিল! মহেন্দ্রের মনে আঘাত লাগিলেও, অকালে রসভঙ্গের আশঙ্কায় ব্যাপারটা সে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিল। কহিল—"ভালই হইয়াছে; আমি ডাক্তারী করিতে যাইতাম, আর ওটা কুহুস্বরে তোমাকে জ্বালাইয়া মারিত।—"

এই বলিয়া মহেন্দ্র আশাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আশা আস্তে আস্তে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া আঁচল শূন্য করিয়া বকুলগুলা ফেলিয়া দিল। কহিল—"আর কেন! ছিছি! তুমি শীঘ্র যাও, মাকে ফিরাইয়া আন গে!"

(৯)

এমন সময় দোতলা হইতে "মহিন্দা মহিন্দা" রব উঠিল। "আরে কে হে, এস এস!" বলিয়া মহেন্দ্র জবাব দিল। বিহারীর সাড়া পাইয়া মহেন্দ্রের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবাহের পর বিহারী মাঝে মাঝে তাহাদের সুখের বাধাস্বরূপ আসিয়াছে—আজ সেই বাধাই সুখের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল।

আশাও বিহারীর আগমনে আরাম বোধ করিল। মাথায় কাপড় দিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, "যাও কোথায়? আর ত কেহ নয়, বিহারী আসিতেছে!"

আশা কহিল, "ঠাকুরপোর জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দিই গে।"

একটা কিছু কর্ম্ম করিবার উপলক্ষ্য আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আশার অবসাদ কতকটা লঘু হইয়া গেল।

আশা শাশুড়ির সংবাদ জানিবার জন্য মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিহারীর সহিত এখনো সে কথা কয় না।

বিহারী প্রবেশ করিয়াই কহিল—"আ সর্ব্বনাশ! কি কবিত্বের মাঝখানেই পা ফেলিলাম! ভয় নাই বোঠা'ণ, তুমি বোস, আমি পালাই!"

আশা মহেন্দ্রের মুখে চাহিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"বিহারী, মার কি খবর?"

বিহারী কহিল—"মা-খুড়ির কথা আজ কেন ভাই? সে ঢের সময় আছে! Such a night was not made for sleep, nor for mothers and aunts!"

বলিয়া বিহারী ফিরিতে উদ্যত হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া বসাইল। বিহারী কহিল—"বোঠা'ণ, দেখ আমার অপরাধ নাই—আমাকে জোর করিয়া আনিল—পাপ করিল মহিন্দা, তাহার অভিশাপটা আমার উপরে যেন না পড়ে।"

কোন জবাব দিতে পারে না বলিয়াই এই সব কথায় আশা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। বিহারী ইচ্ছা করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করে।

বিহারী কহিল—"বাড়ীর শ্রী ত দেখিতেছি—মাকে এখনো আনাইবার কি সময় হয় নাই?"

মহেন্দ্র কহিল—"বিলক্ষণ! আমরা ত তাঁর জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছি।"

বিহারী কহিল—"সেই কথাটি তাঁহাকে জানাইয়া পত্র লিখিতে তোমার অল্পই সময় লাগিবে, কিন্তু তাঁহার সুখের সীমা থাকিবে না। বোঠা'ণ, মহিন্দাকে সেই দু'মিনিট ছুটি দিতে হইবে, তোমার কাছে আমার এই আবেদন!"

আশা রাগিয়া চলিয়া গেল—তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল—"কি শুভক্ষণেই যে তোমাদের দেখা হইয়াছিল! কিছুতেই সন্ধি হইল না—কেবলি ঠুকঠাক চলিতেছে!"

বিহারী কহিল—"তোমাকে তোমার মা ত নষ্ট করিয়াছেন, আবার স্ত্রীও নষ্ট করিতে বসিয়াছে! সেইটে দেখিতে পারি না বলিয়াই সময় পাইলে দুই এক কথা বলি।"

মহেন্দ্র। তাহাতে ফল কি হয়?

বিহারী। ফল তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই হয় না, আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হয়।

(১০)

বিহারী নিজে বসিয়া মহেন্দ্রকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া লইল, এবং সে চিঠি লইয়া পরদিনেই রাজলক্ষ্মীকে আনিতে গেল। রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন, এ চিঠি বিহারীই লিখাইয়াছে—কিন্তু তবু আর থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গে বিনোদিনী আসিল।

গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া গৃহের যেরূপ দুরবস্থা দেখিলেন—সমস্ত অমার্জ্জিত, মলিন, বিপর্য্যস্ত—তাহাতে বধূর প্রতি তাঁহার মন আরো যেন বক্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু বধূর এ কি পরিবর্ত্তন! সে যে ছায়ার মত তাঁহার অনুসরণ করে। আদেশ না পাইলেও, তাঁহার কর্ম্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠেন—"রাখ, রাখ, ও তুমি নষ্ট করিয়া ফেলিবে! জান না যে কাজ, সে কাজে কেন হাত দেওয়া!"

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, অন্নপূর্ণা চলিয়া যাওয়াতেই বধূর এত উন্নতি হইয়াছে! কিন্তু তিনি ভাবিলেন—"মহেন্দ্র মনে করিবে, খুড়ী যখন ছিল, তখন বধূকে লইয়া আমি বেশ নিষ্কণ্টকে সুখে ছিলাম—আর মা আসিতেই আমার বিরহদুঃখ আরম্ভ হইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা যে তাহার হিতৈষী এবং

মা যে তাহার সুখের অন্তরায়, ইহাই প্রমাণ হইবে। কাজ কি!"

আজকাল দিনের বেলা মহেন্দ্র ডাকিয়া পাঠাইলে, বধূ যাইতে ইতস্তত করিত—কিন্তু রাজলক্ষ্মী ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন, "মহীন্ ডাকিতেছে, সে বুঝি আর কানে তুলিতে নাই? বেশী আদর পাইলে শেষকালে এমনি ঘটিয়া থাকে! যাও, তোমার আর তরকারীতে হাত দিতে হইবে না!"

আবার সেই শ্লেট্ পেন্সিল্ চারুপাঠ লইয়া মিথ্যা খেলা! ভালবাসার অমূলক অভিযোগ লইয়া পরস্পরকে অপরাধী করা! উভয়ের মধ্যে কাহার প্রেমের ওজন বেশী, তাহা লইয়া বিনা যুক্তিমূলে তুমুল তর্কবিতর্ক! বর্ষার দিনকে রাত্রি করা এবং জ্যোৎস্না-রাত্রিকে দিন করিয়া তোলা! শ্রান্তি এবং অবসাদকে গায়ের জোরে দূর করিয়া দেওয়া! পরস্পরকে এমনি করিয়া অভ্যাস করা যে, সঙ্গ যখন অসাড়চিত্তে আনন্দ দিতেছে না, তখনো ক্ষণকালের জন্য মিলনপাশ হইতে মুক্তি ভয়াবহ মনে হয়—সম্ভোগসুখ ভস্মাচ্ছন্ন, অথচ কর্ম্মান্তরে যাইতেও পা ওঠে না। ভোগসুখের এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ যে, সুখ অধিকদিন থাকে না, কিন্তু বন্ধন দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠে।

এমন সময় বিনোদিনী একদিন আসিয়া আশার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"ভাই, তোমার সৌভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক্, কিন্তু আমি দুঃখিনী বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই!"

আত্মীয়গৃহে বাল্যকাল হইতে পরের মত লালিত হইয়াছিল বলিয়া, লোকসাধারণের নিকট আশার একপ্রকার আন্তরিক কুণ্ঠিতভাব ছিল। ভয় হইত, পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে। বিনোদিনী যখন তাহার যোড়া-ভুরু ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাহার নিখুঁৎ মুখ ও নিটোল যৌবন লইয়া উপস্থিত হইল, তখন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে সাহস করিল না।

আশা দেখিল, শাশুড়ি রাজলক্ষ্মীর নিকট বিনোদিনীর কোনপ্রকার সঙ্কোচ নাই। রাজলক্ষ্মীও যেন আশাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া বিনোদিনীকে বহুমান দিতেছেন,—সময়ে অসময়ে আশাকে বিশেষ করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বিনোদিনীর প্রশংসাবাক্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছেন। আশা দেখিল, বিনোদিনী সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্মে সুনিপুণ,—প্রভুত্ব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ স্বভাবসিদ্ধ,—দাসদাসীদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ করিতে, ভর্ৎসনা করিতে ও আদেশ করিতে সে লেশমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই সমস্ত দেখিয়া আশা বিনোদিনীর কাছে নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করিল।

সেই সর্ব্বগুণশালিনী বিনোদিনী যখন অগ্রসর হইয়া আশার প্রণয় প্রার্থনা করিল, তখন সঙ্কোচের বাধায় ঠেকিয়াই বালিকার আনন্দ আরো চারগুণ উছলিয়া পড়িল। যাদুকরের মায়াতরুর মত তাহাদের প্রণয়-বীজ একদিনেই অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

আশা কহিল, "এস ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কিছু পাতাই!"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল—"কি পাতাইবে?"

আশা, গঙ্গাজল বকুলফুল প্রভৃতি অনেকগুলি ভাল ভাল জিনিষের নাম করিল।

বিনোদিনী কহিল—"ও সব পুরাণো হইয়া গেছে; আদরের নামের আর আদর নাই!"

আশা কহিল—"তোমার কোন্‌টা পছন্দ?"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল—"চোখের বালি।"

শ্রুতিমধু নামের দিকেই আশার ঝোঁক ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের গালিটাই গ্রহণ করিল। বিনোদিনীর গলা ধরিয়া বলিল—"চোখের বালি!" বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

ক্রমশ।

জীব-কোষ

জীবশরীর কেমন করিয়া ক্রমে ছোট হইতে বড়, কৃশ হইতে স্থূল হইয়া উঠে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিতদের কাছে সে একটা সমস্যা ছিল। জীবকোষ ও তাহার অদ্ভুত কার্য্য যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন সেই সমস্যার মীমাংসা হইল এবং সেই সঙ্গে জীবতত্ত্বের আরো অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম ব্যাপারের কারণ বাহির হইয়া পড়িল।

শতশত বৎসর অন্ধকারে পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচীনেরা জীবতত্ত্বের যে সকল তথ্য স্তূপাকার করিয়া গেছেন, আধুনিকেরা জীবকোষসিদ্ধান্তের সাহায্যে সেইগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া জীবতত্ত্বকে একটা সম্পূর্ণ শাস্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিবার খুব একটা সুযোগ পাইয়াছেন।

কোষসিদ্ধান্তের মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয়টা খুব কঠিন নয়। বিষয়টা এইরূপ,—আমরা প্রাণি বা উদ্ভিদ শরীর পরীক্ষা করিলে মনে করি, প্রাণিশরীর বুঝি কেবল রক্তমাংস ও অস্থি এবং উদ্ভিদশরীর বুঝি কেবল কাষ্ঠদ্বারা গঠিত; জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আমরা সহজবুদ্ধিতে ও খালিচোখে পরীক্ষা করিয়া যাহা মনে করি, জীবশরীরের গঠন বাস্তবিক তাহা নয়,—প্রাণি ও উদ্ভিদ শরীরমাত্রই কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টিমাত্র। পণ্ডিতগণ এই সকল কোষের একটা বিশেষ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, জীবশরীরস্থ প্রত্যেক কোষই স্বতন্ত্রভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যেমন একটি স্ত্রীজীব হইতে কালক্রমে বহু জীবের উৎপত্তি দেখা যায়, সেইপ্রকার এক একটি কোষ হইতে কালক্রমে সহস্র সহস্র কোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পণ্ডিতগণের মতে ইহাই জীবশরীরের বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়টা এখন খুব সহজ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ষাইট বৎসর পূর্ব্বে, কোন পণ্ডিতই এই সহজ তত্ত্বটির সহিত পরিচিত ছিলেন না এবং এমন একটা সহজ উপায়ে যে বিশাল জীবরাজ্যের স্থিতি ও পরিণতি সাধন হইতে পারে, তাহাও তৎকালে পণ্ডিতগণের মনে স্থান পায় নাই। অধ্যাপক শ্বান্ (Schwann) গত ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, এই মতবাদটির কথা প্রথমে প্রচার করেন।

একটা লোকের ক্ষুদ্র জীবনের কয়েকটা-বৎসরব্যাপি চেষ্টায় কোন এক মহদাবিষ্কার সাধনের কথা আজকাল অসম্ভব না হইলেও, জগতে তাহার উদাহরণ খুব সুলভ নয়। গত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উন্নত অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ ও জীব শরীর পরীক্ষা করিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ শ্বানের আবিষ্কারপথ অনেকটা সুগম করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইপ্রকার অনুকূল অবস্থায় না পড়িলে, একক শ্বান্-সাহেব জীবতত্ত্বের এত বড় একটা আবিষ্কার সহজে সাধন করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ উদ্ভিদশরীরে কোষের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন, এবং কোন কোন পণ্ডিত প্রাণিশরীরেও কোষের অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন,—কিন্তু সেই কোষই যে জীবের একমাত্র গঠনোপাদান এবং সেই জীবকোষের গঠন-সামগ্রী প্রাণি ও উদ্ভিদ নির্ব্বিশেষে যে মূলে এক, এবং জীবমাত্রেরই গঠনোপাদান এক হওয়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে,—এ সকল কথা প্রাচীনেরা কিছুই জানিতেন না।

শ্বান্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ জীবকোষের কার্য্য ও তাহার অস্তিত্বাদির বিশেষ বিবরণ প্রচার করিয়া, প্রথমেই একটু গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। জীবমাত্রই যে কোষ-সমষ্টি, তাহার পরীক্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া, তাঁহারা সাধারণকে বেশ বুঝাইয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু এক কোষ হইতে বহু কোষের উৎপত্তির প্রমাণ চাহিলে, তাঁহারা নীরব থাকিতেন। অতি প্রাচীন জীবতত্ত্ববিদ্গণের বিশ্বাস ছিল,—যেমন চিনির রস হইতে মিছিরির দানা উৎপন্ন হয়, সেইপ্রকার জীবশরীরের একটা অবয়বহীন মৌলিক উপাদান হইতে কোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এই বিশ্বাসের অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য শ্বান্‌শিষ্যগণ বহু তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। পরে কয়েকটি অণুবীক্ষণবিদ্ পণ্ডিত একই কোষ হইতে বহুকোষের উৎপত্তি-সম্ভাবনার কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিলে, অনেকের মনে পুরাতন সিদ্ধান্তের প্রতি কিঞ্চিৎ অনাস্থা হইয়া পড়িয়াছিল, এবং শেষে শ্বান্‌শিষ্য ডাক্তার ব্যারি ডিম্ব হইতে শাবকোৎপত্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলে, কোষসিদ্ধান্তের একটু দাঁড়াইবার স্থান হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই নূতন সিদ্ধান্তের উন্নতিযুগ আরম্ভ,—আজকাল নানাদেশীয় জীবতত্ত্ববিদ্গণের আবিষ্কৃত নূতন নূতন তথ্য ক্রমেই ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে।

এই ত গেল কোষসিদ্ধান্তের প্রাথমিক ইতিহাসের কথা। এখন এই সিদ্ধান্তটার মূল ব্যাপার কি দেখা যাউক। শ্বানের আবিষ্কারের প্রথম কথা এই যে, যখন জরায়ু বা ডিম্বে প্রথম জীবোৎপত্তি আরম্ভ হয়, তখন প্রাণিশরীর একটিমাত্র কোষে গঠিত থাকে; তা'র পর কালক্রমে সেই কোষ পূর্ণতালাভ করিলে, মূল কোষটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি পৃথক্ কোষের উৎপত্তি করে এবং পরে এই দুইটি কোষ হইতে চারিটি এবং চারিটি হইতে আটটি ইত্যাদিক্রমে অসংখ্য কোষের উৎপত্তি হয়। সেই এক-মূল-কোষজাত অসংখ্য কোষই জীবের একমাত্র গঠনোপাদান;—পূর্ব্বোক্ত প্রথায় কোষসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত গঠনোপাদানের পরিমাণবৃদ্ধি হইলে এবং বহিস্থ পদার্থ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া কোষগুলি পরিপুষ্ট হইয়া পড়িলে, জীবের আয়তনও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অধ্যাপক শ্বানের জীবদ্দশায় পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু আবিষ্কারচেষ্টা এখানেই শেষ হয় নাই।—উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণযন্ত্রাদি নির্ম্মিত হওয়ায়, পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ খুব উৎসাহের সহিত জীবতত্ত্বের আরো নানাতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং অল্পকালমধ্যে ইঁহারা জীবকোষসম্বন্ধে আর একটা নূতন ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্বান্ জীবকোষকেই জীবনী শক্তির মূল বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ অভিনব প্রথায় জীবশরীর ও কোষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়া, কোষের মধ্যস্থিত পদার্থবিশেষকে জীবনী শক্তির কারণ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে কোষের মধ্যে যে তরল পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাই সেই জীবনী শক্তির উৎপাদক পদার্থ। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবকোষকে স্থূলত দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন,—প্রথমাংশ কোষের বহিরাবরণ এবং দ্বিতীয় অংশটা তন্মধ্যস্থ তরল সামগ্রী। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সহস্র অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কোষসামগ্রীটাই উদ্ভিদ ও প্রাণিশরীরের সজীবতার কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে,— কোন কারণে কোষ হইতে ঐ সামগ্রী নিষ্কাশিত হইয়া পড়িলে বা তাহা বিকৃত হইয়া গেলে, জীবের জীবত্বের লক্ষণ থাকে না। কোষাবরণটা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্জ্জীব পদার্থ;—শুষ্ক কাষ্ঠ বা শুষ্ক চর্ম্ম কেবল কতকগুলি কোষাবরণের সমষ্টিমাত্র, ইহা হইতে সেই কোষসামগ্রী নিষ্কাশিত হইয়া গেছে, কাযেই ইহারা নির্জ্জীব। অধ্যাপক শ্বানের সমসাময়িক পণ্ডিতগণের এবং আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ কোষাবরণকে জীবনী শক্তি রক্ষার প্রধান সহায় মনে করিতেন, কিন্তু আধুনিকেরা কোষসামগ্রী দ্বারাই সেই কার্য্য সাধিত হইতে দেখিয়া, ইহাতেই জীবনী শক্তি বর্ত্তমান বলিয়া মনে করেন। বস্ত্রাভরণাদি যেমন নিয়তই আমাদের শরীরসংলগ্ন থাকিয়াও জীবনী শক্তি রক্ষার সহায়তা করে না,—কোষাবরণও তদ্রূপ কোষসামগ্রীর আভরণস্বরূপ হইয়া থাকে মাত্র। মধ্যে মধ্যে কোষসামগ্রী হইতে যে একপ্রকার পদার্থ

নিঃসৃত হয়, তদ্দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া জীব-শরীরের আয়তন বৃদ্ধি করা এবং শরীরের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা ব্যতীত কোষাবরণের অপর কোন কার্য্য দেখা যায় না।

কোষসামগ্রী-সম্বন্ধীয় আর একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক শুল্‌জ্‌টে-(Schulzte) প্রমুখ কয়েকজন আধুনিক পণ্ডিত বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, জীবমাত্রেরই কোষসামগ্রী একই উপাদানে গঠিত;—উদ্ভিদের কোষে যে সামগ্রী বর্ত্তমান, গোমেষমহিষাদি জীবমাত্রেরই কোষেও সেই একই পদার্থ আছে। কুম্ভকার যেমন একই স্তূপ হইতে কর্দ্দম লইয়া, ঘট কলস ও পাক-পাত্র নির্ম্মাণ করে, প্রকৃতির কারখানায় কোষসামগ্রীর যে অক্ষয় ভাণ্ডার আছে, সেই একই ভাণ্ডারস্থ একই উপাদান লইয়া প্রকৃতি দেবী, মানুষ গর্দ্দভ পণ্ডিত মূর্খ এবং বৃক্ষলতা সকলেরই সৃষ্টি করিতেছেন। এই বিশাল জগতে সেই কোষসামগ্রীই একমাত্র সজীব পদার্থ, এতদ্ব্যতীত আর সকলই নির্জ্জীব,—বহিস্থ পদার্থ হইতে পুষ্টিকর-খাদ্য-গ্রহণ-ক্ষমতা প্রভৃতি জৈবধর্ম্ম কেবল ইহাতেই বর্ত্তমান। প্রাণি ও উদ্ভিদ দেহ, উক্ত কোষ-সামগ্রী দ্বারা গঠিত, কাযেই ইহারাও সজীব।

এই মহদাবিষ্কার দ্বারা জীববিজ্ঞানে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ আশা-নিরাশা, উদ্যম-অনুদ্যমের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, জীব-তত্ত্বের নানাবিভাগসম্বন্ধে যে সকল কষ্ট-কল্পিত আনুমানিক সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছিলেন,—কোষসামগ্রীর আবিষ্কার ও তাহার অদ্ভুত ধর্ম্মের কথা প্রচারিত হওয়ায়, আজ তাহার সকলই ভূশায়ী হইয়া পড়িয়াছে। নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব দ্বারা আজকাল জীবতত্ত্বের সকল জটিলতা দূরীভূত হইয়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার ন্যায় এটাও একটা সরল ও সহজবোধ্য শাস্ত্র হইয়া পড়িতেছে।

এখন দেখা যাউক, সর্ব্বজীবের গঠনোপাদান উক্ত কোষসামগ্রী কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থের যোগে উৎপন্ন, এবং ইহার সজীবতা-ধর্ম্মটার উৎপত্তি কোথায়। বিশুদ্ধ কোষ-সামগ্রী প্রচুরপরিমাণে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, রসায়নবিদ্‌গণ ইহার বিশ্লেষণকার্য্যে প্রথমে বড়ই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন; এখন সহজে কোষসামগ্রীসংগ্রহের উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায়, সম্প্রতি ইহার গঠনোপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় 'আল্‌বুমেন'-নামক একপ্রকার জৈব-পদার্থের নাম শুনিয়া থাকিবেন, রাসায়নিক-গণের মতে কোষসামগ্রীটা সেই আল্‌বুমেন-শ্রেণীর এক অতি জটিল পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আলবুমেনের ন্যায় ইহাতেও কেবল অঙ্গার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন আছে। এখন পাঠক-পাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—যদি আল্‌বুমেন ও কোষসামগ্রী একই জাতীয় হইল, তবে একটি জড়ধর্ম্মী এবং অপরটি জীবধর্ম্মসম্পন্ন দেখা যায় কেন। এতদুত্তরে কিছুদিন পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলিতেন,—আল্‌বুমেন পূর্ব্বোক্ত মৌলিক পদার্থচতুষ্টয়ের সহজ ও অজটিল মিশ্রণে উৎপন্ন, কিন্তু কোষ-সামগ্রীটা ঐ পদার্থ কয়েকটির জটিল-মিশ্রণ-

জাত,—এইজন্য উক্ত পদার্থদ্বয়ের ধর্ম্মের পার্থক্য দেখা যায়।

জীবনী শক্তির এই রাসায়নিক মতবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, নানাদেশীয় রসায়নবিদ্‌গণ কৃত্রিম উপায়ে কোষসামগ্রী প্রস্তুতের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া সোৎসাহে নানা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক হক্সলি ইঁহাদের নেতা ছিলেন। আবার এই সময়ে কৃত্রিম উপায়ে ইউরিয়া, ফরমিক এসিড ও নীল প্রভৃতি কয়েকটি জৈবপদার্থের প্রস্তুতপদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায়, পণ্ডিতগণের উৎসাহ যেন আরো বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহারা বলিতেন, জলের তরলতা প্রভৃতি ধর্ম্ম যেমন তাহার আণবিক বিন্যাস ও রাসায়নিক অবস্থার দ্বারা প্রকাশ পায়, সেইপ্রকার কোষসামগ্রীর জীবনী শক্তিটাও রাসায়নিক অবস্থারই ফলমাত্র। বারুদ প্রভৃতি সহজবিশ্লেষণীয় (unstable) যৌগিক পদার্থ সাধারণতই যেমন উত্তেজনধর্ম্মসম্পন্ন এবং যেমন সেগুলি অত্যল্প-তাপাদি-সংযোগে গতিশীলতা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া পড়ে, কোষসামগ্রীটাও তদ্রূপ একটি সহজ-উত্তেজনশীল পদার্থ, এবং ইহার সজীবতা-ধর্ম্মটা অগ্নিসংযুক্ত বারুদের কার্য্যের অনুরূপ।

হক্সলি-প্রমুখ পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ উল্লিখিত বিশ্বাসে চালিত হইয়া কৃত্রিম কোষসামগ্রী প্রস্তুত জন্য প্রায় কুড়ি বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভ্রান্ত বিশ্বাস অনেক সময়ই মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু এখানে ভ্রান্ত-বিশ্বাস-প্রণোদিত হইয়া নানা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, পণ্ডিতগণ ক্রমেই তাঁহাদের পূর্ব্ববিশ্বাসে অনাস্থাবান্ হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে একটি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ নির্ম্মিত হওয়ায়, তদ্দ্বারা কোষসামগ্রী পরীক্ষা করিয়া তাহার রাসায়নিকশক্তি ও জীবনী শক্তি যে এক নয়, তাহা ইঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখন জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমাত্রেই বলিয়া থাকেন, জীবদেহের নানা অংশের কার্য্য যেমন কতকগুলি সুগঠিত যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, কোষসামগ্রীর সজীবতাও সেইপ্রকার তন্মধ্যস্থ অতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষনিক যন্ত্রের সাহায্যে সাধিত হয়। জীবনী ক্রিয়া যান্ত্রিক, রাসায়নিক নহে।

কোষসামগ্রীর পূর্ব্বোক্ত অতিক্ষুদ্র যন্ত্রসংস্থান কি প্রকারের, এবং কি পদ্ধতিক্রমে যে তাহাদের কার্য্য চলিতেছে, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, এবং শীঘ্র যে জীববিজ্ঞানের এই মূলতত্ত্বটি আবিষ্কৃত হইবে, তাহারও লক্ষণ বড় দেখা যাইতেছে না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

একটি কথা।

একখানি তরি আছে, দুইজনে বাই;
মরা-গাঙে ভরা পালে ছুটে চ'লে যাই।
পড়িলে বায়ুর বেগ হাল দিয়ে তারে,
দাঁড় টেনে চ'লে যাই জনহীন পারে।
বালু ঘুরে ঘুরে উড়ে; ভরা চৈত্রমাস;
ঘরে ঘরে চৈত-পূজা, আমোদ উচ্ছ্বাস।

একমাত্র গান জানি, গাই দু'জনায়;
গোঠে গোঠে রাখালেরা বাঁশরী বাজায়;
আম্রমুকুলের ঘ্রাণ আনে বায়ু ব'য়ে;
চকা-চকী ব'সে থাকে মুখোমুখী হ'য়ে;
দুটি বোন্ প্রতিদিন জল নিতে আসে,
আমাদের চেয়ে চেয়ে টিপিটিপি হাসে।

সূর্য্য ডোবে, গাঁ'র চাঁদ হেসে হেসে ওঠে,
ছেলেরা খেলার ঝোঁকে বটতলা ছোটে;
জ্যোৎস্না এসে উঁকি দিয়ে দোঁহা-পানে চায়,
সর্ব্ব দেহে শুভ্রকর সোহাগে বুলায়।
নাই সেথা বেনে বউ, মুক্তো ঠাকুরাণী,
নাই সেথা ঠারাঠারি নাই কাণাকাণি!

এইমত দুইজনে বাহি এসে তরি,
গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা আসে শ্যামসাজ পরি'।
গুরুগুরু মেঘ ডাকে নেচে ওঠে প্রাণ;
ক্ষেতে ক্ষেতে ছড়া-ছড়া ফলে' আশুধান;
ছেলে-মেয়ে সেজে-গুজে ধেয়ে চলে রথে;
বুড়া-বুড়ী হাত ধ'রে হাঁটে গাঁ'র পথে।

ছোট-তরি-'পরে শুধু দু'জনার ঠাঁই,
দোঁহার নিশ্বাস-বাস দুইজনে পাই।
ডুবে গেল একদিন ঝড়ে তরি-খান;
দু'জন দু'পারে উঠে' বাঁচাইনু প্রাণ।
সে অবধি ছাড়াছাড়ি তাহার আমার,
তরী নাই, নদীটুকু কিসে হই পার।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

নকলের নাকাল।

ইংরাজিতে একটি বচন আছে, সাব্লাইম্ হইতে হাস্যকর অধিক দূর নহে। সংস্কৃত অলঙ্কারে অদ্ভুতরস ইংরাজি সাব্লিমিটির প্রতিশব্দ। কিন্তু অদ্ভুত দুই রকমেরই আছে—হাস্যকর অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর অদ্ভুত।

দুইদিনের জন্য দার্জ্জিলিঙে ভ্রমণ করিতে আসিয়া, এই দুই জাতের অদ্ভুত একত্র

দেখা গেল। একদিকে দেবতাত্মা নগাধিরাজ. আর এক দিকে বিলাতী-কাপড়-পরা বাঙালী। সাব্‌লাইম্‌ এবং হাস্যকর একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

ইংরাজী কাপড়টাই যে হাস্যকর, সে কথা আমি বলি না—বাঙালীর ইংরাজী কাপড় পরাটাই যে হাস্যকর, সে প্রসঙ্গও আমি তুলিতে চাহি না। কিন্তু বাঙালীর গায়ে বিসদৃশ রকমের বিলাতী কাপড় যদি করুণরসাত্মক না হয়, তবে নিঃসন্দেহই হাস্যকর। আশা করি, এ সম্বন্ধে কাহারো সহিত মতের অনৈক্য হইবে না।

হয় ত কাপড় এক রকমের টুপি এক রকমের, হয় ত কলার আছে টাই নাই, হয় ত যে রংটা ইংরাজের চক্ষে বিভীষিকা সেই রঙের স্ফূর্ত্তি; হয় ত যে অঙ্গাবরণকে ঘরের বাহিরে ইংরাজ বিবসন বলিয়া গণ্য করে, সেই অসঙ্গত অঙ্গচ্ছদ! এমনতর অজ্ঞানকৃত সং-সজ্জা কেন?

যদি সম্মুখে কাছা ও পশ্চাতে কোঁচা দিয়া কোন ইংরাজ বাঙালীটোলায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে সে ব্যক্তি সম্মানলাভের আশা করিতে পারে না। আমাদের যে বাঙালী ভ্রাতারা অদ্ভুত বিলাতী সাজ পরিয়া গিরিরাজের রাজসভায় ভাঁড় সাজিয়া ফিরেন, তাঁহারা ঘরের কড়ি খরচ করিয়া ইংরাজ দর্শকের কৌতুক বিধান করিয়া থাকেন।

বেচারা কি আর করিবে? ইংরাজ-দস্তুর সে জানিবে কি করিয়া? যে বিলাত-ফেরৎ বাঙালী দস্তুর জানেন, তাঁহার স্বদেশীয়ের এই বেশবিভ্রমে তিনিই সব চেয়ে লজ্জাবোধ করেন। তিনিই সব চেয়ে তীব্রস্বরে বলিয়া থাকেন, যদি না জানে তবে পরে কেন? আমাদের শুদ্ধ, ইংরাজের কাছে অপদস্থ করে!

না পরিবে কেন? তুমি যদি পর, এবং পরিয়া দেশীপরিচ্ছদধারীর চেয়ে নিজেকে বড় মনে কর, তবে সে গর্ব্ব হইতে সেই বা বঞ্চিত হইবে কেন? তোমার যদি মত হয় যে, আমাদের স্বদেশীয় সজ্জা ত্যাজ্য এবং বিদেশী পোষাকই গ্রাহ্য, তবে দলপুষ্টিতে আপত্তি করিলে চলিবে না।

তুমি বলিবে, বিলাতী সাজ পরিতে চাও পর, কিন্তু কোন্‌টা ভদ্র কোন্‌টা অভদ্র, কোন্‌টা সঙ্গত কোন্‌টা অদ্ভুত, সে খবরটা লও!

কিন্তু সে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। যাহারা ইংরাজিসমাজে নাই, যাহাদের আত্মীয়স্বজন বাঙালী—তাহারা ইংরাজিদস্তুরের আদর্শ কোথায় পাইবে?

যাহাদের টাকা আছে, তাহারা র‍্যাঙ্কিন্‌-হার্ম্মাণের হস্তে চক্ষু বুজিয়া আত্মসমর্পণ করে, এবং বড় বড় চেকে সই করিয়া দেয়—মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করে, নিশ্চয়ই আর কিছু না হউক, আমাকে দেখিয়া অন্তত ভদ্র ফিরিঙ্গি বলিয়া লোকে আন্দাজ করিবে—ইংরাজিকায়দা জানে না, এমন মূর্চ্ছাকর অপবাদ কেহ দিতে পারিবে না।

কিন্তু পনেরো-আনা বাঙালিরই অর্থাভাব—এবং চাঁদনিই তাহাদের বাঙালী সজ্জার চরম মোক্ষস্থান। অতএব উল্টা-পাল্টা ভুলচুক হইতেই হইবে। এমন স্থলে পরের সাজ পরিতে গেলে, অধিকাংশ লোকেরই সং-সাজা বই গতি নাই।

স্বজাতিকে কেন এমন করিয়া অপদস্থ করা? এমন কাজ কেন কর, যাহার দৃষ্টান্তে দেশের লোক হাস্যকর হইয়া উঠে? দুই চারিটা কাক অবস্থাবিশেষে ময়ূরের পুচ্ছ মানান-সই করিয়া পরিতেও পারে—কিন্তু বাকি কাকেরা তাহা কোনমতেই পারিবে না —কারণ, ময়ূরসমাজে তাহাদের গতিবিধি নাই—এমন অবস্থায় সমস্ত কাকসম্প্রদায়কে বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত কয়েকটি ছদ্মবেশীকে ময়ূরপুচ্ছের লোভ সম্বরণ করিতেই হইবে। না যদি করেন, তবে পরপুচ্ছ বিকৃতভাবে আস্ফালনের প্রহসন সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এই লজ্জা হইতে, ইংরাজিয়ানার এই বিকার হইতে, স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কি সক্ষম নকলকারীকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতে পারি না? কারণ, তাঁহারা সক্ষম, আর সকলে অক্ষম। এমন কি, অবস্থাবিশেষে তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরাও অক্ষম হইয়া পড়িবে। তাহারা যখন ফিরিঙ্গি-লীলার অধস্তন রসাতলের গলিতে গলিতে সমাজচ্যুত আবর্জ্জনার মত পড়িয়া থাকিবে, তখন কি ব্যাঙ্কিন্‌বিলাসীর প্রেতাত্মা শান্তিলাভ করিবে?

দরিদ্র কোনমতেই পরের নকল ভদ্র-রকমে করিতে পারে না। নকল করিবার কাঠখড় বেশি। বাহির হইতে তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহাকে নকল করিতে হইবে,সর্ব্বদা তাহার সংসর্গে থাকিতে হয়—দরিদ্রের পক্ষে সেইটেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। সুতরাং সে অবস্থায় নকল করিতে হইলে, আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কিম্ভূতকিমাকার একটা ব্যাপার হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর পক্ষে খাটো ধুতি পরা লজ্জাকর নহে, কিন্তু খাটো প্যাণ্ট্‌লুন পরা লজ্জাজনক। কারণ, খাটো প্যাণ্ট্‌লুনে কেবল অসামর্থ্য বুঝায় না, তাহাতে পর সাজিবার যে চেষ্টা, যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ পায়, তাহা দারিদ্র্যের সহিত কিছু-তেই সুসঙ্গত নহে।

আজকাল ইংরাজি-সাজ কিরূপ চল্‌তি হইয়া আসিতেছে, এবং যতই চল্‌তি হই-তেছে, ততই তাহা কিরূপ বিকৃত হইয়া উঠিতেছে,দার্জ্জিলিঙের মত জায়গায় আসিলে অল্পকালের মধ্যেই তাহা অনুভব করা যায়। বাঙালীর দুরদৃষ্ট বাঙালীকে অনেক দুঃখ দিয়াছে,—পেটে প্লীহা, হাড়ের মধ্যে ম্যালে-রিয়া, দেহে কৃশতা, চর্ম্মে কালিমা, ভাণ্ডারে দৈন্য;—অবশেষে তাহাকে কি অদ্ভুত সাজে সাজাইয়া ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করিবে? চিত্তদৌর্ব্বল্যে যখন হাস্যকর করিয়া তোলে, তখন ধরণী দ্বিধা হওয়া ছাড়া লজ্জানিবারণের আর উপায় থাকে না।

আচার-ব্যবহার সাজসজ্জা উদ্ভিদের মত—তাহাকে উপ্‌ড়াইয়া আনিলে শুকাইয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিলাতী বেশভূষা-আদব-কায়দার মাটি এখানে কোথায়? সে কোথা হইতে তাহার অভ্যস্ত রস আকর্ষণ করিয়া সজীব থাকিবে? ব্যক্তিবিশেষ খরচপত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে মাটি আম-দানী করিতে পারেন এবং দিনরাত সযত্ন-সচেতন থাকিয়া তাহাকে কোনমতে খাড়া রাখিতে পারেন; কিন্তু সে কেবল দুই-চারিজন সৌখীনের দ্বারাই সাধ্য।

যাহাকে পালন করিতে—সজীব রাখিতে

পারিবে না, তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া পচাইয়া হাওয়া খারাপ করিবার দরকার? ইহাতে পরেরটাও নষ্ট হয়, নিজেরটাও মাটি হইয়া যায়। সমস্ত মাটি করিবার সেই আয়োজন বাংলাদেশেই দেখিতেছি।

তবে কি পরিবর্ত্তন হইবে না? যেখানে যাহা আছে, চিরকাল কি সেখানে তাহা একই ভাবে চলে?

প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্ত্তন হইবে, অনুকরণের নিয়মে নহে। কারণ, অনুকরণ অনেক সময়ই প্রয়োজনবিরুদ্ধ। তাহা সুখশান্তিস্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। চতুর্দ্দিকের অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। তাহাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়, কষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে হয়।

অতএব রেলোয়ে-ভ্রমণের জন্য, আপিসে বাহির হইবার জন্য, নূতন প্রয়োজনের জন্য, ছাঁটা-কাটা কাপড় বানাইয়া লও। সে তুমি নিজের দেশ, নিজের পরিবেশ, নিজের পূর্ব্বাপরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত কর! সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ, ভাববিরুদ্ধ, সঙ্গতিবিরুদ্ধ অনুকরণের প্রতি হতবুদ্ধির ন্যায় ধাবিত হইয়ো না।

পুরাতনের পরিবর্ত্তন ও নূতনের নির্ম্মাণে দোষ নাই। আবশ্যকের অনুরোধে তাহা সকল জাতিকেই সর্ব্বদা করিতে হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ অনুকরণ প্রয়োজনের দোহাই দিয়া চলে না। সে প্রয়োজনের দোহাই একটা ছুতামাত্র। কারণ সম্পূর্ণ অনুকরণ কখনই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। তাহার হয় ত একাংশ কাজের হইতে পারে, অপরাংশ বাহুল্য। তাহার ছাঁটা কোর্ত্তা হয় ত দৌড়ধাপের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার ওয়েষ্ট-কোট্ হয় ত অনাবশ্যক এবং উত্তাপজনক। তাহার টুপিটা হয় ত খপ্ করিয়া মাথায় পরা সহজ হইতে পারে, কিন্তু তাহার টাই কলার বাঁধিতে অনর্থক সময় দিতে হয়।

যেখানে পরিবর্ত্তন ও নূতন নির্ম্মাণ অসম্ভব ও সাধ্যাতীত, সেইখানেই অনুকরণ মার্জ্জনীয় হইতে পারে। বেশভূষায় সে কথা কোনক্রমেই খাটে না।

বিশেষত বেশভূষায় কেবলমাত্র অঙ্গাবরণের প্রয়োজন সাধন করে না—তাহাতে ভদ্রাভদ্র, দেশী-বিদেশী, স্বজাতি-বিজাতির পরিচয় দেওয়া হয়। ইংরাজি কাপড়ের ভদ্রতা ইংরাজ জানে। আমাদের ভদ্রলোকদের অধিকাংশের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। জানিতে গেলেও সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে পরের মুখ তাকাইতে হয়।

তার পরে স্বজাতি-বিজাতির কথা। কেহ কেহ বলেন, স্বজাতির পরিচয় লুকাইবার জন্যই বিলাতী কাপড়ের প্রয়োজন হয়। এ কথা বলিতে যাহার লজ্জাবোধ না হয়, তাহাকে লজ্জা দেওয়া কাহারো সাধ্য নহে। পরের বাড়ীতে ছদ্মবেশে সম্বন্ধী সাজিয়া গেলে আদর পাওয়া যাইতে পারে—তবু যাহার কিছুমাত্র তেজ ও ভদ্রতাজ্ঞান আছে, সেই আদরকে সে উপেক্ষা করিয়া থাকে। রেলোয়ের ফিরিঙ্গি গার্ড, ফিরিঙ্গিজ্ঞাতা মনে করিয়া যে আদর করে, তাহার প্রলোভন সম্বরণ করাই ভাল। কোন কোন রেললাইনে দেশী-বিলাতীর স্বতন্ত্র গাড়ি আছে, কোন কোন হোটেলে দেশী লোককে প্রবেশ

করিতে দেয় না, সেজন্ত রাগিয়া কষ্ট পাইবার অবসর যদি হাতে থাকে, তবে সে কষ্ট স্বীকার কর, কিন্তু জন্ম ভাঁড়াইয়া সেই গাড়িতে বা সেই হোটেলে প্রবেশ করিলে সম্মানের যে কি বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝা কঠিন।

পরিবর্ত্তন কোন্ পর্য্যন্ত গেলে অনুকরণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা শক্ত। তবে সাধারণ নিয়মের স্বরূপ একটা কথা বলা যাইতে পারে। যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেখাপ্ হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা, যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহাকে বলে অনুকরণ করা।

মোজা পরিলে কোট পরা অনিবার্য্য হয় না, ধুতির সঙ্গে মোজা বিকল্পে চলিয়া যায়। কিন্তু কোটের সঙ্গে ধুতি, অথবা হ্যাটের সঙ্গে চাপকান চলে না। সাধু ইংরাজিভাষার মধ্যেও মাঝে মাঝে ফরাসী মিশাল্ চলে, তাহা ইংরাজি পাঠকেরা জানেন। কিন্তু কি পর্য্যন্ত চলিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার একটা অলিখিত নিয়ম আছে—সে নিয়ম বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে শেখানো বাহুল্য। তথাপি তার্কিক বলিতে পারে, তুমি যদি অতটা দূরে গেলে, আমি না হয় আরো কিছুদূর গেলাম, কে আমাকে নিবারণ করিবে? সে ত ঠিক কথা! তোমার রুচি যদি তোমাকে নিবারণ না করে, তবে কাহার পিতৃপুরুষের সাধ্য, তোমাকে নিবারণ করিয়া রাখে!

বেশভূষাতেও সেই তর্ক চলে। যিনি আগাগোড়া বিলাতী ধরিয়াছেন, তিনি সমালোচককে বলেন, তুমি কেন চাপ্কানের সঙ্গে প্যাণ্ট্লুন্ পরিয়াছ? অবশেষে তর্কটা ঝগড়ায় গিয়া দাঁড়ায়।

সে স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, যদি অন্যায় হইয়া থাকে, নিন্দা কর, সংশোধন কর, প্যাণ্ট্লুনের পরিবর্ত্তে অন্য কোনপ্রকার পায়জামা যদি কার্য্যকর ও সুসঙ্গত হয়, তবে তাহার প্রবর্ত্তন কর—তাই বলিয়া তুমি আগাগোড়া দেশীবস্ত্র পরিহার করিবে কেন? একজন এক কান কাটিয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি খামকা দুই কান কাটিয়া বসিবে, ইহার বাহাদুরীটা কোথায়, বুঝিতে পারি না।

নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে যখন প্রথম পরিবর্ত্তনের আরম্ভ হয়, তখন একটা অনিশ্চয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তখন কে কতদূরে যাইবে, তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে না। কিছুদিনের ঠেলাঠেলির পরে পরস্পর আপোসে সীমানা পাকা হইয়া আসে। সেই অনিবার্য্য অনিশ্চয়তার প্রতি দোষারোপ করিয়া যিনি পূরা নকলের দিকে যান, তিনি অত্যন্ত কুদৃষ্টান্ত দেখান।

কারণ, আলস্য সংক্রামক। পরের তৈরি জিনিষের লোভে নিজের সমস্ত চেষ্টা বিসর্জ্জন দিবার নজীর পাইলে, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। ভুলিয়া যায়, পরের জিনিষ কখনই আপনার করা যায় না। ভুলিয়া যায়, পরের কাপড় পরিতে হইলে, চিরকালই পরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে।

জড়ত্ব যাহার আরম্ভ, বিকার তাহার পরিণাম। আজ যদি বলি, কে অত ভাবে, তার চেয়ে বিলিতি দোকানে গিয়া এক সুট্ অর্ডর দিয়া আসি—তবে কাল বলিব,

প্যাণ্ট্‌লুন্‌টা খাট হইয়া গেছে, কে এত হাঙ্গাম করে, ইহাতেই কাজ চলিয়া যাইবে।

কাজ চলিয়া যায়। কারণ, বাঙালী-সমাজে বিলাতি কাপড়ের অসঙ্গতির দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। সেইজন্য বিলাত-ফেরৎদের মধ্যেও বিলাতী-সাজ-সম্বন্ধে ঢিলা-ভাব দেখা যায়,—সস্তার চেষ্টায় বা আলস্যের গতিকে তাঁহারা অনেকে এমন ভাবে বেশ-বিন্যাস করেন, যাহা বিধিমত অভদ্র।

কেবল তাহাই নহে। বাঙালী বন্ধুর বাড়ীতে বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্ম্মে বাঙালী-ভদ্রলোক সাজিয়া আসিতে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন, আবার বিলাতী-ভদ্রতার নিয়মে নিমন্ত্রণসাজ পরিয়া আসিতেও আলস্য করেন। পরসজ্জা-সম্বন্ধে কোন্‌টা বিহিত, কোন্‌টা অবিহিত, সেটা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়া, তাঁহারা শিষ্টসমাজের বিধিবিধানের অতীত হইয়া যাইতেছেন। ইংরাজি-সমাজে তাঁহারা সামাজিকভাবে চলিতে ফিরিতে পান না, দেশী সমাজকে তাঁহারা সামাজিকভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন—সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত বিধান নিজের বিধান, সুবিধার বিধান,—সে বিধানে আলস্য-ঔদাসীন্যকে বাধা দিবার কিছুই নাই। বিলাতের এই সকল ছাড়া কাপড় ইঁহাদের পরপুরুষের গাত্রে কিরূপ বীভৎস হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিলে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়।

কেবল সাজসজ্জা নহে, আচার-ব্যবহারে এ সকল কথা আরো অধিক খাটে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশী প্রথা হইতে যাঁহারা নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারকে সদাচার-সদ্‌ব্যবহারের সীমামধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে কিসে? যে ইংরাজের আচার তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না, দেশী সমাজের ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়াছেন।

এঞ্জিন কাটিয়া লইলেও গাড়ি খানিক-ক্ষণ চলিতে পারে—বেগ একেবারে বন্ধ হয় না। বিলাতের ধাক্কা বিলাতফেরতের উপর কিছুদিন থাকিতে পারে—তাহার পরে চলিবে কিসে?

সমাজের হিতার্থে সকল সমাজের মধ্যেই কতকগুলি কঠোর শাসন আপনি অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে আত্ম-সমাজের ত্যাজ্যপুত্র, এবং চেষ্টাসত্বেও পর-সমাজের পোষ্যপুত্র নহেন, তাঁহারা স্বভা-বতই দুই সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিয়া সুখটুকু লইবারই চেষ্টা করিবেন। তাহাতে কি মঙ্গল হইবে?

ইঁহাদের একরকম চলিয়া যাইবে, কিন্তু ইঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা কি করিবে? এবং যাহারা নকলের নকল করে, তাহাদের কি দুরবস্থা হইবে?

দেশী দরিদ্রেরও সমাজ আছে। দরিদ্র হইলেও সে ভদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বিলাতী-সাজা দরিদ্রের কোথাও স্থান নাই। বাঙালী-সাহেব কেবলমাত্র ধন-সম্পদ্‌ ও ক্ষমতার দ্বারা আপনাকে দুর্গতির ঊর্দ্ধে খাড়া রাখিতে পারে। ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইবামাত্র সেই সাহেবের পুত্রটি সর্ব্ব-প্রকার আশ্রয়হীন অবমাননার মধ্যে বিলুপ্ত

হইয়া যায়। তখন তাহার ক্ষমতাও নাই, সমাজও নাই। তাহার নূতনলব্ধ পৈতৃক গৌরবেরও চিহ্ন নাই, চিরাগত পৈতামহিক সমাজেরও অবলম্বন নাই। তখন সে কে?

কেবলমাত্র অনুকরণ এবং সুবিধার আকর্ষণে আত্মসমাজ হইতে যাঁহারা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না, ইহা নিশ্চয় —এবং যে দুর্ব্বলচিত্তগণ ইঁহাদের অনুকরণে ধাবিত হইবে, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে হাস্যজনক হইয়া উঠিবে, ইহাতেও সন্দেহ নাই।

যেটা লজ্জার বিষয়, সেইটে লইয়াই বিশেষরূপ গৌরব অনুভব করিতে বসিলে, বন্ধুর কর্ত্তব্য, তাহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া। যিনি সাহেবের অনুকরণ করিয়াছি মনে করিয়া গর্ব্ববোধ করেন, তিনি বস্তুত সাহেবীর অনুকরণ করিতেছেন। সাহেবীর অনুকরণ সহজ, কারণ তাহা বাহ্যিক জড় অংশ; সাহেবের অনুকরণ শক্ত, কারণ তাহা আন্তরিক মনুষ্যত্ব। যদি সাহেবের অনুকরণ করিবার শক্তি তাঁহার থাকিত, তবে সাহেবীর অনুকরণ কখনই করিতেন না। অতএব কেহ যদি শিব গড়িতে গিয়া মাটির গুণে অন্য কিছু গড়িয়া বসেন, তবে সেটা লইয়া লম্ফঝম্প না করাই শ্রেয়।

কবিচরিত।

বাহির হইতে দেখো না অমন করে
দেখো না আমায় বাহিরে!

আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমারে দেখিতে পাবে না আমার মুখে
কবিরে যেথায় খুঁজিছ সেথা সে নাহি রে!

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
মেঘগর্জ্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
নীরবমন্ত্রে নিশীথ-আকাশে রাজে
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া,—

আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
গরজি' ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
বিপুল ছন্দে উদার মন্ত্রে মাতিয়া।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে,

সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া;—
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে?

নর-অরণ্যে মর্ম্মর-তান তুলি,
যৌবনবনে উড়াই কুসুমধূলি,
চিত্তগুহার সুপ্তরাগিণীগুলি
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।

নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'
আমি তোমাদের মরমে মেলিব আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ কিরণ ঢাকি'
রব তোমাদের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া!

অশ্রু তোমার নয়নে ঝরিবে যবে
আমি তাহাদের গাঁথিব গীতের রবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের মাঝারে ঢাকিয়া কহিব তাহারে।

নাহি জানি আমি কি পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি,
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তার বলিতে পারিনে কাহারে।

যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি,কে পারে আমারে ধরিতে!

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

কবির বিজ্ঞান।

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে! "আছি আমি"
এ কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয় স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে! "আছি আর আছে"
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর? তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে, "এ নিখিলে আর কিছু নাই,—
শুধু এক আছ!" করে তারা একাকার
অস্তিত্বরহস্যরাশি করি' অস্বীকার!
একমাত্র তুমি জান এ ভব-সংসারে
যে আদি গোপনতত্ত্ব,—আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া!

বঙ্গদর্শন।

—:০:—

[নব পর্য্যায়]

মাসিক পত্র ।

৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিন যন্ত্রে,
শ্রীবগলাচরণ বড়াল দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

সূচী

বঙ্গদর্শন।

জড় কি সজীব?

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু গতবারে বিলাতে গিয়া বিজ্ঞানের যে নূতন তথ্য প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, এতদিনে অল্পে অল্পে তাহার সংবাদ আমাদের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সেই আবিষ্কার ঈথর-তত্ত্বকে অগ্রসর করিয়া দিয়া তারহীন টেলিগ্রাফযন্ত্রের কার্য্যোপযোগিতা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং বিজ্ঞানবিদ্গণের নিকট প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছে, এ খবর আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে।

পুনর্ব্বার আচার্য্যবর য়ুরোপের পণ্ডিত-সভায় নবতর তত্ত্ব উপহার লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াছি ব্যাপারটি অদ্ভুত। শুনিয়াছি জড় ও জীবের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বৈষম্য তিনি ভেদ করিয়া বিজ্ঞানিগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি দ্বারা ধাতুপদার্থ ও সজীব পদার্থে একই রূপ ফল উৎপন্ন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তিনি জড়-জীবের সাধর্ম্ম্য প্রমাণ করিয়াছেন।

সকল কথা আমরা এখনো স্পষ্ট করিয়া বিস্তারিতরূপে জানিতে পারি নাই। সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা হইতেই বিষয়-টার মোট কথা আমরা কতকটা অনুমান করিতেছি।

অবৈজ্ঞানিক শ্রোতারা কি বুঝিয়াছেন, তাহা ইংরাজি 'গ্লোব'পত্রের নিম্নলিখিত পরিহাসবাক্যে জানা যায়। গ্লোব বলেন, ধাতুপদার্থের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিবার সময় অধ্যাপকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়াছিল। এজন্য তাঁহাকে ধন্য বলি। কিন্তু আগুন উস্কাইবার লৌহদণ্ড যখন চুলার লৌহবেষ্টনের উপর পড়িয়া যাইবে, তখন তাহার আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে বসিবে, বৃটিশ গৃহস্থর সে অবস্থা আসিতে বিলম্ব আছে।

বৃটিশ গৃহস্থর চিত্ত জড় কি সজীব, কি পরিমাণ তাহার বেদনাবোধ, কতটা আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায়, সে দুরূহ পরীক্ষায় অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন না, তিনি লোহা-পিতলকে আঘাত করিয়া সাড়া পাইয়াছেন। গ্লোবের উক্তিতে ইহা বুঝা

যায় যে, অধ্যাপকের মতে জড়ের জীবনধর্ম্ম আছে, অবৈজ্ঞানিক শ্রোতাদের মনে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে।

জীবমাত্রই যে সচেতন, এ কথা মনে আনিবার প্রয়োজন নাই। অন্তত এখনো তাহার প্রমাণ হয় নাই। উদ্ভিদের চেতনা আছে কি না, কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু তাহার জীবন আছে, এ কথা সকলেই জানে।

লৌহদণ্ড পড়িয়া গেলে তাহার বেদনা-বোধ হয়, এ কথা কেহ বলে না; কিন্তু সে যে আঘাত পায়, এ কথাও কেহ বলিত না। অর্থাৎ সজীব পদার্থ আছাড় খাইলে তাহাতে আঘাতের যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, ধাতু-পদার্থেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা দেয়, ইহা জানা ছিল না। আচার্য্য জগদীশ পরীক্ষা দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

সাধারণ শ্রোতার কথা উপরে লিখিলাম। এক্ষণে বিজ্ঞানবিদ্ বিশেষজ্ঞ কি বলেন, তাহা আলোচনা করিলে বিষয়টার আভাস পাওয়া যাইবে। তড়িৎ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজী পত্র ইলেক্‌ট্রিশ্যানে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতার যে মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

সজীব মাংসপেশিকে যদি চিম্‌টি কাটা যায় বা তাহাতে মোচড় বা চাপ দেওয়া যায়, তবে তাহা লম্বায় ছোট হইয়া চওড়ার দিকে ফুলিয়া উঠে। চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রকৃতিস্থ হয়। বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা মাংসপেশীর এই বিকৃতি ও প্রকৃতির উত্থান-পতন-রেখা আঁকিয়া লওয়া যায়। যদি মাংসপেশীতে থাকিয়া থাকিয়া চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গরেখা (curve) করাতের মত দন্তুর হইয়া অঙ্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে থাকে, তবে অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরমে মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া যায়, তখন আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায় না এবং প্রকৃতিস্থ হইতেও বিলম্ব ঘটে। আবার বিশেষ মাত্রার উত্তাপে মাংসপেশীর সাড় সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। এই উত্তাপের মাত্রা ভিন্ন মাংসপেশীর পক্ষে ভিন্নরূপ।

দ্রব্যগুণে মাংসপেশীর সাড় বাড়ে কমে। উত্তেজক পদার্থে সাড় প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রকৃতিস্থতাও শীঘ্র ফিরিয়া আসে। অবসাদক পদার্থে বিপরীত ফল হয় এবং বিষে এই সাড়-শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন দ্রব্য মাত্রা-বিশেষে উত্তেজনা ও অল্পমাত্রায় অবসাদ আনয়ন করে।

সজীব মাংসপেশীকে ছাড়িয়া যদি সজীব স্নায়ুকে লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহাতেও এইরূপ পরে পরে সাড় ও প্রকৃতি-লাভ দেখা যায়। কিন্তু স্নায়ুতে এই সাড়ার প্রকাশ অন্যপ্রকার। ঘা লাগিলে স্নায়ুর আহত বা উত্তেজিত অংশ হইতে সুস্থ অংশ পর্য্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। পুনঃ-পুন আঘাত, শীতাতপের মাত্রাধিক্য, এবং উত্তেজক বা অবসাদক দ্রব্যদ্বারা স্নায়ুতে যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াশান্তি উপস্থিত হয়, যন্ত্রবিশেষের দ্বারা তাহার রেখাচিত্র লওয়া হইয়াছে।

মাংসপেশীর চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক এইরূপ বিবিধ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। দেহবিদ্‌গণ বলেন, দেহ-পদার্থের মধ্যে এই সাড়ই জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ, মৃতপদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়।

এখন জড়পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় বা ঘা দেওয়া যায়, তবে সেই আহত বা উত্তেজিত প্রান্ত হইতে প্রকৃতিস্থ প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তড়িৎমাপক-স্থচির বিচলন দ্বারা এই সাড়ের পরিমাণ ধরা পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, জড়পদার্থের এই আঘাতজনিত সাড় ও প্রকৃতিলাভের তরঙ্গরেখার সহিত স্নায়ু-মাংসপেশীর তরঙ্গ-রেখার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

ধাতুপদার্থে ঘন ঘন তাড়না করিলে যে তরঙ্গরেখা পাওয়া যায়, তাহা দন্তুর—সেই তাড়না আরো দ্রুত করিলে তরঙ্গরেখা নিরন্তর স্ফীত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা প্রকাশ করে। শীতাতপের মাত্রা অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাড়শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিকাশ পায়;—ধাতুতারের মধ্যে বিশেষ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ের প্রবলতা মদমত্ততার মত আশ্চর্য্য বাড়িয়া উঠে, আবার দ্রব্যবিশেষে অবসাদের লক্ষণ আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্যে বিষের মত কাজ করে। কোন কোন দ্রব্য ধাতু-পদার্থের পক্ষে বিশেষ মাত্রায় উত্তেজক এবং মাত্রান্তরে অবসাদক; আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, সময়মত ঔষধ দিতে পারিলে বিষপ্রয়োগের প্রতিকার করা যায়।

এইরূপ নানা আঘাত-অপঘাতে ধাতু-দ্রব্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার তরঙ্গ-চিত্র জৈবতরঙ্গের এতই সদৃশ যে, দেহবিদ্‌গণ উভয় চিত্রকে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

এই গেল আঘাতজনিত সাড়। আলোক-জনিত সাড় সম্বন্ধেও অধ্যাপক মহাশয় পরীক্ষা করিয়া সমফল পাইয়াছেন। তিনি একটি কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যে সকল রশ্মি সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু অসাড়, তাঁহার কৃত্রিম চক্ষুতে সে সকল রশ্মিও সাড়া জাগাইয়া থাকে। আলো লাগিলে সজীব চক্ষু যেমন করিয়া মস্তিষ্কে বেগ প্রেরণ করে, এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ। সুতরাং এই আবিষ্কারের ফলে দর্শনক্রিয়া ব্যাপারটি দেহবিদ্যার কোঠা হইতে পদার্থ-বিদ্যার কোঠায় আসিয়া পড়িতে পারে। এই কৃত্রিম চক্ষুর আবিষ্কারে বর্ত্তমান তার-হীন টেলিগ্রাফী ও ঐথরিক বার্ত্তাবহন-প্রণালী উলট্‌পালট্ করিয়া দিবে।

তিন শক্র।

কথায় বলে, "তিন শক্র দিতে নাই।" কিন্তু এমনি আমাদের পোড়াকপাল যে, ভারতের ভাগ্যদেবতা জীবজ্জাগ্রৎ তিন তিন জন বৈরী আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকোপে আমাদের জাতীয়জীবন-লীলার শেষ পালা সমাসন্নপ্রায়। যেমন ত্র্যহস্পর্শের তিথিগুলি একে একে ভাল, কিন্তু সংস্পর্শবশতঃ গড়ে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি তাঁহারা দেশকালভেদে নিজে নিজে ভাল হইলেও সম্মেলন-সংঘর্ষ-হেতু মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁরা কারা?

প্রথম।—বৃথাভিমানী 'হিন্দু'-'হিন্দু'-রব-নির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল। তাঁহাদের নিকটে সনাতনে ও নূতনে, আর্ষে ও অনার্ষে, ভগবদ্গীতায় ও মন্সা-ঘেঁটুর গীতে কোন প্রভেদ নাই। অনুষ্টুপ্ছন্দে সংস্কৃতভাষায় লেখা হইলেই, তাহাতে যাহাই থাকুক না কেন—আচার, অনাচার, বামাচার—তাহা বেদ। বেদগাথা যদিও ইঁহাদের কর্ণকুহরে কখনও প্রবেশ করে নাই, তথাপি ইঁহারা শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বেদে বাষ্পযান ও ব্যোমযানের কথা উল্লিখিত আছে—নহিলে রেলগাড়ি চড়িয়া তাঁহারা ম্লেচ্ছবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতেন না। একজন মহাদেবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল—"কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।" ভোলানাথ মহেশ ধুতুরার ঘোরে এ নিন্দাবাদকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কোন গুণ নাই' অর্থাৎ বেদান্তবেদ্য নির্গুণ ব্রহ্ম, আর 'কপালে আগুন' ত শিবের বিশেষ বৈভব। গোঁড়া মহোদয়েরা তেমনি স্বদেশগৌরবের নেশায় আমার নিন্দাকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমাকে ধন্য মনে করিব। তাঁহারা এক কথা জানেন, আর কিছুই জানেন না, শোনেন না। 'হিন্দু' 'হিন্দু' এই তাঁহাদের বুলি। দর্শনবিজ্ঞানশিল্পবাণিজ্যে হিন্দুজাতি উৎকর্ষের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। য়ুরোপীয়েরা তন্দেশে বসিয়া গায়ের জোরে কেবল আস্ফালন করে। হিন্দুর সবই ভাল। শাঁসও ভাল, খোসাও ভাল, তণ্ডুলও ভাল, তুষও ভাল। আহা! গোঁড়ামির এই ত প্রকৃত লক্ষণ।

"সকণ্টক কই মাছ করয়ে ভক্ষণ।
গোঁড়ামির এই তুমি জানিও লক্ষণ॥"

এখন ইঁহাদের গলায় কাঁটা বিঁধিয়া কোন্ দিন না প্রাণটা যায়। এই গোঁড়ারাই দেশের গোড়ার শক্র।

দ্বিতীয়।—ইংরাজিনবিশ হিন্দুনামধারী রামপক্ষিভক্ষীর দল। ইঁহাদের যে পাঠ পড়াও, সেই পাঠই পড়েন। "রাধাকৃষ্ণ" বলাও, তা-ও বলেন, "কালীকল্পতরু" ভজাও, তা-ও ভজেন। ইংরাজি সভ্যতার প্রথমাবেগে শ্বেতাঙ্গ গুরুদেবেরা শিখাইয়াছিলেন যে, হিন্দুরা চিরকালই ইষ্টককাষ্ঠ পূজা করিয়া আসিতেছে—ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু তাহারা জানিতও না, জানেও না। অমনি 'তথাস্তু'

বলিয়া হ্যাট্‌কোট্‌রূপ চূড়াধড়া পরিধান করিয়া কাঁটাচামচ বাজাইয়া সাহেবী পন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আজ সেই শ্বেতাঙ্গদেবেরা শিখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা অধ্যাত্মদর্শনের অত্যুচ্চশিখরে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহারবিদ্যায় তাঁহারা বড় একটা মন দিতেন না। ধর্ম্মমতে হিন্দু হওয়া চাই, কিন্তু যেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ব্যাপার, সেখানে য়ুরোপীয় হওয়াই উচিত। য়ুরোপীয়েরা অধ্যাত্মদর্শনের বড় একটা ধার ধারে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাণিজ্যবিদ্যায় তাহারা জগদ্‌গুরু। হিন্দুরা 'জগৎ মিথ্যা' এই পরমার্থতত্ত্ব বুঝিয়াছিল, তাই পার্থিব ব্যাপারে তারা বড় উদাসীন। ইহার প্রমাণ কি? দেখ আমরা এমনি আধ্যাত্মিক যে লড়াই করি না এবং করিতে আমাদের প্রবৃত্তিও হয় না। আমরা কেমন শান্ত ও সমাহিত, স্থির, ধীর, অলসগতি! আর য়ুরোপীয়েরা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়—একমাসের পথকে একদিনের করে, সমুদ্রলঙ্ঘন করে, অভেদ্যগিরিকে ভেদ করে—কেবল উদ্যমশীলতা ও ব্যস্ততা! ভীরুতা ও আলস্য কি আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক নহে? যেমনি প্রতীচ্য বুধগণ এই কথা প্রচার করিলেন, অমনি ইংরাজিনবিশ সংস্কারকেরা তার-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বচন!" "সত্য বচন!!" আমরা ধর্ম্মে হিন্দু—অর্থাৎ পরমার্থবিষয়ে কোন মতামত রাখি না—কিন্তু পার্থিববিষয়ে আমরা য়ুরোপকে আদর্শ করিব। এই ইংরাজিশিক্ষিত সভ্যদলটি যথেচ্ছাচারী—না স্থলচর, না জলচর। উভচর কি?

তৃতীয়।— সমন্বয়বাদীর দল। এঁরা জোড়াতাড়া দিয়া একীভূত করেন। আমাদেরও কিছু আছে, ওদেরও কিছু আছে, সকলেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে। এই বিকীর্ণ 'কিঞ্চিৎ'গুলা জড় করিয়া একটা স্তূপ বাঁধিলে পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গীন সত্য লাভ করা যায়। হিন্দুরা বলে, জগৎ অলীক, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। আর হার্‌বার্ট স্পেন্সর বলেন, জগৎই একমাত্র সত্য, ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি না, জানা যায় না। এস, দর্শন ও বিজ্ঞানকে মিলাইয়া দাও এবং পূর্ণসত্য গ্রহণ কর। ব্রহ্ম সৎপদার্থ বটে, কিন্তু একাকী নহে। পাঁচটা ভূতও সৎ ও তাঁর চিরসঙ্গী। আমরা বড় ধ্যান করিতে ভালবাসি, সদাই স্তিমিতলোচন, আর য়ুরোপীয়েরা কেবল দৌড়ঝাঁপ করে; এস আমরাও দৌড়াই, কিন্তু চক্ষু মুদিয়া। হিন্দুরা ঈশ্বরপরায়ণ, আর ম্লেচ্ছেরা সংসারভক্ত; যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চাও, তবে ঈশ্বর ও সংসার, দুই সমানমাত্রায় বজায় রাখ। আমরা কদলীপত্রে ভোজন করি, আর সাহেবেরা টেবিলে খায়; এস আমরা টেবিলে কলাপাতা বিছাইয়া খাই। সকলেরই মন রাখা উচিত, কাহাকেও ছোটবড় করা ভাল নয়। দুই জমিদার সমান ঘুষ দেওয়াতে কোন এক ন্যায়বান্ মুন্সেফ রায় দিয়াছিলেন—এক পক্ষের অর্দ্ধেক ডিক্রী অর্দ্ধেক ডিস্‌মিস্, অপর পক্ষেরও অর্দ্ধেক ডিক্রী অর্দ্ধেক ডিস্‌মিস্। পুরাতন সভ্যতা উপহার লইয়া উপস্থিত, নূতনও ভেট পাঠাইয়াছে; এখন কাহাকে ছাড়ি, কাহাকে ফেলি। দু'জনেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া একটা

পূরা সভ্যতা গঠন করা চাই। তুফান হই-তেছে। মুসলমান মাঝী আল্লার দোহাই দিল, আর পৌত্তলিক হিন্দু আরোহীরা 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিল। ঝড় আল্লাও মানিল না, দুর্গাও মানিল না। ইহা দেখিয়া ইংরাজি-সংস্কৃত-পড়া একজন বাবু "দুর্গা আল্লা" "দুর্গা আল্লা" বলিতে আরম্ভ করিল। এই সমন্বয়ের প্রভাবে নৌকা ভরাডুবি হইল, কি ঘাটে পঁহুছিল, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা জানা গিয়াছে যে, আমাদের উদার সমন্বয়বাদী ভ্রাতৃগণ ওঁকার-ববম্বম্-হালেলুয়া-আমেন-সংমিশ্রিত একটা মন্ত্র প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইয়াছেন,—যাহার প্রভাবে স্বদেশ-নৌকাটি সহজেই ভবনদী উত্তীর্ণ হইবে। এই মন্ত্রপ্রণেতারাই প্রতিষ্ঠাবিহীন, সর্ব্বনাশী সংস্কারক।

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, তিনপ্রকার উদারতা তিনটি প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রসূত হইয়াছিল। য়ুনানী বা গ্রীক সদৃশপ্রিয়তা, রোমক বিসদৃশযোগশীলতা ও হিন্দুসমন্বয়-প্রতিষ্ঠা।

গ্রীকেরা সকল মতের ও ভাবের অসমান, বিসদৃশ অংশ ত্যাগ করিয়া সমান, সদৃশ অংশ গ্রহণ করিত। তাহাদের নৈসর্গিক গুণসকল ভিন্নজাতির সদৃশগুণের সহিত মিশিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গ্রীকদর্শনকার-গণ জগতে বিকশিত দেবত্বের ও মনুষ্যত্বের সাধারণভূমি অধিকার করিতে যত্ন করি-তেন।

রোমীয়েরা বিসদৃশ পদার্থের একীকরণে পটু ছিল। কোন দেশে রোমের জয়পতাকা উড্ডীন হইবামাত্র বন্দীদের সহিত তদ্দেশস্থিত দেবতারাও রোমে চালান্ হইত। রোম-বাসীদের বিদেশীয় দেবদেবীর প্রতি বিজা-তীয় ঘৃণা ছিল না। তাহাদের সম্মেলন করা বড় ভাল লাগিত। মিলুক আর না মিলুক, সংখ্যা ও আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইলেই তৃপ্তি হইত। তাহাদের দেবতাদের তালিকা রঙ্‌বেরঙের তালি দেওয়া আউলফকিরদের আঙরাখার মত। এইরূপ উদারতায় বিসদৃশের মিলন হয় বটে, কিন্তু শ্রীসৌষ্ঠব হয় না।

হিন্দুর উদারতা প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট। একটা মূলতত্ত্ব তাহারা গ্রহণ করে এবং পরে সেই মূলতত্ত্বকে পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত অন্যান্য মতের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে। গীতাশাস্ত্র ঐ প্রতিষ্ঠামূলক উদা-রতার সুমহৎ দৃষ্টান্তস্থল। বেদান্তের সার তত্ত্ব—এক বই দুই বস্তু পরমার্থতঃ হইতে পারে না—ইহাই গীতার মৌলিক-শিক্ষা। কিন্তু বহুবাদি-সাংখ্যদর্শন, দ্বৈতবাদি-ভক্তি-শাস্ত্র, কঠোর যোগসাধন—সমস্তই সেই সার-তত্ত্বে গ্রথিত হইয়াছে। গীতা কারুকার্য্য-খচিত স্বর্ণথালের ন্যায়। দুইটি মিলাইয়া এক করা হয় নাই, কিন্তু একেরই ঐশ্বর্য্য-বৈভব বৃদ্ধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের বিরোধ মিটান হইয়াছে। গ্রীকেরা বিভিন্ন মতের ভিতর হইতে সাধারণ ভাবটি গ্রহণ করে, রোমীয়েরা অসমানকে পার্শ্বাপার্শ্বি বসাইয়া ঐক্যস্থাপন করে। কিন্তু হিন্দুরা একটি মৌলিক দেশকালাতীত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্যান্য সার কথা সেই মূলের মূর্ছায় ঢালিয়া গ্রহণ করে। আমার একটি নৈসর্গিক সুর আছে। বেহালা বা এস্রাজের সুরের

সহিত আমার সুর মিশাইয়া মিষ্টতা ও বল বৃদ্ধি করি; কিন্তু পাঁচটা যন্ত্রের সংযোগে আমার সুর প্রস্তুত করি না। হিন্দু গ্রহণ করে, সংযোগ করে, কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তি ছাড়ে না। এই একনিষ্ঠ উদারতা হিন্দুজাতির বিশেষ গুণ। আজ হিন্দু-সন্তানেরা সেই একনিষ্ঠতা—সেই উদারতা হারাইয়া, তেজোহীন ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

একজন 'হিন্দু'শব্দের অর্থ করিয়াছে—"হীন" ও "দূরপলাতক"। বাস্তবিকই হিন্দুস্থানের হীনতার অবধি নাই। হিন্দু নিঃসত্ব হইয়াছে। এই দুর্দ্দশার প্রতীকার আবশ্যক। পশ্চাতে হটিয়া যাওয়া যায় না এবং দাঁড়াইয়া থাকাও শ্রেয়স্কর নহে। অগ্রসর হইতেই হইবে। এখন কোন্ প্রণালীতে আমাদের গতিবিধি নিয়মিত করা উচিত।

প্রথমে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আবশ্যক। আমাদের কিছু আছে, আমরা অসার নহি, এইরূপ বোধ হওয়া চাই। অধ্যাত্মদর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, বেদান্তশাস্ত্র এক অপূর্ব্ব, অপরিবর্ত্তনীয় তত্বকথা হিন্দুজাতিকে শুনাইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনগবেষণা যদি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে সেই বেদান্ততত্ব পরিপুষ্ট ও কার্য্যকারী হইবে না। যুরোপে অধ্যাত্মদর্শন নাই—ইহা এক ঘোর প্রমাদ। আপ্লাতুনের (Plato) মত আত্মদর্শী কয়জন জন্মিয়াছে? কান্ত (Kant) ও হেগেলের ন্যায় অদৃশ্যদর্শী অতি বিরল। যদি আমরা দর্শনবিদ্যায় অগ্রসর হইতে চাই, তাহা হইলে প্রতীচ্যদর্শনকে শিরোধার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু আদান করিতে গিয়া যেন বেদান্তভ্রষ্ট হইয়া না যাই। বেদান্ত হিন্দুর প্রতিষ্ঠাস্থানীয় চিরকালই থাকিবে। কিন্তু জর্ম্মণদর্শনের সহিত সংস্পর্শ ঘটাইয়া তাহাকে বিকশিত ও স্ফুটীকৃত করিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, বেদান্ত ব্রহ্মের লক্ষণসম্বন্ধে আংশিক সত্য বলিয়াছে এবং জর্ম্মণ হেগেলও আংশিক কথা বলিয়াছে—দুটা মিলাইয়া পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে—, তাঁহারা সত্য যে কি বস্তু তাহার আভাস পর্য্যন্ত বোধ হয় দেখেন নাই। আর যাঁহারা, বেদান্তেই সব আছে, ম্লেচ্ছদিগকে ঘরে ঢুকাইবার কোন আবশ্যক নাই, এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা সংস্পর্শজনিত-ক্রমবিকাশবিধি কাহাকে বলে, তাহা জানেন না।

সমাজসংস্কারবিষয়ে এইরূপ আমাদের নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়ান উচিত। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই সেই ভিত্তি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিলে কেহ যেন বর্ত্তমান কর্ম্মভ্রষ্ট শতবিভাগচূর্ণ সামাজিকতা মনে না করেন। য়ুরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য, গ্রহণ করিব, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে নষ্ট হইতে দিব না। ঐ সমস্ত য়ুরোপীয় প্রথা বর্ণধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ফলকরী হইবে, নহিলে বিষফল ফলিবে।

রাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রণালী। জাতীয় মহাসভার নেতারা মনে করেন যে, আমাদের রাজনীতি কিছুই ছিল না। য়ুরোপ হইতে ইহার আমদানি করা আবশ্যক। ইংলণ্ডে যেমন লোকের ভোটের উপর রাজ্যশাসন নির্ভর করে, সেইরূপ আমরাও এ দেশে ভোট চালাইব। কিন্তু

অবহিত হইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইংরাজের রাজতন্ত্র অর্থোন্নতিসাপেক্ষ। ব্যবসায়ী বণিকেরা রাজাকে অর্থের লাভ বা হানি দেখাইয়া যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে বাধ্য করিতে পারে। কোন বিধান বা ব্যবস্থা ধনাগমের সহায় না হইলে একেবারে পরিত্যক্ত হয়। ইংলণ্ডের রাজশক্তি তন্তুবায় ও সুরাজীবীদিগের অর্থলালসার দ্বারা চালিত। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতি যদি অর্থকরী হয়, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। যাহার ধন আছে, যে রাজস্ব দিতে পারে, সেই ভোটের অধিকারী এবং সেই অর্থগত ভোটের উপর হিন্দুস্থানের রাজতন্ত্র স্থাপিত হইলে, বড়ই এক গোলযোগ বাধিবে। হিন্দুর রাজ্যশাসনপ্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অস্ত্রজীবী কর্ত্তৃপক্ষ এবং বণিক্‌সম্প্রদায়ের উপর রাজার শক্তি বা শাসনবিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যাঁহারা জ্ঞানী অথচ অর্থহীন, যাঁহারা অস্ত্রসঞ্চালন করিতেন না, ক্রয়-বিক্রয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না, এইরূপ সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক-শাসনপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাদের অধিকার ভোট হইতে উদ্ভূত হইত না বা ভোটে বিনষ্ট হইত না। জ্ঞান, বুদ্ধি ও বৈরাগ্যের উপর ঐ শাসনবিধাতৃগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলদৃপ্ত নৃপতি ও অর্থলোলুপ বৈশ্য ঐ সুধীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হইত। এই পুরাতন হিন্দু শাসনপ্রণালী য়ুরোপীয় প্রণালী অপেক্ষা ভাল কি মন্দ, তাহা আপাততঃ বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে, যদি আমরা জাতীয়তাভ্রষ্ট হইতে না চাহি, তাহা হইলে আর্য্যরাজনীতিপ্রথাকেই আমাদের নূতন রাজতন্ত্রের ভিত্তি করিতে হইবে। তাহার উপর যত ইচ্ছা ভোট চড়াও, ক্ষতি হইবে না।

ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে কিরূপে আত্মমর্য্যাদা রাখিয়া উদারভাবে প্রতীচ্য আদর্শসকল গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

(১১)

আশার পক্ষে সঙ্গিনীর বড় দরকার হইয়াছিল। ভালবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দুই লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না—মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য বাজে লোকের দরকার হয়।

ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও, নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস, মাতালের জ্বালাময় মদের মত কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মা যখন ঘুমাইতেছেন, দাসদাসীরা একতলার বিশ্রামশালায় অদৃশ্য, মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য কালেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চীলের তীব্রকণ্ঠ অতিক্ষীণ স্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে, তখন নির্জ্জন শয়নগৃহে নীচের বিছানার বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া শুইত এবং বিনোদিনী বুকের নীচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া গুন্‌গুন্‌-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত,—তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

বিনোদিনী প্রশ্ন করিয়া করিয়া তুচ্ছতম কথাটি পর্য্যন্ত বাহির করিত, এক কথা বারবার করিয়া শুনিত, ঘটনা নিঃশেষ হইয়া গেলে কল্পনার অবতারণা করিত—কহিত, 'আচ্ছা ভাই, যদি এমন হইত ত কি হইত, যদি অমন হইত ত কি করিতে?' সেই সকল অসম্ভাবিত কল্পনার পথে সুখালোচনাকে সুদীর্ঘ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতে আশারও ভাল লাগিত।

বিনোদিনী কহিত, "আচ্ছা ভাই চোখের বালি, তোর সঙ্গে যদি বিহারিবাবুর বিবাহ হইত!"

আশা। না ভাই, ও কথা তুমি বলিয়ো না—ছি ছি, আমার বড় লজ্জা করে! কিন্তু তোমার সঙ্গে হইলে বেশ হইত, তোমার সঙ্গেও ত কথা হইয়াছিল।

বিনোদিনী। আমার সঙ্গে ত ঢের লোকের ঢের কথা হইয়াছিল। না হইয়াছে, বেশ হইয়াছে—আমি যা আছি, বেশ আছি!

আশা তাহার প্রতিবাদ করে। বিনোদিনীর অবস্থা যে তাহার অবস্থার চেয়ে ভাল, এ কথা সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে! —"একবার মনে করিয়া দেখ দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত! আর একটু হলেই ত হইত!"

তা' ত হইতই! না হইল কেন? আশার এই বিছানা, এই খাট ত একদিন তাহারই জন্যে অপেক্ষা করিয়াছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এ ঘরে

আজ সে অতিথিমাত্র—আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে!

অপরাহ্নে বিনোদিনী নিজে উদ্যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামি-সম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। আবার এক এক দিন কিছুতেই আশাকে ছাড়িয়া দিত না। বলিত, "আঃ, আর একটু বোসই না! তোমার স্বামী ত পালাইতেছেন না! তিনি ত বনের মায়ামৃগ নন্, তিনি অঞ্চলের পোষা হরিণ!"—এই বলিয়া নানা ছলে ধরিয়া রাখিয়া দেরী করাইবার চেষ্টা করিত।

মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিত—"তোমার সখী যে নড়িবার নাম করেন না—তিনি বাড়ী ফিরিবেন কবে?"

আশা ব্যগ্র হইয়া বলিত—"না, তুমি আমার চোখের বালির উপর রাগ করিয়ো না। তুমি জান না, সে তোমার কথা শুনিতে কত ভালবাসে—কত যত্ন করিয়া সাজাইয়া আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়!"

রাজলক্ষ্মী আশাকে কাজ করিতে দিতেন না। বিনোদিনী বধূর পক্ষ লইয়া তাহাকে কাজে প্রবৃত্ত করাইল। প্রায় সমস্তদিনই বিনোদিনীর কাজে আলস্য নাই, সেই সঙ্গে আশাকেও সে আর ছুটি দিতে চায় না। বিনোদিনী পরে পরে এমনি কাজের শৃঙ্খল বানাইতেছিল যে, তাহার মধ্যে ফাঁক পাওয়া আশার পক্ষে ভারি কঠিন হইয়া উঠিল। আশার স্বামী ছাদের উপরকার শূন্যঘরের কোণে বসিয়া আক্রোশে ছট্‌ফট্ করিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়া বিনোদিনী মনে মনে তীব্র কঠিন হাসি হাসিত। আশা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিত, "এবার যাই ভাই চোখের বালি, তিনি আবার রাগ করিবেন।"

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বলিত—"রোস, এইটুকু শেষ করিয়া যাও! আর বেশী দেরী হইবে না!"

খানিক বাদে আশা আবার ছট্‌ফট্ করিয়া বলিয়া উঠিত—"না ভাই, এবার তিনি সত্যসত্যই রাগ করিবেন—আমাকে ছাড়—আমি যাই!"

বিনোদিনী বলিত—"আহা একটু রাগ করিলই বা! সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালবাসার স্বাদ থাকে না—তরকারীতে লঙ্কামরিচের মত!"

কিন্তু লঙ্কামরিচের স্বাদটা যে কি, তাহা বিনোদিনীই বুঝিতেছিল—কেবল সঙ্গে তাহার তরকারী ছিল না। তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গবর্ষণ হইতে থাকে! "এমন সুখের ঘরকন্না—এমন সোহাগের স্বামী! এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম! তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই 'ছিরি' থাকিত! আমার জায়গায় কি না এই কচি-খুকী, এই খেলার পুতুল!" (আশার গলা

জড়াইয়া) "ভাই চোখের বালি, বল না ভাই, কাল তোমাদের কি কথা হইল ভাই? আমি তোমাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলাম, তাহা বলিয়াছিলে? তোমাদের ভালবাসার কথা শুনিলে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না ভাই!"

(১২)

মহেন্দ্র একদিন বিরক্ত হইয়া তাহার মাকে ডাকিয়া কহিল—"এ কি ভাল হইতেছে? পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে আনিয়া একটা দায় ঘাড়ে করিবার দরকার কি? আমার ত ইহাতে মত নাই—কি জানি, কখন কি সঙ্কট ঘটিতে পারে!"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ও যে আমাদের বিপিনের বউ, উহাকে আমি ত পর মনে করি না!"

মহেন্দ্র কহিল—"না মা ভাল হইতেছে না। আমার মতে উঁহাকে রাখা উচিত হয় না!"

রাজলক্ষ্মী বেশ জানিতেন, মহেন্দ্রের মত অগ্রাহ্য করা সহজ নহে। তিনি বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ও বেহারী, তুই একবার মহীন্‌কে বুঝাইয়া বল্! বিপিনের বৌ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই। পর হউক্ যা হউক্, আপন লোকের কাছ হইতে এমন সেবা ত কখনো পাই নাই!"

বিহারী রাজলক্ষ্মীকে কোন উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের কাছে গেল—কহিল, "মহীন্ দা, বিনোদিনীর কথা কিছু ভাবিতেছ?"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—"ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না। তোমার বোঠা'ণকে জিজ্ঞাসা কর না, আজকাল বিনোদিনীর ধ্যানে আমার আর সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।"

আশা ঘোমটার ভিতর হইতে মহেন্দ্রকে নীরবে তর্জ্জন করিল!

বিহারী কহিল—"বল কি! দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ!"

মহেন্দ্র। ঠিক তাই! এখন উহাকে বিদায় করিবার জন্য চুনী ছট্‌ফট্ করিতেছে।

ঘোমটার ভিতর হইতে আশার দুই চক্ষু আবার ভৎসনা বর্ষণ করিল।

বিহারী কহিল—"বিদায় করিলেও ফিরিতে কতক্ষণ? বিধবার বিবাহ দিয়া দাও—বিষদাঁত একেবারে ভাঙিবে।"

মহেন্দ্র। কুন্দরও ত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল!

বিহারী কহিল—"থাক্, ও উপমাটা এখন রাখ! বিনোদিনীর কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি। তোমার এখানে উনি ত চিরদিন থাকিতে পারেন না। তাহার পরে যে বন দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানে উঁহাকে যাবজ্জীবন বনবাসে পাঠানো, সেও বড় কঠিন দণ্ড।"

মহেন্দ্রের সম্মুখে এ পর্য্যন্ত বিনোদিনী বাহির হয় নাই, কিন্তু বিহারী তাহাকে দেখিয়াছে। বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা এক ভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়—সে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে এই কথা লইয়া

অনেক পরিহাস করিল। বিহারীও তাহার জবাব দিল। কিন্তু তাহার মন বুঝিয়াছিল, এ নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে সাবধান করিয়া দিলেন। কহিলেন, "দেখ বাছা, বৌকে লইয়া তুমি অত টানাটানি করিয়ো না! তুমি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরে ছিলে—আজকালকার চালচলন জান না। তুমি বুদ্ধিমতী, ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিয়ো।"

ইহার পর বিনোদিনী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ব্বক আশাকে দূরে দূরে রাখিল! কহিল—"আমি ভাই কে! আমার মত অবস্থার লোক আপন মান বাঁচাইয়া চলিতে না জানিলে, কোন্ দিন কি ঘটে, বলা যায় কি!"

আশা সাধাসাধি কান্নাকাটি করিয়া মরে—বিনোদিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! মনের কথায় আশা আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বিনোদিনী আমল দিল না।

এদিকে মহেন্দ্রের বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুগ্ধদৃষ্টি যেন ক্লান্তিতে আবৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে যে সকল অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলা তাহার কাছে কৌতুকজনক বোধ হইত, এখন তাহা অল্পে অল্পে তাহাকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার সাংসারিক অপটুতায় সে ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলে না। প্রকাশ না করিলেও আশা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মর্য্যাদা ম্লান হইয়া যাইতেছে। মহেন্দ্রের সোহাগের মধ্যে বেসুর লাগিতেছিল, কতকটা মিথ্যা বাড়াবাড়ি, কতকটা আত্মপ্রতারণা।

এ সময়ে পলায়ন ছাড়া পরিত্রাণ নাই, বিচ্ছেদ ছাড়া ঔষধ নাই। স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে আশা আজকাল মহেন্দ্রকে ফেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বিনোদিনী ছাড়া তাহার যাইবার স্থান কোথায়?

মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তপ্ত বাসরশয্যার মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সংসারের কাজকর্ম্ম পড়াশুনার প্রতি একটু সজাগ হইয়া পাশ ফিরিল। ডাক্তারি বইগুলাকে নানা অসম্ভব স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধূলা ঝাড়িতে লাগিল এবং চাপকান প্যাণ্ট্‌লুন কয়টা রৌদ্রে দিবার উপক্রম করিল।

(১৩)

বিনোদিনী যখন নিতান্তই ধরা দিল না, তখন আশার মাথায় একটা ফন্দী আসিল। সে বিনোদিনীকে কহিল, "ভাই বালি, তুমি আমার স্বামীর সমুখে বাহির হও না কেন? পালাইয়া বেড়াও কি জন্য?"

বিনোদিনী অতি সংক্ষেপে এবং সতেজে উত্তর করিল, "ছি ছি!"

আশা কহিল—"কেন? মার কাছে শুনিয়াছি, তুমি ত আমাদের পর নও!"

বিনোদিনী গম্ভীরমুখে কহিল—"সংসারে আপন-পর কেহই নাই। যে আপন মনে করে, সেই আপন—যে পর বলিয়া জানে, সে আপন হইলেও পর!

আশা মনে মনে ভাবিল, এ কথার আর উত্তর নাই। বাস্তবিকই তাহার স্বামী

বিনোদিনীর প্রতি অন্যায় করেন, বাস্তবিকই তাহাকে পর ভাবেন এবং তাহার প্রতি অকারণে বিরক্ত হন।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আশা স্বামীকে অত্যন্ত আবদার করিয়া ধরিল—"আমার চোখের বালির সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "তোমার সাহস ত কম নয়!"

আশা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, ভয় কিসের?"

মহেন্দ্র। তোমার সখীর যে রকম রূপের বর্ণনা কর, সে ত বড় নিরাপদ্ জায়গা নয়।

আশা কহিল—"আচ্ছা, সে আমি সাম্‌লাইতে পারিব। তুমি ঠাট্টা রাখিয়া দাও—তার্ সঙ্গে আলাপ করিবে কি না বল!"

বিনোদিনীকে দেখিবে বলিয়া মহেন্দ্রের যে কৌতূহল ছিল না, তাহা নহে। এমন কি, আজকাল তাহাকে দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহও জন্মে। সেই অনাবশ্যক আগ্রহটা তাহার নিজের কাছে উচিত বলিয়া ঠেকে নাই।

হৃদয়ের সম্পর্কসম্বন্ধে মহেন্দ্রের উচিত-অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া! পাছে-মাতার অধিকার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এই জন্য ইতিপূর্ব্বে সে বিবাহের প্রসঙ্গমাত্র কানে আনিত না। আজকাল, আশার সহিত সম্বন্ধকে সে এমন ভাবে রক্ষা করিতে চায় যে, অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্য কৌতূহলকেও সে মনে স্থান দিতে চায় না। প্রেমের বিষয়ে সে যে বড় খুঁৎখুঁতে এবং অত্যন্ত খাঁটি, এই লইয়া তাহার মনে একটা গর্ব্ব ছিল। এমন কি, বিহারীকে সে বন্ধু বলিত বলিয়া অন্য কাহাকেও বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেই চাহিত না। অন্য কেহ যদি তাহার নিকট আকৃষ্ট হইয়া আসিত, তবে মহেন্দ্র যেন তাহাকে গায়ে পড়িয়া উপেক্ষা দেখাইত, এবং বিহারীর নিকটে সেই হতভাগ্যসম্বন্ধে উপহাসতীব্র অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইতর-সাধারণের প্রতি নিজের একান্ত ঔদাসীন্য ঘোষণা করিত। বিহারী ইহাতে আপত্তি করিলে মহেন্দ্র বলিত—"তুমি পার বিহারী, যেখানে যাও তোমার বন্ধুর অভাব হয় না; আমি কিন্তু যাকে তাকে বন্ধু বলিয়া টানা-টানি করিতে পারি না।"

সেই মহেন্দ্রের মন আজকাল যখন মাঝে মাঝে অনিবার্য্য ব্যগ্রতা ও কৌতূহলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত, তখন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন খাট হইয়া পড়িত। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বিনোদিনীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য সে তাহার মাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

মহেন্দ্র কহিল—"থাক্ চুনি! তোমার চোখের বালির সঙ্গে আলাপ করিবার সময় কই?" পড়িবার সময় ডাক্তারি বই পড়িব, অবকাশের সময় তুমি আছ, ইহার মধ্যে সখীকে কোথায় আনিবে?"

আশা কহিল—"আচ্ছা তোমার ডাক্তারিতে ভাগ বসাইব না, আমারি অংশ আমি বালিকে দিব!"

মহেন্দ্র কহিল—"তুমি ত দিবে, আমি দিতে দিব কেন ?"

আশা যে বিনোদিনীকে ভালবাসিতে পারে, মহেন্দ্র বলে, ইহাতে তাহার স্বামীর প্রতি প্রেমের খর্ব্বতা প্রতিপন্ন হয়। মহেন্দ্র অহঙ্কার করিয়া বলিত, "আমার মত অনন্যনিষ্ঠ প্রেম তোমার নহে।" আশা তাহা কিছুতেই মানিত না,—ইহা লইয়া ঝগড়া করিত, কাঁদিত, কিন্তু তর্কে জিতিতে পারিত না।

মহেন্দ্র তাহাদের দু'জনের মাঝখানে বিনোদিনীকে সূচ্যগ্র স্থান ছাড়িয়া দিতে চায় না, ইহাই তাহার গর্ব্বের বিষয় হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের এই গর্ব্ব আশার সহ্য হইত না, কিন্তু আজ সে পরাভব স্বীকার করিয়া কহিল—"আচ্ছা বেশ, আমার খাতিরেই তুমি আমার বালির সঙ্গে আলাপ কর।"

আশার নিকট মহেন্দ্র নিজের ভালবাসার দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজি হইল।—বলিয়া রাখিল, "কিন্তু তাই বলিয়া যখন-তখন উৎপাত করিলে বাঁচিব না।"

পরদিন প্রত্যূষে বিনোদিনীকে আশা তাহার বিছানায় গিয়া জড়াইয়া ধরিল। বিনোদিনী কহিল—"এ কি আশ্চর্য্য! চকোরী যে আজ চাঁদকে ছাড়িয়া মেঘের দরবারে ?"

আশা কহিল—"তোমাদের ও সব কবিতার কথা আমার আসে না ভাই, কেন বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো ? যে তোমার কথার জবাব দিতে পারিবে, একবার তাহার কাছে কথা শোনাও'সে!"

বিনোদিনী কহিল, "সে রসিক লোকটি কে ?"

আশা কহিল—"তোমার দেবর, আমার স্বামী! না ভাই ঠাট্টা নয়—তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন!"

বিনোদিনী মনে মনে কহিল, "স্ত্রীর হুকুমে আমার প্রতি তলব পড়িয়াছে, আমি অমনি ছুটিয়া যাইব, আমাকে তেমন পাও নাই!"

বিনোদিনী কোনমতেই রাজি হইল না। আশা তখন স্বামীর কাছে বড় অপ্রতিভ হইল।

মহেন্দ্র মনে মনে বড় রাগ করিল। তাহার কাছে বাহির হইতে আপত্তি! তাহাকে অন্য সাধারণ পুরুষের মত জ্ঞান করা! আর কেহ হইলে ত এতদিনে অগ্রসর হইয়া নানা কৌশলে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় করিত। মহেন্দ্র যে তাহার চেষ্টামাত্রও করে নাই, ইহাতেই কি বিনোদিনী তাহার পরিচয় পায় নাই ? বিনোদিনী যদি একবার ভাল করিয়া জানে, তবে অন্য পুরুষ এবং মহেন্দ্রের প্রভেদ বুঝিতে পারে!

বিনোদিনীও দু'দিন পূর্ব্বে আক্রোশের সহিত মনে মনে বলিয়াছিল—"এতকাল বাড়ীতে আছি, মহেন্দ্র যে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না! যখন পিসিমার ঘরে থাকি, তখন কোন ছুতা করিয়াও যে মার ঘরে আসে না! এত ঔদাসীন্য কিসের?

আমি কি জড়পদার্থ? আমি কি মানুষ না? আমি কি স্ত্রীলোক নই? একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনীর সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত!"

আশা স্বামীর কাছে প্রস্তাব করিল—"তুমি কালেজে গেছ বলিয়া চোখের বালিকে আমাদের ঘরে আনিব, তাহার পরে বাহির হইতে তুমি হঠাৎ আসিয়া পড়িবে—তা হইলেই সে জব্দ হইবে!"

মহেন্দ্র কহিল, "কি অপরাধে তাহাকে এত বড় কঠিন শাসনের আয়োজন?"

আশা কহিল—"না, সত্যই আমার ভারি রাগ হইয়াছে! তোমার সঙ্গে দেখা করিতেও তার আপত্তি! প্রতিজ্ঞা ভাঙিব, তবে ছাড়িব!"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার প্রিয়সখীর দর্শনাভাবে আমি মরিয়া যাইতেছি না। আমি অমন চুরি করিয়া দেখা করিতে চাই না!"

আশা সানুনয়ে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল—"মাতা খাও, একটিবার তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে! একবার যে করিয়া হোক্, তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তার পর তোমাদের যেমন ইচ্ছা, তাই করিয়ো!"

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল। আশা কহিল, "লক্ষ্মীটি আমার অনুরোধ রাখ!"

মহেন্দ্রের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—সেই জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া সম্মতি দিল।

শরৎকালের স্বচ্ছ নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নির্জ্জন শয়নগৃহে বসিয়া আশাকে কার্পেটের জুতা বুনিতে শিখাইতেছিল। আশা অন্যমনস্ক হইয়া ঘনঘন দ্বারের দিকে চাহিয়া গণনায় ভুল করিয়া বিনোদিনীর নিকট নিজের অসাধ্য অপটুত্ব প্রকাশ করিতেছিল।

অবশেষে বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া তাহার হাত হইতে কার্পেট টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল—"ও তোমার হইবে না, আমার কাজ আছে, আমি যাই!"

আশা কহিল, "আর একটু বোস, এবার দেখ, আমি ভুল করিব না।" বলিয়া আবার সেলাই লইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দপদে বিনোদিনীর পশ্চাতে দ্বারের নিকট মহেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল। আশা সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়া আস্তে আস্তে হাসিতে লাগিল।

বিনোদিনী কহিল, "হঠাৎ হাসির কথা কি মনে পড়িল?" আশা আর থাকিতে পারিল না। উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া কার্পেট্ বিনোদিনীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল—"না ভাই, ঠিক বলিয়াছ,—ও আমার হইবে না"—বলিয়া বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া দ্বিগুণ হাসিতে লাগিল।

প্রথম হইতেই বিনোদিনী সব বুঝিয়াছিল। আশার চাঞ্চল্যে এবং ভাবভঙ্গীতে তাহার নিকট কিছুই গোপন ছিল না। কখন্ মহেন্দ্র পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল! নিতান্ত সরল নিরীহের মত সে আশার এই অত্যন্ত ক্ষীণ ফাঁদের মধ্যে ধরা দিল।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"হাসির কারণ হইতে আমি হতভাগ্য কেন বঞ্চিত হই?"

বিনোদিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল!

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—"হয় আপনি বসুন আমি যাই, নয় আপনিও বসুন আমিও বসি!"

বিনোদিনী সাধারণ মেয়ের মত আশার সহিত হাত কাড়াকাড়ি করিয়া মহাকোলাহলে লজ্জার ধুম বাধাইয়া দিল না। সহজস্বরেই বলিল—"কেবল আপনার অনুরোধেই বসিলাম, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দিবেন না!"

মহেন্দ্র কহিল—"এই বলিয়া অভিশাপ দিব, আপনার যেন অনেকক্ষণ চলৎশক্তি না থাকে!"

বিনোদিনী কহিল—"সে অভিশাপকে আমি ভয় করি না। কেন না, আপনার অনেকক্ষণ খুব বেশিক্ষণ হইবে না। বোধ হয়, সময় উত্তীর্ণ হইয়া আসিল!"

বলিয়া আবার সে উঠিবার চেষ্টা করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মাথা খাও, আর একটু বোস!"

(১৪)

আশা জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য করিয়া বল, আমার চোখের বালিকে কেমন লাগিল?"

মহেন্দ্র কহিল, "মন্দ নয়!"

আশা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "তোমার কাউকে আর পছন্দই হয় না!"

মহেন্দ্র। কেবল একটি লোক ছাড়া!

আশা কহিল—"আচ্ছা ওর সঙ্গে আর একটু ভাল করিয়া আলাপ হউক, তার পরে বুঝিব, পছন্দ হয় কি না!"

মহেন্দ্র কহিল—"আবার আলাপ? এখন বুঝি বরাবরই এমনি চলিবে?"

আশা কহিল—"ভদ্রতার খাতিরেও ত মানুষের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়! একদিন পরিচয়ের পরেই যদি দেখাশুনা বন্ধ কর, তবে চোখের বালি কি মনে করিবে বল দেখি? তোমার কিন্তু সকলি আশ্চর্য্য! আর কেউ হইলে অমন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য সাধিয়া বেড়াইত—তোমার যেন একটা মস্ত বিপদ্ উপস্থিত হইল!"

অন্য লোকের সঙ্গে তাঁহার এই প্রভেদের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ভারি খুসি হইল। কহিল, "আচ্ছা, বেশ ত! ব্যস্ত হইবার দরকার কি। আমার ত পালাইবার স্থান নাই, তোমার সখীরও পালাইবার তাড়া দেখি না—সুতরাং দেখা মাঝে মাঝে হইবেই, এবং দেখা হইলে ভদ্রতা রক্ষা করিবে, তোমার স্বামীর সেটুকু শিক্ষা আছে।"

মহেন্দ্র মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিনোদিনী এখন হইতে কোন না কোন ছুতায় দেখা দিবেই। ভুল বুঝিয়াছিল। বিনোদিনী কাছ দিয়াও যায় না—দৈবাৎ যাতায়াতের পথেও দেখা হয় না।

পাছে কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ হয় বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রসঙ্গ স্ত্রীর কাছে উত্থাপন করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিনোদিনীর সঙ্গলাভের জন্য স্বাভাবিক সামান্য ইচ্ছাকেও গোপন ও দমন করিতে গিয়া, মহেন্দ্রের ব্যগ্রতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার পরে বিনোদিনীর ঔদাস্তে তাহাকে আরো উত্তেজিত করিতে থাকিল।

বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা হইবার পরদিনে মহেন্দ্র নিতান্তই যেন প্রসঙ্গক্রমে

হাস্যচ্ছলে আশাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আচ্ছা তোমার অযোগ্য এই স্বামীটিকে চোখের বালির কেমন লাগিল ?"

প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই আশার কাছ হইতে এ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিস্তারিত রিপোর্ট্ পাইবে, মহেন্দ্রের এরূপ দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল ! কিন্তু সে জন্য সবুর করিয়া যখন ফল পাইল না, তখন লীলাচ্ছলে প্রশ্নটা উত্থাপন করিল।

আশা মুস্কিলে পড়িল। চোখের বালি কোন কথাই বলে নাই। তাহাতে আশা সখীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীকে বলিল—"রোস, দু'চারি দিন আগে আলাপ হোক্, তার পরে ত বলিবে। কাল কতক্ষণেরই বা দেখা, ক'টা কথাই বা হইয়াছিল ?"

ইহাতেও মহেন্দ্র কিছু নিরাশ হইল এবং বিনোদিনীসম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা দেখান তাহার পক্ষে আরো দুরূহ হইল।

এই সকল আলোচনার মধ্যে বিহারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি মহীন্ দা, আজ তোমাদের তর্কটা কি লইয়া ?"

মহেন্দ্র কহিল—"দেখ ত ভাই, কুমুদিনী না প্রমোদিনী না কার সঙ্গে তোমার বৌঠা'ণ চুলের দড়ি না মাছের কাঁটা না কি একটা পাতাইয়াছেন, কিন্তু আমাকেও তাই বলিয়া তাঁর সঙ্গে চুরোটের ছাই কিংবা দেশালাইয়ের কাঠি পাতাইতে হইবে, এ হইলে ত বাঁচা যায় না।"

আশার ঘোমটার মধ্যে নীরবে তুমুল কলহ ঘনাইয়া উঠিল। বিহারী ক্ষণকাল নিরুত্তরে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল—কহিল, "বৌঠা'ণ, লক্ষণ ভাল নয় ! এ সব ভোলাইবার কথা ! তোমার চোখের বালিকে আমি দেখিয়াছি ; আরো যদি ঘন-ঘন দেখিতে পাই, তবে সেটাকে দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিব না, সে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু মহীন্ দা যখন এত করিয়া বে-কবুল যাইতেছেন, তখন বড় সন্দেহের কথা !"

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিহারীর যে অনেক প্রভেদ, আশা তাহার আর একটি প্রমাণ পাইল !

হঠাৎ মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ অভ্যাসের সখ্ চাপিল। পূর্ব্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেরামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে সুরু করিল। বাড়ীর চাকর-বেহারাদের পর্য্যন্ত ছবি তুলিতে লাগিল।

আশা ধরিয়া পড়িল, চোখের বালির একটা ছবি লইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল—"আচ্ছা!"

চোখের বালি তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিল—"না !"

আশাকে আবার একটা কৌশল করিতে হইল। এবং সে কৌশল গোড়া হইতেই বিনোদিনীর অগোচর রহিল না।

মৎলব এই হইল, মধ্যাহ্নে আশা তাহাকে নিজের শোবার ঘরে আনিয়া কোনমতে ঘুম পাড়াইবে এবং মহেন্দ্র সেই অবস্থায় ছবি তুলিয়া অবাধ্য সখীকে উপযুক্তরূপ জব্দ করিবে।

আশ্চর্য্য এই, বিনোদিনী কোনদিন দিনের বেলায় ঘুমায় না। কিন্তু আশার ঘরে আসিয়া সে দিন তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িল। গায়ে একখানি লাল শাল দিয়া খোলা জানালার দিকে মুখ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া এমনি সুন্দরভঙ্গীতে ঘুমাইয়া পড়িল যে, মহেন্দ্র কহিল, "ঠিক মনে হইতেছে যেন ছবি লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে!"

মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন্ দিক্ হইতে ছবি লইলে ভাল হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা দিক্ হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। এমন কি, আর্টের খাতিরে অতি সন্তর্পণে শিয়রের কাছে তাহার খোলা চুল এক জায়গায় একটু সরাইয়া দিতে হইল—পছন্দ না হওয়ায় পুনরায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইল! আশাকে কানে কানে কহিল, "পায়ের কাছে শালটা একটুখানি বাঁ দিকে সরাইয়া দাও!"

অপটু আশা কানে কানে কহিল, "আমি ঠিক পারিব না, ঘুম ভাঙাইয়া দিব—তুমি সরাইয়া দাও!"

মহেন্দ্র সরাইয়া দিল।

অবশেষে যেই ছবি লইবার জন্য ক্যামেরার মধ্যে কাচ পুরিয়া দিল, অমনি যেন কিসের শব্দে বিনোদিনী নড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল! আশা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল। বিনোদিনী বড়ই রাগ করিল—তাহার জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু দুটি হইতে মহেন্দ্রের প্রতি অগ্নিবাণ বর্ষণ করিয়া কহিল—"ভারি অন্যায়!"

মহেন্দ্র কহিল—"অন্যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই! কিন্তু চুরিও করিলাম, অথচ চোরাই মাল ঘরে আসিল না, ইহাতে যে আমার ইহকাল-পরকাল দুই গেল। অন্যায়টাকে শেষ করিতে দিয়া তাহার পরে দণ্ড দিবেন।"

আশাও বিনোদিনীকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িল। ছবি লইতে হইল। কিন্তু প্রথম ছবিটা খারাপ হইয়া গেল। সুতরাং পরের দিন আর একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না। তার পরে আবার দুই সখীকে একত্র করিয়া বন্ধুত্বের চিরনিদর্শনস্বরূপ একখানি ছবি তোলার প্রস্তাবে বিনোদিনী না বলিতে পারিল না। কহিল—"কিন্তু এইটেই শেষ ছবি।"

শুনিয়া মহেন্দ্র সে ছবিটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ-পরিচয় বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল।

ক্রমশ।

অশোকের কালনিরূপণ।

অশোকের আবির্ভাবকাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। অশোকাবদান ও দিব্যাবদানের মতে, বুদ্ধনির্ব্বাণের ১০০ শত বর্ষ পরে অশোক রাজ্যলাভ করেন। মহাবংশ-মতে, এই অশোকের নাম কালাশোক। কালাশোকের পর প্রথমে তাঁহার দশ ও পরে নয় পুত্র একত্র ২২ বর্ষ করিয়া ৪৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। ঐ নয় জনের শেষ নৃপতির নাম ধননন্দ। চাণক্য তাঁহাকে হত্যা করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করেন। তৎপরে তৎপুত্র বিন্দুসার ২৮ বর্ষ রাজা ছিলেন। অশোক তাঁহারই পুত্র। বুদ্ধনির্ব্বাণের পর ও এই অশোকের অভিষেক পর্য্যন্ত ২১৮ বর্ষ গত হইয়াছিল। *

মহাবংশ-মতে ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন; সুতরাং মহাবংশানুসারে ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক ঘটে। † এরূপ স্থলে ৩৫৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বিন্দুসারের ও ৩৮১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেককাল ধরিয়া লইতে পারি, কিন্তু পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ কেহই মহাবংশের উপর আস্থাবান্ নহেন। তাহার প্রধান কারণ, বুদ্ধনির্ব্বাণ হইতে মহাবংশে যে অব্দ গণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসজনক নহে। কারণ বুদ্ধনির্ব্বাণকাল লইয়া নানাদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। এজন্য তাঁহারা বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দের উপর নির্ভর না করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়াছেন। জাষ্টিনস্ প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মহাবীর আলেকসান্দারের সমসাময়িক যে Sandrocottus এর উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চত্যপুরাবিদ্‌গণের বিশ্বাস, 'তিনিই মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত।' ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেক্‌সান্দার পঞ্চনদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যগণের বিশ্বাস, সে সময়ে চন্দ্রগুপ্ত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দার রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া রক্ষা পান। ‡ এইরূপে ভারতের আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ আলেক্‌সান্দার ও চন্দ্রগুপ্তের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া ভারতের কালক্রমিক ইতিহাসের পত্তন করিয়াছেন।

অশোক যখন চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, তখন তিনি যে আলেক্‌সান্দার বা চন্দ্রগুপ্তের বহুপরে সিংহাসন লাভ করিবেন, এ সম্বন্ধে কেহ

---

* "জিননিব্বানতো পচ্ছাপুরে তস্সাভিসেকতো অট্ঠারসং বস্সসতং দ্বয়মেব বিজানিয়ং।"

[মহাবংশ ৫ম পরি.]

† পূর্ব্বতন বৌদ্ধদিগের মধ্যে অশোকের অভিষেকসম্বন্ধে মতভেদ আছে। বাহুল্যভয়েও তাহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ থাকায় তৎপ্রকাশে বিরত হওয়া গেল।

‡ বিশ্বকোষে 'চন্দ্রগুপ্ত'-শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কখন সন্দেহ করেন নাই। বিশেষত প্রিয়দর্শীর অনুশাসনে অন্তিওক (Antiochus), তুরময় (Ptolemæus), অন্তিকিনি(Antigonus), মক (Magas) ও অলিকসুন্দর (Alexander) প্রভৃতি কয়েকজন দূরদেশবাসী যবন-(Greek) রাজের নাম পাওয়া যায়। ঐ পাঁচজনের কালসম্বন্ধে অধ্যাপক ল্যাসেন লিখিয়াছেন :—

Antiochus of Syria… (রাজ্যকাল) ২৬০—২৪৭ খৃঃ পূঃ।

Ptolemy Philadelphus… ঐ ২৮৫—২৪৭ খৃঃ পূঃ।

Antigonus Gonatus of Macedonia … ঐ ২৭৮—২৪২ খৃঃ পূঃ।

Magas of Cyrene ২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৃত্যু।

Alexander of Epirus … ঐ ২৬২—২৫৮ খৃঃ পূঃ।

উক্ত পাঁচজন রাজা সকলেই ২৬০ হইতে ২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। এজন্য সেনার্ট বলেন, "প্রিয়দর্শীর রাজত্বের ১৩শ বর্ষে যে লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে যখন ঐ পাঁচ জনের নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন সম্ভবত ঐ লিপিখানিও ২৬০—২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে ২৬৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার অভিষেক এবং তাঁহার চারিবর্ষ পূর্ব্বে ২৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজ্যলাভ ঘটে।" রিস্‌ডেভিড্‌, বুহ্লর, কার্ণ প্রভৃতি সকলেই ঐ মত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কি ঐ মত গ্রহণ করিতে পারি? মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রকৃতই কি আলেক্‌সান্দারের সমসাময়িক,প্রকৃতই কি তিনি মাকিদনবীরের নিকট অপদস্থ হইয়াছিলেন?

আমরা দিওদোরস্‌ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে জানিয়াছি যে, আলেক্‌সান্দারের পঞ্চনদে অবস্থিতিকালে চন্দ্রমা বা চান্দ্রমস (Xandrames) নামধেয় জনৈক নৃপতি প্রবল প্রতাপে পূর্ব্বভারত শাসন করিতেছিলেন।*

উক্ত প্রমাণ দ্বারা কিরূপে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মহাবীর আলেক্‌সান্দারের পর মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে যেমন বুদ্ধ ও অশোকের কালনির্ণয়ে বিভিন্ন মত, চন্দ্রমা (Xandrames) বা চন্দ্রগুপ্তের (Sandrocottus) পরিচয়কালেও প্রাচীন গ্রীক্‌ ঐতিহাসিকগণ সকলেই তদ্রূপ একমত নহেন। এরূপ স্থলে উভয় মতই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এখন উভয় মত ছাড়িয়া অন্য উপায়ে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের কোন সময় পাওয়া যায় কি না, তাহাই দেখা যাউক।

জৈনদিগের মতে মহাবীরের নির্ব্বাণের পর, ১৫৫ বর্ষ গত হইলে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন।† শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মতে, বিক্র-

* তাঁহার ২ লক্ষ পদাতি, ২০ হাজার অশ্বারোহী, ২ হাজার রথ ও ৪ হাজার হস্তী ছিল।
[বিশ্বকোষ—'চন্দ্রগুপ্ত'-শব্দ, ১৩৫ পৃ.।]

† "এবঞ্চ শ্রীমহাবীরমুক্তের্ব্বর্ষশতে গতে। পঞ্চপঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোঽভবন্নৃপঃ॥"
[হেমচন্দ্রবিরচিত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতে পরিশিষ্ট পর্ব্ব ৮।৩৩৯]

মের ৪৭০ বর্ষ পূর্ব্বে এবং দিগম্বরদিগের মতে শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে মহাবীর নির্ব্বাণ-লাভ করেন। * বুদ্ধনির্ব্বাণসম্বন্ধে যেরূপ নানা মত, বীরনির্ব্বাণসম্বন্ধে সেরূপ মতান্তর নাই। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মতেই মিল দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ উভয়-মতেই ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বীরনির্ব্বাণ ঘটে। এরূপ স্থলে, তাঁহার ১৫৫ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৭২ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কাল হইতেছে। শ্রাবণবেলগোলা হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম শিলালিপিতে প্রকাশ যে, চন্দ্রগুপ্ত শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সহিত উজ্জয়িনীধামে আগমন করেন। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, বীরমোক্ষ হইতে ১৭০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ভদ্রবাহু স্বর্গলাভ করেন। † এ সময়ে চন্দ্রগুপ্তের বিদ্যমান থাকাই সম্ভব। ‡ চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের প্রভাব ভারতেতিহাসে প্রসিদ্ধ। চাণক্যের কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত যে নিতান্ত অল্পদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। মহাবংশে তাঁহার ৩৪ বর্ষ ও তৎ-পুত্র বিন্দুসারের ২৮ বর্ষ রাজ্যকাল লিখিত হইয়াছে। এদিকে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে চন্দ্র-গুপ্ত ২৪ বর্ষ ও বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। এরূপ স্থলে উভয় রাজার রাজ্য-কাল মোটামুটি ৫৫ বৎসর ধরিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেকের প্রায় ৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩১৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে অশোকের রাজ্যা-রম্ভ ধরিয়া লওয়া যায়। এখন জৈনমত হইতে দেখিতেছি, যে সময়ে আলেক্‌সান্দার পঞ্চনদে উপস্থিত, সে সময়ে মগধের সিংহা-সনে বিন্দুসার অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত পূর্ব্ব-ভারত শাসন করিতেছেন। সম্ভবত তিনিই গ্রীক্‌দিগের নিকট চন্দ্রমা বা চান্দ্রমস (Xandrames) নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। দিওদোরস্ সিকিউলাস্ লিখিয়াছেন, "আলেক্‌সান্দার ফিজিয়াসের মুখে শুনিয়া-ছিলেন, সিন্ধুর পরপারে ১২ দিনের পথ গেলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার পরপারে চন্দ্রমার (Xandrames) রাজ্য। তাঁহার লক্ষাধিক সৈন্য আছে শুনিয়া আলেক্‌সান্দার প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে পুরু-রাজ (Porus) তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করেন। পুরুরাজ আরও বলেন যে, গাঙ্গ্যপ্রদেশের সেই রাজা অতি নীচবংশোদ্ভব, নাপিতের পুত্র। নাপিত অতি সুপুরুষ ছিল। রাণী তাহার রূপে মুগ্ধা হয়, এই অবৈধ প্রণয়ে এক পুত্র জন্মে। সেই দুষ্টা পরে রাজাকে মারিয়া ফেলে। তাই এখন তাহার পুত্র রাজা হইয়াছে।" (Diodorus Siculus)

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ও দিওদোরাসের মত

* বিশ্বকোষ 'জৈন'-শব্দ ১৬২ পৃ.।

† "বীরমোক্ষাদ্বর্ষশতে সপ্তত্যগ্রে গতে সতি।
ভদ্রবাহুরপি স্বামী যযৌ স্বর্গং সমাধিনা॥" [পরিশিষ্ট পর্ব্ব ১০।১১২]

‡ পাটলিপুত্রের শ্রীসঙ্ঘে ভদ্রবাহু ছিলেন না; অধিক সম্ভব, সে সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ তাহাতে সুখী নহেন, তাঁহারা অশোকের সময়ে ভদ্রবাহুকে টানিয়া আনিতে ইচ্ছুক।

উক্ত রাজার বিপুল সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া শেষে লিখিয়াছেন যে, প্রজাগণ সকলেই ঐ রাজাকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিয়া থাকে।

মাকিদন-বীরের সমকালিক গাঙ্গ্যপ্রদেশের যে রাজার পরিচয় উপরে লিখিত হইল, হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ কোন গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত বা অশোক সম্বন্ধে ঐরূপ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

উক্ত চান্দ্রমস-রাজ সম্ভবত চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনাধিকারী বিন্দুসার। বিন্দুসারের সুখ্যাতির কথা কোথাও নাই, এমন কি অবদানগ্রন্থে বিন্দুসার চন্দ্রগুপ্তের সন্তান বলিয়াও গৃহীত হয় নাই। এজন্যও বোধ হয়, কেহ কেহ তাঁহাকে অবৈধরূপে উৎপন্ন মনে করিয়া থাকিবেন। অশোকাবদান হইতে জানা যায় যে, অশোকের মাতাকে একসময়ে রাজান্তঃপুরে অনেকেই নাপিতানী বলিয়া জানিত।* অধিক সম্ভব, এই নাপিতানী-অপবাদ থাকাতেই বিন্দুসার সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিলেন। পুরুরাজের নিকট আলেক্‌সান্দারও সেই কথা শুনিয়া থাকিবেন। তবে গ্রীক ঐতিহাসিকের নিকট ঐ ঘটনা কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে। বাস্তবিক ক্ষৌরকর্ম্মকারিণী বিন্দুসার-মহিষীর গর্ভেই অশোকের জন্ম, তাহা আমরা অশোকাবদানেই পাইয়াছি।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রিস্ ডেভিডের মতে চন্দ্রগুপ্ত, অমিত্রঘাত, বিন্দুসার বা প্রিয়দর্শী, এগুলি ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উপাধিমাত্র।† যদি ইহাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বিন্দুসারের চন্দ্রমা বা চান্দ্রমস উপাধি থাকা বিচিত্র নহে। অবদানগ্রন্থে লিখিত আছে, তক্ষশিলায় বিদ্রোহকালে বিন্দুসার-কর্ত্তৃক তথায় (যুবক) অশোক বিসর্জ্জিত হইয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দারের নিকট তক্ষশিলরাজ যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন। তক্ষশিলরাজের পরাভবে তক্ষশিলা-প্রদেশে বিশৃঙ্খলতা বা বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। এই সময় অশোক তক্ষশিলা সুশাসনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ও তজ্জন্য হয় ত তাঁহাকে আলেক্‌সান্দারের বিপক্ষতাচরণ করিতে হইয়াছিল। জাষ্টিনস্ লিখিয়াছেন, 'সান্দ্রোকোত্তাস্ আলেক্‌সান্দারের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হন। নানাস্থান ঘুরিয়া অতিশয় ক্লান্তিবোধে তিনি একস্থানে বসিয়া পড়েন, সেই সময় একটা বৃহদাকার সিংহ লোলজিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও পশুরাজ তাঁহার কোন অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যায়। তদ্দর্শনে উক্ত বীরের হৃদয়ে একটি অস্ফুট আশার সঞ্চার হইল। তিনি সাম্রাজ্যস্থাপনের জন্য অনেক দস্যুদল সংগ্রহ করিলেন। তাহাদের সাহায্যে (সেই যুবক)

* বিশ্বকোষে 'প্রিয়দর্শী'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

† Rhys David's Buddhism. p. 221.

গ্রীক্ সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুনদ-প্রবাহিত প্রদেশ অধিকারের চেষ্টা করেন।'* আলেক্সান্দার, ইউডিমস্ ও তক্ষশিলকে পঞ্জাবশাসনের ভার দিয়া যান। ৩২৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে আলেক্সান্দারের মৃত্যুর পর ইউডিমস্ নিজে স্বাধীন রাজা হইবার চেষ্টায়, তাঁহার সেনাপতি ইউমেনিসের দ্বারা পুরুরাজকে হত্যা করেন।† কাহারও মতে সান্দ্রোকোত্তাস্ও এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইউডিমস্ সেনাপতি ইউমেনিসের সাহায্যার্থ ৩ হাজার পদাতি, ৪ হাজার অশ্বারোহী ও প্রায় ১২০টি হস্তী লইয়া গবিনি-রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। এই অবকাশে 'সান্দ্রোকোত্তাস্' জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া গ্রীকদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত ও পঞ্জাব অধিকার করেন। আলেক্সান্দার ভারতসীমান্তপ্রদেশস্থিত যে জনপদসমূহ প্রিয় সেনানী সিলিউকসের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, সান্দ্রোকোত্তাস্ সে সমস্তও জয় করিয়া লইলেন।‡ ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, 'অল্পদিন পরেই সিলিউকস্ নিকেনর পুনরায় গ্রীক্‌রাজ্য-স্থাপনাশায় সান্দ্রোকোত্তাসের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন। পরে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধের সুবিধা হইবে না ভাবিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন।' মেগেস্থিনিস্ লিখিয়াছেন, 'সিলিউকস্ সান্দ্রোকোত্তাসকে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।' তিনি পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত হইলে সিলিউকসের আদেশে গ্রীক্-দূত মেগেস্থিনিস্ পাটলিপুত্রের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

পাশ্চাত্য গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে, অশোককেই উক্ত-ঘটনাবলীর নেতা বলিয়া মনে হয়। অশোকের প্রথম বয়সের নির্দ্দয়প্রকৃতি, কূটনীতি, দলবলসংগ্রহ, তক্ষশিলায় গমন, তথায় প্রতিপত্তিস্থাপন, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ফাঁকি দিয়া রাজ্যগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিলে, গ্রীকবর্ণিত দস্যুপতি সান্দ্রোকোত্তাসের ছবিই মনে হয়।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন, এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির মূল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার প্রভাব পঞ্জাব হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। সর্ব্বজনপরিচিত চাণক্যের নাম পর্য্যন্তও কোন গ্রীক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন নাই। বিশেষত এই চন্দ্রগুপ্তের সহিত যদি গ্রীকরমণীর বিবাহ হইত এবং ইহার সভায় যদি গ্রীকদূত অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে কি সেই গ্রীকদূত কখন চাণক্যের নাম ছাড়িয়া যাইতেন? এতদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, গ্রীকবর্ণিত, 'সান্দ্রো-কোত্তাস্' ও চাণক্যপালিত 'চন্দ্রগুপ্ত' উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি। আরও দিওদোরাসের পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে ইহাও সমর্থিত হইতেছে যে, আলেক্সান্দারের সময় চান্দ্রমস (Xandrames) নামে এক রাজা পূর্ব্ব-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

* Justinus. XV. 4. † Diodorus. XIX. 5.

‡ Justinus. XV. C. 4.

তৎকালে সান্দ্রোকোত্তাস্-নামক এক যুবক পঞ্চনদপ্রদেশে দস্যুদলসাহায্যে আপনার ভবিষ্য উন্নতির পথ খুঁজিতেছিলেন, সেই যুবককেই বিন্দুসারপুত্র অশোক বলিয়া মনে হয়।

জাষ্টিনস্ লিখিয়াছেন, দৈববশে ঐ যুবক রাজা হইয়াছিলেন। বাস্তবিক অশোকের রাজ্য পাইবার কথা নয়, কারণ তদীয় পিতার মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুসীম বিদ্যমান ছিলেন। দস্যুগণ যেমন নির্ম্মম ও কঠোর ভাবে পরস্বাপহরণ করিয়া থাকে, অশোকও সেইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহারে ভ্রাতৃহত্যা করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোকের অপর নাম প্রিয়দর্শী, কিন্তু এই নামটি যেমন অধিকাংশ বৌদ্ধ, জৈন বা হিন্দুগ্রন্থে না থাকিলেও, অশোকের নামান্তর বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি নাই; তদ্রূপ গ্রীকবর্ণিত 'সান্দ্রোকোত্তাস' বা 'চান্দ্রগুপ্ত'* বা 'চন্দ্রগুপ্ত' নামটি তাঁহার একটি নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিতেই বা আপত্তি কি? ভারতেতিহাসে বহুসংখ্যক চন্দ্রগুপ্ত বাহির হইয়াছে, গ্রীসের ইতিহাসেও অনেকগুলি আলেক্সান্দারের নাম পাওয়া গিয়াছে। পিতামহের নাম চন্দ্রগুপ্ত এবং পৌত্রের নামও চন্দ্রগুপ্ত, গুপ্তবংশের ইতিহাস পাঠ করিলে এবিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।† যখন দেখা যাইতেছে, ভারতের বহুসংখ্যক রাজ-পিতামহ ও তৎপৌত্র একই নামে অভিহিত ছিলেন; তখন গ্রীক ঐতিহাসিকের নিকট প্রিয়দর্শী 'চান্দ্রগুপ্ত' বা 'চন্দ্রগুপ্ত' নামে আখ্যাত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত কোন যবন-(গ্রীক) সম্বন্ধ হইয়াছিল কি না, হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন, কোন গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। গ্রীক বা যবনদিগের সহিত অশোকরাজ যে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—গির্ণার হইতে আবিষ্কৃত রুদ্রদামার শিলালিপি-পাঠে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়,—"মৌর্য্যস্য রাষ্ট্রীয়েণ বৈশ্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতম্, অশোকস্য মৌর্য্যস্য তে (তৎ?) যবনরাজেন তুষাস্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরলঙ্কৃতম্।"‡ অর্থাৎ মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক বৈশ্যজাতীয় পুষ্যগুপ্ত (এই হ্রদ) প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মৌর্য্যরাজ অশোকের প্রসিদ্ধ যবনরাজ তুষাস্প প্রণালী দ্বারা (উক্ত হ্রদ পরে) অলঙ্কৃত করাইয়াছিলেন।

এখানে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক বৈশ্য, কিন্তু অশোকের সহিত যবনরাজ তুষাস্পের কি সম্বন্ধ, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, পূর্ব্বসম্বন্ধ দৃষ্টে যবনরাজকেও অশোকের শ্যালক বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? অশোক যবন-(গ্রীক) দিগের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় উন্নতিমার্গ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে।

তিনি সুদূর গ্রীস্, মিসর প্রভৃতি দেশের

* চন্দ্রগুপ্তের বংশধর বা তৎসম্বন্ধীয় বলিয়া যদি 'চান্দ্রগুপ্ত' নাম হইয়া থাকে, তাহাতেই বা আপত্তি কি? চান্দ্রগুপ্ত-শব্দের উল্লেখও অসাধু নহে। যথা—"চান্দ্রগুপ্তং রথবরমারোঢ়ুমুপচক্রমে।" (পরিশিষ্ট পর্ব্ব ৮।৩২২)

† বিশ্বকোষে 'গুপ্তরাজবংশ' দেখ।

‡ Indian Antiquary. Vol. vii. p. 260.

রাজাদিগের সংবাদ রাখিতেন এবং ধর্ম্ম-প্রচারার্থ তাঁহাদের রাজ্যে লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসনলিপি হইতে ইহা আমরা জানিতে পারি। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, তিনি রাজত্বের ১৩শ বর্ষে যে অনুশাসন প্রচার করেন, তাহাতে অন্তিওক, তুরময়, অন্তিকিনি, মক ও অলিকসুদর, এই পাঁচজন যোন-(গ্রীক) রাজের উল্লেখ আছে। এই পাঁচজন যবননৃপতিই সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক। এই পাঁচজনের প্রকৃত আবির্ভাবকাল স্থির হইলে, অশোকের প্রকৃত কালনির্ণয়ে আর কোন গোল থাকিবে না। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসে উক্ত পঞ্চ যবনরাজের পরিচয় ও কাল এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

অন্তিওক (Antiochus I.)—ইনি সিলিউকসের পুত্র, সিরীয়রাজ ও এসিয়ারাজ বলিয়া গণ্য। ২৯১ খৃঃ পূঃ অব্দে মৃত্যু। রাজ্যকাল ৩১০—২৯১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ।

তুরময় (Ptolemœus Lagus)—টলেমী-ফিলাডেল্‌ফাসের পিতা, ইজিপ্তের রাজা, ২৮৪ খৃঃ পূঃ মৃত্যু। রাজ্যকাল ৩২৩—২৮৪ খৃঃ পূঃ।

অন্তিকিনি (Antigonus)—আলেক্‌সান্দারের প্রসিদ্ধ সেনাপতি, প্রভুর মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পরে পাম্‌ফাইলিয়া, লাইসিয়া প্রভৃতি স্থানের রাজা হন। ৩০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মক (Magus)—কাইরিনের (Cyrene) একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ২৫৭ খৃঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজ্যকাল ৩০৭—২৫৭ খৃঃ পূঃ।

অলিকসুদর (Alexander)—এপিরাসের প্রসিদ্ধ রাজা। মহাবীর আলেক্‌সান্দারের মাতুল ও ওলিম্পিয়ার সহোদর। আলেক্‌সান্দারের মৃত্যুর কিছুকাল পরে রাজা হন।

এখন দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচজন রাজা একত্র কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন। দেখা যাইতেছে যে, উক্ত পাঁচজনের মধ্যে অন্তিকিনি (Antigonus) ৩০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে গতাসু হইয়াছিলেন এবং মক (Magus) ৩০৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজ্যারোহণ করেন; সুতরাং ৩০৭ হইতে ৩০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে আমরা উক্ত পাচজন যবনরাজকেই জীবিত দেখিতে পাই। তাহা হইলে ঐ সময়ে অশোক প্রিয়দর্শীও. রাজত্ব করিতেছিলেন, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইউডিমস্ ও সিলিউকসের অধীন পঞ্জাব ও সীমান্তবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ গ্রীকদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, ইহারই কিছুকাল পরে অশোক পাটলিপুত্রে পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবত প্রায় ৩১৬—৩১৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার সিংহাসনলাভ, ৩১২—৩১১ খৃঃ পূঃ তাঁহার অভিষেক এবং ৩০৩—৩০২ খৃঃ পূঃ পঞ্চযবন নৃপতির নামসংবলিত তাঁহার অনুশাসনলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

* বিশ্বকোষে 'প্রিয়দর্শী' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

মেঘদূত।

অধিক ব্যবহারের অতিপরিচয়ে নূতন জিনিষ পুরাতন হইয়া যায়। ভোগের বাহ্যমূর্ত্তি তরুণ, কিন্তু সে যাহাতে হাত দেয়, তাহা জীর্ণ হইতে থাকে। সে আগুনের মত; যতক্ষণ স্পর্শ না করে ততক্ষণ নিজের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, স্পর্শ করিলে কালো করিয়া দেয়,—ছাই করিয়া ফেলে।

তেমনি আবার ব্যবহারের পরিচয়ে যথার্থ পুরাতনের পুরাতন মূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া যায়। যাহাকে প্রত্যহ ভোগ করিতেছি সে যে বহুযুগের, সে যে আমার ভোগের অতীত, ভোক্তারূপে আমি তাহার চেয়ে যে বড় নহি, সে যে আমাকে ছাড়াইয়া দুর্গম অতীতকালের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেছে, এ কথা আমাদের মনে লয় না।

ইহার কারণ এই, পুরাতনের যে দিক্‌টা আমার নহে, যে দিক্‌টা আমি পাই নাই, যে দিক্‌টা বস্তুত পুরাতন, সে দিক্‌টাকে গণ্যই করি না; যাহা আমার ভোগে আসিয়াছে, তাহাই আমাকে আটক করিয়াছে।

যে অংশ পাইয়াছি, আমাদের পক্ষে তাহাই নিশ্চয়, তাহাই অত্যন্ত বর্ত্তমান; লাভ করিয়া যে তৃপ্তি ও শ্রান্তি, তাহাতেই আমাদিগকে একটা সীমার মধ্যে নিরস্ত করিয়া রাখে; যাহা পাইলাম, তাহা অপেক্ষা আরো কিছু আছে, ইহা মনে করিতে মনের আর উদ্যম থাকে না। ভোগের দ্রব্য শেষ হইতে না হইতে আমাদের ভোগ শেষ হইয়া যায়।

এই জন্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, "ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ।" ভোগের দ্রব্যসকল যে ভুক্ত হইতেছে, তাহা নহে, আমরাই ভুক্ত হইতেছি।

আজ এই কথা বিশেষ করিয়া মনে উদয় হইল, আকাশে আষাঢ়ের ঘন মেঘ দেখিয়া। ভাবিতেছিলাম, প্রৌঢ়ের চক্ষে পৃথিবী পুরাতন হইয়া আসিয়াছে। যৌবনে মনের মধ্যে যখন ভাবের আবেশ ছিল, তখন পৃথিবী নববধূর মত সাজিয়া থাকিত; তখন তাহার ও আমার মধ্যে হৃদয়ে হৃদয়ে স্পর্শ, অথচ একটি আরক্ত অবগুণ্ঠনের অন্তরাল ছিল। এখন ভোগের অবসানে, কাজের সম্পর্কে, প্রগল্‌ভা গৃহিণীর মত পৃথিবী তাহার ঘোমটা ঘুচাইয়া ফেলিয়াছে; মনে হইতেছে তাহাকে আমি বেশ করিয়া জানি, সে আমার সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতির জীর্ণ ভিত্তির দ্বারা বেষ্টিত পৃথিবী। সে আমার অন্তঃপুরের চিরপুরাতন পরিচিতা।

আবার আর এক রকম করিয়া বলা যায়, পৃথিবী যে চিরপুরাতন, সে কথা আর মনে হয় না। পৃথিবী যেন আমারই দ্বারা বদ্ধ। যৌবনে নিজের অন্ত পাই নাই, সংসারেরও অন্ত ছিল না। তখন, আমি কি যে হইব, না হইব, কি করিতে পারি, না পারি, কাজে, ভাবে, অনুভাবে আমার প্রকৃতির দৌড় কতদূর, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয়

নাই, সংসারও অনির্দ্দিষ্ট রহস্যপূর্ণ ছিল। এখন নিজের সম্বন্ধে সকল সম্ভাবনার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি; পৃথিবীও সেই সঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। এখন ইহা আমারি আপিসঘর, বৈঠকখানা, দরদালানের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। সেই ভাবেই পৃথিবী এত বেশি অভ্যস্ত পরিচিত হইয়া গেছে যে, ভুলিয়া গেছি এমন কত আপিসঘর, বৈঠকখানা, দরদালান, ছায়ার মত এই পৃথিবীর উপর দিয়া গেছে, ইহাতে চিহ্নও রাখিতে পারে নাই। কত প্রৌঢ় নিজের মাম্‌লা-মকদ্দমার মন্ত্রগৃহকেই পৃথিবীর ধ্রুব কেন্দ্রস্থল গণ্য করিয়া তাকিয়ার উপর ঠেসান্ দিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের নাম তাহাদের ভস্মের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে উড়িয়া গেছে, সে এখন আর খুঁটিয়া পাইবার জো নাই---তবু পৃথিবী সমান বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে।

কিন্তু আষাঢ়ের মেঘ প্রতিবৎসর যখনি আসে, তখনই তাহার নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা ভুল করি না, কারণ, সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সঙ্কোচের সঙ্গে সে সঙ্কুচিত হয় না। যখন বন্ধুর দ্বারা বঞ্চিত, শত্রুর দ্বারা পীড়িত, দুরদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যে কেবল হৃদয়ের মধ্যে বেদনার চিহ্ন লাগিয়াছে, ললাটের উপর বলি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা নহে, যে পৃথিবী আমার চারিদিকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমার আঘাতের দাগ তাহার উপর পড়িয়াছে। তাহার জলস্থল আমার বেদনায় বিক্ষত, আমার দুশ্চিন্তায় চিহ্নিত। আমার উপর যখন অস্ত্র আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আমার চারিদিকের পৃথিবী সরিয়া দাঁড়ায় নাই, শর আমাকে ভেদ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে। এমনি করিয়া বারংবার আমার সুখদুঃখের ছাপ লাগিয়া পৃথিবীটা আমারই বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গেছে।

মেঘে আমার কোন চিহ্ন নাই। সে পথিক আসে যায়, স্থির থাকে না। আমার জরা তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশা-নৈরাশ্য হইতে সে বহুদূরে।

এই জন্য, কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন, আমরাও সেই মেঘ দেখিতেছি। ইতিমধ্যে পরিবর্ত্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে অবন্তী, সে বিদিশা কোথায়? মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়, বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্নের মত তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

মেঘ দেখিলে "সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ" সুখিলোকেরও আনমনা ভাব হয়, এই জন্য। মেঘ মনুষ্যলোকের কোন ধার ধারে না বলিয়া, মানুষকে অভ্যস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা, চেষ্টা, কাজকর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া, সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তখন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভুশাপে নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহ তখন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ,

সংসারের সম্বন্ধ; মেঘ সংসারের এই সকল প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলাকে ভুলাইয়া দেয়, তখনি হৃদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

মেঘ আপনার নিত্যনূতন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে, গর্জ্জনে, বর্ষণে, চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে,—একটা বহুদূর কালের এবং বহুদূর দেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে,—তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধূ তখন এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জানে জানে মাত্র; সে নিয়ম যে এখনো বলবান্ আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ কথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম, ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী—এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব্ব হইয়া গেছে। আমি তাহাকে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাকে ততটুকু বলিয়াই জানি, আমার ভোগের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব আমি গণ্যই করি না। জীবন শক্ত হইয়া বাঁধিয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের আবশ্যক পৃথিবীটুকুকে টানিয়া আঁটিয়া লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের পৃথিবীর মধ্যে এখন আর কোন রহস্য দেখিতে পাই না বলিয়াই শান্ত হইয়া আছি; নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের পৃথিবীটুকুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছি। এমন সময় পূর্ব্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত-শতাব্দী পূর্ব্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়! সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্য্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন-তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে! তখন, পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড় হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিষের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে। জানিতে পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্পই অধিকার করিতে পারিয়াছি, যাহা বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই।

আমার নিত্যকর্ম্মক্ষেত্রকে নিত্যপরিচিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া সজলমেঘমেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে সমস্ত বিধিবিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয়,—পৃথিবীর এই কয়টা বৎসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়ুর বিশালত্বের মাঝখানে স্থাপন করে; আমাকে রামগিরি আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গিহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জ্জন শিখর, এবং আমার কোন্ এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান অলকাপুরীর মাঝখানে একটি সুবৃহৎ-সুন্দর-পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে;—নদী-কলধ্বনিত, সানুমৎপর্ব্বতবন্ধুর, জম্বুকুঞ্জ-

ছায়ান্ধকার, নববারিসিঞ্চিত-যূথী-সুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবী। হৃদয় সেই পৃথিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্গে শৃঙ্গে নদীর কূলে কূলে ফিরিতে ফিরিতে, অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘবিরহের শেষ মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।

মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোন সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্ব্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।

পূর্ব্বমেঘে বৃহৎ-পৃথিবী আমাদের কল্পনার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আমরা সম্পন্ন গৃহস্থটি হইয়া আরামে সন্তোষে অর্দ্ধনিমীলিতলোচনে যে গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে ঘরছাড়া করিয়া দিল। আমাদের গোয়ালঘর-গোলাবাড়ীর বহুদূরে যে আবর্ত্তচঞ্চলা নর্ম্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নব নীপে বিকশিত, উদয়ন-কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকট যে চৈত্য-বট শুককাকলীতে মুখর, তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্যের চিরসত্যে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

বিরহীর ব্যগ্রতাতেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আষাঢ়ের নীলাভ-মেঘচ্ছায়াবৃত নগ-নদী-নগর-জনপদের উপর দিয়া রহিয়া রহিয়া ভাবাবিষ্ট অলসগমনে যাত্রা করিয়াছেন। যে তাঁহার মুগ্ধনয়নকে অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়াছে, তিনি তাহাকে আর "না" বলিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌন্দর্য্যে মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন। যে চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে, তাহার সুদীর্ঘ পথটিও মনোহর, সে পথকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ষায় অভ্যস্ত পরিচিত সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মন বাহিরের দিকে যাইতে চায়, পূর্ব্বমেঘে কবি আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বেলিত করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন— আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সে পৃথিবী 'অনাঘ্রাতং পুষ্পম্', তাহা আমাদের প্রাত্যহিক ভোগের দ্বারা কিছুমাত্র মলিন হয় নাই, সে পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়ের প্রাচীরদ্বারা কল্পনা কোনখানে বাধা পায় না। যেমন ঐ মেঘ, তেমনি সেই পৃথিবী। আমার এই সুখ-দুঃখ-ক্লান্তি-অবসাদের জীবন তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। প্রৌঢ়বয়সের নিশ্চয়তা বেড়া দিয়া ঘের দিয়া তাহাকে নিজের বাস্তবাগানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল পূর্ব্বমেঘ। নব মেঘের আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারিদিকে একটি পরমনিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া, "জননান্তরসৌহৃদানি" মনে করাইয়া দেয়—অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে কোন

একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।

পূর্ব্বমেঘে বহুবিচিত্রের সহিত সৌন্দর্য্যের পরিচয় এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা, এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।

নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্ম্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্ব্বাসন! প্রভুর অভিশাপেই এখানে আট্‌কা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই পূর্ব্বমেঘের গান এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ।

সকল কবির কাব্যেরই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবার তানের মধ্যে আকাশপাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

যে কবির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে, আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্যশ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি,—পুষ্পিত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্যগহ্বরের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। এই জন্য কোন কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার পূর্ব্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন্ সিংহদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।

কুমারসম্ভব-শকুন্তলা-সম্বন্ধে এই দুটি প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা পরে লিখিবার ইচ্ছা আছে!

হিন্দুত্ব। *

তুরস্ক যে যে জায়গা দখল করিয়াছে, সেখানে রাজশাসন এক কিন্তু আর কোন ঐক্য নাই। সেখানে তুর্কি, গ্রীক্, আর্ম্মাণি, স্লাভ্, কুর্দ্দ, কেহ কাহারো সঙ্গে না মিশিয়া, এমন কি পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কোনমতে একত্রে আছে। যে শক্তিতে এক করে, সেই শক্তিই সভ্যতার জননী—সেই শক্তি তুরস্করাজ্যের রাজলক্ষ্মীর মত হইয়া এখনো আবির্ভূত হয় নাই।

প্রাচীন য়ুরোপে বর্ব্বর জাতেরা রোমের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যটাকে বাটোয়ারা করিয়া লইল। কিন্তু তাহারা আপন আপন রাজ্যের মধ্যে মিশিয়া গেল—কোথাও জোড়ের চিহ্ন রাখিল না। জেতা ও বিজিত ভাষায় ধর্ম্মে সমাজে একাঙ্গ হইয়া এক একটি নেশন্-কলেবর ধরিল। সেই যে মিলনশক্তির উদ্ভব হইল, সেটা নানাপ্রকার বিরোধের আঘাতে শক্ত হইয়া সুনির্দ্দিষ্ট আকার ধরিয়া সুদীর্ঘকালে এক একটি নেশন্‌কে এক একটি সভ্যতার আশ্রয় করিয়া তুলিয়াছে।

যে কোন উপলক্ষ্যে হোক অনেক লোকের চিত্ত এক হইতে পারিলে তাহাতে মহৎ ফল ফলে। যে জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সেই এক হইবার শক্তি স্বভাবতই কাজ করে, তাহাদের মধ্য হইতেই কোন না কোন প্রকার মহত্ত্ব অঙ্গধারণ করিয়া দেখা দেয়, তাহারাই সভ্যতাকে জন্ম দেয়, সভ্যতাকে পোষণ করে। বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ। সভ্য য়ুরোপ জগতে সদ্ভাব বিস্তার করিয়া ঐক্য-সেতু বাঁধিতেছে—বর্ব্বর য়ুরোপ বিচ্ছেদ, বিনাশ, ব্যবধান সৃজন করিতেছে, সম্প্রতি চীনে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীনে কেন, আমরা ভারতবর্ষে য়ুরোপের সভ্যতা ও বর্ব্বরতা উভয়েরই কাজ প্রত্যক্ষ করিতে পাই। সকল সভ্যতার মর্ম্মস্থলে মিলনের উচ্চ আদর্শ বিরাজ করিতেছে বলিয়াই, সেই আদর্শমূলে বিচার করিয়া বর্ব্বরতার বিচ্ছেদ অভিঘাতগুলা দ্বিগুণ বেদনা ও অপমানের সহিত প্রত্যহ অনুভব করিয়া থাকি।

এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে একভাবে সাধিত হয় না। এই জন্য য়ুরোপীয়ের ঐক্য ও হিন্দুর ঐক্য এক প্রকারের নহে। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে কথা বলা যায় না। সে ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পার—কারণ নেশন ও ন্যাশনাল্ কথাটা আমাদের নহে, য়ুরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

* সাহিত্যপ্রসঙ্গে "নেশন কি" তৎসম্বন্ধে রেনাঁর মত অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহার সহিত মিলাইয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে পাঠকদিগকে অনুরোধ করি।—সম্পাদক।

প্রত্যেক জাতি নিজের বিশেষ ঐক্যকেই স্বভাবতঃ সব চেয়ে বড় মনে করে। যাহাতে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে ও বিরাট্ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে সে মর্ম্মে মর্ম্মে বড় বলিয়া চিনিয়াছে, আর কোন আশ্রয়কে সে আশ্রয় বলিয়া অনুভব করে না। এইজন্য য়ুরোপের কাছে ন্যাশনাল্ ঐক্য অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্যই শ্রেষ্ঠ;—আমরাও য়ুরোপীয় গুরুর নিকট হইতে সেই কথা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যাশনাল্ ভাবের অভাবে লজ্জা বোধ করিতেছি।

সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য্য—বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা—হিন্দু তাহার কি করিয়াছে দেখিতে হইবে। এই এক করিবার শক্তি ও কার্য্যকে ন্যাশনাল্ নাম দাও বা যে কোন নাম দাও, তাহাতে কিছু আসে যায় না, মানুষবাঁধা লইয়াই বিষয়।

নানা যুদ্ধবিগ্রহ-রক্তপাতের পর য়ুরোপের সভ্যতা যাহাদিগকে এক নেশনে বাঁধিয়াছে, তাহারা সবর্ণ। ভাষা ও কাপড় এক হইয়া গেলেই, তাহাদের আর কোন প্রভেদ চোখে পড়িবার ছিল না। তাহাদের কে জেতা কে জিত, সে কথা ভুলিয়া যাওয়া কঠিন ছিল না। নেশন গড়িতে যেমন স্মৃতির দরকার, তেমনি বিস্মৃতির দরকার—নেশনকে বিচ্ছেদ-বিরোধের কথা যত শীঘ্র সম্ভব ভুলিতে হইবে। যেখানে দুইপক্ষের চেহারা এক, বর্ণ এক, সেখানে সকলপ্রকার বিচ্ছেদের কথা ভোলা সহজ—সেখানে একত্রে থাকিলে মিলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক যুদ্ধ-বিরোধের পরে হিন্দু-সভ্যতা যাহাদিগকে এক করিয়া লইয়াছিল, তাহারা অসবর্ণ। তাহারা স্বভাবতই এক নহে। তাহাদের সঙ্গে আর্য্যজাতির বিচ্ছেদ শীঘ্র ভুলিবার উপায় ছিল না।

আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ায় কি ঘটিয়াছে? য়ুরোপীয়গণ যখন সেখানে পদার্পণ করিল, তখন তাহারা খৃষ্টান, শত্রুর প্রতি প্রীতি করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে একেবারে উন্মূলিত না করিয়া তাহারা ছাড়ে নাই—তাহাদিগকে পশুর মত হত্যা করিয়াছে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় যে নেশন বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে আদিম অধিবাসীরা মিশিয়া যাইতে পারে নাই।

হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শক-জাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী; দ্রাবিড়ী তৈলঙ্গী, নায়ার,—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দুসভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই—উচ্চ, নীচ, সবর্ণ, অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্ম্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্ত্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।

রেনাঁ দেখাইয়াছেন, নেশনের মূল লক্ষণ কি, তাহা বাহির করা শক্ত। জাতির ঐক্য, ভাষার ঐক্য, ধর্ম্মের ঐক্য, দেশের ভূসংস্থান, এ সকলের উপরে ন্যাশনালত্বের একান্ত নির্ভর নহে। তেমনি হিন্দুত্বের মূল কোথায়, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা শক্ত। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম, নানা-প্রকার বিরুদ্ধ আচার-বিচার হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

পরিধি যত বৃহৎ, তাহার কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়া ততই শক্ত। হিন্দুসমাজের ঐক্যের ক্ষেত্র নিরতিশয় বৃহৎ, সেইজন্য এত বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার মূল আশ্রয়টি বাহির করা সহজ নহে।

উপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুত্বের মূল উপাদান সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিবেন, আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছেন, আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনার সেই সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

এ স্থলে আমাদের প্রশ্ন এই, আমরা প্রধানতঃ কোন্ দিকে মন দিব? ঐক্যের কোন্ আদর্শকে প্রাধান্য দিব?

রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ, মিলন যত প্রকারে হয় ততই ভাল। কন্‌গ্রেসের সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা অনুভব করিয়াছেন যে, সমস্তই যদি ব্যর্থ হয়, তথাপি মিলনই কন্‌গ্রেসের চরম ফল। এই মিলনকে যদি রক্ষা করিয়া চলি, তবে মিলনের উপলক্ষ্য বিফল হইলেও, ইহা নিজেকে কোন না কোন দিকে সার্থক করিবেই—দেশের পক্ষে কোন্‌টা মুখ্য ব্যাপার, তাহা আবিষ্কার করিবেই—যাহা বৃথা এবং ক্ষণিক, তাহা আপনি পরিহার করিবে।

কিন্তু এ কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সঙ্কটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগস্বীকার করিতেছি, বহুদুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাতটাকা বেতনের তিনটাকা পেটে খাইয়া চারটাকা বাড়ী পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোটভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড় বলিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্ম্মের মন্ত্র কাণে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্ব্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিবেন, সমাজ ত আছেই,

সে ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষ গড়িয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিছুই করিবার নাই।

এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। এইখানেই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা বর্ত্তমান হিন্দুসভ্যতাকে জিতিয়াছে।

য়ুরোপের নেশন একটি সজীব সত্তা। অতীতের সহিত নেশনের বর্ত্তমানের যে কেবল জড় সম্বন্ধ, তাহা নহে—পূর্ব্বপুরুষ প্রাণপাত করিয়া কাজ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান পুরুষ চোখ বুজিয়া ফল ভোগ করিতেছে তাহা নহে। অতীত-বর্ত্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে—অখণ্ড কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। এক অংশ প্রবাহিত, আর এক অংশ বদ্ধ, এক অংশ প্রজ্বলিত, অপরাংশ নির্ব্বাপিত, এরূপ নহে। সে হইলে ত সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইয়া গেল—জীবনের সহিত মৃত্যুর কি সম্পর্ক?

কেবলমাত্র অলসভক্তিতে যোগসাধন করে না—বরং তাহাতে দূরে লইয়া যায়। ইংরাজ যাহা পরে, যাহা খায়, যাহা বলে, যাহা করে, সবই ভাল, এই ভক্তিতে আমাদিগকে অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করে—তাহাতে আসল ইংরাজত্ব হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়। কারণ, ইংরাজ এরূপ নিরুদ্যম অনুকরণকারী নহে। ইংরাজ স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার জোরেই বড় হইয়াছে—পরের-গড়া জিনিষ অলসভাবে ভোগ করিয়া তাহারা ইংরাজ হইয়া উঠে নাই। সুতরাং ইংরাজ সাজিতে গেলেই প্রকৃত ইংরাজত্ব আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইবে।

তেমনি আমাদের পিতামহেরা যে বড় হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপরে নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল, সেইজন্যই তাঁহারা বড় হইতে পারিয়াছেন। আমাদের চিত্ত যদি তাঁহাদের সেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়, কেবল তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের সহিত আমাদের জড়সম্বন্ধ থাকে, তবে আমাদের আর ঐক্য নাই। পিতামাতার সহিত পুত্রের জীবনের যোগ আছে—তাহাদের মৃত্যু হইলেও জীবনক্রিয়া পুত্রের দেহে একই রকমে কাজ করে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মানসী শক্তি যে ভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের মনে যদি তাহার কোন নিদর্শন না পাই—আমরা যদি কেবল তাঁহাদের অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে বুঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর সজীব নাই। শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য্য। আমরা একটা বড়রকমের যাত্রার দল—গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজসরঞ্জামে পূর্ব্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।

পূর্ব্বপুরুষদের সেই চিত্তকে আমাদের জড় সমাজের উপর জাগাইয়া তুলিলে, তবেই আমরা বড় হইব। আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ-স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া উঠে—নিজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া আপনাকে

সবল ও সচল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়।

জীবনের পরিবর্ত্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্ত্তন বিকার। আমাদের সমাজেও দ্রুতবেগে পরিবর্ত্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া, সে পরিবর্ত্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে—কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

সজীব পদার্থ সচেষ্টভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া আনে—আর নির্জ্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে চেতনার কার্য্য নাই, তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্যচেষ্টা নাই—বাহির হইতে পরিবর্ত্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।

নূতন অবস্থা, নূতন শিক্ষা, নূতন জাতির সহিত সংঘর্ষ—ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি এমন ভাবে চলিতে ইচ্ছা করি, যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বসিয়া আছি, তবে সেই তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বকার অবস্থা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের বন্যা আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা বর্ত্তমানকে স্বীকারমাত্র না করিয়া পূর্ব্বপুরুষের দোহাই মানিলেও পূর্ব্বপুরুষ সাড়া দিবেন না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আমাদের দোহাই পাড়িয়া বলিতেছেন, বর্ত্তমানের সহিত সন্ধি করিয়া আমাদের কীর্ত্তিকে রক্ষা কর, তাহার প্রতি অন্ধ হইয়া ইহাকে সমূলে ধ্বংস হইতে দিয়ো না। আমাদের ভাবসূত্রটিকে রক্ষা করিয়া সচেতনভাবে এক কালের সহিত আর এক কালকে মিলাইয়া লও, নহিলে সূত্র আপনি ছিন্ন হইয়া যাইবে।

কি করিতে হইবে? নেশনের প্রত্যেকে ন্যাশন্যাল্ স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। যে সময় হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত সমাজকলেবরের স্বার্থকেই নিজের একমাত্র স্বার্থ জ্ঞান করিত। রাজা সমাজেরই অঙ্গ ছিলেন, সমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর—ব্রাহ্মণ, সমাজের মধ্যে সমাজধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই সমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, ভাবে, কর্ম্মে, সমুন্নত রাখিবার জন্য সমাজের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রদিকে সচেষ্টভাবে কাজ করিত। তখনকার নিয়ম তখনকার অনুষ্ঠান তখনকার কালের হিসাবে নিরর্থক ছিল না।

এখন সেই নিয়ম আছে, সেই চেতনা নাই। সমস্ত সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচেষ্টতা নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সেই নিয়ত-

জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্ব্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধন-সম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল,—ইহাকে বাণিজ্য-হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্ম্মযোগ, এই কথা নিয়তস্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্র-স্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা ইহাই হিন্দুত্ব। ইহাতে পশু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই প্রতি কল্যাণভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং নিয়ত অভ্যাসে স্বার্থপরিহার করা নিশ্বাসত্যাগের ন্যায় সহজ হইয়া আসে। সমাজের নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড় চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যসূত্রেই হিন্দু-সম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্ত্ত-মানের সহিত অতীতের ধর্ম্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্বলাভের এই একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রনীতিক চেষ্টায় যে কোন ফল নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের সামাজিক ঐক্যসাধনে কিয়দ্দূর সহায়তা করিতে পারে, এই তাহার প্রধান গৌরব। অসামান্যপ্রতিভাশালী দূরদর্শী রানাড়ে কন্‌গ্রেস্‌মিলনকে সার্থক করিবার জন্যই তাহার সহিত সামাজিক আলোচনাসভা যোগ করিয়াছিলেন; সেজন্য তাঁহাকে বিরোধ ও উপহাস সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মাহাত্ম্যকে জনসাধারণের সম্মুখে উজ্জ্বল করিবার নিমিত্তই ঈশ্বর মহৎ লোকদের জন্য পদে পদে অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন প্রস্তুত করিয়া দেন।

—:০:—

বাদল-গাথা।

বিরামবিহীন ঝরে বারিধারা;
দ্যুলোক ভূলোক মদে মাতোয়ারা।
মোর চারিপাশ শুধু হা-হুতাশ;
আর কারো নাই দেখা।—
আমি একা, আমি একা!

ডমরু বাজায়ে নাচে মেঘদল,
চঞ্চলা চপলা হাসে খলখল;
নীলিমার গায় বাদল-গাথায়
ফুটে রোমাঞ্চের রেখা।—
আমি একা, আমি একা!

গুমরি গুমরি বেড়ায় বাতাস,
এই ঢুলে' পড়ে, এই ক্যালে শ্বাস ;
রুদ্ধ ঘরে ঘরে দিবা দ্বিপ্রহরে
প্রেমপত্র হয় লেখা।—
আমি একা, আমি একা!

ডাহুক ডাহুকী লাগি' পাথে পাথে
কি মধু-ব্যথায় মুহু মুহু ডাকে ;
ময়ূরীর কাছে কি আজি রে যাচে
উতলা শিখীর কেকা ?—
আমি একা, আমি একা!

ঘন—ঘনতর নামে বারিধারা ;
সারা বিশ্ব আজ কেঁদে হ'ল সারা।
সাধিয়া কাঁদিয়া ফিরে এল হিয়া,
কেহ ত দিল না দেখা।—
আমি একা, আমি একা!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন।

প্রথম সিদ্ধান্ত।

(নিউটনের)

চলমান বস্তু চলিতে চলিতে যদি পথি-মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তবে সে বস্তু বাহিরের শক্তিকর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়াই স্থির হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

(নিউটনের)

যে বস্তু যে স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, সে বস্তু যদি সে স্থান হইতে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করে, তবে বাহিরের শক্তিকর্তৃক চালিত হইয়া চলিতে আরম্ভ করে।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

(লেখকের)

চলমান বস্তু যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায়।

প্রমাণ।

এরূপ যদি হয় যে, ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু চ-স্থানে উপস্থিত হইয়াছে; তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু চ-স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা যদি স্বীকার না কর ; যদি বল যে, ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু চ-স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা

সত্য হইলেও, ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু চ-স্থানে স্থির হইয়া না দাঁড়াইতেও পারে, তবে তোমার সে কথা আপনাকে আপনি খণ্ডন করিবে; যথা—

তুমি বলিতেছ—

ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু চ-স্থানে উপস্থিত হইয়াছে,.........(স) কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই।

ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু চ-স্থানে উপস্থিত হইয়াও যখন সে মুহূর্ত্তে (ম-মুহূর্ত্তে) সে স্থানে (চ-স্থানে) স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু চ-স্থান হইতে বিচালিত হইয়াছে; অর্থাৎ চ-স্থান হইতে সরিয়া স্থানান্তরে উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং

ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু চ স্থানে উপস্থিত নাই ....(ক্ষ)

গোড়ায় বলিয়াছ, ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু চ-স্থানে উপস্থিত, তার সাক্ষী (স)।

এখন বলিতেছ, ম-মুহূর্ত্তে ক-বস্তু চ-স্থানে অনুপস্থিত, তার সাক্ষী (ক্ষ)।

অতএব তোমার কথার আদি-অন্ত জোড়া দিয়া এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, একই অভিন্ন মুহূর্ত্তে (ম-মুহূর্ত্তে) ক-বস্তু চ-স্থানে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত—যাহা একান্ত পক্ষেই অসম্ভব।

অতএব প্রতিপক্ষের কথা খণ্ডিত হইয়া গিয়া স্বপক্ষের এই কথাই বলবৎ রহিল যে, চলমান বস্তু যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে উপস্থিত হয়, সে মুহূর্ত্তে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায়।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

চলমান বস্তুমাত্রই দুই দুই মুহূর্ত্তে পর্য্যায়ক্রমে প্রতিরুদ্ধ এবং চালিত হয়;—দুইই হয় বাহিরের শক্তি দ্বারা।

প্রমাণ।

প্রথমত তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে পাওয়া যাইতেছে যে, চলমান বস্তু যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে উপস্থিত হয়, সে মুহূর্ত্তে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত চলমান বস্তু দুই মুহূর্ত্ত কোনো-একটি স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না—ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

অতএব এটা স্থির যে, চলমান বস্তু যে মুহূর্ত্তে যেখানে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে সেখানে স্থির হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার পর-মুহূর্ত্তে সেখান হইতে স্থানান্তরে প্রধাবিত হয়।

অতএব এখানকার প্রথম এবং দ্বিতীয় (নিউটনের) সিদ্ধান্ত অনুসারে দাঁড়াইতেছে যে, চলমান বস্তু যে মুহূর্ত্তে যেখানে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে সেখানে বাহিরের শক্তিদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার পরমুহূর্ত্তে বাহিরের শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া স্থানান্তরে প্রধাবিত হয়।

তবেই হইতেছে যে, চলমান বস্তুমাত্রই দুই দুই মুহূর্ত্তে পর্য্যায়ক্রমে (অর্থাৎ পালা-ক্রমে, alternately) প্রতিরুদ্ধ এবং চালিত হয়।

মন্তব্য।

নিউটনের একটি সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, চলমান বস্তু প্রতিরুদ্ধ না হইয়া থামিতে-পারে না এবং স্থির বস্তু চালিত না হইয়া চলিতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত হইতে এখানে একটি নূতন সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির করা হইতেছে এই যে, চলমান বস্তু দুই দুই মুহূর্ত্তে পর্য্যায়ক্রমে প্রতিরুদ্ধ এবং চালিত হয়। এরূপ হইতে পারে না যে, নিউটনের সিদ্ধান্ত সত্য-সিদ্ধান্ত—এখানকার নূতন সিদ্ধান্ত মিথ্যা-সিদ্ধান্ত; কেন না, এখানকার নূতন সিদ্ধান্তটি যে, নিউটনের সিদ্ধান্তের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহার অকাট্য প্রমাণ উপরে বিধিমতে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব যদি সত্য হয়, তবে উভয় সিদ্ধান্তই সত্য; যদি মিথ্যা হয়, তবে উভয় সিদ্ধান্তই মিথ্যা। নিউটনের আবিষ্কৃত আনুকেন্দ্রিক এবং আতিকেন্দ্রিক (centripetal এবং centrifugal) শক্তির সহিত এখানকার প্রতিরোধক-শক্তি এবং চালক-শক্তির সৌসাদৃশ্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়; তাহা এই:—

মনে কর একগাছি দড়ির এক প্রান্তে একখণ্ড সীসা বাঁধিয়া উহার দ্বিতীয় প্রান্ত ধরিয়া সীসাটাকে দ্রুতগতি ঘুরানো যাইতেছে। এরূপ স্থলে, চালক-শক্তির প্রভাবে সীসাটা ঘূর্ণায়কের হস্ত হইতে দূরে প্রধাবিত হইয়া দড়িটাকে বাহিরের দিকে টানিতেছে, এবং ঘূর্ণায়কের হস্তের রোধক-শক্তি দড়িটাকে উঁহার বিপরীত দিকে টানিতেছে। আমার এইরূপ মনে হয় যে, দড়িটা দুই দুই মুহূর্ত্তে পর্য্যায়ক্রমে প্রসারিত এবং প্রতিরুদ্ধ হয়। এরূপ মনে হইবার বিশেষ একটি কারণ আছে, তাহা এই:—

সীসাটাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে দড়িটা যদি কোনো মুহূর্ত্তে বেশীমাত্রা প্রসারিত হইয়া হস্ত হইতে উড়িয়া পলাইবার উপক্রম করে, তবে তাহার অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তে ঘূর্ণায়ক দড়িটার ধৃতস্থান বেশীমাত্রা বলের সহিত আঁটিয়া ধরে। দড়ি বেশী-মাত্রা প্রসারিত হইলে, পরে ঘূর্ণায়ক বেশী মাত্রা বলের সহিত ধৃতস্থান আঁটিয়া ধরে। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, ওরূপ স্থলে চালকশক্তি এবং রোধক-শক্তি পূর্ব্বাপর দুই মুহূর্ত্তে পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য করে। এখানে চালক-শক্তি আতিকেন্দ্রিক (centrifugal)—অর্থাৎ কেন্দ্রের বন্ধন অতিক্রম করিয়া সীসাটাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে, এবং রোধক-শক্তি আনুকেন্দ্রিক centripetal—অর্থাৎ সীসাটাকে কেন্দ্রের দিকে টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ফলকথা এই যে, কবিতার ছন্দে যেমন লঘু-গুরু মাত্রা পর্য্যায়-ক্রমে সন্নিবেশিত হয়, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র রোধক-চালক, আনুকেন্দ্রিক-আতি-কেন্দ্রিক, রাত্রি-দিবা, কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ণ প্রভৃতি যুগলগণ পর্য্যায়-ক্রমে তরঙ্গিত হইতেছে—এই সহজ সত্যটি অযাচিতভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিনিয়ত উপস্থিত হয় বলিয়া আমরা হেলা করিয়া তাহা দেখিয়াও দেখি না। কথায় বলে—"গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

নেশন কি ?

(রেনাঁর মত।)

"নেশন্ ব্যাপারটা কি—" সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভাবুক রেনাঁ এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমে দুই একটা শব্দার্থ স্থির করিয়া লইতে হইবে।

স্বীকার করিতে হইবে, বাঙলায় 'নেশন'-কথার প্রতিশব্দ নাই। চলিত-ভাষায় সাধারণতঃ জাতি বলিতে বর্ণ বুঝায়; এবং জাতি বলিতে ইংরাজিতে যাহাকে race বলে, তাহাও বুঝাইয়া থাকে। আমরা 'জাতি'-শব্দ ইংরাজি 'রেস্'-শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব,—এবং নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন্ ও ন্যাশানাল্ শব্দ বাঙলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ান যায়।

'ন্যাশনাল্ কন্‌গ্রেস্' শব্দের তর্জ্জমা করিতে আমরা 'জাতীয় মহাসভা' ব্যবহার করিয়া থাকি—কিন্তু জাতীয় বলিলে বাঙালী-জাতীয়, মারাঠী-জাতীয়, শিখ-জাতীয়, যে কোন জাতীয় বুঝাইতে পারে—ভারতবর্ষের সর্ব্বজাতীয় বুঝায় না। মান্দ্রাজ ও বম্বাই, 'ন্যাশনাল'-শব্দের অনুবাদচেষ্টায় জাতিশব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা স্থানীয় ন্যাশনাল্ সভাকে মহাজনসভা ও সার্ব্বজনিকসভা নাম দিয়াছেন—বাঙালী কোনপ্রকার চেষ্টা না করিয়া 'ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন্' নাম দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে মারাঠী প্রভৃতি জাতির সহিত বাঙালীর যেন একটা প্রভেদ লক্ষিত হয়—সেই প্রভেদে বাঙালীর আন্তরিক ন্যাশনালত্বের দুর্ব্বলতাই প্রমাণ করে।

'মহাজন' শব্দ বাঙলায় একমাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্য অর্থে চলিবে না। 'সার্ব্বজনিক'শব্দকে বিশেষ্য আকারে নেশন্ শব্দের প্রতিশব্দ করা যায় না। 'ফরাসী সর্ব্বজন' শব্দ 'ফরাসী নেশন্' শব্দের পরিবর্ত্তে সঙ্গত শুনিতে হয় না।

'মহাজন' শব্দ ত্যাগ করিয়া 'মহাজাতি' শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'মহৎ' শব্দ মহত্ত্বসূচক বিশেষণরূপে অনেকস্থলেই নেশনশব্দের পূর্ব্বে আবশ্যক হইতে পারে। সেরূপ স্থলে 'গ্রেট্ নেশন্' বলিতে গেলে 'মহতী মহাজাতি' বলিতে হয় এবং তাহার বিপরীত বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে 'ক্ষুদ্র মহাজাতি' বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু নেশন্-শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরাজের কাছ হইতে পাইয়াছি, ভাষাটাও ইংরাজি

রাখিয়া ঋণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের ব্রহ্ম, শঙ্করের মায়া ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ শব্দ ইংরাজিরচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না, এবং না হওয়াই উচিত।

রেনাঁ বলেন, প্রাচীনকালে 'নেশন্' ছিল না। ইজিপ্ট, চীন, প্রাচীন কাল্‌ডিয়া, 'নেশন্' জানিত না। আসিরিয়, পারসিক ও আলেক্‌জাণ্ডারের সাম্রাজ্যকে কোন নেশনের সাম্রাজ্য বলা যায় না।

রোমসাম্রাজ্য নেশনের কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নেশন্ বাঁধিতে না বাঁধিতে বর্ব্বরজাতির অভিঘাতে তাহা ভাঙিয়া টুকরা হইয়া গেল। এই সকল টুক্‌রা বহুশতাব্দী ধরিয়া নানাপ্রকার সংঘাতে ক্রমে দানা বাঁধিয়া নেশন্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ফ্রান্স্, ইংলণ্ড্, জর্ম্মাণি ও রাশিয়া সকল নেশনের শীর্ষস্থানে মাথা তুলিয়াছে।

কিন্তু ইহারা নেশন্ কেন? সুইজর্‌লাণ্ড্ তাহার বিবিধ জাতি ও ভাষাকে লইয়া কেন নেশন্ হইল, অষ্ট্রীয়া কেন কেবলমাত্র রাজ্য হইল, 'নেশন্' হইল না?

কোন কোন রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ বলেন, নেশনের মূল রাজা। কোন বিজয়ী বীর প্রাচীনকালে লড়াই করিয়া দেশ জয় করেন, এবং দেশের লোক কালক্রমে তাহা ভুলিয়া যায়; সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন্ পাকাইয়া তোলে। ইংলণ্ড্, স্কট্‌লণ্ড্, আয়র্লণ্ড্ পূর্ব্বে এক ছিল না, তাহাদের এক হইবার কারণও ছিল না, রাজার প্রতাপে ক্রমে তাহারা এক হইয়া আসিয়াছে। নেশন্ হইতে ইটালির এত বিলম্ব করিবার কারণ এই যে, তাহার বিস্তর ছোট ছোট রাজার মধ্যে কেহ একজন মধ্যবর্ত্তী হইয়া সমস্ত দেশে ঐক্যবিস্তার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ নিয়ম সকল জায়গায় খাটে নাই। যে সুইজর্‌লাণ্ড্ ও আমেরিকার য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ ক্রমে ক্রমে সংযোগ-সাধন করিতে করিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা ত রাজবংশের সাহায্য পায় নাই।

রাজশক্তি নাই নেশন্ আছে, রাজশক্তি ধ্বংস হইয়া গেছে নেশন্ টিকিয়া আছে, এ দৃষ্টান্ত কাহারো অগোচর নাই। রাজার অধিকার সকল অধিকারের উচ্চে, এ কথা এখন আর প্রচলিত নহে; এখন স্থির হইয়াছে, ন্যাশনাল্ অধিকার রাজকীয় অধিকারের উপরে। এই ন্যাশনাল্ অধিকারের ভিত্তি কি, কোন্ লক্ষণের দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে?

অনেকে বলেন, জাতির অর্থাৎ race-এর ঐক্যই তাহার লক্ষণ। রাজা, উপরাজ ও রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অধ্রুব,—জাতি চিরদিন থাকিয়া যায়, তাহারই অধিকার খাঁটি।

কিন্তু জাতিমিশ্রণ হয় নাই য়ুরোপে এমন দেশ নাই। ইংলণ্ড্, ফ্রান্স্, জর্ম্মাণি, ইটালি, কোথাও বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ কথা সকলেই জানেন। কে টিউটন্, কে কেল্ট্, এখন তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতন্ত্রে জাতি-বিশুদ্ধির কোন খোঁজ রাখে না।

রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে জাতি এক ছিল, তাহারা ভিন্ন হইয়াছে, যাহারা ভিন্ন ছিল, তাহারা এক হইয়াছে।

ভাষাসম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। ভাষার ঐক্যে ন্যাশনাল্ ঐক্যবন্ধনের সহায়তা করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে এক করিবেই, এমন কোন জবরদস্তি নাই। য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ও ইংলণ্ডের ভাষা এক, স্পেন ও স্পানীয় আমেরিকার ভাষা এক, কিন্তু তাহারা এক নেশন্ নহে। অপর পক্ষে সুইজর্ল্যাণ্ডে তিনটা চারিটা ভাষা আছে, তবু সেখানে এক নেশন্। ভাষা অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি বড়;—ভাষাবৈচিত্র্য-সত্বেও সমস্ত সুইজর্ল্যাণ্ডের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এক করিয়াছে।

তাহা ছাড়া, ভাষায় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথাও ঠিক নয়। প্রসিয়া আজ জর্ম্মণ বলে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে স্লাভোনিক্ বলিত, ওয়েল্স্ ইংরাজি ব্যবহার করে, ইজিপ্ট আরবী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

নেশন্ ধর্ম্মমতের ঐক্যও মানে না। ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক্, প্রটেষ্টাণ্ট্, য়িহুদী অথবা নাস্তিক, যাহাই হউক না কেন, তাহার ইংরাজ, ফরাসী বা জর্ম্মণ হইবার কোন বাধা নাই।

বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন দৃঢ়বন্ধন, সন্দেহ নাই। কিন্তু রেনাঁর মতে সে বন্ধন নেশন্ বাঁধিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈষয়িক স্বার্থে মহাজনের পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে পারে বটে; কিন্তু ন্যাশনালত্বের মধ্যে একটা ভাবের স্থান আছে—তাহার যেমন দেহ আছে, তেমনি অন্তঃকরণেরও অভাব নাই। মহাজন-পটিকে ঠিক মাতৃভূমি কেহ মনে করে না।

ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমা-বিভাগ নেশনের ভিন্নতাসাধনের একটা প্রধান হেতু, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নদীস্রোতে জাতিকে বহন করিয়া লইয়া গেছে, পর্ব্বতে তাহাকে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ ম্যাপে আঁকিয়া দেখাইয়া দিতে পারে, ঠিক কোন্ পর্য্যন্ত কোন্ নেশনের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। মানবের ইতিহাসে প্রাকৃতিক সীমাই চূড়ান্ত নহে। ভূখণ্ডে, জাতিতে, ভাষায়, নেশন্ গঠন করে না। ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সুগভীর-ঐতিহাসিক-মন্থনজাত 'নেশন্' একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে।

দেখা গেল, জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্ম্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান, নেশন-নামক মানসপদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কি?

নেশন একটি সজীব-সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিব এই পদার্থের অন্তঃ-প্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিব বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে

অবস্থিত, আর একটি বর্ত্তমানে। একটি হইতেছে—সর্ব্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি-সম্পদ্; আর একটি, পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা,—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিতমত নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীত-কালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের দ্বারা পূর্ব্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য্য, মহত্ত্ব, কীর্ত্তি, ইহার উপরেই ন্যাশ-ন্যাল্ ভাবের মূলপত্তন। অতীতকালে সর্ব্বসাধারণের এক গৌরব, এবং বর্ত্তমান-কালে সর্ব্বসাধারণের এক ইচ্ছা; পূর্ব্বে, একত্রে বড় কাজ করা, এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সঙ্কল্প; ইহাই জনসম্প্রদায়গঠনের ঐকান্তিক মূল। আমরা যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি এবং যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আমাদের ভালবাসা সেই পরিমাণে প্রবল হইবে। আমরা যে বাড়ী নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব, সে বাড়ীকে আমরা ভালবাসি। প্রাচীন স্পার্টার গানে আছে—"তোমরা যাহা ছিলে, আমরা তাহাই; তোমরা যাহা, আমরা তাহাই হইব।"—এই অতি সরল কথাটি সর্ব্বদেশের ন্যাশন্যাল্-গাথাস্বরূপ।

অতীতের গৌরবময়-স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ; একত্রে দুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা; এইগুলিই আসল জিনিষ, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্যসত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়—একত্রে মাশুলখানা-স্থাপন বা সীমান্ত-নির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশি। একত্রে দুঃখ পাওয়ার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর।

অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্ব্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জন-সাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, তাহাই নেশন্। ইহার পশ্চাতে একটি অতীত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে—সাধারণ সম্মতি,—সকলে মিলিয়া একত্রে একজীবন বহন করিবার সুস্পষ্টপরিব্যক্ত ইচ্ছা।

রেনাঁ বলিতেছেন, আমরা রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে রাজার অধিকার ও ধর্ম্মের আধিপত্য নির্ব্বাসিত করিয়াছি, এখন বাকি কি রহিল? মানুষ, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের প্রয়োজন-সকল। অনেকে বলিবেন, ইচ্ছা-জিনিষটা পরিবর্ত্তনশীল, অনেক সময় তাহা অনিয়-ন্ত্রিত, অশিক্ষিত,—তাহার হস্তে নেশনের ন্যাশনালিটির মত প্রাচীন মহৎসম্পদ্ রক্ষার ভার দিলে, ক্রমে যে সমস্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

মানুষের ইচ্ছার পরিবর্ত্তন আছে—কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু আছে, যাহার পরি-বর্ত্তন নাই? নেশন্‌রা অমর নহে। তাহাদের আদি ছিল, তাহাদের অন্তও ঘটিবে। হয় ত

এই নেশন্‌দের পরিবর্ত্তে কালে এক য়ুরোপীয় সম্প্রদায় সংঘটিত হইতেও পারে। কিন্তু এখনো তাহার লক্ষণ দেখি না। এখনকার পক্ষে এই নেশন্‌সকলের ভিন্নতাই ভাল, তাহাই আবশ্যক। তাহারাই সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে—এক আইন, এক প্রভু হইলে, স্বাধীনতার পক্ষে সঙ্কট।

বৈচিত্র্য এবং অনেকসময় বিরোধিপ্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন্‌ সভ্যতাবিস্তারকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসঙ্গীতে প্রত্যেকে এক একটি স্বর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত।

যাহাই হউক, রেনাঁ বলেন, মানুষ, জাতির, ভাষার, ধর্ম্মমতের বা নদীপর্ব্বতের দাস নহে। অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসঙ্ঘ যে একটি সচেতন চারিত্র সৃজন করে, তাহাই নেশন্‌। সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগস্বীকারের দ্বারা এই চারিত্র-চিত্ত যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে, ততক্ষণ তাহাকে সাঁচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

রেনাঁর উক্তি শেষ করিলাম। এক্ষণে রেনাঁর এই সারগর্ভ বাক্যগুলি আমাদের দেশের প্রতি প্রয়োগ করিয়া আলোচনার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক্‌।

আলোচনা।

['আবহ'-শব্দ সম্বন্ধে]

গত আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে লিখিত হইয়াছে, "যোগেশবাবু 'আবহ'শব্দ কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ ভূবায়ু। কিন্তু এই ভূবায়ু বলিতে প্রাচীনেরা কি বুঝিতেন, এবং তাহা আধুনিক অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার শব্দের প্রতিশব্দ কি না, তাহা বিশেষরূপ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে—এক কথায় ইহার মীমাংসা হয় না। অগ্রে সেই প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।"

যে সমালোচনায় আমি 'আবহ'-শব্দ ব্যবহার করি, তাহাতে ঐ শব্দের অর্থ ও পারিভাষিকত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করিবার অবসর ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ঐ শব্দ দিয়াছিলাম। তর্কের প্রয়োজন হইলে সেই পত্রিকাই

উপযুক্ত ছিল। তদ্ভিন্ন, গ্রন্থান্তরে 'আবহ'-সম্বন্ধে সবিস্তরে আলোচনা করা গিয়াছে। সেই গ্রন্থ পাঠকসমীপে সম্প্রতি উপস্থিত করিতে পারিতেছি না। এই সকল কারণে, বিশেষত বঙ্গদর্শনকে 'আবহ'-শব্দবিষয়ে সন্দিহান দেখিয়া, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

আমাদের পৌরাণিকেরা সপ্তবায়ুর কথা বলিতেন। ইহাদের নাম আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ, পরাবহ। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এই সকল নাম সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু সকল পুরাণে ও সিদ্ধান্তে, 'আবহ' ও 'প্রবহ' নামে প্রভেদ নাই, পৌরাণিক মতে এই সপ্ত পবন পৃথিবী হইতে উপরি উপরি গ্রহনক্ষত্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। যথা, বায়ুপুরাণে—

পৃথিব্যাং প্রথমস্কন্ধো দ্বিতীয়শ্চৈব ভাস্করে।
সোমে তৃতীয়ো বিজ্ঞেয়শ্চতুর্থো জ্যোতিষাং গণে॥
গ্রহেষু পঞ্চমশ্চৈব ষষ্ঠঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলে।
ধ্রুবে তু সপ্তমশ্চৈব বাতস্কন্ধঃ পরস্তু সঃ॥

ইত্যাদি।

পুরাণমতে পৃথিবীর পর সূর্য্য, তার পর চন্দ্র, তার পর নক্ষত্রসমূহ, তার পর বুধ-শুক্র-কুজ-গুরু-শনি, তার পর সপ্তর্ষিমণ্ডল, এবং সকলের উপরে ধ্রুব অবস্থিত। তদনুসারে বায়ু ও কূর্ম্ম পুরাণ বলেন, ভূ হইতে মেঘমণ্ডল পর্য্যন্ত আবহবায়ু, মেঘমণ্ডল হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রবহ, তার পর চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত উদ্বহ, ইত্যাদি। সিদ্ধান্তিরা এই সপ্তবায়ুর মধ্যে আবহ ও প্রবহ এই দুইটি-মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে গ্রহনক্ষত্রের দৈনন্দিনগতির কারণস্বরূপ প্রবহবায়ুর কল্পনা হইয়াছিল। এই কল্পনার আদি পুরাণে ছিল। সেখানে উহা একটা Physical theory ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তে উহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া একটা mathematical theory স্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল। শকুন্তলায় কালিদাস ইহারই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রবহবিষয়ে অধিক লেখা সম্প্রতি অনাবশ্যক।

'আবহ' যে পৃথিবীর বায়ু,—ভূবায়ু, তৎসম্বন্ধে পুরাণ ও সিদ্ধান্ত একমত। যথা, বায়ুপুরাণে —

পৃথিব্যাং প্রথমস্কন্ধঃ অমেধ্যেভ্যো য আবহঃ।

ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তে লল্ল (শক ৫০০ ?)—

কুমরুদাবহঃ

ভাস্কর (শক ১০৭২)—

ভূবায়ুরাবহ ইহ

তবে, ভূবায়ুর নাম আবহ। কু-মরুৎ, কু-বায়ু প্রভৃতি শব্দও আছে। বলা বাহুল্য, কু অর্থে পৃথিবী ; যেমন, 'কুদিন'।

এই ভূবায়ু বা আবহের নিসর্গ কি ? শ্রীপতি (শক ৯৬১) বলেন,—

নির্ঘাতোল্কাঘনসুরধনুর্বিদ্যুদন্তঃ কুবায়োঃ
সংদৃশ্যন্তে খনগরপরীবেষপূর্ব্বং তথান্তৎ।

ভাস্করও বলেন,—

অত্রাম্বুদবিদ্যুদাদ্যম্

তবে, 'আবহ' ঠিক আধুনিক atmosphere।

আরও দেখুন। আবহের বিস্তার কত ? লল্ল বলেন—

সমুদ্রশৈলাম্বরনীতভাস- (১০৭৪)
স্তনীরবিস্তৃতমুপন্তি সন্তঃ।

লল্লমতে পৃথিবীর ব্যাসযোজন ১০৫০। সুতরাং পৃথিবীর এ দিকে ১২ যোজন, ও দিকে ১২ যোজন আবহের বিস্তার।

ভাস্করও বলেন,—

ভূমের্বহির্দ্বাদশযোজনানি ভূবায়ুঃ

এ সকল স্থলে যোজনশব্দে যোজনার্দ্ধ বুঝিতে হইবে। তদনুসারে এক যোজন ৪॥০ মাইল, কিংবা ৫ মাইল হয়। অতএব প্রাচীন সিদ্ধান্তকারগণের মতে আবহের বিস্তার ৫০।৬০ মাইল। ইহার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় ঐক্য আছে।

একটি বিষয়ে প্রাচীনেরা একটু গোল করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ আর্য্যভট্টাদি কোন কোন জ্যোতিষী পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিতেন। অন্যেরা ভূভ্রম স্বীকার করিতেন না। না করিবার একটি প্রধান কারণ এই ছিল যে, তাঁহারা মৃণ্ময়-পৃথিবী হইতে আবহকে পৃথক্ ভাবিতেন। চারিদিকে আবহ রহিয়াছে, ভিতরে পৃথিবী কাহারও মতে ভ্রমণ করিতেছে, কাহারও মতে স্থির রহিয়াছে। আবহও যে পৃথিবীর একটা অঙ্গ, এবং উভয়ে একত্র ঘূরিতে পারে, এ তর্ক তাঁহাদের মনে উদয় হয় নাই। হইলে ভূভ্রমবাদের অনেক আপত্তির খণ্ডন হইতে পারিত। এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা।

সাহিত্য। বৈশাখ। হিমারণ্য। শ্রীযুক্ত রামানন্দ ভারতীর হিমাচলে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ক্রমশঃ সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রবন্ধটি সবিশেষ কৌতূহলজনক হইয়াছে। লেখক তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষ্যে তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন—সেই বিবরণ পাঠের জন্য আমরা উৎসুক হইয়া আছি। প্রবন্ধটির ভাষা সরল ও বর্ণনা আড়ম্বরবিহীন। লেখকের ভ্রমণপথটি হিমালয়ের মানচিত্রের কোন্ অংশ অধিকার করে, তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাইলে আমরা আরো তৃপ্তি বোধ করিব। লেখক শঙ্করপ্রবর্ত্তিত মঠস্থাপন ও সন্ন্যাসি-

সম্প্রদায়গঠনের আভাসমাত্র দিয়াছেন; তাঁহার নিকট হইতে তাহার রীতিনীতি ও বিস্তারিত বিবরণ আমরা প্রত্যাশা করিয়া রহিলাম। মাটির বাসন—শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায় এই প্রবন্ধে মাটির পাত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পৃথিবীর নানাদেশে মৃৎপাত্রগঠনশিল্প বৈচিত্র্য ও উন্নতিলাভ করিয়াছে—আমাদের দেশে যেমন ছিল, তেমনি আছে। তাহার শ্রীসৌন্দর্য্য, স্থায়িত্ব, কারুকার্য্য, কিছুই অগ্রসর হয় নাই। এ বিষয়ে লেখক আমাদের মনে আক্ষেপ জন্মাইয়া দিয়াছেন। আমরা নূতন নূতন লোহার কল তৈরি করিয়া জগতে বাহবা লইতে পারিতেছি না, তাহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই—কিন্তু তদপেক্ষা ধিক্কারের বিষয় এই যে, হাঁড়িকুঁড়ি, ঢেঁকি, গোরুর গাড়ি, আমাদের নূতন শিক্ষার আন্দোলনে, বুদ্ধিবৃত্তির নূতন অনুশীলনকালেও কোন অংশে উন্নতিলাভ করিল না। পাঁচরকম মাটি লইয়া পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল মৃৎপাত্রের উপাদান আবিষ্কার করা অপূর্ব্ব অসামান্যতার অপেক্ষা করে না। নূতন শিক্ষা আমাদিগকে তেমন করিয়া যদি সজাগ করিত, তবে দেশের হাঁড়িকুঁড়ি হইতে মনুষ্যসমাজ পর্য্যন্ত সকলি তাহার সাক্ষ্য দিত। লেখক এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন—"কলিকাতার রাধাবাজারে যাই, কেবল বিলাতী বাসনে, বিলাতী পুতুলে, বড় বড় দোকান পরিপূর্ণ দেখি। * * * * বঙ্গদেশে বিদ্বান্ আছে, কিন্তু ব্যবসায়-বিদ্বান্ নাই। কালে অন্যান্য ব্যবসায়ের যে অবস্থা আছে, কুম্ভকারের ব্যবসায়ের উন্নতি না হইলে, তাহারও সেই অবস্থা হইবে।"

প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ। পুরাণতত্ত্ব। লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। বর্ত্তমান আকারে আমরা যে গ্রন্থগুলিকে অষ্টাদশ পুরাণ বলিয়া জানি, তাহার সূত্রপাত কোথায়, সুযোগ্য লেখক সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের আগ্রহবর্দ্ধন করিয়াছেন। লেখক মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন:—"পুরু, কুরু, যদু, শূর, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, নিষধাধিপতি নল প্রভৃতি সহস্র সহস্র নরপতির কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য ও আর্জ্জবাদির বিবরণ বিদ্বান্ সৎকবিগণকর্ত্তৃক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।" এইগুলিই প্রাচীনকালের সাহিত্য ছিল। সেই দেশব্যাপ্ত সাহিত্য হইতে কোন অজ্ঞাতনামা মহাকবি মহাভারত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রাচীনতর বিক্ষিপ্ত-বিলুপ্ত সাহিত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া গেল। তাহার মধ্যে কত ইতিহাস, ভাষার পরিণাম, কবিত্বের বিকাশ নিহিত ছিল! বৈদিক কালেও সেই পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। লেখক দেখাইয়াছেন, "শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, অধ্বর্য্যু পুরাণকীর্ত্তন করিতেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ও মনুসংহিতায় আছে—শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণসকল ও খিলসমূহ শুনাইতে

হইবে। এই কয়টি প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, একসময়ে পুরাণ আর্য্য হিন্দুগণের অবশ্যপাঠ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল।” লেখক বলেন—“খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আবার প্রভাব লক্ষিত হয়। সম্ভবত এই সময়েই ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন পুরাণসমূহ সংগ্রহ বা প্রচলন করিতে থাকেন।” ইতিমধ্যে বৈদিককাল হইতে নূতন পৌরাণিক কালের মাঝখানটাতে প্রাচীন সাহিত্যের যে ধারা চলিয়া আসিয়াছিল, তাহা কোথায় বিনষ্ট হইয়া গেল! সে সাহিত্য যে সুমহৎ ছিল, তাহা রামায়ণ-মহাভারত হইতে অনুমান করিতে পারি। বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে মহাভারতকে অসঙ্কোচে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায়,—সেই মহাভারতের শ্রেষ্ঠতা আকস্মিক হইতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে তাহার উপযুক্ত ভিত্তি ছিল। যেমন মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যস্থলে কোন একটি গ্রহ না থাকিলে জ্যোতিষিগণের হিসাবে মিলিত না, অবশেষে সেই জায়গায় সাড়ে চার শো খণ্ডগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে—তেমনি মহাভারত ও বেদের মধ্যবর্ত্তী স্থানের সাহিত্যহিসাব মিলিতেছে না; সেই স্থানের ছোটবড় সাড়ে চারিশত পুরাণ কি কোন দিন আবিষ্কৃত হইবে? সাহিত্যহিসাবে বর্ত্তমান পুরাণগুলির শ্রেষ্ঠতা নাই। স্পষ্ট বুঝা যায়, সেগুলি প্রয়োজনের অনুরোধে শাস্ত্রকারগণের রচনা—মহাপুরুষদের মহিমায় ভাবাবিষ্ট কবির রচনা নহে। সমাজহিতৈষী রাজগণের আদেশে পণ্ডিতদের দ্বারা সেগুলি সঙ্কলিত। লেখক প্রাচীন জৈনপুরাণের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা কৌতূহলজনক। এই জৈন ও বৌদ্ধ পুরাণগুলির সম্যক্ আলোচনা ব্যতীত আমাদের দেশের ইতিহাস বিশুদ্ধ হইতে পারে না। জৈন ও বৌদ্ধদের নিকট আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ যে নানারূপে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিলে, তবেই আধুনিক হিন্দু-অভিব্যক্তির ধারাসূত্রটি পাওয়া যাইবে। আজকাল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ন্যায় দুই এক জন বাঙালী পণ্ডিতকে বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিতে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি।

ভাদ্র। পঞ্চম-সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

—:o:-

[নব পর্য্যায়]

মাসিক পত্র ।

৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিনযন্ত্রে,
শ্রীবগলাচরণ বড়াল দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বঙ্গদর্শন।

চোখের বালি।

(১৫)

দিক হইতে নাড়া পাইলে ছাই-চাপা আগুন আবার জ্বলিয়া উঠে। নবদম্পতির প্রেমের উৎসাহ যেটুকু ম্লান হইতেছিল, তৃতীয় পক্ষের ঘা খাইয়া সেটুকু আবার জাগিয়া উঠিল।

আশার হাস্যালাপ করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বিনোদিনী তাহা অজস্র জোগাইতে পারিত; এইজন্য বিনোদিনীর অন্তরালে আশা ভারি একটা আশ্রয় পাইল। মহেন্দ্রকে সর্ব্বদাই আমোদের উত্তেজনায় রাখিতে তাহাকে আর অসাধ্যসাধন করিতে হইল না।

বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই মহেন্দ্র এবং আশা পরস্পরের কাছে নিজেকে নিঃশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল,—প্রেমের সঙ্গীত একেবারেই তারস্বরের নিখাদ হইতেই সুরু হইয়াছিল—সুদ ভাঙিয়া না খাইয়া তাহারা একেবারে মূলধন উজাড় করিবার চেষ্টায় ছিল। এই ক্ষ্যাপামির বন্যাকে তাহারা প্রাত্যহিক সংসারের সহজ স্রোতে কেমন করিয়া পরিণত করিবে? নেশার পরেই মাঝখানে যে অবসাদ আসে, সেটা দূর করিতে মানুষ আবার যে নেশা চায়, সেই নেশা আশা কোথা হইতে জোগাইবে? এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙীন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। আশা স্বামীকে প্রফুল্ল দেখিয়া আরাম পাইল।

এখন আর তাহার নিজের চেষ্টা রহিল না। মহেন্দ্র-বিনোদিনী যখন উপহাস-পরিহাস করিত, তখন সে কেবল প্রাণ খুলিয়া হাসিতে যোগ দিত। তাসখেলায় মহেন্দ্র যখন আশাকে অন্যায় ফাঁকি দিত, তখন সে বিনোদিনীকে বিচারক মানিয়া সকরুণ অভিযোগের অবতারণা করিত। মহেন্দ্র তাহাকে ঠাট্টা করিলে বা কোন অসঙ্গত কথা বলিলে, সে প্রত্যাশা করিত, বিনোদিনী তাহার হইয়া উপযুক্ত জবাব দিয়া দিবে। এইরূপে তিনজনের সভা জমিয়া উঠিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিনোদিনীর কাজে শৈথিল্য ছিল না। রাঁধাবাড়া, ঘরকন্না দেখা, রাজলক্ষ্মীর সেবা করা, সমস্ত সে

নিঃশেষপূর্ব্বক সমাধা করিয়া তবে আমোদে যোগ দিত। মহেন্দ্র অস্থির হইয়া বলিত— "চাকরদাসীগুলাকে না কাজ করিতে দিয়া তুমি মাটি করিবে দেখিতেছি!"— বিনোদিনী বলিত, "নিজে কাজ না করিয়া মাটি হওয়ার চেয়ে সে ভাল! যাও তুমি কালেজে যাও!"

মহেন্দ্র। আজ বাদ্‌লার দিনটাতে—

বিনোদিনী। না সে হইবে না—তোমার গাড়ি তৈরি হইয়া আছে—কালেজে যাইতে হইবে।

মহেন্দ্র। আমি ত গাড়ি বারণ করিয়া দিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। "আমি বলিয়া দিয়াছি।"—বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজে যাইবার কাপড় আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিল।

মহেন্দ্র। তোমার রাজপুতের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল, যুদ্ধকালে আত্মীয়কে বর্ম্ম পরাইয়া দিতে।

আমোদের প্রলোভনে ছুটি লওয়া, পড়া ফাঁকি দেওয়া, বিনোদিনী কোনমতেই প্রশ্রয় দিত না। তাহার কঠিন শাসনে দিনে-দুপরে অনিয়ত আমোদ একেবারে উঠিয়া গেল—এবং এইরূপে সায়াহ্নের অবকাশ মহেন্দ্রের কাছে অত্যন্ত রমণীয়, লোভনীয় হইয়া উঠিল। তাহার দিনটা নিজের অবসানের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত!

পূর্ব্বে মাঝে মাঝে ঠিক সময়মত আহার প্রস্তুত হইত না এবং সেই ছুতা করিয়া মহেন্দ্র আনন্দে কালেজ কামাই করিত। এখন বিনোদিনী স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া মহেন্দ্রের কালেজের খাওয়া সকাল সকাল ঠিক করিয়া দেয় এবং খাওয়া হইলেই মহেন্দ্র খবর পায়—গাড়ি তৈয়ার। পূর্ব্বে কাপড়গুলি প্রতিদিন এমন ভাঁজকরা পরিপাটি অবস্থায় পাওয়া দূরে থাক্, ধোবার বাড়ী গেছে, কি আলমারীর কোন একটা অনির্দ্দেশ্য স্থানে অগোচরে পড়িয়া আছে, তাহা দীর্ঘকাল সন্ধান ব্যতীত জানা যাইত না।

প্রথম প্রথম বিনোদিনী এই সকল বিশৃঙ্খলা লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে আশাকে সহাস্য ভর্ৎসনা করিত,—মহেন্দ্র ও আশার নিরুপায় নৈপুণ্যহীনতায় সস্নেহে হাসিত। অবশেষে সখীবাৎসল্যবশে আশার হাত হইতে তাহার কর্ত্তব্যভার বিনোদিনী নিজের হাতে কাড়িয়া লইল। ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল।

চাপকানের বোতাম ছিঁড়িয়া গেছে, আশা আশু তাহার কোন উপায় করিতে পারিতেছে না—বিনোদিনী দ্রুত আসিয়া হতবুদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান কাড়িয়া লইয়া চট্‌পট্ সেলাই করিয়া দেয়। একদিন মহেন্দ্রের প্রস্তুত অন্নে বিড়ালে মুখ দিল—আশা ভাবিয়া অস্থির;—বিনোদিনী তখনি রান্নাঘরে গিয়া কোথা হইতে কি সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া কাজ চালাইয়া দিল, আশা আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র এইরূপে আহারে ও আচ্ছাদনে, কর্ম্মে ও বিশ্রামে, সর্ব্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনীর সেবাহস্ত অনুভব করিতে লাগিল। বিনোদিনীর রচিত পশমের জুতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা

পশমের গলাবন্ধ তাহার কণ্ঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মত বেষ্টন করিল। আশা আজকাল সখীহস্তের প্রসাধনে পরিপাটী-পরিচ্ছন্ন হইয়া সুন্দর-বেশে সুগন্ধ মাখিয়া মহেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে যেন কতকটা আশার নিজের, কতকটা আর একজনের—তাহার সাজসজ্জা-সৌন্দর্য্যে আনন্দে সে যেন গঙ্গা-যমুনার মত তাহার সখীর সঙ্গে মিলিয়া গেছে!

বিহারীর আজকাল পূর্ব্বের মত আদর নাই—তাহার ডাক পড়ে না। বিহারী মহেন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, কাল রবিবার আছে, দুপর বেলা আসিয়া সে মহেন্দ্রর মার রান্না খাইবে। মহেন্দ্র দেখিল রবিবারটা নিতান্ত মাটি হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইল, রবিবারে বিশেষ কাজে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে।

তবু বিহারী আহারান্তে একবার মহেন্দ্রদের বাড়ীর খোঁজ লইতে আসিল। বেহারার কাছে শুনিল, মহেন্দ্র বাড়ী হইতে বাহিরে যায় নাই। "মহীন্ দা" বলিয়া সিঁড়ি হইতে হাঁকিয়া বিহারী মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "ভারি মাথা ধরিয়াছে।" বলিয়া তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া পড়িল। আশা সে কথা শুনিয়া এবং মহেন্দ্রের মুখের ভাব দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিল,—কি করা কর্ত্তব্য, স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। বিনোদিনী বেশ জানিত, ব্যাপারটা গুরুতর নহে, তবু অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে কহিল, "অনেকক্ষণ বসিয়া আছ, একটুখানি শোও! আমি ওডিকলোন্ আনিয়া দিই।"

মহেন্দ্র বলিল, "থাক্ দরকার নাই!"

বিনোদিনী শুনিল না। দ্রুতপদে ওডিকলোন্ বরফজলে মিশাইয়া উপস্থিত করিল। আশার হাতে ভিজা রুমাল দিয়া কহিল, "মহেন্দ্রবাবুর মাথায় বাঁধিয়া দাও!"

মহেন্দ্র বারবার বলিতে লাগিল—"থাক্ না!" বিহারী অবরুদ্ধ হাস্যে নীরবে অভিনয় দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র সগর্ব্বে ভাবিল, "বেহারীটা দেখুক্ আমার কত আদর!"

আশা বিহারীর সম্মুখে লজ্জাকম্পিত হস্তে ভাল করিয়া বাঁধিতে পারিল না—ফোঁটাখানেক ওডিকলোন্ গড়াইয়া মহেন্দ্রের চোখে পড়িল। বিনোদিনী আশার হাত হইতে রুমাল লইয়া সুনিপুণ করিয়া বাঁধিল এবং আর একটি বস্ত্রখণ্ডে ওডিকলোন্ ভিজাইয়া অল্প অল্প করিয়া নিংড়াইয়া দিল—আশা মাথায় ঘোমটা টানিয়া পাখা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মহেন্দ্রবাবু, আরাম পাচ্চেন কি?"

এইরূপে কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বিনোদিনী দ্রুতকটাক্ষে একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া লইল। দেখিল, বিহারীর চক্ষু কৌতুকে হাসিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে প্রহসন। বিনোদিনী বুঝিয়া লইল, এ লোকটিকে ভোলান সহজ ব্যাপার নহে—কিছুই ইহার নজর এড়ায় না।

বিহারী হাসিয়া কহিল—"বিনোদ-বোঠা'ণ, এমনতর শুশ্রূষা পাইলে রোগ সারিবে না, বাড়িয়া যাইবে।"

বিনোদিনী। তা কেমন করিয়া জানিব, আমরা মূর্খ মেয়েমানুষ! আপনাদের ডাক্তারীশাস্ত্রে বুঝি এইমত লেখা আছে?

বিহারী। আছেই ত। সেবা দেখিয়া আমারো কপাল ধরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পোড়াকপালকে বিনা চিকিৎসাতেই চট্‌পট্‌ সারিয়া উঠিতে হয়। মহীন্দার কপালের জোর বেশি!

বিনোদিনী ভিজা বস্ত্রখণ্ড রাখিয়া দিয়া কহিল—"কাজ নাই, বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুতেই করুন্!"

বিহারী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ কয়দিন সে অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিল, ইতিমধ্যে মহেন্দ্র, বিনোদিনী ও আশায় মিলিয়া আপনা-আপনি যে এতখানি তাল পাকাইয়া তুলিয়াছে, তাহা সে জানিত না। আজ সে বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়া দেখিল, বিনোদিনীও তাহাকে দেখিয়া লইল।

বিহারী কিছু তীক্ষ্নস্বরে কহিল—"ঠিক কথা! বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুই করিবে। আমিই মাথাধরা আনিয়াছিলাম, আমিই তাহা সঙ্গে লইয়া চলিলাম। ওডিকলোন্ আর বাজে খরচ করিবেন না।"—আশার দিকে চাহিয়া কহিল—"বোঠা'ণ, চিকিৎসা করিয়া রোগ সারানোর চেয়ে রোগ না হইতে দেওয়াই ভাল!"

(১৬)

বিহারী মনে মনে আশাকে মূঢ় বলিয়া অনেক ভর্ৎসনা করিল—হায়, এমন করিয়া নিজের শিয়রের কাছে নিজে আগুন লাগায়! কিন্তু এই মূঢ়তায় আশার প্রতি বিহারীর স্নেহ আরো বাড়িল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একলাঘরে বসিয়া সরলা সতীর বিশ্বস্ত মুখখানি স্মরণ করিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল! সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জানালা হইতে তারকাখচিত অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি নিমগ্ন করিয়া দিয়া জটিল সংসারের সুখদুঃখের বিপুল রহস্য আলোচনা করিয়া কোথাও কূল পাইল না। মনে মনে ভাবিল, "অদৃষ্ট যেন উপন্যাসলেখকের মত; যেটি যেমন ভাবে হইলে কোন গোল হয় না, সকল পক্ষেই সুখের হয়, তাহা সে কোনমতেই ঘটিতে দেয় না; তাহার প্রকাণ্ড নিষ্ঠুর উপন্যাসকে দুই কথাতেই সহজ শেষ করিয়া দিতে চায় না! বেচারা আশা কোথায় সংসারের এক অদৃশ্য কোণে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল, আর সকলকে ঠেলিয়া, আর সকলকে ফেলিয়া, কোথা হইতে মহেন্দ্র আসিয়া এই অজ্ঞাত বালিকাকে আপন অসংযত হৃদয়ের আবর্ত্তের মধ্যে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইল! আর একটু হইলেই ইহা আর এক রকম হইত, আর একটু হইলেই ইহা না হইতে পারিত!"

কিন্তু এই উপন্যাসলেখকের হাত হইতে আশাকে যতটা সম্ভব রক্ষা করিতে হইবে ত! বিহারী ভাবিল, "আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হোক, ইহাদের মাঝখানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাহিবে না, তবু আমাকে থাকিতে হইবে।"

বিহারী আহ্বান-অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রাখিয়াই মহেন্দ্রের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনোদিনীকে কহিল—

"বিনোদ-বোঠা'ণ, এই ছেলেটিকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বন্ধু মাটি করিয়াছে, স্ত্রী মাটি করিতেছে—তুমিও সেই দলে না ভিড়িয়া একটা নূতন পথ দেখাও—দোহাই তোমার!"

মহেন্দ্র। অর্থাৎ—

বিহারী। অর্থাৎ আমার মত লোক যাহাকে কেহ কোনকালে পোঁছে না—

মহেন্দ্র। তাহাকে মাটি কর! মাটি হইবার উমেদারী সহজ নয় হে বিহারী, দরখাস্ত পেশ করিলেই হয় না!

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল—"মাটি হইবার ক্ষমতা থাকা চাই, বিহারিবাবু!"

বিহারী কহিল—"নিজগুণ না থাকিলেও হাতের গুণে হইতে পারে! একবার প্রশ্রয় দিয়া দেখই না!"

বিনোদিনী। আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিলে কিছু হয় না, অসাবধান থাকিতে হয়! কি বল ভাই চোখের বালি? তোমার এই দেওরের ভার তুমিই লও না ভাই!

আশা তাহাকে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঠেলিয়া দিল। বিহারীও এ ঠাট্টায় যোগ দিল না।

আশার সম্বন্ধে বিহারীর কোন ঠাট্টা সহিবে না, এটুকু বিনোদিনীর কাছে এড়াইতে পারে নাই। বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিনোদিনীকে হাল্‌কা করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বিঁধিল।

সে পুনরায় আশাকে কহিল, "তোমার এই ভিক্ষুক দেওরটি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমারই কাছে আদর ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে—কিছু দে ভাই।"

আশা অত্যন্ত বিরক্ত হইল। বিহারীর ক্ষণকালের জন্য মুখ লাল হইল, পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল—"আমার বেলাতেই কি পরের উপর বরাত চালাইবে, আর মহীন্দার সঙ্গেই নগদ কারবার?"

বিহারী যে সমস্ত মাটি করিতে আসিয়াছে, বিনোদিনীর ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। বুঝিল, বিহারীর সম্মুখে সশস্ত্রে থাকিতে হইবে।

মহেন্দ্রও বিরক্ত হইল। খোলসা কথায় কবিত্বের মাধুর্য্য নষ্ট হয়। সে ঈষৎ তীব্র স্বরেই কহিল—"বিহারি, তোমার মহীন্দা কোন কারবারে যান না—হাতে যা আছে, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট!"

বিহারী। তিনি না যেতে পারেন, কিন্তু ভাগ্যে লেখা থাকিলে কারবারের ঢেউ বাহির হইতে আসিয়াও লাগে!

বিনোদিনী। "আপনার উপস্থিত হাতে কিছুই নাই, কিন্তু আপনার ঢেউটা কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে?"—বলিয়া সে সকটাক্ষ হাস্যে আশাকে টিপিল। আশা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। বিহারী পরাভূত হইয়া ক্রোধে নীরব হইল; উঠিবার উপক্রম করিতেই বিনোদিনী কহিল—"হতাশ হইয়া যাবেন না বিহারিবাবু! আমি চোখের বালিকে পাঠাইয়া দিতেছি!"

বিনোদিনী চলিয়া যাইতেই সভাভঙ্গে মহেন্দ্র মনে মনে রাগিল। মহেন্দ্রের অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া বিহারীর রুদ্ধ আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিল—"মহিন্‌দা, নিজের সর্ব্বনাশ করিতে চাও কর—বরাবর তোমার সেই অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে! কিন্তু যে

সরলহৃদয়া সাধ্বী তোমাকে একান্ত বিশ্বাসে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়ো না। এখনো বলিতেছি, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়ো না!"—বলিতে বলিতে বিহারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল!

মহেন্দ্র রুদ্ধরোষে কহিল—"বিহারি, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! হেঁয়ালি ছাড়িয়া স্পষ্ট কথা কও!"

বিহারী কহিল—"স্পষ্টই কহিব! বিনোদিনী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অধর্ম্মের দিকে টানিতেছে এবং তুমি না জানিয়া মূঢ়ের মত অপথে পা বাড়াইতেছ!"

মহেন্দ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া কহিল—"মিথ্যা কথা! তুমি যদি ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন অন্যায় সন্দেহের চোখে দেখ, তবে অন্তঃপুরে তোমার আসা উচিত নয়।"

এমন সময় একটি থালায় মিষ্টান্ন সাজাইয়া বিনোদিনী হাস্যমুখে তাহা বিহারীর সম্মুখে রাখিল। বিহারী কহিল, "একি ব্যাপার! আমার ত ক্ষুধা নাই!"

বিনোদিনী কহিল, "সে কি হয়! একটু মিষ্টমুখ করিয়া আপনাকে যাইতেই হইবে!"

বিহারী হাসিয়া কহিল—"আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল বুঝি? সমাদর আরম্ভ হইল?"

বিনোদিনী অত্যন্ত টিপিয়া হাসিল—কহিল—"আপনি যখন দেওর, তখন সম্পর্কের যে জোর আছে! যেখানে দাবী করা চলে, সেখানে ভিক্ষা করা কেন? আদর যে কাড়িয়া লইতে পারেন! কি বলেন মহেন্দ্রবাবু?"

মহেন্দ্রবাবুর তখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না।

বিনোদিনী। বিহারিবাবু, লজ্জা করিয়া খাইতেছেন না, না রাগ করিয়া? আর কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে?

বিহারী। কোন দরকার নাই। যাহা পাইলাম, তাহাই প্রচুর।

বিনোদিনী। ঠাট্টা? আপনার সঙ্গে পারিবার যো নাই। মিষ্টান্ন দিলেও মুখ বন্ধ হয় না?

রাত্রে আশা মহেন্দ্রের নিকটে বিহারিসম্বন্ধে রাগ প্রকাশ করিল—মহেন্দ্র অন্যদিনের মত হাসিয়া উড়াইয়া দিল না—সম্পূর্ণ যোগ দিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ী গেল। কহিল—"বিহারি, বিনোদিনী হাজার হোক্ ঠিক বাড়ীর মেয়ে নয়—তুমি সাম্‌নে আসিলে সে যেন কিছু বিরক্ত হয়!"

বিহারী কহিল—"তাই না কি! তবে ত কাজটা ভাল হয় না! তিনি যদি আপত্তি করেন, তাঁর সাম্‌নে নাই গেলাম।"

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইল। এত সহজে এই অপ্রিয় কার্য্য শেষ হইবে, তাহা সে মনে করে নাই। বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করে।

সেই দিনই বিহারী মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে গিয়া কহিল—"বিনোদ-বোঠা'ণ, মাপ করিতে হইবে।"

বিনোদিনী। কেন বিহারিবাবু?

বিহারী। মহেন্দ্রের কাছে শুনিলাম, আমি অন্তঃপুরে আপনার সাম্‌নে বাহির হই বলিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। তাই ক্ষমা চাহিয়া বিদায় হইব।

বিনোদিনী। "সে কি হয় বিহারিবাবু? আমি আজ আছি কাল নাই, আপনি আমার জন্ম কেন যাইবেন। এত গোল হইবে জানিলে আমি এখানে আসিতাম না।"—এই বলিয়া বিনোদিনী মুখ ম্লান করিয়া যেন অশ্রুসংবরণ করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিহারী ক্ষণকালের জন্য মনে করিল, "মিথ্যা সন্দেহ করিয়া আমি বিনোদিনীকে অন্যায় আঘাত করিয়াছি।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজলক্ষ্মী বিপন্নভাবে আসিয়া কহিলেন, "মহীন্, বিপিনের বৌ যে বাড়ী যাইবে বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছে।"

মহেন্দ্র কহিল—"কেন মা, এখানে তাঁর কি অসুবিধা হইতেছে?"

রাজলক্ষ্মী। অসুবিধা না। বৌ বলিতেছে, তাহার মত সমর্থ বয়সের বিধবা মেয়ে পরের বাড়ী বেশিদিন থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে।

মহেন্দ্র ক্ষুব্ধভাবে কহিল—"এ বুঝি পরের বাড়ী হইল?"

বিহারী বসিয়া ছিল—মহেন্দ্র তাহার প্রতি ভর্ৎসনাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

অনুতপ্ত বিহারী ভাবিল—"কাল আমার কথাবার্ত্তায় একটু যেন নিন্দার আভাস ছিল. বিনোদিনী বোধ হয় তাহাতেই বেদনা পাইয়াছে।"

স্বামি-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া বিনোদিনীর উপর অভিমান করিয়া বসিল। ইনি বলিলেন, "আমাদের পর মনে কর ভাই!" উনি বলিলেন, "এতদিন পরে আমরা পর হইলাম!"

বিনোদিনী কহিল—"আমাকে কি তোমরা চিরকাল ধরিয়া রাখিবে ভাই?"

মহেন্দ্র কহিল—"এত কি আমাদের স্পর্দ্ধা?"

আশা কহিল—"তবে কেন এমন করিয়া আমাদের মন কাড়িয়া লইলে?"

সেদিন কিছুই স্থির হইল না। বিনোদিনী কহিল, "না ভাই কাজ নাই, দু'দিনের জন্ম মায়া না বাড়ানই ভাল!"—বলিয়া ব্যাকুলচক্ষে একবার মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

পরদিন বিহারী আসিয়া কহিল—"বিনোদ-বোঠা'ণ, যাবার কথা কেন বলিতেছেন? কিছু দোষ করিয়াছি কি—তাহারি শাস্তি?"

বিনোদিনী একটু মুখ ফিরাইয়া কহিল—"দোষ আপনি কেন করিবেন, আমার অদৃষ্টের দোষ!"

বিহারী। আপনি যদি চলিয়া যান ত আমার কেবলি মনে হইবে, আমারি উপর রাগ করিয়া গেলেন।

বিনোদিনী করুণচক্ষে মিনতি প্রকাশ করিয়া বিহারীর মুখের দিকে চাহিল—কহিল—"আমার কি থাকা উচিত হয়, আপনিই বলুন না!"

বিহারী মুস্কিলে পড়িল। থাকা উচিত, এ কথা সে কেমন করিয়া বলিবে? কহিল, "অবশ্য আপনাকে ত যাইতেই হইবে, না হয় আর দু চার দিন থাকিয়া গেলেন, তাহাতে ক্ষতি কি?"

বিনোদিনী দুই চক্ষু নত করিয়া কহিল, "আপনারা সকলেই আমাকে থাকিবার জন্ম

অনুরোধ করিতেছেন—আপনাদের কথা এড়াইয়া যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন—কিন্তু আপনারা বড় অন্যায় করিতেছেন।”

বলিতে বলিতে তাহার ঘনদীর্ঘ চক্ষু-পল্লবের মধ্য দিয়া মোটা মোটা অশ্রুর ফোঁটা দ্রুতবেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বিহারী এই নীরব অজস্র অশ্রুজলে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল—“কয়দিনমাত্র আসিয়া আপনার গুণে আপনি সকলকে বশ করিয়া লইয়াছেন, সেইজন্যই আপনাকে কেহ ছাড়িতে চান না—কিছু মনে করিবেন না বিনোদ-বোঠা'ণ, এমন লক্ষ্মীকে কে ইচ্ছা করিয়া বিদায় করিবে?”

আশা এক কোণে ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল, সে আঁচল তুলিয়া ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

ইহার পরে বিনোদিনী আর যাইবার কথা উত্থাপন করিল না।

(১৭)

মাঝখানের এই গোলমালটা একেবারে মুছিয়া ফেলিবার জন্য মহেন্দ্র প্রস্তাব করিল—“আস্‌চে রবিবারে দমদমের বাগানে চড়িভাতী করিয়া আসা যাক্!”

আশা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বিনোদিনী কিছুতেই রাজি হইল না। মহেন্দ্র ও আশা বিনোদিনীর আপত্তিতে ভারি মুষ্‌ড়িয়া গেল। তাহারা মনে করিল, আজকাল বিনোদিনী কেমন যেন দূরে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

বিকালবেলায় বিহারী আসিবামাত্র বিনোদিনী কহিল, “দেখুন ত বিহারিবাবু, মহীন্‌বাবু দমদমের বাগানে চড়িভাতী করিতে যাইবেন, আমি সঙ্গে যাইতে চাহি নাই বলিয়া আজ সকাল হইতে দুই জনে মিলিয়া রাগ করিয়া বসিয়াছেন।”

বিহারী কহিল—“অন্যায় রাগ করেন নাই। আপনি না গেলে ইঁহাদের চড়িভাতীতে যে কাণ্ডটা হইবে, অতিবড় শত্রুরও যেন তেমন না হয়!”

বিনোদিনী। চলুন্ না বিহারিবাবু! আপনি যদি যান, তবে আমি যাইতে রাজি আছি।

বিহারী। উত্তম কথা। কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, কর্ত্তা কি বলেন?

বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর এই বিশেষ পক্ষপাতে কর্ত্তা, গৃহিণী, উভয়েই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। বিহারীকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাবে মহেন্দ্রের অর্দ্ধেক উৎসাহ উঠিয়া গেল। বিহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর পক্ষে সকল সময়েই অপ্রিয়, এই কথাটাই বন্ধুর মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য মহেন্দ্র ব্যস্ত—কিন্তু অতঃপর বিহারীকে আটক করিয়া রাখা অসাধ্য হইবে।

মহেন্দ্র কহিল “তা বেশ ত, ভালই ত। কিন্তু বিহারি, তুমি যেখানে যাও, একটা হাঙ্গাম না করিয়া ছাড় না। হয় ত সেখানে পাড়া হইতে রাজ্যের ছেলে জোটাইয়া বসিবে, নয় ত কোন্ গোরার সঙ্গে হয় ত মারামারিই বাধাইয়া দিবে—কিছু বলা যায় না।”

বিহারী মহেন্দ্রের আন্তরিক অনিচ্ছা বুঝিয়া মনে মনে হাসিল, কহিল—“সেই ত সংসারের মজা, কিসে কি হয়, কোথায় কি ফেসাদ ঘটে, আগে হইতে কিছুই বলি-

বার জো নাই! বিনোদ-বোঠা'ণ, ভোরের বেলায় ছাড়িতে হইবে, আমি ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির হইব।"

রবিবার ভোরে জিনিষপত্র ও চাকরদের জন্য একটি থার্ডক্লাস ও মনিবদের জন্য একটি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। বিহারী মস্ত একটা প্যাক্‌-বাক্স সঙ্গে করিয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত। মহেন্দ্র কহিল, "ওটা আবার কি আনিলে? চাকরদের গাড়িতে ত আর ধরিবে না।"

বিহারী কহিল, "ব্যস্ত হইয়ো না দাদা, সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছি।"

বিনোদিনী ও আশা গাড়িতে প্রবেশ করিল। বিহারীকে লইয়া কি করিবে, মহেন্দ্র তাই ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। বিহারী বোঝাটা গাড়ীর মাথায় তুলিয়া দিয়া চট্‌ করিয়া কোচ্‌বাক্সে চড়িয়া বসিল।

মহেন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ভাবিতেছিল, "বিহারী ভিতরেই বসে, কি, কি করে, তাহার ঠিক নাই।" বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "বিহারিবাবু পড়িয়া যাবেন না ত?"

বিহারী শুনিতে পাইয়া কহিল, "ভয় করিবেন না, পতন ও মূর্চ্ছা, ওটা আমার পার্টের মধ্যে নাই!"

গাড়ি চলিতেই মহেন্দ্র কহিল, "আমিই না হয় উপরে গিয়া বসি, বিহারীকে ভিতরে পাঠাইয়া দিই!"

আশা ব্যস্ত হইয়া তাহার চাদর চাপিয়া কহিল, "না তুমি যাইতে পারিবে না।"

বিনোদিনী কহিল, "আপনার অভ্যাস নাই, কাজ কি যদি পড়িয়া যান!"

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, "পড়িয়া যাব? কখন না!"—বলিয়া তখনি বাহির হইতে উদ্যত হইল।

বিনোদিনী কহিল, "আপনি বিহারিবাবুকে দোষ দেন, কিন্তু আপনিই ত হাঙ্গাম বাধাইতে অদ্বিতীয়!"

মহেন্দ্র মুখভার করিয়া কহিল, "আচ্ছা এক কাজ করা যাক্‌! আমি একটা আলাদা গাড়ি ভাড়া করিয়া যাই, বিহারী ভিতরে আসিয়া বসুক্‌।"

আশা কহিল, "তা যদি হয়, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

বিনোদিনী কহিল, "আর আমি বুঝি গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িব।" এম্‌নি গোলমাল করিয়া কথাটা থামিয়া গেল।

মহেন্দ্র সমস্ত পথ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া রহিল।

দমদমের বাগানে গাড়ি পৌঁছিল। চাকরদের গাড়ি অনেক আগে ছাড়িয়াছিল, কিন্তু এখনো তাহার খোঁজ নাই।

শরৎকালের প্রাতঃকাল অতি মধুর। রৌদ্র উঠিয়া শিশির মরিয়া গেছে, কিন্তু গাছপালা নির্ম্মল আলোকে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। প্রাচীরের গায়ে শেফালি-গাছের সারি রহিয়াছে, তলদেশ ফুলে আচ্ছন্ন এবং গন্ধে আমোদিত।

আশা কলিকাতার ইষ্টকবন্ধন হইতে বাগানের মধ্যে ছাড়া পাইয়া বন্যমৃগীর মত উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে লইয়া রাশীকৃত ফুল কুড়াইল, গাছ হইতে

পাকা আতা পাড়িয়া আতাগাছের তলায় বসিয়া খাইল, দুই সখীতে দীঘির জলে পড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান করিল। এই দুই নারীতে মিলিয়া একটি নিরর্থক আনন্দে, গাছের ছায়া এবং শাখাচ্যুত আলোক, দীঘির জল এবং নিকুঞ্জের পুষ্পপল্লবকে পুলকিত, সচেতন করিয়া তুলিল।

স্নানের পর দুই সখী আসিয়া দেখিল, চাকরদের গাড়ি তখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। মহেন্দ্র বাড়ীর বারান্দায় চৌকি লইয়া অত্যন্ত শুষ্কমুখে একটা বিলাতী দোকানের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারি-বাবু কোথায় ?"

মহেন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর করিল—"জানি না।"

বিনোদিনী। চলুন্ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করি গে!

মহেন্দ্র। তাহাকে কেহ চুরি করিয়া লইবে, এমন আশঙ্কা নাই। না খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে।

বিনোদিনী। কিন্তু তিনি হয়ত আপনার জন্য ভাবিয়া মরিতেছেন, পাছে দুর্লভরত্ন খোওয়া যায়। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আসা যাক্।

জলাশয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁধান বটগাছ আছে, সেইখানে বিহারী তাহার প্যাক্‌বাক্স খুলিয়া একটি কেরোসিন্-চুলা বাহির করিয়া জল গরম করিতেছে। সকলে আসিবামাত্র আতিথ্য করিয়া বাঁধা বেদীর উপর বসাইয়া এক এক পেয়ালা গরম চা এবং ছোট রেকাবীতে দুই একটি মিষ্টান্ন ধরিয়া দিল। বিনোদিনী বারবার বলিতে লাগিল, "ভাগ্যে বিহারিবাবু সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই ত রক্ষা, নহিলে চা না পাইলে মহেন্দ্রবাবুর কি দশা হইত!"

চা পাইয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল, তবু বলিল, "বিহারীর সমস্ত বাড়াবাড়ি। চড়িভাতী করিতে আসিয়াছি, এখানেও সমস্ত দস্তুর-মত আয়োজন করিয়া আসিয়াছে! ইহাতে মজা থাকে না!"

বিহারী কহিল, "তবে দাও ভাই তোমার চায়ের পেয়ালা, তুমি না খাইয়া মজা কর গে—বাধা দিব না।"

বেলা হয়, চাকররা আসিল না। বিহারীর বাক্স হইতে আহারাদির সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জাম বাহির হইতে লাগিল। চাল-ডাল, তরী-তর-কারী এবং ছোট ছোট বোতলে বিচিত্র পেষা মসলা, আবিষ্কৃত হইল্। বিনোদিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিল—"বিহারিবাবু, আপনি যে আমাদেরও ছাড়াইয়াছেন। ঘরে ত গৃহিণী নাই, তবে শিখিলেন কোথা হইতে ?"

বিহারী কহিল—"প্রাণের দায়ে শিখি-য়াছি—নিজের যত্ন নিজেই করিতে হয়।"

বিহারী নিতান্ত পরিহাস করিয়া কহিল; কিন্তু বিনোদিনী গম্ভীর হইয়া বিহারীর মুখে করুণচক্ষের কৃপাবর্ষণ করিল।

বিহারী ও বিনোদিনী মিলিয়া রাঁধা-বাড়ায় প্রবৃত্ত হইল। আশা ক্ষীণ সঙ্কুচিত ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আসিলে, বিহারী তাহাতে বাধা দিল। অপটু মহেন্দ্র সাহায্য করিবার কোন চেষ্টাও করিল না। সে গুঁড়ির উপরে হেলান্ দিয়া একটা পায়ের

উপরে আর একটা পা তুলিয়া কম্পিত বট-পত্রের উপরে রৌদ্রকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল।

রন্ধন প্রায় শেষ হইলে পর বিনোদিনী কহিল, "মহীনবাবু, আপনি ঐ বটের পাতা গণিয়া শেষ করিতে পারিবেন না, এবারে স্নান করিতে যান্!"

ভৃত্যের দল এতক্ষণে জিনিষপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ি পথের মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছিল। তখন বেলা দুপর হইয়া গেছে।

আহারান্তে সেই বটগাছের তলায় তাস খেলিবার প্রস্তাব হইল—মহেন্দ্র কোনমতেই গা দিল না এবং দেখিতে দেখিতে ছায়াতলে ঘুমাইয়া পড়িল। আশা বাড়ীর মধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিল।

বিনোদিনী মাথার উপরে একটুখানি কাপড় তুলিয়া দিয়া কহিল, "আমি তবে ঘরে যাই।"

বিহারী কহিল, "কোথায় যাইবেন, একটু গল্প করুন। আপনাদের দেশের কথা বলুন।"

ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরু-পল্লব মর্ম্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দীঘির পাড়ে জামগাছের ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথীর কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্ব্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ-জ্যোতি যখন একটি শান্ত সজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল; তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তি-মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে,—অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস-কৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতী-স্ত্রী-ভাবে একান্ত ভক্তি-ভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণ-পরিপূর্ণা জননীর মত সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্ব্বে মুহূর্ত্তের জন্যেও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই—আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, "বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।" বিহারী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, "প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন, অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে, সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।" বিহারী কথাটাকে থামিতে দিল না—প্রশ্ন করিয়া করিয়া জাগাইয়া রাখিতে লাগিল; বিনোদিনী এ সকল কথা এ পর্য্যন্ত এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই—বিশেষত কোন পুরুষের কাছে

সে এমন আত্মবিস্মৃত স্বাভাবিক ভাবে কথা কহে নাই—আজ অজস্র কলকণ্ঠে নিতান্ত সহজ হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন নববারিধারায় স্নাত, স্নিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

ভোরে উঠিবার উপদ্রবে ক্লান্ত মহেন্দ্রের পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙিল। বিরক্ত হইয়া কহিল, "এবার ফিরিবার উদ্যোগ করা যাক্!"

বিনোদিনী কহিল, "আর একটু সন্ধ্যা করিয়া গেলে কি ক্ষতি আছে?"

মহেন্দ্র কহিল, "না, শেষকালে মাতাল গোরার হাতে পড়িতে হইবে?"

জিনিষপত্র গুছাইয়া তুলিতে অন্ধকার হইয়া আসিল। এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, "ঠিকা গাড়ি কোথায় গেছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গাড়ি বাগানের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, দুইজন গোরা গাড়োয়ানের প্রতি বলপ্রকাশ করিয়া ষ্টেশনে লইয়া গেছে।"

আর একটা গাড়ি ভাড়া করিতে চাকরকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিরক্ত মহেন্দ্র কেবলি মনে মনে কহিতে লাগিল, "আজ দিনটা মিথ্যা মাটি হইয়াছে"—অধৈর্য্য সে আর কিছুতেই গোপন করিতে পারে না, এম্নি হইল।

শুক্লপক্ষের চাঁদ ক্রমে শাখাজালজড়িত দিক্‌প্রান্ত হইতে মুক্ত আকাশে আরোহণ করিল। নিস্তব্ধ নিষ্কম্প বাগান ছায়ালোকে খচিত হইয়া উঠিল। আজ এই মায়ামণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে বিনোদিনী আপনাকে কি একটা অপূর্ব্ব ভাবে অনুভব করিল। আজ সে যখন তরুবীথিকার মধ্যে আশাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার মধ্যে প্রণয়ের কৃত্রিমতা কিছুই ছিল না। আশা দেখিল, বিনোদিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আশা ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাই চোখের বালি, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

বিনোদিনী কহিল—"কিছু নয় ভাই, আমি বেশ আছি! আজ দিনটা আমার বড় ভাল লাগিল!"

আশা জিজ্ঞাসা করিল—"কিসে তোমার এত ভাল লাগিল ভাই?"

বিনোদিনী কহিল—"আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।"

বিস্মিত আশা এ সব কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে মৃত্যুর কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া কহিল—"ছি ভাই চোখের বালি, অমন কথা বলিতে নাই!"

গাড়ি পাওয়া গেল। বিহারী পুনরায় কোচ্‌বাক্সে চড়িয়া বসিল। বিনোদিনী কোন কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, জ্যোৎস্নায় স্তম্ভিত তরুশ্রেণী ধাবমান নিবিড় ছায়াস্রোতের মত তাহার চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আশা গাড়ির কোণে ঘুমাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র সুদীর্ঘপথ নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকিল।

ক্রমশঃ।

পাত্রনির্ব্বাচন।

সন্তানে পিতামাতার গুণের রূপান্তরপরিগ্রহ এক অদ্ভুত ব্যাপার। যে রোগ দম্পতির শরীরে বর্ত্তমান, সন্তানে যে অবিকল তাহাই পরিস্ফুট হইবে, এরূপ নিশ্চয়তা নাই। মাতালের পুত্র মাতাল হইলে অপরিবর্ত্তিত সংক্রমণ হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, মাতালের বংশধরদিগের মধ্যে হয় ত কেহ মাতাল, কেহ উন্মাদগ্রস্ত, কেহ উৎকট রিপুপরবশ।

উপরের লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব। কোন একজন সম্পন্ন লোক নিতান্ত সুরামত্ত ছিলেন। ইঁহার দুইটিমাত্র সন্তান। তন্মধ্যে পুত্রটি সর্ব্ববিধ মাদকের দাস হইয়া নিতান্ত অধমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; কন্যাটি পতিতা রমণীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছে। অন্য এক পরিবারে পিতা খুব বুদ্ধিমান্, কিন্তু নিতান্ত রুগ্ণ ও মদ্যপায়ী, মাতা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে গতাসু হইয়াছেন। সন্তানদিগের মধ্যে একটি পুত্র অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; আর একটি পুত্র নিতান্ত নির্ব্বোধ; অন্য একটি পুত্রও আশাজনক নহে। অন্য একটি পরিবারের অবস্থা এইরূপ—

পিতা——মাতা
(সুস্থ) (বার্দ্ধক্যে বাতব্যাধিগ্রস্ত)

পুত্র (সুস্থ) (ইঁহার পত্নীও সুস্থ)
— পুত্র (উন্মাদ-গ্রস্ত)

পুত্র (বাতব্যাধিগ্রস্ত; ইঁহার পত্নী সুস্থ)
— পুত্র (বাতব্যাধি-গ্রস্ত)
— পুত্র (সুরামত্ত ও বাত-ব্যাধিগ্রস্ত)

অঙ্গহীনতাও পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত হয়। অন্ধ, মূক, বধির প্রভৃতির সন্তান সেই সব ত্রুটি লইয়া জন্মিতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথা আছে। মানবদেহের সর্ব্বাংশে অতিসূক্ষ্ম কোষ বা cell সমূহ বর্ত্তমান। তাহার প্রত্যেকটি কোষে শরীরের প্রত্যেক-অংশগঠনোপযোগি-শক্তি আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন। (Darwin, theory of pangenesis দ্রষ্টব্য) যদি কোনও অঙ্গের পীড়া হয়, তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য শরীরস্থ সমস্ত কোষের তদুপযোগি-শক্তি নিয়োজিত হইবে; যথা, বাহুতে কুষ্ঠাদিরোগ হইলে সমগ্র-দেহের কোষরাশি হইতে বাহুগঠনোপযোগি-শক্তি ব্যয়িত হইতে থাকে। যদি সেই শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয় হইয়াও আরোগ্য না হয়, বাহুটি পচিয়া যাইবে। তখন আর সেই শরীরে বাহুগঠনোপযোগি-শক্তি নাই। পিতামাতার শরীরের যে আণুবীক্ষণিক অংশ লইয়া সন্তানের দেহ গঠিত হয়, তাহাও ঐরূপ কোষমাত্র। যাহার বাহু পূর্ব্বোক্ত-রূপে নষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্তানোৎপাদক দেহাংশে বাহুগঠনোপযোগি-শক্তির অভাবে সন্তান বাহুহীন হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যুদ্ধাদিতে খণ্ডিতবাহু হইতে পারে। তাহার সন্তান কখনও অপূর্ণাঙ্গ হইবে না; কারণ, তাহার কোষসমূহের শক্তি পূর্ণরূপে বর্ত্তমান।

দীর্ঘজীবিত্ব বা অল্পায়ুষ্কত্বও পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত হইতে পারে। বহুসন্তানবত্তা বা বন্ধ্যাত্বও তদ্রূপ। সুপ্রসিদ্ধ গ্যাল্টন

সাহেব পুরুষানুক্রমিকত্ব-সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দায়াদ মহিলাদের (peeresses) পাণিগ্রহণ ইংলণ্ডের প্রাচীন অভিজাতসম্প্রদায়ের উচ্ছেদের এক কারণ। পুত্রের অভাবেই কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। অতএব কন্যার উত্তরাধিকারিত্বই প্রমাণ যে, তিনি পিতা-মাতা হইতে বহুসন্তানবত্তারূপ গুণের বীজ লাভ করেন নাই। ইংরেজ অভিজাতসন্তান-গণ সর্ব্বদাই বিবাহার্থ এইরূপ মহিলাদের অন্বেষণ করেন। দীর্ঘকাল এই প্রকারে অর্থের নিকট বংশবৃদ্ধির উৎসর্গ হইলে, নির্বংশত্ব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এস্থলেও আমার অভিজ্ঞতা হইতে দৃষ্টান্ত দেই। এক পরিবারে তিন ভাই ও দুই ভগিনী ছিলেন; এখন ইঁহারা সকলেই মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মধ্যম ভ্রাতা বিবাহের অল্পপরেই অল্পবয়সে গতাসু হন। এক ভগিনীও নিঃসন্তান অবস্থায় অল্পবয়সে বিধবা হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অতি দীর্ঘজীবী, কিন্তু নিঃসন্তান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা একটুক বেশি বয়সে বিবাহ করেন, কিন্তু পত্নীর যৌবনোদয়ের পর প্রায় ২১।২২ বৎসর জীবিত থাকিয়াও মাত্র তিনটি সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার দুইটিমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। উক্ত ভাই-ভগিনীদিগের এক খুল্লতাত, মাত্র দুই সন্তানের পিতা; এবং তাঁহাদের জন্মের ব্যবধান ৬।৭ বৎসর। এই সব বিবেচনা করিয়া এই বংশে বন্ধ্যাত্ব জন্মগত বলিয়াই মনে হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি পিতা-মাতার গুণ প্রকৃত প্রস্তাবেই সন্তানে প্রবর্ত্তিত হয়, তবে গুণবানের পুত্র অপদার্থ ও অপেক্ষাকৃত গুণহীনের পুত্র গুণবান্ হয় কেন? এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথমত, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অনেক সময়ে গুণবিশেষ দুই এক পুরুষ গুপ্ত থাকিয়া পরে প্রকাশিত হয়। অবস্থাবিশেষে অতিদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষদের গুণও বংশধর-দিগের মধ্যে প্রকাশমান হইয়া থাকে। ডারুইনের পুনরাবির্ভাববাদ (theory of reversion) তাহাই বলে।

দ্বিতীয়ত, পিতামাতার বাহ্য অবস্থা দেখিয়া সন্তানের অবস্থা নির্ণয় করা সর্ব্বদা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে গ্যাল্টনসাহেব একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কোন এক কাউণ্টিতে অধিকসংখ্যক লিবারেল ও অল্প-সংখ্যক র‍্যাডিক্যাল নির্ব্বাচকদিগের মধ্যে সংখ্যাবহুল লিবারেলদের প্রতিনিধিই মনো-নীত হইবেন। অপর এক কাউণ্টিতে অধিকসংখ্যক কন্সার্বেটিব ও অল্পসংখ্যক র‍্যাডিক্যালদিগের মধ্যে অধিকসংখ্যক কন্সার্বেটিবদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হই-বেন। কিন্তু এই দুইটি কাউণ্টি একটিতে পরিণত হইলে লিবারেল ও কন্সার্বেটিবগণ পরস্পরবিরোধী হইয়া পরস্পরের প্রাধান্য-সম্ভাবনা লুপ্ত করিবেন; আর দুই কাউ-ণ্টির র‍্যাডিক্যালের শক্তি মিলিত হওয়াতে তাঁহাদেরই জয় হইবে। যদি এই দুই কাউণ্টিকে দম্পতি কল্পনা করা হয়, সন্তা-নোৎপাদনে তাঁহাদের একীভাব সাধিত

হইবে। তাঁহাদের দৃশ্যমান গুণাবলী লিবারেল ও কন্সর্বেটিব এবং অদৃশ্য সমধর্ম্মাক্রান্ত গুণাবলী র‍্যাডিক্যাল সদৃশ। এরূপ মেলনের ফলে সময়ে সময়ে সাধারণ লোকের অসাধারণ এবং মনীষীর হীনগুণ সন্তান দৃষ্টিগোচর হয়।

তৃতীয়ত, সুবিখ্যাত প্রতিভাশালী লোকদিগের সন্তানগণ পিতার অনুপযুক্ত বলিয়া অনেক সময়েই আমরা অভিযোগ শুনিতে পাই। এই অভিযোগ নিতান্ত অমূলক নহে, বিজ্ঞানও কিয়ৎপরিমাণে ইহার সমর্থন করিতেছে। ক্ষমতাশালী ও প্রতিভাশালী এই দুই শ্রেণীর বড়লোক আছে। এক শ্রেণীর লোক বাল্যকাল হইতে স্বাভাবিক বুদ্ধি, যত্ন ও চেষ্টার ফলে ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করেন। প্রত্যেক সমাজেই ঈদৃশ বহুলোক বর্ত্তমান। ইঁহারাই প্রাকৃত-প্রতিভাশালী বা talented। অন্য এক শ্রেণীর লোক স্বভাবতই স্বস্ব তেজোদীপ্তিতে সমাজের চক্ষু ঝলসাইয়া দেন। প্রথমশ্রেণীর ন্যায় ইঁহাদের তত যত্ন-চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ইঁহাদের মধ্যে কি যেন একটা উদ্দাম ভাব আছে। কোনও সমাজেই এরূপ লোক এক সময়ে অধিক মিলে না। ইহারাই অসামান্যপ্রতিভাশালী বা genius। বায়রণের প্রতিভা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, অসামান্য প্রতিভা বিজ্ঞানের হিসাবে একপ্রকার রোগের মধ্যে। তাই ইহাদের সুসন্তানলাভের আশা অতি অল্প। অনেক সময়ে এইরূপ অসামান্য-প্রতিভাশালী লোকদিগের পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তির উন্মাদাদি রোগ দৃষ্ট হয়। ফলত মানুষের সর্ব্ববিধ অসামান্যত্বই (বা monstrosity) রোগ এবং তাহা বংশরক্ষার ব্যাঘাতজনক। সময়ে সময়ে এই শ্রেণীর লোক অল্পায়ুষ্ক; কেহ নিঃসন্তান; কাহারও সন্তান রুগ্ণ; কেহ কেহ সন্তানোৎপাদনবিরোধী; কাহারও বা জীবন উচ্ছৃঙ্খল। এই কারণেই অসামান্য-প্রতিভাশালী লোকদিগের হীনগুণ সন্তান দেখিয়া পুরুষানুক্রমিকত্বের ব্যতিক্রম বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সন্তানের হীনতাই অসামান্যত্বের একমাত্র অনিবার্য্য ফল।

এ স্থলে কয়েকজন জগদ্বিখ্যাত পুরুষের দৃষ্টান্ত আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। ইঁহাদের প্রতিভার সহিত অসামান্যত্ব বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন না কোন রোগের অস্তিত্ব ছিল কি না, চিন্তনীয়। বার্ণ্‌স্, কীট্‌স্ ও বায়রণ, তিন জনেই অল্পবয়সে গতাসু হন। শঙ্করাচার্য্য এবং আলেকজাণ্ডারও তাই। সিজার ও নেপোলিয়ন কেবলমাত্র এক এক সন্তানের পিতা এবং উভয়েরই সন্তান অল্পবয়সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। মহম্মদের একমাত্র সন্তান ফতেমা। নিউটন জীবনে কখনও বংশরক্ষার চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। পোপ চিররুগ্ণ ছিলেন; কাউপার উন্মত্তও হইয়াছিলেন। ক্লাইবের বাল্যজীবন, যৌবনে আত্মহত্যার চেষ্টা এবং চরমে আত্মহত্যা সুপ্রসিদ্ধ। রুসোর জীবন-কাহিনী ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন। এতদ্ভিন্ন প্রায় সমুদয় উন্নত প্রতিভাশালী কবির জীবন উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্ত।

রুগ্ণ, দুঃশীল, নির্ব্বোধ প্রভৃতির সহিত বিবাহ অযৌক্তিক, একথা কাহাকেও বলিতে হইবে না। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। পাত্রপাত্রীর পিতৃমাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষদের সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য না লইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে পরিণামে অনুতাপ সম্ভবপর। এ কথা স্বীকার্য্য যে, খুব তন্ন তন্ন অনুসন্ধান প্রায় অসম্ভব; কিন্তু এ দিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখা অসম্ভব নহে। বিশেষত আমাদের দেশে অভিভাবকগণ পাত্র বা পাত্রী অন্বেষণ করেন। এই রীতি অনুসারে পূর্ব্বপুরুষদের তথ্যনির্ণয় অতি সহজসাধ্য।

পুরুষানুক্রমিকত্ব-সম্বন্ধে চিন্তা করিলে সহজেই কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যে পরিবারে কোন একটি রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, সেই রোগ-গ্রস্ত অন্য পরিবারের সহিত তাহার বৈবাহিক-সম্বন্ধ-স্থাপন নিতান্ত বিপজ্জনক; কারণ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের শরীরস্থ সামান্য রোগবীজ মিলিত হইয়া দ্বিগুণিত বলে সন্তানদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু রোগবিশেষের বীজদুষ্ট পুরুষ বা রমণী তদ্বিহীন স্ত্রী বা স্বামী লাভ করিলে, সন্তানে সে রোগের প্রাদুর্ভাব অনুভূত নাও হইতে পারে। পিতামাতা উভয়ের পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা সন্তানে গুরুতর অজীর্ণরোগ সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা পিতামাতা উভয়ে সামান্য কাশরোগগ্রস্ত হইলে সন্তানের কঠিন কাশরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। পরন্তু যদি ঘটনাক্রমে উক্ত দম্পতিযুগলের পুরুষ-দ্বয় পরস্পরের স্ত্রীর সহিত বিবাহিত হইতেন, তবে হয় ত সন্তানে কোন কঠিন রোগ জন্মিবার অবসর ঘটিত না। পূর্ব্বে যে গুণাবলীর রূপান্তরী-ভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎপ্রতিও মনোযোগ আবশ্যক। পরস্পরে পরিণমনীয় রোগগুলিকে, সন্তানে সংক্রমণসম্বন্ধে, একই রোগ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বাতব্যাধিগ্রস্তের সন্তানের সহিত মদ্যপায়ীর সন্তানের পরিণয়ের ফলে উন্মাদ, মৃগী, অতি-মাদকাসক্তি, আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি প্রভৃতি নানা-রোগের বিকাশ হইতে পারে। যে বংশ অল্পায়ুষ্ক, তাহাদের দীর্ঘজীবী পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক বাঞ্ছনীয়। দুই মৃতবৎসার সন্তানের পরিণয় নির্ব্বংশত্বের নিদানভূত। দুই পরিবারের একমাত্র সন্তান-দ্বয়ের বিবাহ নিষ্ফল হওয়ার সমধিক সম্ভা-বনা। এই বিষয়ে গ্যাল্টনসাহেবের পূর্ব্ব-লিখিত মত প্রত্যেক অর্থগৃধ্নু পিতামাতার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অতিদীর্ঘ, অতি-স্থূল বা বামনের সহিত বিবাহও যুক্তিসঙ্গত নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারগণের বিধি আলোচনা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মনু বলিতেছেন---

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোহজাবি-ধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ॥৬
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥৭
নোদ্বহেৎ কাপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥৮
যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বা বিজ্ঞায়তে পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্ম্মশঙ্কয়া॥১১

তৃতীয় অধ্যায়।

সপ্তম শ্লোকে অতিসমৃদ্ধিসত্বেও হীনক্রিয়, পুত্রসন্তানবিহীন, বেদাধ্যয়নবিরহিত (আধুনিক মতে মূর্খ), রোমশ এবং অর্শ, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, অপস্মার, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত কুলের কন্যা পরিত্যাজ্যা হইতেছে। 'হীনক্রিয়' শব্দের অর্থ—জাতকর্ম্মাদিবিহীন বলিয়া টীকাকার বলিতেছেন ; ইহার আধুনিক অর্থ—সদাচারবিহীন হইতে পারে। অতিরোমত্ব সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থা নহে ; বিশেষত স্ত্রীলোকের পক্ষে। অতএব পুরুষানুক্রমিকত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, মনুর এই বিধির প্রত্যেক অংশ বিজ্ঞানসম্মত। একাদশ শ্লোকে ভ্রাতৃহীনা ও অজ্ঞাতপিতৃকার পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহাও বিজ্ঞানানুমোদিত। ভ্রাতৃহীনা স্ত্রীর গর্ভে পুত্রসন্তানলাভের আশা অল্প। যাহারা পাত্র বা পাত্রীর পূর্ব্বপুরুষের তত্বানুসন্ধানে অনিচ্ছুক, অজ্ঞাতপিতৃকত্বে বিবাহ নিষেধ করিয়া মনু তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। অষ্টম শ্লোকে কন্যার নিজদেহাদিসম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। মনুর মতে কপিলকেশা, পিঙ্গলাক্ষী, ষড়ঙ্গুল্যাদিবিশিষ্টা প্রযুক্ত বিকলাঙ্গী, অলোমিকা, অতিলোমা, বা পরুষভাষিণীর পাণিগ্রহণ অকর্ত্তব্য। বিকলাঙ্গী ও পরুষভাষিণীর সম্বন্ধে আপত্তির কারণ সুস্পষ্ট। এতদ্ব্যতীত অন্য সকলগুলি বিশেষণই এতদ্দেশে অসামান্যত্ববাচক ; অতএব তদবস্থায় বিবাহও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাগর-কথা।

বিদ্যাসাগরমহাশয় অসুস্থ অবস্থায় অনেক সময়ে ফরাসডাঙায় অবস্থিতি করিতেন। এইরূপ অসুস্থাবস্থায় একদিন এই স্বর্গীয় মহাত্মা জাহ্নবীতীরে রাজপথে পাদচারণা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক একটি বালককে ক্রোড়ে লইয়া সেই পথে বেড়াইতে আসিয়াছে। ছেলেটি দেখিতে মন্দ নয়, মুখখানি দেখিলে, আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। বিদ্যাসাগরমহাশয় ছেলেটিকে দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে ক্রোড়স্থ বালকটির পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল। বালকের দু'খানি পায়ের আকার সমান নহে দেখিয়া, তিনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বালকের দু'খানি পা-ই একরকম ছিল, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একখানি পা শীর্ণ ও ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কে আছে, এবং ইহার চিকিৎসা হইয়াছে কি না?" প্রত্যুত্তরে স্ত্রীলোকটি জানাইল যে, ইহার বাপ-মা সামান্য অবস্থার লোক হইলেও ছেলেটির পাখানির এই দোষ দূর করিবার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, ইহাদের আর কিছুই নাই।" বালকের পিতামাতা বালকের রোগশান্তির জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া নিরাশ হইয়াছেন শুনিয়া, বিদ্যাসাগরমহাশয়ের আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের বাড়ী কত দূরে?" বাড়ী অনেক দূরে নহে, এবং একটু ক্লেশ স্বীকার করিলে, সেই অসুস্থ শরীরে হয় ত এই বালকদের বাড়ী গিয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন, এইরূপ স্থির করিয়া বালকের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বালকের পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ফরাসডাঙায় থাকিয়া সেখানকার চিকিৎসক ও হুগলীর সিভিলসার্জ্জন দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া কোন ফললাভ হয় নাই, লাভের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তখন বিদ্যাসাগরমহাশয় দৈবশক্তি-জাত অনুকম্পার ভারে পরিপূর্ণ বলিয়া আত্মবিস্মৃত, তাই স্থান, সময়, অবস্থা ও লোকবিচার না করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া বসিলেন, "ইহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ভাল ডাক্তার দেখাইলে ত ভাল হইত!" এই প্রশ্ন শুনিয়া বালকের পিতা এই মোটা চাদর গায়ে, উড়িষ্যার আমদানি চেহারার অপরিচিত ব্রাহ্মণকে বাতুল ভাবিবে কি না, মনে মনে তাহারই মীমাংসা করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ বালকের পাখানি আবার একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হয় মেডিকেল কালেজের ডাক্তারদের দেখালে কিছু না কিছু উপকার হইত।" তখন বালকের পিতা বলিল, "মহাশয়, কলিকাতায় লইয়া গিয়া ডাক্তার দেখান আমাদের সাধ্যাতীত।" তখনও বিদ্যাসাগরমহাশয় না ভাবিয়া চিন্তিয়া পূর্ব্ববৎ পরমাত্মীয়ের ন্যায় বলিলেন, "আচ্ছা যদি কেহ কলিকাতায় যাওয়া-আসা, সেখানে থাকা, আর ডাক্তার ও ঔষধের ব্যয় বহন করে, তা হ'লে তোমরা ছেলেটিকে নিয়ে কলিকাতায় যেতে পার কি না?" বালকের পিতা ব্রাহ্মণের বাহিরের অবস্থা দেখিয়া ও প্রস্তাবের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া কি উত্তর দিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। এমন সময়ে গৃহস্থের দ্বারে এক একটি করিয়া লোক দাঁড়াইতেছে দেখিয়া, বিদ্যাসাগরমহাশয় তখনই ধরা পড়িবার ভয়ে নিজের বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া, এবং সম্ভব ও সুবিধা হইলে কলিকাতায় যাইতে পারিবে কি না, সেই সংবাদ অপরাহ্নে জানাইতে অনুরোধ করিয়া, ত্বরায় গাঢাকা দিলেন এবং অচিরে অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণের চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের দ্বারে একটু জনতা হইল। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের কেহই বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে চিনিত না। কিন্তু যে বাড়ীর ঠিকানা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই গোল বাধিয়া উঠিল। কেহ বলে, "ও বাড়ীতে

এক রাজা আছে।" কেহ বলে, "কলিকাতার এক বড় লোক ঐ বাড়ীতে মাঝে মাঝে এসে থাকে।" এইরূপ নানা জল্পনায় ক্ষণকাল যাইতে না যাইতে ঐ পল্লীর একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক অপরিচিত ব্রাহ্মণের উক্তিসকলের পুনরাবৃত্তি শ্রবণ করিয়া এবং নির্দ্দিষ্ট বাটী কোন্‌খানি, তাহা অবগত হইয়া বলিলেন, "তোমরা কেহ চিনিতে পার নাই, বিদ্যা-সাগরমহাশয় আসিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এমন কথা আর কে বলিতে পারে? অপ-রাহ্ণে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। এবং তিনি যেরূপ বলিবেন, তাহা করিলে উপকার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, জানিবে।" তখন চারিদিকে 'বিদ্যাসাগর' 'বিদ্যাসাগর' বলিয়া একটা 'হৈ চৈ' পড়িয়া গেল। এবং অতি অল্পসময়মধ্যে ঐ বালকের খঞ্জত্ব ও বিদ্যাসাগরমহাশয়ের নাম নানা আকারে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বালকের পিতা বালকের মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধ্যার সময় নির্দ্দিষ্ট বাটীতে ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিন্তু আগন্তুক কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলিতে পারিতেছেন না দেখিয়া বিদ্যাসাগর-মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যেটুকু গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেটুকু ধরা পড়িয়াছে; তিনি যে তিনি, তাহা ইহারা বুঝিয়াছে। তখন বিদ্যাসাগরমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি ঠিক করিলে?" বালকের পিতা করজোড়ে ক্ষমা চাহিয়া বলিল, "আজ আমার দরজায় আপনার পায়ের ধূলা পড়িয়াছিল, এ সৌভাগ্য জানিতে না পারিয়া আমি অবজ্ঞা করিয়াছি, আগে আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন, তাহার পর অন্য কথা।" বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিলেন, "তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর নাই,—সুতরাং তোমার অপরাধও হয় নাই। এখন বল দেখি, কি স্থির করিয়াছ?" বালকের পিতা বলিল, "আমরা নিরুপায়, আপনি কোন ব্যবস্থা করিলে আমরা মাথা পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিব।" তখন হর্ষোৎ-ফুল্লনয়নে বালকের পিতার দিকে তাকাইয়া সাগর বলিলেন, "তবে তোমাদের এখানকার সব বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় যাইবার ও সেখানে কিছুদিন থাকিবার আয়োজন কর; আর কবে যাবে, তাহা আমাকে বলিয়া যাইবে, তাহা হইলে আমি গিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিব।" তখন বালকের পিতা পুনরায় বলিল, "আজ্ঞা সেখানে থাকিতে হবে? তা হলে যে অনেক টাকা খরচ হবে, এত টাকা—।" সাগর বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার কেন?"

আমরা এই ঘটনার সমগ্রভাগ তাঁহার মুখে না শুনিলেও, ঘটনাটি সত্য কি না, জানিবার জন্য প্রকারান্তরে বিষয়টি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ফরাসডাঙায় সেই ছোট ছেলেটির পাখানি কি সারিয়াছে?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না, একবারে সারে নাই, তবে যেমনটি ছিল, তেমনটি থাকিবে, আর বাড়িবে না। এইটুকুই লাভ।" মানুষের সুখসুবিধাটা তিনি এতই দেখিতে শিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা যেখানে যেটুকু মানুষের লাভের সম্ভাবনা ছিল, প্রাণপণে সেটুকু করিতে চেষ্টা করিতেন।

আমরা জানি, তিনি এই বালকটির জন্য এই পরিবারটিকে কলিকাতায় রাখিয়া প্রায় ৩।৪ মাস কাল বাড়ীভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সাহেবডাক্তারের ১৬৲ টাকা করিয়া দর্শনী ও ঔষধাদির ব্যয় সর্ব্বসমেত ৩।৪ শত টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মানুষ সুস্থ-শরীরে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুক, এজন্য তাঁহার অদেয় কিছুই ছিল না। এমন কি, যাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত, সংসারে যাহার মুখদর্শন করাও অন্যায় মনে করিতেন, সে ব্যক্তিও নিরাপদে কালযাপন করুক, এটিও তাঁহার স্বভাবগুণে প্রিয়কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। এরূপ একটি ঘটনাও আমরা অবগত আছি। একটি যুবক তাঁহারই অনুরোধে কর্ম্ম পাইয়া তাঁহার এক আত্মীয়ের নিকট কর্ম্ম করে। সে ব্যক্তি আপনার আচরণ দ্বারা প্রভুর সমূহ অনিষ্ট-সাধন করিয়া কর্ম্মচ্যুত হয়। তাহার অসদাচরণের কথা বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কর্ণ-গোচর হইলে, তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হইয়া একটি বন্ধুর দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "সে যেন আর তাঁহার সম্মুখে না আসে।" আমরা স্বকর্ণে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "আর আমার নিকট তাহার নাম করিও না।" এইরূপ তীব্র বিরক্তির দীর্ঘ-স্থায়িত্বের মধ্যে এক সময়ে এই ব্যক্তি দারুণ রোগে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। এই ব্যক্তির নিদারুণ পীড়ার সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি স্বয়ং তাহার সংবাদ লইতে গিয়াছেন। সংবাদ লইয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, ঔষধ ও পথ্যাদির জন্য অর্থ-সাহায্য করিয়াও যেন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইল না, তাই আবার সর্ব্বদা তাহার পীড়ার সংবাদ লইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। কর্ম্মসূত্রে যাহার উপর এতদূর বিরক্ত যে, তাহার নামটি পর্য্যন্ত শুনিতে অনিচ্ছুক, সে রোগমুক্ত হইয়া সুখে সংসার করুক এবং স্ত্রীপুত্রের সুখসাধন করুক, এজন্য ব্যস্ত। কেবল তাহাই নহে, ঘরের পয়সা খরচ করিয়া তাহাকে বাঁচাইতে চায়, এমন লোক সংসারে আর কয়জন মিলে, আমরা জানি না। আমরা শ্রদ্ধাসহকারে সে মহামূল্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি; ক্রমে ক্রমে সেগুলি বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে উপহার দিব।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেকাধ্বনি।

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ূরের ডাক শুনিয়া আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—আমি ঐ ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারি না; কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন, বুঝিবার জো নাই।

কবি যখন বসন্তের কুহুস্বর এবং বর্ষার কেকা—দুটাকেই সমান আদর দিয়াছেন, তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝি বা কৈবল্যদশাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার কাছে ভাল ও মন্দ, ললিত ও কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লীর ঝঙ্কারকে কেহ মধুর বলিতে পারেন না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকেও উপেক্ষা করেন নাই। প্রেয়সীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু ষড়্‌ঋতুর মহাসঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন।

এক প্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্ত্তমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া, মন তাহার সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে—ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া; এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে;—বলে, ও নিতান্তই মিষ্ট, কেবলি মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোন প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়। মন পারতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের ঋণ স্বীকার করিতে চায় না।

যাহারা গানের সমজ্‌দার, এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসা দ্বারা অপমানিত করে;—মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না; সে বলে, আমাকে শুক্‌নো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব। গানের উপযুক্ত সমজ্‌দার বলে, বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইয়ো না,—আমাকে শুক্‌নো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুসি হইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়া দিব। বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিষের মূল্য নামাইয়া দেয়।

মন বলে, ইন্দ্রিয় যে সুখটুকু আদায় করে, সেটুকু আমি উপেক্ষা করিতেও পারি, সেটুকু কল্পনা করিয়া লইবার শক্তিও আমায় আছে, অতএব সেটার অনেকখানি বাদ দিলেই আমি সম্মানিত হই।

যাহা সহজেই মিষ্ট, তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, আর কেন ঢের হইয়াছে!

এই জন্য যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিক্‌কার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদূর নহে, তাহা সে বোঝে; এইজন্য তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে, অথচ তখনো সে তাহার সীমা পায় নাই—এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমজ্‌দারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত-ব্যাপার বলিয়া মনে করে, অনেকসময় তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যাসম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, তুমি কি বুঝিবে! আর এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর কেহ বোঝে না!

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্ত্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্ত্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতেই চট্ করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। দেশে ব্যাপক না হইতে পারে, কালে ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে—অভ্যাসের সঙ্গে ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর, তাহা আপাততঃ বহুলোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে—তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে, তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা" ভাল বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়—তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। ললিতলবঙ্গলতার পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক্:—

> আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
> বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
> পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
> সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষর-বহুল,—তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিত-লবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন

এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। "পর্য্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্রা"—ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থান-পতন আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মত অতিপ্রত্যক্ষ নহে—তাহা নিগূঢ়; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুসি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য্য, তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে—সে সঙ্গীত সমস্ত শব্দসঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়,—মনে হয়, যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে, সে কোন মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে, সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ, কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র। নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারি গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমাল-তালী-বনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্দ্ধবাহু শতসহস্র শিশুর মত অগণ্য শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত মর্ম্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্যক্রেঙ্কার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান,—কান তাহার মাধুর্য্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকখানি পায়;—সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারব এইজন্যই জড়িত। তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিকবধূকে ব্যাকুল করে না—তাহা সমস্ত বর্ষার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বাহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, তাহা জল-স্থল-আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চ-

কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মত প্রকৃতির নিগূঢ়স্পর্শাধীন। সেই জন্য যৌবনাবেশ-বিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নর-নারীর প্রেম কি কি সুরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু আবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগান,—ফুল-ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক। তাই যে কেকারব বর্ষাঋতুর নিখাদ সুর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড় চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোন বর্ণবৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই,—শচীর কোন প্রাচীন কিঙ্করী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসর বর্ণ। নানাশস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্ব-ব্যাপি-কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন-বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্ব্বে ক্ষেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপ জ্যোতি-হীন, গতিহীন, কর্ম্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ঐ বর্ণহীন মেঘের মত, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মত, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডিকে আরো ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেয়ে। তাহা নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গে ঝিল্লীরব ভালরূপ মেশে; কারণ, যেমন মেঘ, যেমন ছায়া, তেমনি ঝিল্লীরব আর একটা আচ্ছাদনবিশেষ; তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ; তাহা বর্ষা-নিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।

সার সত্যের-আলোচনা।

সত্য-জগৎ এবং ভাব-জগৎ।

ব্রহ্মাণ্ড আশ্চর্য্য এবং তাহার আদি, অন্ত এবং মধ্য, সকলই আশ্চর্য্য। ব্রহ্মাণ্ড এক বই দুই নহে; অথচ তাহাই, এক-ব্রহ্মাণ্ডই, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড। একই সূর্য্য, যাহা উদিতও হয় না—অস্তমিতও হয় না, তাহা একই সময়ে পৃথিবীর একস্থানে নবোদিত প্রাতঃসূর্য্য, আর-এক স্থানে প্রখর মধ্যাহ্ন-সূর্য্য, আর-এক স্থানে অস্তোন্মুখ দিনান্ত-সূর্য্য। মূলে যাহা একই অভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড, ফলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড। একই ব্রহ্মাণ্ড সুখী ব্যক্তির সুখের পুষ্পোদ্যান, দুঃখী ব্যক্তির দুঃখের কণ্টক-বন; কর্ম্মীর কর্ম্ম-ক্ষেত্র, জ্ঞানীর আলোচনা-ক্ষেত্র; কবির নাট্য-শালা, উদাসীনের পান্থ-শালা; শুষ্ক তার্কিকের মরুভূমি, দুরাকাঙ্ক্ষের মৃগ-তৃষ্ণা; সাধকের গুরুগৃহ, ভক্তের পিতৃগৃহ; সাধু-সজ্জনের পুণ্যতীর্থ, মুক্ত পুরুষের ব্রহ্ম-ধাম। গোড়া'র সেই-যে এক অভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড, তাহাই সত্য-জগৎ; আর, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ঐ-যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগৎ।

ভাব কি? এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা ভাবনার বীজ; এবং আর-এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা ভাবনার ফল। ভাবনা-শব্দ ভূ-ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভবন-শব্দের অর্থ হওন; ভাবন-শব্দের অর্থ হওয়ানো। আমি যদি আমার মনের মধ্যে একটা আম্রফল হওয়াই, তবে আমার সেই মানসিক হওয়ানো-ক্রিয়ার নাম আম্র-বিষয়ক-ভাবন-ক্রিয়া, সংক্ষেপে—আম্র-ভাবনা; আর আম্রের যে একটা আদর্শ-লিপি বা নক্সা * আমার মনের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রাখা আছে, অর্থাৎ প্রলম্ব-গোলাকৃতি পাণ্ডুরচ্ছবি উদ্ভিজ্জ পদার্থ এইরূপ যে-একটি নক্সা পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রাখা আছে, তাহাই আম্র-ভাবনার বীজ, তাহারই নাম আম্রে ভাব। কিন্তু একটু পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, এক দিক্ দিয়া দেখিলে যাহা ভাবনার বীজ, আর-এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা ভাবনার ফল। মনে কর, দেব-দত্ত-নামক এক ব্যক্তিকে অনেক-দিন পূর্ব্বে আমি জাদু-ঘরে দেখিয়াছিলাম। সেই দিন হইতে তাহার মূর্ত্তির একটা নক্সা আমার মনোমধ্যে জাগিতেছে। মাঝে মাঝে সেই নক্সা দৃষ্টে তাহার সেই মূর্ত্তিটি আমি আমার মনের মধ্যে উদ্ভাবনা করি অর্থাৎ ভাবনা করি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তাহাকে

* নক্সা স্বতন্ত্র, ছবি স্বতন্ত্র, এটা যেন মনে থাকে। বাড়ীর নক্সা বাড়ীর ছবি নহে।

রাস্তার ধারে একটা অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে দেখিলাম; কিন্তু চেনো-চেনো করিয়াও চিনিতে পারিলাম না। গতকল্য আমি তাহাকে একটা সভার মাঝখানে দেখিতে পাইয়া কিয়ৎকাল তাহার মুখের প্রতি ঠাহর করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিলাম যে, ইনি দেবদত্ত। দেবদত্তের সেই পুরাতন নক্‌সা, যাহা এ-যাবৎকাল ভাবনার বীজরূপে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তাহা এক্ষণে ফলরূপে আমার বুদ্ধিতে আরূঢ় হইল; সে ফলের দার্শনিক নাম প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ দোমেটে রকমের জানা—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Recognition। প্রত্যভিজ্ঞানই Recognitionই বীজ-জ্ঞানের Cognitionএর ফলাভিব্যক্তি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ভাবনার গোড়া'র সূত্র বা আদর্শলিপি বা নক্‌সা, যাহার নাম দেওয়া হইয়া থাকে ভাব, তাহা বস্তু একই—কেবল অবস্থাভেদে কখনো বা বীজরূপে লুক্কায়িত থাকে, কখনো বা ফলরূপে আবির্ভূত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যাহাকে আমরা বলি ভাব, তাহা বিবিক্ত (abstract) অবস্থায় ভাবনার বীজ, এবং 'মূর্ত্তিমান্' (concrete) অবস্থায় ভাবনার ফল।

আমরা যাহাকে যে-ভাবে দেখি, সে প্রকৃত পক্ষে সে ভাবের মনুষ্য না হইলেও, আমরা তাহাকে আমাদের মনোমধ্যে সেই ভাবের মত করিয়া ভাবন করি অর্থাৎ হওয়াই। দেবদত্ত আমার পরম বন্ধু, তাই আমি তাহাকে সদ্‌ভাবে দেখি; তোমার সহিত তাহার বিষয়-ঘটিত বিবাদ চলিতেছে, তাই তুমি তাহাকে অসদ্‌ভাবে দেখ। দেবদত্তের উকিল ধনঞ্জয় দেবদত্তের সোণার কাটি রূপার কাটি। ধনঞ্জয় যখন দেবদত্তকে সাধুবাদ দিয়া স্বর্গে তোলে, তখন দেবদত্ত আপনাকে নরোত্তম মনে করে; যখন ধিক্কার দিয়া পাতালে নাবায়, তখন দেবদত্ত আপনাকে নরাধম মনে করে। দেবদত্ত তোমার নিকটে দেবতাবিশেষ, আমার নিকটে দৈত্য-বিশেষ; এবং তাহার আপনার নিকটে কখনো বা নরোত্তম, কখনো বা নরাধম, ধনঞ্জয় যখন স্বর্গে তোলে, তখন নরোত্তম—যখন পাতালে নাবায়, তখন নরাধম। দেবদত্ত কিন্তু তুমি তাহাকে দৈত্য বলিলেও দৈত্য হয় না, আমি তাহাকে দেবতা বলিলেও দেবতা হয় না; আপনি আপনাকে নরোত্তম মনে করিলেও নরোত্তম হয় না—নরাধম মনে করিলেও নরাধম হয় না; দেবদত্ত যাহা আছে, তাহাই আছে। দেবদত্ত তোমার, আমার এবং তাহার আপনার নিকটে হইয়া দাঁড়াইতেছে ইহা, উহা, তাহা, সাত সতেরো; আছে কিন্তু যে দেবদত্ত সেই দেবদত্ত। হওয়া'র মূলে 'আছে' রহিয়াছে; ভবতি'র মূলে 'অস্তি' রহিয়াছে; ভাবের মূলে সত্য রহিয়াছে। সত্যই ভাবের ভিত্তিমূল এবং সর্ব্বস্ব।

সত্য কি? না যাহা আমাদের কাহারো ভাবন-ক্রিয়ার অর্থাৎ হওয়ানো-ক্রিয়ার—ভাবনার—অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব হইতেই আছে। সত্য সমুদ্র; ভাব সমুদ্রের দৃশ্য-

মান উপরি-তল; ভাবনা সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলা। সত্য-শব্দ সৎশব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা আজও আছে, কালও আছে, চিরকালই আছে, তাহাই সৎশব্দের বাচ্য; আর যাহা সতের অন্তঃপাতী অর্থাৎ সৎসম্পর্কীয়,তাহাই সত্য-শব্দের বাচ্য। যাহা সত্য, তাহা আমি ভাবিলেও আছে—না ভাবিলেও আছে; পক্ষান্তরে, যাহা শুধু কেবল আমার একটা মনের ভাব, তাহা আমি ভাবিলেই আছে—না ভাবিলে নাই। দুয়ের এইরূপ আভিধানিক প্রভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, গোড়া'র সেই যে এক অভিন্ন জগৎ, যাহা আমি ভাবিলেও আছে—না ভাবিলেও আছে, তাহার নাম দেওয়া হইল সত্য-জগৎ; আর, সেই একই সত্য-জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ, যাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহার নাম দেওয়া হইল, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগৎ।

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভাব-জগতের অধিষ্ঠাতা যে রাজা, চাসা, পণ্ডিত, মূর্খ, বণিক্‌, কারীকর প্রভৃতি সেই সেই জীবাত্মা, তা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাস্য এখন এই যে, ভাব-জগতেরই কি কেবল অধিষ্ঠাতা আত্মা আছে? সত্য-জগতের অধিষ্ঠাতা কেহ কি নাই? সত্য-জগতের অধিষ্ঠাতা অবশ্যই কেহ আছেন। কেন না,এক-অদ্বিতীয় সত্য-জগতে যদি এক-অদ্বিতীয় আত্মা না থাকেন, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রতি-রূপ-জগতে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আসিবে কোথা হইতে? যদি কোনো এক রাজসভার চতুষ্পার্শ্বস্থিত শুভ্র, মলিন, ভিন্ন ভিন্ন দর্পণের মধ্যগত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব-সভায় স্পষ্টাস্পষ্ট ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার রাজমূর্ত্তি বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাতেই যেমন প্রমাণ হয় যে, একই রাজ-সভায় একই রাজা অধিষ্ঠান করিতেছেন; তেমনি এটা যখন সুনিশ্চিত যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগতে বা প্রতিরূপ-জগতে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা অধিষ্ঠান করিতেছে, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, একই অদ্বিতীয় সত্য-জগতে একই অদ্বিতীয় আত্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন। ভাবিয়া দেখিলে সত্য-জগৎ এবং ভাব-জগৎ দুই জগৎ নহে—প্রত্যুত একই জগৎ। একই জগৎ একদিকে সৎস্বরূপের অধিষ্ঠানে সনাথ এবং তাঁহার শক্তিতে সত্তাবান্‌, সুতরাং সত্য অর্থাৎ সৎসম্পর্কীয়; আর-এক দিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত—সুতরাং ভিন্ন-ভিন্ন-ব্যক্তিগত ভাব।

ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞান।

একই সত্য-জগৎ এক ব্যক্তির নিকটে সুখের সংসার সাজিয়া উপস্থিত হয়, আর-এক ব্যক্তির নিকটে দুঃখের অরণ্য সাজিয়া উপস্থিত হয়। সত্য-জগৎ যাহার নিকটে যে-সময়ে যে-বেশে উপস্থিত হয়, সে আপনিও আপনার নিকটে সেই সময়ে সেই বেশেরই দেখিয়া-শেখা-সদৃশ বেশে উপস্থিত হয়। সত্য-জগৎ যাহার নিকটে সুখের সংসার সাজিয়া উপস্থিত হয়, সে আপনার নিকটে

আপনি সুখী সাজিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ মনে ভাবে যে, আমি সুখী। সত্য-জগৎ যাহার নিকটে দুঃখের অরণ্য সাজিয়া উপস্থিত হয়, সে আপনার নিকটে আপনি দুঃখী সাজিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ মনে ভাবে যে, আমি দুঃখী। প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রা-ভঙ্গের সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আপনার আপনার নিকটে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাজ সাজিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পরে চিরাভ্যস্ত সংস্কারের রঙ্গশালাটিকে কল্পনার বিচিত্র চিত্রসজ্জায় এবং সদসৎ-বিবেচনার তাড়িত-প্রদীপে সজ্জিত করিয়া আপনার আপনার নির্দ্দিষ্ট পালা আপনার আপনার নিকটে অভিনয় করিতে আরম্ভ করে; আরম্ভ করিয়া কখনো বা আপনাকে হাসায়, কখনো বা কাঁদায়, কখনো বা আপনাকে নাচাইয়া তোলে, কখনো বা দমাইয়া দ্যায়, কখনো বা আপনার নিকট হইতে বাহবা পাইয়া ফুলিয়া দ্বিগুণ হয়, কখনো বা ধিক্কার খাইয়া কুঁকড়িয়া অর্দ্ধেক হয়। তাহার পরে বিশ্রামের যবনিকা-পতনের সময় হইলে, দিনের সঙ্গে যখন দিনগত পাপ ক্রমে ক্রমে অলক্ষিত-ভাবে সরিয়া পড়ে, আর সেই সঙ্গে যখন অভিনেতৃগণের রঙ্গের বেশ-ভূষা স্ব স্ব গাত্র হইতে শিথিল হইয়া খসিয়া পড়ে, তখন রাজা অরাজা হয়, দীন অদীন হয়, বিদ্বান্ অবিদ্বান্ হয়, মূর্খ অমূর্খ হয়, ইত্যাদি; তখন সকলেই একই অভিন্ন বেশে—সর্ব্বপ্রথমে যে-বেশে মাতৃগর্ভে লুক্কায়িত ছিল, সেই আদিম তমসাচ্ছন্ন বেশে—অগাধ সুষুপ্তির গর্ভে নিলীন হইয়া যায়।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে যখন আমরা সুখনিদ্রার মাতৃগর্ভ হইতে পূর্ব্বপরিচিত ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমরা আপনাকে আপনাকে কর্ত্তা এবং ভোক্তা বলিয়া স্ব স্ব জ্ঞানে উপলব্ধি করি। রাত্রিকালের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বেশ্ আমি বুঝিতে পারি যে, আমি আপনিই নিশ্বাস টানিতেছি, প্রশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছি; ও-দুই কার্য্যের আমি আপনিই কর্ত্তা। এটাও তখন বুঝিতে পারি যে, আমার আপনারই ঐ দুই কার্য্যের গুণে আমি আপনিই প্রাণ পাইয়া সুখী হইতেছি; আমার আপনার স্বাস্থ্য-সুখের আমি আপনিই ভোক্তা। জাগ্রৎকালে যখন আমি আপনাকে কর্ত্তা এবং ভোক্তা বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তখন আপনাকে আপনি ঐরূপে জ্ঞানে উপলব্ধি-করা-সূত্রে (কর্ত্তা এবং ভোক্তা তো আছিই—অধিকন্তু) জ্ঞাতা হইয়া দাঁড়াই। আর, তখন আমি সেই কর্ত্তা, ভোক্তা এবং জ্ঞাতা পুরুষের নাম দিই আত্মা। এটা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, কি জাগ্রৎকালে, কি সুষুপ্তি-কালে, উভয় কালেই আমি একই কর্ত্তা—একই ভোক্তা। তার সাক্ষী—সুষুপ্তি-কালের অচেতন অবস্থাতেও আমি যথাক্রমে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ এবং বিসর্জ্জন করি, সুতরাং তখনও আমি নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জনের কর্ত্তা; তা ছাড়া, আমার মন বলিতেছে যে, তখনও আমি আরাম উপভোগ করি—তখনো আমি আরামের ভোক্তা। কিন্তু তুমি চাও প্রমাণ! তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্মরণের আছ্-ঘরে প্রবেশ করিয়া সুষুপ্তির কোটার অন্ধি-সন্ধি হাতড়াইতে লাগিলাম। প্রয়াণের মধ্যে পাইলাম—পুরাতন তালপত্রের লিপিতে

দেবনাগর অক্ষরে লেখা একটি বেদবাক্য। বাক্যটি শুধু এই যে, "সুখমহমস্বাপ্সম্"— আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। আমি হর্ষোৎফুল্ল নয়নে সেই লিপিখানি সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি তোমাকে যখন তাহা দেখাইতে গেলাম, তখন দেখি যে, বেলা তখন দ্বিপ্রহর, আর, তুমি ভোজনান্তে খস্‌খসের টাটির দুর্গের অভ্যন্তরে দোদুল্যমান পাখার বাতাসের সুস্নিগ্ধ হিল্লোলে শিয়রের বালিশে মাথা দিয়া হাত-পা ছড়াইয়া নিদ্রায় অচেতন। আর যা-কিছু আমার দোষ থাকুক বা না থাকুক—পারস্যভাষায় যাহাকে বলে "জল্লাদ," তাহা আমি নহি—আমার শরীরে মায়ামমতা আছে, সুখনিদ্রা যে কি সুদুর্লভ বহুমূল্য সামগ্রী, সে-বিষয়েও আমি ভুক্তভোগী; কিন্তু তথাপি—এত কষ্টে যাহা আমি সংগ্রহ করিলাম, তাহা কাল-বিলম্বে বাসী হইয়া যাইতে পারে এই ভয় এবং "ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্" অর্থাৎ প্রমাণ-প্রদর্শন-জনিত পুণ্য-ফলের লোভ, এই দুই নাছোড়-বন্দ পদাতিকের পাল্লায় পড়িয়া আমি তোমার কাণের কাছে চীৎকার-ধ্বনি করিয়া এবং তোমার বাহুমূলে পুনঃপুন ধাক্কা প্রদান করিয়া তোমাকে অনেক কষ্টে জাগাইয়া তুলিলাম! ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের আলিঙ্গন-পাশ হইতে অর্দ্ধভুক্ত মৃগ সিংহকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে সে যেমন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, তোমার আলিঙ্গন-পাশ হইতে আমি তেমনি-একটা সাধের সামগ্রী অপহরণ করা'তে তুমি ঠিক তেমনি-তর অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া "অসভ্য! বর্ব্বর! কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই!" প্রভৃতি গর্জ্জনধ্বনি আরম্ভ করিলে। অতএব প্রমাণ হইল যে, তোমার নিদ্রাবস্থায় তুমি সুষুপ্তির পরমানন্দ ভোগ করিতেছিলে। আরেকটি কথা এই যে, নিদ্রাকালে কফ-কাশের উপদ্রবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথরোধ হইলে নিদ্রিত বালক ক্রন্দন করিয়া জাগিয়া ওঠে, এটা যখন সকলেরই দেখা কথা, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, নিদ্রাকালে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার কোনোপ্রকার ব্যতিক্রম ঘটলে নিদ্রিত ব্যক্তির সুখভোগের ব্যাঘাত হয়; ইহারই অভিন্নার্থ পাঠান্তর এই যে, নিদ্রাকালে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া যথানিয়মে চলিতে থাকিলে, নিদ্রিত ব্যক্তির সুখভোগ অব্যাহত থাকে। অতএব এটা স্থির যে, কি জাগ্রৎকালে, কি সুষুপ্তিকালে, উভয় কালেই আত্মা কর্ত্তা এবং ভোক্তা। নিশ্বাসের আকর্ষণ তথৈব প্রশ্বাসের বিসর্জ্জন, এই দুই কার্য্যের কর্ত্তা; এবং তজ্জনিত স্বাস্থ্য-সুখের অর্থাৎ প্রাণগত আরামের ভোক্তা। এ যেন মানিলাম—মানিলাম যে, সুষুপ্তির অচেতন অবস্থাতেও আমি কর্ত্তা এবং ভোক্তা দুইই; কিন্তু এটাও তো দেখা উচিত যে, জাগ্রৎকালে একদিকে আমি যেমন কর্ত্তা এবং ভোক্তা, আর-এক দিকে তেমনি আমি জানিতে পারি যে, আমি কর্ত্তা এবং ভোক্তা; জানিতে যখন পারি, তখন কাজেই তৎকালে আমি জ্ঞাতা। সুষুপ্তি-কালে আমি তো জানিতে পারি না যে, আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা; জানিতে যখন পারি না—তখন সে সময়ে আমি যে, সত্যসত্যই কর্ত্তা বা ভোক্তা, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে,

সুষুপ্তিকালেও নিদ্রিত ব্যক্তির জ্ঞান তলে তলে কার্য্য করে—সুষুপ্তি-কালেও আত্মা জ্ঞাতা পুরুষ। যদি বল যে, তাহার প্রমাণ কি? তবে বেদান্তদর্শন তাহার যেরূপ প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, তাহা বলিতেছি;—তাহা একে আমাদের দেশের ঘরের সামগ্রী, তাহাতে এমনি নিখুঁত, পরিষ্কার এবং সুসঙ্গত যে, তাহার উপরে কাহারো কোনো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না।

সৌষুপ্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে

বৈদান্তিক প্রমাণ।

(১) মূল কথা অর্থাৎ

Major premise।

যে-কোনো বিষয় হউক্ না কেন, তাহার উপস্থিতি-কালে তাহা যে-ব্যক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞানে প্রতিভাত না হয়, তাহার অনুপস্থিতি-কালে তাহা সে-ব্যক্তির স্মরণে আবির্ভূত হইতে পারে না। তা'র সাক্ষী;—শনিবারে যে-দর্শক নাট্যাভিনয়-দৃষ্টে সাক্ষাৎ জ্ঞানে আনন্দ উপলব্ধি না করে, পরদিন রবিবারে সে-দর্শকের স্মরণে "আমি গতকল্য নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছি," এ কথাটি আবির্ভূত হইতে পারে না।

(২) দেখা কথা অর্থাৎ

Minor premise।

সুখ-নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার সময়, "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এই বৃত্তান্তটি সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মরণে আবির্ভূত হয়।

(৩) ফল কথা অর্থাৎ

Conclusion।

অতএব প্রমাণ হইল যে, সুষুপ্তি-সুখের উপস্থিতি-কালে সে সুখ সুষুপ্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞানে প্রতিভাত হয়।

আলোচকের মন্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, সুষুপ্তি-কালেও আত্মা কর্ত্তা এবং ভোক্তা দুইই; বেদান্তদর্শনের উপরি-উক্ত যুক্তি অনুসারে অধিকন্তু প্রমাণ হইল এই যে, সে সময়ে আত্মা ভোক্তা তো আছেই, তা ছাড়া সে জানিতেছে যে, আমি ভোক্তা—জানিতেছে যে, আমি সুখ-ভোগে নিমগ্ন আছি। কেন না, যে-সুখের ভোগের সময় যে ব্যক্তি না জানে যে আমি সুখ-ভোগ করিতেছি, সে-সুখের ভোগের পর্য্যবসান-কালে সে ব্যক্তির স্মরণ হইতে পারে না যে, আমি সুখ-ভোগে নিমগ্ন ছিলাম। অতএব, এটা স্থির যে, সুষুপ্তি-কালে আত্মা জানিতেছে যে, "আমি ভোক্তা।" তবেই হইতেছে যে, সুষুপ্তি-কালেও আত্মা শুধু কেবল কর্ত্তা এবং ভোক্তা হইয়াই ক্ষান্ত নহে, অধিকন্তু আত্মা জ্ঞাতা।

এই তো দেখা গেল যে, সুষুপ্তি-কালেও আত্মার জ্ঞান সমূলে বিলুপ্ত হয় না—সুষুপ্তি-কালেও আত্মা জ্ঞাতা। এই সঙ্গে এটাও কিন্তু দেখা উচিত যে, জাগ্রৎকালের জ্ঞান, স্বপ্নকালের জ্ঞান এবং সুষুপ্তিকালের জ্ঞান, তিন কালের জ্ঞান তিন-প্রকার-লক্ষণাক্রান্ত। সে তিনপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি; সে প্রভেদের গোড়া'র কথাই বা কি অর্থাৎ

সে প্রভেদ কিসের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এবং তাহার দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত ; এ সমস্ত বিষয় আগামী বারের আলোচনার পথের সম্বল হইবে—সে-ই ভাল, এক্ষণে তাহা ভাণ্ডারে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুনয়।

ভাল বাসি কি না বাসি—তুমি সুধায়ো না,
তুমি সুধায়ো না!
এখনো যে সুষুপ্ত ভুবন,
ফুলগন্ধে ঢুলুঢুলু বন,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে স্বপনের গুপ্ত আনাগোনা!
তুমি সুধায়ো না, তুমি সুধায়ো না!

আবেগে কাঁপিছে হিয়া—কিছু সুধায়ো না,
মোরে সুধায়ো না!
অরুণ উঠিছে ফুটি' ধীরে
নিশান্তের নিঃশব্দ তিমিরে,
নিস্তব্ধ মেঘের প্রান্তে ফলাইছে সোনা।
তুমি সুধায়ো না—তুমি সুধায়ো না।

ভাষা অশ্রুজলে ভাসে—মোরে সুধায়ো না,
কিছু সুধায়ো না!
শিশিরশীতল অন্ধকারে
অস্তশিখরের পরপারে
তোমার ও বীণাবেণু লভুক্ সান্ত্বনা!
তুমি সুধায়ো না—তুমি সুধায়ো না!

ওগো ক্ষমা দাও মনে—আহা সুধায়ো না,
কিছু সুধায়ো না!
অধরের দ্বার রোধ করি
বসায়েছি কঠিন প্রহরী,
সেই ভালো, দুজনায় আধ জানা-শোনা।
তুমি সুধায়ো না, তুমি সুধায়োনা!

বঁধু, সখা, দেবতা গো—আর সুধায়ো না,
মোরে সুধায়ো না!
ধৈর্য্যহারা ওগো কুতূহলী!
কি বলিতে কি জানি কি বলি!
থাক্ শূন্য মন্দিরেতে মৌন আরাধনা!
তুমি সুধায়ো না—তুমি সুধায়ো না!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

রাষ্ট্র ও নেশন।

বিংশ শতাব্দীতে যুগধর্ম্ম—রাষ্ট্র ও নেশন এই দুই ঐতিহাসিক পদার্থ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। বঙ্গদর্শন নবজীবন লাভ করিয়াই এই যুগধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা বঙ্গদর্শনের অতীত জীবনের সহিত অসঙ্গত নহে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ভারতবর্ষে এই দুইটি পদার্থেরই কোন কালে অস্তিত্ব ছিল না। সাহাবুদ্দিন ঘোরিকে যদি ভারতবর্ষ-ব্যাপী মহারাষ্ট্রের সম্মুখীন হইতে হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। এবং ভারতবর্ষে নেশন থাকিলে পৃথিবীর ইতিহাসও কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, তাহা বলা যায় না।

অধ্যাপক সীলী বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে নেশন নাই; কিন্তু এমন বীজ হয় ত আছে, যাহা হইতে কালে নেশন অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে।

এই কারণে রাষ্ট্র কাহাকে বলে ও নেশন কাহাকে বলে, তাহা ভারতবাসীর

পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু বুঝা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

নেশনের লক্ষণসম্বন্ধে রেনাঁর মত বঙ্গদর্শনে সঙ্কলিত হইয়াছে। যিনি অবহিতভাবে উহা পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন, এক কথায় নেশনের সংজ্ঞা দেওয়া চলে না।

রাষ্ট্র আশ্রয় করিয়া নেশন উৎপন্ন হয়; কিন্তু রাষ্ট্রমাত্রেই নেশন জন্মে না। ইউরোপখণ্ডে রুশিয়া প্রবলপ্রতাপ রাষ্ট্র; কিন্তু রুশীয়জাতিকে নেশন বলা যায় কি না, সন্দেহ।

নেশন বলা যায় না; কেন না, রুশিয়ানামক মহারাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ন্ত্রী সর্ব্বতোমুখী রাজশক্তি। এই রাজশক্তি প্রজাশক্তির একবারে মুখাপেক্ষা করে না। প্রজাশক্তি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া রাজশক্তিকে সমর্থন করে না।

যেখানে রাজশক্তিতে ও প্রজাশক্তিতে এরূপ বিচ্ছেদ নাই, সেইখানেই নেশন মূর্ত্তিমন্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান। ইউরোপে ব্রিটিশ, ফরাসী ও জর্ম্মাণ এবং আমেরিকায় মিলিতরাষ্ট্রের প্রজাগণ নেশনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বহুদিন পূর্ব্বে সেখানেও নেশনের অস্তিত্ব ছিল না। তবে ইউরোপের সমাজক্ষেত্রে বহুদিন পূর্ব্বে এমন বীজ উপ্ত হইয়াছিল, যাহা হইতে বিবিধ নেশন অঙ্কুরিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। ইতালীয় নেশন ও জর্ম্মাণ নেশন প্রকৃতপক্ষে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক সৃষ্টি।

সংক্ষেপে নেশনের লক্ষণবিবৃতি চলে না; যদি নিতান্তই সংক্ষেপে বলিতে হয়, তাহা হইলে নেশন অর্থে আমরা সুগঠিত, সংহত, শরীরবদ্ধ মানবসমাজ বুঝিব; ঐ সমাজশরীর সর্ব্বদা জাগ্রত ও সচেতন থাকিয়া আপনার স্বার্থ অর্থাৎ সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট; শত্রু হইতে আত্মরক্ষণে ও পরের বিরুদ্ধে আত্মপ্রসারে সর্ব্বদাই উন্মুখ; উহার প্রত্যেক অঙ্গ সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য একযোগে কাজ করে; এক অঙ্গে আঘাত দিলে অন্য অঙ্গ হইতে আর্ত্তধ্বনি উদ্গত হয়; এবং সমগ্র শরীরের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক অঙ্গ আপনার সঙ্কীর্ণ মঙ্গল পরিহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

সমগ্র নেশনের শক্তিকে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যায়, নেশনের রাজশক্তির মূল প্রজাশক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ও প্রজাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান। প্রজাশক্তি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র রাজশক্তির মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নপর। এবং যে প্রজাসঙ্ঘ লইয়া নেশনের শরীর, সেই প্রজাসঙ্ঘের সর্ব্বাঙ্গীণ-মঙ্গল-সাধনার্থই রাজশক্তি বর্ত্তমান। রাজশক্তির অস্তিত্বের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

গজনীপতি মামুদ যখন সোমনাথমহাদেবের মন্দির লুণ্ঠন করেন, তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দুসমাজের সকলে সেই অত্যাচারকাহিনীর সংবাদ রাখাও কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। মহারাণা প্রতাপসিংহ যখন একাকী সিংহবিক্রমে দিল্লীশ্বরের সহিত যাবজ্জীবন সংগ্রাম করিয়াও

আপনার উন্নত মস্তক অবনত করিতে স্বীকৃত হন নাই, ভিন্ন প্রদেশের ভারতসন্তানের শীতল শোণিত তখন উষ্ণ হয় নাই; মরাঠাসৈন্য যখন উত্তরকালে দিল্লীশ্বরের প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়াইত, তখন সেই প্রজাগণের সজাতিত্ব ও সধর্ম্মত্বের কথা মনেও স্থান দেয় নাই।

তাহার অর্থ ভারতবর্ষব্যাপী প্রকাণ্ড পুরাতন হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু হিন্দু নেশনের অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু-সমাজের একাঙ্গের ব্যথা অপর অঙ্গ অনুভবে সমর্থ ছিল না।

আবার চৌহানপতিকে আক্রান্ত ও বিপন্ন দেখিয়া রাঠোররাজ যখন হাস্য করিতেছিলেন, এবং মুসলমানহস্তে মগধরাজ্য বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও পার্শ্ববর্ত্তী বঙ্গরাজ যখন পলায়নের শুভমুহূর্ত্ত-নিরূপণার্থ পঞ্জিকা দেখিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষে খণ্ডরাষ্ট্র ছিল ও খণ্ডরাষ্ট্রমধ্যে কুলের ও কুলপতিগণের মর্য্যাদা ছিল, কিন্তু ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রব্যাপী মহানেশন ছিল না।

অতি প্রাচীন কালে এই সকল খণ্ডরাষ্ট্রে রাজশক্তি এক বংশ হইতে বংশান্তরে সংক্রান্ত হইত, এক কুল হইতে কুলান্তরে সংক্রান্ত হইত, প্রজাসঙ্ঘ উদাসীনের মত চাহিয়া দেখিত। শাসনদণ্ড মৌর্য্যের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া মিত্রের হস্তে, মিত্রের হস্ত হইতে সুঙ্গের হস্তে, সুঙ্গের হইতে অন্ধ্রের হস্তে সঞ্চালিত হইত, মৌর্য্য ও মিত্র ও সুঙ্গ ও অন্ধ্রের প্রজাপুঞ্জ তাহাতে সুখদুঃখের কোন কারণ দেখিত না। উত্তরকালে হিন্দু রাজার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড মুসলমানের হস্তে, মুসলমানের শাসন হইতে খ্রীষ্টানের হস্তে গিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রজাগণ এই সকল রাজবিপ্লবকে নৈসর্গিক বিপ্লবের ন্যায় অকাতর সহিষ্ণুতা সহকারে গ্রহণ করিয়াছে; স্বয়ং এই বিপ্লবঘটনার অনুকূলে বা প্রতিকূলে দাঁড়াইবার কর্ত্তব্যতা মনে স্থান দেয় নাই। ইহার অর্থ—ভারতবর্ষে প্রজা-শক্তি কখনও রাজশক্তির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উহাকে বলবতী করে নাই; রাজশক্তি প্রজা-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; ভারত-বর্ষে কখনও নেশন ছিল না।

ভারতবর্ষে নেশন ছিল না বলিয়া ভারত-বর্ষের ইতিহাস এইরূপ হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইউরোপেও এককালে নেশন ছিল না। ইউরোপে নেশনের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, ভারতবাসীর কতকটা আশ্বাস না হউক, কতকটা শিক্ষা-লাভ ঘটিতে পারে, সন্দেহ নাই।

সামাজিক একতা নেশনগঠনে সাহায্য করে; কিন্তু এই একতা কোথায়—বাহির করা দুষ্কর।

ব্রিটিশ দ্বীপ মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন, ব্রিটিশ দ্বীপে সংহত নেশনের উৎপত্তি হইয়াছে বুঝা যায়। জাতিগত একতা পূর্ণমাত্রায় নাই, তবে অধিকাংশ বৃটিশ প্রজা সাক্সন্-বংশধর বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন। ভাষাগত একতা ছিল না, তবে ইংরাজী ভাষার প্রচারে অন্যান্য ভাষা লোপ পাইতে বসিয়াছে। ধর্ম্মগত একতা অনেকটা আছে; এককালে সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে একই বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ

হইয়াছে। ধর্ম্মগত ঐক্যের অপেক্ষা আচারগত ঐক্য অধিক আছে; আর সকলের উপর আছে রাষ্ট্রীয় ঐক্য। সমস্ত প্রজা এক রাষ্ট্রতন্ত্রের তুল্যরূপে অধীন। এই সমস্ত ঐক্যের ফলে ব্রিটিশ নেশন; বহুশত বৎসর ব্যাপিয়া ইহার জীবন একটানে উন্নতির মুখে চলিয়াছে। এই ঐতিহাসিক প্রাচীনতা প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজার আর একটা গৌরবের কথা—আর একটা ঐক্যসাধন বন্ধন।

আইরিশ জাতির বাসভূমি ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন; তদ্ভিন্ন জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্ম্মগত অনৈক্য বর্ত্তমান; সকলের উপরে আইরিশ জাতি আপনাদের পরাজয়ের ও অপমানের কাহিনী এখনও ভুলিতে পারে নাই; ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাও তাহা ভুলিবার অবসর দেন নাই। এখানে রাষ্ট্রীয় একতা সত্ত্বেও আইরিশ জাতি ব্রিটিশ নেশনের কলেবরে মিশিতে পারে নাই।

ফরাসীদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা প্রায় চারিদিকেই স্পষ্ট; কেবল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সুচিহ্নিত সীমা নাই। সেই দিকেই গোল। আইবীরিয় ও কেল্ট ও জর্ম্মাণ একত্র মিশিয়া ফরাসী জাতি উৎপন্ন হইয়াছে; প্রত্যেক ফরাসীর দেহে বোধ হয় তিনের রক্তই বর্ত্তমান। ধর্ম্মগত, আচারগত, ভাষাগত, একতা অনেকটা বর্ত্তমান আছে। ফরাসী সাহিত্যের ও ফরাসী বিজ্ঞানের গৌরবে ফরাসীমাত্রই অধিকারী। আর একটা একতা, প্রতিবেশী জর্ম্মাণের প্রতি বিদ্বেষে। ফরাসীর প্রাচীন ইতিহাস জর্ম্মাণের পরাজয়কাহিনী পুনঃপুন স্মরণ করাইয়া ফরাসীর ঐক্যবার্ত্তা ঘোষণা করে। এই সকল ঐক্যের ফলে ফরাসী নেশন।

তার পর জর্ম্মাণ নেশন। এই জাতিতে বংশগত বিশুদ্ধি যতটা আছে, ততটা অন্য জাতিতে আছে কি না, সন্দেহ। জর্ম্মাণের শরীরে পুরাতন রোমসাম্রাজ্যের বিপ্লাবক টিউটনের রক্ত প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান বলিয়া জর্ম্মাণ শ্লাঘা করেন। তদুপরি ভাষাগত ও আচারগত ঐক্য ত আছেই। তথাপি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মাণ নেশন ছিল না। জর্ম্মাণ নেশন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের সৃষ্টি।

জর্ম্মাণ নেশন জমাট বাঁধিতে এত সময় লাগিবার কারণ কি? যে একতাবন্ধনে নেশনের উৎপত্তি, সেই একতা জর্ম্মাণজাতিমধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল, তথাপি জর্ম্মাণ নেশন জমাট বাঁধে নাই, ইহার অর্থ আলোচনার যোগ্য।

প্রথমেই দেখা যায়, জর্ম্মণির সুনির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। উত্তরে ডেনমার্কের ও হলণ্ডের লো জর্ম্মাণ, পশ্চিমে ফরাসী, দক্ষিণে হাঙ্গেরীয়ান ও তুর্কি, পূর্ব্বে স্লাব জাতি, এই বিভিন্নভাষি-বিভিন্নজাতির মধ্যে জর্ম্মাণের বাস। কোন উন্নত পর্ব্বতপ্রাচীর বা কোন সাগরশাখা ব্যবধানস্বরূপ হইয়া জর্ম্মাণের ভৌগোলিক সীমারেখার নির্দ্দেশ করে নাই। জর্ম্মাণ ঠিক জানে না, উত্তরে ও পশ্চিমে ও দক্ষিণে ও পূর্ব্বে কোথায় উহার বাসভূমির শেষ; কোন্ রেখা পার হইয়া সে পদার্পণ করিবে না; তাহার প্রতিবেশীরাও জানে না, কোন্ রেখা পার হইলে জর্ম্মাণের স্বদেশে অনধিকারপ্রবেশ ঘটিবে। ফলে পার্শ্ব-

বর্হ্মি-বিভিন্নজাতি জর্ম্মণিকে পুনঃপুন আক্রমণ করিয়া ঐ দেশকে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। এই অবিরাম সংগ্রামের তুমুল কোলাহলে ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। নৈসর্গিক সীমান্তরেখার অভাবে জর্ম্মণিও পুনঃপুন পররাষ্ট্র ও পরজাতিকে আক্রমণ করিয়াছে। শান্তির অভাবে জর্ম্মাণ জাতি জমাট বাঁধিতে অবসর পায় নাই।

এই নৈসর্গিক কারণ ছাড়া আর একটা ঐতিহাসিক কারণ দেখা যায়। সেই কারণ অনুসন্ধানে রোমসাম্রাজ্যের পতনকালে যাইতে হয়। রোমসাম্রাজ্যের পতনের সময় জর্ম্মাণ জাতি বিবিধ কুলে বিভক্ত ছিল। এক একটা কুল রোমসাম্রাজ্যের এক একটা প্রদেশ অধিকার করিয়া বসে। ফ্র্যাঙ্ক, গথ, লম্বার্ড প্রভৃতি কুলের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই সকল বিভিন্ন কুলের পরস্পর সম্প্রীতি ছিল না। উঁহাদের পরস্পর বিরোধ জর্ম্মাণজাতির সংহতির পক্ষে এককালে প্রধান অন্তরায় ছিল। কুলপতিগণের পরস্পর বিরোধ জর্ম্মাণজাতিকে বহুদিন সংহত হইতে দেয় নাই।

কালক্রমে এই কুলগত বিরোধ লোপ পাইয়াছিল; কিন্তু আর একটা বিরোধ আসিয়া পড়ে। রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া কুলপতিগণ আপনাদের অনুগত অনুচরগণকে ভূমি বণ্টন করিয়া দেন। এই অনুচরগণের এক এক জন এক এক বিস্তীর্ণ প্রদেশের ভূস্বামী ও সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। রোমসাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে সম্রাট্পদবী একটা কুলবিশেষে ও বংশবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্রাট্ স্বয়ং প্রাদেশিক পরাক্রান্ত ভূস্বামিগণের একান্ত অধীন হইয়া পড়েন। এইরূপে ইউরোপে ফিউডাল তন্ত্রের উৎপত্তি হয়। জর্ম্মাণরাজ রোমক-সম্রাট্-নামে সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগতের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু কাজে এই সকল খণ্ডরাষ্ট্রের অধিপতি পরাক্রান্ত সামন্তবর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন মাত্র। খণ্ডরাষ্ট্রগুলি চিরদিন ধরিয়া পরস্পর বিবাদ করিত; সম্রাট্ সেই বিবাদ নিবারণে একান্ত অসমর্থ ছিলেন। কালক্রমে ধর্ম্মগত বিবাদ এই রাষ্ট্রগত বিবাদের সহিত যুক্ত হইয়া আগুন আরও জ্বালাইয়া তুলে। প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক জর্ম্মাণরাষ্ট্রপতিগণ বিকট ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই অগ্নিকাণ্ডে জর্ম্মাণ রাষ্ট্রতন্ত্র এককালে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রোমক সম্রাটের পদবী কালক্রমে হাব্স্বর্গ্ বংশে আবদ্ধ হইল; হাব্স্বর্গ্-বংশধরগণ বহুদিন ধরিয়া সমগ্র খৃষ্টীয় জগতকে রোমসম্রাটের শাসনাধীন রাখিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; কিন্তু জর্ম্মাণ রাষ্ট্রপতিগণের একতাসাধনে সমর্থ হন নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অভ্যুদয়ে রোমসাম্রাজ্যের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল; কিন্তু সেই ফরাসী সংঘর্ষের তুমুল বিপৎপাতও জর্ম্মণির একতাসাধনে সমর্থ হয় নাই। একতা সাধিত হয় নাই বটে, কিন্তু জর্ম্মাণজাতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য এই একতাবন্ধনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। নূতন-সৃষ্ট জর্ম্মাণ সাহিত্য ও জর্ম্মাণ দর্শন ও জর্ম্মাণ বিজ্ঞান, এই একতালাভের জন্য জর্ম্মাণ রাষ্ট্র-

সকলকে একস্বরে আহ্বান করিতেছিল। হাব্‌স্‌বর্গ্‌-বংশধর রোমসম্রাটের উপাধির মায়া কাটাইয়া অস্ট্রিয়া-সম্রাট্‌-রূপে জর্ম্মাণ রাষ্ট্রপতিগণের উপর নামমাত্র প্রাধান্যে তৃপ্ত রহিলেন। কিন্তু সেই প্রাধান্য পরিচালনায় তাঁহার শক্তি ছিল না। সহসা উদ্ধত প্রুসিয়ারাজ্য বিসমার্কের মন্ত্রণাশক্তিতে পরিচালিত হইয়া অস্ট্রিয়াপতিকে জর্ম্মাণ রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিল; এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের অদূরদর্শিতার ফলে ফরাসীবিগ্রহের সুযোগ আশ্রয়ে জর্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া জর্ম্মাণ-নেশনের সৃষ্টি করিল। এই বিস্ময়কর-ঘটনার পর সংহত জর্ম্মাণ নেশন ইউরোপ-খণ্ডে উন্নত মস্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে; এবং ধরাপৃষ্ঠে আপনার প্রভুত্ব-বিস্তারের চেষ্টা করিয়া দর্পের সহিত জর্ম্মাণ নেশনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। জাতিগত, ভাষাগত ও আচারগত একতায় ধর্ম্মগত অনৈক্য লোপ করিয়াছে। এবং স্বার্থের ঐক্য ও ফরাসী বিদ্বেষের সাধারণ ঐক্য, সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া নৈসর্গিক সীমান্তরেখার অভাব মোচন করিয়াছে।

ধর্ম্মগত, আচারগত, ভাষাগত ও জাতিগত একতা নেশনবন্ধনে সাহায্য করে, সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ, ফরাসী ও জর্ম্মাণ জাতির নেশনবন্ধনে এই একতা সাহায্য করিয়াছে। অস্ট্রিয়ারাজ্য জর্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও মুখ্যত এই ঐক্যের অভাবেই নেশনে পরিণত হইতে পারে নাই। অস্ট্রিয়ারাজ্যে জর্ম্মাণ ও স্লাব ও তুরাণিক, তিন বিভিন্ন জাতির নিবাস। তাহাদের মধ্যে শোণিতের ভেদের সঙ্গে ভাষাভেদ, ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সেই জন্য এই বিভিন্ন জাতি জমাট বাঁধিয়া একটা পরাক্রান্ত নেশনে পরিণত হইতে পারিতেছে না; এবং এই অনৈক্যজাত দুর্ব্বলতার জন্যই অস্ট্রিয়াপতি প্রাচীন ঐতিহাসিক বিশ্রুতি সত্ত্বেও জর্ম্মাণ জাতির নেতৃত্বপদ হইতে বহুশত বৎসর পরে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। ভাষাগত ও আচারগত ও ধর্ম্মগত, ও কিয়ৎপরিমাণে জাতিগত, ঐক্য ছিল বলিয়াই, বিবিধ প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রপতির দ্বন্দ্বক্ষেত্র ইতালিভূমিতেও এতদিনে নেশনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সকল একতা ছাড়িয়া স্বার্থগত একতা। ইংরাজজাতি স্কচ ও ওয়েলশের ভাষাভেদ, ও জাতিভেদ সত্ত্বে উহাদের সহিত একত্র মিশিয়া নেশনে পরিণত হইয়াছে, তাহার কারণ স্কচের স্বার্থ ও ওয়েলশের স্বার্থ সম্প্রতি ইংরাজের স্বার্থের সহিত অভিন্ন। জর্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহ যে এতকালে বিসংবাদ ভুলিয়া একতাবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূলে সেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ—ফরাসীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। ইতালির নেশনত্বপ্রাপ্তির মূলেও সেই শত্রু হইতে আত্মরক্ষণরূপ সাধারণ স্বার্থ বিদ্যমান। এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ও সাধারণ স্বার্থের একতা অন্যবিধ অনৈক্যকে পরাভূত করিয়াছে। জর্ম্মণির নিকট পরাভবে সাধারণ স্বার্থে আঘাত পাইয়া ফরাসী জাতির নেশনত্ব আরও দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজের সহিত বাণিজ্যপ্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘর্ষে জর্ম্মাণজাতির

সাধারণ স্বার্থে আঘাতসম্ভাবনায় জর্ম্মাণ-জাতির নেশনত্ব ক্রমেই সংহত হইতেছে। এই সাধারণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের একতায় সকল বিভেদকে ডুবাইয়া দিয়া নেশনের সৃষ্টি করে। এই রাষ্ট্রীয় একতাই সর্ব্ববিধ অনৈক্যকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে বলিয়া ব্রিটিশদ্বীপের অধিবাসিমাত্রেই আজি তুল্য রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে ও সকলেই আপনাকে ব্রিটিশ নেশনের অঙ্গীভূত জানিয়া গৌরব বোধ করিতেছে। এই কারণেই আমরা ভারতজাত পারসীকে ইংরাজের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে দেখিতে পাইয়াছি; এই কারণেই ইহুদীর হস্তে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ডের পরিচালনা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। ইহুদী বল, আর পার্সী বল, আর মুসলমান বল, আর খ্রীষ্টান বল, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ব্রিটিশ রাজার ব্রিটেনবাসী প্রজামাত্রই প্রকাণ্ড ব্রিটিশ নেশনের অঙ্গীভূত; ও সেই ব্রিটিশ নেশনের মাহাত্ম্যরক্ষায় যত্নশীল।

ধর্ম্মগত, ভাষাগত, জাতিগত ঐক্য নেশনবন্ধনে আনুকূল্য করে। এইখানেই নেশনরূপ মহাবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গমের বীজ। ইহার উপর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ঐক্য থাকিলে সেই মহাবৃক্ষ সতেজে পুষ্টিলাভ করে ও বৃদ্ধিলাভ করে। স্বার্থের ঐক্য অন্যান্য বিষয়ে সামান্য অনৈক্যকে নষ্ট করিয়া নেশনশরীর গড়িয়া তুলে। আর যেখানে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের আকর্ষণ ধর্ম্মগত বা আচারগত বা ভাষাগত অনৈক্যের বিকর্ষণে পরাভূত হয়, সেখানে নেশনের উৎপত্তি ঘটে না।

কিন্তু কেবল স্বার্থরক্ষায় সমর্থ হইলেই নেশন হয় না। বর্ত্তমান কালে রুশিয়ার মত স্বার্থরক্ষণে সমর্থ মহারাষ্ট্র কোথায়? কিন্তু রুশিয়া মহারাষ্ট্রমাত্র; রুশিয়ায় নেশন নাই। নেশন নাই, কেন না, এখানে রাজ-শক্তি প্রজাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন। দোর্দ্দণ্ড রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে সংযত ও নিয়মিত করে; কিন্তু প্রজাশক্তির উপর উহার প্রতিষ্ঠা নাই। রাজা ও প্রজা জনসমাজের দুই প্রধান অঙ্গ; যেখানে দুই অঙ্গের বিচ্ছেদ, যখন একের ব্যথায় অন্যে কাতর হয় না, যখন একে আঘাত পাইলে অন্যে সাড়া দেয় না, সেখানে নেশনশরীর বর্ত্তমান নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে খণ্ড-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু সেই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সমবেদনার আত্মীয়বন্ধন ছিল না। ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্র স্থাপনের অনেকবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা স্থায়ী হয় নাই। ভারত-বর্ষে মহারাষ্ট্র ত ছিল না; আবার নেশনও ছিল না; কেন না, রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির কোনরূপ স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। রাজশক্তির অভ্যুদয়ে বা পরাভবে প্রজাশক্তি চিরদিনই উদাসীন ছিল। কাজেই ভারত-বর্ষব্যাপী মহারাষ্ট্রও ছিল না, ভারতব্যাপী নেশনও ছিল না।

সম্প্রতি ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যপতির ছত্রতলে ব্রিটিশ প্রজা ও ব্রিটিশ সম্রাটের সামন্ত ভূপতি-গণ আশ্রয় লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রের সৃজন করিয়াছে। রুশিয়া-সম্রাট্ দূর হইতে ইহার ঐশ্বর্য্যের প্রতি লুব্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন;

কিন্তু তাঁহার সাহস হয় না, এই মহারাষ্ট্রকে আক্রমণ করেন। কাজেই ভারতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্রের এখন অস্তিত্ব আছে; কিন্তু ভারতবর্ষে অদ্যাপি নেশন সৃষ্ট হয় নাই। কেন না, ভারতে রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির কোন দৃঢ় বন্ধন নাই। প্রজাশক্তির উপর রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত নহে; প্রজাশক্তি রাজশক্তির সহায় নহে; রাজশক্তিকে প্রজাশক্তি বিনীতভাবে ভয় করে ও ভক্তি করে, কিন্তু ভাল বাসে না ও আপনার আত্মীয়রূপে জানে না। যতদিন এই উভয় শক্তির মধ্যে একাত্মতা না জন্মিবে, ততদিন ভারতবর্ষে নেশনের সৃষ্টি হইবে না। যদি কালক্রমে একাত্মতার উৎপত্তি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে নেশনের উৎপত্তিও অসম্ভব।

বর্ত্তমান কালে আমাদের রাজশক্তি বৈদেশিকের হস্তে; কাজেই রাজায় প্রজায় মমত্ববন্ধনের অভাব বেশ বুঝা যায়। কিন্তু যখন রাজশক্তি দেশীয় রাজার হাতে ছিল, তখনও এই রাজায় প্রজায় মমত্বের বন্ধন কেন ছিল না, বিচার্য্য বিষয় হইয়া পড়ে।

মুসলমান আক্রমণকালে ভারতবর্ষে একতার অভাব, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একতার অভাব, ভারতবর্ষের পতনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের একতার অভাব পতনের প্রধান কারণ বটে, সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজার সহিত প্রজার ঐক্যবন্ধনও অন্যতর প্রধান কারণ, তাহা ঐতিহাসিকেরা সর্ব্বদা লেখেন না। ভারতবর্ষে রাষ্ট্ররক্ষার কাজ চিরদিনই রাজার হাতেই অর্পিত আছে। রাজা আপনার সৈন্যসামন্ত লইয়া শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু প্রজা তাঁহার সাহায্য করিত, এরূপ প্রমাণ অধিক পাওয়া যায় না। রাজা যাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন—প্রজা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। রাজার সহায়রূপে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দাঁড়ান কর্ত্তব্য বোধ করে নাই; অথবা রাজার পরাজয়ের পর স্বয়ং আক্রমণকারীকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস। এখানে রাজায় রাজায় চিরকাল যুদ্ধ হয়। প্রজা উদাসীন হইয়া দাঁড়াইয়া দেখে; এবং যে জয়লাভ করে, তাহার নিকট অকাতরে আত্মসমর্পণ করে।

ইউরোপের ইতিহাস অন্যরূপ। বোনাপার্টি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন, এই আশঙ্কা উপস্থিত হইবামাত্র, ব্রিটিশ প্রজা দলে দলে ভলণ্টিয়ারের খাতায় নাম লেখাইয়াছিল। সিডান-ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়ান আত্মসমর্পণ করিবার পরও ফরাসী প্রজা জর্ম্মাণের সহিত যুঝিয়াছিল। সেদিন বুয়রযুদ্ধে ইংরেজের রাজশক্তি কয়েকবার আঘাত পাইবামাত্র ব্রিটিশ প্রজা দলে দলে সমুদ্রপারে দেহপাতের জন্য ছুটিয়াছিল।

সেকালে ভারতবর্ষ শত খণ্ডে শত রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, ইহাতে বিস্মিত হইবার বড় কারণ নাই। ইংরাজদের মধ্যে কেমন ঐক্য আছে, ফরাসীদের মধ্যে কেমন ঐক্য আছে, জর্ম্মাণেরাও এতকাল পরে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে; আর ভারতবাসীরা এক হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াও ঐক্যবন্ধন

লাভ করে নাই; এজন্য ভারতবাসীকে তিরস্কার করা একটা প্রথা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের কোন একটা দেশের তুলনা ঠিক সঙ্গত নহে। বরং সমগ্র ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা হইতে পারে। আয়তনে বা লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপ-মহাদেশেরই তুলনা হয়; ইউরোপের অন্তর্গত কোন দেশের তুলনা হয় না। রোমসম্রাট্ সমগ্র ইউরোপকে একচ্ছত্র করিতে পারেন নাই। দুইসহস্র বৎসর চেষ্টার পর সেই চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমগ্র ইউরোপ খ্রীষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু এক হয় নাই। প্রায় সমগ্র ইউরোপ রোমের সভ্যতার উত্তরাধিকারী, তথাপি সমগ্র ইউরোপ এক হয় নাই। তখন ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড দেশ, যাহা আয়তনে ইউরোপ অপেক্ষা অধিক ছোট নহে, যাহার লোকসংখ্যা ইউরোপের সমান, যাহার ভিতরে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, ভাষাভেদ, আচারভেদ প্রভৃতি ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশী, সেই প্রকাণ্ড দেশের সমগ্র অধিবাসী যে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটা বৃহৎ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বরং ইউরোপের মধ্যে যেরূপ জাতিবিদ্বেষ ও ধর্ম্মবিদ্বেষ বর্ত্তমান, ভারতবর্ষের মধ্যে সেরূপ জাতিবিদ্বেষ বা ধর্ম্মবিদ্বেষ কোনও কালে ছিল না।

ইংরাজ ও ফরাসী, ফরাসী ও জর্ম্মাণ, জর্ম্মাণ ও রুশ, ইংরাজ ও রুশ, ইহাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষের মাত্রা অত্যন্ত তীব্র। বাঙালী ও বেহারী, বেহারী ও পঞ্জাবী, মরাঠা ও রাজপুত, ইহাদের মধ্যে সেরূপ তীব্র বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যা কোনও কালেই ছিল না। আবার ইউরোপে প্রোটেষ্টাণ্ট ও কাথলিকের মধ্যে যেরূপ বিদ্বেষ, মারামারি, রক্তারক্তি ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের বিভিন্ন-সম্প্রদায়-মধ্যে, শাক্তে শৈবে বা শাক্তে বৈষ্ণবে, এমন কি হিন্দু বৌদ্ধেও, সেরূপ রক্তারক্তি ব্যাপার কখনও ঘটে নাই। বোধ করি, এইরূপ ধর্ম্মগত বিদ্বেষ ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বভাববহির্ভূত।

ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে, ঐক্যের অভাবে ভারতবাসীকে তিরস্কার উচিত হয় না।

সমগ্র ইউরোপ এক হয় নাই, উহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র খণ্ডরাষ্ট্রগুলি জমাট বাঁধিয়া এক একটা মহাপ্রতাপ নেশনে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ এক মহারাষ্ট্রে পরিণত না হইয়া যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হইত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের পতন অনিবার্য্য না হইতেও পারিত।

এইজন্য আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় অনৈক্য, বহুসংখ্যক খণ্ডরাজ্যের অস্তিত্ব, পতনের একটা প্রধান কারণ হইলেও প্রধানতম কারণ নহে। ভারতবর্ষ ইউরোপের মত বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত হইলেও ভারতবর্ষের পরাধীনতা অনিবার্য্য হইত না। ভারতবর্ষের পতনের কারণ যে উহার অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি নেশনে পরিণত হয় নাই। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অনৈক্য ত ছিলই, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র মধ্যে প্রজাশক্তি রাজশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা

লাভ করে নাই। প্রজাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় রাজশক্তি সম্যক্-রূপ সামর্থ্য লাভ করিতে পারে নাই। রাজার সুখদুঃখে প্রজা কখনও সমবেদনা দেখায় নাই। রাজার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে প্রজা উদাসীন ছিল। রাজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রজা রাষ্ট্ররক্ষার জন্য আপনার দুর্জ্জয়-শক্তি প্রয়োগ করিতে শিখে নাই। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি যেখানে এইরূপ বিচ্ছিন্ন, সেখানে নেশন জন্মে না। ভারতবর্ষে নেশনের অস্তিত্ব ছিল না; সেইজন্য ভারতবর্ষ পরাক্রমণ-নিরোধে সফল হয় নাই। নেশন জন্মিবার বীজ ভারতক্ষেত্রে না ছিল, এমন নহে, কিন্তু সেই বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম ঘটে নাই।

এইখানে ইউরোপের ইতিবৃত্তের সহিত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে অনৈক্য আছে। উভয়ত্র ইতিহাস ভিন্ন পন্থায় চলিয়া ভিন্ন ফল উৎপাদন করিয়াছে। উভয়ত্র এই প্রভেদের মূল কারণ কি, তাহা ঐতিহাসিকগণের বিচার্য্য বিষয়। প্রসঙ্গান্তরে আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ভারতবর্ষীয় ইসফস্ ফেবল্।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইসফস্-ফেবল্-নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের কতিপয় গল্প বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদিত করিয়া কথামালা নামে প্রকাশিত করেন। শিশুগণের শিক্ষার উপযোগী যে সকল বাঙলা পুস্তক বিদ্যমান আছে, কথামালা উহাদের অন্যতম। আহম্মদনগর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নারায়ণ বালকৃষ্ণ গড্‌পোল বি, এ, মহাশয় ইংরেজী ইসফ্‌স্ ফেবল্ সংস্কৃত-ভাষায় অনুবাদিত করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। অল্পকালমধ্যে সংস্কৃত ইসফ্‌স্ ফেবলের চারি পাঁচ সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে গিল্‌ক্রাইষ্ট-(J. Gilchrist)-নামক ইংরেজ ইসফ্‌স্ ফেবলের কয়েকটি গল্প হিন্দুস্থানী, পারসীক, আরবিক, বাঙলা, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদিত করিয়া রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অধুনা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্ব প্রদেশেই ইংরেজী ইসফ্‌স্ ফেবল্ সুপ্রচারিত হইয়াছে। ইউরোপের প্রত্যেক ভাষায় ইসফ্‌স্ ফেবল্ লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুত পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য জনপদ নাই, যেখানে এই গ্রন্থের প্রচার পরিলক্ষিত হয় না।

বর্ত্তমান ইসফ্‌স্ ফেবল্ ইসফের উদ্ভাবিত নহে। ইসফ্ নামে একজন

নীতিবিৎ পণ্ডিত খৃ৹ পূ৹ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসদেশে বিদ্যমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্লেটো (Plato) লিখিয়াছেন, সক্রেটিস্ (Socrates) কারারুদ্ধ অবস্থায় ইসফের গল্পসমূহ পদ্যে অনুবাদ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেন। আরিষ্টোফানিস্ (Aristophanes) ইসফের গল্পের চারিবার উল্লেখ করিয়াছেন। আরিষ্টোটল (Aristotle) ইসফের একটি গল্প এক ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, লুসিয়ান (Lucian) সেই গল্পটিই অন্যভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া বোধ হয়, ইসফ্ কতকগুলি গল্প রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহা কখনও লিপিবদ্ধ করেন নাই এবং বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার রচিত গল্পনিচয় লোকস্মৃতির অতীত হইয়া গিয়াছে। 'ইসফ্' এই নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ইউরোপীয় ভাষায় ইসফ্স্ ফেবল্ কোথা হইতে আসিল, ইহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ইংলণ্ডদেশীয় অধ্যাপক রীজ্ ডেভিড্স্ (Rhys Davids) মহোদয় স্থির করিয়াছেন যে, উহা তুর্কিস্থান হইতে পরিগৃহীত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কনষ্টাণ্টাইনোপল্ (Constantinople) নগরের প্লানুডিজ্-(Planudes)-নামক একজন কৃতবিদ্য ধর্ম্মযাজক কতকগুলি গল্প সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার ঐ পুস্তক 'ইসফ্স্ ফেবল্' এই নামে অভিহিত করেন। প্লানুডিজ্ শুনিয়াছিলেন, গ্রীসে প্রাচীন কালে ইসফ্ নামে একজন নীতিবিৎ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত পণ্ডিতের নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে তিনি স্বীয় গ্রন্থ ইসফ্স্ ফেবল্ নামে প্রকাশিত করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালীর অন্তর্গত মিলান্ নগরে উক্ত গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ পরিনিষ্পন্ন হয়। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে ইউরোপের সমস্ত ভাষায় প্লানুডিজ্-কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। প্লানুডিজ্ নানাস্থান হইতে গল্প সঙ্কলন করিয়া স্বীয় গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। খৃ৹ পূ৹ প্রথম শতাব্দীতে বাব্রিয়াস্-(Babrius)-নামক একজন গ্রীক কবি পদ্যে কতকগুলি গল্প রচনা করিয়াছিলেন। উহার কতিপয় গল্প প্লানুডিজ্-কৃত ইসফ্স্ ফেবলে পরিদৃষ্ট হয়। ফিড্রস্ (Phædrus)-নামক লাটীন কবির উদ্ভাবিত কয়েকটি গল্পও প্লানুডিজ্ রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর গল্পগুলি প্লানুডিজ্ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হন। এমন কি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুগবেষণা দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন যে, গ্রীক কবি বাব্রিয়াস্ এবং লাটীন কবি ফিড্রস্ উভয়েই ভারতবর্ষীয় গল্প যথাক্রমে গ্রীক ও লাটীন পদ্যে অনুবাদিত করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ বিরচন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় গল্পসমূহ বিভিন্ন সময়ে ইউরোপে সংনীত হইয়াছিল ; যথা—

(১) আলেক্জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে নানাসূত্রে কতিপয় ভারতবর্ষীয় গল্প ইউরোপে প্রবেশ করে। ঐ সকল গল্প ইসফের নামে প্রচারিত হয়।

(২) যখন আলেক্জাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন, তখন (খৃ৹ পূ৹ ৪র্থ শতাব্দীতে)

বহু গল্প ভারত হইতে গ্রীসে সংনীত হয়। বাব্রিয়াস্, ফিড্রস্ প্রভৃতি কবিগণ ঐ সকল গল্প গ্রীক, লাটীন প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত করেন।

(৩) মধ্যযুগে কতিপয় ভারতবর্ষীয় গল্প পারস্যভাষায় অনুবাদিত হয়। উক্ত পারস্য-গ্রন্থ আবার আরবিক ভাষায় অনূদিত হয়। জিউগণ ঐ আরবিক গ্রন্থ, গ্রীক, হিব্রু, লাটীন প্রভৃতি ভাষায় প্রচারিত করেন।

(৪) খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সেণ্ট্ জন্ অব্ ডামস্কস্ (St. John of Damascus)-নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থের অনুকরণে বার্লেম-জোসাফেট (Barlaam and Josaphet) নামে একখানি আখ্যায়িকা রচনা করেন। ১১শ শতাব্দীতে ঐ গ্রন্থ লাটীনভাষায় অনুবাদিত হয়। তদনন্তর সমগ্র ইউরোপে ঐ গ্রন্থ প্রচারিত হয়।

(৫) যখন আরবিকগণ স্পেনদেশে আধিপত্য করেন, তখন বহু গল্প ইউরোপে প্রবেশ করে। ধর্ম্মসংগ্রামের (Crusades) যুগেও অনেক গল্প দেশান্তরে সঞ্চারিত হয়।

(৬) হূণজাতীয় লোকসকল অনেক ভারতীয় গল্প ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রচার করে। জেঙ্গিস খাঁর সময়ে (১২১৯ খৃষ্টাব্দে) অনেক হূণ ইউরোপে প্রধাবিত হয়।

যে সকল গল্প অবলম্বনে ইসফস্ ফেবলের সৃষ্টি হইয়াছিল, তন্মধ্যে জাতকনামক পালিগ্রন্থের গল্পসমূহই সমধিক উল্লেখযোগ্য। যদিও পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত ইসফস্ ফেবলের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা পালিজাতক হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল। বস্তুত পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থও জাতকগ্রন্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

পঞ্চতন্ত্র প্রথমত ত্রয়োদশ তন্ত্রে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পাঁচটি তন্ত্র পৃথক্ করিয়া পঞ্চতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ৫৩১—৫৭৯ খৃষ্টাব্দে খোস্রু নুসির্বণের চিকিৎসক বর্জুয়ে পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থ পহ্লবী (প্রাচীন পারসীক) ভাষায় অনুবাদিত করেন। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সিরিয়াক্ (Syriac) ভাষায় অনুবাদিত হইয়া "কলিলগ্ ও দমনগ্" (Kalilag and Damnag) এই নাম ধারণ করে। কর্কটক ও দমনক নামক দুই শৃগালের উপাখ্যান পঞ্চতন্ত্রের আদিভাগে বর্ণিত হইয়াছে। উহাদের নাম অনুসারে সিরিয়াক্ ভাষায় অনুবাদিত গ্রন্থের নাম "কলিলগ্ ও দমনগ্" হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ আবার আরবিক ভাষায় অনুবাদিত হইয়া "কলিলঃ" ও "ডিমনঃ" (Kalilah and Dimnah) এই আখ্যা লাভ করিয়াছে। সিমিয়ন্ সেথ নামক একজন জিউ ১০৮০ খৃষ্টাব্দে "কলিলঃ" ও "ডিমনঃ" গ্রন্থ গ্রীকভাষায় অনুবাদিত করেন। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে অন্য একজন জিউ কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত গ্রন্থ হিব্রু ভাষায় অনুবাদিত করেন। ১২৬৩—১২৭৮ খৃ০ অব্দে জন্ অব্ কেপুয়া (John of Capua) উক্ত হিব্রু গ্রন্থ লাটীন ভাষায় অনুবাদিত করেন। আরবিক অনুবাদগ্রন্থ এই সময়ে স্পেনিশ্ ও লাটীন উভয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এই দ্বিতীয়বার অনুবাদিত লাটীন পঞ্চতন্ত্রের নাম "Æsop the old." আরবিক পঞ্চতন্ত্রের মুখবন্ধে লিখিত আছে,

আলেক্জাণ্ডার (Alexander the Great) ভারত অধিকার করিয়া Dabschelim-নামক ব্যক্তিকে ভারতীয় গ্রীকসাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া যান। বিদ্‌পই-(Bidpai)-নামক কোন পণ্ডিত Dabschelimকে নীতি শিক্ষা দিবার জন্য পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ বিরচন করেন। পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিন তন্ত্রের গল্প কথাসরিৎসাগর ও হিতোপদেশ উভয় গ্রন্থেই রূপান্তরিত ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মূল পঞ্চতন্ত্র পালিভাষার জাতকগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

পঞ্চতন্ত্র, ইসফ্‌স্‌ ফেবল্‌ প্রভৃতি সকল গ্রন্থেরই মূল প্রস্রবণ—জাতকগ্রন্থ। এই গ্রন্থ পালিভাষায় লিখিত। ইহা সূত্র-পিটকের খুদ্দক-নিকায়ের অন্তর্ভূত। ইহাতে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মসমূহের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধ নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কোন জন্মে দান, কখনও শীল, কোন সময়ে প্রজ্ঞা, কখনও বীর্য্য, কখনও ক্ষান্তি, কোন সময়ে মৈত্রী ইত্যাদি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করেন। বুদ্ধদেব শৃগাল, কুক্কুর, সিংহ, কচ্ছপ, গৃধ্র, মর্কট ইত্যাদি যোনিতে জন্মিয়াও সদ্‌গুণসমূহ হইতে বিচ্যুত হন নাই। বুদ্ধদেব নানাযোনি-পরিভ্রমণকালে যে সকল ঘটনায় স্বীয় সদ্‌গুণাবলী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ঐ সকল ঘটনাই জাতকের বর্ণনীয় বিষয়।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, জাতকগ্রন্থ বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় বিরচিত হইয়াছিল, ও খৃ° পূ° ৫৪৩ অব্দে প্রথম বোধিসংগম-কালে উহা বর্ত্তমান ছিল। সিংহলদেশীয় প্রবাদ অনুসারে জানা যায়, দ্বিতীয় বোধি-সংগমকালে খৃ° পূ° ৪৪৩ অব্দে ঐ গ্রন্থের প্রচার ছিল। মেজর কানিংহাম দক্ষিণ ভারতের ভরুৎ-নামক স্থানে একটি স্তূপ আবিষ্কার করেন। উহা খৃ° পূ° তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। উহাতে বাতাগ্র-সৈন্ধব জাতকের গল্প অঙ্কিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে লিখিত দীপবংশনামক পালিগ্রন্থে জাতকের উল্লেখ আছে। সুমঙ্গলবিলাসিনী, অঙ্গুত্তর-নিকায়, সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক প্রভৃতি গ্রন্থেও জাতকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

জাতকগ্রন্থে গদ্য ও পদ্য উভয়ই বিদ্যমান আছে। গল্পগুলি গদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে প্রমাণস্বরূপে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

সিংহচর্ম্মজাতক, কচ্ছপজাতক ইত্যাদি গল্প ইসফ্‌স্‌ ফেবলের অবিকল প্রতিরূপ। কোন কোন গল্পে কিছু রূপান্তর দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ, পালিভাষার গল্পসমূহ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাঁহারা জিউ, আরবিক, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় ঐ সকল গল্প অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটন করেন।

কালসহকারে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থের সহ মূল পালি জাত-কের অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছে বটে, তথাপি এখনও উভয়গ্রন্থের সৌসাদৃশ্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। উভয়বিধ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়গুলি প্রায় একরূপ। অনেকস্থলে ভাষাও পরস্পর সুসদৃশ। উদাহরণস্বরূপে

জাতকগ্রন্থের গৃধ্রজাতক নামক গল্প হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

যন্নু গিজ্ঝো যোজনসতং কুণপানি অবেক্খতি।
কস্মা জালঞ্চ পাসঞ্চ আসজ্জাপি ন বুজ্ঝসীতি॥
জাতক।

ইহার অনুরূপ শ্লোক হিতোপদেশের জরদ্গব-গৃধ্রের উপাখ্যান হইতে উদ্ধৃত হইল—

যোঽধিকাদ্‌যোজনশতাৎ পশ্যতীহামিষং খগঃ।
স এব প্রাপ্তকালস্তু পাশবন্ধং ন পশ্যতি॥
হিতোপদেশ।

ডেন্মার্কদেশীয় কোপেনহেগেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালিভাষার অধ্যাপক ডাক্তার ফজ্‌বোল পালিজাতক রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করিতেছেন। দ্বাদশখণ্ড (volume) পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড অধ্যাপক রীজ্‌ ডেভিড্‌স্‌, দ্বিতীয় খণ্ড উইলিয়াম্‌ রাউস প্রভৃতি পণ্ডিত ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন; অধ্যাপক কাউএল্‌ ক্যাম্ব্রিজে এই অনুবাদ-কার্য্যের তত্ত্বাবধানে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

আলোচনা।

(ক)

সিদ্ধান্তবিচার।

শ্রাবণমাসের বঙ্গদর্শনে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিউটনের দুইটি সিদ্ধান্ত হইতে অপর দুইটি নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু বয়োবৃদ্ধ, সুপণ্ডিত ও সুসমাহিতচেতা। তাঁহার কথা সকলেরই মনোযোগের বিষয়, সন্দেহ নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নূতন-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে যাহা ধারণা হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম। সত্যনির্ণয়ই আমার লক্ষ্য, প্রতিবাদ লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়মাত্র।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত।

(ক) "চলমান বস্তু যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায়।"

(খ) "চলমান বস্তুমাত্রই দুই দুই মুহূর্ত্তে পর্য্যায়ক্রমে প্রতিরুদ্ধ এবং চালিত হয়;—দুইই হয় বাহিরের শক্তি দ্বারা।"

আলোচকের প্রতিবাদ।

অত্রত্য (খ)-সিদ্ধান্ত (ক)-সিদ্ধান্তের অনুমানমাত্র। আমার মনে হয়, "চলমান বস্তু যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায়," এ কথা আপনাকে আপনি খণ্ডন করিতেছে। যদি মনে করা যায় যে, চলবস্তু (ক) ও (খ) সিদ্ধান্তের অনুযায়ী হইয়াই চলে, তাহা

হইলে উহার কতকগুলি গতিক্ষণ ও কতকগুলি বিরামক্ষণ ও তৎসঙ্গে উহার কক্ষায় কতকগুলি গতিস্থান ও কতকগুলি বিরামস্থান পর্য্যায়ক্রমে পাওয়া যাইবে। মনে করুন, "চ" একটি বিরামস্থান ও "ছ" তাহার অব্যবহিত-পরবর্ত্তী বিরামস্থান; তাহা হইলে ক-বস্তু চ-স্থান হইতে ছ-স্থান পর্য্যন্ত অবিরাম চলিয়াছে অর্থাৎ "চ" ও "ছ" এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে "উপস্থিত" হইয়াও "স্থির হইয়া দাঁড়ায়" নাই। অতএব (ক)-সিদ্ধান্ত ও সেই সঙ্গে (খ)-সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল।

যদি বলেন, "চ" ও "ছ" এই দুয়ের মধ্যে একটিমাত্র স্থান আছে, সেটি গতিস্থান, তবে জিজ্ঞাস্য—"চ ও ছ-এর মধ্যে অবকাশ আছে কি না।" যদি অবকাশ না থাকে, তবে গতিস্থানটিও নাই, অতএব (খ)-সিদ্ধান্ত, ও পরম্পরা-সম্বন্ধে (ক)-সিদ্ধান্ত, খণ্ডিত হইল। আর যদি অবকাশ থাকে, তবে সেই অবকাশকে শতাংশে, সহস্রাংশে, অর্ব্বুদাংশে, এমন কি, অনন্তাংশে বিভক্ত কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক বিভাগে একটি একটি স্থানের উৎপত্তি হইতেছে, সেই সেই স্থানে চলবস্তু "উপস্থিত" হইয়াও "স্থির হইয়া দাঁড়ায়" নাই। অতএব (ক)-সিদ্ধান্ত, ও সেই সঙ্গে (খ)-সিদ্ধান্ত, খণ্ডিত হইল।

এক্ষণে যে যুক্তি অনুসারে (ক) ও (খ) সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা যাউক। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন—"অতএব তোমার কথার আদি-অন্ত জোড়া দিয়া এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, একই অভিন্ন মুহূর্ত্তে (ম-মুহূর্ত্তে) ক-বস্তু চ-স্থানে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত—যাহা একান্ত পক্ষেই অসম্ভব।" এস্থলে প্রথম বিচার্য্য, "মুহূর্ত্তের মান আছে কি না।" যদি মান থাকে, তবে উপরের উক্তি "একান্ত পক্ষেই অসম্ভব" নহে; যেহেতু মুহূর্ত্তের প্রথমাংশে "উপস্থিত", দ্বিতীয়াংশে "অনুপস্থিত," এরূপ কল্পনার অবকাশ রহিয়াছে। আর যদি মুহূর্ত্তের মান না থাকে, তবে মানাভাবে বিরামের মুহূর্ত্ত মারা যায় ও সেই সঙ্গে (ক) ও (খ) সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হয়। বাস্তবিক মুহূর্ত্ত একেবারে মানহীন হইলে, মুহূর্ত্তসমষ্টি হইতে কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। মুহূর্ত্ত যতই কেন ক্ষুদ্র হউক না, তাহার মান আছে। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মুহূর্ত্তের অংশ, অংশাংশ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া চলিলে পরিণামে যাহা হইবে, তৎপ্রতি পূর্ব্বোক্ত-যুক্তি-প্রয়োগ দ্বারা "অসম্ভব" কিছু পাওয়া যাইবে কি না। উত্তর, ঐ পরিণাম মানের একান্ত অভাববিশিষ্ট নহে, হইতে পারে না। যাহা একান্তই মানহীন, তাহা আমাদের ধারণার অতীত, যুক্তির সীমার বহির্ভূত। সসীমের বাহিরে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, অসীম আমাদের জ্ঞানগোচর নহে। "মহতো মহীয়ান্" আমাদের জ্ঞানের যেমন অবিষয়, "অণোরণীয়ান্"ও তেমনি। সসীমবিষয়া যুক্তি অসীমস্পর্দ্ধিনী হইলে শুভদায়িনী হইবে, প্রত্যাশা করা যায় না।

শ্রীসারদারঞ্জন রায়।

(খ)

মূল-প্রবন্ধ-লেখকের মন্তব্য।

প্রতিবাদকারী শ্রদ্ধেয় লেখকমহাশয় "গতিক্ষণ" ও "বিরামক্ষণ,"—"গতিস্থান" ও "বিরামস্থান"-এর যে উল্লেখ করিয়াছেন, মূল প্রবন্ধে তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপনেরই সম্ভাবনা ছিল না, কারণ মূল-প্রবন্ধলেখক স্থিতির সহিত সম্বন্ধবিহীন গতি মূলেই স্বীকার করেন না। যেমন বিন্দু-পরম্পরার সমষ্টিকে রেখা বলে, তেমনি স্থিতিপরম্পরার সংঘটনকেই আমরা গতি-নামে নির্দ্দেশ করি। অব্যবহিত পর পর মুহূর্ত্তে অব্যবহিত পর পর স্থানে স্থিতিরই অপর নাম গতি। এ কথা না স্বীকার করিলে, বলিতে হয়, গতিকালে কোন বস্তু কোন দেশকেই অধিকার করে না।

এইরূপ অব্যবহিত-পরবর্ত্তী কালে অব্যবহিত দেশপরম্পরায় স্থিতি কি কারণে ঘটে, তাহার তত্ত্বালোচনা মূল প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না—প্রত্যুত গতিব্যাপারটির দেশকালঘটিত মুখ্য বৈজ্ঞানিক অবয়বটির প্রতিই তাহার লক্ষ্য সর্ব্বাংশে নিবদ্ধ ছিল।

মুহূর্ত্তের মান-সম্বন্ধে প্রতিবাদী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মূল প্রবন্ধের কিছুই আসে যায় না। কেন না, কালের যে কোন ক্ষুদ্রাৎ-ক্ষুদ্র অংশ হউক না কেন, তাহাকেই মুহূর্ত্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে মূল-প্রবন্ধ-লেখকের কোন আপত্তি নাই। প্রকৃত কথা এই যে, চলবস্তুর কোন একটি স্থিতিকাল কালমাত্রার যে কোন অংশ বা অংশের অংশ হউক না কেন, সকল স্থলেই এ কথা স্বীকার্য্য যে, চলবস্তু একই অভিন্ন মুহূর্ত্তে একই অভিন্ন স্থানে যুগপৎ উপস্থিত এবং অনুপস্থিত হইতে পারে না।

প্রতিবাদী মহাশয় যদি নিম্নলিখিত কথাটির প্রতি একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করেন, তাহা হইলে বোধ করি তিনি মূলপ্রবন্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্যটি বিবেচনার অভ্যন্তরে স্থানদান করিতে ভারবোধ করিবেন না।—কথাটি এই—

মনে কর ক-বস্তু ক-স্থানে স্থির রহিয়াছে। আমি তাহাকে আঘাত করিবামাত্র তাহা ক-স্থান হইতে খ-স্থানে, খ-স্থান হইতে গ-স্থানে, গ-স্থান হইতে ঘ-স্থানে উপনীত হইল। সে বস্তু প্রথম মুহূর্ত্তে ক-স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহার অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তেই খ-স্থানে উপস্থিত হইল, এটা যখন সুনিশ্চিত, তখন, খ-স্থান হইতে যে সময়ে তাহা গ-স্থানে উপনীত হইল, সে সময়েও তাহা যে মুহূর্ত্তে খ-স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহার অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তে গ-স্থানে উপস্থিত হইল, এইরূপ মনে করাই যুক্তিসিদ্ধ। তাহার পরিবর্ত্তে যদি মনে করা যায় যে, সে বস্তু প্রথম মুহূর্ত্তে ক-স্থানে উপস্থিত ছিল এবং দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে খ-স্থানে উপস্থিত হইল এ কথা সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে খ-স্থানে

উপস্থিত ছিল এবং তৃতীয় মুহূর্ত্তে গ-স্থানে উপস্থিত হইল এ কথা সত্য নহে; তবে নিতান্তই এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয়, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সুভাব-সঙ্গীত। শ্রীহরদেব চট্টোপাধ্যায় রচিত। ২য় সংস্করণ। মূল্য ॥০ আট আনা।

সাহিত্যের হিসাবে, সুভাবই যথেষ্ট নহে; তাহা সুব্যক্ত এবং সুবিন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। এই সংগীতগুলির ভাব যে সু, ইহা অনায়াসেই বলা যায়; কিন্তু রচনার দোষে এগুলি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে না, এইরূপ আমাদের বোধ হয়। তথাপি দেখিতেছি, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয়। ভূমিকায় লিখিত আছে যে, হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে পরলোকগত; তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা এই সুভাব-সঙ্গীত পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছেন। সুতরাং পুস্তকের এই সংস্করণ, পিতৃপদে কন্যার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি। এরূপ স্থলে সমালোচনার নির্ম্মম ছুরিকা ব্যবহার আমরা অকর্ত্তব্য মনে করি।

লহরী। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

এই কাব্যখানির কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, মলাটখানি আরও ভাল। এই ভালগুলির সমাবেশে কাব্য হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, এখানি নিশ্চয়ই কাব্য হইত। তবে ভগবানের এই নিষ্ঠুর নিয়ম যে, ছাপাখানার চেষ্টায় কাব্য বলিয়া সামগ্রীটা তৈয়ার হয় না। সুতরাং, এই পুস্তকখানি যে কাব্য হয় নাই, সে অপরাধ সম্পূর্ণই ভগবানের, অবিনাশবাবুর নহে। তাঁহার পরিশ্রম ও যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না।

'কুরুক্ষেত্র'-নামক কাব্যখণ্ড গ্রন্থকার, মাইকেল মধুসূদনকে উপহার দিয়াছেন। সেই উপহার-কবিতায় লিখিত হইয়াছে যে—

"অক্ষম তুলিতে মধু তুলিয়াছি মোম।"

কবিদিগের মধ্যে এরূপ সত্যবাদিতা দুর্ল্লভ।

বালিবধ-কাব্য। শ্রীগুরুতারণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ভাগ্যে মলাটের উপর 'কাব্য' বলিয়া লেখা আছে, নতুবা পুস্তক পড়িয়া কিছুতেই ইহাকে কাব্য বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। গ্রন্থকার কি মনে করেন যে, ছন্দ হইলেই কাব্য হয়?

আশ্বিন। ষষ্ঠ-সংখ্যা

বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

—:o:—

সূচী

৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিনযন্ত্রে,
শ্রীযুগলাচরণ বড়াল দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

কলিকাতা, ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড ২৸৹, কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ১৸৹।
শ্রীনিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদকাহিনী ২৸৹।
শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী—অশ্রুকণা ২৲, আভাস ৸৹, সন্ন্যাসিনী ১৲, শিখা ২৲।
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী—দীপনির্ব্বাণ ১।৹, ছিন্নমুকুল ১।৹, কাহাকে ১।৹, গল্পসল্প ।৶৹ ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ।
শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ—সঙ্গিনী (কবিতাগ্রন্থ) ১৲।
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী—রেণু ৷৷৹।
শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী—অশোকা ১৸৹।
"স্নেহলতা"-রচয়িত্রী—স্নেহলতা, প্রেমলতা (উপন্যাস), প্রসূনাঞ্জলি।
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—অধঃপতন, বিপত্নীক (উপন্যাস), উচ্ছ্বাস (কবিতা)।
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি—সাজি (গল্পের বহি) ১৲।
শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—নবকথা (গল্পের বহি) ১।৹, অভিশাপ ৶৹।
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—সিরাজউদ্দৌলা ১৸৹, সীতারাম রায় ।৶৹।
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল কাগজ ৩৲, বাঁধাই ৩৸৹।
শ্রীজলধর সেন—হিমালয় ১৲, প্রবাসচিত্র, নৈবেদ্য।
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়—বাসন্তী ৷৷৹, হামিদা ৷৷৹।
শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—আইনশিক্ষা ১ম ভাগ ১।৹।
শ্রীকালীচরণ মিত্র—যূথিকা (গল্পের বহি) ১৲, অম্লমধুর ৷৷৹।
শ্রীবঙ্কিমবিহারী দাস—কুসুমযুগল ।৹, আলেখ্যযুগল ।৹,, (গল্প) শ্মশান ।৹, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস ১।৹, ত্রিবেণী ।৶৹।
শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র সংকলিত, প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বের লিখিত উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী—"লিপি-সংগ্রহ" ৷৷৶৹। (বঙ্গদর্শন ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর বিশেষ প্রশংসিত।)
শ্রীরমণীমোহন মল্লিক—চণ্ডীদাস ১৲, জ্ঞানদাস ১।৹, বলরামদাস ১৲, শশিশেখর ।৹, নবীন সম্রাট্ ।৶৹, ইত্যাদি।
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ—মুকুর।
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শকুন্তলা ।৶৹, ক্ষীরের পুতুল ।৶৹।
শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী—আমিষ ও নিরামিষ ২৲, (পাকপ্রণালী)।

বঙ্গদর্শন।

বিরোধমূলক আদর্শ।

আজকাল ইংলণ্ডে খুব একটা লড়াইয়ের নেশা চাপিয়াছে। সৈনিকদলে ভিড়িবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। এই ডাক অন্য-সকল বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বনিত হইতেছে। ফ্রান্স্‌ও যে এ বিষয়ে নিরপরাধ, তাহা নহে। এখন দুই পক্ষের পালোয়ান্ সাহিত্যে পরস্পরকে শাসাইতেছে। ব্রিটিশ্ চ্যানেলের দুই পারে একদল খবরের কাগজ সৈনিকতার রাস্তা দিয়া বর্ব্বরতায় পৌঁছিবার জন্য ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—ব্যক্তিগত ধর্ম্মনীতি হইতে ন্যাশন্যাল ধর্ম্মনীতির আদশের যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, শেষে তাহার কি এইরূপ সমন্বয় হইবে? য়ুরোপ কি ইচ্ছা করিয়া বিধিমতে বর্ব্বরতায় ফিরিয়া যাইবে?

আজকাল দুই পয়সা দিলেই খবরের কাগজে পড়িতে পাওয়া যায় যে, ধাতুগত বিরোধের ভাব, অনিবার্য্য পার্থক্য এবং জাতিগত বিদ্বেষে পরস্পরের বংশানুক্রমিক শত্রুজাতির সহিত, আজ হউক্ বা কাল হউক্, একটা সংঘর্ষ হইবেই! তাহাদের মতে মানুষের প্রবলতম প্রবৃত্তি এবং ন্যায়ধর্ম্মের উচ্চতম নীতিসকল দুই জাতিকে দুই

ওগুস্‌ং রেয়াল্ কন্‌টেম্পোরারি রিভিয়ু পত্রে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ফরাসী ইংরাজকে জানে না, ইংরাজ ফরাসীকে বোঝে না।

ফরাসীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ইংরাজের প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ কেন—উত্তর পাওয়া যাইবে, ইংরাজ মানুষটাকে আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু ইংরাজ জাতটার উপর আমার ঘৃণা।

য়ুরোপের বিদ্যালয়ে যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে অন্য দেশের প্রতি বিরোধ প্রকাশ করিয়া নিজেদের দেশের গৌরব ঘোষণা করা হয়। প্যাট্রিয়টিক্ ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছেলেদিগকে, অন্য দেশের সহিত স্বদেশের সাবেক কালের ঝগড়ার কথা স্মরণ করাইয়া, ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত সেই বিরোধ টানিয়া রাখা হয়। কর্সিকাদেশের মাতৃগণ, অন্য পরিবারের সহিত স্বপরিবারের কুলক্রমাগত যে বিদ্বেষ চলিয়া আসিতেছে, এবং তাহাদের প্রতি যে প্রতিহিংসা করিবার আছে, শিশুকাল হইতে সন্তানের কানে তাহা জপ করিতে থাকে,—য়ুরোপীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানোও ঠিক সেইরূপ।

বিপরীত দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেছে। তাহারা বলে, নেশন্‌দের মধ্যে শান্তিস্থাপনের আশা বাতুলের খেয়ালমাত্র। ইত্যাদি।

এই সকল বিরোধ-বিদ্বেষের বাক্য লক্ষ-লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়া দেশে বিদেশে বিতরিত হইতেছে। এই প্রাত্যহিক বিষের মাত্রা নিয়মমত পান করিয়া দেশের ক্ষতি হইতেছে, সন্দেহ নাই।

প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বাঁধি বোল আছে, যাহা লোকে মুখে উচ্চারণ করে, এবং সে সম্বন্ধে আর চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে গেলেই হাতাহাতি বাধিয়া যায়। বাঁধিবোল মুখে মুখে চলিয়া যায়—লোকে নিঃসংশয়ে জীবন-যাপন করে। প্যাট্রিয়টিক্‌ খুনাখুনী অথবা যোদ্ধৃধর্ম্ম, এইরূপের একটা বাঁধিবোল।

য়ুরোপীয় লেখক যে কথা বলিতেছেন, তাহার উপরে আমরা আর কি বলিব? তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া নাই বলিয়া লেখক অনেক দুঃখ করিয়াছেন—আর ইংরাজে ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বোঝাপড়ার অভাব দাঁড়াইয়াছে, সে জন্য আমাদের কি দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রাচ্যজাতীয়ের প্রতি,—ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞা ইংরাজি সাহিত্যের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরাজ বালকদিগকে ইংরাজ বীরত্বের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিবার জন্য যে সকল ছেলে-ভুলানো গল্প ঝুড়িঝুড়ি বাহির হইতেছে, তাহাতে মুটিনি গল্পের উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে রক্তপিপাসু পশুর মত আঁকিয়া দেবচরিত্র ইংরাজের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রমাণ করিতেছে। ফরাসীকে ইংরাজের ঠিক বুঝিবার উপায় আছে—পরস্পরের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, বর্ণ, একই-প্রকার,—কিন্তু আমাদের মধ্যে যথার্থই পার্থক্য বিদ্যমান। সেই পার্থক্য অতিক্রম করিয়া, এমন কি, সেই পার্থক্য-বশতই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে ঘটিবে, তাহা বিধাতা জানেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অত্যুক্তি ও মিথ্যার দ্বারা অন্ধতা, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি করিতেছে।

বস্তুত এই অন্ধতা নেশন্‌তন্ত্রেরই মূলগত ব্যাধি। মিথ্যার দ্বারা হউক্‌, ভ্রমের দ্বারা হউক্‌, নিজেদের কাছে নিজেকে বড় করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষ্যে অন্য নেশন্‌কে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম্ম—ইহা প্যাট্রিয়টিজ্‌-মের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশন্‌-তন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন ত আমরা এখনো য়ুরোপে দেখিতে পাই না।

পরস্পরকে যথার্থরূপ জানাশুনা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? নেশনের মেরুদণ্ডই যে স্বার্থ। স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরাজ যদি সুদূর এসিয়ায় কোনপ্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে, ফ্রান্স্‌ তখনি সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে, ইংরাজের বলবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও, পরস্পরের সমৃদ্ধিতেও পরস্পরের চিত্তকে বিষাক্ত করে। এক

নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্ব্বদাই আশঙ্কাজনক। এ স্থলে বিরোধ, বিদ্বেষ, অন্ধতা, মিথ্যাপবাদ, সত্যগোপন, এ সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।

সমাজের পক্ষে উদারতা সহজ। হিন্দুরা বলে, স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করাই পুণ্য। অবস্থাভেদে আচারব্যবহারের পার্থক্য ঘটিতেই পারে এবং সে পার্থক্য পরস্পরের পক্ষে মঙ্গলেরই কারণ, এ কথা শান্তচিত্তে নির্ম্মলজ্ঞানে অনুধাবন করিয়া দেখা যায় এবং ভিন্ন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাসম্মান সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও স্বসমাজের কর্ত্তব্যপালন করা কঠিন হয় না। সামাজিক উন্নতিতে মানুষের চারিত্রগত উন্নতি হয়—সে উন্নতিতে কাহারো সহিত স্বার্থের বিরোধ ঘটে না। সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষ, অসত্য, হিংসা, সেই উন্নতির প্রতিকূল। সদ্ভাব ও সত্যই সমাজের মূল আশ্রয়। নেশন্ অনেক সময় ধর্ম্মকে উপেক্ষা ও উপহাস করা আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করে, বাহুবলকে ন্যায়ধর্ম্মের অপেক্ষা বড় বলিয়া স্পষ্টতই ঘোষণা করে ; সমাজ কদাপি তাহা করিতে পারে না ; কারণ, ধর্ম্মই তাহার একমাত্র অবলম্বন, স্বার্থকে সর্ব্বদা সংযত করাই তাহার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

আমরা যদি বাঁধি বোলে না ভুলি, যদি প্যাট্রিয়টীকেই সর্ব্বোচ্চ বলিয়া না মনে করি, যদি সত্যকে, ন্যায়কে, ধর্ম্মকে, ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড় বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে। আমরা নিকৃষ্ট আদর্শের আকর্ষণে কপটতা, প্রবঞ্চনা ও অসত্যের পথে পা বাড়াইয়াছি কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। এবং ধর্ম্মের দিকে না তাকাইলেও সুবুদ্ধির হিসাব হইতে এ কথা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে যে, ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করিলেই বিরোধের আদর্শকে খাড়া করা হয়—সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোন কালে য়ুরোপের মহাকায় স্বার্থদানবের সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারিব ?

আমরা লড়াই করিতে পারি জ্ঞানে, ধর্ম্মে। সেখানে আমাদের পৈতৃক মূলধন আছে। সেখানে কেহ আমাদিগকে ঠেকাইবে না—সেখানে পিতৃলোক এবং দেবতা আমাদের সহায় হইবেন এবং বাঁধি বোলে যদি না ভুলি, তবে ইহা জানা উচিত যে, সেখানে যে মহত্বের উপাদান আছে, তাহা সকল মহত্বের উচ্চে।

কিন্তু এরূপ উপদেশ শুনা যায় যে, প্রকৃতির নিয়ম বিরোধ, অতএব বিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাহির যদি আমার বিরুদ্ধ হয়, তবে আমিও তাহার বিরুদ্ধ না হইলে বাঁচিতে পারিব না। এইজন্য শিশুকাল হইতে ভিন্নজাতির সহিত বিরোধভাবের একান্ত চর্চ্চাই প্যাট্রিয়টীর সাধনা। হিন্দুজাতি সেই পোলিটিক্যাল বিরোধভাবের চর্চ্চাকেই সকল সাধনার অপেক্ষা প্রাধান্য দেয় নাই বলিয়াই নষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কথাটি যদি একান্তই স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলিব, আত্মরক্ষাই মানুষের অথবা লোকসম্প্রদায়ের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মে যদি নাশ করে, তবে তাহাতেই মাথা পাতিয়া দিতে হইবে।

ন্যাশনালধর্ম্মেও সকল সময়ে রক্ষা করে না। ক্ষুদ্র বোয়ারজাতি যে লড়িতে লড়িতে নিঃশেষ হইবার দিকে চলিয়াছে—কিসের জন্য? তাহাদের হৃদয়ে ন্যাশনাল-ধর্ম্মের আদর্শ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই। সে ধর্ম্মে তাহাদিগকে রক্ষা করিল কই?

তা ছাড়া বিনাশের চেহারা অনেক সময় ছদ্মবেশী। অনেক সময় পরিপূর্ণ সম্পদ্ তাহার মুখোষের মত। কথিত আছে, ক্ষয়-কাশে রোগীর কপোলে রক্তিম-লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। সম্প্রতি উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান মিলি-টারিত্বের রক্তিমায় য়ুরোপের গণ্ডস্থল যে টকটকে হইয়া উঠিতেছে, সে কি তাহার স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ? তাহার ন্যাশনালত্বের ব্যাধি অতিমেদস্ফীতির ন্যায় তাহার হৃদয়কে, তাহার মর্ম্মস্থানকে, তাহার ধর্ম্মনীতিকে আক্রমণ করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না?

> অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্ম্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কুশল লাভ করে, শত্রুদিগকে জয় করিয়াও থাকে—কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতির নিয়মের প্রতি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ য়ুরোপের যেরূপ অটল বিশ্বাস, ধর্ম্মের প্রতি ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ হিন্দু সেইরূপ একান্ত বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচারেই যে ধ্রুব মৃত্যু, তাহা নহে, ধর্ম্মনিয়মের ব্যভিচারেও ধ্রুব বিনাশ। ধার্ম্মনৈতিক নিয়মের অমোঘত্বে য়ুরোপ শ্রদ্ধা হারাইতেছে দেখিয়া, আমরাও যেন না হারাইয়া বসি। আমাদের রাজার এক চোখ কানা বলিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখের উপরে যেন পাগ্‌ড়ি টানিয়া না দিই।

নদী তাহার দুই তটভূমির মধ্য দিয়া তটহীন সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। নদীকে যদি তাহার তটের মধ্যেই সম্পূর্ণ বদ্ধ করিবার জন্য বাঁধ দেওয়া যায়, তবে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া তটকে প্লাবিত ও বিনষ্ট করে। প্রাকৃতিক নিয়ম জড় হইতে সচেতনে ধর্ম্মপরিণামের দিকে নিয়ত ধাবিত। সেই পরিণামের দিকে তাহার গতিকে বাধা দিয়া যদি তাহাকে বর্ত্তমানের আদর্শেই একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, তবে তাহা ভীষণ হইয়া প্রলয় সাধন করে। স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আদর্শ, যতই দৃঢ়, যতই উচ্চ, যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্ম্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে, ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। য়ুরোপের নেশন্‌তন্ত্রে এই স্বার্থ, বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনত্বের দিকে—বিশ্বনেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া, নিজের মধ্যেই তাহাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রত্যহ প্রবল হইতেছে। আগে আমার নেশন্, তার পরে বাকি আর সমস্ত কিছু, এই স্পর্দ্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রূকুটী-কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার প্রলয়পরিণাম যদি বা বিলম্বে আসে, তথাপি তাহা যে কিরূপ নিঃসন্দেহ, কিরূপ সুনিশ্চিত, তাহা আর্য্যঋষি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

এই ধর্ম্মবাণী সকল দেশের, সকল কালের, চিরন্তন সত্য, ন্যাশনালম্বের মূলমন্ত্র ইহার নিকট ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক। নেশন্-শব্দের অর্থ যখন লোকে ভুলিয়া যাইবে, তখনো এ সত্য অম্লান রহিবে এবং ঋষি-উচ্চারিত এই বাক্য স্পর্দ্ধামদমত্ত মানব-সমাজের ঊর্দ্ধে বজ্রমন্ত্রে আপন অনুশাসন প্রচার করিতে থাকিবে।

পল্লীর সেকাল ও একাল

বাল্যের কথা মনে পড়ে;—বৈশাখের প্রথম দিন, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়াছি; মঙ্গলারতির ধূপগন্ধে এবং অষ্টগন্ধার সৌরভে বাতাস আমোদিত। কদলীবৃক্ষে, মঙ্গল-ঘটে, সিক্ত আম্রপল্লবের মালায়, বৎসরা-রম্ভের প্রথম অরুণোদয় পুণ্যময় হইয়া দেখা দিয়াছে। আমরা গুরুজনের মাঙ্গলিক কার্য্যে যোগদান করিতে প্রস্তুত, বয়স্য-গণের উৎসাহের সীমা নাই।

অল্প বেলা হইলে নবপঞ্জিকা শোনাইবার জন্য যখন গ্রহাচার্য্য আসিয়া দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে কুশাসনে বসিলেন, তখন পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ সকলে দূর্ব্বাদল এবং পুষ্প হস্তে লইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। অন্তঃপুর হইতে তৈজসপাত্রে আতপতণ্ডুল, কাঁচা আম, ফুল-দূর্ব্বা সাজাইয়া, আচ্ছাদন এবং কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য সহযোগে আনিয়া আচার্য্য-বরের সম্মুখে স্থাপন করা হইল। নবপঞ্জিকা-শ্রবণের ইহাই দক্ষিণা। বক্তা দক্ষিণার প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিদান করিয়া কর্ত্তার আদেশ পাইয়াই "নারায়ণং নমস্কৃত্য" আরম্ভ করিয়া দিলেন; ক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির উৎপত্তির দিনক্ষণ, স্থিতিকাল, গুণদোষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, অবতার এবং মনুষ্যের আকার ও আয়ু প্রভৃতির বর্ণনাপাঠান্তে উপস্থিত বর্ষের ফলাফলকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেই, প্রবীণ শ্রোতৃবর্গের মুখে কখনো হাস্য, কখনো বিষাদের চিহ্ন দেখা দিল। আমরা সেই ভালমন্দ ফলের চিন্তায় কিছুমাত্র হর্ষবিষাদের ধার ধারিতাম না; কেবল বক্তার ভূত-ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের ক্ষমতায় আশ্চর্য্য বোধ করিতাম, আর অনেক অনাবশ্যক অনুস্বার-যুক্ত সংস্কৃত বচনগুলিকে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডি-ত্যের পরিচায়ক সিদ্ধান্ত করিয়া লইতাম। দ্বাদশমাসে দ্বাদশরাশির আয়-ব্যয়-স্থিতির কথা আরম্ভ করিলে, বয়স্থগণের প্রায় সকলেই নিজ নিজ রাশির আয়-ব্যয়টা ভালরূপে জানিয়া নিতেন।

বর্ষফল বলা শেষ হইয়া গেলে শ্রোতৃ-বর্গের মধ্যে নানাজনে নানা প্রশ্ন উপস্থিত

করিতেন। আচার্য্য অম্লানবদনে তৎসমস্তের একটা সমাধান করিয়া দিতেন। বর্ষপ্রবেশে যাঁহাদের ভাগ্য প্রসন্ন জানা যাইত, তাঁহারা হাসি এবং আনন্দ লইয়া গৃহে ফিরিতেন; অন্যেরা কতকটা চিন্তার ভার লইয়া আচার্য্যোপদিষ্ট গ্রহশান্তির যথাসাধ্য উদ্যোগে ব্যাপৃত হইতেন। গ্রামের বড় বড় বাড়ীতে পঞ্জী শোনাইয়া এবং যাহাদের গ্রহবৈগুণ্য ঘটিয়াছে, তাহাদের গ্রহশান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন করিয়া আচার্য্যরা বৈশাখমাসে অনেকটা কাঞ্চনমূল্য লাভ করিতেন। পুরোহিতেরাও পুণ্য বৈশাখের বিচিত্র দৈবকর্ম্মে উদরান্নসংস্থানের যথেষ্ট অবসর পাইতেন।

বৈশাখ ফুলের মাস। তখন ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই বাড়ীতে কিছু-না-কিছু ফুল ফুটিয়া পল্লীপ্রকৃতির প্রসাধন সম্পন্ন করিত। মনে পড়ে গন্ধরাজ, মল্লিকা, বেল, সন্ধ্যামালিকা, জাতি, যূথী, টগর, কুন্দ, রঙ্গণ, শ্বেত-রক্ত-পীত করবীর এবং বিচিত্র চম্পককুসুমের সম্মিলিত স্নিগ্ধ মধুর গন্ধে সমস্ত গ্রাম সৌরভান্বিত হইয়া উঠিত।

শাস্ত্রে বৈশাখমাসে দেবোদ্দেশে পুষ্পদানের অত্যন্ত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিশেষত ভগবদুদ্দেশে নিবেদন না করিয়া পুষ্পের ঘ্রাণ লইতে শাস্ত্রের নিষেধ। যে ফুল ফুটিল, কিন্তু ভগবচ্চরণলাভের সৌভাগ্য-গর্ব্ব করিতে পারিল না, তাহার জন্ম বৃথা; নির্ম্মাল্য ব্যতীত সেই বৃথা ফুলের আঘ্রাণ লইলে কমলার করুণা হইতেও বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা* থাকায় জ্ঞানী গ্রামজনেরা প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে শুদ্ধভাবে সাজী লইয়া পুষ্পচয়নে বাহির হইতেন। পরে সংগৃহীত কুসুমরাশি গ্রামের প্রতি দেবালয়ে ভাগ করিয়া দিতেন। যাঁহাদের আহ্নিককৃত্যে পুষ্প-বিল্বপত্রের প্রয়োজন হইত, তাঁহারা নিজের জন্যও সঞ্চয় রাখিতেন। প্রতি ব্রাহ্মণেরই বাড়ীতে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত আছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণভবনমাত্রেই তখন ফুলের ভাণ্ডার হইয়া উঠিত। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণের গৃহে শূদ্রচিত পুষ্প পূজায় ব্যবহৃত হয় না, তাঁহারা সেই পুষ্পে মন্দির এবং বেদি সাজাইতেন।

চৌর্য্যকর্ম্ম সকল অবস্থাতেই দোষাবহ – ঘৃণার্হ; কিন্তু দেবোদ্দেশে কুসুমাপহরণে পাপভাগী হইতে হয় না, শাস্ত্রবিধি থাকায় অনেক সময় নিদ্রিত গৃহবাসীর স্বগৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবার্চ্চনার বা কাম্যপূজার ফুল অপহরণপূর্ব্বক দেবোদ্দেশে দান করিয়া পুণ্যবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অনেকে দ্বিধা বোধ করেন না। বলা বাহুল্য, সেই অবস্থায় অনেক সময় পরের বাগান-লুণ্ঠন শেষ করিয়া নিজের সযত্নপালিত বাগানটিকে নিতান্তই কুসুমনির্ধন দেখিয়া পুষ্পচোরকে মর্ম্মাহত হইতে হইত।

বালক-বালিকারা এই সময়ে ফুলের খেলায় মাতিয়া উঠিত। তাহাদের কেহ কেহ প্রবীণগণের অনুকরণে প্রাতঃস্নানাদি করিয়া পুষ্পচয়নপূর্ব্বক দেবমন্দিরে দান করিয়া আনন্দবোধ করিত; অনেকে

* লক্ষীর উক্তি—চিরং স্মাতি ক্রতং ভুঙ্‌ক্তে পুষ্পং প্রাপ্য ন জিঘ্রতি।
যো ন পশ্যেৎ স্ত্রিয়ং নগ্নাং নিয়তং স চ মে প্রিয়ঃ॥

নিজেদের ক্ষুদ্র খেলাঘরের খেলার দেবতার জন্যই তাহা সংগ্রহ করিত।

বালক-বালিকা ও অভিভাবকবর্গের নিকট তরুণী এবং প্রৌঢ়া গ্রামবধূরা ফুল চাহিয়া লইত; অনেক সময় না চাহিয়াই পাইত। সেই বিচিত্র কুসুম, তুলসীদল-মঞ্জরী ও বিচিত্র পত্রের দ্বারা তাঁহারা কত মনোহর মাল্য আর বিচিত্র আভরণ রচনা করিয়া দেবমন্দিরে দান করিতেন। পূজক অপরাহ্নে সেই কারুখচিত মাল্যাভরণে বিগ্রহ সাজাইতেন। সন্ধ্যারতির সময় শুভ্র দীপ-মালার আলোকে আবালবৃদ্ধ নরনারী কুসুমাভরণশোভিত বিগ্রহ দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। আরতির পরে প্রণামান্তে চরণামৃত পান করিয়া সকলেই নির্ম্মাল্য লাভ করিতেন, আভরণরচয়িত্রী-গণ অন্তঃপুরে থাকিয়াও নির্ম্মাল্যবিতরণের যোগ্য অংশে বঞ্চিত হইতেন না। তখন সেই প্রসাদী পুষ্পাভরণ প্রিয়জনগণের পরস্পর উপহারে বিচিত্র ক্রীড়ায় সাদরে ব্যবহৃত হইত।

বৈশাখমাসের প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গল-চণ্ডীদেবীর পূজা প্রবন্ধলেখকের দেশে প্রতি হিন্দুগৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন গরিব প্রতিবেশীরা পুরোহিতগৃহে বা পাড়ার বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীতে নিজেদের সামান্য পূজোপকরণ ও একটি ঘট লইয়া গিয়া একসঙ্গে পূজা করিত। বলা বাহুল্য, পরস্পরের সহযোগে তখন এই সকল উৎসব শতগুণে উৎসাহময় হইয়া উঠিত। সেই মঙ্গলচণ্ডীপূজার পূর্ব্বরাত্রি, পুষ্পাহরণকারী বালকবৃন্দের আনন্দসঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিত। মনে আছে, সেই ফুলতোলা উপ-লক্ষ্যে কত রাত্রিজাগরণ, অভিভাবকগণের নিকট কত অসঙ্গত কারণ প্রদর্শন, কত কাঁটাফোটা, কত বৃষ্টিতে ভিজা, কত বন্ধুলাভ, আর কত বন্ধুবিচ্ছেদই না ঘটিয়াছে।

তখন বালকদিগের পুষ্প-বিল্বপত্র আহ-রণে, বালিকাগণের দূর্ব্বাদল আহরণ ও কুশাকুশি প্রভৃতির মার্জ্জনে—গৃহিণীকুলের সাগ্রহ পূজার আয়োজনে, গৃহস্বামিগণের ব্যস্ত কর্ত্তৃত্বে, মঙ্গলচণ্ডীপূজায় যে উৎসাহের অভিনয় হইত—আনন্দের লহরী উথলিয়া উঠিত, বর্ত্তমানের দুর্গোৎসবও তাহার তুলনায় নিতান্তই নির্জ্জীব। পুরোহিত আসিয়া যখন পূজায় বসিয়া শঙ্খধ্বনি করিতেন, তখন বালক-বালিকারা দীপ্ত উৎসাহে কাঁশর, ঘড়ি প্রভৃতির গাত্রে নির্দ্দয় প্রহার করিয়া মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীর অর্চ্চনাসংবাদ প্রতিযোগী বালক-বালিকা-গণকে জানাইয়া দিত। পূজা শেষ হইয়া গেলেই প্রসাদের পালা। বালকবালিকারাও অনেকে পূজাপর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় উপবাসী থাকিয়া কিরূপ পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ ভোগ করিত, তাহা কিয়ৎপরিমাণে পল্লীর বালকবালিকারা আজিও অনুমান করিতে পারে।

এই সকল উৎসবের প্রধান অঙ্গ শিশু-গণ; তাহারাই উৎসবের আনন্দকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে, এবং এই আনন্দের হিল্লোলে তাহাদের জীবন সর্ব্বদা আন্দোলিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

বৈশাখমাসের আর এক উৎসব ফুল-দোল বা চন্দনী যাত্রা। পুরাণোক্ত দ্বাদশ

মাসের দ্বাদশ যাত্রার ইহা অন্যতম। বৈশাখী পূর্ণিমা এই যাত্রার দিন, বৈশাখী পূর্ণিমায় এই ফুলের মহোৎসব। কেবলই ফুল,—বিগ্রহে, সিংহাসনে, মন্দিরে, বাহিরে, কেবল বিচিত্র পুষ্পরাশির সম্মোহন সৌন্দর্য্য! নাটমন্দিরের ঝাড়-লণ্ঠন হইতে স্তম্ভগুলি পর্য্যন্ত কুসুমদাম-শোভিত। নরনারীর কণ্ঠে প্রসাদী মালা, হাতে ফুলের স্তবক; সমস্ত মালা, স্তবক এবং বিক্ষিপ্ত পুষ্পসম্ভার চন্দনানুলিপ্ত। চন্দনগন্ধে কুসুমসৌরভ অনুপ্রাণিত হয় বলিয়াই বুঝি ইহার নাম 'চন্দনী যাত্রা।' এই কুসুম-সুকুমার উৎসবে বাল্যের পল্লীপ্রকৃতি যে এক আনন্দরসধারায় নিমগ্ন হইয়া যাইত, তাহা স্মরণ করিলে আজিও একটা উৎকণ্ঠা-কুল সু-রসাল ভাব অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে! এই উৎসব যদিও দেবালয়বিশেষেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু তখন তাহাতে সমস্ত গ্রামবাসী সমান উৎসাহ, সমান আনন্দ, সমান উৎসবাকুলতা বহন করিত; তখনকার পক্ষে ইহাও সার্ব্বজনীন উৎসব।

ছোটখাট আরও অনেক উৎসব বৈশাখের দিনগুলিকে নন্দনীয় করিত, সে সকলের উল্লেখে প্রবন্ধ একান্তই বাড়িয়া যাইবে, কাজেই সেগুলিকে বর্জ্জন করা গেল।

কাঁচা আম কুড়ান এই সময়ের একটা পরম উল্লাস। বাতাস না হইলে আম পড়ে না, কাজেই পবনদেবকে আম্রতরুর শাখাসঞ্চালনের জন্য কত যে অনুরোধ করা গিয়াছে, তাহার সীমা নাই। বলা বাহুল্য, বালক-বালিকাগণের করুণ প্রার্থনাতেই হউক, আর নায়িকালাভের উৎসাহেই হউক, চৈত্রের শেষাশেষী হইতে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত পবনদেব যথেষ্টই উত্তেজিত হইয়া উঠেন। কাজেই আম-কুড়ান কর্ম্মটা স্বচ্ছন্দেই চলিয়া থাকে। সেই আমকুড়ান উপলক্ষ্যে বৃষ্টিতে ভিজা, ঝড়ভগ্ন ডালপালার আঘাত লাগা, হাত-পা-কাটা প্রভৃতি অনেক উপসর্গ ছিল, কিন্তু তাহাতে তখন আমকুড়ানোর মর্য্যাদা কিছুমাত্র হ্রাস হইত না। গৃহিণীগণ যদিও অনেক সময় নানা আশঙ্কা করিয়া ঝড়বৃষ্টির উপদ্রবে ছেলেদের বাহির হইতে বাধা দিতেন, কিন্তু কোনপ্রকারে তাঁহাদের হাত ছাড়াইয়া পলাইতে পারিলে, যখন থাল, ডালা ও টুকরি ভরিয়া ভরিয়া আম্রসম্ভার আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরা হইত, তখন তাঁহারা যে খুব অসন্তুষ্ট, এরূপ মনে হইত না। তখন তরুণ এবং প্রৌঢ়গণ পর্য্যন্ত অনেক সময় শিশুদের সঙ্গী হইতেন, এবং অন্তঃপুরের আমকুড়ান-ব্যাপারে গৃহলক্ষ্মীগণ একমাত্র আপনাদেরই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। যখন সেই ধারাসিক্ত কুলসুন্দরী-গণ আর্দ্রবস্ত্রে কটিদেশ-বন্ধন-পূর্ব্বক ডালা হাতে করিয়া অন্তঃপুরের আন্দোলিত আম্রকুঞ্জে সঞ্চরণ করিতেন, আর তাঁহাদের আলুলায়িত সিক্ত কুন্তলজালে গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া জলবিন্দু ক্ষরিত হইত এবং স্বভাবজাত লতার গতিতে হেলিয়া ভুলিয়া তাঁহারা পরস্পরে হারাজিতি ধরিয়া তাড়াতাড়ি কাড়াকাড়ি করিয়া আম কুড়াইয়া ডালা ভরিতেন, তখন উন্মত্ত পবন নিশ্চয়ই নিজেকে পুরস্কৃত জ্ঞান করিত। তখন

গৃহলক্ষ্মীগণের নিপুণ গৃহিণীপনায় ভবিষ্যতের জন্য কাঁচা আমের নানাপ্রকার আচার, আমচুর, কাসন্দী প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। দানধর্ম্ম আদান-প্রদান চলিত। তা ছাড়া যে যে গ্রামে এই ফলের অভাব, সেই সকল পল্লীর নিম্নশ্রেণীর রমণীজনেরা আপনাদের ক্ষেত্রজাত ধনে, মৌরী, জিরা শোম্প অথবা পরিশ্রমনির্ম্মিত সাজী, ধুচুনী, কুলা বা পরিষ্কার পাতলা চিঁড়ার বিনিময়ে যথেষ্ট আম লইয়া যাইত। সেই চাষী গৃহিণীদের সঙ্গে যে সকল বালক-বালিকা উৎসাহে ঝুড়িসহ ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারা প্রায় সকল বাড়ীতে দুই চারটা করিয়া আম প্রাপ্ত হইত।

আম পাকিতে আরম্ভ হইলেই গ্রামবাসী প্রত্যেক হিন্দুগৃহস্থ অবস্থানুসারে আম আর দুগ্ধ প্রথমে গ্রামের প্রতি ব্রাহ্মণ-ভবনে প্রতি দেবালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। দেবদ্বিজে দানের পূর্ব্বে গৃহস্বামিগণের পক্ষে পাকা আম খাওয়া একরূপ নিষিদ্ধই ছিল। কোন কোন বাড়ীতে এই সময়ে কালীপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়; দেবালয়ে আম-দুধ দিয়া, বাসিক-পূজা সম্পন্ন করিয়া, পিতৃলোকের উদ্দেশে আম্রাদি নিবেদন করিয়া, তার পরে অনেক গৃহস্বামী আম খাইতেন।

মনে আছে, তখন গ্রামের এক বাড়ীতে যে দিন কালীপূজা, সেদিন সমস্ত গ্রামবাসী কোন-না-কোন প্রকারে তাহাতে আপনাদের আন্তরিক সহায়তা জ্ঞাপন করিত। বালক-বালিকারা ত সকলেই যেন নিজেদের বাড়ীর পূজা মনে করিত, তাহাদের উৎসাহ বর্ণনার সীমার বাহিরে। কিন্তু বয়স্কগণেরও কোনপ্রকার ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইত না। পূজার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে প্রতিবেশিনীরা পূজাবাড়ীতে মিলিত হইয়া নানা উপকরণ প্রস্তুত করিত। পূজার দিন সেই সকল ফুল্লচিত্তা সরলা পল্লীরমণীরা পূজাবাড়ীর অন্তঃপুরে মিলিত হইয়া উলু দিয়া সমস্বরে পূজাবিষয়ক বিচিত্র সঙ্গীতের মধুর লহরী তুলিয়া নিস্তব্ধ নৈশ-গগন ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিত। মন্দিরপ্রাঙ্গণে উৎসাহী পুরুষসম্প্রদায় খোল-করতালের সহিত সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিতেন। ঢুলীরা আসিয়া শানাই, কাঁসী, টাঁসার সহিত ঢোলের ঢুপঢুপানি আরম্ভ করিয়া দিত। দূর হইতে সেই নিশীথকালে সকলগুলিই পৃথক্ ভাবে কানে পৌছিত। মধ্যে মধ্যে ঘড়ি-কাঁসরের গর্জ্জন ও শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইত; কেন না, সেগুলির কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বালক-দলের উপর। এইরূপে গোলেমালে আমোদে প্রমোদে সঙ্গীতে কীর্ত্তনে কাটাইয়া নিশীথ-রাত্রিতে পূজাবসান হইলে, আনন্দের সহিত প্রসাদ লাভ করিয়া সকলে গৃহে ফিরিতেন।

জ্যৈষ্ঠমাসের 'সাবিত্রীব্রত' কুলবতীগণের অনেকেই তখন করিতেন। ইহা যদিও সার্ব্বজনীন উৎসব নহে; তথাপি ইহার আয়োজনে উদ্যোগে সকলেই ব্যস্ত হইতেন। এরূপ উপবাসবহুল কঠিন ব্রত বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু স্বামীর কল্যাণ-কামনায় সাধ্বী রমণীগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে এই অনশনময় ব্রত পালন করিয়া নিরালস্যে তিন-চারি-দিন-ব্যাপী উৎসবে আনন্দে যোগদান করিতেন। দুই দিন নিরম্বু অনশন

এবং পূর্ব্বে ও পরে যথাবিধি সংযমন করিয়া স্বয়ং পুনঃপুন স্নানান্তে পবিত্রভাবে পূজার উদ্যোগ করিয়া দেওয়া এবং অভ্যাগতা ও প্রতিবেশিনীগণের সাদর সম্ভাষণে তৎপরতা প্রকাশ করা সাধ্বীগণের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও নিষ্ঠার পরিচায়ক।

জ্যৈষ্ঠমাসের ছোটখাট অনেকগুলি ব্রত-উৎসবাদি বাদ দিলেও 'ষষ্ঠীব্রতে'র উল্লেখ অবশ্যকর্ত্তব্য। পশ্চিম বঙ্গে ষষ্ঠীবাঁটায় জামাতারই পূর্ণ অধিকার থাকায় ইহা "জামাই ষষ্ঠী" নামে অভিহিত হয়। প্রবন্ধ-লেখকের দেশে এই ব্রত সন্তানবতী রমণীরই অবশ্যকর্ত্তব্য। সন্তানহীনা অনেকেও সন্তানকামনায় ষষ্ঠীদেবীর কৃপাভিখারিণী হইয়া থাকেন। ষষ্ঠীবাঁটায় পুত্রের দাবি অগ্রগণ্য; কিন্তু কন্যা, জামাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতি পুত্র এবং কন্যা স্থানীয় সকলেই সমানভাবে বাঁটা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপর দিকে কন্যা মাতাপিতার— এবং পুত্রবধূ শ্বশুরশাশুড়ীর মাতৃত্বগৌরব লইয়া যখন ষষ্ঠীদেবীর কাছে তাঁহাদের দীর্ঘায়ুপ্রার্থনা জানাইয়া ষষ্ঠীর আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ "জীব চাউল" এবং বাঁটা সন্তান-স্নেহের উচ্ছ্বাসে শ্বশুরশাশুড়ী, পিতামাতা প্রভৃতি যোগ্য গুরুজনের হস্তে দান করিয়া সহাস্যে তাঁহাদের নিছনী লইয়া জননী-রূপে সম্মুখে দাঁড়ায়, সেই শান্ত করুণ মধুর ভাব বর্ণনা করিবার ক্ষমতা প্রবন্ধলেখকের নাই।

তখন প্রতিবেশী আর গ্রামবাসীদের মধ্যে গ্রামসম্পর্কের মর্য্যাদা স্বজনসম্পর্কের তুল্যমূল্য ছিল। সুতরাং এক এক ব্রতিনীকে যে ষষ্ঠীদেবীর কাছে কত বাঁটা প্রস্তুত করিতে হইত, এবং এক এক জনকে যে কত বার বাঁটা খাইতে হইত, তাহার কিছু স্থিরতা নাই।

আমের দিনে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে প্রায় ফলা-রের নিমন্ত্রণেই কাটাইতেন। এমনও দিন গিয়াছে, যখন এক এক দিন দুই তিন স্থানে ফলাহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পাকযন্ত্রটিকে নিতান্তই বিপাকে ফেলিতে হইত। দক্ষিণায় অপর অংশী না থাকিলেও অবস্থাপন্নের বাড়ীতে ব্রাহ্মণগণের উপলক্ষ্যে জ্ঞাতি এবং অন্যান্য জাতিও চব্যচোষ্যাদির ভাগ লইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু তখন দেখা গিয়াছে, ব্রাহ্মণগণের অনেকে ব্রহ্মতেজের প্রভাবে যে পরিমাণ ক্ষীর,দধি,আম্র,কণ্টকী, চিপিটক-শর্করা-সহযোগে উদরস্থ করিয়া অনায়াসে পরিপাক করিতে সমর্থ হইতেন, অপর লোকের পক্ষে তাহা একরূপ অসম্ভব বিবেচিত হইত। পাকযন্ত্রের এরূপ কঠোর ব্যায়ামচর্চ্চার সুবিধা সাধারণের ভাগ্যে অল্পই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের এরূপ পরাভব ভবিতব্য। ভোক্তাদের পূর্ব্বে যথেষ্ট সমাদর হইত। কৃতিগণ সাগ্রহে তাঁহাদের পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইতেন।

হায় এই কয়দিনে সেই পল্লীপ্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এইবারের বৎসরারম্ভের কালে স্বদেশে থাকিয়া কি নীরস ভাববিপর্য্যয় প্রত্যক্ষ করিয়া নিরাশ হইতে হইয়াছে। এখন কোন উৎসবে উৎসাহ নাই। পরস্পরের মধ্যে সেই ঐক্য-বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। নবপল্লী

অনেকের বাড়ীতে পঠিত হয়, কিন্তু প্রতিবেশীর ভিড় নাই,—আবশ্যক অনাবশ্যক প্রশ্নের গন্ধ নাই।

ফুলের বাগান এখন প্রায় লঙ্কা, তামাক এবং বেগুনের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। যে দুই চার বাড়ীতে এখনও ফুলের বাগান আছে, সেখানেও এখন পুণ্যেচ্ছু প্রবীণ এবং ক্রীড়াসক্ত শিশু বৃন্দের ব্যগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না। দুই এক স্থলে পুষ্পযাত্রা হয়, কিন্তু সেই কুসুমমকরন্দপানলোলুপ মধুপশ্রেণীর মত জানপদবৃন্দ দলে দলে তাহাতে আসিয়া আনন্দমত্ততা প্রকাশ করে না। ফুল্ল বৈশাখী পূর্ণিমার রজনী এখন তরুণ-তরুণীর আনন্দসঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠে না। আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠলগ্ন সচন্দন কুসুমদামের অপূর্ব্ব শোভা ও মধুর সৌরভ নয়ন এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতর্পণ করিয়া অকারণ উৎকণ্ঠায় কাহাকেও ব্যগ্র করে না।

পিতামহরোপিত আম্রতরুশ্রেণীর অনেকগুলিই নানারূপে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া জালানি কাঠের কাযা করিয়াছে। তাহার স্থলে নূতন গাছ প্রায় রোপিত হয় নাই। অবশিষ্ট জরাজীর্ণ প্রাচীন আম্রতরু কখনই প্রচুর ফল প্রসব করিতে পারে না, জীর্ণতরুর ফলও যথেষ্ট হীনবল—ক্ষুদ্র। তজ্জন্যই বুঝি এখনকার শিশুদলও অনেকটা শান্ত, দান্ত ও তিতিক্ষু হইয়া পড়িয়াছে।

পূজার বাড়ীতে এখন কর্ম্মকর্ত্তা সাধ্যসাধনা করিয়াও প্রতিবেশীর সহায়তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হন না। রমণীগণের মধ্যেও মান-অভিমানেরই অভিনয় অধিক চলিয়া থাকে। শিশুদল ইচ্ছাসত্ত্বেও মানী অভিভাবকগণের শাসনে ঘুমাইয়া পূজার স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নেই প্রসাদসুধা লাভ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করে। যুবকদের মস্তকটি প্রায় ধরিয়াই আছে; বরং প্রসাদবিতরণের সময় দুই চার জন বৃদ্ধকেই উৎসাহে উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

আম-দুধ এখনও দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এখন ইহা সার্ব্বজনীন নহে, অথবা ইহার একান্তকর্ত্তব্যতা কেহই মনে করে না। এখন ইহা যেন লৌকিকতায় পরিণত হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বের তুলনায় সাবিত্রীব্রত এখন ঐ অঞ্চলে কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে মনে হয়; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক ব্রতিনী এই পবিত্র-প্রেমসম্ভূত সাবিত্রীব্রতের সংযত অনুষ্ঠানকে একটা উদ্ভট লোক-দেখান সতীত্বনিষ্ঠার বাহ্য অভিনয়ের আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাদের ব্রতে সেই প্রাণগত দাম্পত্যনিষ্ঠার আড়ম্বরহীন অনুরাগের স্থলে কতকটা ঔপন্যাসিক উৎকট প্রেমবিকার স্থানলাভ করিয়াছে।

ষষ্ঠীব্রতে আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্পর্ক অনুসন্ধান করিয়া পুত্রকন্যাস্থানীয়দের প্রতি রমণীকুলের মাতৃস্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না, এই নীচ স্বার্থপরতার দিনে আপনাদের পুত্র-কন্যা-জামাতা ছাড়া অন্য সম্পর্কের সহিত সম্পর্ক রাখাও অনেকে অনাবশ্যক বিবেচনা করে।

বর্ত্তমানে খুব অল্প স্থলেই ব্রাহ্মণগণ ফলাহারের নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত হন,

ইংরাজিগন্ধহীন নিরক্ষর ব্রাহ্মণযুবক এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত মিথ্যাভিমানী যুবক এবং প্রৌঢ়েরাও বাড়ীতে আহার করিয়া অনেক সময়ই অপরাহ্ণে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া সামান্য জলযোগের দ্বারাই কৃতীকে বাধিত করিয়া থাকেন। সরল ব্রাহ্মণবালকেরা এখনও ক্বচিৎ নিমন্ত্রণ লাভ করিলে সাগ্রহে যথাসময়ে বৃদ্ধদের সহিত নিমন্ত্রণবাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং প্রবীণগণের মুখে অতীত নিত্যনৈমিত্তিক নিমন্ত্রণের প্রচুর গল্প শুনিয়া উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে।

পূর্ব্বে পরস্পরের মধ্যে প্রতি ঘটনায়, প্রতি কর্ম্মে, একটি সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধন জাগ্রত হইয়া উঠিত; এখন ঈর্ষ্যাদ্বেষের তীক্ষ্ণ-ছুরিকা অলক্ষ্যে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সম্বন্ধবন্ধনের মূলচ্ছেদপূর্ব্বক একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ এবং মিথ্যা অপবাদ রচনা করিয়া, কর্ম্মহীন অবশিষ্ট অধিকাংশ পল্লীবাসী জঘন্য ক্রূরকর্ম্মেই জীবনযাপন করিয়া থাকে। ভাগ্যবান্ এবং মনস্বিগণের যাঁহারা গ্রহবৈগুণ্যে স্বদেশের পল্লীভবনে বাস করিতে বাধ্য হন, তাঁহারা অনেক সময়েই মূঢ় অথচ শিক্ষাভিমানী উদ্ধত ক্রূর-বুদ্ধি গ্রাম্যদেবতাগণের অশিষ্ট ব্যবহারে ক্ষুব্ধ—মর্ম্মাহত হইয়া কোনপ্রকারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব।

সগোত্র-বিবাহ

বর-কন্যার অবয়ব এবং গাত্র, চক্ষু ও কেশের রং প্রভৃতির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেক সময়ে উভয়ের শরীর সম-ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এ সব বিষয়ে পাত্র-পাত্রী পরস্পর হইতে যত ভিন্ন-রূপ হয়, ততই ভাল। কারণ সমধর্ম্মাক্রান্ত-শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাহ নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনা; অথবা সন্তান হইলেও তাহাদের দীর্ঘজীবন আশা করা যায় না। (E. B. Foote, M. D., New york.) বোধ হয়, সমধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাহ নিকট-সম্পর্কিতদের বিবাহের তুল্য; কারণ নিকট-সম্পর্কিতদের বিবাহের অশুভকরত্ব স্বামি-স্ত্রীর গুণসাম্যেরই ফলমাত্র।

এস্থলে পাত্রপাত্রী-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে আর একটি অতি গুরুতর প্রশ্নে উপস্থিত হই-তেছি। প্রশ্নটি এই—বর-কন্যার মধ্যে শোণিতসম্পর্কের ফলাফল কি? বাক্য-প্রয়োগের সুবিধার নিমিত্ত তদ্রূপ সম্পর্কের অস্তিত্বস্থলে বিবাহ সমশোণিত ও তদভাবে বিষমশোণিত নামে অভিহিত হইবে।

প্রাচীন মিশর ও পেরুর রাজপরিবারে সময়ে সময়ে সহোদর-সহোদরা উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। আধুনিক সভ্যসমাজমাত্রেই

এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ। খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে এখনও নিকট আত্মীয়-আত্মীয়ার পরিণয় প্রচলিত আছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতেছেন। সমশোণিত বিবাহের প্রতি বিমুখতা বোধ হয় হিন্দুসমাজের ন্যায় অন্য কোনও সমাজেরই নাই। চীনদেশে এ বিষয়ে কিছু কড়াকড়ি আছে; কিন্তু তাহাও আমাদের দেশের ন্যায় বলিয়া জানিতে পারি নাই।

যে সকল উদ্ভিদের পুষ্পে পুংকেশর ও গর্ভকেশর দুই-ই বিদ্যমান, তাহাদেরও বীজোৎপাদনের নিমিত্ত এক পুষ্পের গর্ভকেশরে অন্য পুষ্পের পরাগের সংযোগ হওয়া আবশ্যক হয়। নিজ-পরাগ-সংযোগে কোন পুষ্পই বোধ হয় পূর্ণরূপ উর্ব্বরতা লাভ করে না। অধিকন্তু কোন বৃক্ষের নিজ-পরাগ-সহযোগে চিরকাল তাহার বংশরক্ষা হইতে পারে না। অন্তত দীর্ঘকাল পরে পরে তজ্জাতীয় অন্য কোন বৃক্ষের পরাগ প্রথমোক্ত বৃক্ষের গর্ভকেশরে সংযোগ করা আবশ্যক হয়। এতদ্ব্যতীত কালক্রমে বৃক্ষের উর্ব্বরতা নষ্ট হইবে বলিয়াই ডারুইন অনুমান করেন। এই দুইটি সত্য সমশোণিত বিবাহের বিরুদ্ধে অতি প্রবল যুক্তি। ইতর জন্তুদিগের মধ্যে সমশোণিত-বিবাহ-জাত সন্তানগণের হীনতা পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্যসমাজেও সমশোণিত বিবাহ শুভকর হয় না। Marriage and Heredity নামক গ্রন্থের প্রণেতা নেস্‌বিট্ সাহেব মনেঃকরেন, ইংরেজ অভিজাত-সম্প্রদায়ের বর-কন্যা-নির্ব্বাচনক্ষেত্র অল্পপরিসর হওয়াতে তাঁহাদের গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে। ক্রমাগত নিম্নতরশ্রেণীস্থ যোগ্যব্যক্তিদের সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীতে উন্নয়ন দ্বারা নূতন শোণিতের অনুপ্রবেশ ব্যতীত অভিজাতদিগের বংশ-লোপেরই সম্ভাবনা। প্রাচীন অনেক অভিজাত পরিবারের লোপই তাহা প্রমাণ করিতেছে। তুরস্কের প্রাচীন অভিজাত পরিবারসমূহের বৈবাহিক সম্বন্ধ সুদীর্ঘকাল স্বশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় বিবাহে সমশোণিতত্ব ঘটিয়া তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছে। য়ুরোপীয় রাজবংশ-সমূহে পুনঃপুন আদান-প্রদান দ্বারা রক্ত-সাম্যের আতিশয্য ঘটিয়াছে। রাজেতর শোণিত য়ুরোপীয় সিংহাসনাধিকারীদিগের শরীরে প্রায়ই প্রবেশ করে না। ফলও নিতান্ত ভীতিজনক। যদিও রুষিয়ার বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা ভীমশক্তি ছিলেন, তথাপি জার দ্বিতীয় নিকলাসের শরীর নিতান্ত রোগপ্রবণ। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ পুত্রশোকে জর্জ্জরিত। ইংলণ্ডের হানভারিয়ান্ রাজবংশ স্বাস্থ্যহীনতার জন্য প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান রাজ-পরিবারে প্রায় কেহই কোনও কঠিন রোগের আক্রমণ হইতে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। স্পেন ও পর্টুগালের রাজবংশে সমশোণিত বিবাহের সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় ফল ফলিয়াছে। এই দুই দেশের রাজগণ অনেক সময়েই স্ববংশসম্ভূতা নিকট আত্মীয়াদিগকে মহিষীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সকল বিবাহ কখনও নিষ্ফল হয়; কখনও বা ক্ষীণমস্তিষ্ক দুর্ব্বলদেহ সন্তান-দিগকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে।

প্রাচীন হিন্দুগণ স্ববংশে বিবাহনিষেধ দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া-

ছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক সামাজিক কুপ্রথা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি। রাঢ়ীয় ফুলেমেলে রঘুরাম চক্রবর্ত্তী ও বিষ্ণুঠাকুরের বংশে আদান-প্রদান চলে। বর্ত্তমান লেখক রঘুরাম চক্রবর্ত্তী হইতে এবং তাঁহার ভাগিনেয় বিষ্ণুঠাকুর হইতে সপ্তম পুরুষ। বহুবিবাহ ও বহুসন্তানবত্তা নিবন্ধন রঘু ও বিষ্ণুর বংশ অতি বিস্তৃত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত দুই চারিটি বাদে রঘুরামের বংশের প্রায় সমুদয় কন্যা বিষ্ণুর বংশে সম্প্রদত্তা হইয়াছে; বিষ্ণুর বংশেরও বহু কন্যা রঘুরামের বংশধরদিগের গৃহলক্ষ্মী হইয়াছেন। সাত পুরুষের মধ্যে প্রতিপুরুষে এইরূপে পুনঃপুন আদান-প্রদান রক্তসাম্য স্থাপন করিয়া সমশোণিত বিবাহের দোষ উৎপাদন করিবারই সম্ভাবনা। সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও নির্ব্বাচনক্ষেত্রের এরূপ সঙ্কীর্ণতা কালক্রমে নানাদোষের আকর হইতে পারে। এ বিষয়ে সময় থাকিতে সাবধানতা আবশ্যক।

কিন্তু স্ববংশে বিবাহ দূষণীয় হইলেও হিন্দুগণ এ বিষয়ে একটুক বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সগোত্র ব্রাহ্মণদ্বয় বিশ-পুরুষ-ব্যবধান হইলেও পরস্পরের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। অথচ সাত পুরুষের মধ্যে দুই ব্যক্তির বংশে কত আদান-প্রদান হইয়াছে, পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। দেবীবরের কৃপায় কুলীনদের অন্য পন্থা নাই। কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত রীতিও আপনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বহুদূরবর্ত্তী সগোত্র ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাহ প্রতিষেধ করিতে পারে না। মনু বলিতেছেন—

> অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
> সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ ৫॥
>
> তৃতীয় অধ্যায়।

এতদনুসারে সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ; কিন্তু মাতামহগোত্রে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নহে। যখন পূর্ব্বপুরুষদের 'জন্মনামের প্রত্যভিজ্ঞান' থাকে না, অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে যখন চৌদ্দ পুরুষের অধিক ব্যবধান ঘটে, তখন মাতামহগোত্রে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে। অসপিণ্ড কথাতে এত গোলযোগ আছে যে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান আমার সাধ্যাতীত। তাই সে-সকলের সারোদ্ধার করিয়া পাঁচটি বংশাবলীর চিত্র দিলাম; তাহা হইতেই দৃষ্ট হইবে, বিবাহের জন্য পাত্র-পাত্রীর মধ্যে অন্যূন কত ব্যবধান আবশ্যক।

১ম চিত্র।

২য় চিত্র।
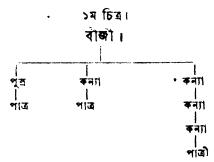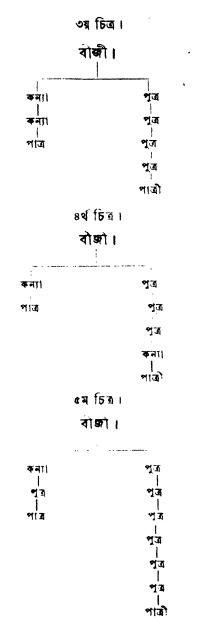
বয়সে কুলাইলে যে যে পুরুষ ও রমণীর মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে পাত্র ও পাত্রী নামে অভিহিত করা হইল। বয়সে কুলান সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রপৌত্র বা প্রপৌত্রী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র বা কন্যার মধ্যে অনেক সময়ে আট দশ বৎসর মাত্র বয়সের তারতম্য দেখা যায়। তাই নিষিদ্ধ না হইলে তদ্রূপ স্থলে বিবাহ চলিতে পারিত। অতএব উপরে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে দুই তিন পুরুষ বা তদধিক ব্যবধান দেখিয়া কার্য্যত বিবাহ অসম্ভব ভাবিবার বিশেষ কারণ নাই।

পুত্রকন্যার শরীরে পিতামাতার গুণ সমভাবে সংক্রমিত হয়। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে পুত্রশরীরে পিতার শোণিত অর্দ্ধেক মাত্র; পৌত্র ও দৌহিত্রে তদর্দ্ধেক; প্রপৌত্র ও প্রদৌহিত্রে তাহারও অর্দ্ধেক, ইত্যাদি। এস্থলে পুংসন্তানবাচক শব্দগুলি অপত্য-বাচক বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, এই সব বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথম চিত্রে পাত্রপাত্রীর শরীরে যথাক্রমে $\frac{১}{৮}$ ও $\frac{১}{১৬}$, দ্বিতীয় চিত্রে $\frac{১}{১৬}$ ও $\frac{১}{২}$ বা $\frac{১}{৪}$, তৃতীয় চিত্রে $\frac{১}{৮}$ ও $\frac{১}{৩২}$, চতুর্থ চিত্রে $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{১}{৩২}$ এবং পঞ্চম চিত্রে $\frac{১}{৮}$ ও $\frac{১}{২৫৬}$ অংশ সমপূর্ব্বপুরুষের রক্ত বর্ত্তমান। এই ভগ্নাংশগুলিকে দ্বিগুণিত করিলে, পাত্রপাত্রীর রক্তসাম্যের প্রকৃত পরিমাণ পাওয়া যায়; যেহেতু সমপূর্ব্বপুরুষ দুইজন—স্বামী ও স্ত্রী। যদি এইরূপ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে বহুদূরবর্ত্তী সগোত্র ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিবাহ-প্রতিষেধের বিজ্ঞানসম্মত কারণ দেখি না। স্মার্ত্তগণ শূদ্রদের স্বগোত্রে বিবাহ নিষেধ করেন নাই। অধিকন্তু, কায়স্থসমাজে যদিও স্ববংশে বিবাহ প্রচলিত নাই, তথাপি

সগোত্রবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কড়াকড়ি শুধু ব্রাহ্মণদের বেলা। কিন্তু কৌলিন্যের কৃপায় সে কড়াকড়িরও প্রাণ নাই। শাস্ত্রানুসারে চৌদ্দ পুরুষের অধিক ব্যবধান ঘটিলে জ্ঞাতিত্ব ঘুচিয়া যায়। বোধ হয় তদবস্থায় সগোত্র-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ফলত অনুসন্ধান করিলে প্রকাশ পাইবে যে, জ্ঞাতিত্বসম্পর্ক-বিরহিত সগোত্র ব্যক্তিদ্বয়ের তুল্য ঘনিষ্ঠতা যে কোন পরগণার একশ্রেণীস্থ যে কোন ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে বর্ত্তমান। অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের মধ্যে পুনঃপুন আদান-প্রদাননিবন্ধন এরূপ অবস্থাসংঘটন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চোখের বালি।

(১৮)

চড়িভাতীর দুর্দ্দিনের পরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে আর একবার ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে উৎসুক ছিল। কিন্তু তাহার পরদিনেই রাজলক্ষ্মী ইনফ্লুয়েঞ্জা-জ্বরে পড়িলেন। রোগ গুরুতর নহে, তবু তাহার অসুখ ও দুর্ব্বলতা যথেষ্ট। বিনোদিনী দিনরাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল।

মহেন্দ্র কহিল—"দিনরাত এমন করিয়া খাটিলে শেষকালে তুমিই যে অসুখে পড়িবে। মার সেবার জন্তে আমি লোক ঠিক করিয়া দিতেছি।"

বিহারী কহিল—"মহীন্ দা, তুমি অত ব্যস্ত হইয়ো না! উনি সেবা করিতেছেন, করিতে দাও। এমন করিয়া কি আর কেহ করিতে পারিবে!"

মহেন্দ্র রোগীর ঘরে ঘনঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। একটা লোক কোন কাজ করিতেছে না, অথচ কাজের সময় সর্ব্বদাই সঙ্গে লাগিয়া আছে, ইহা কর্ম্মিষ্ঠা বিনোদিনীর পক্ষে অসহ্য। সে বিরক্ত হইয়া দুই তিন বার কহিল—"মহীন্‌বাবু, আপনি এখানে বসিয়া থাকিয়া কি সুবিধা করিতেছেন! আপনি যান্—অনর্থক কলেজ কামাই করিবেন না।"

মহেন্দ্র তাহাকে অনুসরণ করে, ইহাতে বিনোদিনীর গর্ব্ব এবং সুখ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এমনতর কাঙালপনা—রুগ্ণা মাতার শয্যাপার্শ্বেও লুব্ধহৃদয়ে বসিয়া থাকা—ইহাতে তাহার ধৈর্য্য থাকিত না, ঘৃণাবোধ হইত। কোন কাজ যখন বিনোদিনীর উপর নির্ভর করে, তখন সে আর কিছুই

মনে রাখে না। যতক্ষণ খাওয়ান-দাওয়ান, রোগীর সেবা, ঘরের কাজ প্রয়োজন, ততক্ষণ বিনোদিনীকে কেহ অনবধান দেখে নাই—সে-ও প্রয়োজনের সময় কোনপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখিতে পারে না।

বিহারী অল্পক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে রাজলক্ষ্মীর সংবাদ লইতে আসে। ঘরে ঢুকিয়াই কি দরকার, তাহা সে তখনি বুঝিতে পারে কোথায় একটা কিছুর অভাব আছে তাহা তাহার চোখে পড়ে,—মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যায়। বিনোদিনী বুঝিতে পারিত, বিহারী তাহার শুশ্রূষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছে, সেইজন্য বিহারীর আগমনে সে যেন বিশেষ পুরস্কার লাভ করিত।

মহেন্দ্র নিতান্ত ধিক্কারবেগে অত্যন্ত কড়া নিয়মে কলেজে হাজির হইতে লাগিল। একে তাহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া আসিল, তাহার পরে এ কি পরিবর্ত্তন। আহার ঠিক সময়ে হয় না, সহিসটা নিরুদ্দেশ হয়, মোজাজোড়ার ছিদ্র ক্রমেই প্রসারিত হইতে থাকে। এখন এই সমস্ত বিশৃঙ্খলায় পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ বোধ হয় না। যখন যেটি দরকার, তখনি সেটি হাতের কাছে সুসজ্জিত পাইবার আরাম কাহাকে বলে, তাহা সে কয়দিন জানিতে পারিয়াছে, এক্ষণে তাহার অভাবে, আশার অশিক্ষিত অপটুতায় মহেন্দ্রের আর কৌতুকবোধ হয় না।

"চুনি, আমি তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, স্নানের আগেই আমার জামায় বোতাম পরাইয়া প্রস্তুত রাখিবে, আর আমার চাপকান প্যাণ্টলুন্ ঠিক করিয়া রাখিয়া দিবে—একদিনও তাহা হয় না! স্নানের পর বোতাম পরাইতে আর কাপড় খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার ত্‌'ঘণ্টা যায়!"

অনুতপ্ত আশা লজ্জায় ম্লান হইয়া বলে, "আমি বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলাম।"

"বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলে! নিজের হাতে করিতে দোষ কি! তোমার দ্বারা যদি কোন কাজ পাওয়া যায়!"

ইহা আশার পক্ষে বজ্রাঘাত। এমন ভর্ৎসনা সে কখন পায় নাই। এ জবাব তাহার মুখে বা মনে আসিল না যে, 'তুমিই ত আমার কর্ম্মশিক্ষার ব্যাঘাত করিয়াছ।' এ ধারণাই তাহার ছিল না যে, গৃহকর্ম্ম-শিক্ষা নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। সে মনে করিত, 'আমার স্বাভাবিক অক্ষমতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ কোন কাজ ঠিকমত করিয়া উঠিতে পারি না।' মহেন্দ্র যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া বিনোদিনীর সহিত তুলনা দিয়া আশাকে ধিক্কার দিয়াছেন, তখন সে তাহা বিনয়ে ও বিনা বিদ্বেষে গ্রহণ করিয়াছে।

আশা এক একবার তাহার রুগ্ণা শাশুড়ির ঘরের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়,—এক একবার লজ্জিতভাবে ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সে নিজেকে সংসারের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে, সে কাজ দেখাইতে চায়, কিন্তু কেহ তাহার কাজ চাহে না। সে জানে না, কেমন করিয়া কাজের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, কেমন করিয়া সংসারের মধ্যে

স্থান করিয়া লইতে হয়। সে নিজের অক্ষমতার সঙ্কোচে বাহিরে বাহিরে ফিরে। তাহার কি একটা মনোবেদনার কথা অন্তরে প্রতিদিন বাড়িতেছে, কিন্তু তাহার সেই অপরিস্ফুট বেদনা—সেই অব্যক্ত আশঙ্কাকে সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না। সে অনুভব করে, তাহার চারিদিকের সমস্তই সে যেন নষ্ট করিতেছে—কিন্তু কেমন করিয়াই যে তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং কেমন করিয়াই যে তাহা নষ্ট হইতেছে, এবং কেমন করিলে যে তাহার প্রতিকার হইতে পারে, তাহা সে জানে না। থাকিয়া থাকিয়া কেবল গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, 'আমি অত্যন্ত অযোগ্য, নিতান্ত অক্ষম, আমার মূঢ়তার কোথাও তুলনা নাই!'

পূর্ব্বে ত আশা ও মহেন্দ্র সুদীর্ঘকাল দুইজনে এক গৃহকোণে বসিয়া কখনো কথা কহিয়া, কখনো কথা না কহিয়া, পরিপূর্ণ সুখে সময় কাটাইয়াছে। আজকাল বিনোদিনীর অভাবে আশার সঙ্গে একলা বসিয়া মহেন্দ্রের মুখে কিছুতেই যেন সহজে কথা যোগায় না এবং কিছু না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতেও তাহার বাধ'বাধ' ঠেকে। পূর্ব্বকার সেই সহজ কথা ও সহজ মৌন, দুই ভাঙিয়া গেছে। এমন হইল, রাত্রের অন্ধকার ব্যতীত একলা আশার সহিত একত্র হইতে তাহার ভাবনা হইত। আশারও ভয় করিত; সে বুঝিত, সে কিছুতেই মহেন্দ্রকে আমোদ দিতে পারিতেছে না। পরস্পরকে মিলনসুখ দেওয়া সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলে, সে সুখ দেওয়া দুঃসাধ্য হয়। যখন পরস্পরের সঙ্গটুকুমাত্রই স্বভাবত সুখকর, তখন আনন্দের অনুকূল কথাবার্ত্তাও আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; তেলা মাথায় তেল প্রকৃতি আপনি ঢালে। কিন্তু সঙ্গকে সুখকর করিবার জন্য যখন বাহ্য উপায় চাই, বাহ্য উপায় তখনি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ হইয়া উঠে। অবোধ আশা মনে মনে কেবলি প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'বিনোদিনী শীঘ্র নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাহাদের মিলনসুখের ভাঙা হাট আবার জমাইয়া তুলুক্, তাহাদের উজাড় ঘরের কোণটিকে আবার একবার হাস্যালাপে সজাগ করিয়া দিক্!'

মহেন্দ্র বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও চিঠি কাহার?"

"বিহারিবাবুর।"

"কে দিল?"

"বউ ঠাকরাণী।" (বিনোদিনী)

"দেখি" বলিয়া চিঠিখানা লইল। ইচ্ছা হইল ছিঁড়িয়া পড়ে। দু'চারিবার উল্টাপাল্টা করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বেহারার হাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। যদি চিঠি খুলিত, তবে দেখিত, তাহাতে লেখা আছে, 'পিসিমা কোনমতেই সাগু-বার্লি খাইতে চান না, আজ কি তাঁহাকে ডালের ঝোল খাইতে দেওয়া হইবে?'—ঔষধ-পথ্য লইয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রকে কখনো কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না,—সে সম্বন্ধে বিহারীর প্রতিই তাহার নির্ভর।

মহেন্দ্র বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেয়ালে টাঙানো একখানা ছবির দড়ি ছিন্নপ্রায় হওয়াতে

ছবিটা বাঁকা হইয়া আছে। আশাকে অত্যন্ত ধমক দিয়া কহিল, "তোমার চোখে কিছুই পড়ে না, এমনি করিয়া সমস্ত জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়।" দমদমের বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া যে তোড়া বিনোদিনী পিতলের ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, আজও তাহা শুষ্ক অবস্থায় তেমনি ভাবে আছে;—অন্যদিন মহেন্দ্র এ সমস্ত লক্ষ্যই করে না—আজ তাহা চোখে পড়িল। কহিল, "বিনোদিনী আসিয়া না ফেলিয়া দিলে ও আর ফেলাই হইবে না!" বলিয়া ফুলসুদ্ধ ফুলদানী বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিল, তাহা ঠংঠংশব্দে সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া চলিল।—"কেন আশা আমার মনের মত হইতেছে না, কেন সে আমার মনের মত কাজ করিতেছে না, কেন তাহার স্বভাবগত শৈথিল্য ও দুর্ব্বলতায় সে আমাকে দাম্পত্যের পথে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতেছে না, সর্ব্বদা আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে?"—এই কথা মহেন্দ্র মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে হঠাৎ দেখিল, আশার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেছে, সে খাটের থাম ধরিয়া আছে, তাহার ঠোঁট-দুটি কাঁপিতেছে—কাঁপিতে কাঁপিতে সে হঠাৎ বেগে পাশের ঘর দিয়া চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র তখন ধীরে ধীরে গিয়া ফুলদানীটা কুড়াইয়া আনিয়া রাখিল। ঘরের কোণে তাহার পড়িবার টেবিল ছিল—চৌকিতে বসিয়া সেই টেবিলটার উপর হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘরে আলো দিয়া গেল, কিন্তু আশা আসিল না। মহেন্দ্র দ্রুতপদে ছাদের উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি নটা বাজিল, মহেন্দ্রদের লোকবিরল গৃহ রাত দুপরের মত নিস্তব্ধ হইয়া গেল,—তবু আশা আসিল না। মহেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশা সঙ্কুচিতপদে আসিয়া ছাদের প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র কাছে আসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল—মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বামীর বুকের উপর আশার কান্না ফাটিয়া পড়িল—সে আর থামিতে পারে না, তাহার চোখের জল আর ফুরায় না, কান্নার শব্দ গলা ছাড়িয়া বাহির হইতে চায়, সে আর চাপা থাকে না! মহেন্দ্র তাহাকে বক্ষে বদ্ধ করিয়া কেশচুম্বন করিল—নিঃশব্দ আকাশে তারাগুলি নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রাত্রে বিছানায় বসিয়া মহেন্দ্র কহিল—"কলেজে আমাদের 'নাইট্‌-ডিউটি' অধিক পড়িয়াছে, অতএব এখন কিছুকাল আমাকে কলেজের কাছেই বাসা করিয়া থাকিতে হইবে।"

আশা ভাবিল, "এখনো কি রাগ আছে? আমার উপর বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন? নিজের নির্গুণতায় আমি স্বামীকে ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিলাম? আমার ত মরা ভাল ছিল!"

কিন্তু মহেন্দ্রের ব্যবহারে রাগের লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। সে অনেকক্ষণ কিছু না বলিয়া আশার মুখ বুকের উপর রাখিল এবং বারংবার অঙ্গুলি দিয়া তাহার চুল চিরিতে চিরিতে তাহার খোঁপা শিথিল করিয়া দিল। পূর্ব্বে আদরের দিনে মহেন্দ্র এমনি করিয়া আশার বাঁধা চুল খুলিয়া দিত—আশা তাহাতে আপত্তি করিত।

আজ আর সে তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া পুলকে বিহ্বল হইয়া চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একসময় তাহার ললাটের উপর অশ্রুবিন্দু পড়িল, এবং মহেন্দ্র তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া স্নেহরুদ্ধস্বরে ডাকিল—"চুনি।" আশা কথায় তাহার কোন উত্তর না দিয়া দুই কোমল হস্তে মহেন্দ্রকে চাপিয়া ধরিল। মহেন্দ্র কহিল—"অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ কর।"

আশা তাহার কুসুমসুকুমার করপল্লব মহেন্দ্রের মুখের উপর চাপা দিয়া কহিল—"না, না, অমন কথা বলিয়ো না! তুমি কোন অপরাধ কর নাই! সকল দোষ আমার! আমাকে তোমার দাসীর মত শাসন কর! আমাকে তোমার চরণাশ্রয়ের যোগ্য করিয়া লও!"

বিদায়ের প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিবার সময় মহেন্দ্র কহিল—"চুনি, আমার রত্ন, তোমাকে আমার হৃদয়ের সকলের উপরে ধারণ করিয়া রাখিব, সেখানে কেহ তোমাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।"

তখন আশা দৃঢ়চিত্তে সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত হইয়া স্বামীর নিকট নিজের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দাবী দাখিল করিল। কহিল,—"তুমি আমাকে রোজ একখানি করিয়া চিঠি দিবে?"

মহেন্দ্র কহিল—"তুমিও দিবে?"

আশা কহিল—"আমি কি লিখিতে জানি?"

মহেন্দ্র তাহার কানের কাছের অলক-গুচ্ছ টানিয়া দিয়া কহিল, "তুমি অক্ষয়-কুমার দত্তর চেয়ে ভাল লিখিতে পার—চারুপাঠ যাহাকে বলে!"

আশা কহিল—"যাও, আমাকে আর ঠাট্টা করিয়ো না!"

যাইবার পূর্ব্বে আশা যথাসাধ্য নিজের হাতে মহেন্দ্রের পোর্ট্ম্যাণ্টো সাজাইতে বসিল। মহেন্দ্রের মোটা মোটা শীতের কাপড় ঠিকমত ভাঁজ করা কঠিন, বাক্সে ধরান শক্ত—উভয়ে মিলিয়া কোনমতে চাপাচাপি ঠাসাঠুসি করিয়া যাহা এক বাক্সে ধরিত, তাহাতে দুই বাক্স বোঝাই করিয়া তুলিল। তবু যাহা ভুলক্রমে বাকি রহিল, তাহাতে আরও অনেকগুলি স্বতন্ত্র পুঁটুলির সৃষ্টি হইল। ইহা লইয়া আশা যদিও বার-বার লজ্জাবোধ করিল, তবু তাহাদের কাড়াকাড়ি, কৌতুক ও পরস্পরের প্রতি সহাস্য দোষারোপে পূর্ব্বেকার আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিল। এ যে বিদায়ের আয়োজন হইতেছে, তাহা আশা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেল। সহিস্ দশবার গাড়ি তৈয়ারির কথা মহেন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিল, মহেন্দ্র কানে তুলিল না,—অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "ঘোড়া খুলিয়া দাও।"

সকাল ক্রমে বিকাল হইয়া গেল, বিকাল সন্ধ্যা হয়। তখন স্বাস্থ্যপালন করিতে পরস্পরকে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং নিয়মিত চিঠিলেখা সম্বন্ধে বারংবার প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইল।

রাজলক্ষ্মী আজ দুইদিন হইল উঠিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় গায়ে মোটা কাপড় মুড়ি দিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে তাস খেলিতে-

ছেন। আজ তাঁহার শরীরে কোন গ্লানি নাই। মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর দিকে একেবারেই চাহিল না—মাকে কহিল, "মা, কলেজে আমার রাত্রের কাজ পড়িয়াছে, এখানে থাকিয়া সুবিধা হয় না—কলেজের কাছে বাসা লইয়াছি। সেখানে আজ হইতে থাকিব।"

রাজলক্ষ্মী মনে মনে অভিমান করিয়া কহিলেন, "তা যাও! পড়ার ক্ষতি হইলে কেমন করিয়া থাকিবে?"

যদিও তাঁহার রোগ সারিয়াছে, তবু মহেন্দ্র যাইবে শুনিয়া তখনি তিনি নিজেকে অত্যন্ত রুগ্ণ ও দুর্ব্বল বলিয়া কল্পনা করিলেন; বিনোদিনীকে বলিলেন, "দাও ত বাছা, বালিশটা এগাইয়া দাও!"—বলিয়া বালিশ অবলম্বন করিয়া শুইলেন, বিনোদিনী আস্তে আস্তে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মহেন্দ্র একবার মার কপালে হাত দিয়া দেখিল—তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিল। রাজলক্ষ্মী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন—"নাড়ী দেখিয়া ত ভারি বোঝা যায়! তোর আর ভাবিতে হইবে না, আমি বেশ আছি!"—বলিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বলভাবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কোনপ্রকার বিদায়সম্ভাষণ না করিয়া রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

(১৯)

বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপারখানা কি? অভিমান, না রাগ, না ভয়? আমাকে দেখাইতে চান, আমাকে কেয়ার করেন না? বাসায় গিয়া থাকিবেন? দেখি কতদিন থাকিতে পারেন?"

কিন্তু বিনোদিনীরও মনে মনে একটা অশান্তভাব উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে প্রতিদিন সে নানা পাশে বদ্ধ ও নানা বাণে বিদ্ধ করিতেছিল, সে কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। বাড়ী হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবর্জ্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্ব্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত,—তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে বেদনায় জাগরূক করিয়া রাখিত, তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে মহেন্দ্র তাহার মত স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মত ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভাল বাসে, কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে, না, তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার, না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না;—মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, "কোন নারীর কি আমার মত এমন দশা হইয়াছে! আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না!" কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হোক্ বা দগ্ধ করিতেই

হৌক্, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে! ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল—"সে যাইবে কোথায়! সে ফিরিবেই! সে আমার।"

আশা ঘর পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া সন্ধ্যার সময় মহেন্দ্রের বাহিরের ঘরে, মাথার তেলে দাগ-পড়া মহেন্দ্রের বসিবার কেদারা, কাগজ-পত্র-ছড়ানো ডেস্ক্, তাহার বই, তাহার ছবি প্রভৃতি জিনিষপত্র বারবার নাড়াচাড়া এবং অঞ্চল দিয়া ঝাড়পোঁচ করিতেছিল। এইরূপে মহেন্দ্রের সকল জিনিষ নানারূপে স্পর্শ করিয়া, একবার রাখিয়া, একবার তুলিয়া, আশার বিরহ-সন্ধ্যা কাটিতেছিল। বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; আশা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া তাহার নাড়াচাড়ার কাজ রাখিয়া দিয়া, কি যেন খুঁজিতেছে, এম্নিতর ভান করিল। বিনোদিনী গম্ভীর-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হচ্চে তোর ভাই?"

আশা মুখে একটুখানি হাসি জাগাইয়া কহিল, "কিছুই না ভাই!"

বিনোদিনী তখন আশার গলা জড়াইয়া কহিল—"কেন ভাই বালি, ঠাকুরপো এমন করিয়া চলিয়া গেলেন কেন?"

আশা বিনোদিনীর এই প্রশ্নমাত্রেই সংশয়ান্বিত, সশঙ্কিত হইয়া উত্তর করিল—"তুমি ত জানই ভাই—কলেজে তাঁহার বিশেষ কাজ পড়িয়াছে বলিয়া গেছেন!"

বিনোদিনী ডান হাতে আশার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া যেন করুণায় বিগলিত হইয়া স্তব্ধভাবে একবার তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আশার বুক দমিয়া গেল। নিজেকে সে নির্ব্বোধ এবং বিনোদিনীকে বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিত—বিনোদিনীর ভাবখানা দেখিয়া হঠাৎ তাহার বিশ্বসংসার অন্ধকার হইয়া উঠিল সে বিনোদিনীকে স্পষ্ট করিয়া কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। দেয়ালের কাছে একটা সোফার উপরে বসিল। বিনোদিনীও তাহার পাশে বসিয়া দৃঢ়বাহু দিয়া আশাকে বুকের কাছে বাঁধিয়া ধরিল। সখীর সেই আলিঙ্গনে আশা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দ্বারের কাছে অন্ধ ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতেছিল—"চরণতরণী দে মা তারিণি তারা।"

বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধানে আসিয়া দ্বারের কাছে পৌছিতেই দেখিল—আশা কাঁদিতেছে এবং বিনোদিনী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতেছে। দেখিয়াই বিহারী সেখান হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। পাশের শূন্যঘরে গিয়া অন্ধকারে বসিল। দুই করতলে মাথা চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল, "আশা কেন কাঁদিবে? যে মেয়ে স্বভাবতই কাহারো কাছে লেশমাত্র অপরাধ করিতে অক্ষম, তাহাকেও কাঁদাইতে পারে, এমন পাষণ্ড জগতে কে আছে?"—তার পরে বিনোদিনী যেমন করিয়া সান্ত্বনা করিতে-ছিল, তাহা মনে আনিয়া মনে মনে কহিল—"বিনোদিনীকে ভারি ভুল বুঝিয়াছিলাম!

সেবায় সান্ত্বনায়, নিঃস্বার্থ সখীপ্রেমে, সে মর্ত্ত্যবাসিনী দেবী!"

বিহারী অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া রহিল। অন্ধের গান থামিয়া গেলে, বিহারী সশব্দে পা ফেলিয়া কাশিয়া মহেন্দ্রের ঘরের দিকে চলিল। দ্বারের কাছে না যাইতেই ঘোমটা টানিয়া আশা দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে ছুটিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী বলিয়া উঠিল—"এ কি বিহারিবাবু? আপনার কি অসুখ করিয়াছে?"

বিহারী। কিছু না!

বিনোদিনী। চোখ দুটা অমন লাল কেন?

বিহারী তাহার উত্তর না দিয়া কহিল—"বিনোদ-বোঠা'ণ, মহেন্দ্র কোথায় গেল!"

বিনোদিনী মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল—"শুনিলাম, হাঁসপাতালে তাঁহার কাজ পড়িয়াছে বলিয়া কলেজের কাছে তিনি বাসা করিয়া আছেন। বিহারিবাবু একটু সরুন্, আমি তবে আসি।"

অন্যমনস্ক বিহারী দ্বারের কাছে বিনোদিনীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যার সময় একলা বাহিরের ঘরে বিনোদিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা লোকের চক্ষে সুদৃশ্য নয়, সে কথা হঠাৎ মনে পড়িল। বিনোদিনী চলিয়া যাইবার সময় বিহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া লইল—"বিনোদ-বোঠা'ণ, আশাকে তুমি দেখিয়ো—সে সরলা কাহাকেও আঘাত করিতেও জানে না, নিজেকে আঘাত হইতে বাঁচাইতেও পারে না।"

বিহারী অন্ধকারে বিনোদিনীর মুখ দেখিতে পাইল না, সে মুখে হিংসার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। আজ বিহারীকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে, আশার জন্য করুণায় তাহার হৃদয় ব্যথিত। বিনোদিনী নিজে কেহই নহে! আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আশার সমস্ত সুখ সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম! শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্ব্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে—শ্রীযুক্ত বিহারিবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না, সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে,—দু'জনের মধ্যে কত প্রভেদ! প্রতিকূল-ভাগ্য-বশত বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোন পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে জয়ী করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহারমূর্ত্তি ধরিল!

অত্যন্ত মিষ্টস্বরে বিনোদিনী বিহারীকে বলিয়া গেল—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন বিহারিবাবু! আমার চোখের বালির জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া নিজেকে বেশি কষ্ট দিবেন না!"

(২০)

অনতিকাল পরেই মহেন্দ্র তাহার ছাত্রাবাসে চেনা হাতের অক্ষরে একখানি চিঠি পাইল।

দিনের বেলা গোলমালের মধ্যে খুলিল না— বুকের কাছে পকেটের মধ্যে পুরিয়া রাখিল। কলেজে লেক্‌চার শুনিতে শুনিতে হাঁস-পাতাল ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একএকবার মনে হইতে লাগিল—'ভালবাসার একটা পাখী তাহার বুকের নীড়ে বাসা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইয়া তুলি-লেই তাহার সমস্ত কোমল কূজন কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।'

সন্ধ্যায় একসময় মহেন্দ্র নির্জ্জনঘরে ল্যাম্পের আলোকে চৌকিতে বেশ করিয়া হেলান্ দিয়া আরাম করিয়া বসিল। পকেট হইতে তাহার দেহতাপতপ্ত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইল। অনেকক্ষণ চিঠি না খুলিয়া লেফাফার উপরকার শিরোনামা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র জানিত, চিঠির মধ্যে বেশি কিছু কথা নাই। আশা নিজের মনের ভাব ঠিকমত ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। কেবল তাহার কাঁচা অক্ষরে বাঁকা লাইনে তাহার মনের কোমল কথা-গুলি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আশার কাঁচা হাতে বহুযত্নে লেখা নিজের নামটি পড়িয়া মহেন্দ্র নিজের নামের সঙ্গে যেন একটা রাগিণী শুনিতে পাইল ;—তাহা সাধ্বী-নারী-হৃদয়ের অতি নিভৃত বৈকুণ্ঠ-লোক হইতে একটি নির্ম্মল প্রেমের সঙ্গীত।

এই দুই-এক-দিনের বিচ্ছেদে মহেন্দ্রের মন হইতে দীর্ঘ মিলনের সমস্ত অবসাদ দূর হইয়া সরলা বধূর নবপ্রেমে উদ্ভাসিত সুখস্মৃতি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শেষাশেষি প্রাত্যহিক ঘরকন্নার খুঁটিনাটি-অসুবিধা তাহাকে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে সমস্ত অপসারিত হইয়া কেবলমাত্র কর্ম্মহীন, কারণহীন একটি বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের আলোকে আশার মানসী মূর্ত্তি তাহার মনের মধ্যে প্রাণ পাইয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্র অতি ধীরে ধীরে লেফাফা ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া নিজের ললাটে কপোলে বুলাইয়া লইল। একদিন মহেন্দ্র যে এসেন্স্ আশাকে উপহার দিয়া-ছিল, সেই এসেন্সের গন্ধ চিঠির কাগজ হইতে উতলা দীর্ঘনিশ্বাসের মত মহেন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভাঁজ খুলিয়া মহেন্দ্র চিঠি পড়িল। কিন্তু এ কি! যেমন বাঁকা-চোরা লাইন, তেমন সাদাসিধা ভাষা নয় ত! কাঁচা-কাঁচা অক্ষর, কিন্তু কথাগুলি ত তাহার সঙ্গে মিলিল না! লেখা আছে—

"প্রিয়তম, যাহাকে ভুলিবার জন্য চলিয়া গেছ, এ লেখায় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিব কেন? যে লতাকে ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলে, সে আবার কোন্ লজ্জায় জড়াইয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে! সে কেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া গেল না!

"কিন্তু এটুকুতে তোমার কি ক্ষতি হইবে নাথ? না হয় ক্ষণকালের জন্য মনে পড়িলই বা! মনে তাহাতে কতটুকুই বা বাজিবে? আর, তোমার অবহেলা যে কাঁটার মত আমার পাঁজরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রহিল! সকল দিন, সকল রাত, সকল কাজ, সকল চিন্তার মধ্যে যে

দিকে ফিরি, সেই দিকেই যে আমাকে বিঁধিতে লাগিল! তুমি যেমন করিয়া ভুলিলে, আমাকে তেমনি করিয়া ভুলিবার একটা উপায় বলিয়া দাও!

"নাথ, তুমি যে আমাকে ভাল বাসিয়াছিলে, সে কি আমারই অপরাধ? আমি কি স্বপ্নেও এত সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিয়াছিলাম? আমি কোথা হইতে আসিলাম, আমাকে কে জানিত? আমাকে যদি না চাহিয়া দেখিতে, আমাকে যদি তোমার ঘরে বিনা-বেতনের দাসী হইয়া থাকিতে হইত, আমি কি তোমাকে কোন দোষ দিতে পারিতাম? তুমি নিজেই আমার কোন্ গুণে ভুলিলে প্রিয়তম,—কি দেখিয়া আমার এত আদর বাড়াইলে? আর, আজ বিনামেঘে যদি বজ্রপাতই হইল, তবে সে বজ্র কেবল দগ্ধ করিল কেন? একেবারে দেহমন কেন ছাই করিয়া দিল না?

"এই দুটো দিনে অনেক সহ্য করিলাম, অনেক ভাবিলাম, কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না,—ঘরে থাকিয়াও কি তুমি আমাকে ফেলিতে পারিতে না? আমার জন্যও কি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল? আমি কি তোমার এতখানি জুড়িয়া আছি? আমাকে তোমার ঘরের কোণে—তোমার দ্বারের বাহিরে ফেলিয়া রাখিলেও কি আমি তোমার চোখে পড়িতাম? তাই যদি হয়, তুমি কেন গেলে, আমারও কি কোথাও যাইবার পথ ছিল না? কাঁদিয়া কাঁদিয়াছি, ভাসিয়া যাইতাম।

এ কি চিঠি! এ ভাষা [illegible], তাহা মহেন্দ্রের বুঝিতে বাকি রহিল [illegible]। অকস্মাৎ আহত মূর্চ্ছিতের মত মহেন্দ্র [illegible] চিঠিখানি লইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহি[illegible] যে লাইনে রেলগাড়ির মত তাহার [illegible] পূর্ণবেগে ছুটিয়াছিল—সেই লাইনেই [illegible] পরীত দিক্ হইতে একটা ধাক্কা খাইয়া লাইনের বাহিরে তাহার মনটা যেন উ[illegible]পাল্টা স্তূপাকার বিকল হইয়া পড়িয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার সে দুইবার তিনবার করিয়া পড়িল। কিছুকাল যাহা সুদূর আভাসের মত ছিল, আজ তাহা যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার জীবনাকাশের এক কোণে যে ধূমকেতুটা ছায়ার মত দেখাইতেছিল, আজ তাহার উদ্যত বিশাল পুচ্ছ অগ্নিরেখায় দীপ্যমান হইয়া দেখা দিল।

এ চিঠি বিনোদিনীরই। সরলা আশা নিজের মনে করিয়া তাহা লিখিয়াছে। পূর্ব্বে যে কথা সে কখনো ভাবে নাই, বিনোদিনীর রচনামত চিঠি লিখিতে গিয়া সেই সব কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নকলকরা কথা বাহির হইতে বদ্ধমূল হইয়া তাহার আন্তরিক হইয়া গেল। যে নূতন বেদনার সৃষ্টি হইল, এমন সুন্দর করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে আশা কখনই পারিত না। সে ভাবিতে লাগিল, 'সখী আমার মনের কথা এমন ঠিকটি বুঝিল কি করিয়া? কেমন করিয়া এমন ঠিকটি প্রকাশ করিয়া বলিল?' অন্তরঙ্গ সখীকে আশা আগো যেন বেশি আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় করিয়া ধরিল, কারণ,

যে ব্যথাটা ...ার মনের মধ্যে, তাহার ভাষাটি তাহ... সখীর কাছে—সে এতই নিরুপায়!

মহেন্দ্র ... ছাড়িয়া উঠিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বি...ীর উপর রাগ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, মাঝে থেকে রাগ হইল আশা৷র উপর! "দেখ দেখি আশার এ কি মূঢ়তা, স্বামীর প্রতি এ কি অত্যাচার!" বলিয়া চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া প্রমাণস্বরূপ চিঠিখানা আবার পড়িল। পড়িয়া ভিতরে ভিতরে একটা হর্ষসঞ্চার হইতে লাগিল। চিঠিখানাকে সে আশারই চিঠি মনে করিয়া পড়িবার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু এ ভাষায় কোনমতেই সরলা আশাকে মনে করাইয়া দেয় না। দু'চার লাইন পড়িবামাত্র একটা সুখোন্মাদকর সন্দেহ ফেনিল মদের মত মনকে চারিদিকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। এই প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যক্ত, নিষিদ্ধ অথচ নিকটাগত, বিষাক্ত অথচ মধুর, একই কালে উপহৃত অথচ প্রত্যাহৃত প্রেমের আভাস মহেন্দ্রকে মাতাল করিয়া তুলিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিজের হাতে পায়ে কোথাও এক জায়গায় ছুরি বসাইয়া বা আর কিছু করিয়া নেশা ছুটাইয়া মনটাকে আর কোন দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। টেবিলে সজোরে মুষ্টি বসাইয়া চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "দূর কর, চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলি!" বলিয়া চিঠিখানা ল্যাম্পের কাছাকাছি লইয়া গেল। পুড়াইল না, আর একবার পড়িয়া ফেলিল। পরদিন ভৃত্য টেবিল হইতে কাগজপোড়া ছাই অনেক ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহা আশার চিঠির ছাই নহে, চিঠির উত্তর দিবার অনেকগুলা অসম্পূর্ণ চেষ্টাকে মহেন্দ্র পুড়াইয়া ছাই করিয়াছে।

ক্রমশ।

সার সত্যের আলোচনা।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি।

জাগ্রৎকালে আমরা বিজ্ঞান-রাজ্যে বাস করি; স্বপ্ন-কালে মনোরাজ্যে বাস করি। বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রদীপ বুদ্ধি; মনোরাজ্যের প্রদীপ কামনা। জ্ঞান কিন্তু এক বই দুই নহে। একই জ্ঞান বিজ্ঞান-রাজ্যের বুদ্ধি-প্রদীপ হইয়া বস্তু-সকলের ব্যাবহারিক সত্তায়* আলোক প্রদান করে, এবং মনো-

* ব্যাবহারিক সত্তা = Concrete সত্তা = প্রাতিভাসিক সত্তা (Phenomenal existence) ≠ বাস্তবিক সত্তা (Real existence)। Concrete সত্তাই লোকের ব্যবহারে আসে।

রাজ্যের কাম-প্রদীপ হইয়া বস্তু-সকলের প্রাতিভাসিক সত্তায় আলোক প্রদান করে। মনোরাজ্যের কাম-প্রদীপ এক-প্রকার কাম-ধেনু। মনোরাজ্যে, তাই, যে যাহা অজ্ঞাতসারে কামনা করে, সে সেই অযাচিত সামগ্রী চক্ষু মুদিত করিয়া করতলে প্রাপ্ত হয়;—

"স্বপ্নের কৃপায়, অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্য্যে ফাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা॥"
স্বপ্ন-প্রয়াণ।

কিন্তু কামনা-কামিনীটিকে সব সময়ে চেনা ভার। একপ্রকার কামনা আছে, যাহা আশঙ্কার কনিষ্ঠা ভগিনী। তার সাক্ষী;—একজন পথিক যদি পর্ব্বতের সানুমঞ্চের কিনারায় দাঁড়াইয়া গভীর নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে তাহার মনোমধ্যে পতনের আশঙ্কা তো জাগিয়া ওঠেই; কিন্তু আশঙ্কা যেমন জাগিয়া ওঠে, তেমনি তাহার পিছন দিক্ হইতে পতনের জন্য একপ্রকার ব্যগ্রতা—একপ্রকার অধীর কামনা "ঝাঁপ দিয়া পড়ো" বলিয়া বিভ্রান্ত পথিকটিকে যমালয়ের সোজা রাস্তা দেখাইয়া দ্যায়। এইপ্রকার শঙ্কানুজা কামনা হইতে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা জন্ম গ্রহণ করে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

স্বাপ্নিক বস্তু-সকলও জ্ঞানের বিষয়—এ কথা সত্য; কিন্তু তাহার গোড়ায় গলদ্—তাহা অবাস্তবিক। মোটামুটি বলিলাম "অবাস্তবিক"; কিন্তু যদি কোনো ন-ছোড়-বন্দ সত্য-জিজ্ঞাসু আমাকে শক্তা-শক্তি করিয়া ধরেন, তবে আমার মুখ দিয়া প্রকৃত সত্য-কথাটি বাহির হইয়া পড়িবে। সে কথা এই যে, স্বপ্নের বস্তু-সকল দুই হিসাবে দুইরূপ;—এক হিসাবে তাহা বাস্তবিক; আর-এক হিসাবে অবাস্তবিক। স্বাপ্নিক বস্তুর সত্তা যদি সর্ব্বাংশে অবাস্তবিক হইত, তবে তাহাকে "অবাস্তবিক" বলিলেই এক কথায় চুকিয়া যাইত। কিন্তু অত সহজে মাম্‌লা চুকিবার নহে। এ কথা কাহারো অবিদিত নাই যে, অন্ধ মিল্‌টন আলোকের জাগ্রৎস্বপ্নে পুলকিত হইয়া উল্লাস-ভরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "Hail holy Light offspring of heaven first-born"—অভিবাদন করি তোমায় পবিত্র আলোক—ব্রহ্মের প্রথমজাত সন্তান! মিল্‌টন্ যখন নিমীলিত-চক্ষে আলোকের এইরূপ সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, তখন বুঝিতেই পারা যাইতেছে যে, সেই যে স্বাপ্নিক আলোক, যাহা তাঁহার মনশ্চক্ষুতে দেখা দিতেছে, তাহার বাস্তবিক সত্তা তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নাই; আছে তাহা তাঁহার স্মৃতিক্ষেত্রে— যদিচ অদৃশ্য-ভাবে। যে ক্ষেত্রে যে ভাবে থাকুক্ না কেন—আছে তো? তবেই হইতেছে যে, স্বপ্নের দৃষ্ট বস্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবাস্তবিক হইলেও, তাহা পরোক্ষ সম্বন্ধে বাস্তবিক—যে অংশে তাহা বাস্তবিক পদার্থের স্মৃতি-গর্ত্ত, সে অংশে অবশ্যই তাহা বাস্তবিক। এইজন্য বলিতেছি যে, স্বাপ্নিক বস্তু-সকলের সত্তাকে অবাস্তবিক না বলিয়া বলা উচিত প্রাতিভাসিক—দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেনও তাই।

স্বপ্ন-কালের মনোরাজ্য যেমন কামনা-মাতৃক, জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান-রাজ্য তেমনি বুদ্ধি-মাতৃক ; আর, সেই বিজ্ঞান-রাজ্যের বস্তু-সকলের সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা। সে সত্তা দ্বৈতগর্ত্তা। ব্যাবহারিক সত্তার দুই পৃষ্ঠে অপর দুইবিধ সত্তার সংশ্লেষ রহিয়াছে স্পষ্ট। বিজ্ঞান-রাজ্যের বস্তু-সকলের এ-পৃষ্ঠের সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা, ও-পৃষ্ঠের সত্তা বাস্তবিক সত্তা, এবং সমগ্র অবয়বের সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা। সাবধানী পোদ্দার যেমন পরীক্ষিতব্য টাকার দুই পিট উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখে, এখানে তেমনি বিজ্ঞান-রাজ্যের বস্তু-সকলের ব্যাবহারিক সত্তার দুই পিট এবং তাহার পরে তাহার সমগ্র অবয়ব একে একে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা বিধেয় ; তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

(১) ব্যাবহারিক সত্তার
এ পিট।

আমি যখন আমার সম্মুখে ঐ থামটা দেখিতেছি, তখন দেখিতেছি আর কিছু না—ঐ থামটা'র মধ্য হইতে উহার বাস্তবিক সত্তা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই দেখিতেছি—উহার শ্বেতবর্ণ উন্নত স্থূলাকৃতি মাত্র দেখিতেছি। মনে কর, আমি ঐ থামটার বাস্তবিক সত্তা একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া শুদ্ধ কেবল উহার শ্বেতবর্ণ উন্নত স্থূলাকৃতির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছি ; একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে, মনে কর, আমার চক্ষে একপ্রকার তন্দ্রার ঘোর আসিল, আর, সেই-গতিকে ঐ থামটা স্বপ্নের ন্যায় একটা প্রাতিভাসিক দৃশ্য-মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। এখন দেখিতে হইবে এই যে, ঐ থামটার সত্তা যদি সত্য-সত্যই সেইরূপ একটা প্রাতিভাসিক সত্তা-মাত্র হইত, তাহা হইলে, উহা যে এক-মুহূর্ত্তে হাউই-বাজি হইয়া হুস্ করিয়া উড়িয়া যাইবে না, অথবা বাঘ হইয়া গাঁ গাঁ করিয়া খাইতে আসিবে না, তাহার কোনো স্থিরতা থাকিত না। তা'র সাক্ষী—স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজ্যে সবই বে-আইন বে-কানুন্। সে রাজ্যে যে যাহা, সে তাহা নহে। সে রাজ্যে—এই দেখিতেছি ভারা-বনত মুমূর্ষু গর্দ্দভ, পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা গর্দ্দভ নহে—তাহা তেজঃস্ফীত অশ্ব ; এই দেখিতেছি মাটি-ঘাঁসা শূকর, পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা শূকর নহে—তাহা বর্ম্মাবৃত খড়্গায়ুধ গণ্ডার ; এই দেখিতেছি মিউমিউ-কারী বিড়াল-ছানা, পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা বিড়াল-ছানা নহে—তাহা ভীষণ ব্যাঘ্র স্বপ্নের মুলুকে এইসকল অঘটন-ঘটনা কেমন অবলীলা-ক্রমে আমাদের নয়ন্-সমক্ষে হওয়া-যাওয়া করে! তখন তাহাদের বাস্তবিকতা-সম্বন্ধে সংশয়ের বিন্দু-বিসর্গও আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে না। বুদ্ধি তখন কোথায়—যে, তাহাকে বিভ্রান্ত করি'বে? বুদ্ধি তখন অগাধ নিদ্রায় নিমগ্ন! প্রকৃত কথা এই যে, যে সময়ে আমরা স্বপ্নের মনোরাজ্যে বাস করি, সে সময়ে বাস্তবিক-অবাস্তবিকের কথা আমাদের মনেই আসে না। তার সাক্ষী ;—আমি যদি কোনো সময়ে আমার কোনো মৃত বন্ধুকে স্বপ্ন

দেখি, তবে সে সময়ে আমার সে বন্ধু বাস্তবিকই জীবিত আছেন, অথবা অনেক-দিন হইল মৃত হইয়াছেন, এ কথা জিজ্ঞাসার বিষয় বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু তথাপি দুয়ের মধ্যে বিশেষ একটি প্রভেদ আছে; সে প্রভেদ এই যে, প্রকৃত স্বপ্নের অবস্থায়—স্বপ্ন যে স্বপ্ন, তাহা জানিতে পারিবার কোনো উপায় নাই; পক্ষান্তরে জাগ্রৎস্বপ্নের অবস্থায়—স্বপ্নের স্বপ্নত্ব বোদ্ধার নিকটে ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় না। বিজ্ঞান-রাজ্যের ব্যাবহারিক সত্তার মধ্যেও যে মনোরাজ্যের প্রাতিভাসিক সত্তা তলে তলে কার্য্য করে, তাহার দিব্য একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে; সে প্রমাণ এই :

চিত্র-বীক্ষণ যন্ত্রের দুই চোঙের মধ্য দিয়া তাহার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—দেখিবে যে, তাহার অন্তর্নিহিত আলেখ্য-পটে বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি যাহা যাহা চিত্রিত আছে, সমস্তই যেন বাস্তবিক সত্য—এই ভাবের একটি প্রাতিভাসিক দৃশ্য তোমার চক্ষের সম্মুখে সাক্ষাৎ বিরাজমান। তখন-কার সেই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, উদ্যান-কানন, গিরি-নদী, যেখানে যেখানে প্রতিভাসিত হইতেছে, সেখানে সেখানে উহাদের বাস্তবিক সত্তা মূলেই নাই; আছে তবে কোথায়? উহাদের যেখানকার যত কিছু বাস্তবিক সত্তা, সমস্তই যন্ত্রাধিশ্রিত দুইখানি চিত্রলিপির মধ্যে সম্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, জাগ্রৎ-কালের বিজ্ঞান-রাজ্যের মধ্যেই মনোরাজ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; আর সেই যে মনোরাজ্য, তাহার প্রাতিভাসিক সত্তা বিজ্ঞান-রাজ্যের ব্যাবহারিক সত্তা'র দুই পৃষ্ঠের এক পৃষ্ঠ। বুদ্ধির বিষয়ীভূত বিজ্ঞানরাজ্যের বস্তু-সকলের দুই পৃষ্ঠে দুইরূপ সত্তা সংশ্লিষ্ট থাকা'তে বুদ্ধির পক্ষে দিব্য একটি সুবিধা হইয়াছে এই যে, বুদ্ধি ইচ্ছা করিলেই দুইকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া বিবেচ্য বস্তুর ব্যাবহারিক সত্তা কোন্ অংশে প্রাতিভাসিক এবং কোন্ অংশে বাস্তবিক, তাহার যথাসম্ভব ঠিকানা পাইতে পারে।

(২) ব্যাবহারিক সত্তার
ও পিট।

আমি বেশ্ বুঝিতে পারিতেছি যে, ঐ থামটার ব্যাবহারিক সত্তা উহার বাস্তবিক সত্তাতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আমার ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে প্রাতিভাসিক সত্তা ছড়াইতেছে; তার সাক্ষী, উহা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ে শ্বেত-বর্ণ স্থূলাকৃতি এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ে সংঘাত-কাঠিন্য, দুই ইন্দ্রিয়ে এই যে দুইপ্রকার ভোগ-সামগ্রী বাঁটিয়া দিতেছে, দুয়েরই সত্তা ঐ থামটার প্রাতিভাসিক সত্তা। এখানে থামটার বাস্তবিক সত্তার সহিত তাহার ঐ দুইপ্রকার প্রাতিভাসিক সত্তার সম্বন্ধ যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা বস্তু-গুণের সম্বন্ধ। এই গেল একটা কথা—আর একটা কথা এই যে, কালে ঐ থামটার গাত্রে শেয়ালা জমিয়া উহার শুভ্র গাত্র মলিন হইয়া যাইতে পারে; উহা জরা-জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া খসিয়া পড়িতে পারে; উহা জলে গলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে; সবই হইতে পারে—কিন্তু কিছুই হইতে পারে না বিনা কারণে। বিনা কারণে অত বড় ঐ থামটার একটি ক্ষুদ্রাৎ-ক্ষুদ্র বালুকণাও

পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। [illegible] এব এটা স্থির যে, ঐ থামটার বাস্তবিক সত্তা একদিকে যেমন উহার ভিতরে * বস্তুরূপে স্থির রহিয়াছে, আর এক দিকে তেমনি কারণ-রূপে কার্য্য করিতেছে। এই গেল দ্বিতীয় কথা, তৃতীয় আর-একটি কথা এই যে, এক-একটি কারণের অগ্রপশ্চাতে অসংখ্য কার্য্য-কারণের তরঙ্গ-মালা নিয়তির বাঁধে আট্‌কানো রহিয়াছে। এইজন্য, এক দিক্ দিয়া যেমন কারণের ক্রিয়া কার্য্য-পরম্পরায় ভাঁটাইয়া চলিতে থাকে, আর এক দিক্ দিয়া তেমনি কার্য্যের প্রতিক্রিয়া কারণ-পরম্পরায় বাহিয়া উঠিতে থাকে। তার সাক্ষী; এক দিকে অনিল-হিল্লোল সরোবর-জলে তরঙ্গ-হিল্লোল উৎপাদন করে, তরঙ্গ-হিল্লোল পদ্মবন টলমলায়মান করে; আর এক দিকে, পদ্মবন তরঙ্গ-হিল্লোলকে প্রত্যাঘাত করে, তরঙ্গ-হিল্লোল অনিল-হিল্লোলকে প্রত্যাঘাত করে। এক দিকে যেমন ঐ থামটার উপরে চতুর্দ্দিক্ হইতে জল-বায়ু প্রভৃতির ক্রিয়ার পশ্চাতে ক্রিয়া আসিয়া পড়িতেছে, আর এক দিকে তেমনি থামটার স্বশক্তি হইতে প্রতিক্রিয়ার পশ্চাতে প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত হইয়া জল-বায়ু প্রভৃতির ঘেরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। ফল কথা এই যে, এক দিকে যেমন থামটার বাস্তবিক সত্তাকে লইয়া সমস্ত জগতের একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা স্থির রহিয়াছে, আর এক দিকে তেমনি থামটার বাস্তবিক সত্তা এবং অপরাপর সমস্ত বস্তুর বাস্তবিক সত্তা, এই দুই খণ্ড সত্তার পরস্পর বাধ্যবাধকতা-সূত্রে দুয়ের মধ্যে ক্রমাগতই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। ফল কথা এই যে, বিশ্বভুবনের মূলীভূত একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা স্থির রহিয়াছে বস্তুরূপে; ধাবমান হইতেছে কার্য্য-কারণের প্রবাহ-রূপে; রাশ টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছে নিয়তি-রূপে। নিয়তি আর কিছু না—বিধাতা-পুরুষের নিয়ম। এমন অনেক রাজ-নিয়ম আছে, যাহা নিছক বল-গর্ত্ত; যাহা নিয়ম-কর্ত্তার গায়ের জোর মাত্র; যাহার ভিতরে কোনো পদার্থ নাই—না আছে প্রেম, না আছে জ্ঞান, না আছে কিছু। কিন্তু বিধাতা-পুরুষের নিয়ম সে শ্রেণীর নিয়ম নহে। বিধাতা-পুরুষের অভ্রান্ত এবং অব্যর্থ নিয়মের ভিতরে বাহিরে তাঁহার ত্রৈকালিক জ্ঞানের অনিরুদ্ধ দৃষ্টি এবং বিশ্বব্যাপী প্রেমের অপরাজিত বল এক সঙ্গে জাগিতেছে; এক কথায়—তিনি আপনি জাগিতেছেন। আর একটি কথা এই যে, বিধাতা-পুরুষ আপনার সেই নিয়মের প্রবল-প্রতাপান্বিত শক্তিকে আপনার অসীম করুণার আচ্ছাদনে এরূপ সুসংবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, কেহই তাহা চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পায় না; আর, জগতের লোক তাহা চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পায় না বলিয়া তাহার নাম দিয়াছে অদৃষ্ট। এখানকার যাহা প্রকৃত মন্তব্য কথা—তাহা এই:—

* ভিতর-বাহিরের অনেক-রূপ অর্থ আছে। (১) কলসীর ভিতরে জল; (২) চলমান বস্তুর ভিতরে গতিশক্তি; (৩) মনের ভিতরে অভিসন্ধি; ইত্যাদি নানা অর্থ। এখানেও "ভিতরে"-শব্দের অর্থ সেইরূপ দেশকালপাত্রোচিত।

প্রথমত নিখিল জগতের কার্য্যকারণ-প্রবাহ নিয়তির * বাঁধে আট্‌কানো রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত নিয়তির বাঁধ এবং কার্য্য-কারণের প্রবাহ, দুই-ই বিশ্বভুবনের মূলীভূত একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে এই যে, সেই যে একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা, যাহা বিশ্বভুবনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহাই জাগ্রৎকালের বুদ্ধি-বিজ্ঞানের প্রধানতম ভরসা এবং অবলম্বন-যষ্টি। বিশ্ব-ভুবনে যদি বাস্তবিক সত্তার গোড়া-বাঁধুনি না থাকিত, তাহা হইলে তর্কচ্ছলে যদি স্বীকারও করা যায় যে, সে অবস্থায় জগতের একপ্রকার স্বপ্নবৎ প্রাতিভাসিক সত্তা সম্ভাবনীয়, তথাপি এটা স্থির যে, সেরূপ অরাজক স্বপ্ন-রাজ্যে বুদ্ধি-বিজ্ঞান মুহূর্ত্ত-কালের জন্যও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। তার সাক্ষী ;—ঐ থামটা যদি সত্যসত্যই স্বপ্নের ন্যায় শুদ্ধ কেবল প্রাতি-ভাসিক দৃশ্যমাত্র হয়, অর্থাৎ এরূপ যদি হয় যে, ঐ থামটার ভিতরে বাস্তবিক সত্তা নাই—উহার গুণের ভিতরে বস্তু নাই কার্য্যের ভিতরে কারণের হস্ত নাই—উহার সহিত অপর কোনো বস্তুর কোনোপ্রকার বাধ্য-বাধকতা নাই ; তাহা হইলে, এখন যেন তুমি উহাকে থাম বলিতেছ—কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে বিনা কারণে উহা যখন হাউই-বাজি হইয়া হুস্ করিয়া উড়িয়া যাইবে, তখন উহার থামত্ব কোথায় রহিবে? একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব যে, বুদ্ধির কার্য্যই হ'চ্চে বাস্তবিক সত্তার সহিত প্রাতি-ভাসিক সত্তার যোগ-সংঘটন। বাস্তবিক সত্তাই যদি নাই, তবে বুদ্ধি কাহার সহিত কাহার যোগ-সংঘটন করিবে? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বুদ্ধির বিষয়ীভূত বিজ্ঞান-রাজ্যের সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা, আর সেই ব্যাবহারিক সত্তার এ পিটে প্রাতিভাসিক সত্তা এবং ও পিটে বাস্তবিক সত্তা, দুই পিটে দুইরূপ সত্তা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। অতঃ-পর দ্রষ্টব্য এই যে, বুদ্ধির কার্য্যই হ'চ্চে দুয়ের যোগ-সংঘটন। দেখা যা'ক্ কিরূপ সে যোগ-সংঘটন।

(৩) ব্যাবহারিক সত্তার দুই পিটের যোগ-সংঘটন।

"জাগ্রৎকাল আমাদের বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব-কাল" এই কথাটি জন-সাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য অভিধানে জাগরিতা-বস্থার আর-এক নাম দেওয়া হইয়াছে প্রবুদ্ধ অবস্থা এবং জাগ্রৎকালের আর-এক নাম দেওয়া হইয়াছে প্রবোধ-কাল। ফল কথা এই যে, জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান-রাজ্যেই বুদ্ধি নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। স্বপ্নকালের মনোরাজ্যে বুদ্ধির খেলা যত কিছু চলিতে দেখা যায়, সমস্তই খেলা-মাত্র, অভিনয়-মাত্র; একপ্রকার ছায়াবাজি! তা বই, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধির খেলা নহে। বুদ্ধির মুখ্যতম কার্য্য হ'চ্চে বস্তু চেনা। পণ্ডিতি ভাষায়—তাহারই নাম প্রত্যভিজ্ঞান (recognition)। বেদান্তদর্শনের "সোহয়ং

* নিয়-তি—নিয়-ম। নিয়তি-শব্দের অর্থ বিধাতা-পুরুষের নিয়ম, তা ছাড়া আর কিছুই নহে।

দেবদত্তঃ” প্রত্যভিজ্ঞানের একটি গোড়া-ঘ্যাঁসা উদাহরণ ; তা ছাড়া, ইউরোপীয় দর্শন-রাজ্যের গোড়ার কথা একটি এই যে, All cognition is *re*cognition অর্থাৎ জ্ঞান-নামাই প্রত্যভিজ্ঞান। এখন, বুদ্ধির এই যে মুখ্য কার্য্য প্রত্যভিজ্ঞান, তাহার মুখের প্রতি একটু স্থিরচিত্তে ঠাহর করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ যে প্রত্যভিজ্ঞান, ও-টি বুদ্ধিমাতার এক-প্রকার শ্যাম-দেশীয় (Siamese) যমক-সন্তান। প্রত্যভিজ্ঞানের সমগ্র শরীরে -বাস্তবিক এবং প্রাতিভাসিক—এই দুইপ্রকার সত্তা পিঠাপিঠি-ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। মনে কর, পুষ্করিণীতে একটা হংস খেলিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া—আমি বলিলাম “ও-টা রাজহংস” অর্থাৎ “ঐ হংস রাজহংস”। ‘ঐ হংস রাজ-হংস” এ কথাটি একটিমাত্র কথা কিন্তু দুই খণ্ডে বিভক্ত। সে দুই খণ্ড হ'চ্চে—(১) ঐ হংস এবং (২) রাজহংস। এখন দেখিতে হইবে এই যে, যাহাকে আমি “ঐ হংস” বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, সেই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হংসটির সত্তা বাস্তবিক সত্তা ; আর, রাজহংসের একটা ভাব বা আদর্শ, যাহা অনেকদিন হইতে আমার মনের মধ্যে জিয়ানো রহিয়াছে এবং এক্ষণে যাহা আমি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বাস্তবিক হংসটার উপরে উপাধিচ্ছলে চাপাইয়া দিতেছি, তাহা আমার মানস-সরোবরের রাজহংস ; সুতরাং তাহার সত্তা প্রাতিভাসিক। এই যে আমি হংসের একবিধ সত্তার সঙ্গে আর একবিধ সত্তা জুড়িয়া দিলাম—বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে প্রাতিভাসিক সত্তা জুড়িয়া দিলাম—ইহারই নাম বুদ্ধির খেলা। গুলি-ডাণ্ডা-খেলা'তে যেমন গুলি এবং ডাণ্ডার সংস্পর্শ-সংঘটন আবশ্যক হয়, বুদ্ধির খেলা'তে তেমনি বিচার্য্য বস্তুর বাস্তবিক সত্তা এবং বিচারকের মনোগত আদর্শের প্রাতিভাসিক সত্তা, এই দুইপ্রকার সত্তার যোগ-সংঘটন আবশ্যক হয়। উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বাস্তবিক সত্তা দক্ষিণ হস্ত ; প্রাতিভাসিক সত্তা বাম হস্ত ; বুদ্ধির খেলা করতালি-প্রদান। জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান-রাজ্যে দুই হস্ত অনুক্ষণ একযোগে কার্য্য করিতে থাকে—কাজেই তালি বাজিতে থাকে অর্থাৎ বুদ্ধির খেলা চলিতে থাকে। আমি যদি আমার কুটুরী-ঘরে চৌকি হেলান দিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ইংলণ্ড ভাবি, তবে সেরূপ ধোঁয়পা ভাবনা স্বপ্নের অনেকটা কাছা-কাছি যায়, ইহা খুবই সত্য ; কিন্তু আমি তখন সত্যসত্যই নিদ্রিত নহি ; আমি তখন দিব্য সজাগ ! আমি তখন বেশ্ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার শরীরের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে আমার আশ্রয়-চৌকির বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে ; আশ্রয়-চৌকির বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে ; কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে বাড়ীর ভিত্তিমূলের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে ; বাড়ীর ভিত্তিমূলের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে কলিকাতা-পুরীর বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে ; কলিকাতা-পুরীর বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে পূর্ব্ব-সমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে ; পূর্ব্ব-সমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে মহাসমুদ্রের

বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; মহা-সমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে ইংলণ্ডের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে। কিন্তু এই যে বাস্তবিক সত্তার অসংখ্য শ্রেণী-পরম্পরা, ইহার গোড়ার কাহিনী একরত্তি ক্ষুদ্র; কি? না, আমার আপনাকে শুদ্ধ ধরিয়া এই কুটুরী-ঘরটির বাস্তবিক সত্তা; কেন না, তাহাই কেবল সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে। তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু আমার চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সমস্তেরই সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সেই সকল চিন্তা-চর বস্তু-সকলের প্রাতিভাসিক সত্তার সহিত আমার এই কুটুরী-ঘরটির বাস্তবিক সত্তার সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশেষ কোনোপ্রকার সম্পর্ক দৃষ্ট হইতেছে না বটে, কিন্তু তা বলিয়া, আমার বুদ্ধি পরোক্ষ-সম্বন্ধে দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক-পাতানো-কার্য্যের ঘটকতা করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। আমার বুদ্ধির নিকটে এ কথা অবিদিত নাই যে, আমার চিন্তা-চর প্রাতিভাসিক ইংলণ্ডের গোড়া'র কথা হ'চ্চে বাস্তবিক ইংলণ্ড; আর সেই বাস্তবিক ইংলণ্ড হইতে আমার এই ক্ষুদ্র কুটুরী-ঘর পর্য্যন্ত বাস্তবিক সত্তার যোগ-সূত্র নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে। আমার বুদ্ধি এটা বেশ্ জানে যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তা এবং সমস্ত জগতের বাস্তবিক সত্তা, মূলে একই বাস্তবিক সত্তা। ইহা জানিয়া আমার বুদ্ধি করিতেছে কি? না, প্রথমত আমার এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তাতেই সর্ব্বজগতের অখণ্ড এবং নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবিক সত্তা উপলব্ধি করিতেছে; দ্বিতীয়ত আমার এই ক্ষুদ্র কুটুরীর বাস্তবিক সত্তাতেই বিশ্ব-ভুবনের বাস্তবিক সত্তা হস্তে পাইয়া সেই নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড বাস্তবিক সত্তার যোগে আমার চিন্তাচর ইংলণ্ডের প্রাতিভাসিক সত্তার সহিত বাস্তবিক সত্তা জুড়িয়া দিতেছে। অতএব জাগ্রৎকালে আমি আমার মনোরথ-বিমানকে প্রাতিভাসিক সত্তার আকাশ-মার্গে যতই উচ্চে উড্ডীয়মান করাই না কেন— তাহার খুঁটি বাঁধা রহিয়াছে বাস্তবিক সত্তার সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে—যদিচ সে ভিত্তিমূল দেখিতে অতি যৎসামান্য ক্ষুদ্র। সে ভিত্তি-মূল কি? না, আমার আপনার এবং আমার সন্নিধানবর্ত্তী প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিষয়-সকলের বাস্তবিক সত্তা। এইটি কেবল এখানে দেখা উচিত যে, বাস্তবিক সত্তা'র সাক্ষাৎকার-লাভ আমি যে-কোনো স্থানেই করি না কেন—তিল-পরিমাণ স্থানেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি, আর পর্ব্বত-পরিমাণ স্থানেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি, যে-কোনো স্থানেই তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করি না কেন, সেই স্থান হইতেই তাহা নিখিলবিশ্বময় নিরবচ্ছেদে পরিব্যাপ্ত।

অনতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎকালে বাস্তবিক এবং প্রাতিভাসিক, এই দুইরূপ সত্তা একযোগে কার্য্য করে বলিয়া বুদ্ধি রীতিমত খেলিতে পায়। স্বপ্ন-কালে মনেরই কেবল দুয়ার খোলা থাকে— বুদ্ধির দ্বারে কপাট পড়িয়া যায়। স্বপ্নের মনোরাজ্যে যাহার যাহা কিছু সত্তা, সমস্তই প্রাতিভাসিক সত্তা। পূর্ব্বে এক স্থানে

উপমাচ্ছলে বলিয়াছি যে, বাস্তবিক সত্তা দক্ষিণ হস্ত, প্রাতিভাসিক সত্তা বাম হস্ত এবং বুদ্ধির খেলা করতালি-প্রদান। স্বপ্নের অর্দ্ধাঙ্গ-হীন শরীরে একাকী কেবল বাম হস্তই কার্য্য করে—প্রাতিভাসিক সত্তাই কার্য্য করে—কাজেই তালি বাজে না অর্থাৎ বুদ্ধি খেলে না। স্বপ্নাবস্থায় সিরাজুদ্দৌলার আমলের মৃত ব্যক্তি জীবিতের অভিনয় করিয়া দর্শকের চক্ষের সম্মুখ দিয়া অনায়াসে পার পাইয়া যায়; দর্শক ভুলক্রমেও একবার আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করে না যে, এ যাহা দেখিতেছি, ইহা বাস্তবিক কি অবাস্তবিক। অতএব পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি, তাহাই ঠিক; সে কথা এই যে, স্বপ্ন-কালে বুদ্ধির খেলা যত কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা খেলা-মাত্র, অভিনয়-মাত্র;—একপ্রকার ছায়াবাজি; তা বই, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধির খেলা নহে। তবেই হইতেছে যে, বুদ্ধি জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান-রাজ্যেরই অধিপতি। স্বপ্নকালের মনোরাজ্যের অধিপতি মন। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, সুষুপ্তিকালের নিস্তব্ধতা-রাজ্যের * অধিপতি কে? ইহার উত্তর এই যে, প্রাণ। সুষুপ্তি-কালের নিস্তব্ধতা-রাজ্যে কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় দুইটি মাত্র; কি-দুইটি? না, প্রাণক্রিয়ার ব্যতিক্রম-সংশোধন এবং শরীরের স্বাস্থ্যসাধন।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, স্বপ্ন-কালের নকল-বুদ্ধি-ক্রিয়াতে যেমন জাগ্রৎকালের আসল-বুদ্ধি-ক্রিয়ার প্রতিভাস বা ছায়া বা গন্ধ সংসক্ত থাকে, সুষুপ্তি-কালের প্রাণক্রিয়াতে তেমনি মনঃক্রিয়া এবং বুদ্ধি-ক্রিয়া, দুয়েরই ছায়া সংক্রামিত হয়। সুষুপ্তি-কালের প্রাণ-ক্রিয়াতে মনের ছায়া পড়া'তে সুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রা-সুখের উপভোগ হয়; আর, সেই নিদ্রা-সুখের উপরে বুদ্ধির ছায়া পড়া'তে সুষুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানে নিদ্রাসুখের অনুভব হয়। যাহাই হউক না কেন, সুষুপ্তিকালের জ্ঞান জাগ্রৎকালের বুদ্ধির ন্যায় জাগ্রত জীবন্ত জ্ঞান নহে, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। সে জ্ঞান তবে কিরূপ জ্ঞান? সে জ্ঞান যে কিরূপ জ্ঞান, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর;—

এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র নহে যে, একজন কবি গড়ের মাঠের তরুতলে বসিয়া কবিতা-রচনা-কার্য্যে এরূপ তন্মন-ভাবে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং স্বরচিত-কবিতা-রস-মাধুর্য্যে এরূপ প্রগাঢ় নিমগ্ন রহিয়াছেন যে, তাঁহার সম্মুখ দিয়া একদল সিপাহী-সৈন্য রণবাদ্য করিতে করিতে চলিয়া গেল—তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। এরূপ অবস্থায়, কবির জ্ঞান কবিতা-রচনাকার্য্যে ভরপুর নিমগ্ন থাকাতে আর কোনো দিকেই যে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। কবিতা-রচনাকালে কবির জ্ঞান যেমন অনন্য-মানসে সেই কার্য্যেই নিমগ্ন থাকে—অথবা যেমন

* স্তব্ধতা-শব্দের মুখ্য অর্থ স্তম্ভিত-ভাব। নিঃশব্দতা, নিস্তব্ধতা-শব্দের, গৌণ অর্থ মাত্র। নিস্তব্ধতা-শব্দের মুখ্য অর্থ স্থৈর্য্য অথবা প্রশান্তি।

দুর্ব্বাসা-ঋষির শাপ-প্রদানের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে শকুন্তলার জ্ঞান দুষ্যন্ত রাজার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল—সুষুপ্তি-কালে নিদ্রিত ব্যক্তির জ্ঞান তেমনি অতীব একটি সরস কার্য্যে নিমগ্ন থাকে; এমন ভরপূর নিমগ্ন থাকে যে, আর কোনো দিকেই তাহার দৃষ্টিপাত করিবার সামর্থ্য থাকে না। সে কার্য্য কি? না, প্রাণের কল-ম্যারামতি-কার্য্য। শকুন্তলা যেমন দুষ্যন্ত রাজাকে ভাল বাসিতেন, বুদ্ধি তেমনি প্রাণকে ভাল বাসে। সুষুপ্তি-কালে তাই নিদ্রিত ব্যক্তির বুদ্ধি প্রাণের কল-ম্যারামতি-কার্য্যে একান্তঃকরণে নিমগ্ন থাকে। ঐ কার্য্যটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে চলিতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুষুপ্তির আরাম অটুট থাকে। ঐ কার্য্যটি সাঙ্গ হইলেই নিদ্রাসুখের ভোগ-মাত্রা পর্য্যাপ্তি লাভ করে; ভোগ-মাত্রা পূর্ণ হইলেই নিদ্রা-ভঙ্গ হয়।

এতক্ষণ ধরিয়া যে বিষয়ের আলোচনা করা হইল, তাহাতে জীবাত্মার জ্ঞানের তিন কালের তিন অবস্থার প্রভেদ বুঝিতে পারিবার পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়াছে, এরূপ ভরসা হয়। এখন আমরা এটা অন্তত বুঝিতে পারিতেছি যে,—

(১) সুষুপ্তি-কালের জ্ঞান প্রাণ-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম-সংশোধন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং তজ্জনিত আনন্দ-ভোগে নিমগ্ন থাকে।

(২) স্বপ্নকালের জ্ঞান মনোরাজ্যের প্রাতিভাসিক সত্তাতে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে।

(৩) জাগ্রৎকালের জ্ঞান, বিজ্ঞান-রাজ্যের ব্যাবহারিক সত্তার দুই পৃষ্ঠের অপর দুইরূপ সত্তার, ইহার সঙ্গে উহার যোগ-সংঘটন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে।

অতঃপর তিন কালের জ্ঞানের তিন অবস্থা একসঙ্গে স্ফূর্ত্তি পাইবার সময় কোথায় কি ভাবে স্ফূর্ত্তি পায়, এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইবার সময় কোথায় কোথায় কি-কি-ভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। আজিকের মত এই অবধিই ভাল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার সম্পাদকী।

আমিও একদিন সম্পাদক হইয়াছিলাম, সে ধৃষ্টতা আমার মাপ করিবেন। আমার ধারণা ছিল, সভাপতি এবং সম্পাদক হওয়া সহজ। পতাকার দণ্ডটাই খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কাপড়ের টুক্‌রা তাহার সর্ব্বোচ্চে উড়িয়া মাৎ করিয়া তোলে— তাহার ভার নাই, মূল্য যৎসামান্য, কিন্তু সে-ই ত বাতাসে ফর্‌ফরায়তে;—বড় আশা করিয়াছিলাম, লেখকদের শিরঃস্থানে ভর করিয়া পতপত-নিনাদে পাঠকসমাজের চূড়ার উপর উড্ডীয়মান্ হইব। কিন্তু তখন লেখকজাতিকে চিনি নাই। চাণক্য যদি সম্পাদক হইতেন, তবে তাঁহার বিখ্যাত শ্লোকের মধ্যে "রাজকুলেষু"-শব্দের পূর্ব্বে "লেখকেষু" বসাইয়া দিতেন। এই লেখকদের সম্বন্ধে ভাবী ও বর্ত্তমান সম্পাদকগণকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আমার এই কাহিনীর অবতারণা। এই লেখাটি প্রকাশ করিয়া সম্পাদকমহাশয় স্বজাতিহিতৈষিতার পরিচয় দিবেন।

সবে-মাত্র কালেজ ছাড়িয়াছি, তখন দেহভরা উদ্যম, বুকভরা আশা, হৃদয়-ভরা স্বদেশপ্রেম! তখন অর্থানুরাগ অপেক্ষা বিদ্যানুরাগ প্রবল, বিদ্যানুরাগ অপেক্ষা যশোলিপ্সা প্রখরতর! আমার স্বদেশপ্রেম, বিদ্যানুরাগ ও যশোলিপ্সা, এই "ত্র্যহ-স্পর্শে"র সংমিশ্রণে অচিরেই এক বাঙলা মাসিক পত্রিকার জন্ম হইল। তার নাম রাখিলাম—"উদ্দীপনা।" ভবিষ্যতে আদরের পুত্রের অনশন ঘটিবার সম্ভাবনা দাঁড়াইলেও, যেমন জনকবিশেষে পুত্রের অন্নাশনে অত্যধিক ব্যয় করেন, আমিও তেমনি উদ্দীপনার অনুষ্ঠানে অকাতরে—অকুণ্ঠিতচিত্তে অর্থব্যয় করিলাম। আশাতীত আশা পাইলাম! বরষায় দর্দ্দুরের মন যেমন নাচিয়া উঠে, ভরসায় এ ক্ষুদ্রের মনও তেমনি নাচিয়া উঠিল। আরও মাসিকপত্র যে না ছিল, তাহা নহে; কিন্তু আমি বড় বড় লেখকের পৃষ্ঠপোষিত—

"আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"

আমার কাগজ চলিতে আরম্ভ করিল, বিজ্ঞাপনের দুন্দুভি বাজাইতে বাজাইতে, প্রশংসাপত্রের ভেরীনিনাদ করিতে করিতে, আমার কাগজ হুহু চলিতে লাগিল। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন দিনে দিনে বাড়ে, আমার সোণার চাঁদ গ্রাহকও তেমনি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। কিন্তু ষোলকলার মধ্যে অধিকাংশ কলাই যে পশ্চাদ্দেয় মূল্যের গ্রাহক, সে কথা স্বীকার করিতে হইবে। চাঁদেও কলঙ্ক থাকে—কিন্তু এত কলঙ্ক থাকিলে চাঁদনীর অংশ অত্যন্ত কম পড়ে—আমার ভাগ্যে তাই ঘটিল—রজতচ্ছটা বড় সামান্য। সম্পাদক-চকোরের পেট যে ভরে না। কিন্তু তাতে কি? আমার যে মূল উদ্দেশ্য পাঠকসংগ্রহ, তা ত সিদ্ধ হইল। বিশেষত আমার স্বদেশানুরাগে কোন

স্বার্থের গন্ধ ছিল না। প্রতিদানের আশা রাখিলে প্রেম গাঢ় হয় না, তাও আমার তখন জানা ছিল। তখন জানিতাম, ঘরের খাইয়া যদি বনের মহিষ তাড়াইতে না পারিলাম, তবে ধিক্ আমার স্বদেশপ্রেমব্রতে। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, শতধিক্ ওই রজত-চক্রখণ্ডে! সে পৌনঃপুনিক দশমিকের মত বিভাগে বাড়ে না।

"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"

বিদ্যার মত এ উদারতাও তার নাই। দুইটি বৎসর অতীত হইতে না হইতে—

আমার পূর্ণ বাকস
শূন্য করিয়া
রুণি ঝুনি ঝুনি—
গেল সে চলিয়া।
ওগো এবে সে নিঠুর
দেখে না ফিরিয়া॥

আমি—

কত তারে সাধি
দিবানিশি কাঁদি
চোখে বহে যায় দরিয়া।
তবু, সে তো রে আসে না ফিরিয়া॥

বিপন্ন হইয়া গ্রাহকমহাশয়দের শরণাপন্ন হইলাম। বোধ হয়, অর্থ অনর্থের মূল ভাবিয়াই অনেকে আর্থিক কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কেহ কেহ যাহা উত্তর দিলেন, তাহার ভাবার্থ—

ধন দিয়ে মন যদি সেই সে তুষিতে হ'লো।
বাংলা মাসিক প'ড়ে তবে কিবা ফল বলো॥

আমার নামজাদা লেখকগণও এই সময় আমার প্রতি একটু বেশি অনুগ্রহ আরম্ভ করিলেন। যিনি বড় দার্শনিক বলিয়া খ্যাত, তিনি লিখিতে লাগিলেন,—কবিতা; সমালোচক 'রহস্যে' ব্রতী হইলেন; কবি ধরিলেন,—রাজনীতি; ঔপন্যাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদের আসন লইলেন; আর ঐতিহাসিক মন দিলেন,—"কঠোপনিষদে!"

এই সকল প্রবন্ধ কাগজে বাহির হওয়ার পর লেখার প্রকৃত রস আস্বাদ করিতে না পারিয়া, সমালোচকগণ কাঁঠালের আমসত্ব বলিয়া এগুলিকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দু দশ কথা শুনাইতে ছাড়িলেন না। এ শ্রেণীর প্রবন্ধের সকলগুলি আমি না ছাপিয়া চাপিয়া রাখিতাম, অবশ্য এগুলি যে প্রকাশের অযোগ্য মনে করিতেছি, তাহা লেখকদের তখন বলিতাম না,

কিন্তু,—

"এ সকল রহে না গোপনে
বন্ধুকর্ণে প্রবেশিলে
প্রকাশ পায় তা জনে জনে।"

যাহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে বিলম্ব হয়, তিনিই চটিতে আরম্ভ করেন, প্রবন্ধ ফেরত চাহেন। একদিন সহসা দেখিলাম, আমারি কাগজে একখানি মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন মহাধুমধামে বাহির হইয়াছে। আমার অধিকাংশ লেখকই সে কাগজের লেখকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তখন আমার মনের ভাব যে কি-প্রকার হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীদাসের রাধিকার ভাষায় বলিতে গেলে—

"সই কেমনে ধরিব হিয়া!
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া!

সে বঁধু লেখক, না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে ?
আমার অন্তর যেমন করিছে,
তেমনি হউক সে !
যাহার লাগিয়া, বাছাই ত্যজিনু
লোকে অপযশ কয়,—
সেই গুণনিধি, আমারে ছাড়িয়া
আর জানি কার্ হয় !
সম্পাদক হয়ে, লেখক ভাঙায়ে
এমতি করিল কে ?
আমার পরাণ, যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে।"

অনেক লেখক আবার এরূপ কোন কারণ না ঘটিতেই নূতনে মন দিলেন! হায় এই সব লেখকদের নিকট আমরা সম্পাদকগণ বুঝি হবিষ্যের মালসা *— "নিতুই নব।" ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই কাগজ বাহির করিবার সময় আমায় বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন—এখন ইঁহাদের সে আশ্বাসবাণী কোথায় রহিল ?

"যে মনেতে নাচাইলে
সে মন এখন রইল কোথা ?
ডুমুরের ফুল হলি কি রে
দেখা পাওয়া কঠিন কথা।"

বুঝি—

"সে কাল গেল বৈয়া বঁধু
সে কাল গেল বৈয়া।"

একদিন এই শ্রেণীর একজন লেখককে পথে দেখিতে পাইলাম। তিনি তখন আর এক সম্পাদকের আফিসে প্রবেশ করিতে উদ্যত, নব সম্পাদকমহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে। আমি সবিনয় নমস্কার-নিবেদন করিলাম— "ভাল ত ?—আর যে দেখা পাই না।" মুখে এইটুকু বলিলাম, কিন্তু আমার কাতর-দৃষ্টিতে প্রকাশ করিতেছিল,—

"এই পথে নিতি, কর গতায়তি,
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
নব-সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,
আমি বঞ্চি একাকিনী॥
বঁধু আজ না ছাড়িয়া দিব।"

লেখক-মহাশয় ব্যাপারটা বুঝিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন, যেন পলাইতে পারিলে বাঁচেন! ভাবটা,—

"চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে,
শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে,
এই নিবেদন তোরে।"

"আচ্ছা দেখা হবে" বলিয়া তিনি পাশ কাটাইলেন, আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম,—

"লেখক চপলজাতি
কোথা নাহি থির রয়।
যে তারে অধিক তোষে
তারে সে লেখা জোগায়!"

তা যে কারণেই হোক, দিনদিন আমার বাঁধা লেখকগণের মধ্যে অনেকেরই অনুগ্রহে বঞ্চিত হইতে লাগিলাম! আমার সময় খারাপ পড়িয়াছিল,—জানি না, একদিন কি দুর্ব্বুদ্ধি হইল—

"ভাঙিল মঙ্গলঘট আপনার হাতে!"

উদ্দীপনা-সম্পাদনে যিনি আমার প্রধান

* ইহাতে যেন এ কথা কেহ না বুঝেন যে, এই সকল লেখক জননীস্বরূপা বঙ্গভাষার শ্রাদ্ধ নিত্য করিয়া থাকেন।

সহায় ছিলেন, তাঁহার কোন একটা লেখায় ব্যক্তিগত আক্রমণের কিছু বাড়াবাড়ি দেখিয়া, একটু বাদসাদ দিয়াছিলাম। আরে বাপ্‌রে!—

"কে দিল আগুনে হাত
কে ধরিল ফণী!"

সত্যই তখন আমার উদ্দীপনার—

"পঞ্চম মঙ্গলে আর রন্ধ্রগত শনি!"

তখন বুঝি নাই, কিন্তু এখন বুঝিয়াছি,—সাহস থাকে, সহ্যগুণ থাকে, পরমায়ু থাকে, "ভিমরুলের চাকে" হাত দিও, কিন্তু লেখক বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে, অন্তত কোন নামজাদা মাসিক পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে যাহাদের দুই একটা লেখাও বাহির হইয়াছে, সম্পাদক হইয়া তাঁহাদের লেখায় হাত দিও না, দিও না, দিও না! তাহা হইলে তাঁহাদের রোষ রাবণের শক্তিশেলের মত তোমার বুকে বিঁধিবে, ইন্দ্রের বজ্রের মত তোমার মাথায় পড়িবে, বিষ্ণুর সুদর্শনের মত তোমার শক্তি খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিবে। কিন্তু বলিতেছিলাম, এতদিনে আমি আপনার পায়ে আপনি কুঠার বসাইলাম। যাহার লেখায় আমার "উদ্দীপনা" উদ্দীপিত হইতেছিল, তাঁহারি ক্রোধে এখন বুঝি "উদ্দীপনা" দগ্ধ হয়। বুঝিলাম, আলো যে দেয়, পোড়াইতেও সেই পারে, কিন্তু—

"এতদিন বুঝি নাই, এখন কি হবে বুঝে!"

এখন যে,—

"আপন করমদোষে
সুধার সমুদ্র, দৈবে শুকায়ল,
তিয়াসে পরাণ শোষে!"

বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, আমার সেই লেখকচূড়ামণি অন্য কাগজে প্রবন্ধ দিতে লাগিলেন। এতদিনে—

"হা শম্ভু তুমিও বাম!"

তা যাই হোক, আমি তাঁহার আশা ত্যাগ করিলাম না, অনেক সাধাসাধি, কাঁদাকাঁদি, হাঁটাহাঁটি করিলাম, কিন্তু আমার লেখক-প্রবরের একই কথা,—

"'যাও যাও মিছে সেধ' না,
ভাঙিলে সকলি মিলে
মন মিলে না।"

না মিলুক, আমি কিন্তু একদিন "না-ছোড়-বান্দা" হইয়া ধরিলাম।

"আমার কি অপরাধ, তাই আর আমার কাগজে লেখেন না!"

উঃ।—মনে করিয়া দেখ!

আমি।—তাহার জন্য কতবার ক্ষমা চাহিয়াছি, এক অপরাধের কি মার্জনা হয় না?

উঃ। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। এখন তুমি প্রবীণ সম্পাদক।

আমি।—তা নয়, এবার আমি কি স্থির করিয়াছি, শুনুন। আপনার অভিপ্রায় অনুসারেই এখন সমস্ত প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইবে,—উদ্দীপনা আপনারই।

উঃ।—এখন আর সে কথা সাজে না। আমার উদ্দীপনা হইলে কি এমনতর ঘটে! তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ! আমি তোমায় প্রবন্ধ দিব, তুমি ছাপিবে। আমার লেখা বাদ দিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া ছাপিবে, ইহা আমি সহ্য করিব, এ সম্বন্ধ নহে।

আমি।—উদ্দীপনা আপনার আশ্রিত—প্রতিপালিত, আপনার প্রবন্ধের ভিখারী!

আমায় ক্ষমা করুন,—আমি অবোধ, না বুঝিয়া কি করিয়াছি,—আমায় ক্ষমা করুন।

তথাপি তিনি নিরুত্তর। আমি আবার বলিলাম, "কি বলেন?"

উঃ।—আমি তোমার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিব।

বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলেন।

এবার বড় কষ্ট হইল, চক্ষু ছলছল করিতেছিল, হুকুমে চক্ষের জল ফিরাইলাম; সবিনয়ে, অবিকম্পিত কণ্ঠে, বলিতে লাগিলাম, "তবে যাও, আর লিখিও না। বিনাপরাধে আমায় ত্যাগ করিতে হয়, কর, কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে। মনে রাখিও, একদিন তুমি খুঁজিবে, কোন্ সম্পাদক আমার মত ভাল-মন্দ-নির্ব্বিচারে তোমার সকল প্রবন্ধ ছাপে! দেবতা সাক্ষী, যদি তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকে, তবে তুমি আবার লিখিবে, আমি সেই আশায় কাগজ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল, আর লিখিব না,—কিন্তু আমি বলিতেছি, আবার আসিবে—আবার লিখিবে। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি উদ্দীপনারই, অন্য মাসিকের নও।" এই বলিয়া আমি ভক্তিভাবে তাঁকে নমস্কার করিয়া ফিরিলাম। গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যুক্তকরে মনে মনে ঊর্দ্ধমুখে অথচ অস্ফুটবাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম—"কেহ আমাকে বলিয়া দাও, আমার কি দোষে এই সাতাইশ-বৎসর-মাত্র বয়সে, এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল! আমার অর্থ বিনষ্ট হইয়াছে, আমার লেখকেরা ত্যাগ করিল, আমার সাতাইশ-বৎসর-মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে "উদ্দীপনা" ভিন্ন আর কিছু ভাল বাসি নাই, লেখকের মনোরঞ্জনব্রত ভিন্ন ইহলোকে আর কিছু করি নাই, করিতে শিখি নাই, তবু—আমি আজ নিরাশ হইলাম কেন?"

কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, দেবতা নিতান্ত নিষ্ঠুর, যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তখন লেখক বা গ্রাহক আর কি করিবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ কাগজ উঠাইয়া দিলাম, সম্পাদকজন্ম হইতে খালাস পাইলাম!

কিন্তু—

"এখনও এখনও কেন—!"

শ্রীপ্রেমবল্লভ গুপ্ত।

গীতলক্ষ্মী।

প্রেম, তুমি জন্মে জন্মে সঙ্গ নিলে মোর
সঙ্গীতের বেশে!
জন্মান্তরস্মৃতি তাই বাজিছে বীণায়
নিমেষে নিমেষে।
তুমিও ছাড়নি মোরে, আমিও ছাড়িনি,
প্রেমেরি এ ধারা,
দুজনে বেড়াই নেচে দুঃখের জগতে
ভাবে মাতোয়ারা!
তরঙ্গিত ধ্বনিসিন্ধু ক্ষোভে তল হ'তে
রমার মূরতি,
বেজে ওঠে মায়াবাদ্যে দেউলে দেউলে
মঙ্গল আরতি।
তুমি আর আমি করি কি যে সুধাপান
কেহ নাহি জানে;
পরপারে এ সংসারে [illegible] জনে
ভাবের শ্মশানে!
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে আলোকে আঁধারে
প্রভাতের বেলা
জাগেনি কবির গান, বাঁশি নিয়ে শুধু
ছিল ছেলেখেলা।
হেনকালে কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিল ধ্বনিয়া
গুঞ্জরিত স্বর;
কোকিলা উতলা হ'ল শুনি কোকিলের
মত্ত কলস্বর।
সেই মহোৎসবে মাতি নবসিক্ত প্রাণে
তরুণ উচ্ছ্বাসে
শূন্য মন্দিরের দ্বার তূর্ণ মুক্ত করি
ছিনু কার আশে?

সে যে তুমি,—হে জাগ্রত প্রণয়দেবতা,
এলে মোর ঘরে
বিকাশি' এ হৃদিপদ্ম তব সুকুমার
পাদপদ্মভরে!
সাধকের সুধাস্বপ্নে জন্ম নিলা বুঝি
প্রীতির আধার?
করুণাকোমল আঁখি, ওষ্ঠে শান্ত হাসি,
কণ্ঠে গীতধার!
কবে জেনেছিলে মোর নিগূঢ় বেদনা
তব লাগি' প্রিয়া?
তাই মধুমূর্ত্তি ধরি পশিলে সেদিন
পূর্ণ করি হিয়া!
প্রথম মিলনমোহে ছিনু যবে দোঁহে
মৌন মুগ্ধ মূক,
চারিপাশে কৌতূহলী প্রকৃতি কেবল
ছিল জাগরূক।
সে শুধু লিখিলা বসি মোদের কাহিনী
সহস্র ঝলকে
বনে বনে, ফুলে ফুলে, গগনে গগনে,
মেঘের স্তবকে।
রচিনু নবীন ছন্দে আনন্দ-মিলন
মনে পড়ে বালা?
সঙ্গীতের পুরস্কার দিলে মোর গলে
তব কণ্ঠমালা!
চক্ষু ভরি' এল নেশা, কণ্ঠ ভরি' তৃষা,
বক্ষ ভরি' তাপ,
বাঁশরীর রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, ভরিয়া উঠিল
প্রেমের প্রলাপ!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার।
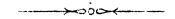
কলিকাতা-সহরের দৈনন্দিন মৃত্যুসংখ্যা প্রত্যহ খবরের কাগজে বাহির হয়। সাতদিনের সংবাদ একত্র করিয়া এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে :—

তারিখ।	মৃত্যুসংখ্যা।
১লা বৈশাখ	৫০
২রা "	৪৫
৩রা "	৬২
৪ঠা "	৭০
৫ই "	৩৫
৬ই "	৬০
৭ই "	৫২

এই তালিকা দেখিলে কোন্ দিন কত লোক মরিয়াছে, জানা যায়।

তালিকার পরিবর্ত্তে রেখাদ্বারা দৈনন্দিন মৃত্যুসংখ্যা-নির্দ্দেশ চলিতে পারে।

১ চিত্র।
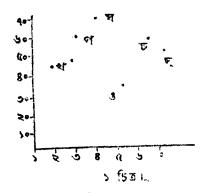
১ম চিত্রে দুইটি রেখা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত। একটি রেখা সময়নির্দ্দেশক, উহাতে ১ হইতে ৭ পর্য্যন্ত তারিখের অঙ্ক লেখা আছে। অন্য রেখাটি মৃত্যুসংখ্যা-নির্দ্দেশক, উহাতে ১০ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা অঙ্কিত আছে।

১০ অঙ্ক ও ২০ অঙ্কের মাঝের স্থানটুকু দশ ভাগে বিভক্ত করিলে ১১, ১২, হইতে ১৯ পর্য্যন্ত অঙ্ক পাওয়া যাইতে পারে। চিত্র কদাকার হইবার ভয়ে ঐ সকল চিহ্ন দেওয়া হয় নাই। পাঠকগণ মনে মনে ঐরূপ ভাগ করিয়া লইতে পারেন।

১ হইতে ৭ পর্য্যন্ত তারিখ-নির্দ্দেশক অঙ্কের উপরে ক, খ ইত্যাদি ক্রমে ছ পর্য্যন্ত সাতটি বিন্দু রহিয়াছে। এক এক অঙ্কের উপর এক এক বিন্দু। ৩ অঙ্কের উপর গ, ৬ অঙ্কের উপর চ, ইত্যাদি।

সকল বিন্দুর উচ্চতা সময়নির্দ্দেশক রেখা হইতে সমান নহে। কোনটির উচ্চতা অধিক, কোনটির কম। ঘ-বিন্দু সর্ব্বোচ্চে আছে, আর ঙ-বিন্দু সকলের নিম্নে আছে। কোন্ বিন্দু কত উঁচুতে আছে, মাপিতে হইলে পাশের মৃত্যুসংখ্যা নির্দ্দেশক রেখায় তাকাইলেই চলিবে। ক-বিন্দুর উচ্চতা ৫০; খ-বিন্দুর উচ্চতা ৪০ ও ৫০এর মাঝামাঝি অর্থাৎ ৪৫; গ-এর উচ্চতা ৬০এর একটু বেশি অর্থাৎ ৬২; ঘ-বিন্দুর উচ্চতা ৭০; ঙ-বিন্দুর উচ্চতা আবার ৩৫ মাত্র।

২ চিত্র।
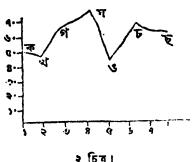
২য় চিত্রে বিন্দুগুলির মাঝ দিয়া একটা ভাঙা-চুরা বাঁকা রেখা টানা গিয়াছে। এই রেখার অন্তর্গত কোন্ বিন্দু কত উচ্চে আছে দেখিলেই, কোন্ তারিখে কত লোক মরিয়াছে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

মনে কর, জানিতে চাই, ৬ই তারিখে কত লোক মরিয়াছে। তারিখের অঙ্ক ৬এর উপরে রেখায় চ-বিন্দু; চ-বিন্দুর উচ্চতা ৬০; স্থির হইল, ৬ই তারিখে ৬০ জন লোক মরিয়াছে।

তালিকার কাজ এইরূপ রেখা দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। রেখায় একটা সুবিধা আছে, তালিকায় তাহা নাই। রেখার উঠা-নামা দেখিলেই মৃত্যুর হারের উঠা-নামা বুঝিতে পারা যায়—রেখাটি যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, মৃত্যু-সংখ্যা কোন্ দিন কত বাড়িয়াছে, কোন্ দিন কত কমিয়াছে। ৪ঠা তারিখে মৃত্যুর হার একবারে ৭০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তার পরদিন একবারে সহসা ৩৫এ পতন। কলিকাতার যিনি বাসিন্দা, তাঁহাকে এইরূপ রেখা দেখাইলে, তিনি রেখার সহসা উর্দ্ধগতি দেখিলে আতঙ্কিত হইবেন; রেখার নিম্নে পতনে, তাঁহার আশ্বাসলাভ ঘটিবে।

আর একটা উদাহরণ লওয়া যাক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে কোন্ বৎসর কত ছাত্র বি,এ, পাশ করে, তাহার তালিকা বাহির হয়। সেই তালিকার বদলে ৩য় চিত্র দেওয়া গেল। চিত্রদেখিলেই বুঝা যাইবে, কোন্ বৎসরের পাশের ফল কিরূপ।
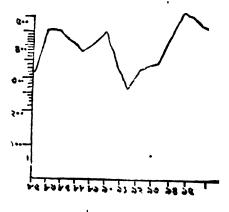
৩ চিত্র।

৮৫ হইতে ৯৫ পর্য্যন্ত ইংরাজী বৎসরের অঙ্ক; ৮৫ অর্থে ১৮৮৫, ৯৫ অর্থে ১৮৯৫। অন্য রেখায় ১০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত অঙ্ক উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা-নির্দ্দেশক। বক্র রেখাটি দেখিয়া কোন্ বার কত ছাত্র পাশ করিয়াছে, অক্লেশে বুঝা যায়। ৮৫সালে পাশের সংখ্যা প্রায় ৩১০; ৮৬ ও ৮৭ সালে প্রায় সমান, সাড়ে চারিশতর কাছাকাছি; ৮৮ সালে কিঞ্চিৎ পতন, প্রায় পৌনে চারিশতে; ৮৯ ও ৯০ দুই বৎসর ক্রমিক উত্থান, ৮৯এ ৪০৯; ৯০এ ৪৩৫; ৯১সালে একবারে অধঃপতন ৩০৩ সংখ্যায়। আবার ৯৫ পর্য্যন্ত ক্রমশ উত্থান। ৯৫সালে উন্নতির সীমা প্রায় পাঁচশত পর্য্যন্ত।

পূর্ব্বাহ্ন। অপরাহ্ন।
৪ চিত্র।
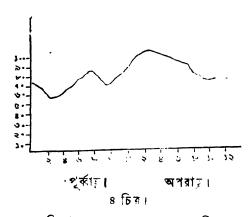
কলিকাতা-সহরের মৃত্যুসংখ্যার হিসাব ২৪ ঘণ্টা পর পর পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসর অন্তরে ছাত্রেরা বি, এ, পাশ করে। কিন্তু এমন বিবিধ ঘটনা আছে, যাহা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়; ক্ষণে ক্ষণে তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা জানা আবশ্যক হইয়া উঠে। যেমন বায়ুর উষ্ণতা। বায়ুর উষ্ণতা চব্বিশ ঘণ্টায় সমান থাকে না, উহা ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। বড় বড় মানমন্দিরে থার্ম্মমিটার দ্বারা এই অবিরাম পরিবর্ত্তনের হিসাব রাখা হয়। এবং সেই অবিরাম পরিবর্ত্তন রেখার উত্থান-পতন দ্বারা দেখান যাইতে পারে। ৪র্থ চিত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উষ্ণতা কখন্ কিরূপ ছিল, দেখান হইতেছে। রাত্রি ১২টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ন; বেলা ১২টা হইতে পররাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অপরাহ্ন। সময়নির্দ্দেশক রেখায় পূর্ব্বাহ্নের ও অপরাহ্নের ঘটিকাচিহ্ন এইরূপে অঙ্কিত আছে। উষ্ণতা-নির্দ্দেশক অপর রেখায় উষ্ণতা-অংশ থার্ম্মোমিটারের ডিগ্রি ১০০ পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে।

রেখার উত্থান-পতনে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কোন্ সময়ে বায়ুর উষ্ণতা কত ডিগ্রি ছিল। রাত্রি বারটার সময় উষ্ণতা প্রায় ৭৫ ডিগ্রি ছিল, ক্রমশ কমিয়া রাত্রি ৪টার সময় ৬০ ডিগ্রির নীচে নামিয়াছে। আবার ক্রমশ উঠিয়া বেলা ৯টার সময় ৮০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। হয় ত সেই সময় একটু মেঘ করিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়াছিল। উষ্ণতা সেইরূপ কোন একটা কারণে বেলা ১২টার সময় আবার কমিয়া যায়। আবার ৪টা বেলার সময় উষ্ণতার মাত্রা ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে। এইরূপ অহোরাত্রমধ্যে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি চিত্রস্থিত বক্র রেখাটির উত্থান-পতনের দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশিত হইতেছে।

যে কোন ঘটনার পরিবর্ত্তন বা হ্রাসবৃদ্ধি এইরূপ রেখা দ্বারা দেখান যাইতে পারে।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র এইরূপ কতিপয় রেখা দ্বারা ধাতুপদার্থের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রেখাগুলির অর্থ কি, বুঝাইবার জন্য এতখানি ভূমিকা আবশ্যক হইল। যাঁহারা এই প্রণালীর অর্থ জানেন, তাঁহাদের নিকট ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। যাঁহারা এই প্রণালীর অর্থ জানেন না, তাঁহাদের জন্য এই ভূমিকা আবশ্যক। নতুবা জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত রেখাগুলি তাঁহাদের নিকট অর্থশূন্য বোধ হইবে।

মাংসপেশীতে আঘাত করিলে, উহার সঙ্কোচ ঘটে। আঘাতের ফলে একটু খাটো হয়। কতটুকু খাটো হয়, মাপিয়া দেখা চলে। আবার কতটা আঘাতে কতটুকু খাটো হয়—তাহাও মাপিয়া দেখা চলে। এই সঙ্কোচন চিরস্থায়ী হয় না; আঘাতের

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচ ঘটে; আবার একটু পরে মাংসপেশী স্বভাবে ফিরিয়া আসে। একটা ধাক্কা, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচবৃদ্ধি, আবার কিছুক্ষণ পরে স্বভাবপ্রাপ্তি। শরীর-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহারা এই সকল ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণে দিন কাটান। একটা ধাক্কায় কতক্ষণে কতটুকু সঙ্কোচ ঘটিল, আবার কতক্ষণ পরে স্বভাব-প্রাপ্তি হইল, ঘড়ি ধরিয়া ও মাপকাঠি লইয়া মাপিয়া থাকেন; এবং যাহা দেখেন, তাহা রেখা টানিয়া অন্যকে দেখান।

একখণ্ড মাংসপেশীতে একটা ধাক্কা দিলে, কতক্ষণে কতটুকু সঙ্কোচ ঘটে ও কতক্ষণে আবার স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা নিম্নের ৫ ক চিত্রে দেখান গেল। এই চিত্র Brodie's Experimental Physiology পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। এই চিত্রে ও পরবর্ত্তী চিত্রসকলে লম্বরেখা দুইটি আর অনাবশ্যক বোধে দেওয়া যায় নাই। পাঠকগণ মনে মনে কল্পনা করিয়া লইবেন, সেই রেখাদ্বয় যেন চিত্রে অদৃশ্য-ভাবে রহিয়াছে। একটি রেখা ভূমিগত— উহা কালনির্দ্দেশক। অপরটি উহার উপর লম্বরূপে দণ্ডায়মান—উহা সঙ্কোচের মাত্রা-নির্দ্দেশক।

৫ ক চিত্র।

এ চিত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ধাক্কা পাইয়া সঙ্কোচ ক্রমে বাড়িতেছে; পূর্ণমাত্রায় উঠার পর আবার সঙ্কোচ কমিয়া গিয়াছে। মাংস-পেশী ক্ষণিকের জন্য বিকৃতিলাভের পর আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, তাড়িত-তরঙ্গের ধাক্কা বা তদনুরূপ একটা ধাক্কা পাইলে, ধাতুপদার্থ বিকৃতিলাভ করে; উহার তাড়িত-পরিচালন শক্তি সহসা বাড়িয়া যায়। একটা ধাক্কায় ক্ষণেকের মত বাড়ে মাত্র; আবার কিয়ৎক্ষণ পরে উহা স্বভাবে ফিরিয়া আসে। এই পরিচালন-শক্তির বৃদ্ধি ও হ্রাসও রেখার উত্থান-পতন দ্বারা দেখান যাইতে পারে। জগদীশচন্দ্র ও তাহা দেখাইয়াছেন। ৫ খ চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।

৫ খ চিত্র।

মাংসপেশীর অবস্থার উত্থান-পতন, আর ধাতুপদার্থের অবস্থার উত্থান-পতন, উভয়ের সাদৃশ্য কত অদ্ভুত, তাহা ৫ (ক) ও ৫ (খ), দুই চিত্র মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পরবর্ত্তী চিত্রগুলির বোধ করি বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক হইবে না। পাঠকমহাশয় আপনি বুঝিয়া লইবেন। কয়েক জোড়া চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে প্রথম চিত্র ক-চিহ্নিত ও দ্বিতীয় চিত্র খ-চিহ্নিত করা গেল। ক-চিহ্নিত চিত্রগুলি শরীর-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে গৃহীত; এই সকল চিত্রের কোনটায় মাংসপেশীর, কোনটায় বা স্নায়ুসূত্রের, বিকারপ্রাপ্তি

দেখান হইয়াছে। খ-চিহ্নিত চিত্রগুলি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের অঙ্কিত। ধাতুচূর্ণে, ধাতুর তারে, ধাক্কা দিয়া, মোচড় দিয়া, তাড়িততরঙ্গের আঘাত দিয়া, উহাতে বিকার উৎপাদন করিলে, সেই বিকারের কিরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, কিরূপ উত্থান-পতন ঘটে, তাহা এই সকল চিত্রে দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক জোড়ার ক-এর সহিত খ-এর সাদৃশ্য কত বিস্ময়কর! মাংসপেশী বা স্নায়ুসূত্রের মত জীবন্ত দ্রব্য যে নানাবিধ বিকার লাভ করে, তাহা সকলেই জানিত; কিন্তু নির্জীব ধাতুচূর্ণ বা ধাতুতন্ত্রীতে যে এমন বিকার উৎপন্ন হয়, তাহা কেহ জানিত না। এবং মাংসপেশীর বা স্নায়ুসূত্রের বিকারলাভ ও স্বভাবপ্রাপ্তির সহিত নির্জীব ধাতুপদার্থের বিকারলাভের ও স্বভাবপ্রাপ্তির এত সাদৃশ্য আছে, তাহাই বা কে জানিত? সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্য এই, যে দ্রব্য পেশীর পক্ষে বা স্নায়ুর পক্ষে মাদক বা উত্তেজক, তাহাই আবার ধাতুপদার্থের পক্ষেও মাদক ও উত্তেজক; যাহা সজীব পদার্থের পক্ষে অবসাদক, নির্জীবের পক্ষেও তাহাই অবসাদক।

এখন আমরা এক এক জোড়া চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব ও উহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিব। ক চিত্রের সহিত খ চিত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া, সজীবের ও নির্জীবের সাদৃশ্য পাঠক বুঝিয়া লইবেন।

৬ক চিত্র।

৬ক।—এক খণ্ড মাংসপেশীতে পুনঃপুন ধাক্কা পড়িলে উহার সঙ্কোচ কিরূপে বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, দেখান হইতেছে।

৬খ চিত্র।

৬খ।—ধাতুদ্রব্যে পুনঃপুন ধাক্কা পড়িলে উহার তাড়িত-পরিচালন-শক্তি কিরূপ বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, দেখান হইতেছে।

৭ক চিত্র।

৭ক।—পুনঃপুন আঘাতে মাংসপেশী যেন ক্রমশ ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে। প্রথম প্রথম আঘাতে যতটা সঙ্কোচ হইতেছিল, পরের আঘাতে আর ততটা সঙ্কোচ ঘটে না। সঙ্কোচের মাত্রা পর পর আঘাতে কমিয়া আসিতেছে। রেখার উত্থান-পতনের মাত্রা ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে; তাহার অর্থ পুনঃপুন উত্তেজনায় মাংসপেশীরা ক্রমশ যেন শ্রান্ত ও অবসন্ন হইতেছে।
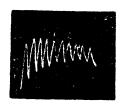
৭খ চিত্র।

৭ খ।—পুনঃপুন উত্তেজনা পাইয়া ধাতুপদার্থও ক্রমশ শ্রান্ত ও অবসন্ন হইতেছে।

৮ ক চিত্র।   ৯ ক চিত্র।

৮ খ চিত্র।   ৯ খ চিত্র।

৮ ক।—পুনঃপুন উত্তেজনায় পেশীর ক্রমশ অবসাদপ্রাপ্তি—৭ ক চিত্রের অনুরূপ।

৮ খ।—পুনঃপুন উত্তেজনায় ধাতু-দ্রব্যের ক্রমশ অবসাদপ্রাপ্তি—৭ খ চিত্রের অনুরূপ।

৯ ক।—প্রথমেই প্রবল আঘাত পাইয়া মাংসপেশী যেন একই আঘাতে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছে। তার পরের আঘাতে যেন অতি ক্ষীণভাবে সাড়া দিতেছে। আর পূর্ব্বের মত প্রতিক্রিয়ার যেন ক্ষমতা নাই। তার পর আঘাত থামিলে, ক্রমশ স্বভাব-প্রাপ্তি ও অবসাদলোপ।

৯ খ।—ধাতুদ্রব্যের অবস্থাও তদনুরূপ—প্রবল আঘাতে ধাতুপদার্থও যেন কাতর ও অবসন্ন; পরের আঘাতগুলিতে তাহার আর পূর্ব্বের মত সতেজে প্রতিক্রিয়া উৎ-পাদনের ক্ষমতা নাই।

১০ ক চিত্র।

১০ ক।—প্রথম আঘাত এত প্রবল যে, সেই আঘাতে মাংসপেশী একবারে সম্পূর্ণ-ভাবে অবসন্ন; এবার অবসাদের মাত্রা পূর্ণ; আর আঘাতে সাড়া দেয় না। সঙ্কোচ-নির্দ্দেশক রেখাটি চরম উন্নতি লাভ করিয়া একবারে সোজা চলিয়াছে; আঘাতসত্ত্বেও, উত্তেজনাসত্ত্বেও, কিছুকাল উহার আর উত্থান-পতন নাই। মাংসপেশীর এই পূর্ণ অবসাদের অবস্থায় ধনুষ্টঙ্কার ঘটে। ধনুষ্টঙ্কারে মাংসপেশীর সঙ্কোচনমাত্রা চরম-সীমায় উপস্থিত হয়; তখন উহা এরূপ কাঠিন্য ও জড়তা লাভ করে যে, আর কোনরূপে কোন উত্তেজনায় উহাকে কোমল করা যায় না; উহার জড়তার অপনোদন হয় না। আবার কিয়ৎকাল বিশ্রামলাভের পর এই শ্রান্তি দূর হয়; তখন উহা স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ইহাকে রোগমুক্তি বলা যাইতে পারে। উত্তাপপ্রয়োগ, ঔষধপ্রয়োগ প্রভৃতি রোগমুক্তির অনুকূল।

১০ খ চিত্র।

১০ খ।—ধাতুদ্রব্যের পূর্ণ অবসাদ। প্রবল আঘাতে ধাতুদ্রব্যেরও আর সাড়া

দিবার ক্ষমতা থাকে না। উহার পরিচালন-শক্তি একবারে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইয়াছে। এখন নূতন উত্তেজনায় সে শক্তির আর হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তাড়িতোর্ম্মি-প্রদর্শনের জন্য নির্ম্মিত Coherer যন্ত্রে ধাতু-দ্রব্যের এই অবসাদপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। বিশ্রামলাভের পর, অথবা উত্তাপ-প্রয়োগে এই অবসাদের দশা আবার দূর হয়।

১১ ক চিত্র।

১১ ক। উত্তাপে অবসাদ নষ্ট করে, উত্তাপ রোগমুক্তির অনুকূল। ১১ ক চিত্রের অন্তর্গত উভয় রেখায় ইহা দেখান হইয়াছে। ৩০ ডিগ্রি উষ্ণতায় মাংসপেশী যেন সতেজে সাড়া দিতেছে; উত্তেজনা পাইবামাত্র অমনি সঙ্কুচিত হইতেছে; আবার ক্ষণমাত্রেই স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। আর ৬ ডিগ্রি মাত্র গরমে মাংসপেশী যেন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ; উত্তেজনা তেমনই; কিন্তু উহার সঙ্কোচ-মাত্রা কত কম। ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ লাভ করিয়া আবার ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইতেছে।

উত্তাপের এই অবসাদ-নাশক-শক্তি সকলেই জানেন। দারুণ শীতে শরীর অবসন্ন হয়; উত্তাপে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। পরিশ্রমে মাংসপেশী শ্রান্ত ও অবসন্ন হইলে, উষ্ণতাপ্রয়োগে উহার অবসাদ দূর হয়। মাংসপেশীর স্ফূর্ত্তিলাভের জন্য ডাক্তারদের ফোমেণ্টেশন্-প্রয়োগের ব্যবস্থা চিরপ্রসিদ্ধ।

১১ খ চিত্র।

১১ খ।—এখানেও দুইটি রেখা—একটিতে ধাতুদ্রব্য গরম—২১০ ডিগ্রি—অন্যটিতে ধাতুদ্রব্য ঠাণ্ডা—২ ডিগ্রি মাত্র। উভয় রেখায় কত তফাত। গরমে কত তেজ; ঠাণ্ডায় কত অবসাদ।

১১ খ খ চিত্র।
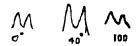
১১ খ খ।—এই চিত্রের তিনটি রেখা ধাতুদ্রব্যের উষ্ণতার মাত্রাভেদে ত্রিবিধ অবস্থা দেখাইতেছে। প্রথম রেখায় ০ ডিগ্রি, দ্বিতীয়টিতে ৪০ ডিগ্রি, ও তৃতীয় রেখায় ১০০ ডিগ্রি গরমে ধাতুর অবস্থা কিরূপ থাকে, বুঝা যাইতেছে। ০ ডিগ্রির অপেক্ষা ৪০ ডিগ্রিতে উত্তেজনা যেন কিছু বাড়িয়াছে; আবার ১০০ ডিগ্রিতে যেন একটু অবসন্ন হইয়াছে। অল্প উত্তাপে উত্তেজনা বাড়ে; কিন্তু উত্তাপের আতিশয্য আবার উত্তেজনার বদলে অবসাদ উৎপন্ন করে।

১২ ক।—এই চিত্র দেওয়া গেল না। আমোনিয়া অতি পরিচিত উগ্রগন্ধি বাষ্পীয় পদার্থ। আমোনিয়া-প্রয়োগে শরীরের কিরূপ অবসাদ-নাশ ও উত্তেজনা-বৃদ্ধি হয়, তাহা সকলেই জানেন।

১২ খ চিত্র।

১২ খ।—এই চিত্রে ধাতুদ্রব্যের উপর আমোনিয়ার ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। বামের রেখার উত্থান-পতনে আমোনিয়া-প্রয়োগের পূর্ব্বতন অবস্থা ও ডাহিনের রেখার উত্থান-পতনে আমোনিয়া প্রয়োগের পরবর্ত্তী অবস্থা দেখান হইতেছে। নির্জ্জীব ধাতুপদার্থ আমোনিয়া-প্রয়োগে যে এমন উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা কে জানিত!
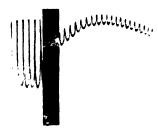
১৩ ক চিত্র।

১৩ ক।—বিষপ্রয়োগে স্নায়ুসূত্রের অবসাদপ্রাপ্তি এই চিত্রে দেখান হইতেছে। যাহাতে অস্বাভাবিক অবসাদ উৎপাদন করে, তাহাই বিষ। ক্লোরোফর্ম্মের অবসাদক-ক্রিয়া সকলেই জানেন। অতিমাত্রায় প্রয়োগে স্নায়ুগণ অবসন্ন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। অধিক মাত্রায় জীবনহানি পর্য্যন্ত ঘটে। এই চিত্রের বামাংশে ক্লোরোফর্ম্ম-প্রয়োগের পূর্ব্বে স্নায়ুসূত্রের স্বাভাবিক উত্তেজিত অবস্থা ও দক্ষিণের অংশে ক্লোরোফর্ম্ম-প্রয়োগের পরে অবসন্ন অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্নায়ুসূত্রে আঘাত করিলে উহাতে তাড়িত-প্রবাহ জন্মে; দ্রুতপ্রবাহে স্নায়ুর স্বাভাবিক অবস্থার ও ক্ষীণ প্রবাহে উহার অবসন্ন অবস্থার সূচনা করে। ক্লোরোফর্ম্ম-প্রয়োগে স্নায়ু ক্রমে অবসন্ন হয়; উহার আর দ্রুত-প্রবাহ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। চিত্রে তাহাই দেখান হইতেছে।

১৩ খ চিত্র।

১৩ খ।—ধাতুপদার্থে বিষের ক্রিয়া। বামাংশে বিষপ্রয়োগের পূর্ব্বের ও দক্ষিণের অংশে বিষপ্রয়োগের পরের অবস্থা দেখান হইতেছে।
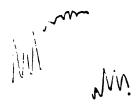
১৪ খ চিত্র।

১৪ খ।—এই চিত্রে তিনটি রেখা ধাতুর ত্রিবিধ অবস্থার জ্ঞাপক। প্রথম রেখায় বিষপ্রয়োগের পূর্ব্বতন অবস্থা—ধাতুপদার্থ এখন স্বভাবস্থ; উত্তেজনা পাইলেই সতেজে সাড়া দেয়। দ্বিতীয় রেখায় বিষপ্রয়োগের পরবর্ত্তি-দশা—নির্জ্জীব ধাতু এখন সজীবের মত অবসন্ন—উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া ক্ষীণ।

তৃতীয় রেখা ঔষধপ্রয়োগের পর—ঔষধ-প্রয়োগে অবসাদ দূর হইয়াছে; ধাতু আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তেজনায় সাড়া দিতেছে। ১৪ ক চিত্র দেওয়া আবশ্যক হয় নাই।
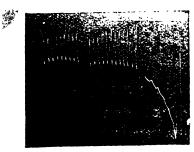
১৫ খ চিত্র।

১৫ খ।—এখানেও তিনটি রেখা। প্রথম রেখা ধাতুদ্রব্যের স্বাভাবিক অবস্থার জ্ঞাপক। অল্পমাত্রায় উত্তেজক দ্রব্যের প্রয়োগে ধাতু-দ্রব্য কিরূপে উত্তেজিত হয়, তাহাও দ্বিতীয় রেখায় বুঝা যাইতেছে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগে ঔষধও কিরূপে বিষবৎ হয়, উত্তেজনা কিরূপে অবসাদে পরিণত হয়, তাহা দেখা যাইতেছে। আফিম, বেলাডোনা, ইপিকা-কুয়ানা প্রভৃতি দ্রব্য কিরূপে মাত্রাভেদে স্নায়ুযন্ত্রের উপর, কখনও ঔষধের, কখনও বিষের, কাজ করে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; স্বতন্ত্র চিত্রে তাহা দেখান গেল না।
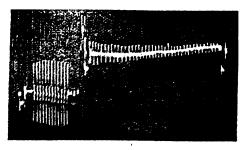
১৬ক চিত্র।

১৬ ক।—স্নায়ুযন্ত্রের উপর আফিমের ক্রিয়া দেখান হইয়াছে। বামাংশে প্রয়োগের পূর্ব্বতন, দক্ষিণাংশে পরবর্ত্তী ক্রিয়া দেখান হইয়াছে।
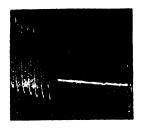
১৬ খ চিত্র।

১৬ খ।—ধাতুদ্রব্যে আফিমের তদনুরূপ ক্রিয়া।

জড়দেহে ও জীবদেহে যে কতটা সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা উপরি উদ্ধৃত চিত্র-গুলি দেখিলেই কতকটা বুঝা যাইবে। এই সাদৃশ্যের বিষয় এতদিন কেহ জানিত না। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র এই সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রে একটা নূতন রাস্তা খুলিয়া দিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয়-মাত্র নাই। এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কোন্ নূতন দেশে উপস্থিত হইবেন, তাহা এখন কেহই বলিতে পারে না। জীবদেহের মত জড়দেহ বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়, জীবদেহের ন্যায় জড়দেহ বিষপ্রয়োগে অবসন্ন হয়, আবার ঔষধে তাহার অবসাদ নষ্ট হয়, এই সকল নূতন তত্ত্ব অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের পূর্ব্বে কোন বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনায় আসে নাই। জড়েরও জীবন আছে কি না, এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। অনেক বড় বড় পণ্ডিত

মীমাংসা অসাধ্য বলিয়া একবারে নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন। কোন্ পথে চলিলে এই সমস্যার পূরণ হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশেও এ পর্য্যন্ত কেহ সাহসী হয়েন নাই। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়াপরম্পরা সেই সমস্যার পূরণে কতদূর সফল হইবে, তাহার নির্দ্দেশে আমরা অসমর্থ। কিন্তু তিনি যে নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকাহস্তে অজ্ঞানের তমোময়-রহস্যাবৃত-প্রদেশাভিমুখে একাকী অগ্রণী হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব বিস্ময় উৎপাদন করিবে, সন্দেহ নাই। তাঁহার মাতৃভূমির বিষাদক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে তিনি আনন্দের রেখাপাতে সমর্থ হইয়াছেন ;—তাঁহার জননীর আশীর্বচন তাঁহার জয়যাত্রায় রক্ষাকবচ হউক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নির্ঝরিণী।

(Victor Hugo হইতে)

নির্ঝরিণী শৈল হতে ঝরে
—বিন্দু বিন্দু ভীষণ সাগরে।
নাবিকের মহাভীতি সিন্ধু বলে, "অল্পমতি!
আমা-কাছে কি চাহিস্ ওরে!

আমি যে প্রলয়-সম, মহাত্রাস মূর্ত্তি মম,
আকাশ আরম্ভে' যাহা, আমি করি শেষ।
তোরে কিবা প্রয়োজন, তুই অতি ক্ষুদ্রজন,
অসীম অনন্ত আমি অপার অশেষ॥"

নির্ঝরিণী বলে ধীরে, লবণাক্ত জলধিরে,
"তোমার যা নাহি ওগো সাগর অতল!
বিনা রব-আস্ফালন, করি তাহা বিতরণ,
পান করিবার মত একবিন্দু জল॥"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

নির্ম্মলা। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী প্রণীত। মূল্য ।৴০ ছয় আনা।

সচরাচর বাঙলা গল্পের বহি যেমন হয়— অর্থাৎ, কিছুই হয় না—তদপেক্ষা এখানি ভাল। কোন প্রকারে এখানি পড়া যায়। ঘটনায় বৈচিত্র্য নাই বা থাকিল, বাহুল্য যথেষ্ট আছে। খানিকটা অনন্যসাধারণত্বও আছে। দেবেশচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল, মাতাল, বেশ্যাসক্ত—সেই দুঃখে তাহার স্ত্রী আত্ম-ঘাতিনী হইয়াছে। সুতরাং শূদ্র দেবেশচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়াছে, তাহার বক্তৃতা শুনিয়া "গীতার অভিনব ধর্ম্মে সমস্ত দুর্গাপুর মাতিয়া উঠিয়াছে," এবং সে উপনিষদের গাথা চেঁচাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাছে কেহ মনে করে যে, গ্রন্থকার গীতা ও উপনিষদের ফিরিওয়ালা মাত্র, তাই বক্সী মহাশয় ফুটনোটে লিখিতে ভুলেন নাই যে, এই স্তোত্র "কটোপনিষৎ, পঞ্চমীবল্লী" হইতে সমাহৃত। আমরা যার-পর-নাই আপ্যায়িত হইলাম। উপন্যাসখানির ঘটনাবলীর সময়, যখন প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স—বর্ত্তমান সম্রাট্ এ দেশে আঁসিয়াছিলেন। সে ত আজ পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কালের কথা। গ্রন্থপ্রণয়নের বেগে গ্রন্থকার ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তখনও গীতা, উপনিষৎ ও নিষ্কাম ধর্ম্মের শ্রাদ্ধ আজকাল্‌কার মতন এতদূর গড়ায় নাই।

মৌখিক অঙ্ক। শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীআবিদ আলি খাঁ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রাইমারি স্কুল সমূহের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ লিখিত ও প্রকাশিত। যাহাদের জন্য লিখিত, তাহাদের কাজে লাগিবে বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু গ্রন্থকার আবিদ-আলি-সাহেবকে একটা কথা জিজ্ঞাসা আছে। এই পুস্তক তিনি কেন হরিদ্রাবর্ণের—তুলোট—কাগজে মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে কি পাঠসৌকর্য্য সাধিত হয়? আমাদের ত তাহা বোধ হয় না।

একটা মজার কথার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। গ্রন্থকার আবিদ-আলি-সাহেব একটি প্রশ্ন দিয়াছেন। প্রশ্নটি এই:—

"একটি বৃক্ষে ১০০ পায়রা বসিয়াছিল; একজন শিকারী গুলি করায় ৩টি মারা পড়ে। স্থির কর, ঐ বৃক্ষে আর কত পায়রা অবশিষ্ট রহিল?"

প্রশ্নটির উত্তর বালক কেন, বালকের পিতামহও বোধ করি দিতে পারেন না। ভাগ্যে আবিদ আলি-সাহেব অনুগ্রহ করিয়া উত্তরটা বলিয়া দিয়াছেন, নতুবা আমরাও মুখে মুখে ইহার উত্তর দিতে পারিতাম না। উত্তরটি এই—একটিও পাখী গাছে থাকিবে না। কেন না, অবশিষ্ট সবগুলিই ভয়ে উড়িয়া পলাইবে। ইহা কি অঙ্কের প্রশ্ন, না বরযাত্র ঠকাইবার প্রশ্ন?

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। ৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

—:o:—

সূচী।

৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিনযন্ত্রে,
শ্রীবগলাচরণ বড়াল দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

বঙ্গদর্শন।

মুক্তামালা।

ক্রোধ।

বিলাসপুরের রাজা প্রতাপসিংহের মহিষী চন্দ্রাবতী ক্রোধাগারে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। আগারের আয়তন ক্ষুদ্র, গবাক্ষ নাই, হর্ম্ম্যতলে কোনরূপ শয্যা বা আসন নাই। গৃহের প্রাচীরে, লোহিতাক্ষরে "মানাগার" এই শব্দ খোদিত রহিয়াছে। ক্রোধ লোহিতমূর্ত্তি, এইজন্য লোহিত অক্ষর। রাণী ভূতলে বসিয়া আছেন। কেশ অবেণীবদ্ধ, চন্দ্রাবতী বেণী মুক্ত করিয়া, কেশ রুক্ষ করিয়াছেন; কপালে করাঘাতের চিহ্ন, রোদনে চক্ষু ফুলিয়াছে; বস্ত্র মলিন, জীর্ণ; অঙ্গের অলঙ্কার গৃহে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দারুণ ক্রোধে রাণী মানাগারে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন।

ক্রোধের ইতিহাস বড় সহজ নয়। আগ্রার দুর্গস্থিত আকবরবাদশাহের মহিষী যোধাবাইর মহল হইতে এক হিন্দু দাসী কর্ম্ম ছাড়িয়া আসিয়া প্রতাপসিংহের অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াছিল। চন্দ্রাবতী যখন শুনিলেন যে, মীরা যোধাবাইর মহলে দাসী ছিল, তখন তাহাকে নিযুক্ত করিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত সুখগর্ব্ব অনুভব করিলেন। তাহার সহিত দিবারাত্র যোধাবাইর ও বাদশাহী ঐশ্বর্য্যের গল্প করা তাঁহার প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল। একদিন রাণী একছড়া মুক্তার মালা বাহির করিয়া গলায় দিয়াছিলেন। মীরা দেখিয়া কহিল, "রাণী-সাহেব, মুক্তার মালা যদি পরিতে হয় ত যোধাবাইর মত একছড়া ক্রয় কর।"

রাণী সকৌতুকে ও সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরকম মুক্তা ?"

দাসী কহিল, "সে মালায় কেবল এক-সারি মুক্তা"—রাণীর গলায় একাদশ সারির মালা ছিল—"কিন্তু তেমন মুক্তা কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই। যেমন বড়, তেমনি উজ্জ্বল, ভিন্ন আলোকে ভিন্নরকম রং, দেখিয়া আশ মেটে না। তুমি যোধাবাইর অপেক্ষা সুন্দরী, তোমাকে সেইরকম একছড়া মালা উত্তম সাজিবে।"

সেই অবধি চন্দ্রাবতী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মুক্তামালার ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। পতি প্রতাপসিংহকে ধরিলেন, যোধাবাইর তুল্য একছড়া মুক্তার মালা তাঁহাকে আনাইয়া দিতে হইবে।

প্রতাপসিংহ কহিলেন, "তুমি কি যোধাবাইর সমকক্ষ? আগ্রা-দিল্লীর বাদশাহতে আর আমাতে? তোমার এ অসম্ভব সাধ কোথা হইতে হইল?"

চন্দ্রাবতী কহিলেন, "আমি কি সকল বিষয়ে যোধাবাইর তুল্য ভাগ্য কামনা করিতেছি? তাহার মত কি একছড়া মুক্তার মালা পরিতে পারি না?"

প্রতাপসিংহ একটু রাগিয়া কহিলেন, "সে মুক্তার মালা কেমন করিয়া হইয়াছে জান? বাদশাহের তোষাখানায় সেরকম গুটিকয়েক মুক্তা ছিল। তাহার পর সমস্ত ভারতবর্ষ অন্বেষণ করিয়া সে মালা হইয়াছে। কোন বণিকের কাছে একটি, কোন রাজার গৃহে একটি, এই রকম করিয়া একটি একটি করিয়া মুক্তা খুঁজিয়া মালা প্রস্তুত হইয়াছে। উহা শুধু অমূল্য নহে, সম্রাট্ ভিন্ন আর কাহারও শক্তি নাই যে, উহা সংগ্রহ করে। আমি তেমন মালা কোথায় পাইব?"

চন্দ্রাবতী কহিলেন, "অত কথায় কাজ কি, বল না কেন, আমাকে কিনিয়া দিবে না!"

পতিপত্নী উভয়েরই নবীন যৌবন, যেমন দুইজনে প্রীতি, সেইরূপ সহসা রাগারাগি হইবার সম্ভাবনা। এ পর্য্যন্ত কিন্তু দাম্পত্যকলহের কখন বাড়াবাড়ি হয় নাই। ঈশান কোণে কদাচ এক-আধ-বার বিদ্যুৎস্ফুরণ, কিন্তু তাহা নিমেষের মধ্যে মিলাইয়া যাইত। প্রেমাকাশ এ পর্য্যন্ত প্রায় নির্ম্মল ছিল। সহসা একেবারে সেই আকাশ দীর্ণ করিয়া বিদ্যুতের দীপ্তি, তৎপরেই ঘোর মেঘগর্জ্জন!

প্রতাপসিংহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যাহা দেখিবে, তাহাতেই সাধ! তাহা হইলে ত দড়ী দেখিলে গলায় দিতে সাধ হইবে! যদি যোধাবাইর মত মালা পরিতে সাধ ত তাহার মত কপাল করিলে না কেন, তাহার মত যবনভর্ত্তার কামনা করিলে না কেন?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রাজা রাগিয়া সদরবাটীতে চলিয়া গেলেন।

রাণীও গিয়া মানাগারে প্রবেশ করিলেন।

শান্তি।

স্নানাহারের সময় যখন অতীত হইয়া গেল, তখন দাসী ও পরিজনেরা আসিয়া রাণীকে অনেক ডাকাডাকি করিল। রাণী তাহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, দ্বার খুলিলেন না। তাহারাও অধিক পীড়াপীড়ি করিল না, কারণ ক্রোধাগারের এই সনাতন-প্রথা যে, যাহার জন্য তাহাতে প্রবেশ, তাহারই সাধ্যসাধনায়, অনুনয়-বিনয়ে, আবার সে দ্বার মুক্ত হইবে। রাজার নিকট সংবাদ গেল, রাণী মানাগারে প্রবেশ করিয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন।

এ সম্ভাবনা রাজার মনে একবারও উঠে নাই। তিনি রাগিয়া কতকগুলা অত্যন্ত অযথা কথা বলিয়াছিলেন; বাহিরে আসিয়া রাগ কতক পড়িয়া গিয়াছিল, মনে করিতেছিলেন, এবার অন্দরমহলে গিয়া রাণীকে বুঝাইয়া বলিবেন; যেন তিনি মুক্তামালার কথা ভুলিয়া যান। রাণী যদি বড় রাগ করেন ত কোনমতে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে, নিতান্তপক্ষে তাঁহাকে

আর কোন বহুমূল্য অলঙ্কার ক্রয় করিয়া দিতে হইবে। ক্রোধাগারের কথাটা তাঁহার স্মরণই ছিল না!

থাকিবার কথাও নয়। রাণী চন্দ্রাবতী বিবাহের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কখন এ ঘরে প্রবেশ করেন নাই পূর্ব্বকালে কবে কোন্ রাণী মানাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কেহ তাহার সন্ধান রাখিত না। পূর্ব্ব-পুরুষেরা কতকি রাখিয়া গিয়াছিলেন, কত সামগ্রী, কত গৃহের ব্যবহার, কালে উঠিয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের কালে এমনি কঠিন নিয়ম ছিল যে, গৃহবিপর্য্যয় ঘটিবার সাধ্য ছিল না। "শয়নাগার," "বিশ্রামাগার," "ভোজনাগার", "ক্রীড়াগার" প্রভৃতি চিহ্নিত গৃহ ছিল। "মানাগার" আর বড় একটা কাহারও মনে ছিল না। বিলাসপুর পার্ব্বত্য-প্রদেশ, পূর্ব্বে রাজগৃহে নরবলির প্রথা ছিল। সে কত কালের কথা, তাহা কাহারও স্মরণ নাই। প্রাসাদ হইতে কিছু দূরে "বলিগৃহ" ছিল, এখন ভাঙিয়া ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে। শয়নগৃহে শয়ন করিবার সময় ও ভোজনগৃহে ভোজন করিবার সময় রাজা প্রতাপসিংহের মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইত না; কিন্তু মানাগারে রাণী প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া ভাবিলেন, 'পূর্ব্বপুরুষেরা এ গৃহের সৃষ্টি করিলেন কেন?'

পূর্ব্বপুরুষেরা তেমন কিছু অবিবেচনার কাজ করেন নাই, কারণ শয়ন-ভোজন যেমন নিত্যপ্রয়োজন, অভিমান সেরূপ না হইলেও অবশ্যম্ভাবী। স্বতন্ত্র স্থান না থাকিলে শয়ন-ভোজন-রন্ধন-কথোপকথন প্রভৃতির স্থান মানে অভিমানে ভাসিয়া যাইত। সেইজন্য পূর্ব্বপুরুষেরা, বুদ্ধি করিয়া, আহার-নিদ্রার মত ক্রোধ-অভিমানেরও একটা স্বতন্ত্র স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে সেই গৃহে রাণীপরম্পরার ক্রোধাভিমান সঞ্চিত, পুঞ্জীকৃত হইতেছিল।

সাত পাঁচ ভাবিয়া অবশেষে রাজা পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সনাতন-নিয়মানুসারে ক্রোধা-গারের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দাসী প্রভৃতি সকলে সরিয়া গেল, কিন্তু অন্তরাল হইতে শ্রবণলোলুপ বহুতর রমণী উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

লজ্জায়, বিরক্তিতে, রাজার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দ্বারে অল্প অল্প করাঘাত করিলেন। অস্ফুট, কম্পিত স্বরে কহিলেন, "রাণী, দ্বার মুক্ত কর!"

সে দ্বারের পশ্চাতে যে অভিমানের অর্গল ছিল, তাহা করাঘাতে কেন, বজ্রা-ঘাতেও খুলিবার নহে। কোন উত্তর না পাইয়া রাজা আর করাঘাত করিলেন না, কেবল কণ্ঠবলের উপর নির্ভর করিলেন। সে বলও কোমলতায়, চীৎকারে নহে।

রাজা বলিলেন, "রাণী, বাড়ীসুদ্ধ লোক কি মনে করিবে! আমার অপরাধ হইয়াছে, তুমি দুয়ার খোল, যাহা চাও, আনিয়া দিব।"

রাণী ভিতর হইতে বলিলেন, "অধিক-ক্ষণ কেহ কিছু মনে করিবে না। রাত্রি হইলেই সব চুকিয়া যাইবে।"

"কি চুকিয়া যাইবে?

"দড়ী দেখিলে যে সাধ হয়, তাহাই মিটাইব! মুক্তার মালা গলায় দিবার সাধ

না মিটিতে পারে, কিন্তু গলায় দড়ী দিবার সাধ ত মিটিবে! সঙ্গে দড়ী আনিয়াছি। রাত্রি হইলেই তোমার সাধ, আমার সাধ, মিটাইব।”

দুর্ব্বাক্য যে প্রয়োগ করে, অনেক সময় সে বাক্য তাহার নিকট ফিরিয়া আসে। রাজা আপনার বাক্য স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইলেন, কহিলেন, “আমি রাগের মাথায় কি বলিয়াছি, সে দোষ লইও না। আমার শতবার অপরাধ হইয়াছে, আমায় ক্ষমা কর।”

“তোমার আর অপরাধ কি? আমি একছড়া মুক্তার মালা চাহিয়াছি, আমারই অপরাধ হইয়াছে। কিন্তু অপরাধের ত প্রায়শ্চিত্ত আছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব, স্থির করিয়াছি।

রাণীর স্বর বাষ্পরুদ্ধ, শুনিয়া রাজার অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। কাতর-স্বরে অনুনয় করিয়া কহিলেন, “আমি যেমন করিয়া পারি, তোমায় মালা আনিয়া দিব। এখন আমার কথা রাখ, দ্বার মুক্ত কর।”

রাণী অর্গল মুক্ত করিলেন, কিন্তু দ্বার খুলিলেন না। দ্বার অল্প খুলিয়া বাহু দ্বারা ধারণ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি শুধু মনরাখা কথা বলিতেছ?”

রাজা কহিলেন, “আমায় কি তোমার এতই অবিশ্বাস? আমি ত বলিয়াছি, যেখান হইতে হউক, যেমন করিয়া পারি, তোমায় মালা আনিয়া দিব।” ঈষন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়া রাজা রাণীর হস্তধারণ করিলেন, কিন্তু বলপূর্ব্বক দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিলেন না।

আরও দুই চারি কথার পর দ্বার মুক্ত হইল। রাজা ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া রাণীর অলঙ্কার তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর রাণী কেশ বাঁধিয়া সংযতবসনে বাহিরে গমন করিলেন।

আশা।

মুক্তার মালা খুঁজিতে রাজকার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। রাজা মন্ত্রীদের আদেশ করেন, মন্ত্রীরা অপর লোককে বলেন, এই রকমে চারিদিকে কথা ছড়াইয়া পড়িল। দেশদেশান্তর হইতে জহুরী আসিতে লাগিল, দেশদেশান্তরে মুক্তার সন্ধানে লোক ছুটিল। মুক্তার মালা রাণীর প্রয়োজন, কিন্তু দেশের লোক পর্য্যন্ত সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, দোকানে, হাটে, কেবল সেই এক কথা। অমুক স্থান হইতে বিখ্যাত জহুরী আসিয়াছে, সে এমন মুক্তা আনিয়াছে যে, তাহার একটি সাত রাজার ধন, তথাপি না কি রাণীর মনোনীত হয় নাই। কেহ হাসিয়া বলে, “আমাদের রাণী যোধাবাই-বেগমের তুল্য হইয়া উঠিলেন, দেখিতেছ কি! অনেককাল রাজ্যে এমন তোলপাড় হয় নাই।”

যতরকম মুক্তা বা মুক্তার মালা আসে, রাণী গোপনে মীরাকে দেখান। সে মাথা নাড়িয়া, নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলে, “সে মুক্তা আর এ মুক্তা! রাণীজি, যদি সামান্য জহুরীর কাছে তেমন মুক্তা মিলিত, তাহা হইলে যোধাবাইর কণ্ঠমালা কি দুনিয়ায় অতুলনীয় হইত?”

রাণী রাগিয়া রাজাকে মুক্তা ফিরাইয়া দিতেন। রাজা আবার তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন, "যতদিন না পাই, ততদিন খুঁজিব। বাদশাহের বেগমের মালাও ত একদিনে হয় নাই। আমরা ত এই খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

কিছুদিন এইরূপে অতীত হইলে, মীরা একদিন রাণীকে কহিল, "রাণীসাহেব, শুনেছ একজন বড় সাধু এসেছে ?"

রাণীজির বিশেষ তেমন কৌতূহলের উদ্রেক হইল না, অলসস্বরে কহিলেন, "কই, না !"

"সে যে-সে সাধু নয়, বড় ভারি মহাপুরুষ। একবার তিনি যমুনাতীরে বসিয়াছিলেন, আকবরবাদশাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। একজন নকীব তাঁহাকে গিয়া বলিয়াছিল যে, বাদশাহ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার সহিত বাদশাহের কি প্রয়োজন ? যিনি বাদশাহের বাদশাহ, আমি তাঁহার ভজনা করি, বাদশাহের নিকট গমন করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই।' এই কথা শুনিয়া বাদশাহ স্বয়ং ফকীরের নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ফকীর গাত্রোত্থান করেন নাই। উঠিয়া আসিবার সময় বাদশাহ যুক্তকরে তাঁহার নিকট দোয়া চাহিয়াছিলেন।"

রাণীর চক্ষু বিস্ময়বিস্ফারিত হইল। "তাই ত ! এমন সাধুর কথা ত শুনি নাই।"

"শুধু কি তাই ! সাধু এক এক সময় দাঁড়াইয়া উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন, আর তাঁহার চারিদিকে আশরফি-বৃষ্টি হইতে থাকে। তিনি যদি প্রসন্ন হন ত কি না করিতে পারেন ? রাজা, চাষা, তাঁহার ভেদ নাই, যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে, তাহার আর কোন ভাবনা থাকে না।"

রাণী বলিলেন, "তিনি না জানি কত গরিব লোকের উপকার করিয়াছেন !"

"শুধু কি গরিব লোকের ? যাহারা ধনী, তাহারাই কি যাহা চায়, তাহাই পায় ? রাজা-রাজড়ার ঘরেও কি অভাব নাই ? তুমি ত রাজরাণী, তবে তোমার মনের মত একছড়া মুক্তার মালা পাওয়া যায় না কেন ?"

রাণী বিমনা হইলেন, কহিলেন, "তা আর কই পাওয়া যায় ?"

মীরা বলিল, "সাধু এত লোককে এত দিতে পারেন, আর তোমাকে একছড়া মুক্তার মালা দিতে পারিবেন না ?"

রাণী সগর্ব্বে বলিলেন, "ফকীরের নিকট ভিক্ষা লইব !"

"ভিক্ষা লইতে কে তোমায় বলিতেছে ? সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট যাহা পাইবে, শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহাদের নিকট রাজরাণীই বা কে, আর কুটীরবাসিনীই বা কে ? তিনি যাহা দিবেন, ভক্তিপূর্ব্বক লইতে হইবে।"

"এত বড় মুক্তার মালা তিনি কোথায় পাইবেন ?"

মীরা হাসিয়া বলিল, "তাঁহাদের মত লোক কোথা হইতে কি পান, তাহাই যদি আমরা জানিব ত আমাদের ভাবনা কি ?"

তখন রাণী বলিলেন, "কিন্তু কে তাঁহাকে বলিবে ?"

"কেন, আমি বলিব। আমি একবার তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম।"

রাণী কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলেন না, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিলেন, "সত্য ? তিনি কি বলিলেন ?"

"তিনি বলিয়াছেন, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। তবে সে কথা স্পষ্ট বলেন নাই। বোধ হয়, তিনি দিবেন।"

"আমাকে কি করিতে হইবে ?"

"তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু রাজা ঘুণাক্ষরেও এ কথা শুনিতে পাইলে বিপদ্ হইবে।"

"তিনি শুনিলে আমায় ভর্ৎসনা করিবেন। তাঁহাকে কোন কথা বলা হইবে না।"

"তুমি না বলিলে আর কে বলিবে ? যদি বল ত আবার ফকীরের কাছে যাই।"

রাণী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। রাজা জহুরী ডাকিয়া মুক্তামালা দেখিতেছিলেন, রাণী ফকীরের নিকট প্রার্থী হইলেন। প্রতাপসিংহ সে কথা কিছু জানিতে পারিলেন না।

ছলনা।

মীরা নিত্য সন্ন্যাসীর নিকট যায়, নিত্য আসিয়া রাণীকে নানা কথা বলে। একদিন বলিল, "সন্ন্যাসী বলিয়াছেন যে, সোনারূপা যত সহজে পাওয়া যায়, মুক্তা তত সহজে পাওয়া যায় না। সে জন্য তোমাকেও একটু চেষ্টা করিতে হইবে।"

"আমি কি করিব ?"

"তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তোমার অন্য অলঙ্কারের উপর অনুরাগ আছে কি না। থাকিলে মুক্তার মালা পাওয়া যাইবে না। আর সকল অলঙ্কারের মায়া ত্যাগ করিয়া কেবল সেই মুক্তামালার কথা ভাবিতে হইবে।"

রাণী বলিলেন, "আমি ত তাই ভাবিতেছি, অন্য কোন অলঙ্কারের কথা আমার মনেও নাই।"

"তিনি আরও বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনদিন এক বেলা অন্ন, আর এক বেলা ফলমূল আহার করিয়া শুদ্ধাচারিণী হইয়া থাকিবে।"

রাণী সেইমত করিলেন। তাহার পর মীরা আসিয়া বলিল, "সন্ন্যাসী বলিয়াছেন যে, রাত্রিকালে তোমাকে একেলা সকল অলঙ্কার একটি বাক্সে পূরিয়া অন্দরমহলের উদ্যানে কোন বৃক্ষমূলে পুঁতিয়া রাখিতে হইবে। তুমি চলিয়া আসিলে পর, আমি সন্ন্যাসীকে গোপনে সেই স্থানে লইয়া আসিব। তিনি সেই স্থানে মন্ত্রপাঠ করিলে পর, তুমি মুক্তামালা পাইবে।"

রাণী বলিলেন, "সন্ন্যাসী কোথাও যান না, এখানে আসিবেন কেন ? আর আমার অলঙ্কার কতক্ষণ প্রোথিত থাকিবে ?"

"তোমার জন্য তিনি আসিবেন; তোমার অলঙ্কার মাটীতে পুঁতিয়া তাহার উপর বসিয়া মন্ত্র না বলিলে মুক্তামালা হইবে না। পরদিবস তুমি অলঙ্কার বাহির করিয়া লইও।"

তাহাই হইল। রাত্রিকালে রাণী মীরাকে সঙ্গে করিয়া, অলঙ্কারের বাক্স সঙ্গে লইয়া, উদ্যানে গমন করিলেন। একটা বৃক্ষতলে মীরা একটা গর্ত্ত খনন করিল, তাহাতে অলঙ্কারের বাক্স রাখিয়া, মাটী চাপা দিয়া, রাণী মীরার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। উদ্যানের বাহিরে উচ্চ বারান্দার উপর রাণী দাঁড়াইলেন। মীরা গিয়া, অন্দর-মহলের ও উদ্যানের দ্বার দিয়া ফকীরকে উদ্যানে লইয়া আসিল।

রাণী অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন। সন্ন্যাসীর মাথায় বড় বড় জটা, মুখে গুম্ফ-শ্মশ্রুর এত বাহুল্য যে, ভাল করিয়া মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দিনমানে হইলে সেগুলা পরচুল কি না, তাহাতে অনেকের সংশয় হইত। যে স্থানে অলঙ্কার প্রোথিত ছিল, মীরা গিয়া তাহাকে সে স্থান দেখাইয়া দিল। সন্ন্যাসী সেই স্থানে বসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল ও ধূপ-ধুনা প্রভৃতি জ্বালিয়া ভয়ঙ্কর ধূম উৎপাদন করিল। সে ধূমে সন্ন্যাসী ও বৃক্ষতল, কিছুই লক্ষিত হয় না। অবশেষে ধূম অপসারিত হইলে, সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বেশগৃহে পশ্চিমদিকে অন্বেষণ কর। কল্য স্নানাদির পর এখান হইতে অলঙ্কার তুলিয়া লইবে, তাহার পূর্ব্বে তুলিলে বিপদ হইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। মীরা তাহাকে পথ দেখাইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাণীর সঙ্গে বেশগৃহে গমন করিল।

গৃহের পশ্চিম কোণে রাণী দেখিলেন, অলাবুর একটি কমণ্ডলু রহিয়াছে। সেইটি তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, তাহার ভিতর এক-ছড়া মালা—বাহির করিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মীরা ছুটিয়া তাঁহার নিকটে গেল। দেখিল, রাণীর হস্তে অপূর্ব্ব মুক্তামালা, এক একটি মুক্তা এক একটি কপোতডিম্বের তুল্য, কোমলে উজ্জ্বল, মসৃণ, প্রদীপালোকে ঝল্‌মল্ করিতেছে! রাণী সেই একবার চীৎকার করিয়া আনন্দে আর কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল সেই সন্ন্যাসিলব্ধ বিচিত্র মালা দেখিতে লাগিলেন। মীরা অনেকক্ষণ পরে বলিল, "ইহার তুলনায় যোধাবাইর মালাও কিছু নয়। এমন মুক্তা কোন বাদশাহের বেগমও কখন দেখেন নাই।"

হর্ষে, গর্ব্বে, রাণীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পরদিবস রাজা প্রাতঃকৃত্য সমাপন ও বেশভূষা ধারণ করিয়া বাহিরে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় রাণী হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন। এমন হাসি রাজা অনেকদিন দেখেন নাই। রাণী বলিলেন, "একছড়া মুক্তার মালা তোমাকে দিয়া হইল না, এ ছড়া কেমন হইল দেখ দেখি!"

রাজা রাণীর কণ্ঠ দেখিলেন—গৌর কম্বুগ্রীবা আলিঙ্গন করিয়া সেই বিশাল মুক্তামালা প্রভাতালোকে জ্বলিতেছে! রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কোথায় পাইলে?" তাহার পর রাণীর নিকটে আসিয়া উত্তম-রূপে দেখিলেন, সহসা কহিলেন, "দেখি! দেখি!"

রাণী গর্ব্বোন্নত ভঙ্গীতে, কৌতুক-প্রদীপ্ত নয়নে, স্মিতাধরে দাঁড়াইয়াছিলেন। কহিলেন, "দেখ, ভাল করিয়া দেখ!"

রাজা ভাল করিয়া দেখিলেন, দুই একটা মুক্তা স্পর্শ করিয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন, তাহার পর উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "এ ছড়া কত দিয়া ক্রয় করিয়াছ ?"

রাণীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। লজ্জা, ক্রোধ, অভিমান, অপমান, কত ভাব মুখে ব্যক্ত হইবার উদ্যম করিতে লাগিল, অবশেষে ক্রোধই প্রবল হইয়া উঠিল। কহিলেন, "তোমাকে ত আর কিনিয়া দিতে হয় নাই।"

রাজা পূর্ব্ববৎ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন," এ-রকম একছড়া পাইলে কি তুমি সন্তুষ্ট হও ? এ যে ঝুঠা !" রাজা রাণীর কণ্ঠলগ্ন একটা মুক্তা লইয়া দুই অঙ্গুলি দিয়া টিপিলেন। মুক্তা চূর্ণ হইয়া রাজার করতলে পতিত হইল।

"কি কর! কি কর!" বলিয়া রাণী রাজার হস্তধারণ করিলেন ; তৎপরে কণ্ঠের মালা মোচন করিলেন। রাজা করতলগত চূর্ণ রাণীকে দেখাইলেন। সূক্ষ্ম কাচ, চূণ প্রভৃতি কয়েকটা সামগ্রী—মুক্তাচূর্ণের মত কিছুই নাই !

রাণী সাচ্চা মুক্তা অনেক দেখিয়াছিলেন, ঝুঠা কখন দেখেন নাই। রাজার কথা শুনিয়া ও সেই কাচ প্রভৃতি চূর্ণ দেখিয়া তিনি বাক্‌শূন্য হইলেন। রাজা হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তখন রাণীর চৈতন্য হইল। উদ্যানে বৃক্ষতলে গিয়া দেখিলেন, গর্ত্ত শূন্য রহিয়াছে! ফিরিয়া আসিয়া মীরাকে ডাকিয়া নিভৃতাগারে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসিপ্রদত্ত কণ্ঠমালা হস্তে ছিল, সেই মালা নিক্ষেপ করিয়া মীরার মুখে আঘাত করিলেন। সে যেন কিছু জানে না, রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণী কহিলেন, "বাঁদি, তোকে শূলে দিব জানিস্!"

বাঁদি বলিল, "আমার অপরাধ ?"

"একটা ভণ্ড চোরকে সাধু-সন্ন্যাসী বলিয়া রাজবাটীতে আনিয়া, তাহার সঙ্গে পরামশ করিয়া আমার সমস্ত অলঙ্কার চুরি করিয়াছিস্। আর এই মুক্তার মালা—যোধাবাইয়ের মালার অপেক্ষাও বহুমূল্য, না ?"—পদদ্বারা রাণী ঝুঠা মুক্তা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মীরা কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল, "রাণীজি, আমি কি জানি যে, সে সন্ন্যাসী এমনতর লোক ? আমি ত তাহার সকল কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে লইয়া আসি, সে যে এরকম লোক, কেমন করিয়া জানিব ? তোমার যে অলঙ্কার পোতা ছিল—"

"আমি দেখিয়া আসিয়াছি—নাই।"

"কি সর্ব্বনাশ! কোতওয়ালকে খবর দাও, তাহাকে ধরিবে।"

"আর তুমি ?"

"আমি ত পলাই নাই, তোমার কাছেই আছি, শূলে দাও, ফাঁসি দাও, যাহা ইচ্ছা হয়, কর।"

"বেশঘরে এই মুক্তার মালা কে রাখিয়াছিল ?"—রাণী পদদলিত চূর্ণের প্রতি কটাক্ষ করিলেন।

"আমি যদি রাখিয়া থাকি ত আমার দুই

হাত যেন গলিয়া পচিয়া খসিয়া যায়।” মীরার-চক্ষে শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল।

রাণী কহিলেন, “জল্লাদের চাবুক পিঠে পড়িলে আপনি সত্যকথা বলিবে।”

মীরার রোদন বন্ধ হইল না, কিন্তু রোদনের সঙ্গে সঙ্গে সে বলিতে লাগিল, “আমি ত কোন কথা গোপন করিতে চাহি না, তা আমাকে যে শাস্তি ইচ্ছা হয়, দাও। তুমিই জিজ্ঞাসা কর, আর রাজাই জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি কিছু লুকাইতেছি? সন্ন্যাসীর কাছে ত আমি তোমাকে লুকাইয়া যাই নাই। সে যাহা বলিত, সকল কথা তোমাকে আসিয়া বলিতাম, যখন তাহাকে উদ্যানে ডাকিয়া লইয়া আসি, তাহাও তোমার অনুমতিক্রমে। বৃক্ষতলে তুমি স্বহস্তে অলঙ্কার রক্ষা করিয়াছিলে, সন্ন্যাসী আসিলে তাহাকে দেখিয়াছিলে। আমি সর্ব্বদা তোমার নিকটেই ছিলাম, আজ এ পর্য্যন্ত বাড়ীর বাহির হই নাই। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকেও বলিব।”

শুনিতে শুনিতে রাণীর স্মরণ হইল যে, এতক্ষণ তিনি দাসীর অপরাধ দেখিতেছিলেন, আত্মাপরাধ একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। এই সকল কথা শুনিলে রাজা তাঁহাকে কি বলিবেন? রাণী মীরাকে বলিলেন, “আচ্ছা, আমি ভাবিয়া দেখিব। এখন রাজাকে বলিবার কোন আবশ্যক নাই।”

রোদন ভুলিয়া, অল্প হাসিয়া, দাসী সরিয়া গেল।

মীরা পলায়ন করে নাই। জটাশ্মশ্রু যত শীঘ্র ত্যাগ করা যায়, রাজবাটীর দাসী-চিহ্ন তত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। পলাইলে মীরার যত আশঙ্কা, না পলাইলে তত নয়। রাণী নিজে ধরা না দিয়া দাসীকে ধরাইয়া দিতে পারিবেন না।

অন্য কোন কথা সে সময় প্রকাশ না করিয়া রাণী রটাইলেন যে, তাঁহার অলঙ্কার চুরি গিয়াছে। অধিকাংশ অলঙ্কার হীরা-মুক্তার—আবার পাওয়া গেল। অল্প-স্বল্প সুবর্ণ ছিল, সেইগুলা গেল।

প্রাপ্তি।

আগ্রা হইতে মীরার পরিচিত এক ব্যক্তি বিলাসপুরে আসিয়াছিল। সে শুনিয়া গেল যে, বিলাসপুরের রাণী, যোধাবাই-বেগমের কণ্ঠমালার মত মুক্তা-হারের জন্য পাগল হইয়াছেন।

ক্রমে এই কথা যোধাবাই-বেগমের কর্ণে উঠিল। একজন দাসী তাঁহাকে বলিল, “শুনিয়াছ বেগমসাহেব, এক রাণী মুক্তার কণ্ঠী গড়াইতেছে, তোমার অপেক্ষাও না কি উৎকৃষ্ট হইবে?”

যোধাবাই একে রাজপুতকন্যা, অম্বের দুহিতা, তাহাতে রাজরাজেশ্বরী, আকবর-শাহের মহিষী। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, কহিলেন, “কাহার এমন স্পর্দ্ধা? তাহাকে বাঁদীর বাঁদী করিয়া রাখিব।”

“বিলাসপুরের রাণী।”

বেগমের ক্রোধাগ্নি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইল। হাসিয়া কহিলেন, “কে? চন্দ্রাবতী?”

“সে-ই।”

“মুক্তার মালা কি পাইয়াছে?”

“কোথায় পাইবে? তোমার মত মালা কি পৃথিবীতে আর কোথাও আছে?”

বেগম অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে, বিলাসপুরে রাণী চন্দ্রাবতী ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথা রাজার নিকট অধিকদিন গোপন করিতে পারিলেন না। সকল কথা প্রকাশ না হউক, অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। শুনিয়া রাজা হাস্য করিলেন ও রাণীকে অনেক বিদ্রূপ করিলেন। মুক্তার হারের জন্য রাণী রাজাকে আর অধিক ত্যক্ত করিতে পারিতেন না। হারের কথা ক্রমে লোকে বিস্মৃত হইতে লাগিল।

এমন সময় সংবাদ আসিল, বাদশাহ বিলাসপুরের নীচের জঙ্গলে শীকার করিতে আসিতেছেন। তখন আর কোন কথাই কাহারও স্মরণ রহিল না। রাজ্যের সর্ব্বত্র হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বাদশাহের শীকারের জন্য রাজ্যের যত হস্তী ও অশ্ব প্রেরিত হইল। চারিদিকে রসদের উদ্যোগ হইতে লাগিল। নানাবিধ উপঢৌকনাদি লইয়া রাজা বাদশাহের আগমনের জন্য অগ্রসর হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাদশাহের আগমন ত সহজ ব্যাপার নহে। তিনি যেখানেই গমন করুন, তাঁহার সঙ্গে একটি রাজধানী চলিত। বাজারবাট, লোকজন, দাসদাসী, বাহিরের লোক মিলিয়া প্রায় লক্ষজন হইত। এখন বাদশাহ মৃগয়ায় যাইবেন বলিয়া অল্প লোক, তথাপি দশ-বিশ-সহস্র হইবে।

রাজা প্রতাপসিংহ নজর দিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করিলেন। বাদশাহ রাজাকে নূতন উপাধি প্রদান করিলেন ও পাঁচসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। এ সম্মান পাইবার রাজা কিছুমাত্র আশা করেন নাই।

বাদশাহের সঙ্গে যোধাবাই-বেগম আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্বতন্ত্র শিবির, সমুদয় আয়োজন স্বতন্ত্র। মোগল বাদশাহের মহিষী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যোধাবাই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। আগ্রা-দুর্গে তাঁহার মহল দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় হিন্দুর অট্টালিকা, অপর কোন মহলের সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। যোধাবাই নিষ্ঠাবতী হিন্দুরমণীর মত বাস করিতেন; আকবরও তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন না, কারণ ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার উদারতা অসীম। যোধাবাইর মহলের খোজা গিয়া প্রতাপসিংহকে সংবাদ দিল, বেগমসাহেব রাণীসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন।

এরূপ আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না। রাজা বিলাসপুরে সংবাদ পাঠাইয়া রাণীকে আনয়ন করাইলেন। রাণী শিবিকায় আরোহণ করিয়া মহাসমারোহে বেগমদর্শনে গমন করিলেন।

যোধাবাই চন্দ্রাবতীকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন, কহিলেন, "আমি তোমার নাম অনেকদিন শুনিয়াছি, একবার দেখিবার সাধ ছিল।"

উভয়ে পরস্পরকে দেখিতেছিলেন। চন্দ্রাবতী যোধাবাইয়ের অপেক্ষা সুন্দরী বটে, কিন্তু বেগমের তেজোদর্পে সে রূপ পরাস্ত হইল।

বেগম রাণীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, রাণী উত্তর দিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রগল্‌ভতা-প্রদর্শন-ভয়ে অধিক কিছু জিজ্ঞাসা

করিলেন না। যোধাবাই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু চন্দ্রাবতীকে কিছু আহার করিবার অনুরোধ করিতে সাহস হইল না। যোধাবাই প্রাণপণে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিলেও তিনি যবনী; চন্দ্রাবতী তাঁহার গৃহে জলস্পর্শ করিতেন না।

অবশেষে চন্দ্রাবতী বিদায় গ্রহণ করিবার মানসে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন বেগম একজন দাসীকে সঙ্কেত করিলেন। বেগমও উঠিয়া রাণীর সহিত কয়েক পদ গমন করিলেন, এমন সময় দাসী হস্তিদন্তনির্ম্মিত, কারুকার্য্যখচিত, একটি ক্ষুদ্র পেটিকা লইয়া আসিল। বেগম পেটিকা খুলিয়া সেই অমূল্য মুক্তার কণ্ঠমালা বাহির করিলেন! যে মালার তুল্য আর একছড়া মালার জন্য রাণী রাজ্য তোলপাড় করিয়াছিলেন, যাহার বৃথা আশায় তাঁহার অলঙ্কাররাশি গিয়াছিল, সেই মালা আজ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে! বেগম কি সমস্ত কথা শুনিয়াছেন ও সেইজন্য তাঁহাকে অপমান করিতেছেন?

বেগম মালা রাণীর গলায় পরাইয়া দিলেন। দাসীকে কহিলেন, "রাণী-সাহেবকে শিবিকায় তুলিয়া দিয়া পেটিকা তাঁহার সঙ্গে দিয়া আইস।"

রাণীর পদতলে ধরণী যেন দ্বিধা হইল। লজ্জায় আকর্ণগণ্ড রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "এ মালা অমূল্য; আমি ইহার অযোগ্য।"

বেগম রাণীর চিবুক ধারণ করিলেন, বলিলেন, "এ মালা তোমারই যোগ্য। তুমি ইহা কণ্ঠে ধারণ করিয়া যোধাবাইকে কখন কখন স্মরণ করিও!"

রাণী নিরুত্তরে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সমাপ্তি।

এই ত সেই মুক্তামালা!

ইহারই জন্য রাণী রাজ্যে অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহার জন্যও নহে, কারণ ইহার তুল্য আর একছড়ার জন্য রাণী উতলা, এ ছড়া যে কখন পাইবেন, এরূপ স্বপ্নেও মনে করেন নাই। অথচ যোধাবাইর সেই মালাই তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন।

কিন্তু কল্পনায় যে আনন্দ অনুভব করিতেন, বাস্তবিক ত তাহার কিছুমাত্র অনুভব করিলেন না!

রাণী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রাজা তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। রাজা রাণীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। মালার কথা ইতিপূর্ব্বেই রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল।

রাজা কহিলেন, "দেখি, দেখি, বেগমের প্রসাদ দেখি!"

রাণী ক্রোধে মুক্তামালা ছিন্ন করিয়া নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন।

রাজা হস্তসঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, কহিলেন, "ইহা বাদশাহের বেগমের প্রসাদ, সন্ন্যাসীর ছলনা নহে। বেগমপ্রদত্ত মালা তুমি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছ, এ কথা প্রকাশ হইলে আমরা বিপদে পড়িব।"

রাণী মুক্তামালা কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন। মুক্তামালা বাক্সে উঠিল বটে, কিন্তু রাণীর কণ্ঠে আর উঠিল না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

তরল-বায়ু।

প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে, যখন আচার্য্য ফ্যারাডে সর্ব্বপ্রথমে বায়বীয় পদার্থ তরলীভূত করিবার উপায় আবিষ্কারের জন্য অহোরাত্র পরীক্ষাগারে আবদ্ধ থাকিতেন, সেই সময়ে আচার্য্যের জনৈক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তোমার এই আবিষ্কার-দ্বারা সংসারের কি উপকার হইবে?" ফ্যারাডে তদুত্তরে বন্ধুবরকে বলিয়াছিলেন,—"শিশুসন্তানদ্বারা গৃহস্থের কি উপকার হয় বলিতে পার?" তরলীভূত বায়বীয় পদার্থ যে একদিন সংসারের নানা-কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে, সেই প্রাথমিক বৈজ্ঞানিকযুগে প্রাচীন অধ্যাপক ফ্যারাডে তাহা দিব্যচক্ষুতে স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। সাংসারিক সহস্রকার্য্যে তরলীভূত বায়ুর নানা উপযোগিতা ও বায়ু তরল করিবার সহজ প্রক্রিয়ার ব্যাপার আবিষ্কৃত হওয়ায়, স্বর্গীয় আচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত উক্তিটির প্রত্যেক বাক্য ভবিষ্যদ্‌বাণীর ন্যায় সফল হইল বলিয়া মনে হইতেছে,—এখন সত্যই ফ্যারাডের সেই অক্ষম শিশুসন্তানটি পূর্ণতা-লাভ করিয়া, এক অদ্ভুত শক্তিদ্বারা সংসারের ছোট-বড় নানা কাজ সহজে সম্পন্ন করিবার আয়োজন করিতেছে।

যে মূলপদ্ধতিক্রমে বায়ু তরলীভূত হইয়াছে, সে'টা অতি সহজ এবং সকলেরই পরিজ্ঞাত। ডাল্‌টন্ ও ফ্যারাডে হইতে আরম্ভ করিয়া, ছোট-বড় বিজ্ঞানবিদ্‌-মাত্রেই, সেই একই পদ্ধতিক্রমে বায়বীয় পদার্থ তরল করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু সহজে সেই পদ্ধতিপ্রয়োগের কৌশল জানা না থাকায়, প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া আসিতেছিল। অল্পদিন হইল, অধ্যাপক ডিওয়ার-(Dewar)-নামক জনৈক পণ্ডিতের আবিষ্কৃত কৌশলক্রমে মার্কিন শিল্পী ট্রিপ্‌লার-(Tripler)-সাহেব বায়ু তরল করিবার একটি যন্ত্র গঠন করিয়া, জগতের একটা মহান্ উপকার সাধনের উপক্রম করিয়াছেন।

চাপ ও শৈত্য প্রয়োগ ব্যতীত বায়বীয় পদার্থ তরল করিবার উপায়ান্তর নাই। একটা দৃঢ় কাচগোলকের মধ্যে পম্প দ্বারা বাহিরের বায়ু বা অপর কোনও বায়বীয় পদার্থ প্রবেশ করাইলে, কাচগোলকের ভার ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কারণ যে বায়বীয় পদার্থ পূর্ব্বে মুক্তাবস্থায় বাহিরের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাই এখন গোলক-মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রস্থানে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। বায়ু, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থগুলিকে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে গোলকাবদ্ধ করিতে থাকিলে, তাহার অবস্থা ক্রমে কিপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিবার উপায় নাই, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, মুক্তাবস্থায় যে বায়ুরাশি বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়াছিল,

এখন তাহাই ক্ষুদ্র গোলকগর্ভে আবদ্ধ হইয়া পড়ায়, বায়ুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুসকল নিশ্চয়ই ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বায়বীয় পদার্থের পরস্পর দূরবিচ্ছিন্ন অণুসকলকে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা বেশ সহজে ঘনসন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বায়বীয় পদার্থের অণু ঘনসন্নিবিষ্ট করিবার আর একটা উপায় আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, আবদ্ধ বায়ুতে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে চাপ না দিয়া, তাহাকে কেবলমাত্র শীতল করিলেও, ঠিক চাপ-প্রয়োগের অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। কতিপয় বায়বীয় পদার্থ কেবল চাপ-প্রয়োগেই তারল্যপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি বায়ু যুগপৎ শৈত্য ও চাপ প্রয়োগ না করিলে তরল হয় না। ফলে প্রত্যেক বায়বীয় পদার্থেরই একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতার সীমা আছে। যতক্ষণ সেই বায়ু সেই সীমার উৰ্দ্ধে উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ, যতই চাপ প্রয়োগ কর, উহা তরল হইবে না। শৈত্যপ্রয়োগে উষ্ণতা ক্রমশ কমাইয়া সেই সীমার নিম্নে লইয়া যাও; পরে চাপ প্রয়োগ করিলে উহার তারল্য জন্মিবে।

প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে চাপ ও শৈত্য প্রয়োগদ্বারা অনেক-গুলি বায়বীয় পদার্থ তরলীভূত করিয়াছেন, অধ্যাপক ডিওয়ার-(Dewar)-সাহেবও ঠিক্ ঐ প্রথায় একই কালে চাপ ও শৈত্য প্রয়োগ করিয়া বায়ু তরল করিয়াছেন।

একজন পণ্ডিতের ক্ষুদ্রজীবনব্যাপিনী গবেষণায় একটা বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধনের কথা অসম্ভব না হইলেও, জগতে তাহা বড়ই দুর্লভ। গত একশত বৎসর হইতে নানাদেশীয়-পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক বায়বীয় পদার্থ তরলীভূত করিবার যে আয়োজন হইয়া আসিতেছিল, অধ্যাপক ডিওয়ার পূর্ব্বপণ্ডিতগণের সংগৃহীত তথ্য অবলম্বন করিয়া, তাঁহাদেরই সজ্জিত পরীক্ষাগারে কিছুদিন গবেষণা করিয়া, বায়ু তরলীভূত করিয়াছেন মাত্র। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফ্যারাডের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ডাল্‌টন্‌ও বায়ু তরল করা সম্ভবপর বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, এবং কেবল চাপ ও শৈত্য প্রয়োগে যে বায়বীয় পদার্থমাত্রই তরলীভূত হইতে পারে, এ কথাও তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, কিন্তু সহজে অধিক চাপ ও শৈত্য প্রয়োগের কৌশল তখন জানা না থাকায়, তাঁহার উক্তির সত্যতা সেই সময়ে সম্পূর্ণ বুঝা যায় নাই।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক ইংরাজ বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নেতা আচার্য্য ফ্যারাডে, ডাল্‌টনের নির্দ্দিষ্ট প্রথায় ক্লোরিন বাষ্প তরল করিয়া, জড়বিজ্ঞানের এই অংশ-বিশেষের দিকে সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞানবিদ্‌-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; কিন্তু তৎকালে বিষয়টার গুরুত্ব কেহই ভাল বুঝিতে পারেন নাই,—তজ্জন্য তা'র পর বহুকাল পণ্ডিত-গণের নিকট হইতে সে সম্বন্ধে কোনও নূতন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শেষে ১৮৪৪ অব্দে অধ্যাপক থাইলোরিয়ার (Thilorier) অঙ্গারক বাষ্প তরল করিয়া পরে তাহাকে কঠিনাকারে পরিণত করিয়াছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ আচার্য্য ফ্যারাডে-প্রমুখ পণ্ডিতগণ

আবার নবোৎসাহে পরীক্ষারত হইয়াছিলেন। ফ্যারাডের অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরীক্ষা-নৈপুণ্যে পরিজ্ঞাত বায়বীয় পদার্থের মধ্যে অধিকাংশেরই তরল করিবার কৌশল এই সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন, এই তিনটি বায়বীয় পদার্থ তরলীভূত করিবার কৌশল তাঁহাদের মধ্যে কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। প্রধান পণ্ডিতগণের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া, অক্সিজেন প্রভৃতি বাষ্পত্রয় স্থায়ী বাষ্প (Permanent Gas) বলিয়া এইসময়ে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। ফলে কেবলমাত্র চাপ দ্বারা ইহাদিগকে তরল করা যায় না। পূর্ব্বে কোনরূপে ইহাদের উষ্ণতা কমাইতে হইবে, তৎপরে চাপ-প্রয়োগে তারল্য জন্মিবে।

ইহার পর কিছুদিন কোন পণ্ডিতই এই বিষয়ের পুনঃপরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করেন নাই,—কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও অক্সিজেন প্রভৃতি বাষ্প "স্থায়ী বাষ্প" বলিয়া পণ্ডিতগণের মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তার পর গত ১৮৭৯ অব্দে ফরাসী পণ্ডিত কাইলটে (Cailletet) এবং জর্ম্মাণ অধ্যাপক পিকটের (Pictet) পরীক্ষানৈপুণ্যে তথাকথিত "স্থায়ী বাষ্প" গুলি তরল করিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইলে, কোন বাষ্পই স্থায়ী নয় বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস হইয়াছিল। বায়ু তরল করিবার চেষ্টা এই সময় হইতে আরম্ভ,—অধ্যাপক ডিওয়ার এই কয়েক বৎসর নীরবে গবেষণা করিয়া সম্প্রতি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের বহুকালপোষিত আশা পূরণ করিয়াছেন।

তরল বায়ু হঠাৎ দেখিলে, জিনিষটাকে পরিষ্কার জল বলিয়া ভ্রম হয়,—গুরুত্ব, উজ্জ্বলতা ও বর্ণ প্রভৃতিতে ইহা প্রায় জলের অনুরূপ, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ইহা অসম্ভব শীতল। মদ প্রভৃতি পদার্থ তাহার সংস্পর্শে আসিবামাত্রই জমিয়া কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বরফের তুলনায় তরল বায়ু প্রায় ৩৪০ ডিগ্রি পরিমাণে শীতল। কোন একটা পদার্থকে বাষ্পীভূত করিতে হইলে, আমরা সাধারণত তাহাতে তাপ প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু তরল বায়ু স্বতই এত অধিক শীতল যে, বরফের ন্যায় শীতল পদার্থ তাহাতে অগ্নির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কিয়ৎকাল বরফাচ্ছন্ন রাখিলেই, তরল বায়ু বরফের তাপেই ফুটিয়া শীঘ্র বাষ্পীভূত হইয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত তরল বায়ুর আরো অনেকগুলি ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ধাতব-পদার্থের উপর তাহার কার্য্যটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অতি অল্পপরিমাণ তরল বায়ু ক্ষণকালের জন্য কোন ধাতুর সংস্পর্শে আসিলেই তাহাকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিয়া তোলে। কঠিন ইস্পাত বা লৌহ তরল বায়ুর স্পর্শে কাচবৎ ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু আবার তাহারই সংযোগে সীসকবৎ কোমলতা প্রাপ্ত হয়। তরল বায়ুর অপরাপর ধর্ম্ম আবিষ্কারের জন্য আজও খুব পরীক্ষা চলিতেছে—এবং সহজে বাষ্পীভূত হইবার যে একটা প্রধান ধর্ম্ম

ইহাতে দেখা যায়, কল-কারখানার কাজে, তাহা সাধারণ জলীয় বাষ্পের শক্তি অপেক্ষা অধিক উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। একজন বিজ্ঞানবিৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তরল বায়ুর সম্প্রসারণ-শক্তি অগ্নিসংযুক্ত বারুদ বা লিডাইট অপেক্ষাও অধিক, যাহাতে তদ্দারা বন্দুক ও কামানের গোলাগুলি চালাইবার সুব্যবস্থা হয়, তজ্জন্যও অনেকে সচেষ্ট আছেন।

আমাদের প্রচলিত নিত্যব্যবহার্য্য পদার্থ অপেক্ষা কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদির আবিষ্কার-সমাচার আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বড় দুর্ল্লভ নয়, কিন্তু এই সকল নূতন দ্রব্যকে পুরাতনের স্থান অধিকার করিতে কদাচিৎ দেখা গিয়া থাকে। ব্যয়বাহুল্য নূতনের প্রচলনের প্রধান অন্তরায়,—সাধারণত এই সকল নূতন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ব্যয় এত অধিক দেখা যায় যে, উপযোগিতা ও ব্যয়ে প্রায়ই সামঞ্জস্য থাকে না. কাজেই সেগুলি সংসারে পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিতে পারে না, এজন্যই সেই ফরাসী পণ্ডিতের আবিষ্কৃত হীরক-প্রস্তুত-প্রণালী আজও তাঁহার ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারের বাহিরে আসিতে পারে নাই। তরল বায়ুর আবিষ্কারসংবাদ ও তাহার নানা কার্য্যোপযোগী গুণের কথা প্রথমে প্রচারিত হইলে, ইহাকেও কৃত্রিম হীরকের ন্যায় কেবল ল্যাবরেটারির পরীক্ষণীয় ব্যাপার বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি ট্রিপ্লার-নামক জনৈক মার্কিন যন্ত্রবিদ্ অতি অল্প-ব্যয়ে তরলবায়ু প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া এই সন্দেহ দূর করিয়াছেন। অধ্যাপক ডিওয়ার এক আউন্স তরলবায়ু প্রস্তুত করিতে প্রায় ছয়শত গিনি ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ট্রিপ্লার এখন একশত গিনিতে এক পাইণ্টেরও অধিক তরলবায়ু প্রস্তুত করিতেছেন এবং শীঘ্রই ইহা অপেক্ষাও অল্পব্যয়ে তরলবায়ু পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন।

ট্রিপ্লারের বায়ু তরল করিবার কৌশলটা অতি সুন্দর ও সহজ। প্রথমে বায়ু তরল করিবার সময় সঙ্কীর্ণ-পাত্রাবদ্ধ বায়ু শীতল করিবার জন্য অধ্যাপক ডিওয়ার, নাইট্রস্ অক্সাইড ও ইথেলিন বাষ্প ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন, ট্রিপ্লার তাঁহার নবোদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কোন রাসায়নিক পদার্থেরই সাহায্য না লইয়া কেবল বায়ুদ্বারা বায়ুকে জমাইয়া তরল করিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। বায়বীয় পদার্থে চাপ প্রয়োগ করিয়া সঙ্কীর্ণস্থানে আবদ্ধ করিলে, সঙ্কোচনকালে সেই-পদার্থ-স্থিত অনেক তাপ স্বতই বহির্গত হইয়া পড়ে * ; এবং আবার সেই সঙ্কীর্ণস্থান হইতে মুক্ত হইলেই উহা প্রসারিত হয় ও প্রসারণকালে বাহির হইতে তাপ আত্মসাৎ করিয়া, নিকটস্থ পদার্থগুলিকে শীতল করিতে থাকে। বায়ু-তরলীকরণ-ব্যাপারে ট্রিপ্লার-সাহেব বায়বীয় পদার্থের কেবলমাত্র এই দুইটি

* বাইসিকেল-প্রিয় পাঠক, তাঁহার দ্বিচক্রযানের চাকার রবারের থলিতে বাতাস পূরিবার সময়, এই ব্যাপারটা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন,—থলিতে যতই সবলে বাতাস পম্প করা যায়, টায়ারের উপরিভাগ সঙ্কুচিত বায়ুর পরিত্যক্ত তাপে ততই উষ্ণ হইতে থাকে।

ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রথায়, প্রথমেই কতকগুলি দৃঢ় ধাতব নলে স্বতন্ত্র যন্ত্রের সাহায্যে বায়ু আবদ্ধ রাখিয়া, বরফজল দ্বারা সেগুলিকে বেশ শীতল করা হয়; তা'র পর সেই নলগুলিতে যে এক একটি ক্ষুদ্র বায়ুনির্গমনপথ থাকে, তাহা কিয়ৎকালের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হয়। এইপ্রকারে রুদ্ধ বায়ু ক্ষুদ্র নির্গমনপথ পাইয়া, যেমন নলমধ্যস্থ অপর বায়ু হইতে তাপ হরণ করিয়া মহাবেগে বহির্গত হইতে থাকে,—সেই হৃত তাপে অবশিষ্ট বায়ুর উষ্ণতা কমিয়া যায়। এই শীতল বায়ুর কিয়দংশ আবার প্রসারণকালে আরও তাপ হরণ করে; তাহাতে অবশিষ্ট বায়ুর উষ্ণতা আরও কমে। এইরূপে ক্রমশ উষ্ণতা কমিয়া বায়ু অত্যন্ত শীতল হইলে অল্প চাপেই তরল হইয়া পড়ে। নলে বায়ু আবদ্ধ করিবার জন্য যে স্বতন্ত্র যন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, ট্রিপ্‌লার সে যন্ত্রটিও কেবল তরল-বায়ু দ্বারা চালাইতেছেন; জল, অগ্নি ইত্যাদির কোন সাহায্য না লইয়া, উক্ত যন্ত্রের পরিচালনে তিন-পাউণ্ড তরলবায়ু ব্যয় করিয়া, তিনি প্রায় দশ-পাউণ্ড পর্য্যন্ত তরল-বায়ু প্রস্তুত করিতেছেন।

সুলভ তরলবায়ু দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র যন্ত্র পরিচালনে কৃতকার্য্য হইয়া, ট্রিপ্‌লার এখন তরলবায়ু-চালিত একটা বৃহৎ যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য সচেষ্ট আছেন। আধুনিক ষ্টীমার ও রেলগাড়ি ইত্যাদিতে সংলগ্ন যন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলেই, সেগুলি নূতন শক্তির ব্যবহারোপযোগী হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দিতেছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

দাবার জন্মকথা

দাবা-খেলার আদিম উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ। পারস্য-সাহিত্য-পাঠে জানা যায় যে, এই খেলা ভারত হইতে পারস্যে, পারস্য হইতে আরবে, এবং আরব হইতে সম্ভবত য়ুরোপে, নীত হইয়া থাকিবে। পুরাতন পারসিকেরা বিদেশীয় আবিষ্কৃত বিষয় নিজস্ব করিয়া লইতে বিশেষ পটু ছিল। তাহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশে এ দেশে আসিয়া এখানকার সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি অনেক বিষয় নিজদেশে বহন করিয়া লইয়া যায়। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ গ্রন্থ ৫৫০ খৃষ্টাব্দে পারস্যে ও ৭০০

খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরবে উপনীত হয়; দাবা-খেলাও বোধ হয় এই সময়েই ভারত হইতে তত্তদ্দেশে নীত হইয়াছিল। সার্ উইলিয়ম্ জোন্‌স্ মহোদয় অনুমান করিয়াছেন, ৫৩১—৫৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিখ্যাত পারস্যরাজ খসরু নশিরবানের প্রিয় চিকিৎসক 'বরজু বৈদ্যপ্রিয়' কান্যকুব্জ হইতে পারস্যরাজ্যে এই খেলা লইয়া যান। (Vide 'Antiquarian Researches of Asia' and Prof. Max Muller's 'Ancient Sanskrit Literature'.) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বলিয়াছেন যে, গোড়ের ব্রাহ্মণগণ এককালে এই খেলার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

দাবার পুরাতন সংস্কৃত নাম ছিল 'চতুরঙ্গ'; অমরকোষ অভিধানে চতুরঙ্গ-শব্দার্থ লেখা হইয়াছে—'হস্ত্যশ্বরথপাদাতম্', অর্থাৎ সৈন্য-বিভাগের চারিটি অঙ্গ বা অংশ—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য; রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যেও এই অর্থই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব, এই ক্রীড়া যে জাতির মস্তিষ্কসমুদ্ভূত, সে জাতি যে এক সময়ে সমরনিপুণ ছিল, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে?

পুরাতন পারসিক জাতি এই সংস্কৃত 'চতুরঙ্গ'শব্দকে অপভ্রংশ করিয়াছিল চতরঙ; তার পর যখন আরবীয়েরা পারস্যপ্রদেশ অধিকার করিল, তখন তাহাদের মধ্যে এই খেলার নাম আরো পরিবর্তিত হইয়া 'শতরঞ্জ্'নামের প্রচলন হইল; কারণ, আরবী বর্ণমালায় 'চতরঙ্গ্' শব্দের আদি ও অন্ত্য বর্ণের অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে এই 'শতরঞ্জ্'শব্দ আধুনিক পারস্য-ভাষায় পরিগৃহীত * হইয়া ভারতবর্ষে পুনরাগমন করিয়াছে এবং তাহার আদিম-অর্থযুক্ত 'চতুরঙ্গ'সংজ্ঞা সকলের মন হইতে একেবারে অপসৃত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে 'শতরঞ্জ্'শব্দকেই অর্থযুক্ত করা হইয়াছে—'শত ব্যক্তিকে যে রঞ্জন করে, তাহারই নাম শতরঞ্জ।'

এই 'শতরঞ্জ'শব্দ আরো পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে, যথা—শতরঞ্চ, স্কাক্‌চি, ইচেক্‌স্। ইংরাজিতে অবশেষে ইহা সংক্ষিপ্ত 'চেস'মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। (বিবর্ত্তনের বিশেষ বর্ণনা Antiquarian Researches of Asia নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।) এই 'চেস' হইতেই 'চেক'-(মাৎ করা)-শব্দের উৎপত্তি।

'দাবা'শব্দে যেমন খেলাকে বুঝায়, তেমনি মন্ত্রীকেও বুঝায়। বোধ হয়, 'দাবা'-শব্দ পারসিক দেওয়ান-(দবান)-শব্দের অপভ্রংশ। তাই 'দাবা'শব্দে মন্ত্রীকে বুঝাইয়াছে। তার পর মন্ত্রীই খেলার প্রধান বল বলিয়া তাহারই নামে সমগ্র খেলার নামকরণ হইয়া থাকিবে। 'পিল' বা 'ফিল' শব্দও পারসিক, অর্থ—হস্তী।

আধুনিক খেলার অনুযায়ি-প্রক্রিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে আছে কি না,

* বিজিত জাতির ভাষার উপর জেতার ভাষার যথেষ্ট প্রভাব; একন্য পারস্যজাতি তাহাদের 'চতরঙ্' ছাড়িয়া 'শতরঞ্জ্' ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করিব, আশা রহিল।

স্বর্গীয় মহাত্মা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পণ্ডিতপ্রবর সার্ উইলিয়ম্ জোন্‌স্ মহোদয়কে বলিয়াছিলেন, "এই খেলার বিষয় পুরাতন অষ্টাদশ 'ধর্ম্মশাস্ত্র' হইতে এইরূপ জানা যায় যে, ইহা লঙ্কেশ্বর রাবণের পত্নীকর্ত্তৃক সমরপ্রিয় স্বামীর তৃপ্ত্যর্থে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।" ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দিবার সময় 'রাক্ষসনিয়মের' উল্লেখ করিয়া এই উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

জানি না; তবে 'ভবিষ্যপুরাণে' এতৎসদৃশ আর একটি খেলার যে ক্রম লিখিত আছে, তাহাই এস্থলে বিবৃত করিতেছি। ভবিষ্যপুরাণে এই খেলার নাম 'চতুরঙ্গ' বা 'চতুরাজি'। 'চতুরাজি' অর্থে 'চারি রাজা'; এই খেলায় চারিটি রাজার আবশ্যক, এজন্য ঐ নাম কল্পিত হইয়াছে। ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনচ্ছলে এই ক্রীড়ার প্রক্রিয়া উক্ত পুরাণে বর্ণিত আছে।

উত্তর

পশ্চিম | পূর্ব

নৌকা	ক			রাজা	হস্তী	অশ্ব	নৌকা
অশ্ব	তি			প	দা	তি	ক
হস্তী	দা						
রাজা	প						
						প	রাজা
						দা	হস্তী
ক	তি	দা	প			তি	অশ্ব
নৌকা	অশ্ব	হস্তী	রাজা			ক	নৌকা

দক্ষিণ

ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইয়া দিতেছেন—"চারিদিকে ৮টি করিয়া সমচতুষ্কোণ ৬৪টি ঘরের একটি ছক অঙ্কিত করিয়া, এই ছকের পূর্ব্বে লোহিত, দক্ষিণে হরিৎ, পশ্চিমে পীত এবং উত্তরে কৃষ্ণবর্ণ সেনাদলকে সংস্থাপিত করিতে হইবে। বলসজ্জার নিয়ম এই—রাজার বামে হস্তী, তৎপরে অশ্ব ও তৎপার্শ্বে নৌকা বসাইয়া, তাহার পর ইহাদের সম্মুখে চারিটি পদাতিক বা 'বোড়ে' বসাইতে হইবে; আর নৌকাগুলি ছকের কোণের ঘরে ব'সবে। পূর্ব্বপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত ছকের মধ্যে বলসজ্জার নিদর্শন দেওয়া হইল। চালগুলি ইহার সহিত মিলাইয়া, একটু মনোযোগ-সহকারে চেষ্টা করিলে, এ খেলা আয়ত্ত করা কঠিন হইবে না।

এক্ষণে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে 'চাল' (move) শিক্ষা দিতেছেন। প্রথম চালসকল পাশা-খেলার চালের মত পাশ্‌টি ফেলিয়া স্থির করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে একটি-মাত্র পাশ্‌টি ব্যবহার্য্য; যথা—পাঁচ পড়িলে রাজা বা বোড়ে চালিতে হইবে, চার পড়িলে হস্তী, তিনে অশ্ব ও দুই পড়িলে নৌকা চালিতে হইবে। রাজা সকল দিকেই একঘরমাত্র যাইতে পারে এবং ঐ নিয়মানুসারেই (অর্থাৎ একঘরমাত্র) বোড়ে চলিয়া থাকে। কিন্তু বোড়ের সকল দিকে যাইবার ক্ষমতা নাই, কেবল সম্মুখের দিকে যাইবে, আর কোন বল মারিবার সময় কোণাকুণি ঘরে মারিবে (আধুনিক খেলার মত)। ঘোড়াও বর্ত্তমান খেলার নিয়মমত 'আড়াই'-ঘর অর্থাৎ সোজাসুজি দুই ঘর ও কোণে একঘর, মোট 'আড়াই'-ঘর প্রত্যেক বারে অতিক্রম করিবে। নৌকা কোণাকুণি দুই ঘর যাইবে। হস্তীর ক্ষমতা আমাদের মন্ত্রীর মত, অর্থাৎ আধুনিক মন্ত্রীর মত সকল দিকেই যতদূর ইচ্ছা যাইতে পারে। নৌকা আধুনিক পিলের মত কোণাকুণি যায়, কিন্তু দুই ঘরের অধিক যাইবার ক্ষমতা নাই, ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

বোড়ে ও নৌকা অন্য বল মারিতে পারে এবং স্বয়ং মারা যাইতেও পারে; কিন্তু রাজা, হস্তী এবং অশ্ব, শত্রুধ্বংস করিতে পারে, অথচ নিজে মরিবার ইহাদের অধিকার নাই। (এক্ষণে এ নিয়মটা কেবল রাজার পক্ষেই প্রযোজ্য।) 'চতুরাজি'-খেলায় রাজাকে সতর্কভাবে রক্ষা করিতে হইবে, এবং ছোট বলের জন্য বড় বল নষ্ট করা যাইতে পারিবে না।

বল-সকলের তারতম্য নিম্নলিখিত উপায়ে স্থির করা হইয়াছে। অশ্ব মধ্যস্থল হইতে আটটি চাল পাইতে পারে এবং নৌকা কেবলমাত্র চারিটি পায়, এজন্য অশ্ব নৌকা হইতে শ্রেষ্ঠ বল। হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল, এজন্য হস্তীর জন্য সকল বল নষ্ট করিয়াও হস্তীকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

গোতমের নিয়মানুসারে রাজা, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, এক হস্তীর সম্মুখে অপর হস্তী সংস্থাপিত করিতে পারিবে না। যদি একপক্ষের রাজা এককালে অপরপক্ষের দুইটি হস্তীকেই বিনাশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা দক্ষিণের হস্তীকে ত্যাগ করিয়া বামপার্শ্বের হস্তীকে বিনাশ করিবে। গোতমের ন্যায় দার্শনিক ও সংহিতাকারও যখন 'চতুরঙ্গের' নিয়ম

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন উহা যে ভারতের বিজ্ঞশ্রেণীতেও বিশেষ আদৃত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চারিজন ক্রীড়কের মধ্যে যে-কেহই জয় করিতে পারে। এই চারিজনের দুই দুই জন এক এক পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। দুইজন প্রকৃত রাজা পরস্পরের সাহায্যে (ally) যেমন যুদ্ধজয় করিতে পারেন, এ খেলাও তদ্রূপ। একপক্ষের রাজা অন্য পক্ষের কোনও রাজার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলে, সেই অবস্থাকে 'সিংহাসন' বলা হয়; তখন বুঝিতে হইবে, সেই রাজা অপরপক্ষের রাজার উপর জয়ী হইল। আবার যদি সেই রাজা পরপক্ষের রাজাকে ঐ ঘরে (অর্থাৎ রাজার নিজ ঘরে) যাইয়া মারিতে পারে, তবে দুই বাজী জয় হইল বুঝিতে হইবে। ইহার উপর যদি স্বপক্ষের রাজার সিংহাসন অধিকার করিতে পারে, তবে স্বপক্ষীয় সমগ্র বলের অধিনেতা বলিয়া স্বীকৃত হইবে, বন্ধু রাজার আর কোন ক্ষমতা থাকিবে না। যদি কোন রাজা ক্রমান্বয়ে তিন রাজার সিংহাসন অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে সে জয়ী হয় এবং তাহাকেই 'চতুরাজি' বলে। ইহার পরও যদি জেতা সর্ব্বশেষে বিজিত সিংহাসনের রাজাকে মারিতে পারে, তবে জয় আরো যশস্কর হয়। ব্যাসদেব স্পষ্টই বলিতেছেন যে, 'চতুরাজি' বা 'সিংহাসন' হইবার সময় রাজা হস্তিদ্বারা বা সমগ্র বল দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া কার্য্য করিবে। স্বপক্ষীয় কোন রাজা ধৃত হইলে, পরপক্ষীয় উভয় রাজাকে ধৃত করিয়া তাহাদের স্বাধীনতার নিষ্ক্রয়রূপে স্বপক্ষীয় বন্ধু রাজাকে ফিরাইয়া পাওয়া যায়; অথবা তাহা না পারিলে, আপনাকে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়া, বন্ধু রাজাকে ফেরত পাইতে পারে; বন্ধু রাজা ফিরিয়া আসিয়া দলস্থ সমস্ত বলের অধিনেতৃপদ গ্রহণ করিবে। ইহা যোদ্ধৃ-রাজগণকে মহানুভবতা শিক্ষা দিবার একটি সুন্দর উপায় নহে কি? এই আত্ম-বলিদানের নাম 'নৃপাকৃষ্ট' অর্থাৎ নৃপ-দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত। যদি রাজা বা নৌকা ভিন্ন অন্য কোন ঘরের বোড়ে চলিতে চলিতে অপরপক্ষের শেষ ঘর পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে, তবে সেই বোড়ে যে বলের ঘরের, সেই বল হইবে,—ইহার নাম 'ষট্পদ'। কিন্তু গোতম এই নিয়মের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, যতক্ষণ কোন ক্রীড়কের তিনটি পর্য্যন্ত বোড়ে থাকিবে, ততক্ষণ এই 'ষট্পদ' হইতে পারিবে না; কেবল একটি-মাত্র বোড়ে অবশিষ্ট থাকিলেই, তাহা নৌকা বা রাজা সমস্তই হইতে পারিবে। যদি তিন নৌকা একত্র হয় এবং চতুর্থ নৌকাকেও চালিয়া সেখানে লওয়া যায়, তাহা হইলে চতুর্থ নৌকা সকল নৌকাই ধৃত করে। এই জয়ের নাম 'বৃহন্নৌকা'। ব্যাস 'রাক্ষসবিধান' অনুসারে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে, যদি কোনও পক্ষের রাজা সর্ব্ববল-বিরহিত হইয়া একক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইবে না, অর্থাৎ সন্ধি হইবে, কিংবা খেলার ভাষায় বলিতে হইলে, 'বাজী চটিয়া' যাইবে, ইহার নাম 'কাককাষ্ঠ'।

'চতুরঙ্গ' বলের মধ্যে 'রথ' অন্যতম, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু 'চতুরাজি' ও আধুনিক, উভয় খেলাতেই ঐ 'রথ' 'নৌকা'রূপে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। উভয় খেলাতেই নৌকার কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। অপরন্তু চীনদেশীয় খেলায় দেখা যায় যে, ছকের উপর নদী অঙ্কিত থাকে, কাজেই তাহাতে 'নৌকা' নিতান্ত আবশ্যক। চীনরাজ্য নদীপ্রধান; ভারত হইতে এ খেলা যখন সে দেশে যায়, বোধ হয় ঐ রথই তখন নৌকায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার পর যখন তাতারগণ এবং কুবলাই খাঁ ও চেঙ্গিজ খাঁ প্রমুখ বিজয়ী পারসিকগণ চীনজয় করিয়াছিলেন, সেই সময় যে চৈন পরিবর্ত্তন পারস্যক্রীড়ার মধ্যেও প্রবেশলাভে সমর্থ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সম্ভবত আমাদের দেশে তাঁহারাই নৌকার আমদানি করিয়া যবন অধিকার সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চতুরাজি খেলায় কি করিয়া নৌকা আসিল, ঠিক বুঝা যায় না; তবে রথ ও নৌকার উক্তরূপ ব্যতিক্রম যদি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অতি প্রাচীন ভারতেও নৌসমরের বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিল না; অন্যথা প্রক্ষিপ্ত মতবাদের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আরাধ্যা

দুঃখ মম—দৈন্য মম, থাক্ চির-সঙ্গি-সম,
নাহি ভাবি তায়!
তিরস্কার—পুরস্কার, যশ-অপযশ-ভার
দিছি তব পায়!
তোমাতেই অনুরাগী, রাখিয়াছি তোমা' লাগি
যা ছিল আমার ;—
আমার আকাঙ্ক্ষা, আশা, আমার ভাবনা, ভাষা,
হৃদয়ের সার।

চাহিব না কারো মুখে, রাখ দুখে—রাখ সুখে,
জীবনে—মরণে !
হয় হবে পরাজয়, তাহে দেবি, নাহি ভয়,
নাহি ভাবি মনে।
শত লোকে—শত কাজে, র'য়েছে বিশ্বের মাঝে,
আমি উদাসীন ;
উন্মাদ—পাগল-পারা, কার্ প্রেমে আত্মহারা—
যাপি নিশিদিন ?

ও কার্ মঞ্জীর-রব, কানে করি অনুভব,
কোথা হ'তে আসে ?
ও কার্ অলক-গন্ধ ভাসে ওগো, মৃদুমন্দ—
সন্ধ্যার বাতাসে ?
প্রাবৃটে মেঘের কোলে, ও কার্ নিচোল দোলে
শ্যামল শোভায় ?
ও কার্ চরণ লুটে' রক্ত-কোকনদ ফুটে
শারদ উষায় ?

ভাব-ভোরে ডুবে থাকি, তোমারে হৃদয়ে রাখি,
হে আরাধ্যো, মম !
ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাই, ও করুণ মুখ চাই—
চির নিরুপম !
অভাব-সহস্র ল'য়ে জীবন যে যায় ব'য়ে,
দুঃখ নাহি গণি !
কাটে দিন অর্দ্ধাশনে, স্পর্দ্ধা দেবি, রাখি মনে
—রেখেছ এমনি !

যে দৈন্য তোমার তরে, বহিব তা অকাতরে,
গর্ব্ব ভাবি মনে !
বরহস্তে দেছ যাহা, শিরে তুলি ল'ব তাহা—
হে দেবি, যতনে।
শত-অনাদর-মাঝে, তোমারি করুণা সাজে,
—তাই নেছ ডেকে !
মলিন ললাটে মম, তিলক উজ্জ্বলতম,
—তাই দেছ এঁকে।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

সার সত্যের আলোচনা।

জাগরিত অবস্থার বিশেষত্ব।

জীবাত্মার অবস্থা অনেক; তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গোড়া-ঘ্যাসা অবস্থা তিনটি—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন এবং (৩) সুষুপ্তি। অবস্থা-শব্দের মুখ্য অর্থ অবস্থিতি। অবস্থিতি দুই-রূপ—(১) দেশে অবস্থিতি, (২) কালে অবস্থিতি। অবস্থা-শব্দের প্রচলিত ভাবার্থ—কালে অবস্থিতি। যাহা আবির্ভূত হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে এবং তৎপরে তিরোহিত হয়, তাহারই নাম অবস্থা। সাধারণত অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে, মনুষ্যের জাগরিতাবস্থার স্থিতিকাল দিবা-ভাগ; স্বপ্নাবস্থার স্থিতিকাল পূর্ব্বরাত্রি এবং শেষ-রাত্রি; সুষুপ্ত অবস্থার স্থিতি-কাল মধ্য-রাত্রি। ঐ তিনটি মৌলিক অবস্থা এক-দিকে যেমন তিন বিভিন্ন কালের তিন বিভিন্ন অবস্থা, আর এক দিকে তেমনি উহা একই অভিন্ন জীবাত্মার তিন বিভিন্ন অবস্থা। এটা যখন সুনিশ্চিত যে, ও-তিন অবস্থা একই জীবাত্মার তিন কালের তিন অবস্থা, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ও-তিন অবস্থা পরস্পরের সহিত অবি-চ্ছেদ্য যোগ-সূত্রে সংগ্রথিত। ফলেও এই-রূপ দেখা যায় যে, জাগরিতাবস্থার কর্ম্মো-দ্যম ক্রমে ক্রমে অবসান প্রাপ্ত হইয়া নিদ্রার

দিকে অল্পে অল্পে পা বাড়ায়; নিদ্রার আরামের মাত্রা ক্রমে ক্রমে অবসান প্রাপ্ত হইয়া জাগরণের দিকে অল্পে অল্পে পা বাড়ায়; পূর্ব্বরাত্রের স্বপ্ন সুষুপ্তির দিকে, এবং শেষরাত্রের স্বপ্ন জাগরণের দিকে অল্পে অল্পে পা বাড়ায়। জাগরণ এবং নিদ্রা এরূপ গায়ে গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে যে, নিদ্রার হ'ব হ'ব অবস্থার নামই জাগরণের যা'ব যা'ব অবস্থা, আর, জাগরণের যা'ব যা'ব অবস্থার নামই নিদ্রার হ'ব হ'ব অবস্থা পূর্ব্বরাত্রের জাগরণ এবং নিদ্রার সন্ধিস্থান দেখ—দেখিবে যে, তাহা জাগরণের অন্ত এবং নিদ্রার আদি; শেষরাত্রের নিদ্রা এবং জাগরণের সন্ধিস্থান দেখ—দেখিবে যে, তাহা নিদ্রার অন্ত এবং জাগরণের আদি। দুই সন্ধিস্থানই না জাগরণ, না নিদ্রা, অথবা জাগরণ এবং নিদ্রা দুইই একসঙ্গে। উভয়ের সন্ধিস্থান যখন না জাগরণ না নিদ্রা, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, নিদ্রা এবং জাগরণ স্বত কিছুই নহে—তাহা একই অভিন্ন জীবাত্মার বিভিন্ন রূপান্তর-ঘটনা মাত্র। তা ছাড়া, তিন কালের তিন অবস্থার প্রত্যেকেরই গাত্রে একই অভিন্ন অধিষ্ঠাতার নাম লেখা রহিয়াছে স্পষ্ট;—তোমার তিন অবস্থার গাত্রে তোমার নাম লেখা রহিয়াছে, আমার তিন অবস্থার গাত্রে আমার নাম লেখা রহিয়াছে, দেবদত্তের তিন অবস্থার গাত্রে দেবদত্তের নাম লেখা রহিয়াছে। তবে কি না—নীলবর্ণ আলেখ্য-পটে যেমন সোণার অক্ষর বেশী ফোটে, রূপার অক্ষর ফোটে কিন্তু তত না, লোহার অক্ষর আদবেই ফোটে না; তেমনি (রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে) সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ-পটে যখন তাহার নাম সূর্য্যরশ্মির সুবর্ণ লেখনী দিয়া সোণার অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহা জল্-জল্ করিতে থাকে; অর্দ্ধসুপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ-পটে যখন তাহার নাম চান্দ্রমসী রজত-লেখনী দিয়া রূপার অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দ্যাখায়; সুষুপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ-পটে যখন তাহার নাম নৈশ অন্ধকারের লৌহ-লেখনী দিয়া লোহার অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তার সাক্ষী—সজাগ ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, "এ জাগরিত অবস্থা আমারই জাগরিত অবস্থা"। অর্দ্ধসুপ্ত ব্যক্তি এটা যদিচ বুঝিতে পারে যে, "এ যাহা আমি দেখিতেছি, তাহা আমিই দেখিতেছি", কিন্তু, তা বই, এটা সে বুঝিতে পারে না যে, "আমি স্বপ্ন দেখিতেছি"। সুষুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞান যদিচ নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে নিলীন হইয়া প্রাণের আরাম, মনের শান্তি এবং শরীরের আরোগ্য অনুভব করে, কিন্তু তথাপি এটা সে বুঝিতে পারে না যে, "আমি নিদ্রা যাইতেছি"। অতএব এটা যেমন সুনিশ্চিত যে, তিন অবস্থা একেরই তিন অবস্থা, এটাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, তিন অবস্থা যে একেরই তিন অবস্থা, তাহা সুব্যক্ত হয় কেবল এক অবস্থায়; অপর দুই অবস্থায় তাহা অব্যক্ত থাকে। সুব্যক্ত হয় কোন্ অবস্থায়? না জাগরিত অবস্থায়। জাগরিত অবস্থাতে—কাহাকে বলে জাগরিতাবস্থা, কাহাকে

লে স্বপ্নাবস্থা, কাহাকে বলে সুষুপ্তাবস্থা, ন্তই জ্ঞাতা পুরুষের নিকটে সুব্যক্ত য়। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, াগরিতাবস্থার মধ্যেই অপর দুই অবস্থা লে তলে জানান্ দিতেছে; কেন না, জাগরিতাবস্থার মধ্যে যদি অপর দুই অবস্থার কোনো নিদর্শনই বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে জাগ্রৎকালে সে দুই অবস্থার সম্বন্ধে কোনো কথা চলিতে পারা দূরে থাকুক্, কোনো কথা উঠিতেই পারিত না।

জাগ্রৎকালের স্বপ্ন।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চিত্র-বীক্ষণ যন্ত্রের অভ্যন্তরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে একপ্রকার প্রাতিভাসিক দৃশ্য দর্শকের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। সে দৃশ্যের ভিতরের ব্যাপারটা যে কি, তাহা বিজ্ঞানের কৃপায় অনেকেই আমরা বুঝি। কিন্তু আমরা বুঝিলে কি হইবে—আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় বোঝে না। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়কে আমরা যতই বুঝাইয়া বলি না কেন—যে, "তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা"—সে কিন্তু কিছুতেই আপনার গোঁ ছাড়ে না; সে বলে, "বাঃ! স্পষ্ট আমি দেখিতেছি অভ্র-ভেদী পর্ব্বত, স্রোতস্বতী নদী, পুষ্পিত উদ্যান-কানন, হংসকারণ্ডবাকীর্ণ সরোবর, সুব্যবস্থিত রাস্তা-ঘাট-দেবালয়-প্রাসাদ-উদ্যান-পুষ্করিণী-পরিশোভিত লোকালয়—তুমি বলিতেছ কি না 'সর্ব্বৈব মিথ্যা'! তোমার চক্ষুদুটিকে তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ!" ইহার প্রত্যুত্তরে বুদ্ধি বলে যে, "তুমি দেখিতেছ এটা সত্য, কিন্তু যাহা দেখিতেছ তাহা মিথ্যা।" ইহারই নাম হর-পার্ব্বতীর কন্দল। হাজার হো'ক্ বুদ্ধি অবলা স্ত্রী; মন ষণ্ডামার্ক-গোঁয়ার। মনের গায়ের জোরের কাছে বুদ্ধি আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বুদ্ধি বেচারী নিতান্তই দায়ে পড়িয়া, মন যাহা বলিতেছে, তাহাই ঘাড় পাতিয়া লয়। বুদ্ধিমতী বুদ্ধি বলে, "সত্যি! কেমন দেখ বাগান! দিব্যি সোণালি রঙের চাঁপাফুল ফুটে' র'য়েচে! ঐ ফুলটি এনে দিয়ে আমাকে বাঁচাও! আমার বড্ড সাধ গিয়েছে—ঐ ফুলটিকে তুল্ করে কাণে পরি।" মন ফুল তুলিতে গিয়া দেখে যে, সে ফুলও নাই, সে উদ্যানও নাই, সবই ভোঁ ভাঁ! মন তখন মনের খেদে বলে—"সাধে কি শাস্ত্রে লেখে 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী'! তাহার দৌড়কে বলিহারি! কঠোর পরীক্ষার নিকট হইতে কাণমলা খাইয়া সবে-মাত্র এখন আমার এইরূপ ধারণা হইতেছে যে, বুঝি বা সর্ব্বৈব মিথ্যা; বুদ্ধির কিন্তু এক-মুহূর্ত্তও ত্বর সহিল না—প্রথম উদ্যমেই বলিয়া বসিল 'সর্ব্বৈব মিথ্যা'! কালিদাস ঠিক্ই বলিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি অশিক্ষিত পটু অর্থাৎ না পড়িয়া পণ্ডিত!" প্রকৃত কথা এই যে, বুদ্ধি প্রথম উদ্যমেই ও-কথা বলে নাই; বুদ্ধি গবাক্ষের দ্বারে উঁকি দিয়া মনকে অনেকবার ঐরূপ প্রতারিত হইতে দেখিয়াছে; আর, সেই ভূয়োদর্শনের ফলেই জানিতে পারিয়াছে যে, মন যাহা দেখিতেছে—সবই ফাঁকি। মনের ভ্রান্তিও এক-

প্রকার ভূয়োদর্শনের ফল। কিন্তু মনের ভূয়োদর্শন প্রকৃত প্রস্তাবে ভূয়োদর্শন নহে, তাহা একপ্রকার অন্ধ সংস্কার। এ সম্বন্ধে পরে অনেক কথা বলিবার আছে; এখানে এ যাহা স্বল্প ইঙ্গিত করিলাম—এই অবধিই ভাল। বর্ত্তমান স্থলে অন্ধ ভূয়োদর্শনের চক্রে পড়িয়া মন কিরূপে বিভ্রান্ত হয়, তাহার একটা নমুনা দেখাই—তাহা হইলেই মনের বিভ্রান্তি কোন্ পথ দিয়া যাতায়াত করে, তাহার কতকটা ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারিবে।

দর্শক যখন সম্মুখবর্ত্তী দৃষ্টিক্ষেত্রে চক্ষু নিবিষ্ট করে, তখন সেই দৃষ্টিক্ষেত্রের ঈষৎ বিভিন্ন দুই দিকের ঈষৎ বিভিন্ন দুইখানি ছবি দর্শকের দুই নেত্রে নিপতিত হয়। ঐ-প্রকার ছবি-যুগলের ঈষৎ আকার-ভেদ, উভয়ের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু-সকলের হ্রস্বদীর্ঘতার আপেক্ষিক পরিমাণ, * এবং তাহাদের সঙ্গাশ্রিত ছায়াতপের প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি-ঘটিত কতকগুলি চিহ্নের সহিত উক্ত বস্তুসকলের দূরত্ব-নৈকট্যের ভান ভূয়োদর্শনের সংস্কার-সূত্রে দর্শকের মনোমধ্যে ক্রমাগতই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর রূপে বাঁধা পড়িয়া যাইতে থাকে। ঐ সকল সাঙ্কেতিক চিহ্নের কোন্-কোন্-গুলি কোন্ কোন্ বস্তুর গাত্রে কি-কি-ভাবে কি-কি-পরিমাণে বিন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা দর্শকের চক্ষে পড়িবামাত্রই দর্শকের মনে ধ্রুব প্রতীতি হয় যে, অমুক বস্তু বেশী দূরে রহিয়াছে, অমুক বস্তু কম দূরে রহিয়াছে, অমুক বস্তু খুব নিকটে রহিয়াছে; আর দর্শকের মনে ঐ যাহা প্রতীতি হয়, দর্শক তাহাই চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করে। দৃশ্য-দর্শন-কালে একই দৃশ্যের ঈষৎ বিভিন্ন দুই দিকের যেরূপ দুইখানি ছবি দর্শকের দুই চক্ষে সচরাচর নিপতিত হয়, চিত্রবীক্ষণ যন্ত্রের ছবি ঠিক্ তেম্নিতর দুইখানি ছবি; অর্থাৎ তাহা একই দৃশ্যের ঈষৎ বিভিন্ন দুই দিকের দুইখানি ছবি; এই জন্য দর্শক সেই দুই ছবির ঈষৎ আকার-ভেদ, উভয়ের অন্তর্গত চিত্রিত বস্তুসকলের হ্রস্বদীর্ঘতার আপেক্ষিক পরিমাণ, এবং তাহাদের সঙ্গাশ্রিত ছায়াতপের প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি-ঘটিত বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিবামাত্র তদনুসারে সেই সকল বস্তুর বিশেষ বিশেষ দূরত্ব-নৈকট্য অবধারণ করিতে অগত্যা বাধ্য হয়; আর, সেইরূপে বাধ্য হইয়া আপনার চক্ষের সম্মুখে একটা বৃহৎ দৃশ্য-ব্যাপার উদ্ভাবন করে—আপনিই উদ্ভাবন করে, অথচ এটা সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না যে, "আমি উদ্ভাবন করিতেছি"। এই কারণ-বশত দর্শকের মনোমধ্যে এইরূপ একটা দুরপনেয় ভ্রম জন্মে যে, যে যে বস্তু চক্ষের সম্মুখে যে যে স্থানে প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিকই যেন সেই সেই বস্তু সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করি-

* ইহার পরিবর্ত্তে "ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসকলের গাত্র-নিক্ষিপ্ত রশ্মি-চক্ষুর কোণাগ্রের সঙ্কোচোতের তারতম্য" বলিলে কথাটা বৈজ্ঞানিক হইত। কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে, আঁটাসাঁটা বৈজ্ঞানিক পরিচ্ছদ অপেক্ষা, লৌকিক জ্ঞানের আটপৌরে ধুতিচাদরই বর্ত্তমান প্রবন্ধের গাত্রে মানায় ভাল।

তেছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, স্বপ্নাবস্থায় দর্শকের মনের চিরাভ্যস্ত সংস্কার যেমন বুদ্ধির অসাক্ষাতে কার্য্য করিয়া নানাপ্রকার দৃশ্য উদ্ভাবন করে, জাগরিতাবস্থাতেও অবিকল তাহাই করে; প্রভেদ কেবল এই যে, স্বপ্নাবস্থায় চিরাভ্যস্ত সংস্কার অবিতর্কিত-ভাবে যাহা প্রাণ চায়, তাহাই উদ্ভাবন করে, (এ একপ্রকার দিনে ডাকাতি); জাগরিতাবস্থায় মনোরাজ্যের স্বপ্ন বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া পুরবাসীদিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে।

জাগ্রৎকালের সুষুপ্তি।

নিদ্রাকালে আমরা যেরূপ আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করি, এবং তজ্জনিত স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করি, জাগ্রৎকালেও সেইরূপ করিয়া থাকি। জাগ্রৎকালে দৈবাৎ কখনো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচালনা-পথে কফাদির বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, তবেই যা সে-দুই কার্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে, নহিলে ' নিদ্রাকালেও যেমন জাগ্রৎকালেও তেমনি—সে-দুই কার্য্য আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে স্বভাব-গুণে আপনা-আপনি চলিতে থাকে। ঘুমানো আর কিছুই না—প্রকৃতির অব্যক্ত সত্তাতে হাত-পা ছড়াইয়া গা ভাসাইয়া দেওয়া। যখন নৌকা পা'ল পাইয়াছে—এবং অনুকূল স্রোত বহিতেছে—দাঁড়ি তখন ঘুমন্ত-ভাবে দাঁড় টানে। নৌকা যখন বেশ্ পা'ল পাইয়াছে, কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে চলিতেছে, দাঁড়ি তখন অর্দ্ধসুপ্ত-ভাবে দাঁড় টানে। যখন বায়ু এবং স্রোত দুইই প্রতিকূলে বহিতেছে, তখনই দাঁড়ি পুরামাত্রা জাগ্রত-ভাবে দাঁড় টানে। তেমনি সচরাচর আমরা ঘুমন্ত-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করি; তা বই, যখন আমরা মাত্রাতীত শারীরিক পরিশ্রম করিয়া হাঁপাইতে থাকি, তখনই কেবল আমরা জাগ্রত-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করিতে থাকি। সচরাচর আমাদের প্রাণ আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে আমাদের-হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করে;—প্রাণের এইরূপ অব্যক্ত স্ফূর্ত্তির নামই (অর্থাৎ অচেতন স্ফূর্ত্তির নামই) সুপ্তি। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই জ্ঞান প্রাণের হাতের কাজ আপনার হাতে টানিয়া লয়; তাহা যখন করে, তখন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সুপ্তি ভাঙিয়া যায়। তবেই হইতেছে যে, জাগরিতাবস্থার মধ্যেও সুষুপ্তি তলে তলে আপনার রাজ্য চালায়; কোন্ রাজ্য? না প্রাণরাজ্য। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎকালে মনোরাজ্যের স্বপ্ন বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া স্বকার্য্য সাধন করে; এক্ষণে অধিকন্তু দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাণরাজ্যের সুষুপ্তি মনোরাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া অব্যক্ত সত্তার তামস পরিচ্ছদ বয়ন করিতে থাকে। মোট কথা এই যে, জাগরণের কার্য্যক্ষেত্রে—উপরের কর্ম্মচারী উপরের কার্য্য করে, নিচের কর্ম্মচারী নিচের কার্য্য করে,

মধ্যের কর্ম্মচারী মধ্যের কার্য্য করে; তা বই, কেহই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না।

মনে কর, আমি একটা হাঁড়িতে আধ-সের দুগ্ধ, এক-সের ঘৃত এবং দুই-কুন্‌কে চাউল নিক্ষেপ করিয়া সেই তিন-দ্রব্য-সংবলিত হাঁড়িটা ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলাম। কিয়ৎপরে এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখিয়া আইস তো—উহাতে কি আছে।" সে বলিল, "ঘৃত আছে।" আমি বলিলাম, "উহাতে আর কোনো সামগ্রী তো নাই?" সে বলিল, "আর তো কিছুই দেখিতে পাইলাম না।" সে দেখিতে না পা'ক্‌--আমি কিন্তু দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, ঐ হাঁড়িটার উপরি-স্তরে ঘৃত রহিয়াছে, মধ্যস্তরে দুগ্ধ রহিয়াছে, নিম্নস্তরে তণ্ডুল রহিয়াছে। তেমনি, আর কেহ দেখিতে পা'ক্ বা না পা'ক্—যে দেখিতেছে, সে দেখিতেছে যে, জাগরিতাবস্থার উপরি-স্তরে বুদ্ধি ব্যাবহারিক সত্তাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে; মধ্যস্তরে মন প্রাতিভাসিক সত্তাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে; নিম্নস্তরে প্রাণ অব্যক্ত সত্তাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে। জাগরিতাবস্থা এবং স্বপ্নাবস্থার মধ্যে প্রধান একটি প্রভেদ এই যে, প্রাতিভাসিক সত্তা জাগরিতাবস্থার মধ্যস্তরে চাপা থাকে, স্বপ্নাবস্থায় তাহা উপরি-স্তরে ভাসিয়া ওঠে। তেমনি আবার, জাগরিতাবস্থা এবং সুষুপ্ত অবস্থার মধ্যে প্রধান একটি প্রভেদ এই যে, অব্যক্ত সত্তা জাগরিতাবস্থার নিম্নস্তরে চাপা থাকে, সুষুপ্ত অবস্থায় তাহা উপরি-স্তরে ভাসিয়া ওঠে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত একই সীধা রাস্তা অবলম্বন করিয়া পদব্রজে সটান চলিয়া আসিয়াছি। এখন যে স্থানটিতে পৌঁছিয়াছি—এ স্থানটি অনেকগুলা পথের সঙ্গম-স্থান; তাহার মধ্যে কোন্ পথ আপাতত অবলম্বনীয়, তাহা বিবেচনার বিষয়। এই সঙ্গমস্থানটিতে পদার্পণ করিবামাত্র আলোচককে একটু থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে হইতেছে। এই স্থানটির নানা-দিক্ হইতে নানা-ভাবের ত্রিক আসিয়া যখন-তখন আলোচকের সম্মুখে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে; সময়ে সময়ে সেগুলাকে সাম্‌লানো ভার হইয়া পড়ে। আশ্চর্য্য এই যে, যেমন 'সব শেয়ানের একই রায়', তেমনি সব ত্রিকেরই ভিতরের কথা একই ধরণের। একটি ত্রিকের চাবি পাইলেই তাহা দিয়া সব ত্রিকেরই ডালা খোলা যায়। আলোচিতব্য ত্রিকগুলি নিম্নে পংক্তি সাজাইয়া প্রদর্শন করা হইল।

ত্রিক-সপ্তক।

(১)	প্রাণ	মন	বুদ্ধি।
(২)	উদ্ভিদ্	জন্তু	মনুষ্য।
(৩)	সুষুপ্তি	স্বপ্ন	জাগ্রৎ।
(৪)	প্রলয়	সৃষ্টি	স্থিতি।
(৫)	অব্যক্ত সত্তা	প্রাতিভাসিক সত্তা।	ব্যাবহারিক সত্তা
(৬)	ভোগ	কর্ম্ম	জ্ঞান।
(৭)	তম	রজ	সত্ত্ব।

এই পংক্তি-সপ্তকের মধ্যে মোটামুটি যে একপ্রকার সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা তো দেখিতে পাওয়া যাইতেইছে; তা ছাড়া তাহার মধ্যে অনেক-

নিগূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে-গুলির ভিতরের সমাচার সংগ্রহ করিতে হইলে, নিগূঢ়তত্ত্বের সমুদ্রে ডুব দিতে ভয় করিলে চলিবে না। বারান্তরে চোক-কাণ বুজিয়া ডুব দেওয়া যাইবে—এবারে এইখানেই ইতি করা যাউক্।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চোখের বালি

(২১)

ইতিমধ্যে আরও এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল।—

"তুমি আমার চিঠির উত্তর দিলে না? ভালই করিয়াছ! ঠিক কথা ত লেখা-যায় না, তোমার যা' জবাব, সে আমি মনে মনে বুঝিয়া লইলাম। ভক্ত যখন তাহার দেবতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের কথায় তাহার উত্তর দেন? দুখিনীর বিল্বপত্রখানি চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে।

"কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না হৃদয়দেব! তুমি বর দাও বা না দাও, চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই! তাই আজিও এই দু'ছত্র চিঠি লিখিলাম—হে আমার পাষাণ-ঠাকুর, তুমি অবিচলিত হইয়া থাক!"—

মহেন্দ্র আবার চিঠির উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশাকে লিখিতে গিয়া বিনোদিনীর উত্তর কলমের মুখে আপনি আসিয়া পড়ে। ঢাকিয়া লুকাইয়া কৌশল করিয়া লিখিতে পারে না। অনেক-গুলি ছিঁড়িয়া রাত্রের অনেক প্রহর কাটাইয়া একটা যদি বা লিখিল, সেটা লেফাফায় পুরিয়া উপরে আশার নাম লিখিবার সময় হঠাৎ তাহার পিঠে যেন কাহার চাবুক পড়িল—কে যেন বলিল, 'পাষণ্ড, বিশ্বস্ত বালিকার প্রতি এমনি করিয়া প্রতারণা!' চিঠি মহেন্দ্র সহস্র টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং বাকি রাতটা টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া নিজেকে যেন নিজের দৃষ্টি হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

তৃতীয় পত্র।—"যে একেবারেই অভিমান করিতে জানে না, সে কি ভালবাসে? নিজের ভালবাসাকে যদি অনাদর-অপমান

হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারি, তবে সে ভালবাসা তোমাকে দিব কেমন করিয়া ?

"তোমার মন হয় ত ঠিক বুঝি নাই, তাই এত সাহস করিয়াছি। তাই, যখন ত্যাগ করিয়া গেলে, তখনো নিজে অগ্রসর হইয়া চিঠি লিখিয়াছি ;—যখন চুপ করিয়া ছিলে, তখনো মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি ! কিন্তু তোমাকে যদি ভুল করিয়া থাকি, সে কি আমারই দোষ ? একবার সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত সব কথা মনে করিয়া দেখ দেখি, যাহা বুঝিয়াছিলাম, সে কি তুমিই বোঝাও নাই ?

"সে যাই হোক্, ভুল হোক্ সত্য হোক্, যাহা লিখিয়াছি, সে আর মুছিবে না, যাহা দিয়াছি, সে আর ফিরাইতে পারিব না, এই আক্ষেপ ! ছি ছি, এমন লজ্জাও নারীর ভাগ্যে ঘটে ! কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ভাল যে বাসে, সে নিজের ভালবাসাকে বারবার অপদস্থ করিতে পারে ! যদি আমার চিঠি না চাও ত থাক্—যদি উত্তর না লিখিবে, তবে এই পর্য্যন্ত !"

ইহার পর মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। মনে করিল, অত্যন্ত রাগ করিয়াই ঘরে ফিরিয়া যাইতেছি। বিনোদিনী মনে করে, তাহাকে ভুলিবার জন্যই ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছি ! বিনোদিনীর সেই স্পর্দ্ধাকে হাতে হাতে অপ্রমাণ করিবার জন্যই তখনি মহেন্দ্র ঘরে ফিরিবার সঙ্কল্প করিল।

এমন সময় বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। বিহারীকে দেখিবামাত্র মহেন্দ্রের ভিতরের পুলক যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। ইতি-পূর্ব্বে নানা সন্দেহে ভিতরে ভিতরে বিহারীর প্রতি তাহার ঈর্ষা জন্মিতেছিল, উভয়ের বন্ধুত্ব ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। পত্রপাঠের পর আজ সমস্ত ঈর্ষাভার বিসর্জ্জন দিয়া বিহারীকে সে অতিরিক্ত আবেগের সহিত আহ্বান করিয়া লইল। চৌকি হইতে উঠিয়া, বিহারীর পিঠে চাপড় মারিয়া, তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে একটা কেদারার উপরে টানিয়া বসাইয়া দিল।

কিন্তু বিহারীর মুখ আজ বিমর্ষ। মহেন্দ্র ভাবিল, বেচারা নিশ্চয় ইতিমধ্যে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে এবং সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"বিহারি, এর মধ্যে আমাদের ওখানে গিয়াছিলে ?"

বিহারী গম্ভীরমুখে কহিল, "এখনি সেখান হইতে আসিতেছি।"

মহেন্দ্র বিহারীর বেদনা কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু কৌতুক বোধ করিল। মনে মনে কহিল—"হতভাগ্য বিহারী ! স্ত্রীলোকের ভালবাসা হইতে বেচারা একেবারে বঞ্চিত।" বলিয়া নিজের বুকের পকেটের কাছটায় একবার হাত দিয়া চাপ দিল—ভিতর হইতে তিনটে চিঠি খড়্‌খড়্ করিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"সবাইকে কেমন দেখিলে ?"

বিহারী তাহার উত্তর না করিয়া কহিল—"বাড়ী ছাড়িয়া তুমি যে এখানে ?"

মহেন্দ্র কহিল—"আজকাল প্রায় নাইট্-ডিউটি পড়ে—বাড়ীতে অসুবিধা হয়।"

বিহারী কহিল, "এর আগেও ত নাইট্-

ডিউটি পড়িয়াছে, কিন্তু তোমাকে ত বাড়ী ছাড়িতে দেখি নাই।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—"মনে কোন সন্দেহ জন্মিয়াছে না কি?"

বিহারী কহিল—"না, ঠাট্টা নয়, এখনি বাড়ী চল!"

মহেন্দ্র বাড়ী ফিরিবার জন্য উদ্যত হইয়াই ছিল, বিহারীর অনুরোধ শুনিয়া সে হঠাৎ নিজেকে ভুলাইল, যেন বাড়ী যাইবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। কহিল, "সে কি হয় বিহারি! তা হ'লে আমার বৎসরটাই নষ্ট হইবে!"

বিহারী কহিল, "দেখ মহিন্‌দা, তোমাকে আমি এতটুকু বয়স হইতে দেখিতেছি, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমি অন্যায় করিতেছ!"

মহেন্দ্র। কার 'পরে অন্যায় করিতেছি জজ্‌সাহেব?

বিহারী রাগ করিয়া বলিল, "তুমি যে চিরকাল হৃদয়ের বড়াই করিয়া আসিয়াছ, তোমার হৃদয় গেল কোথায় মহিন্‌দা!"

মহেন্দ্র। সম্প্রতি কালেজের হাঁস-পাতালে!

বিহারী। থাম মহেন্দ্র, থাম! তুমি এখানে আমার সঙ্গে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া কথা কহিতেছ, সেখানে আশা তোমার বাহিরের ঘরে, অন্দরের ঘরে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

আশার কান্নার কথা শুনিয়া হঠাৎ মহেন্দ্রের মন একটা প্রতিঘাত পাইল। জগতে আর যে কাহারো সুখদুঃখ আছে, সে কথা তাহার নূতন নেশার কাছে স্থান পায় নাই। হঠাৎ চমক লাগিল, জিজ্ঞাসা করিল—"আশা কাঁদিতেছে কি জন্য?"

বিহারী বিরক্ত হইয়া কহিল—"সে কথা তুমি জান না, আমি জানি?"

মহেন্দ্র। তোমার মহিন্‌দা সর্ব্বজ্ঞ নয় বলিয়া যদি রাগ করিতেই হয় ত মহিন্‌দার সৃষ্টিকর্ত্তার উপর রাগ কর!

তখন বিহারী যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আগাগোড়া বলিল। বলিতে বলিতে বিনোদিনীর বক্ষোলগ্ন আশার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া বিহারীর প্রায় কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

বিহারীর এই প্রবল আবেগ দেখিয়া মহেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মহেন্দ্র জানিত, বিহারীর হৃদয়ের বালাই নাই—এ উপসর্গ কবে জুটিল? যেদিন কুমারী আশাকে দেখিতে গিয়াছিল, সেই দিন হইতে না কি? বেচারা বিহারী!—মহেন্দ্র মনে মনে তাহাকে বেচারা বলিল বটে, কিন্তু দুঃখবোধ না করিয়া বরঞ্চ একটু আমোদ পাইল। আশার মনটি একান্তভাবে যে কোন্ দিকে, তাহা মহেন্দ্র নিশ্চয় জানিত। অন্য লোকের কাছে যাহারা বাঞ্ছার ধন, কিন্তু আয়ত্তের অতীত, আমার কাছে তাহারা চিরদিনের জন্য আপনি ধরা দিয়াছে, ইহাতে মহেন্দ্র বক্ষের মধ্যে একটা গর্ব্বের স্ফীতি অনুভব করিল।

তার পরে বিহারীর বর্ণিত সমস্ত দৃশ্যটি সে কল্পনাচক্ষে দেখিতে লাগিল। আশা কাঁদিতেছে, বিনোদিনী তাহাকে বক্ষে লইয়া সান্ত্বনা করিতেছে! এ সান্ত্বনা কি মায়াবিনীর ছলনা, না আমি চিঠি পড়িয়া

যাহা বুঝিয়াছি, তাহা আগাগোড়া ভুল? নারীর হৃদয়রহস্য বুঝিবার জো নাই—মহেন্দ্র মনে মনে কহিল, "আমার বুঝিয়া কাজ নাই; যাহাকে বুঝিয়াছি, সেই আমার ভাল। আমার আশার জন্যে অন্য লোকে পাগল, সেই আশা আমারই জন্যে আমার শূন্যঘরের জিনিষপত্রের মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।" মহেন্দ্র বিহারীকে কহিল "আচ্ছা, চল, যাওয়া যাক্! তবে একটা গাড়ি ডাক!"

(২২)

মহেন্দ্র ঘরে ফিরিয়া আসিবামাত্র তাহার মুখ দেখিয়াই আশার মনের সমস্ত সংশয় ক্ষণকালের কুয়াশার মত এক মুহূর্ত্তেই কাটিয়া গেল। নিজের চিঠির কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মহেন্দ্রের সাম্‌নে সে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না! মহেন্দ্র তাহার উপরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—"এমন অপবাদ দিয়া চিঠিগুলা লিখিলে কি করিয়া?"

বলিয়া পকেট হইতে বহুবারপঠিত সেই চিঠি তিনখানি বাহির করিল। আশা ব্যাকুল হইয়া কহিল—"তোমার পায়ে পড়ি, ও চিঠিগুলো ছিঁড়িয়া ফেল।"—বলিয়া মহেন্দ্রর হাত হইতে চিঠিগুলা লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র তাহাকে নিরস্ত করিয়া সেগুলি পকেটে পূরিল। কহিল—"আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে গেলাম, আর তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে না? আমাকে সন্দেহ করিলে?"

আশা ছলছল চোখে কহিল—"এবারকার মত আমাকে মাপ কর! এমন আর কখনই হইবে না।"

মহেন্দ্র কহিল—"কখনো না?"

আশা কহিল—"কখনো না!"

তখন মহেন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। আশা কহিল—"চিঠিগুলা দাও, ছিঁড়িয়া ফেলি!"

মহেন্দ্র কহিল—"না, ও থাক্!"

আশা সবিনয়ে মনে করিল, "আমার শাস্তিস্বরূপ এ চিঠিগুলি উনি রাখিলেন!"

এই চিঠির ব্যাপারে বিনোদিনীর উপর আশার মনটা একটু যেন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর আগমনবার্ত্তা লইয়া সে সখীর কাছে আনন্দ করিতে গেল না—বরঞ্চ বিনোদিনীকে একটু যেন এড়াইয়া গেল। বিনোদিনী সেটুকু লক্ষ্য করিল এবং কাজের ছল করিয়া একেবারে দূরে রহিল!

মহেন্দ্র ভাবিল—"এ ত বড় অদ্ভুত! আমি ভাবিয়াছিলাম, এবার বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়াই দেখা যাইবে—উল্টা হইল? তবে সে চিঠিগুলার অর্থ কি?"

নারীহৃদয়ের রহস্য বুঝিবার কোন্ চেষ্টা করিবে না বলিয়াই মহেন্দ্র মনকে দৃঢ় করিয়াছিল—ভাবিয়াছিল, "বিনোদিনী যদি কাছে আসিবার চেষ্টা করে, তবু আমি দূরে থাকিব।" আজ সে মনে মনে কহিল "না এ ত ঠিক হইতেছে না! যেন আমাদের মধ্যে সত্যই কি একটা বিকার ঘটিয়াছে! বিনোদিনীর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্ত্তা আমোদপ্রমোদ করিয়া এই সংশয়াচ্ছন্ন গুমটের ভাবটা দূর করিয়া দেওয়া উচিত।"

আশাকে মহেন্দ্র কহিল—"দেখিতেছি, আমিই তোমার সখীর চোখের বালি হই-

লাম। আজকাল তাঁহার আর দেখাই পাওয়া যায় না!"

আশা উদাসীনভাবে উত্তর করিল—"কে জানে, তাহার কি হইয়াছে!"

এদিকে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কাঁদোকাঁদো হইয়া কহিলেন—"বিপিনের বৌকে আর ত ধরিয়া রাখা যায় না!"

মহেন্দ্র চকিতভাব সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল—"কেন মা?"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"কি জানি বাছা, সে ত এবার বাড়ী যাইবার জন্য নিতান্তই ধরিয়া পড়িয়াছে! তুই ত কাহাকে খাতির করিতে জানিস্ না! ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়ীতে আছে, উহাকে আপনার লোকের মত আদরযত্ন না করিলে থাকিবে কেন?"

বিনোদিনী শোবার ঘরে বসিয়া বিছানার চাদর সেলাই করিতেছিল। মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"বালি!"

বিনোদিনী সংযত হইয়া বসিল। কহিল—"কি মহেন্দ্রবাবু!"

মহেন্দ্র কহিল—"কি সর্ব্বনাশ! মহেন্দ্র আবার বাবু হইলেন কবে?"

বিনোদিনী আবার চাদর সেলাইয়ের দিকে নতচক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল—"তবে কি বলিয়া ডাকিব?"

মহেন্দ্র কহিল—"তোমার সখীকে যা বল—চোখের বালি।"

বিনোদিনী অন্য দিনের মত ঠাট্টা করিয়া তাহার কোন উত্তর দিল না—সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল—"ওটা বুঝি সত্যকার সম্বন্ধ হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না!"

বিনোদিনী একটু থামিয়া দাঁত দিয়া সেলাইয়ের প্রান্ত হইতে খানিকটা বাড়্‌তি সূতা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল—"কি জানি, সে আপনি জানেন!"

বলিয়াই তাহার সর্ব্বপ্রকার উত্তর চাপা দিয়া গম্ভীরমুখে কহিল—"কলেজ হইতে হঠাৎ ফেরা হইল যে!"

মহেন্দ্র কহিল—"কেবল মড়া কাটিয়া আর কতদিন চলিবে?"

আবার বিনোদিনী দন্ত দিয়া সূতা ছেদন করিল এবং মুখ না তুলিয়াই কহিল—"এখন বুঝি জীয়ন্তের আবশ্যক?"

মহেন্দ্র স্থির করিয়াছিল, আজ বিনোদিনীর সঙ্গে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক্ ভাবে হাস্যপরিহাস উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া আসর জমাইয়া তুলিবে। কিন্তু এমনি গাম্ভীর্য্যের ভার তাহার উপর চাপিয়া আসিল যে, লঘু জবাব প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুখের কাছে জোগাইল না। বিনোদিনী আজ কেমন-এক-রকম কঠিন দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে দেখিয়া, মহেন্দ্রের মনটা সবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ব্যবধানটাকে কোন একটা নাড়া দিয়া ভূমিসাৎ করিতে ইচ্ছা হইল। বিনোদিনীর শেষ বাক্যঘাতের প্রতিঘাত না দিয়া, হঠাৎ তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল—"তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ কেন? কোনো অপরাধ করিয়াছি?"

বিনোদিনী তখন একটু সরিয়া সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া দুই বিশাল উজ্জ্বল চক্ষু

মহেন্দ্রের মুখের উপর স্থির রাখিয়া কহিল—"কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ত সকলেরই আছে। আপনি যে সকল ছাড়িয়া কলেজের বাসায় যান, সে কি কাহারো অপরাধে? আমারো যাইতে হইবে না? আমারো কর্ত্তব্য নাই?"

মহেন্দ্র ভাল উত্তর অনেক ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার এমন কি কর্ত্তব্য যে না গেলেই নয়?"

বিনোদিনী অত্যন্ত সাবধানে সূচিতে সূতা পরাইতে পরাইতে কহিল—"কর্ত্তব্য আছে কি না, সে নিজের মনই জানে! আপনার কাছে তাহার আর কি তালিকা দিব?"

মহেন্দ্র গম্ভীর চিন্তিতমুখে জানলার বাহিরে একটা সুদূর নারিকেল-গাছের মাথার দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনী নিঃশব্দে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। ঘরে ছুঁচটি পড়িলে শব্দ শুনা যায়, এম্নি হইল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র হঠাৎ কথা কহিল। অকস্মাৎ নিঃশব্দতাভঙ্গে বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—তাহার হাতে ছুঁচ ফুটিয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল—"তোমাকে কোন অনুনয়-বিনয়েই রাখা যাইবে না?"

বিনোদিনী তাহার আহত অঙ্গুলি হইতে রক্তবিন্দু শুষিয়া লইয়া কহিল—"কিসের জন্য এত অনুনয়-বিনয়? আমি থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই কি? আপনার তাহাতে কি আসে যায়?"

বলিতে বলিতে গলাটা যেন ভারি হইয়া আসিল; বিনোদিনী অত্যন্ত মাথা নীচু করিয়া সেলাইয়ের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিল—মনে হইল, হয় ত বা তাহার নত-নেত্রের পল্লবপ্রান্তে একটুখানি জলের রেখা দিয়াছে! মাঘের অপরাহ্ণ তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইবার উপক্রম করিতেছিল।

মহেন্দ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ সজলস্বরে কহিল—"যদি তাহাতে আমার আসে যায়, তবে তুমি থাকিবে?"

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বসিল। মহেন্দ্রের চমক ভাঙিয়া গেল। নিজের শেষ কথাটা ভীষণ ব্যঙ্গের মত তাহার নিজের কানে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অপরাধী জিহ্বাকে মহেন্দ্র দন্ত দ্বারা দংশন করিল—তাহার পর হইতে রসনা নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

এমন সময় এই নৈঃশব্দ্যপরিপূর্ণ ঘরের মধ্যে আশা প্রবেশ করিল। বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ যেন পূর্ব্ব কথোপকথনের অনুবৃত্তিস্বরূপে হাসিয়া মহেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল—"আমার গুমর তোমরা যখন এত বাড়াইলে, তখন আমারও কর্ত্তব্য, তোমাদের একটা কথা রাখা। যতক্ষণ না বিদায় দিবে, ততক্ষণ রহিলাম।"

আশা স্বামীর কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া সখীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। কহিল—"তবে এই কথা রহিল। তা হইলে তিন সত্য কর, যতক্ষণ না [illegible] দিব, ততক্ষণ থাকিবে, থাকিবে, থাকিবে।"

বিনোদিনী তিনবার স্বীকার করিল। আশা কহিল, "ভাই চোখের বালি, সেই

যদি রহিলেই, তবে এত করিয়া সাধাইলে কেন ? শেষকালে আমার স্বামীর কাছে ত হার মানিতে হইল ?"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, আমি হার মানিয়াছি, না তোমাকে হার মানাইয়াছি ?"

মহেন্দ্র এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ছিল ; মনে হইতেছিল, তাহার অপরাধে যেন সমস্ত ঘর ভরিয়া রহিয়াছে, লাঞ্ছনা যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া ! আশার সঙ্গে কেমন করিয়া সে প্রসন্নমুখে স্বাভাবিকভাবে কথা কহিবে ? একমুহূর্ত্তের মধ্যে কেমন করিয়া সে আপনার বীভৎস অসংযমকে সহাস্য চটুলতায় পরিণত করিবে ? এই পৈশাচিক ইন্দ্রজাল তাহার আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল। সে গম্ভীরমুখে কহিল— আমারি ত হার হইয়াছে।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরেই আবার মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিনোদিনীকে কহিল "আমাকে মাপ কর।"

বিনোদিনী কহিল—"অপরাধ কি করেছ ঠাকুরপো !"

মহেন্দ্র কহিল—"তোমাকে জোর করিয়া এখানে ধরিয়া রাখিবার অধিকার আমাদের নাই !"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল—"জোর কই করিলে, তাহা ত দেখিলাম না ! ভাল বাসিয়া ভালমুখেই ত থাকিতে বলিলে। তাহাকে কি জোর বলে ? বল ত ভাই চোখের বালি, গায়ের জোর আর ভালবাসা কি একই হইল ?"

আশা তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া কহিল, "কখনই না !"

বিনোদিনী কহিল—"ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছা আমি থাকি, আমি গেলে তোমার কষ্ট হইবে, সে ত আমার সৌভাগ্য ! কি বল ভাই চোখের বালি, সংসারে এমন সুহৃদ্ কয়জন পাওয়া যায় ? তেমন ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী, অদৃষ্টগুণে যদিই পাওয়া যায়, তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইব কেন ?"

আশা তাহার স্বামীকে অপদস্থভাবে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া ঈষৎ ব্যথিতচিত্তে কহিল—"তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে ভাই ? আমার স্বামী ত হার মানিয়াছেন, এখন তুমি একটু থাম !"

মহেন্দ্র আবার দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইল। তখন রাজ[illegible] [illegible] গল্প করিয়া বিহা[illegible] [illegible]ন্দ্রের সন্ধানে আসিতেছিল। ম[illegible] [illegible]হাকে দ্বারের সম্মুখে দেখিতে পাই[illegible] [illegible]লিয়া উঠিল—"ভাই বিহারি, আম[illegible] [illegible]ত পাষণ্ড আর জগতে নাই।" এমন বেগে কহিল, সে কথা ঘরের মধ্যে গিয়া পৌঁছিল।

ঘরের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ আহ্বান আসিল—"বিহারি-ঠাকুরপো।"

বিহারী কহিল—"একটু বাদে আসচি বিনোদ-বোঠা'ণ।"

বিনোদিনী কহিল—"একবার শুনেই যাও না।"

বিহারী ঘরে ঢুকিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে একবার আশার দিকে চাহিল—ঘোমটার মধ্য হইতে আশার মুখ যতটুকু দেখিতে

পাইল, সেখানে বিষাদ বা বেদনার কোন চিহ্নই ত দেখা গেল না। আশা উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, বিনোদিনী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল—কহিল, "আচ্ছা বিহারি-ঠাকুরপো, আমার চোখের বালির সঙ্গে কি তোমার সতীন্-সম্পর্ক? তোমাকে দেখ্‌লেই ও পালাতে চায় কেন?"

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বিনোদিনীকে তাড়না করিল।

বিহারী হাসিয়া উত্তর করিল—"বিধাতা আমাকে তেমন সুদৃশ্য করিয়া গড়েন নাই বলিয়া।"

বিনোদিনী। দেখ্‌চিস্ ভাই বালি, বিহারি-ঠাকুরপো বাঁচাইয়া কথা বলিতে জানেন—তোর রুচিকে দোষ না দিয়া বিধাতাকেই দোষ দিলেন। লক্ষ্মণটির মত [illegible] সুন্দ[illegible] পাইয়াও তাহাকে আদর করিতে [illegible] না—তোরই কপাল মন্দ!

বিহারী। [illegible]র যদি তাহাতে দয়া হয় বিনোদ-বো[illegible] তবে আর আমার আক্ষেপ কিসের?

বিনোদিনী। সমুদ্র ত পড়িয়া আছে, তবু মেঘের ধারা নহিলে চাতকের তৃষ্ণা মেটে না কেন?

আশাকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে জোর করিয়া বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। বিহারীও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, মহেন্দ্রবাবুর কি হইয়াছে বলিতে পার?"

শুনিয়াই বিহারী থম্‌কিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"তাহা ত জানি না। কিছু হইয়াছে না কি?"

বিনোদিনী। কি জানি ঠাকুরপো, আমার ত ভাল বোধ হয় না!

বিহারী উদ্বিগ্নমুখে চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। কথাটা খোলসা শুনিবে বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। বিনোদিনী কোন কথা না বলিয়া মনোযোগ দিয়া চাদর সেলাই করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিহারী কহিল—"মহীন্দার সম্বন্ধে তুমি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিয়াছ?"

বিনোদিনী অত্যন্ত সাধারণভাবে কহিল—"কি জানি ঠাকুরপো, আমার ত ভাল বোধ হয় না। আমার চোখের বালির জন্যে আমার কেবলি ভাবনা হয়।"

বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেলাই রাখিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল—"বোঠা'ণ, একটু বোস।"—বলিয়া একটা চৌকিতে বসিল।

বিনোদিনী ঘরের সমস্ত জান্‌লা-দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া কেরোসিনের বাতি উস্কাইয়া সেলাই টানিয়া লইয়া বিছানার দূরপ্রান্তে গিয়া বসিল। কহিল—"ঠাকুরপো, আমি ত চিরদিন এখানে থাকিব না—কিন্তু আমি চলিয়া গেলে আমার চোখের বালির উপর একটু দৃষ্টি রাখিয়ো—সে যেন অসুখী না হয়।"—বলিয়া যেন হৃদয়োচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া লইবার জন্য বিনোদিনী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

বিহারী বলিয়া উঠিল—"বোঠা'ণ, তোমাকে থাকিতেই হইবে। তোমার নিজের বলিতে কেহ নাই—এই সরলা মেয়েটিকে সুখে দুঃখে রক্ষা করিবার ভার তুমি লও—তুমি তাহাকে ফেলিয়া গেলে আমি ত আর উপায় দেখি না!"

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, তুমি ত সংসারের গতিক জান। এখানে বরাবর থাকিব কেমন করিয়া? লোকে কি বলিবে?

বিহারী। লোকে যা বলে বলুক্, তুমি কান দিয়ো না। তুমি দেবী—অসহায়া বালিকাকে সংসারের নিষ্ঠুর আঘাত হইতে রক্ষা করা, তোমারি উপযুক্ত কাজ। বোঠা'ণ, আমি তোমাকে প্রথমে চিনি নাই, সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর! আমিও সঙ্কীর্ণহৃদয় সাধারণ ইতরলোকদের মত মনে মনে তোমার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা স্থান দিয়াছিলাম;—একবার এমনো মনে হইয়াছিল, যেন আশার সুখে তুমি ঈর্ষা করিতেছ—যেন—কিন্তু সে সব কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও পাপ আছে। তার পরে, তোমার দেবীহৃদয়ের পরিচয় আমি পাইয়াছি,—তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই, আজ তোমার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিনোদিনীর সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। যদিও সে ছলনা করিতেছিল, তবু বিহারীর এই ভক্তি-উপহার সে মনে মনেও মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এমন জিনিষ সে কখনো কাহারো কাছ হইতে পায় নাই। ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, সে যেন যথার্থই পবিত্র, উন্নত—আশার প্রতি একটা অনির্দ্দেশ্য দয়ায় তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুপাত সে বিহারীর কাছে গোপন করিল না, এবং সেই অশ্রুধারা বিনোদিনীর নিজের কাছে নিজেকে পূজনীয়া বলিয়া মোহ উৎপাদন করিল।

বিহারী বিনোদিনীকে অশ্রু ফেলিতে দেখিয়া নিজের অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া উঠিয়া বাহিরে মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র যে হঠাৎ নিজেকে পাষণ্ড বলিয়া কেন ঘোষণা করিল, বিহারী তাহার কোন তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পাইল না। ঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র নাই। খবর পাইল, মহেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বে মহেন্দ্র অকারণে কখনই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইত না। সুপরিচিত লোকের ও সুপরিচিত ঘরের বাহিরে মহেন্দ্রের অত্যন্ত ক্লান্তি ও পীড়া বোধ হইত। বিহারী ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেল।

বিনোদিনী আশাকে নিজের শয়নঘরে আনিয়া বুকের কাছে টানিয়া দুই চক্ষু জলে ভরিয়া কহিল, "ভাই চোখের বালি, আমি বড় হতভাগিনী, আমি বড় অলক্ষণা!"

আশা ব্যথিত হইয়া তাহাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল—"কেন ভাই, অমন কথা কেন বলিতেছ?"

বিনোদিনী রোদনোচ্ছ্বসিত শিশুর মত আশার বক্ষে মুখ রাখিয়া কহিল—"আমি যেখানে থাকিব, সেখানে কেবল মন্দই হইবে।

দে ভাই, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি আমার জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যাই।"

আশা চিবুকে হাত দিয়া বিনোদিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল—"লক্ষ্মীটি ভাই, অমন কথা বলিস্ নে—তোকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না,—আমাকে ছাড়িয়া যাইবার কথা কেন আজ তোর মনে আসিল ?"

মহেন্দ্রর দেখা না পাইয়া বিহারী কোন একটা ছুতায় পুনর্ব্বার বিনোদিনীর ঘরে আসিয়া মহেন্দ্র ও আশার মধ্যবর্ত্তী আশঙ্কার কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্য উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে পরদিন সকালে তাহাদের বাড়ী খাইতে যাইতে বলিবার জন্য বিনোদিনীকে অনুরোধ করিবার উপলক্ষ্য লইয়া সে উপস্থিত হইল। "বিনোদ-বোঠা'ণ" বলিয়া ডাকিয়াই হঠাৎ কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোকে বাহির হইতেই আলিঙ্গনবদ্ধ সাশ্রুনেত্র দুই সখীকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। আশার হঠাৎ মনে হইল, নিশ্চয়ই বিহারী তাহার চোখের বালিকে কোন অন্যায় নিন্দা করিয়া কিছু বলিয়াছে, তাই সে আজ এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কথা তুলিয়াছে। বিহারিবাবুর ভারি অন্যায়! উঁহার মন ভাল নয়। আশা বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। বিহারীও বিনোদিনীর প্রতি ভক্তির মাত্রা চড়াইয়া বিগলিত-হৃদয়ে দ্রুত প্রস্থান করিল!

সেদিন রাত্রে মহেন্দ্র আশাকে কহিল, "চুনি, আমি কাল সকালের প্যাসেঞ্জারেই কাশি চলিয়া যাইব।"

আশার বক্ষস্থল ধক্ করিয়া উঠিল—কহিল, "কেন ?"

মহেন্দ্র কহিল, "কাকীমাকে অনেকদিন দেখি নাই।"

শুনিয়া আশা বড়ই লজ্জাবোধ করিল;—এ কথা পূর্ব্বেই তাহার মনে উদয় হওয়া উচিত ছিল। নিজের সুখদুঃখের আকর্ষণে স্নেহময়ী মাসীমাকে সে যে ভুলিয়াছিল, অথচ মহেন্দ্র সেই যে প্রবাসি-তপস্বিনীকে মনে করিয়াছে, ইহাতে নিজেকে কঠিন-হৃদয়া বলিয়া বড়ই ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র কহিল—"তিনি আমারই হাতে তাঁহার সংসারের একমাত্র স্নেহের ধনকে সমর্পণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেছেন—তাঁহাকে একবার না দেখিয়া আমি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না!"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল; স্নেহপূর্ণ নীরব আশীর্ব্বাদ ও অব্যক্ত মঙ্গলকামনার সহিত বারংবার সে আশার ললাট ও মস্তকের উপর দক্ষিণ করতল চালনা করিতে লাগিল। আশা এই অকস্মাৎ স্নেহাবেগের সম্পূর্ণ মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না, কেবল তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আজই সন্ধ্যাবেলায় বিনোদিনী তাহাকে অকারণ স্নেহাতিশয্যে যে সব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। উভয়ের মধ্যে কোথাও কোন যোগ আছে কি না, তাহা সে কিছুই বুঝিল না। কিন্তু মনে হইল, যেন ইহা তাহার জীবনে কিসের একটা সূচনা! ভাল কি মন্দ কে জানে!

ভয়ব্যাকুলচিত্তে সে মহেন্দ্রকে বাহু-

[ব]শে বদ্ধ করিল। মহেন্দ্র তাহার সেই [অ]কারণ আশঙ্কার আবেশ অনুভব করিতে [পা]রিল। কহিল, "চুনি, তোমার উপর [তো]মার পুণ্যবতী মাসীমার আশীর্ব্বাদ [আ]ছে, তোমার কোন ভয় নাই, কোন ভয় [না]ই! তিনি তোমারই মঙ্গলের জন্য তাঁহার [স]মস্ত ত্যাগ করিয়া গেছেন, তোমার কখনো [কো]ন অকল্যাণ হইতে পারে না!"

আশা তখন দৃঢ়চিত্তে সমস্ত ভয় দূর করিয়া ফেলিল। স্বামীর এই আশীর্ব্বাদ অক্ষয়কবচের মত গ্রহণ করিল। সে মনে মনে বারংবার তাহার মাসীমার পবিত্র পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল—এবং একাগ্রমনে কহিল, "মা, তোমার আশীর্ব্বাদ আমার স্বামীকে সর্ব্বদা রক্ষা করুক্।"

পরদিনে মহেন্দ্র চলিয়া গেল, বিনোদিনীকে কিছুই বলিয়া গেল না। বিনোদিনী মনে মনে কহিল, "নিজে অন্যায় করা হইল, আবার আমার উপরে রাগ! এমন সাধু ত দেখি নাই! কিন্তু এমন সাধুত্ব বেশিদিন টেঁকে না।"

(২৩)

সংসারত্যাগিনী অন্নপূর্ণা বহুদিন পরে হঠাৎ মহেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া যেমন স্নেহে আনন্দে আপ্লুত হইয়া গেলেন, তেমনি তাঁহার হঠাৎ ভয় হইল, বুঝি আশাকে লইয়া মার সঙ্গে মহেন্দ্রের আবার কোন বিরোধ ঘটিয়াছে এবং মহেন্দ্র তাঁহার কাছে নালিশ জানাইয়া সান্ত্বনালাভ করিতে আসিয়াছে। মহেন্দ্র শিশুকাল হইতেই সকলপ্রকার সঙ্কট ও সন্তাপের সময় তাহার কাকীর কাছে ছুটিয়া আসে। কাহারো উপরে রাগ করিলে অন্নপূর্ণা তাহার রাগ থামাইয়া দিয়াছেন, দুঃখবোধ করিলে তাহা সহজে সহ্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পর হইতে মহেন্দ্রের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা যে সঙ্কটের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিকার-চেষ্টা দূরে থাক্, কোনপ্রকার সান্ত্বনা পর্য্যন্ত তিনি দিতে অক্ষম। সে সম্বন্ধে যে ভাবে যেমন করিয়াই তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাতেই মহেন্দ্রের সাংসারিক বিপ্লব আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিবে, ইহাই যখন নিশ্চয় বুঝিলেন, তখনই তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। রুগ্ন শিশু যখন জল চাহিয়া কাঁদে, এবং জল দেওয়া যখন কবিরাজের নিতান্ত নিষেধ, তখন পীড়িতচিত্তে মা যেমন অন্যঘরে চলিয়া যান, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া নিজেকে প্রবাসে লইয়া গেছেন! দূর তীর্থবাসে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের নিয়মিত অনুষ্ঠানে এ কয়দিন সংসার অনেকটা ভুলিয়াছিলেন, মহেন্দ্র আবার কি সেই সকল বিরোধের কথা তুলিয়া তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্ষতে আঘাত করিতে আসিয়াছে?

কিন্তু মহেন্দ্র আশাকে লইয়া তাহার মার সম্বন্ধে কোন নালিশের কথা তুলিল না। তখন অন্নপূর্ণার আশঙ্কা অন্যপথে গেল। যে মহেন্দ্র আশাকে ছাড়িয়া কালেজে যাইতে পারিত না, সে আজ কাকীর খোঁজ লইতে কাশি আসে কেন? তবে কি আশার প্রতি মহেন্দ্রের টান ক্রমে ঢিলা হইয়া আসিতেছে? মহেন্দ্রকে তিনি কিছু আশঙ্কার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে মহীন্, আমার মাথা খা, ঠিক করিয়া বল্ দেখি, চুনী কেমন আছে?"

মহেন্দ্র কহিল, "সে ত বেশ্ ভাল আছে কাকীমা।"

"আজকাল সে কি করে মহীন্? তোরা কি এখনো তেম্‌নি ছেলেমানুষ আছিস্, না কাজকর্ম্মে ঘরকন্নায় মন দিয়াছিস্?"

মহেন্দ্র কহিল—"ছেলেমানুষী একেবারেই বন্ধ। সকল ঝঞ্ঝাটের মূল সেই চারুপাঠখানা যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাইবার জো নাই। তুমি থাকিলে দেখিয়া খুসি হইতে—লেখাপড়া শেখায় অবহেলা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে যতদূর কর্ত্তব্য, চুনী তাহা একান্তমনে পালন করিতেছে।"

"মহীন্, বিহারী কি করিতেছে?"

মহেন্দ্র কহিল, "নিজের কাজ ছাড়া আর সমস্তই করিতেছে। নায়েব-গোমস্তায় তাহার বিষয়সম্পত্তি দেখে; কি চক্ষে দেখে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বিহারীর চিরকাল ঐ দশা। তাহার নিজের কাজ পরে দেখে, আর, পরের কাজ সে নিজে দেখে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন—"সে কি বিবাহ করিবে না মহীন্?"

মহেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া কহিল, "কই কিছুমাত্র উদ্যোগ ত দেখি না!"

শুনিয়া অন্নপূর্ণা হৃদয়ের গোপনস্থানে একটা আঘাত পাইলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বোন্‌ঝিকে দেখিয়া একবার বিহারী আগ্রহের সহিত বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার সেই উন্মুখ আগ্রহ অন্যায় করিয়া অকস্মাৎ দলিত হইয়াছে। বিহারী বলিয়াছি[ল], "কাকীমা, আমাকে আর বিবাহ করি[তে] কখনো অনুরোধ করিয়ো না!" সেই ব[ড়] অভিমানের কথা অন্নপূর্ণার কানে বাজি[তে]ছিল। তাঁহার একান্ত অনুগত সেই স্নেহে[র] বিহারীকে তিনি এমন মনভাঙা অবস্থা[য়] ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকে কো[ন] সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই। অন্নপূ[র্ণা] অত্যন্ত বিমর্ষ ও ভীত হইয়া ভাবি[তে] লাগিলেন, "এখনো কি আশার প্রতি[মা] বিহারীর মন পড়িয়া আছে?"

মহেন্দ্র কখনো ঠাট্টার ছলে, কখনো গম্ভীরভাবে, তাহাদের ঘরকন্নার আধুনিক সমস্ত খবরবার্ত্তা জানাইল, কেবল বিনোদিনীর কথার উল্লেখমাত্র করিল না!

এখন কালেজ খোলা, কাশীতে মহেন্দ্রের বেশিদিন থাকিবার কথা নয়! কিন্তু কঠিন রোগের পর স্বাস্থ্যকর আব্‌হাওয়ার মধ্যে গিয়া আরোগ্যলাভের যে সুখ, মহেন্দ্র কাশীতে অন্নপূর্ণার নিকটে থাকিয়া প্রতিদিন সেই সুখ অনুভব করিতেছিলেন—তাই একে একে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। নিজের সঙ্গে নিজের যে একটা বিরোধ জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেটা দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া গেল। কয়দিন সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণা অন্নপূর্ণার স্নেহমুখচ্ছবির সম্মুখে থাকিয়া, সংসারের কর্ত্তব্যপালন এমনি সহজ ও সুখকর মনে হইতে লাগিল যে, তাঁহার পূর্ব্বেকার আতঙ্ক হাস্যকর বোধ হইল। মনে হইল, বিনোদিনী কিছুই না! এমন কি, তাহার মুখের চেহারাই মহেন্দ্র স্পষ্ট করিয়া মনে আনিতে পারে

না। অবশেষে মহেন্দ্র খুব জোর করিয়াই মনে মনে কহিল, "আশাকে আমার হৃদয় হইতে এক চুল সরাইয়া বসিতে পারে, এমন ত আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না।"

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে কহিল- "কাকীমা, আমার কালেজ কামাই যাইতেছে—এবারকার মত তবে আসি! যদিও তুমি সংসারের মায়া কাটাইয়া একান্তে আসিয়া আছ—তবু অনুমতি কর, মাঝে মাঝে আসিয়া তোমার পায়ের ধূলা লইয়া যাব।"

মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন আশাকে তাহার মাসীর স্নেহোপহার সিঁদুরের কৌটা ও একটি শাদা পাথরের চুমকি ঘটি দিল, তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাসীমার সেই পরমস্নেহময় ধৈর্য্য এবং মাসীমার প্রতি তাহাদের ও তাহার শাশুড়ির নানাপ্রকার উপদ্রব স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীকে জানাইল, "আমার বড় ইচ্ছা করে, আমি একবার মাসীমার কাছে গিয়া তাঁহার ক্ষমা ও পায়ের ধূলা লইয়া আসি! সে কি কোন-মতেই ঘটিতে পারে না?"

মহেন্দ্র আশার বেদনা বুঝিল, এবং কিছুদিনের জন্য কাশীতে সে তাহার মাসীমার কাছে যায়, ইহাতে তাহার সম্মতিও হইল। কিন্তু পুনর্ব্বার কালেজ কামাই করিয়া আশাকে কাশি পৌছাইয়া দিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল।

আশা কহিল, "জ্যাঠাইমা ত অল্প-দিনের মধ্যেই কাশী যাইবেন, সেই সঙ্গে গেলে কি ক্ষতি আছে?"

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে গিয়া কহিল—"মা, বৌ একবার কাশীতে কাকীমাকে দেখিতে যাইতে চায়।"

রাজলক্ষ্মী শ্লেষবাক্যে কহিলেন, "বৌ যাইতে চান ত অবশ্যই যাইবেন, যাও তাঁহাকে লইয়া যাও!"

মহেন্দ্র যে আবার অন্নপূর্ণার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল, ইহা রাজলক্ষ্মীর ভাল লাগে নাই। বধূর যাইবার প্রস্তাবে তিনি মনে মনে আরো বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র কহিল—"আমার কালেজ আছে, আমি রাখিতে যাইতে পারিব না। তাহার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে যাইবে।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"সে ত ভাল কথা! জ্যাঠামশায়রা বড়লোক, কখনো আমাদের মত গরিবের ছায়া মাড়ান না, তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলে কত গৌরব!"

মাতার উত্তরোত্তর শ্লেষবাক্যে মহেন্দ্রের মন একেবারে কঠিন হইয়া বাঁকিল। সে কোন উত্তর না দিয়া আশাকে কাশি পাঠাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চলিয়া গেল।

বিহারী যখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"ও বিহারি, শুনিয়াছিস্, আমাদের বৌমা যে কাশী যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন!"

বিহারী কহিল—"বল কি মা, মহীনদা আবার কালেজ কামাই করিয়া কাশী যাইবে?"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "না, না, মহীন্ কেন যাইবেন? তা হইলে আর বিবিয়ানা

হইল কই? মহীন্ এখানে থাকিবেন, বৌ তাঁহার জ্যাঠামহারাজের সঙ্গে কাশী যাইবেন। সবাই সাহেব-বিবি হইয়া উঠিল!"

বিহারী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইল, বর্ত্তমান কালের সাহেবিয়ানা স্মরণ করিয়া নহে। বিহারী ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপারখানা কি? মহেন্দ্র যখন কাশী গেল, আশা এখানে রহিল; আবার মহেন্দ্র যখন ফিরিল, তখন আশা কাশী যাইতে চাহিতেছে! দুজনের মাঝখানে একটা কি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে! এমন করিয়া কতদিন চলিবে? বন্ধু হইয়াও আমরা ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারিব না—দূরে দাঁড়াইয়া থাকিব?"

মাতার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহেন্দ্র তাহার শয়নঘরে আসিয়া বসিয়াছিল। বিনোদিনী ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই—তাই আশা তাহাকে পাশের ঘর হইতে মহেন্দ্রের কাছে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল।

এমন সময় বিহারী আসিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—"আশা-বোঠা'ণের কি কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে?"

মহেন্দ্র কহিল—"না হইবে কেন? বাধাটা কি আছে?"

বিহারী কহিল—"বাধার কথা কে বলিতেছে? কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল তোমাদের মাথায় আসিল যে?"

মহেন্দ্র কহিল, "মাসীকে দেখিবার ইচ্ছা—প্রবাসী আত্মীয়ের জন্য ব্যাকুলতা, মানবচরিত্রে এমন মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে!"

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সঙ্গে যাইতেছ?"

প্রশ্ন শুনিয়াই মহেন্দ্র ভাবিল, "জ্যাঠার সঙ্গে আশাকে পাঠান সঙ্গত নহে, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে বিহারী আসিয়াছে।" পাছে অধিক কথা বলিতে গেলে ক্রোধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাই সংক্ষেপে বলিল—"না!"

বিহারী মহেন্দ্রকে চিনিত। সে যে রাগিয়াছে, তাহা বিহারীর অগোচর ছিল না। একবার জিদ্ ধরিলে তাহাকে টলানো যায় না, তাহাও সে জানিত। তাই মহেন্দ্রের যাওয়ার কথা আর তুলিল না। মনে মনে ভাবিল, "বেচারা আশা যদি কোন বেদনা বহন করিয়াই চলিয়া যাইতেছে হয়, তবে সঙ্গে বিনোদিনী গেলে তাহার সান্ত্বনা হইবে।" তাই ধীরে ধীরে কহিল—"বিনোদ-বোঠা'ণ তাঁর সঙ্গে গেলে হয় না?"

মহেন্দ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"বিহারি, তোমার মনের ভিতর যে কথাটা আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বল। আমার সঙ্গে অসরলতা করিবার কোন দরকার দেখি না! আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালবাসি! মিথ্যা কথা! আমি বাসি না! আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হবে না! তুমি এখন নিজেকে রক্ষা কর! যদি সরল বন্ধুত্ব তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে বহুদূরে

লইয়া যাইতে। আমি তোমার মুখের সাম্‌নে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভাল বাসিয়াছ!"

অত্যন্ত বেদনার স্থানে দুই পা দিয়া মাড়াইয়া দিলে, আহত ব্যক্তি মুহূর্ত্তকাল বিচার না করিয়া আঘাতকারীকে যেমন সবলে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে— রুদ্ধকণ্ঠ বিহারী তেম্‌নি পাণ্ডুমুখে তাহার চৌকি হইতে উঠিয়া মহেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল—হঠাৎ থামিয়া বহুকষ্টে স্বর বাহির করিয়া কহিল "ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন্, আমি বিদায় হই!"—বলিয়া টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে বিনোদিনী ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল "বিহারি-ঠাকুরপো!"

বিহারী দেয়ালে ভর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"কি বিনোদ-বোঠা'ণ!"

বিনোদিনী কহিল "ঠাকুরপো, চোখের বালির সঙ্গে আমিও কাশীতে যাইব।"

বিহারী কহিল—না, না, বোঠা'ণ, সে হইবে না, সে কিছুতেই হইবে না! তোমাকে মিনতি করিতেছি—আমার কথায় কিছুই করিয়ো না! আমি এখানকার কেহ নহ, আমি এখানকার কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না, তাহাতে ভাল হইবে না! তুমি দেবী, তুমি যাহা ভাল বোধ কর, তাহাই করিয়ো! আমি চলিলাম!"

বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে বিনম্র নমস্কার করিয়া চলিল। বিনোদিনী কহিল— "আমি দেবী নই ঠাকুরপো, শুনিয়া যাও! —তুমি চলিয়া গেলে কাহারো ভাল হইবে না! ইহার পরে আমাকে দোষ দিয়ো না!"

বিহারী চলিয়া গেল। মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী তাহার প্রতি জ্বলন্ত বজ্রের মত একটা কঠোর কটাক্ষ-বিক্ষেপ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সে ঘরে আশা একান্ত লজ্জায় সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছিল। বিহারী তাহাকে ভালবাসে, এ কথা মহেন্দ্রের মুখে শুনিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার উপর বিনোদিনীর আর দয়া হইল না। আশা যদি তখন চোখ তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে সে ভয় পাইত। সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে! মিথ্যা কথা বটে! বিনোদিনীকে কেহই ভালবাসে না বটে! সকলেই ভালবাসে এই লজ্জাবতী ননীর পুতুলটিকে!

মহেন্দ্র সেই যে আবেগের মুখে বিহারীকে বলিয়াছিল "আমি পাষণ্ড"—তাহার পর আবেগশান্তির পর হইতে সেই হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য সে বিহারীর কাছে কুণ্ঠিত হইয়া ছিল। সে মনে করিতেছিল, তাহার সব কথাই যেন ব্যক্ত হইয়া গেছে। সে বিনোদিনীকে ভালবাসে না, অথচ বিহারী জানিয়াছে যে, সে ভালবাসে, ইহাতে বিহারীর উপরে তাহার বড় একটা বিরক্তি জন্মিতেছিল। বিশেষত তাহার পর হইতে যতবার বিহারী তাহার সম্মুখে আসিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল, যেন বিহারী সকৌতূহলে তাহার একটা ভিতরকার কথা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সেই সমস্ত বিরক্তি

উত্তরোত্তর জমিতেছিল—আজ একটু আঘাতেই বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু বিনোদিনী পাশের ঘর হইতে যেরূপ ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিল—যেরূপ আর্ত্তকণ্ঠে বিহারীকে রাখিতে চেষ্টা করিল এবং বিহারীর আদেশপালনস্বরূপে আশার সহিত কাশী যাইতে প্রস্তুত হইল, ইহা মহেন্দ্রের পক্ষে অভাবিতপূর্ব্ব। এই দৃশ্যটি মহেন্দ্রকে প্রবল আঘাতে অভিভূত করিয়া দিল। সে বলিয়াছিল, সে বিনোদিনীকে ভালবাসে না, কিন্তু যাহা শুনিল, যাহা দেখিল, তাহা তাহাকে সুস্থির হইতে দিল না; তাহাকে চারিদিক্ হইতে বিচিত্র আকারে পীড়ন করিতে লাগিল! আর, কেবলি নিষ্ফল পরিতাপের সহিত মনে হইতে লাগিল—"বিনোদিনী শুনিয়াছে,—আমি বলিয়াছি, 'আমি তাহাকে ভালবাসি না।'"

(২৪)

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল—"আমি বলিয়াছি, 'মিথ্যা কথা, আমি বিনোদিনীকে ভালবাসি না।' অত্যন্ত কঠিন করিয়া বলিয়াছি। আমি যে তাহাকে ভালবাসি, তাহা না-ই হইল, কিন্তু ভালবাসি না, এ কথাটা বড় কঠোর!—এ কথায় আঘাত না পায়, এমন স্ত্রীলোক কে আছে! ইহার প্রতিবাদ করিবার অবসর কবে কোথায় পাইব? ভাল বাসি, এ কথা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু ভাল বাসি না, এই কথাটাকে একটু ফিকা করিয়া—নরম করিয়া জানান দরকার। বিনোদিনীর মনে এমন একটা নিষ্ঠুর অথচ ভুল সংস্কার থাকিতে দেওয়া অন্যায়!"

এই বলিয়া মহেন্দ্র তাহার বাক্সর মধ্য হইতে আর একবার তাহার চিঠি তিনখানি পড়িল। মনে মনে কহিল—"বিনোদিনী আমাকে যে ভালবাসে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাল সে বিহারীর কাছে অমন করিয়া আসিয়া পড়িল কেন? সে কেবল আমাকে দেখাইয়া। আমি যখন তাহাকে ভাল বাসি না স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, তখন সে কোন সুযোগে আমার কাছে তাহার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান না করিয়া কি করিবে? এম্নি করিয়া আমার কাছে অবমানিত হইয়া হয় ত সে বিহারীকে ভালবাসিতেও পারে!"

মহেন্দ্রের ক্ষোভ এতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যে, নিজের চাঞ্চল্যে সে নিজে আশ্চর্য্য এবং ভীত হইয়া উঠিল। না হয় বিনোদিনী শুনিয়াছে মহেন্দ্র তাহাকে ভালবাসে না, তাহাতে দোষ কি? না হয় এই কথায় অভিমানিনী বিনোদিনী তাহার উপর হইতে মন সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ঝড়ের সময় নৌকার শিকল যেমন নোঙরকে টানিয়া ধরে, মহেন্দ্র তেম্নি ব্যাকুলতার সঙ্গে আশাকে যেন অতিরিক্ত জোর করিয়া ধরিল।

রাত্রে মহেন্দ্র আশার মুখ বক্ষের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"চুনি, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস, ঠিক করিয়া বল?"

আশা ভাবিল, "এ কেমন প্রশ্ন? বিহারীকে লইয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক যে কথাটা উঠিয়াছে, তাহাতেই কি তাহার উপরে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে?" সে লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিল—"ছি ছি, আজ তুমি

এমন প্রশ্ন কেন করিলে? তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে খুলিয়া বল, আমার ভালবাসায় তুমি কবে কোথায় কি অভাব দেখিয়াছ?'

মহেন্দ্র আশাকে পীড়ন করিয়া তাহার মাধুর্য্য বাহির করিবার জন্য কহিল 'তবে তুমি কাশী যাইতে চাহিতেছ কেন?'

আশা কহিল 'আমি কাশী যাইতে চাই না, আমি কোথাও যাইব না।'

মহেন্দ্র। তখন তো চাহিয়াছিলে।

আশা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কহিল, 'তুমি তো জান, কেন চাহিয়াছিলাম।'

মহেন্দ্র। আমাকে ছাড়িয়া তোমার মাসীর কাছে বোধ হয় বেশ সুখে থাকিতে।

আশা কহিল, "কখনো না। আমি সুখের জন্য যাইতে চাহি নাই।"

মহেন্দ্র কহিল 'আমি সত্য বলিতেছি, তুমি আর কাহাকেও বিবাহ করিলে ঢের বেশি সুখী হইতে পারিতে।'

শুনিয়া আশা চকিতের মধ্যে মহেন্দ্রের বক্ষ হইতে সরিয়া গিয়া, বালিশে মুখ ঢাকিয়া কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া রহিল, মুহূর্ত্তপরে তাহার কান্না আর চাপা রহিল না। মহেন্দ্র তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বক্ষে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল, আশা বালিশ ছাড়িল না। পতিব্রতার এই অভিমানে মহেন্দ্র সুখে গর্ব্বে ধিক্কারে ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল।

যে সব কথা ভিতরে ভিতরে আভাসে ছিল, সেইগুলা হঠাৎ স্পষ্ট কথায় পরিস্ফুট হইয়া সকলেরই মনে একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এমন স্পষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধে বিহারী কেন কোন প্রতিবাদ করিল না? যদি সে মিথ্যা প্রতিবাদও করিত তাহা হইলেও যেন বিনোদিনী একটু খুসি হইত। বেশ্ হইয়াছে, মহেন্দ্র বিহারীকে যে আঘাত করিয়াছে, তাহা তাহার প্রাপ্য ছিল। বিহারীর মত অমন মহৎ লোক কেন আশাকে ভালবাসিবে? এই আঘাতে বিহারীকে যে দূরে ফেলিয়াছে, সে যেন ভালই হইয়াছে—বিনোদিনী যেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু বিহারীর সেই মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশুমুখ বিনোদিনীকে সকল কাজের মধ্যে যেন অনুসরণ করিয়া ফিরিল। বিনোদিনীর অন্তরে যে সেবাপরায়ণা নারী-প্রকৃতি ছিল, সে সেই আর্ত্তমুখ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রুগ্নশিশুকে যেমন মাতা বুকের কাছে দোলাইয়া বেড়ায়, তেমনি সেই আতুর মূর্ত্তিকে বিনোদিনী আপন হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দোলাইতে লাগিল, তাহাকে সুস্থ করিয়া সেই মুখে আবার রক্তের রেখা, প্রাণের প্রবাহ, হাস্যের বিকাশ দেখিবার জন্য বিনোদিনীর একটা অধীর ঔৎসুক্য জন্মিল।

দুই তিন দিন সকল কর্ম্মের মধ্যে এইরূপ উন্মনা হইয়া ফিরিয়া বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। বিনোদিনী একখানি সান্ত্বনার পত্র লিখিল—কহিল, "ঠাকুরপো, আমি তোমার সেদিনকার সেই শুষ্কমুখ দেখিয়া অবধি প্রাণমনে কামনা করিতেছি, তুমি সুস্থ হও, তুমি যেমন ছিলে, তেমনিটি হও—সেই সহজ হাসি আবার কবে দেখিব, সেই উদার কথা আবার

কবে শুনিব? তুমি কেমন আছ, আমাকে একটি ছত্র লিখিয়া জানাও!

তোমার বিনোদ-বোঠা'ণ।"

বিনোদিনী দরোয়ানের হাত দিয়া বিহারীর ঠিকানায় চিঠি পাঠাইয়া দিল।

আশাকে বিহারী ভালবাসে, এ কথা যে এমন রূঢ় করিয়া এমন গর্হিতভাবে মহেন্দ্র মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহা বিহারী স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কারণ, সে নিজেও এমন কথা স্পষ্ট করিয়া কখনো মনে স্থান দেয় নাই। প্রথমটা বজ্রাহত হইল—তার পরে ক্রোধে ঘৃণায় ছট্‌ফট্ করিয়া বলিতে লাগিল—"অন্যায়, অসঙ্গত, অমূলক!"

কিন্তু কথাটা যখন একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তখন তাহাকে আর সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা যায় না। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্যের বীজ ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কন্যা দেখিবার উপলক্ষ্যে সেই যে একদিন সূর্য্যাস্তকালে বাগানের উচ্ছ্বসিত পুষ্পগন্ধপ্রবাহে লজ্জিতা বালিকার সুকুমার মুখখানিকে সে নিতান্তই আপনার মনে করিয়া বিগলিত অনুরাগের সহিত একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, তাহাই বারবার মনে পড়িতে লাগিল, এবং বুকের কাছে কি যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল, এবং একটা অত্যন্ত কঠিন বেদনা কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। দীর্ঘ-রাত্রি ছাদের উপর শুইয়া শুইয়া, বাড়ীর সম্মুখের পথে দ্রুতপদে পায়চারি করিতে করিতে করিতে, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল, তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া উঠিল। যাহা সংযত ছিল, তাহা উদ্দাম হইল, নিজের কাছেও যাহার কোন প্রমাণ ছিল না, মহেন্দ্রের বাক্যে তাহা বিরাট্ প্রাণ পাইয়া বিহারীর অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত করিয়া দিল।

তখন সে নিজেকে অপরাধী বলিয়া বুঝিল। মনে মনে কহিল, "আমার ত আর রাগ করা শোভা পায় না, মহেন্দ্রের কাছে ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতে হইবে! সে দিন এমনভাবে চলিয়া আসিয়াছিলাম, যেন মহেন্দ্র দোষী, আমি বিচারক—সে অন্যায় স্বীকার করিয়া আসিব।"

বিহারী জানিত, আশা কাশী চলিয়া গেছে। একদিন সে সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মীর দূর-সম্পর্কের মামা সাধুচরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাধুদা, কদিন আসিতে পারি নাই—এখানকার সব খবর ভাল?" সাধুচরণ সকলের কুশল জানাইল। বিহারী জিজ্ঞাসা করিল—"বোঠা'ণ কাশীতে কবে গেলেন?"

সাধুচরণ কহিল—"তিনি যান নাই। তাঁহার কাশী যাওয়া হইবে না।"

শুনিয়া, কিছু না মানিয়া অন্তঃপুরে যাইবার জন্য বিহারীর মন ছুটিল। পূর্ব্বে যেমন সহজে, যেমন আনন্দে, আত্মীয়ের মত সে পরিচিত সিঁড়ি বাহিয়া ভিতরে যাইত, সকলের সঙ্গে স্নিগ্ধকৌতুকের সহিত হাস্যালাপ করিয়া আসিত, কিছুই মনে হইত না, আজ তাহা অবিহিত, তাহা দুর্লভ, জানিয়াই তাহার চিত্ত যেন উন্মত্ত হইল। আর একটিবার, কেবল শেষবার, তেমনি করিয়া ভিতরে গিয়া ঘরের ছেলের মত রাজলক্ষ্মীর সহিত

মহেন্দ্র স্থির করিল, নিজেকে ধরা না দিয়া বিনোদিনীর মন কোন অবকাশে আর একবার ফিরাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, বিনোদিনী পথের মধ্যেই যেন কাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। অমনি মহেন্দ্রের মনে চকিতের মধ্যে বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "ওগো, মিথ্যা দাঁড়াইয়া আছ, দেখা পাইবে না! এই তোমার চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে!" বলিয়া চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

বিনোদিনী কহিল, "খোলা যে?"

মহেন্দ্র তাহার জবাব না দিয়াই চলিয়া গেল। বিহারী চিঠি খুলিয়া পড়িয়া কোন উত্তর না দিয়া চিঠি ফেরৎ পাঠাইয়াছে, মনে করিয়া বিনোদিনীর সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত শিরা দব্‌দব্‌ করিতে লাগিল। যে দরোয়ান চিঠি লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল; সে অন্যকাজে অনুপস্থিত ছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না। প্রদীপের মুখ হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু ক্ষরিয়া পড়ে, রুদ্ধ শয়নকক্ষের মধ্যে বিনোদিনীর দীপ্তনেত্র হইতে তেমনি হৃদয়ের জ্বালা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। নিজের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া কিছুতেই তাহার সান্ত্বনা হইল না—সেই দুই চারিলাইন কালীর দাগকে অতীত হইতে, বর্ত্তমান হইতে, একেবারেই মুছিয়া ফেলিবার, একেবারেই না করিয়া দিবার, কোন উপায় নাই কেন? ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায়, তাহাতেই বাধা? কোন-কিছুতেই কি সে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না? সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত—ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই, তাহার ব্যর্থ-জীবনের কর্ম্ম সমাধা হইবে।

(২৫)

সেদিন নূতন ফাল্গুনে প্রথম বসন্তের হাওয়া দিতেই আশা অনেকদিন পরে সন্ধ্যার আরম্ভে ছাদে মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে। একখানি মাসিক কাগজ লইয়া খণ্ডশ প্রকাশিত একটা গল্প খুব মনোযোগ দিয়া সেই অল্প আলোকে পড়িতেছিল। গল্পের নায়ক তখন সংবৎসর পরে পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে, আশার হৃদয় উদ্বেগে কাঁপিতেছিল; এদিকে হতভাগিনী নায়িকা ঠিক সেই সময়েই বিপদের স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। আশা চোখের জল আর রাখিতে পারে না! আশা বাংলা গল্পের অত্যন্ত উদার সমালোচক ছিল। যাহা পড়িত, তাহাই মনে হইত চমৎকার। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিত, "ভাই চোখের বালি, মাথা খাও, এ গল্পটা পড়িয়া দেখ! এমন সুন্দর! পড়িয়া আর কাঁদিয়া বাঁচি না।" বিনোদিনী ভাল-মন্দ বিচার করিয়া আশার উচ্ছ্বসিত উৎসাহে বড় আঘাত করিত।

কথা সারিয়া, একবার ঘোমটাবৃত আশাকে বোঠা'ণ বলিয়া দুটো তুচ্ছ কথা কহিয়া আসা তাহার কাছে পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল। সাধুচরণ কহিল, "ভাই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলে যে, ভিতরে চল।"

শুনিয়া বিহারী দ্রুতবেগে ভিতরের দিকে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া সাধুকে কহিল, "যাই, একটা কাজ আছে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। সেই রাত্রেই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গেল।

দরোয়ান বিনোদিনীর চিঠি লইয়া বিহারীকে না পাইয়া চিঠি ফিরাইয়া লইয়া আসিল। মহেন্দ্র তখন দেউড়ির সম্মুখে ছোট বাগানটিতে বেড়াইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল "এ কাহার চিঠি?" দরোয়ান সমস্ত বলিল। মহেন্দ্র চিঠিখানি নিজে লইল।

একবার সে ভাবিল, চিঠিখানা লইয়া বিনোদিনীর হাতে দিবে—অপরাধিনী বিনোদিনীর লজ্জিতমুখ একবার সে দেখিয়া আসিবে—কোন কথা বলিবে না। এই চিঠির মধ্যে বিনোদিনীর লজ্জার কারণ যে আছেই, মহেন্দ্রর মনে তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। মনে পড়িল, পূর্ব্বেও আর একদিন বিহারীর নামে এমনি একখানা চিঠি গিয়াছিল। চিঠিতে কি লেখা আছে, এ কথা না জানিয়া মহেন্দ্র কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। সে মনকে বুঝাইল—বিনোদিনী তাহার অভিভাবকতায় আছে, বিনোদিনীর ভাল-মন্দর জন্য সে দায়ী। অতএব এরূপ সন্দেহজনক পত্র খুলিয়া দেখাই তাহার কর্ত্তব্য। বিনোদিনীকে বিপথে যাইতে দেওয়া কোনমতেই হইতে পারে না।

মহেন্দ্র ছোট চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। তাহা সরলভাষায় লেখা, সেইজন্য অকৃত্রিম উদ্বেগ তাহার মধ্য হইতে পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। চিঠিখানা পুনঃপুন পাঠ করিয়া এবং অনেক চিন্তা করিয়া মহেন্দ্র ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, বিনোদিনীর মনের গতি কোন্ দিকে। তাহার কেবলি আশঙ্কা হইতে লাগিল—"আমি যে তাহাকে ভালবাসি না বলিয়া অপমান করিয়াছি, সেই অভিমানেই বিনোদিনী অন্যদিকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে। রাগ করিয়া আমার আশা সে একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে।"

এই কথা মনে করিয়া মহেন্দ্রের ধৈর্য্য রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যে বিনোদিনী তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছিল, সে যে মুহূর্ত্তকালের মূঢ়তায় সম্পূর্ণ তাহার অধিকারচ্যুত হইয়া যাইবে, সেই সম্ভাবনায় মহেন্দ্রকে স্থির থাকিতে দিল না। মহেন্দ্র ভাবিল "বিনোদিনী আমাকে যদি মনে মনে ভালবাসে, তাহা বিনোদিনীর পক্ষে মঙ্গলকর—এক জায়গায় সে বদ্ধ হইয়া থাকিবে। আমি নিজের মন জানি, আমি ত তাহার প্রতি কখনই অন্যায় করিব না। সে আমাকে নিরাপদে ভালবাসিতে পারে। আমি আশাকে ভালবাসি, আমার দ্বারা তাহার কোন ভয় নাই! কিন্তু সে যদি অন্য কোন দিকে মন দেয়, তবে তাহার কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে, কে জানে!"—

আজিকার এই গল্পটা আশা মহেন্দ্রকে পড়াইবে বলিয়া স্থির করিয়া যখন সজল-চক্ষে কাগজখানা বন্ধ করিল, এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রের মুখ দেখিয়াই আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র জোর করিয়া প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"একলা ছাদের উপর কোন্ ভাগ্যবানের ভাবনায় আছ?"

আশা নায়ক-নায়িকার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া কহিল, "তোমার কি শরীর আজ ভাল নাই?"

মহেন্দ্র। শরীর বেশ আছে।

আশা। তবে তুমি মনে মনে কি একটা ভাবিতেছ, আমাকে খুলিয়া বল!

মহেন্দ্র আশার বাটা হইতে একটা পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিয়া কহিল—"আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার মাসীমা-বেচারা কতদিন তোমাকে দেখেন নাই। একবার হঠাৎ যদি তুমি তাঁহার কাছে গিয়া পড়িতে পার, তবে তিনি কত খুসিই হন্!"

আশা কোন উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ এ কথা আবার নূতন করিয়া কেন মহেন্দ্রের মনে উদয় হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, "তোমার যাইতে ইচ্ছা করে না?"

এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। মাসীকে দেখিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করে, আবার মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছাও করে না। আশা কহিল—"কালেজের ছুটি পাইলে তুমি যখন যাইতে পারিবে, আমিও সঙ্গে যাইব।"

মহেন্দ্র। ছুটি পাইলেও যাইবার জো নাই; পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হইতে হইবে।

আশা। তবে থাক্, এখন নাই গেলাম্!

মহেন্দ্র। থাক্ কেন? যাইতে চাহিয়া-ছিলে, যাও না!

আশা। না, আমার যাইবার ইচ্ছা নাই!

মহেন্দ্র। এই, সেদিন এত ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ ইচ্ছা চলিয়া গেল?

আশা এই কথায় চুপ করিয়া চোখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীর সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য বাধাহীন অবসর চাহিয়া মহেন্দ্রর মন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার একটা অকারণ রাগের সঞ্চার হইল। কহিল, "আমার উপর মনে মনে তোমার কোন সন্দেহ জন্মিয়াছে না কি? তাই আমাকে চোখে চোখে পাহারা দিয়া রাখিতে চাও?"

আশার স্বাভাবিক মৃদুতা, নম্রতা, ধৈর্য্য, মহেন্দ্রের কাছে হঠাৎ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, "মাসীর কাছে যাইতে ইচ্ছা আছে, বল যে, আমি যাইবই, আমাকে যেমন করিয়া হোক্, পাঠাইয়া দাও—তা নয়, কখনো হাঁ, কখনো না, কখনো চুপচাপ—এ কী রকম!"

হঠাৎ মহেন্দ্রের এই উগ্রতা দেখিয়া আশা বিস্মিত, ভীত হইয়া উঠিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়া কোন উত্তরই ভাবিয়া পাইল না। মহেন্দ্র কেন যে কখনো হঠাৎ এত আদর করে, কখনো হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠে, তাহা সে কিছুই

বুঝিতে পারে না! এইরূপে মহেন্দ্র যতই তাহার কাছে অধিক দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিতেছে, ততই আশার কম্পান্বিত চিত্ত ভয়ে ও ভালবাসায় তাহাকে যেন অত্যন্ত অধিক করিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে।

মহেন্দ্রকে আশা মনে মনে সন্দেহ করিয়া চোখে চোখে পাহারা দিতে চায়! ইহা কি কঠিন উপহাস, না নির্দ্দয় সন্দেহ? শপথ করিয়া কি ইহার প্রতিবাদ আবশ্যক, না হাস্য করিয়া ইহা উড়াইয়া দিবার কথা?

হতবুদ্ধি আশাকে পুনশ্চ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অধীর মহেন্দ্র দ্রুতবেগে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল! তখন কোথায় রহিল মাসিক পত্রের সেই গল্পের নায়ক, কোথায় রহিল গল্পের নায়িকা। সূর্য্যাস্তের আভা অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, সন্ধ্যারম্ভের ক্ষণিক বসন্তের বাতাস গিয়া শীতের হাওয়া দিতে লাগিল—তখনো আশা সেই মাদুরের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

অনেক রাত্রে আশা শয়নঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র তাহাকে না ডাকিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে। তখনি আশার মনে হইল, স্নেহময়ী মাসীর প্রতি তাহার উদাসীনতা কল্পনা করিয়া মহেন্দ্র তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছে। বিছানার মধ্যে ঢুকিয়াই আশা মহেন্দ্রের দুই পা জড়াইয়া তাহার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া রহিল। তখন মহেন্দ্র করুণায় বিচলিত হইয়া তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল। আশা কিছুতেই উঠিল না। সে কহিল—"আমি যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, আমাকে মাপ কর!"

মহেন্দ্র আর্দ্রচিত্তে কহিল, "তোমার কোন দোষ নাই চুনি! আমি নিতান্ত পাষণ্ড, তাই তোমাকে অকারণে আঘাত করিয়াছি।"

তখন মহেন্দ্রের দুই পা অভিষিক্ত করিয়া আশার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া তাহাকে দুই বাহুতে তুলিয়া আপনার পাশে শোয়াইল। আশার রোদনবেগ থামিলে সে কহিল—"মাসীকে কি আমার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করে না? কিন্তু তোমাকে ফেলিয়া আমার যাইতে মন সরে না। তাই আমি যাইতে চাই নাই, তুমি রাগ করিয়ো না!"

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আশার আর্দ্রকপোল মুছাইতে মুছাইতে কহিল—"এ কি রাগ করিবার কথা চুনি? আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পার না, সে লইয়া আমি রাগ করিব? তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না!"

আশা কহিল—"না, আমি কাশী যাইব!"

মহেন্দ্র। কেন?

আশা। তোমাকে মনে মনে সন্দেহ করিয়া যাইতেছি না—এ কথা যখন একবার তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন আমাকে কিছুদিনের জন্যও যাইতেই হইবে!

মহেন্দ্র। আমি পাপ করিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে হইবে?

আশা। তাহা আমি জানি না—কিন্তু পাপ আমার কোনখানে হইয়াছেই, নহিলে এমন সকল অসম্ভব কথা উঠিতেই পারিত

না। যে সব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতাম না, সে সব কথা কেন শুনিতে হইতেছে?

মহেন্দ্র। তাহার কারণ, আমি যে কি মন্দ লোক, তাহা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর!

আশা ব্যস্ত হইয়া কহিল—"আবার! ও কথা বলিয়ো না! কিন্তু এবার আমি কাশী যাইবই!"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—"আচ্ছা যাও, কিন্তু তোমার চোখের আড়ালে আমি যদি নষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে কি হইবে?"

আশা কহিল—"তোমার আর অত ভয় দেখাইতে হইবে না! আমি কি-না ভাবিয়া অস্থির হইতেছি?"

মহেন্দ্র। কিন্তু ভাবা উচিত। তোমার এমন স্বামীটিকে যদি অসাবধানে বিগ্‌ড়াইতে দাও, তবে এর পরে কাহাকে দোষ দিবে?

আশা। তোমাকে দোষ দিব না, সেজন্য তুমি ভাবিয়ো না!

মহেন্দ্র। তখন নিজের দোষ স্বীকার করিবে?

আশা। একশোবার!

মহেন্দ্র। আচ্ছা, তাহা হইলে কাল একবার তোমার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে গিয়া কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া আসিব।

এই বলিয়া মহেন্দ্র অনেক রাত হইয়াছে বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পুনর্ব্বার এ পাশে ফিরিয়া কহিল—"চুনি, কাজ নাই, তুমি না-ই বা গেলে?"

আশা কাতর হইয়া কহিল—"আবার বারণ করিতেছ কেন? এবার একবার না গেলে তোমার সেই ভৎর্সনাটা আমার গায়ে লাগিয়া থাকিবে! আমাকে দু-চার-দিনের জন্যও পাঠাইয়া দাও!"

মহেন্দ্র কহিল—"আচ্ছা!" বলিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল!

কাশী যাইবার আগের দিন আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া কহিল—"ভাই বালি, আমার গা ছুঁইয়া একটা কথা বল্।"

বিনোদিনী আশার গাল টিপিয়া ধরিয়া কহিল, "কি কথা ভাই? তোমার অনুরোধ আমি রাখি না?"

আশা। কে জানে ভাই, আজকাল তুমি কি-রকম হইয়া গেছ? কোনমতেই যেন আমার স্বামীর কাছে বাহির হইতে চাও না!

বিনোদিনী। কেন চাই না, সে কি তুই জানিস্ নে ভাই? সেদিন বিহারিবাবুকে মহেন্দ্রবাবু যে কথা বলিলেন, সে কি তুই নিজের কানে শুনিস্ নাই? এ সকল কথা যখন উঠিল, তখন কি আর বাহির হওয়া উচিত—তুমিই বল না ভাই বালি?

ঠিক উচিত যে নহে, তাহা আশা বুঝিত। এ সকল কথার লজ্জাকরতা যে কতদূর, তাহাও সে নিজের মন হইতেই সম্প্রতি বুঝিয়াছে। তবু বলিল—"কথা অমন কত উঠিয়া থাকে, সে সব যদি না সহিতে পারিস্, তবে আর ভালবাসা কিসের ভাই? ও কথা ভুলিতে হইবে!"

বিনোদিনী। আচ্ছা ভাই ভুলিব।

আশা। আমি ত ভাই কাল কাশী যাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোন অসু-

বিধা না হয়, তোমাকে সেইটে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে! এখনকার মত পালাইয়া বেড়াইলে চলিবে না!

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল। আশা বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"মাথা খা ভাই বালি, এই কথাটা আমাকে দিতেই হইবে।

বিনোদিনী কহিল—"আচ্ছা।"

ক্রমশ।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ক'নে বউ। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

এই উপন্যাসের যখন চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে, তখন যে ইহা সাধারণের আদর পাইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। ইহা আদৃত হইবার উপযুক্তও বটে। ক'নে বউটি অতি লক্ষ্মী মেয়ে। এমন মেয়ে যে গৃহে, সে গৃহ শান্তিময়, সুখময়, পুণ্যময় হইবেই ত। হইয়াছেও তাই। কিন্তু গ্রন্থকার যোগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কলিকাতার গার্ডেন-পার্টির অবতারণা করিয়াছেন কেন? এই পরিচ্ছেদের জন্য উপন্যাসখানির উপাদেয়তা কমিয়াছে বই বাড়ে নাই। এমন সুন্দর পুস্তকে এমন কুৎসিত চিত্র কেন? যদি আমাদের পরামর্শ লইতে অপমান-বোধ না হয়, তাহা হইলে যোগেন্দ্রবাবু যেন পরবর্ত্তী সংস্করণে এই পরিচ্ছেদটা উঠাইয়া দেন।

আর একটা কথা। রামকুমারের পুত্র-দুইটিকে বিষ খাওয়ান এবং গৃহদাহ-ব্যাপারের অবতারণা গ্রন্থকার করিয়াছেন কেন? ইহা 'কামিনীর' উপযুক্তই হইয়াছে; কিন্তু এইরূপ উপন্যাসে 'কামিনীর' ন্যায় স্ত্রীলোকের চরিত্র কি সাজে? হিন্দুর পল্লী-গৃহ-সমাজের শান্ত, শীতল, পবিত্র চিত্রে এই রৌদ্ররসের অবতারণা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে একটি সুন্দর তালে একটি সুন্দর সুর গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে অনেকদূর পর্য্যন্ত বাঁধিয়া যাইতেছিলেন, তাহা কেন শেষকালে—বেসুরা, বেতালা করিয়া ফেলিলেন? তথাপি উপন্যাসখানি সুন্দর হইয়াছে। আর কোন কারণেও না হউক, কেবল ক'নে বউটির জন্যই এই পুস্তক সকলেরই— অন্তত সকল হিন্দু স্ত্রীলোকের—পাঠ করা উচিত।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

বাঙ্গালার ইতিহাস। *

নবাবী আমল।

নানা কারণে নবাবী আমলের ঐতিহাসিক-তথ্যনির্ণয়ের পথ নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এ-কালের লিখিত সে-কালের ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য কেহ কেহ সেকালের ইতিহাসের লুপ্তোদ্ধারের চেষ্টা নিতান্ত পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করেন। তথাপি পূর্ব্বকাহিনীর তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই;—ইহা নূতন কথা না হইলেও, বাঙালীর কলঙ্কের কথা। যাঁহারা এই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রম সফল হইলে, তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে। তাঁহাদের গ্রন্থে যৎসামান্য ভুল-ভ্রান্তি থাকিলে, তাহা কালে ক্রমশ সংশোধিত হইবে। তজ্জন্য তাঁহাদের সাহিত্য-শ্রমের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

ইংরাজলিখিত একদেশদর্শী ঐতিহাসিক মতামতের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদমাত্রই বাঙ্গালার ইতিহাস নামে পরিচিত ছিল। বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্যই তাহা লিখিত ও মুদ্রিত হইত। প্রথম ভাগ আদৌ লিখিত হয় নাই, অথচ দ্বিতীয় ভাগ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ গ্রন্থ বড়ই দুর্লভ। সেই দুর্লভ গ্রন্থ—বাঙ্গালার ইতিহাস!

স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান করিয়া স্বদেশের সুসঙ্কলিত ইতিহাস প্রচার করা যে বঙ্গসাহিত্যসেবকগণের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত, তাহা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বিঘোষিত করেন। তাহার প্রথম ফল,—স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কৃত শিশুপাঠ্য বাঙ্গালার ইতিহাস। সেই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, তাহা "মুষ্টিভিক্ষামাত্র—কিন্তু সুবর্ণমুষ্টি!" তথাপি বঙ্গসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিভাগে স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেই স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার পথপ্রদর্শক বলিতে হইবে।

তাহার পর দুই চারি খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে ইতি-

* শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত।

হাসের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করায়, নানা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। এইরূপ দুই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তথ্যানুসন্ধানের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার লেখনীপ্রসূত নবাবী আমলের সুবৃহৎ ইতিহাস পাঠ করিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ জন্মিয়াছিল। এতদিনে সেই চিরায়মাণ ইতিহাস বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের লৌহকারাগার হইতে বিনির্গত হইল। ইহা বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে আনন্দের সংবাদ।

বাঙ্গালার সুবিস্তৃত ইতিহাস প্রচারের ইহাই প্রথম উদ্যম। প্রথম বলিয়া উৎসাহলাভের যোগ্য;—সর্ব্বতোভাবে স্নেহের চক্ষে দর্শনীয়। ক্রমে যোগ্যতর ব্যক্তি ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত হইবেন; সুতরাং কালে অবশ্যই বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষপাতশূন্য সত্যসিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। এখন মতামত উদ্ধৃত করিয়া নবপ্রকাশিত পুস্তকের কোথায় কি ত্রুটি ও অসঙ্গতি আছে, তাহার বিস্তৃত সমালোচনা লিপিবদ্ধ করা অনাবশ্যক। বর্ত্তমান চেষ্টা যে সর্ব্বাংশে সফল হইতে পারে না, তাহা জানিয়াও, সে চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ইতিহাস লিখিবার সময় হইলেও, বাঙালীর তদুপযোগী সামর্থ্যলাভে এখনও বিলম্ব আছে। এখনও কিছুকাল বিবরণসংগ্রহের ও মতামতের সমালোচনার প্রয়োজন আছে। এ সময়ে তাড়াতাড়ি ইতিহাস নাম দিয়া সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিরাপদ্ বলিয়া বোধ হয় না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইতিহাস পড়িয়া বোধ হইতেছে,—এখনও অনেক পুরাতন বংশের অনুরোধ-উপরোধ ইতিহাসলেখকের স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা প্রদান করে; এখনও বন্ধুবান্ধবের মুখের দিকে চাহিয়া অনেক সরল সিদ্ধান্তকে নিতান্ত জটিল করিয়া তুলিতে হয়। ইহাতে ইতিহাসের মর্য্যাদা নষ্ট হইবার কথা। সঙ্কলিত বৃত্তান্ত বিচার করিয়া যাহা বুঝা উচিত, তাহা না বুঝিয়া,—যাহা বলা উচিত, তাহাতে "হত ইতি গজঃ" করিয়া,—যাহা লিখা উচিত নহে, কষ্টকল্পিত কৈফিয়ৎ সাজাইয়া তাহাই সংস্থাপন করিবার আয়োজনে ইতিহাস রচনা করিলে, কালে তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তজ্জন্য কেহ তিরস্কার করিতে পারিবেন না। তিনি বহরমপুরের বিদ্যালয়ে শিশুশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিয়া, মুরশিদাবাদী স্নেহমমতায় বেষ্টিত হইয়া, বন্ধুবান্ধবের প্ররোচনায় নিয়ত ভারাক্রান্ত কলেবরে নানা অসুবিধায় পতিত হইয়াও যে পরিমাণে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাহা লইয়াই পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। নচেৎ এরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ আদৌ সঙ্কলিত হইত না; হইলেও, উৎসাহলাভের অভাবে প্রকাশিত হইত কি না, সন্দেহ! সেকালের কোন গ্রন্থেই ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কোন গ্রন্থই সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। অথচ তজ্জন্য কোন গ্রন্থকে একেবারে উপেক্ষা করিবারও উপায় নাই। ইহাতেও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে স্বেচ্ছামতে চালিত না হইয়া,

পদে পদে প্রতিহত হইবার কথা। তথাপি, গ্রন্থবিশেষ অবলম্বনে ঘটনাবিশেষের বর্ণনা করিয়া, অন্যত্র সেই গ্রন্থকে উল্লঙ্ঘন ও সমুচিত সমালোচনা দ্বারা উভয়স্থলের দোষ-গুণের ব্যাখ্যা না করায়, স্থানে স্থানে তথ্যানুসন্ধানের অনুরাগ অপেক্ষা, মত-বিশেষের সংস্থাপনকামনার গরজের ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য নিতান্ত গায়ে পড়িয়া অনেক কথা লিখিতে হইয়াছে; নিতান্ত দায়ে পড়িয়া অনুমানবলে অনেক কৈফিয়ৎ রচনা করিতে হইয়াছে। অনেক স্থলে যাহা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সমালোচনা দ্বারা খণ্ডিত না করিয়া তদ্বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রচার করায়, কিয়ৎপরিমাণে অসঙ্গতির অবতারণা করা হইয়াছে। প্রথম চেষ্টায় এরূপ ত্রুটি একেবারে পরিহার করা সম্ভব নহে। সুতরাং এরূপ ত্রুটির দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

বাঙ্গালা কত দিনের সভ্য জনপদ, তাহা নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই। মোসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কবে বক্তিয়ার খিলিজি কি সূত্রে কতদূর পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন এবং কোন্ পাঠানভূপতি কতদিন পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে যাহা লিখিত আছে, তাহাও ভ্রমশূন্য নহে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালার ইতিহাস প্রচারে তাড়াতাড়ি থাকিলে, প্রথমভাগ না লিখিয়াই দ্বিতীয়ভাগ মুদ্রিত করিতে হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তজ্জন্যই হিন্দু, বৌদ্ধ ও পাঠান আমল ছাড়িয়া দিয়া, মোগলশাসনকাল হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

তথাপি এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার হয় নাই। যে সকল পুরাতন গ্রন্থাদি অবলম্বনে এই ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে মতপার্থক্যের অভাব নাই, পক্ষপাতের অভাব নাই, অতি-রঞ্জিত অতিশয়োক্তির অভাব নাই। এই সকল পুরাতন লিখিত প্রমাণের মধ্যে কোন কোন ইংরাজলিখিত চিঠিপত্র ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণ ঘটনার সমসময়ে লিখিত না হইয়া উত্তরকালে লিখিত হইয়াছিল। যাঁহারা লেখক, তাঁহারা কেহই নিরপেক্ষ ইতিহাস-লেখকের উচ্চাসন-লাভের অধিকারী ছিলেন না। এই সকল কারণে, কেবল কতকগুলি পুরাতন পুস্তক হস্তগত হইলেই, নবাবী আমলের ইতিহাস লেখা সম্ভব হয় না। যাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বুঝিয়াছেন—ইহা কত কঠিন, কত শ্রমসাধ্য, কত ব্যয়সাধ্য জটিল ব্যাপার। তজ্জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অপরিসীম পরিশ্রমের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে চিরকাল সমাদর লাভ করিবে। পরবর্ত্তী ইতিহাসলেখকগণ যে ইহা হইতে কত উপকার লাভ করিবেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এই গ্রন্থ এত অধিক বিবরণপুঞ্জে ভারাক্রান্ত যে, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে—ইহা নবাবী আমলের জ্ঞাতব্য তথ্যের সীমাশূন্য দীর্ঘ নির্ঘণ্টবিশেষ। তাহার সহিত

নবাববর্গের চিত্রপট ও বঙ্গভূমির মানচিত্র সংযুক্ত হইয়া গ্রন্থগৌরব সবিশেষ বর্দ্ধিত করিয়াছে।

এখন আর মোগল-পাঠান বাঙালীর "ক্রীড়াপটেও" বিরাজ করে না! যাহারা একদা তরবারিহস্তে অধিকার-বিস্তার-কামনায় এ উহার কণ্ঠশোণিত পান করিবার জন্য বাঙ্গালার বহু যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মত্তবৎ ধাবিত হইত, তাহাদের বংশধরগণ এখন শান্ত, সুধীর, সুশীল বালকের ন্যায় একক্ষেত্রে হলচালনা করিতে করিতে একত্রে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গ্রাম্যসঙ্গীত গান করিতেছে। ঝটিকার পর শান্তির ন্যায় বিপ্লবের পর বিশ্রাম আসিয়া নবযুগের অবতারণা করিয়াছে। এখন ধীরভাবে ভালমন্দের বিচার করিয়া ইতিহাস লিখিতে বসিলে, প্রতিকূল সমালোচনার জন্য, অসহিষ্ণু রাজরোষ আর বিনা বিচারে সহসা কণ্ঠরোধ করিবার আশঙ্কা নাই! এখন মোগল-পাঠান বাঙালীর স্মৃতিপট হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে; বর্গীর হাঙ্গামা, মগ-ফিরিঙ্গীর অত্যাচার, দস্যুদলের উৎপীড়ন, উপকথার অঙ্গীভূত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার ইতিহাসের এই অংশ উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলপূর্ণ,—উপন্যাসের ন্যায় বহু বিস্ময়ের আকর! কিন্তু এতকাল পরেও এই অংশের আলোচনা করিবার সময়ে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেন স্থানে স্থানে নিতান্ত সসঙ্কোচে লেখনীচালনা করিয়াছেন! নবাবী আমলের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে;—কিন্তু নবাবী আমল তিরোহিত হইল কেন, তাহার সমালোচনা করা গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হইলেও, তাহা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হয় নাই। বলিতে বলিতে অনেক কথাই অর্দ্ধোক্ত রহিয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত বৃত্তান্তভারে ভারাক্রান্ত হইয়া, লেখকের মূলসূত্র যেন কোথায় সহসা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে!

বৃত্তান্তসমষ্টির নাম ইতিহাস নহে,—তাহা ইতিহাসের উপাদানমাত্র। সেই উপাদান অবলম্বন করিয়া কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার বিশদব্যাখ্যায় ঘটনাবলীর মর্ম্মোদ্ঘাটন করাই ইতিহাসের কার্য্য। নবাবী আমলের ইতিহাসের আদ্যোপান্ত তদনুসারে লিখিত হইলে ভাল হইত;—শেষের দিকে ক্রমেই যেন ঘটনাবিবৃতি প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বিশেষজ্ঞ ভিন্ন, এত অধিক ঘটনাবিবৃতি পাঠ করিয়া তাহা হইতে সারোদ্ধার করিয়া রসবোধ করা সাধারণ পাঠকের অধ্যবসায়ে কুলাইয়া উঠিবার সম্ভাবনা অল্প। তথাপি যাঁহারা আদ্যন্ত পাঠ করিতে পারিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বহু-জ্ঞাতব্য-তথ্য-লাভে শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস লোকশিক্ষার উপাদানে পরিপূর্ণ। কত অল্পব্যয়ে সংসার চালাইয়া সভ্যসমাজ সৎকীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারে,—কত অল্প সেনাবলে দেশ সুরক্ষিত ও দেশ বিজিত হইতে পারে,—কত তুচ্ছ কারণে দেশের লোকে দেশের ভালমন্দে উদাসীন হইয়া স্বার্থসিদ্ধির প্রলোভনে অকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতে পারে,—কত অল্পব্যয়ে যৎসামান্য যন্ত্র-সংযোগে বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত বিচিত্র

পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইতে পারে,—তাহা বুঝি কেবল বাঙ্গালার ইতিহাসেই দেদীপ্যমান। বাঙালী কত অল্পে পরিতৃপ্ত;—এমন নিরীহ, এমন শান্তিপ্রিয়, এমন কুশাগ্রবুদ্ধি সভ্যজাতি বুঝি আর কোন দেশে নাই! অন্যদেশের দৃষ্টান্ত ধরিয়া ইতিহাস লিখিতে গিয়া বিদেশীয় লেখকবর্গ কত ভ্রমেই না পতিত হইয়াছেন! কেহ বলিয়াছেন—বাঙালী ভীরু! কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; বাঙালী মরিতে ভয় করে নাই। কেহ বলিয়াছেন—বাঙালী দুর্ব্বল! কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যদান করে না। বাঙালীর বীরবাহুই বৃটিশরাজ্যস্থাপনের প্রথম সহায়! বাঙালীর জাতীয়জীবনে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল; জাতীয়কল্যাণকামনায় একপ্রাণতা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি দুর্ব্বল। এই দুইটি বাঙালীর প্রধান কলঙ্ক,—ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের সর্ব্বত্র সুব্যক্ত। সেইজন্য বাঙ্গালার ইতিহাস বাঙালীর জাতিগত সুকীর্ত্তি-কুকীর্ত্তির ইতিহাস নহে, ব্যক্তিগত সুকীর্ত্তি-কুকীর্ত্তির জীর্ণস্তূপ! না বুঝিয়া বিদেশের লোকে ব্যক্তিগত দোষ-গুণ জাতিশীর্ষে সংস্থাপিত করিয়া ইতিহাস-রচনা করিয়া গিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জাতীয়-অনুরাগ-বশত ব্যক্তিগত কুকীর্ত্তির কৈফিয়ৎ সংগ্রহ করিয়া প্রধান প্রধান পাত্রমিত্রগণকে ইতিহাসের কশাঘাত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষীণ উদ্যমে লেখনী-চালনা করিয়াছেন। মীরজাফরখাঁকে সমস্ত ইতিহাসলেখক ভৎর্সনা করিয়া গিয়াছেন; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখনীবলে তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া এত অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে!

নবাবী আমলে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু জনশ্রুতির সন্ধান পাওয়া যায়। শুনা যায়,—সেকালে মাসিক একটাকা আয় হইলেই না-কি লোকে প্রত্যহ কোর্ম্মা-পোলাও আহার করিতে পারিত। কিন্তু একদিকে সুলভ ভোজ্য, অন্যদিকে বর্গীর হাঙ্গামা, মগ-ফিরিঙ্গীর উপদ্রব, দস্যু-তস্করের উৎপীড়ন! একদিকে নিত্য বিপ্লব,—আবার অন্যদিকে দেবমন্দির ও মস্‌জেদ্‌-চূড়া মস্তক উত্তোলন করিত, জলদৈন্য দূর করিবার জন্য পুণ্য-প্রয়াসে দীর্ঘ দীর্ঘিকা খনিত হইত। এই সকল কথা কতদূর সত্য, নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শিশুপাঠ্য সরল ইতিহাস "সুবর্ণমুষ্টি";—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রৌঢ়পাঠ্য জটিল-গ্রন্থ "সুবর্ণস্তূপ"। শিল্পনিপুণ অধ্যবসায়-শীল পরবর্ত্তী লেখকগণ এই স্তূপ হইতে সুবর্ণ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে বহু রত্নালঙ্কার সংযুক্ত করিতে পারিবেন। আকরোত্থিত ধাতুপিণ্ডের সহিত অনেক অসার আবর্জ্জনা মিশ্রিত থাকিলেও তাহার মূল্য নষ্ট হয় না; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক সুবর্ণস্তূপের সহিত অনেক অসঙ্গত মতামত সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, তাহারও মূল্য নষ্ট হইবে না। বরং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় তথ্যানুসন্ধাননিপুণ অধ্য-বসায়শীল লেখক ঐতিহাসিক পাত্রমিত্র-গণের প্রকৃত-মর্য্যাদা-নিরূপণের পথ সহজ

করিয়া দিলেন। লোকে এখন তাঁহার মতামতের সহিত অন্যান্য মতামত তুলনায় সমালোচনা করিয়া সহজে তথ্যনির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে।

চরিতাখ্যায়ক এবং ইতিহাসলেখকের কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। চরিতাখ্যায়ক দেশের দিক্ দিয়া না দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষের দিক্ দিয়া ঘটনাবিচার করিতে পারেন; কিন্তু ইতিহাসলেখককে প্রধানত দেশের দিক্ দিয়া দেখিয়াই ঘটনাবিচার করিতে হয়। কোন্ ঐতিহাসিক পাত্র কিরূপ অবস্থাচক্রে পতিত হইয়া কোন্ ঘটনায় লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনার ভার চরিতাখ্যায়কের উপর রাখিয়া দিয়া, কাহার কার্য্যে দেশের কিরূপ উন্নতি-অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল, কেবল তাহারই আলোচনা করিলে, নবাবী আমলের ইতিহাস এত জটিল ও বৃহদায়তন হইত না। নবাবী আমলের কার্য্যকলাপের মধ্যেই মোসলমানশাসনের ধ্বংসবীজ নিহিত ছিল; তাহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। যাঁহারা সযত্নসিঞ্চিত বারিধারায় সেই বিষবৃক্ষের উন্নতিসাধন করেন, তাঁহারা মোসলমানশাসন উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে কদাপি চেষ্টা করেন নাই;—তাঁহাদের কর্ম্মফলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে নবাবীশাসন উৎখাত হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের কার্য্যকলাপ যে সর্ব্বথা নিন্দনীয়, তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজেও স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; অথচ ইঁহাদের কার্য্যকলাপের জন্য ইঁহাদের বিশেষ অপরাধ ছিল না, এই ভাব পরিস্ফুট করিতে গিয়া অনেক কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সে চেষ্টা সফল হয় নাই; বরং উদ্ধৃত প্রমাণাবলী তাহা সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দিয়াছে! এ পর্য্যন্ত নবাবী আমলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যে সকল প্রমাণ ক্রমশ লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রতিকূল প্রমাণ আবিষ্কৃত না করিয়া, কেবল প্রতিকূল মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে,—এ পর্য্যন্ত অন্যান্য লেখক এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভ্রমসঙ্কুল; এক্ষণে যাহা লিখিত হইতেছে, তাহাই যথার্থ ইতিহাস। এই ভাব, গ্রন্থের আদ্যন্ত সংগোপনের চেষ্টা থাকিতেও, পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে! এরূপ সভয়ে সমালোচনা না করিয়া, অকুতোভয়ে পূর্ব্বপ্রকাশিত মতামত উদ্ধৃত করিয়া, তাহার অসারত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিলে ভাল হইত; ভ্রান্ত মত সংশোধনের উপায় হইত। নিতান্ত নগণ্য ঘটনার বিস্তৃত আলোচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের ভুলভ্রান্তি ইঙ্গিতে প্রদর্শিত করিয়া বিশেষ ফল হয় নাই। মূল সিদ্ধান্তগুলি তদ্দ্বারা নিরাকৃত হয় না; মনের সন্দেহ তদ্দ্বারা বিদূরিত হয় না; নবাবী আমলের নবপ্রকাশিত ইতিহাসের সিদ্ধান্তই যে সর্ব্বত্র সমীচীন, তাহাও তদ্দ্বারা সংস্থাপিত হয় না!

নবাববিশেষের ব্যক্তিগত চরিত্রহীনতা নবাবীশাসন তিরোহিত হইবার মুখ্যকারণ বলিয়া বোধ হয় না;—দেশের রাজপুরুষবর্গের সাধারণ চরিত্রহীনতাই প্রকৃত কারণ। নবাবী আমল উৎখাত হইয়া

বৃটিশশাসন সংস্থাপিত হইয়াছে। নবাবী-শাসন উৎখাত হইবার যে কারণ, বৃটিশ-শাসন সংস্থাপিত হইবারও সেই কারণ। নবাবীশাসন উৎখাত হইল কেন, কোন সুযোগ্য ইতিহাসলেখক তাহার সমালোচনা করেন নাই; কিন্তু বৃটিশশাসন সংস্থাপিত হইল কেন, বহু সুযোগ্য ইতিহাসলেখক তাহার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের চরিত্রহীনতাই যে তাহার মূল, তাহাই তাঁহাদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সিদ্ধান্ত কি, তাহা পরিষ্কার বুঝিয়া উঠা যায় না, বৃত্তান্তপুঞ্জে সে সিদ্ধান্ত ডুবিয়া গিয়াছে; এবং যে ভাবে বৃত্তান্তপুঞ্জ সজ্জীভূত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত লুক্কায়িত হইয়া নবাববিশেষের ব্যক্তিগত চরিত্রহীনতাই বঙ্গবিপ্লবের মূল বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। ইহা হয় ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিজেরও অভিপ্রেত নহে; কারণ, তাঁহার ন্যায় ইতিহাস-পাঠকের নিকট সত্যসিদ্ধান্ত অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। কিন্তু অনুরোধ-উপরোধে গ্রন্থের ফল অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে;—গ্রন্থপাঠ শেষ করিলে পাঠকচিত্তে এইরূপ ভাবই জাগিয়া উঠিবে!

এই সকল ত্রুটি ও মতভেদ থাকিলেও, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস, বৃত্তান্ত-সঙ্কলন-গৌরবে বঙ্গসাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য হইয়াছে। কোনস্থলে ইঙ্গিতে, কোনস্থলে সংক্ষেপে, কোনস্থলে বা বিস্তার-বাহুল্যে নবাবী আমলের প্রায় সকল কথাই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল বৃত্তান্ত যে সকল পুরাতন প্রচলিত-অপ্রচলিত গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত, তাহারও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালার ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন, তাঁহাদের শ্রম যে এতদ্দ্বারা অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপভাবে বৃত্তান্তসঙ্কলন করিয়া স্বদেশের ইতিহাসরচনার চেষ্টা অতি অল্পদিনমাত্র আরব্ধ হইয়াছে; কালে এইরূপ চেষ্টা হইতেই ইতিহাস সুগঠিত হইবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সংস্কৃত-ব্যাকরণের ইতিবৃত্ত।

জর্ম্মান্ শব্দতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক রট (Roth) বলেন, অন্যান্য দেশে যেরূপে ব্যাকরণশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, ভারতবর্ষেও ঠিক সেইরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎপত্তি হইয়াছে। কেবলমাত্র চলিত ভাষা হইতে ইহা জন্মগ্রহণ করে নাই; পরন্তু কথিত ও লিখিত ভাষার পার্থক্য যখন মনুষ্যের ভাবিবার বিষয় হইয়াছিল, তখনই ইহার জন্মলাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমে ব্যাকরণ এই সমস্ত কথিত ও লিখিত ভাষার পার্থক্যপ্রদর্শনেই তৎপর ছিল। তার পর কেবল সমাজবিশেষে প্রচলিত ও সাহিত্যবিশেষেরই অনুশাসনে প্রযুক্ত হয় এবং ক্রমে কালসহকারে, কি কথিত কি লিখিত, উভয়বিধ ভাষারই প্রবেশদ্বার প্রস্তুত ও ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর সর্ব্ববিধ সংস্কৃতসাহিত্যের শব্দের অনুশাসন করিতে থাকে। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শব্দানুশাসন সর্ব্বপ্রথমে আমরা পাণিনিতেই দেখিতে পাই। এই সময় হইতেই সমাজবিশেষে প্রচলিত ও সাহিত্যবিশেষের অনুশাসনে নিরত ব্যাকরণগুলি বিলুপ্ত হইতে থাকে।

ব্যাকরণ কেন বেদাঙ্গ হইল, * তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ডাক্তার বর্ণেল (Burnell) বলেন, প্রাচীনতম যুগের ভারতের সমুদয় গ্রন্থই ছন্দোবদ্ধ। এইহেতু সংস্কৃত-ভাষা-সম্বন্ধে ছন্দঃশাস্ত্র বেদের ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে অতি আবশ্যক বলিয়া আলোচিত হইয়াছে। এই সময়ে শব্দশাস্ত্রেরও সামান্য সামান্য আলোচনা বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ইতিপূর্ব্বেই বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। বেদশাস্ত্রকারগণের মধ্যে যাঁহাদের নিজের মত অক্ষুণ্ণ প্রতিপন্ন করিবার জন্য অভিনব পন্থা আবিষ্কার আবশ্যক হইয়াছিল, তাঁহারাই শব্দশাস্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। এইজন্যই আমরা বেদের ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে নানাপ্রসঙ্গে ধাতু, প্রত্যয় প্রভৃতি ব্যাকরণের আবশ্যক বিষয়ের বাদানুবাদ দেখিতে পাই। একপক্ষে সুনিপুণভাবে পদ ও সংহিতাশাস্ত্রের সম্বন্ধবিনির্ণয় ও শব্দের বিশ্লেষণ দেখান হইয়াছে—ইহা হইতেই শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের উৎপত্তি †। অন্যপক্ষে পদসাধন ও শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং ইহা হইতেই নিরুক্ত ও বাক্যের অর্থ লইয়া পদযোজনাসম্বন্ধে বাদানুবাদের উৎপত্তি

* শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাঞ্চয়ঃ।
জ্যোতিষাময়নঞ্চৈব বেদাঙ্গানি ষড়েব তু॥

† নিরুক্ত ১।১৭। দুর্গাচার্য্যের টীকা।

হয়। এইরূপে যখন বৈদিক সূত্রসমূহকে পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন হইতে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই ব্যাকরণ-নামক বেদাঙ্গের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব প্রাচীনতম কাল হইতে বৈদিকসূত্রের শব্দগত অর্থ নির্ণয় করিতে শব্দবিশ্লেষণের সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল। শব্দসমূহ যে অতি বুদ্ধিমত্তার সহিত বিশ্লেষিত হইত, তাহা প্রাতিশাখ্যপাঠে আমরা অবগত হইতে পারি। অনেক আবশ্যক-অনাবশ্যক ও সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতিও প্রাতি-শাখ্যকারগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। বিশেষত তাঁহাদের সময়ে শব্দসকলের অশুদ্ধোচ্চারণ যে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের এ বিষয়ে অতিসাবধানতা হইতেই অনুমান করিতে পারি *। এইরূপে দেখিতে পাই, কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের নির্দ্দেশ (Physiological analysis of sound) প্রাচীন ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একটি প্রধান বিষয় ছিল।

পাণিনির পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকরণ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই ব্যাকরণ কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থকে না বুঝাইয়া ব্যাকরণশাস্ত্রকেই লক্ষ্য করিত। ঋক্, যজু ও অথর্ব্ববেদের প্রাতিশাখ্যগুলিকে এক এক খানি বেদাঙ্গ-ব্যাকরণ বলিলেও বলা যায়। অধ্যাপক গোল্ড্‌ষ্টুকর্ (Prof. Gold-stucker) বলেন, † বেদাঙ্গ বলিতে কেবলমাত্র পাণিনির ব্যাকরণকেই বুঝাইত; কিন্তু অধ্যাপক রট, ডাক্তার বর্ণেল প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিত তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, পাণিনির পূর্ব্বে প্রচলিত সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্রকেই বেদাঙ্গ বলিত। ঋগ্বেদের ‡ টীকায় সায়ণাচার্য্য যে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে তিনি কোন ব্যক্তি-বিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করেন নাই। আর দুর্গাচার্য্যের "ব্যাকরণম্ অষ্টধা নিরুক্তং চতুর্দ্দশধা" প্রভৃতি উক্তি হইতেও আমরা ইহাই বুঝিতে পারি।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই § বোধ হয় ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অক্ষর, অক্ষরপংক্তি, চতুরক্ষর, বর্ণ, কার (ক-কার, খ-কার প্রভৃতি) ও পদ ইত্যাদির অল্পাধিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরে শুক্লযজু-র্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে ¶ "একবচনেন বহু-বচনং ব্যবায়ামেতি" প্রভৃতি ব্যাক-

* ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

† Academy, July, 1870.

‡ Sayana's com: on the Rigv. I. P. 34. (Ed. Maxmuller)

§ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১ম, ২য় ও ৫ম অধ্যায়।

¶ শতপথব্রাহ্মণ Dr. Weber's Edition P.990. (ইহাতে ধাতু প্রভৃতিরও ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়।)

রণের কথা দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে * স্পর্শ, স্বর, উষ্মন্ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে † "শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্থামঃ। বর্ণাঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ।" প্রভৃতির উল্লেখ আছে। গোপথব্রাহ্মণে ‡ ওঙ্কারের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ধাতু, প্রাতিপদিক, নাম, আখ্যাত, লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি, স্বর, উপসর্গ ও নিপাত প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রায় অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

নিরুক্তি, § শিক্ষা প্রভৃতিতে ব্যাকরণের কোন কোন বিষয় আলোচিত হইলেও, সেগুলিকে ব্যাকরণশ্রেণীতে আনয়ন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্যাকরণে যাহা যাহা থাকা উচিত, প্রাতিশাখ্যে যদিও সে সমস্ত বিষয় নাই, তথাপি এগুলি ব্যাকরণশ্রেণীর গ্রন্থ। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণশিক্ষার নিমিত্ত এই সমস্ত প্রাতিশাখ্য বিরচিত হয় নাই, কিংবা শব্দ, ধাতু প্রভৃতির প্রকৃতি অথবা গঠনপ্রণালী সম্বন্ধেও ইহাতে কোন নিয়মাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণাদি-সম্বন্ধে পাণিনি যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন, সে সমস্তই তিনি প্রাতিশাখ্য হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন ¶।

বস্তুত পদ অথবা সংহিতার প্রত্যেক শব্দ কথিতভাষায় অথবা সঙ্গীতে কিরূপ উচ্চারণবৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, উচ্চারণাদিভেদে কেমন করিয়া এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, প্রাতিশাখ্যে তাহাই শিক্ষা দেয়। এই নিমিত্তই প্রাতিশাখ্যে শব্দসমূহের উচ্চারণ, উচ্চারণাদির লঘুগুরুভেদ, প্রত্যেক অক্ষর অথবা শব্দের উচ্চারণের বিশেষ বিশেষ নিয়ম, প্রকৃতি, কার্য্যকারিতা, দুই বা ততোধিক শব্দের সন্ধিবিধি প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাতিশাখ্যের মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যই প্রাচীনতম। মহামুনি শৌনক || ইহার রচয়িতা। গ্রন্থখানি সরল ছন্দে বিরচিত, সুতরাং স্মরণে রাখিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাকর। সূত্রগুলি অতি সহজ; পাণিনির ন্যায় ইহাতে পারিভাষিক কৌশল একটুও প্রদর্শিত হয় নাই। শৌনক

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ২।২২।৩, ৫।

† তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (ডা॰ রাজেন্দ্রলাল মিত্র) ৭২৫ পৃ॰।

‡ গোপথব্রাহ্মণ (ডা॰ রাজেন্দ্রলাল মিত্র) ১।২৪।

§ নিরুক্তির্যোগতো নাম্নামন্যার্থত্বপ্রকল্পনম্।
ঈদৃশৈশ্চরিতৈর্জানে সত্যং দোষাকরো ভবান্ ॥

চন্দ্রালোক, ৫।১৬৮।

¶ Maxmuller's History of the Ancient Sanskrit Literature.

|| সূত্রভাষ্যকৃতঃ সর্ব্বান্ প্রণম্য শিরসা শুচিঃ।
শৌনকস্য বিশেষেণ যেনেদং পার্ষদং কৃতম্ ॥

ঋক্প্রাতিশাখ্যটীকায় উবটভট্ট।

শাকল্যের গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। পাণিনি স্বীয় গ্রন্থে যে ৩৪টি শাকল্যের সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গোল্ড্‌ষ্টুকর্ (Goldstucker) বলেন, ঋক্‌প্রাতিশাখ্য পাণিনির পরে বিরচিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে, ইহার বর্ণনীয় বিষয় পাণিনি অপেক্ষা বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ। কিন্তু উভয় পুস্তকের সাদৃশ্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। "ন" কিরূপে "ণ"তে ও "স" কিরূপে "ষ"তে (ঋক্-প্রা° ৫ম অ°) পরিবর্ত্তিত হয়, এবং 'অ'-'ই'-'উ'-এর দীর্ঘ-উচ্চারণ বিধি, (ঋক্-প্রা° ৭ম, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়) পাণিনি ও প্রাতিশাখ্যকার একই নিয়মে সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাণিনির অসম্পূর্ণতা ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। উল্লিখিত ণত্ব-ষত্ব ও হ্রস্ব-দীর্ঘ বিধান পাণিনিতে অসম্পূর্ণ থাকিলেও ঋক্‌প্রাতিশাখ্য কেবলমাত্র ঋগ্বেদের শাকল-শাখার সহিত সম্বন্ধযুক্ত; সুতরাং শুদ্ধ ঐ শাখার প্রয়োজনীয় বিষয় শৌনক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণ বেদের শাখাবিশেষ অথবা আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থবিশেষের জন্য নহে। লৌকিক সংস্কৃতভাষার সম্পূর্ণ একখানি ব্যাকরণ প্রণয়নই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বৈদিক ব্যাকরণ যে তিনি সংক্ষেপে সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং শৌনক সেই পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অন্যতম। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের দুইপ্রকার টীকা বর্ত্তমান। তন্মধ্যে উবটভট্টের "পার্ষদ-ব্যাখ্যাই" প্রসিদ্ধ। উবটভট্টের নিবাস আনন্দপুরে (বারাণসী?) ছিল। ঋক্‌প্রাতিশাখ্য আশ্বলায়ন-সূত্র অপেক্ষাও প্রাচীনতর। আশ্বলায়ন শৌনকেরই ছাত্র ছিলেন। ইহা তিন কাণ্ড ও প্রত্যেক কাণ্ড ছয় পটলে বিভক্ত। এই প্রাতিশাখ্যখানি যে বৈদিক যুগ হইতে অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা অনেকেই মনে করেন না।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে তত মৌলিকতা দৃষ্ট হয় না। অধ্যাপক হুইট্‌নী (Whitney) মনে করেন যে, ইহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের ন্যায় সূত্রগুলি সরল নহে। পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ অতি বহুল। ইহার টীকাকারের নাম উল্লিখিত নাই। তিনি না-কি বররুচি, আত্রেয় ও মাহিষেয় নামক এই প্রাতিশাখ্যের টীকাকারগণের টীকা হইতে তাঁহার ভাষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই টীকায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিরচিত সায়ণাচার্য্যের কালনির্ণয়নামক পুস্তকের উল্লেখ আছে।

শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যও পরবর্ত্তী কালের পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। কাত্যায়ন ইহার প্রণেতা বলিয়া ইহাকে কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্য বলে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সংজ্ঞা ও পরিভাষা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দসকলের উচ্চারণের নিয়ম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে সংস্কার অর্থাৎ সন্ধির নিয়মানুসারে অক্ষরের ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন ও স্বাতন্ত্র্য, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়া-

পদের উপর যতিপাতের নিয়ম ও উচ্চারণ-বিধি, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের তালিকা, গ্রন্থপাঠের নিয়ম এবং যাস্কের নিয়ম অনুসারে শব্দসকলের বিভাগ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন, শাকল্য, গার্গ্য, (ঋক্‌প্রাতিশাখ্যেও ইঁহাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়) কাশ্যপ, দাল্‌ভ্য, জাতুকর্ণ্য, শৌনক, (ঋক্-প্রা০-কার?) ঔপশিবি, কাণ্ব প্রভৃতির নাম উল্লিখিত আছে। ইহার মাতৃমোদক নামে উবটের টীকা অতি প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত নিতান্ত আধুনিক কালে বিরচিত "প্রাতিশাখ্য-জ্যোৎস্না" নামে ইহার আর একখানি টীকা আছে। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র রামচন্দ্র ইহার রচয়িতা। অধ্যাপক গোল্ড্‌ষ্টুকর (Prof. Goldstucker) মনে করেন, এই কাত্যায়ন ও পাণিনির ভাষ্যকার কাত্যায়ন একই ব্যক্তি। কিন্তু তিনি ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেন নাই। কেবল নামসাদৃশ্যে এ বিষয়ের প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। আর পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণের সূত্রে (৪।১।১৮) যে কাত্যায়নের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিও বোধ হয় এই প্রাতিশাখ্যকার। কেন না, ভাষ্যকার পাণিনির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শৌনকীয় চাতুরধ্যায়িকা অথর্ব্ববেদ-প্রাতিশাখ্যের অন্যতর নাম। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যকার ইহার রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এখানি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাতিশাখ্যগুলি অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় পুষ্প-ঋষি-প্রণীত সামবেদ-প্রাতিশাখ্য মুদ্রিত করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া বোপদেব আটজনমাত্র শাব্দিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন *। ইঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণের প্রণেতা, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রণীত কোন ব্যাকরণ আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বাদশশতাব্দীতে বিরচিত সোমদেবের কথাসরিৎসাগরনামক গল্পপুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি, পাণিনির ব্যাকরণের আবির্ভাবের পর হইতেই ইন্দ্র-ব্যাকরণের চর্চ্চা বিলুপ্ত হয়। বৃহৎকথা-মঞ্জরী হইতেই কথাসরিৎসাগরের গল্পগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতেও ঠিক এই-রূপই উল্লিখিত আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী হইতেও ইন্দ্রব্যাকরণের কথা জানিতে পারা যায়। অবদানশতকে লিখিত আছে, শারিপুত্র বাল্যকালে ইন্দ্রব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন †। তিব্বতীয় ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়, ‡ সর্ব্বজ্ঞান (শিব) সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই ব্যাকরণ তিনি জম্বুদ্বীপে কখনও প্রেরণ করেন নাই। ইন্দ্র ইন্দ্রব্যাকরণের

---

* ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥
ধাতুপাঠ, উপক্রমণিকা।

† Eugene Burnouf.

‡ Taranath's Tibetan History of the Indian Buddhism. P. 294 ; 54.

প্রণয়ন ও বৃহস্পতি ইহা অধ্যয়ন করেন। পাণিনির ব্যাকরণ প্রচলিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জম্বুদ্বীপে এই ব্যাকরণই প্রচলিত ছিল। অন্য একস্থানে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ বলিতেছেন—সপ্তবর্ম্মন্ (সর্ব্ববর্ম্মন্ ?) ষণ্মুখকে (কার্ত্তিকেয়) ইন্দ্রব্যাকরণ প্রকাশ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, কার্ত্তিকেয় বলিলেন, "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ।" এইটুকু শুনিয়াই সপ্তবর্ম্মন্ (সর্ব্ববর্ম্মন্) ব্যাকরণের অবশিষ্ট সমুদয় অংশ বুঝিতে পারিলেন। ইহা কাতন্ত্র অর্থাৎ কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। সুতরাং তারানাথের সময়ে ষোড়শ শতাব্দীতে কাতন্ত্র-ব্যাকরণ ঐন্দ্র-ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, বুঝিতে পারা যায়। আর তারানাথ তাঁহার ইতিহাসেও লিখিয়াছেন যে, পণ্ডিতগণের মতে কলাপ-ব্যাকরণ ইন্দ্রব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। তারানাথ সপ্তবর্ম্মন্‌কে কালিদাস ও নাগার্জ্জুনের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের টীকায় সায়ণাচার্য্যের উল্লিখিত একটি বাক্য হইতেও ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বৈয়াকরণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় *। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত ভোজচম্পূতে "ঐন্দ্রী বাগিব" ও দুর্গাচার্য্যের নিরুক্তবৃত্তিতে "যথার্থং পদমৈন্দ্রাণাম্" প্রভৃতি বাক্য দৃষ্ট হয়। সারস্বত ব্যাকরণের টীকায় "ইন্দ্র প্রভৃতিও যে শব্দসমুদ্রের অন্তে যাইতে পারেন নাই" প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা ইন্দ্রকেই প্রথম ও প্রধান বৈয়াকরণ বলা হইয়াছে। যক্ষবর্ম্মন্‌ও তাঁহার শাকটায়ন-ব্যাকরণের টীকায় "ইন্দ্রচন্দ্রাদিভিঃ শাব্দৈর্যদুক্তং শব্দলক্ষণম্" প্রভৃতিতে ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইন্দ্র-ব্যাকরণনামক কোন গ্রন্থ এক্ষণে বর্ত্তমান না থাকিলেও এক কালে ছিল এবং পাণিনির ব্যাকরণের ন্যায় পাণিনির পূর্ব্বে তাহা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

শাকটায়ন একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। যজুর্ব্বেদের কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্য, অথর্ব্ববেদ-প্রাতিশাখ্য ও পাণিনির ব্যাকরণে ইঁহার সূত্রসমূহ প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। নিরুক্ত শব্দবিজ্ঞানসম্বন্ধে একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। যাস্ক ইহাতে শাকটায়নের আবিষ্কৃত সমস্ত নাম যে ধাতুজ, তাহা সপ্রমাণ ও গার্গ্যের প্রতিবাদের নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাস্কের নাম ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শাকটায়ন প্রাতিশাখ্যকারগণেরও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, আমরা অনুমান করিতে পারি। শাকটায়নের ব্যাকরণে ইন্দ্র, আর্য্যবজ্র প্রভৃতি দুই এক জন বৈয়াকরণের নাম দৃষ্ট

* বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদৎ তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি। সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ (প্র)গৃহ্যতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে। [তৈ॰ স॰ ৬।৪।৭।৩।] ইতি।

মোক্ষমূলর-সম্পাদিত ঋগ্বেদ, ১মখণ্ড, ২য় সংস্করণ ১৯ পৃ॰, ১ম সং॰ ৩৫ পৃ॰।

হয় *। সুতরাং ইন্দ্র সর্ব্বপ্রথম বৈয়াকরণ হওয়া অসম্ভব নহে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ বূলার মলয় (malayalam) অক্ষরে লিখিত শাকটায়ন-ব্যাকরণের সমগ্র হস্তলিপি ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীতে প্রদান করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই।

আপিশলি পাণিনির পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে তাঁহার নাম † উল্লিখিত আছে। উজ্জ্বলদত্ত তাঁহার উণাদিসূত্রের কয়েক স্থানে এবং সায়ণাচার্য্য তাঁহার ধাতুবৃত্তি ও পদচন্দ্রিকায় (১৪৩১ খৃ॰ লিখিত) অনেক স্থানে আপিশলির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি উদ্ধৃত সূত্র দেখিয়া অধ্যাপক আউফ্রেট্ (Dr. Aufrecht) অনুমান করেন, তিনি একজন শাব্দিক ছিলেন।

পূর্ব্বেই একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। পাণিনির পূর্ব্বে ও পরে বহুতর শাব্দিক অথবা বৈয়াকরণ বর্ত্তমান ছিলেন। বোপদেব তবে কেবলমাত্র আটজনের নাম উল্লেখ করিলেন কেন? অবশ্য, এই আটজন ব্যতীত অনেক বৈয়াকরণেরই নাম তাঁহার জানা ছিল। যাস্কের নিরুক্তে, ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যে, তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যে, কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্যে, অথর্ব্ববেদ-প্রাতিশাখ্যে তিনি বহুতর নামের উল্লেখ পাইয়াছেন। আর পাণিনির ব্যাকরণে যেমন আপিশলি, শাকটায়ন প্রভৃতির মত উদ্ধৃত আছে, তেমনি গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্ম্মন্, পৌষ্করসাদি, শাকল্য, শৌনক, স্ফোটায়ন প্রভৃতির নাম ত আছে, তবে ইঁহারা শাব্দিক-শ্রেণীতে পড়িলেন না কেন? হইতে পারে, ইঁহাদের অনেকেই কোন শব্দগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই অথবা প্রণয়ন করিয়া থাকিলেও বোপদেবের সময়ে সে সমস্ত বর্ত্তমান ছিল না; কিন্তু তাই বলিয়া কাতন্ত্র অথবা কলাপ ব্যাকরণের নাম উল্লিখিত হইল না কেন? পাণিনির ব্যাকরণের নিম্নেই যাহাকে আসন প্রদান করা যাইতে পারে, সেখানি পরিত্যক্ত হইল কেন? ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কলাপ-ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বোপদেব নিজে "ক্তান্তাস্ত্রৌ দলী" এই সূত্রে কলাপব্যাকরণেব পারিভাষিক শব্দ "লি" লিঙ্গের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছেন, এ কথা আমরা মুগ্ধবোধের টীকা হইতেই জানিতে পারি। বোপদেবের কবিকল্পদ্রুমের টীকা কাব্যকামধেনুতে ত্রিলোচনদাসের কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা অর্থাৎ কাতন্ত্র-ব্যাকরণের টীকা হইতে অনেক বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। দুর্গাদাস বলেন, এই কাব্যকামধেনু বোপদেবের নিজের রচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া উজ্জ্বলদত্ত কাতন্ত্র-ব্যাকরণের সূত্রসমূহ স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বোপদেব ও ইনি সমসাময়িক লোক। ধাতুসম্বন্ধে প্রাচীন লেখক মৈত্রেয় রক্ষিত কলাপ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। বোপদেব এই সমস্ত শাব্দিক অথবা বৈয়াকরণের নাম কেন উল্লেখ করিলেন না, এ সম্বন্ধে ডাক্তার

* Dr. George Buhler "Orient and Occident. III. P. 182.

† পাণিনি ৬।১।৯২।

বর্ণেল যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা অনেকটা সমীচীন মনে করি। তাঁহার মতে ইন্দ্রনামক কোন বৈয়াকরণ কোনদিন ছিলেন না *। পাণিনির পূর্ব্বে কেবল দুই এক জন ব্যতীত যিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিতেন, তাহারই নাম ইন্দ্রব্যাকরণ রাখিতেন। যেমন কথাসরিৎসাগরে কাত্যায়ন বলিতেছেন, "তেন প্রনষ্টমৈন্দ্রং তদস্মদ্‌ব্যাকরণং ভুবি।" নিরুক্তবৃত্তিতে "যথার্থং পদমৈন্দ্রাণাম্" ইত্যাদি। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ষোড়শ শতাব্দীতে তিব্বতপ্রদেশে কলাপ-ব্যাকরণকে ইন্দ্রব্যাকরণ বলিত। ডাক্তার বর্ণেল তোলকাপ্‌পিয়ম্-(Tolkappiyam)-নামক তামিল ব্যাকর কাতন্ত্র-ব্যাকরণ ও কাত্যায়নের পা ব্যাকরণের গঠন-প্রণালী ও বিষয়নির্ব্বাচনে যে একই-প্রকার, তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৈয়াকরণত্রয় স্ব স্ব ব্যাকরণের বিষয় ও গঠনপ্রণালী নির্ব্বাচনে পাণিনির অনুসরণ না করিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণ করিয়াছিলেন। (কাহারও কাহারও মতে পালি-ব্যাকরণ-প্রণেতা কাত্যায়ন পাণিনির পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।) প্রাতিশাখ্যের পদবিভাগ ও উক্ত ব্যাকরণ-ত্রয়ের পদবিভাগে অনেক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইঁহারা সকলেই যে ইন্দ্র-ব্যাকরণের অনুসরণ করেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব ইন্দ্র-ব্যাকরণের অনুযায়ী বলিয়াই বোধ হয় বোপদেব ঐ সকল বৈয়াকরণ অথবা শাব্দিকের নাম উল্লেখ করেন নাই।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর পাণিনির আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের সোমদেব ভট্ট কথাসরিৎ-সাগর-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে লিখিত আছে, কাত্যায়ন-বররুচি বৎসদেশের রাজধানী কৌশাম্বীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান্ ছিলেন ও তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। তিনি মহর্ষি বর্ষের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সমগ্র বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ব্যাকরণসম্বন্ধীয় তর্কযুদ্ধে পাণিনিকে পরাস্ত করেন। পাণিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার বরলাভে অবশেষে কাত্যায়নকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাত্যায়ন নিজে পাণিনির ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ ও সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি পাটলিপুত্রে নৃপতি নন্দের মন্ত্রী হন। নন্দ যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, মোক্ষমূলর তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং কথাসরিৎসাগর হইতে (যদিও ইহা উপাখ্যানমাত্র) আমরা জানিতে পারি যে, কাত্যায়ন-বররুচি ও পাণিনি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু মোক্ষ-

* আমরা বলিব, ইন্দ্রনামক একজন আদি-বৈয়াকরণ ছিলেন। পাণিনির পূর্ব্বে অনেকেই সেই ব্যাকরণের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব ব্যাকরণ রচনা করিতেন ও ইন্দ্রের অনুযায়ী বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে ঐন্দ্র ব্যাকরণ নামে অভিহিত করিতেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে ইন্দ্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

মুলর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে 'ষড়্‌দর্শনের ইতিহাস'নামক গ্রন্থে খৃ° পূ° ৬ষ্ঠ শতাব্দী পাণিনির আবির্ভাবকাল কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তত কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই।

ডাক্তার বেবার (Dr. Weber) বলেন, পাণিনি বুদ্ধের পরে, এমন কি আলেক্‌জাণ্ডারের ভারতাক্রমণেরও পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, হুয়েনসাংএর মতে পাণিনি বুদ্ধের ৫০০ পাঁচশত বৎসর পরে ও কাত্যায়ন (ভাষ্যকার ?) বুদ্ধের ৩০০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। ডাক্তার বেবার, হুয়েনসাংএর এই সময়নির্দ্দেশ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, এই কাত্যায়ন হয় ত ভাষ্যকার না হইতে পারেন, প্রত্যুত কাত্যবংশধর কোন কাত্যায়ন হওয়াই সম্ভব। তাঁহার মতে পাণিনি স্বীয় সূত্রে ভিক্ষু, ভিক্ষা, কাষায়বসন প্রভৃতি শব্দের অত্যন্ত বেশি ব্যবহার করিয়াছেন; ইহা দ্বারা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাহাদের পরিধেয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে তিনি সেণ্টপিটার্সবর্গ-নগরে রচিত সংস্কৃত অভিধান ও উইলসন-সাহেবের অভিধানে হিন্দুগণের চতুর্থ আশ্রমকে যে ভিক্ষু আশ্রম ও তাহাদের পরিধেয়কে যে কাষায়বসন বলিত, তাহাও পাইয়াছেন। তথাপি তিনি ঐগুলি দ্বারা বৌদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আর পাণিনি যে আলেক্‌জাণ্ডারের ভারতাক্রমণের পর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি বলেন, তাহাও পাণিনির সূত্র হইতেই পাওয়া যাইতেছে। পাণিনি স্বীয় সূত্রে যবন ও যবনানী পদের ব্যবহার করিয়াছেন। এ সমস্ত যে গ্রীক জাতিকেই লক্ষ্য করিতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তবে যাঁহারা আভেস্তা পড়িয়াছেন, তাঁহারা হয় ত স্বীকার করিবেন যে, আভেস্তার সময়ে হিন্দুজাতির সহিত পারশীক জাতির মিলন হইত। অমরসিংহও পারশীক জাতিকে যবন বলিয়াছেন। ডাক্তার বর্ণেলও বলেন, * পারশীক-শব্দ 'দিপি' ('Dipi') হইতে সংস্কৃত 'লিপি'-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অধ্যাপক মোক্ষমূলর স্বীকার করেন, আলেক্‌জাণ্ডারেরও পূর্ব্বে সেমিটিক অক্ষর ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। গোল্‌ড্‌ষ্টুকর্‌ বলেন, ইহা সেমিটিক অক্ষর নহে, পারস্যদেশে প্রচলিত অক্ষরবিশেষ; ইহাকে 'শরশীর্ষাক্ষর' বা 'কীলকলিখন'—Cuneiform writing—বলে। 'দেরায়াস'-(Darius)-এরও পূর্ব্বে এই অক্ষর পারস্যে প্রচলিত ছিল। সুতরাং পাণিনির যবনানী-সূত্রের ভাষ্যে যে যবনলিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পারশীক অক্ষর।

অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর (Prof. Goldstucker) কয়েকটি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঋক্‌, যজু ও সামবেদ এবং যাস্কের নিরুক্ত মাত্র পাণিনির সময়ে প্রচারিত ছিল। তাঁহার মতে আরণ্যক পাণিনির সময়ে ছিল না। যদিও তিনি সূত্রে পাইয়াছেন—"অরণ্যান্মনুষ্যে" (৪।২।১২৯)। বাজসনেয়ি-সংহিতা, তৈত্তিরীয়-সংহিতা, শত

* Elements of the South India Paleography.

পথব্রাহ্মণ, উপনিষৎসমূহ, অথর্ব্ববেদ প্রভৃতি কিছুই পাণিনির সময়ে প্রচারিত হয় নাই। কেন না, তাঁহার মতে এ সমস্ত পাণিনি স্বীয় সূত্রে ও গণে ব্যবহার করিলেও, ইহাদের পারিভাষিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই *। এইরূপ তিনি ষড়্‌দর্শনের পারিভাষিক শব্দ, নির্ব্বাণের বৌদ্ধব্যাখ্যা, শাক্যমুনির নাম প্রভৃতি কিছুই পাণিনিতে দেখিতে পান নাই।

অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর (Prof. Goldstucker) ভুলিয়া যাইতে চান যে,পাণিনি ব্যাকরণ † রচনা করিয়াছেন; অভিধান অথবা মহাকোষ (Encyclopædia) লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। নির্ব্বাণ-শব্দের 'মোক্ষ' অর্থ বুদ্ধের অনুচরগণ, আর "ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থঃ" (ন্যায়সূত্র ২।২।৬৮) গৌতমের শিষ্যগণ স্বীকার করিবেন। কিন্তু বৈয়াকরণগণ তাহা স্বীকার করিবেন কেন? শব্দ অথবা ধাতু গত অর্থেরই তাঁহারা অনুসরণ করিবেন, কিন্তু গৌতম, কণাদ অথবা বুদ্ধের অনুসরণ করিবেন না! নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা নাই বলিয়া পাণিনি বুদ্ধের পূর্ব্বে, আর শতপথব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা নাই বলিয়া তিনি বৈদিকযুগের প্রারম্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমরা এ যুক্তির পক্ষপাতী নহি। আর পাণিনি উপনিষদ্‌, ব্রাহ্মণ অথবা আরণ্যক যুগের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া লৌকিকভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে গেলেন কেন? তখন কি লৌকিক ভাষার পুস্তকাদি রচিত হইয়াছিল? পাণিনির সূত্রে উল্লিখিত শৌনক, শাকটায়ন, শাকল্য, আপিশলি, চাক্রবর্ম্মন্‌, গালব, গার্গ্য, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, ক্যাতায়ন, স্ফোটায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণ ও শাব্দিকগণকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তাড়াইয়া না দিলে, তাঁহারা যে পাণিনির পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া পড়েন।

আর একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন—সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনির ব্যাকরণ যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহার ব্যাকরণের সূত্র পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সমুদয় ব্যাকরণসূত্রকে পরাজিত করিয়াছে। বিজাতীয় লোক ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তীব্র কোলাহলে ভারত যখন প্লাবিত হইতেছিল, পাণিনির ন্যায় মনীষীর সংস্কৃতভাষারক্ষার নিমিত্ত সেই সময়ে অগ্রসর হওয়া কল্পনা করা অন্যায় নহে। গ্রীকজাতি যতদিন রোমাণদিগকে গ্রীকভাষা শিখাইতে আরম্ভ না করিয়াছিল, ততদিন তাহাদের ব্যাকরণ অতি অল্পই উন্নতি লাভ করে। আরবের সেমিটিক জাতির সহিত পারশীক, সিরীয় ও অন্যান্য বিজাতীয়ের সংস্রবের জন্যই বোধ হয় আরব্য ও হিব্রু ব্যাকরণের উৎপত্তি হইয়াছিল। আর পাণিনির আবির্ভাব খৃ° পূ° চতুর্থ শতাব্দীতে কল্পনা করিলে আমরা সেইরূপ একটা যুগান্তর দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবলবেগে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতে উদ্যত, ওদিকে পারশীকজাতির সহিত গ্রীকজাতির সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতাই যে সংস্কৃত ব্যাকরণের উন্নতির কারণ

* পাণিনি ৪।২।১২৯, ৪।৩।১০৬গণ, ৪।৩।১০২, ৫।৩।১০০ গণ, ৪।৩।১০৫, ৪।৩।১০১ ও ১০৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

† ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে সাধুশব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্‌।

হইয়াছিল, তাহা আমরা অধ্যাপক সেস্-(Prof. Sayce)-এর নিম্নলিখিত উক্তি হইতে অনুমান করিতে পারি *। তিনি বলেন, "বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের নিমিত্ত কথিত ভাষাগুলি যখন শীঘ্র শীঘ্র প্রচারিত ও অত্যন্ত সম্মানিত হইয়া আসিতেছিল, খুব সম্ভব সেই সময় সংস্কৃত বৈয়াকরণ ব্যাকরণের উন্নতির নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।" অতি প্রাচীনকাল হইতেই শাব্দিকগণ শব্দসকলের কথিত ভাষা অনুসারে উচ্চারণ ও আকারের পার্থক্যের প্রতি মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। মহাভাষ্যেও আমরা কত প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। জৈমিনি তাঁহার মীমাংসাসূত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বেদে পর্য্যন্ত অপভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পাণিনির সূত্রে কতকগুলি বিদেশের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি প্রক্ষিপ্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। এই সমস্ত অবস্থা আলোচনা করিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি যে, যখন নানাবিধ উপভাষা ও বিজাতীয় ভাষা সংস্কৃতভাষাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময়েই পাণিনির ব্যাকরণ প্রণীত হয়। অন্তত অন্যান্য দেশের ব্যাকরণের উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিলে, আমাদের এই ধারণাই জন্মে।

পাণিনি ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া প্রায় সর্ব্ববিষয়ে নূতনত্ব প্রদর্শন করিলেও, প্রধানত চারিটি বিষয়ে আমরা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হই।

(ক) পাণিনিই শিবসূত্রের † সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার ও প্রত্যাহার দ্বারা সেগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে কেহই এ প্রতিভা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই বোধ হয় পাণিনির টীকাকারগণ ইহা শিবের অনুগ্রহে লব্ধ, এই কথা বলেন। শিবসূত্রে কিরূপ অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে, একটিমাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণগণ শয়ন, পবন, নায়ক ও পাবক এই চারিটি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদের জন্য চারিটি পৃথক্ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনির "এচোঽয়বায়াবঃ"(৬।১।৭৮) এই একটি সূত্রেই সমুদয় সম্পন্ন হইয়াছে।

(খ) অনুবন্ধগুলি পাণিনির নিজের উদ্ভাবিত। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বৈয়াকরণ অনুবন্ধের ব্যবহার করিয়াছেন কি না, জানিতে পারা যায় নাই। কোন প্রাতিশাখ্যেই অনুবন্ধের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না।

(গ) পাণিনি অনেকগুলি পারিভাষিক সংজ্ঞার উদ্ভাবন করিয়াছেন। যেমন কৃৎ-প্রত্যয়, নদী, স্ত্রী, সংখ্যা, ঘ, ঘি, ঘু, টি প্রভৃতি।

(ঘ) যদিও পাণিনির পূর্ব্বে অতি সামান্য পরিমাণে গণের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু

* Principles of Comparative Philology.

† অইউণ্, ঋ৯ক্ প্রভৃতি হইতে হল্ পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে শিবসূত্র বলে। অইউণ্ এই কয়েকটি বর্ণ কেবলমাত্র প্রথম ও শেষবর্ণ অর্থাৎ অণ্ দ্বারা প্রকাশ করাকে প্রত্যাহার বলে। এইরূপ অক্, অচ্, অট্ প্রভৃতি।

বলিতে গেলে পাণিনিই গণসমূহের উদ্ভাবন করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদ-প্রাতিশাখ্যে অল্প অল্প গণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ পাণিনির নিজের উদ্ভাবিত, তাহাদের সকলেরই তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আর যে সমস্ত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণগণের নিকট হইতে গৃহীত, তাহাদের যেগুলির ব্যাখ্যা তাঁহার নিকট অসম্পূর্ণ বোধ হইয়াছে, সেগুলি তিনি নিজে নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের উদ্ভাবিত প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি, অনুস্বার, অস্ত, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপসর্গ, নিপাত, হেতু, প্রত্যয়, প্রধান, প্রযত্ন, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান প্রভৃতি শব্দের তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। আবার অনুনাসিক, আত্মনেপদ, আমন্ত্রিত, উপধা, গুণ, দীর্ঘ, পদ, পরস্মৈপদ, বিভক্তি, বৃদ্ধি, সংযোগ, সবর্ণ, হ্রস্ব প্রভৃতি শব্দ তাঁহার পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যাকরণসমূহ হইতে গ্রহণ করিয়াও তাহাদের নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এই সমস্ত শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিকট যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় নাই। এই সমস্ত শব্দ যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাকরণ হইতে গৃহীত, তাহা তিনি স্থানে স্থানে স্বীকারও করিয়াছেন। যেমন—"চতুর্থীতি সংজ্ঞা প্রাচাম্" ইত্যাদি।

পাণিনির পূর্ব্বের বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণ-রচনায় যতদূরই কৃতিত্ব প্রদর্শন করুন না কেন, পাণিনিই যে সংস্কৃতভাষার মেরুদণ্ড, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয় একজন পাণিনি দৃষ্ট হইলেন না। পাণিনির জীবনীর বিষয় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে (গান্ধারপ্রদেশে ?) শলাতুর-নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী ছিল *। ইহাই কেবল আমরা জানিতে পারি। প্রবাদ আছে, তিনি সিংহের হস্তে † নিহত হইয়াছিলেন।

পাণিনির পরে কাশকৃৎস্ন, চন্দ্র, অমর, জৈনেন্দ্র, সর্ব্ববর্ম্মন্ (কাতন্ত্রকার), বোপদেব, সারস্বতব্যাকরণপ্রণেতা প্রভৃতি বহু বৈয়াকরণ বর্ত্তমান ছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কাচ্চায়নের পালি-ব্যাকরণ মহাসদ্দ-(শব্দ)-নীতি, রূপসিদ্ধি, বালাবতার, পয়োগ-সিদ্ধি, আখ্যাত পদ, ধাতুমঞ্জুষা মোগ্গল্লানের ব্যাকরণ প্রভৃতি পালি, সিদৎসংগরাভ-নামক সিংহলী ব্যাকরণ ও শ্যামদেশীয়, কাম্বোডিয়াদেশীয় বহু ব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ অতি বৃহৎ হইল দেখিয়া আমরা আপাতত এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না।

শ্রীযতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য।

* শালাতুরীয়কো দাক্ষীপুত্রঃ পাণিনিরাহিকঃ।

† সিংহো ব্যাকরণস্য কর্ত্তুরহরৎ প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণিনেঃ।

পঞ্চতন্ত্র, বোম্বে সংস্করণ

পল্লীপার্ব্বণ।

আষাঢ়ের প্রথম হইতেই রথযাত্রার বিচিত্র উদ্যোগে পল্লীপ্রকৃতি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে বাঁশের রথ প্রস্তুত হইবে, বিশ-পঁচিশ-দিন পূর্ব্বেই সেখানে কার্য্যারম্ভ হইল। কোথাও কাষ্ঠনির্ম্মিত রথের সংস্কার, কোথাও ধাতব রথের মাজা-ঘষা চলিতে লাগিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ভদ্রাভদ্র, বাল-বৃদ্ধ-যুবক, সকলে উৎসাহে সে সমস্ত কর্ম্মে যোগদান করিয়াছে। কোন আদর-অভ্যর্থনা নাই, সাধাসাধি নাই, ধন্যবাদবর্ষণের চিহ্নমাত্র নাই।

সকালে-বিকালে রথতলায় এখন প্রতি-দিন সভা বসে। সেখানে তাম্বূল-তাম্র-কূটের শ্রাদ্ধ হয়, অকালে অকারণে অনেক রাজা-উজীরকে পঞ্চত্বলাভ করিতে হয়। তা ছাড়া যিনি একবার শ্রীক্ষেত্রে বা আর কোনখানে রথে গিয়াছিলেন, তিনি সে সকল স্থানের রথের আড়ম্বর, কারুকার্য্য, লোকারণ্য, হঠাৎ রথ বন্ধ হওয়া, হাতীর দ্বারা রথ-চালানোর চেষ্টা, রথের চাকার নীচে পড়িয়া তিনজন বলিষ্ঠ পঞ্জাবীর মরণ, ইত্যাদি সত্যাসত্য শত গল্প করিতে থাকেন, আর সকলে তদ্গতচিত্তে তাঁহার মুখের প্রতি চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া কান পাতিয়া নিরাপত্তিতে সেগুলি শুনিয়া চরিতার্থ হইতে থাকেন।

এইরূপে রথের দিন উপস্থিত হইল। নিজ গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির লোক-সকল দলে দলে মধ্যাহ্নকালেই রথোৎসবে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; নানা দল নিশান লইয়া, শিঙা বাজাইয়া, খোল-করতাল-যোগে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন। নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থ সুন্দরীকুল দলে দলে নির্দ্দিষ্ট অংশে উপস্থিত হইয়া উচ্চ কলধ্বনিতে ও উলুধ্বনিতে রথপ্রাঙ্গণ পুনঃপুন মুখরিত করিয়া তুলিল। বালক-বালিকারা, স্ত্রী-পুরুষ উভয় দলেই যাতায়াত করিতেছে, তাহাদের আনন্দ অখণ্ড—পরিপূর্ণ! আষাঢ়মাসে প্রায়ই বর্ষা হইয়া থাকে, অধিকাংশ যাত্রি-দলকে নৌকায় করিয়া আসিতে হয়, কাজেই নৌকার শ্রেণী নদীর ঘাট বা খালের দুই পার্শ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। অদূরে মন্দিরচূড়ায় পতপতশব্দে পতাকা উড়িতেছে। রথপ্রাঙ্গণে ধ্বজপতাকাভূষিত পুষ্পদামবেষ্টিত রথের শোভা।

অপরাহ্নের আরম্ভে শত শত লোকের লোলদৃষ্টির ব্যগ্রতা বাড়াইয়া দেবসেবক ব্রাহ্মণ মনোহরবেষভূষিত শ্রীবিগ্রহ রথে তুলিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবামাত্র চারিদিকে সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গীত, উলুধ্বনি, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের রোল, শিশুবৃন্দের আনন্দ-কোলাহল উচ্ছ্বসিত—উদ্বেলিত হইয়া উঠিল,—সেই আনন্দগোলযোগের মধ্যে ব্রাহ্মণ রথের প্রকোষ্ঠে ঠাকুর তুলিলেন। অমনি দলে দলে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবক,

রথের রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। ঘর্‌ঘর্‌ কর্‌কর্‌ শব্দে রথ চলিতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিকে উচ্চ জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল; শতশত লোকের মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। মণ্ডপের বারেণ্ডা ও রথের চারিধার আগন্তুকগণের প্রদত্ত উপহারফলে পূর্ণ। রথের উপর হইতে ব্রাহ্মণগণ আনারস, কাঁঠাল, ডাব, বেল, জনতার মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছেন; লাফালাফি-কাড়াকাড়ি করিয়া সেই প্রসাদী ফল দর্শকদল গ্রহণ করিতেছে; কোন স্থলে বা এই উপলক্ষে বলিষ্ঠগণের বলপরীক্ষা হইতেছে। একজন একটা কাঁঠাল ধরিয়াছে, আর-এক-জন তাহা বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে; কোন স্থলে একজন বিশেষ বলশালীর প্রতি দুই, তিন, চারি-জন পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষ বল ও কৌশল প্রয়োগ করিতেছে; লুটপুটি-গড়াগড়ি করিয়া তাহারা ধূলায় ধূসরিত অথবা বৃষ্টি-সিক্ত প্রাঙ্গণে কর্দ্দমাক্ত হইতেছে।

যে যে স্থলে রথ উপলক্ষে মেলা বসে, সেই সকল স্থানে স্ত্রীলোকেরা ছেলেমেয়ের আবদার মিটাইতেছেন, নিজেদের চুড়ি-চিরুণির কথাও ভুলিতেছেন না। মুসলমানেরাও মেলার দ্রব্যজাত ক্রয় করিতেছেন, আর দূরে থাকিয়া রথের ব্যাপার দেখিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রথস্থ বিগ্রহের আরতি দর্শন করিতে তখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দর্শক-মণ্ডলী দাঁড়াইলেন। ধূপধুনার গন্ধে—পুষ্প-কর্পূরের সৌরভে চতুর্দ্দিক্‌ আমোদিত হইয়া উঠিল। আরতির বাদ্য আরম্ভ হইল, কীর্ত্তনসম্প্রদায় আরতির গান ধরিলেন। পূজক যথাক্রমে ধূপ, কর্পূরপ্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ ও জলশঙ্খাদি দ্বারা নানাপ্রকারে হস্ত-সঞ্চালন করিয়া তালে তালে আরতি করিতে লাগিলেন;—আরতির শেষে শঙ্খের প্রসাদী জল সকলের মস্তকে সিঞ্চিত হইল। সকলে অবনতমস্তকে সেই মঙ্গল-জলবিন্দু গ্রহণ করিয়া, স্তবস্তুতি ও প্রণামাদির পর, প্রসাদী ফলমূল ও পুষ্প-মাল্যাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক বিদায় লইতে লাগিলেন।

ক্রমে কর্ত্তৃপক্ষ রথপ্রাঙ্গণ হইতে পুরুষ-সম্প্রদায়কে স্থানান্তরিত করিলেন। গ্রামের সম্ভ্রান্তগৃহের মহিলাগণ তখন শুদ্ধবসন-ভূষণ-পরিহিত হইয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সপ্রণাম রথস্থ-বিগ্রহ-দর্শন ও রথসঞ্চালন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেই, পুনর্ব্বার বাদ্যধ্বনির সহিত উৎসব নিবৃত্ত হইয়া গেল।

সাতদিন পরে আবার পুনর্যাত্রা। তাহাও পূর্ব্ব রথেরই অনুরূপ, তবে তাহাতে অতটা জনতা বা আড়ম্বর দেখা যায় না।

শ্রাবণমাসের জলক্রীড়া আজিও চিত্তকে একান্ত চঞ্চল করিয়া তোলে। তখনকার অবিশ্রাম ধারাবর্ষণ, দিনদিন জলবৃদ্ধি, অনবরত বিদ্যুৎপ্রকাশ, যুগপৎ হর্ষ-ভয়ের সঞ্চার করে। পূর্ণবর্ষার ভরানদী পল্লীর পদ-তল বিধৌত করিয়া উচ্ছ্বসিত স্রোতোবেগে দু'কূল ভাসাইয়া উধাও চলিয়াছে। সেই অবিরাম গতি, চঞ্চল তরঙ্গবিক্ষোভ, কুটিল আবর্ত্ত, গৈরিকরাগরঞ্জিত জলধারা, কত লোকের চিত্তে কত ভাবের স্ফুরণ করে। খালগুলিতে নদীর মত স্রোত বহিতেছে, ক্ষেত্র-প্রান্তর জলে ভরা—চারিদিকে জলের

কল্লোল, নদীর কল্‌কল্‌, মাঠের ছল্‌ছল্‌, বিলের তর্‌তর্‌ অহর্নিশ চলিতেছে। প্রান্তরের তৃণ-ধান্য জলের উপর ভাসিতেছে। চাষীরা সেই জলে বক্ষ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া পাকা-ধান কাটিতেছে, আর ডিঙ্গিতে বোঝাই দিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক খানি নৌকা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চর্‌চর্‌ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। নানাকর্ম্মে নানাদেশের বিচিত্র রকমের তরণিশ্রেণী নদী, খাল, বিল, প্রান্তরে দশদিকে ছুটিয়াছে। কুল-সুন্দরীগণ বর্ষাকালে একবার অবশ্যই পিতৃভবন, মাতুলভবন প্রভৃতি হইতে সাদর নিমন্ত্রণ লাভ করিয়া থাকেন। সেই উপলক্ষ্যে স্মিতবদনা রমণীদিগকে লইয়া চারিদিকে তরণিশ্রেণী হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে; আর সেই তরণীর অগ্রভাগ উৎসুকা প্রমদাদিগের যত্নোত্তোলিত কুমুদকহ্লারে—সালুকফুল-পানিফলে—বিচিত্র জলীয় লতায় পাতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কত শাফ্‌লার মালা ও অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া, কত রকমের শাক-তরকারি সংগ্রহ করিয়া, তাঁহারা বর্ষার আনন্দ পূর্ণহৃদয়ে উপভোগ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করে?

বর্ষার জলে যখন চতুর্দ্দিক্‌ ভাসিয়া যায়, তখন গ্রামগুলি মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত ভাসিতে থাকে। সেই দ্বীপাধিবাসীরা কোন-প্রকার তরণির সহায়তা ছাড়া গ্রাম ছাড়িয়া একপদ অগ্রসর হইতে পারে না; কাজেই ঘাটে ঘাটে ক্ষুদ্র তরি, কলাগাছের ভেলা বা বাঁশের 'ভেরো'।

ঝুলন বা হিন্দোলন বৃন্দাবনের রস-লীলার অন্যতম হইলেও, এক্ষণে তাহা সর্ব্ব-দেশব্যাপী উৎসব;—তবে সর্ব্বগৃহব্যাপী নহে। শ্রাবণের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচদিন অথবা ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিনদিন দেবালয় বা ব্যক্তি-বিশেষের গৃহে ঝুলন হইয়া থাকে। ঝুলন নিকট হইলেই গ্রামের উৎসাহী দল সিংহা-সনের কারুকার্য্যে, নাটমন্দিরের সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত হইয়া উঠেন। ঝুলন-আরম্ভের পূর্ব্বদিনে বা যে দিন ঝুলন, সেই দিন প্রাতঃকালে সুনির্ম্মিত উজ্জ্বল সিংহাসন-খানি ভূমিতল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে তুলিয়া পায়াতে দড়ি বাঁধিয়া দেবমণ্ডপের উপরি-ভাগ হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। সিংহা-সনের নিম্নে কলাইপূর্ণ কতকগুলি ঝুমুর্‌ গ্রথিত থাকে এবং সম্মুখদিকের দুটি পায়াতে দু'গাছি সুন্দর সুরঞ্জিত রজ্জু সংলগ্ন করিয়া দ্বারের পার্শ্বে বারেণ্ডায় রাখা হয়। ঝুলন রজনীর ব্যাপার। বিহিত দিনে সন্ধ্যার পর সিংহাসনে বিগ্রহ স্থাপন করিলেই ভক্তবৃন্দ বাহির হইতে ঐ রজ্জু আকর্ষণ করিতে থাকেন, সেই আকর্ষণে সমস্ত সিংহাসন আন্দোলিত হইতে থাকে। টানে টানে তালে তালে সিংহাসন আগে আসে, আবার পিছাইয়া যায়; সিংহাসনের কম্পনে বিচিত্র-রত্নালঙ্কার-ভূষিত বিগ্রহেরও চঞ্চলতা লক্ষিত হয়; আর নীচের ঝুমুরগুলি ভূমিতলে সংলগ্ন হইয়া ঝুম্‌ঝুম্‌ ঝুমুরঝুমুর্‌ ধ্বনি করিতে থাকে। সিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুইটি বৈঠকী ঝাড়,—উজ্জ্বল আলোকে সিংহাসন উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সম্মুখে দর্শকমণ্ডলী আলোক-মালা-সমুজ্জ্বল নাট-মন্দিরের বাহিরে ও বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া

সঞ্চালিত সুরঞ্জিত সিংহাসনের মধ্যে উজ্জ্বল-মধুরবেশে সজ্জিত যুগলমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

প্রবন্ধলেখকের দেশে শ্রাবণে মনসা-পূজা সার্ব্বজনীন হিন্দু উৎসব। বর্ষাকালে প্রচুর সর্পভয়, তজ্জন্যই সর্পমাতা সর্পভূষিতা মনসা শ্রাবণে ভক্তিযুক্ত অর্চ্চনা লাভ করেন। শ্রাবণের প্রথম পঞ্চমী হইতে একটি মনসার ডাল বা চারা সংগ্রহ করিয়া যথাবিধি পঞ্চোপচারে প্রতি পঞ্চমীতে তাহাতে পূজা করা হয়। ইহার নাম স্থাপন। শ্রাবণের শেষ—সংক্রান্তিদিনে আসল পূজা। এই পূজায় প্রায় প্রতি বাড়ীতেই চতুর্ভুজা, বিচিত্রনাগসর্পমণ্ডিতা, হংসবাহিনী, গৌরী, মনসামূর্ত্তি আনয়ন করা হয়। সর্পভীত জানপদ অবস্থানুসারে মনসাপূজার আয়োজনে কিছুমাত্র কৃপণতা প্রকাশ করেন না। পুরোহিতগণ মনসাপূজায় একান্তই গলদ্‌-ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন; কেন না, সর্পজননীর পূজার প্রতি যজমানগণের খুব সতর্ক মনোযোগ। পূজা-জপ-হোমাদি কর্ম্মে একান্ত তাড়াতাড়ি করিলে যজমানেরা পুরোহিতের শাস্ত্রজ্ঞান এবং নিষ্ঠার প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, এই সন্দেহে অনেকসময় মিথ্যা বিলম্ব করিয়া অসময় পর্য্যন্তও মনসা-পূজায় তাঁহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

ব্রাহ্মণগৃহের লক্ষ্মীরা অন্নব্যঞ্জন-পায়স-পিষ্টকাদি করিয়া মনসার ভোগ দেন। সকলের অবস্থায় অবশ্য সকল রকম ঘটিয়া উঠে না। যাই হোক, পূজান্তে অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত পাড়ায় পাড়ায় পরস্পরের মধ্যে প্রসাদ পাওয়ার ও প্রসাদ আদান-প্রদানের অভিনয় চলে। ব্রাহ্মণ-বাড়ীতেই প্রসাদার্থীর অধিক ভিড় হয়।

পূর্ব্বে মনসার প্রভাববিষয়ক বাঙ্‌লা-প্রাচীন-পদ্যময় পদ্মপুরাণ পাঠ হইত এবং উহা জানপদ-নরনারীকে মাসব্যাপী আনন্দে মগ্ন করিয়া রাখিত। শ্রাবণের প্রথম হইতেই পদ্মপুরাণ-পাঠক পাড়ার সমস্ত বাল-বৃদ্ধ-তরুণকে সমবেত করিয়া—যে-দিন যেখানে যেমন সুবিধা—বাহিরে, ঘরের বারেণ্ডায় বা বৈঠকখানায় পাটি, চাটাই, শতরঞ্জ বিছাইয়া, খোল-করতালের কলরোলে পাঠ আরম্ভ করিয়া দিতেন। পাঠকের ভক্তি ও শক্তি অনুসারে প্রথমের বন্দনাগীতি হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইয়া পড়িত। বন্দনাগীতির পরই একটি ধুয়ার সহিত 'রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম' ইত্যাদি বচনপরম্পরা, খোল-করতাল এবং সমবেত কণ্ঠের বিচিত্র অট্টরোলে, পল্লীবাসী সকলে পাঠের সমাচার পরিজ্ঞাত হইতেন। তার পরে ধুয়ার অংশ-বিশেষ সকলে তাললয়ে মিলাইয়া গান করিতেন, আর সেই রাগিণীর অনুপাতে পাঠক পদ্মপুরাণ পাঠ করিতে থাকিতেন। পদ্মপুরাণপাঠ অনেকটা রামায়ণগানের মত। পাড়ায় পাড়ায় আড়াআড়ি করিয়া পদ্মপুরাণপাঠের সুর যখন সপ্তমে চড়িয়া উঠিত, আর সকলের কণ্ঠে "রামনামের মালা যার গলে, শমনের ভয় নাই তার কোন কালে" প্রভৃতি ধুয়ার অংশ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকিত, তখন সেই কোলাহল দেশপ্লাবী বর্ষার জলে প্রতিহত হইয়া কেবল পাড়াকে মুখরিত করিত না,

সমস্ত গ্রাম এবং চতুষ্পার্শ্বের পল্লীগুলিকেও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত!

মনে পড়ে, শেষদিনে পদ্মপুরাণপাঠের কত আড়ম্বর! সেদিন সন্ধ্যার পর বিশেষ-রূপে সাজসজ্জা করিয়া পদ্মপুরাণপাঠ আরম্ভ করা হইত। ভূগর্ভস্থ লৌহসিন্ধুকের অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়াও নিয়তির অখণ্ডনীয় প্রভাবে মায়াবী কালীয়নাগের দংশনে লক্ষ্মীন্দ্র যখন জীবনত্যাগ করিলেন, তখন পাঠক, গায়ক এবং শ্রোতৃকুল বাস্তবিকই আকুল হইয়া উঠিলেন। সতী বেহুলার আদর্শ-পতিপ্রেম, মর্ম্মান্তিক করুণবিলাপ, সে সময়ে বাস্তবিকই হৃদয়বানের হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত করিল। বেহুলা মৃতস্বামি-দেহ বক্ষে লইয়া ভাসিয়া চলিলেন! তাঁহার ধর্ম্মবলে—সতীত্বপ্রভাবে মনসার কৃপা হইল; সেই করুণায় লক্ষ্মীন্দ্রের মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন সঞ্চারিত হইল। এই অংশ পাঠ হইবার সময় উচ্চ আনন্দধ্বনির সহিত 'জীয়ো জীয়ো রে লখাই চাঁদের নন্দন' বলিয়া সকলে যখন ধুয়া ধরিলেন, লক্ষ্মীন্দ্র তখন সমবেদনাশীল জনগণের স্নেহে যথার্থই 'লখাই' হইয়া উঠিলেন। এই অংশ পাঠ করিতে ভোর হইয়া গেল,—তখন লোকের ভিড় একান্তই অধিক। পুনর্জ্জীবন-লাভের উপক্রমে একটা নূতন হাঁড়ীতে বর্ষার নূতন জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে সপল্লব আম্রশাখা ডুবাইয়া পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করা হইল; পাঠক ঠিক জীবন-লাভের সময়ে সেই আম্রশাখার দ্বারা চতুর্দ্দিকে সকলের উপরে জীবনবারিস্বরূপ সেই শীতল জল সেচন করিলেন। অনেকে ঘটে করিয়া সেই জল বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের জন্য লইয়া গেলেন। পদ্মপুরাণ সমাপ্ত হইতে পরদিন অর্থাৎ ১লা ভাদ্র প্রায় একপ্রহর বেলা হইয়া গেল। সর্ব্বশেষে সকলে মাস-ব্যাপী পাঠোৎসবের সমাপ্তিকর হরিধ্বনি করিয়া স্নানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপরাহ্ণে মনসার ভাসান। পাঁচ সাত দশ খানা গ্রামের মধ্যবর্ত্তী কোন একটা সুপ্রশস্ত স্থান ভাসানের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সেখানে সেদিন দৌড়ের নৌকা (বাচের নৌকা) সমবেত হইয়া থাকে। ময়ূরপঙ্খী, ঘোড়া-মুখা, 'লাখাই', 'উথার', 'সরঙ্গা' প্রভৃতি বিচিত্র তরণিশ্রেণী সুসজ্জিত হইয়া বাচ্ খেলিবার জন্য নাচিয়া নাচিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। যে দেশের পল্লীকাহিনী বিবৃত হইতেছে, সেখানে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থানের নাম 'থলী'। 'থলী'তে সেই বাচের নৌকা-গুলি উপস্থিত হইয়া প্রথমে নানাদিকে নানাগতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। কোন নৌকার মধ্যস্থলে বা অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া একজন দলপ্রধান করতাল বাজাইয়া গান ধরিয়াছে—"বেলা গেল রে শাম্ যাইবার করে বাড়ী।" অন্য নৌকায় আর একজন দীর্ঘকেশ আন্দোলিত করিয়া নাচিয়া নাচিয়া আরম্ভ করিয়াছে—"সখি গৌরাঙ্গপ্রেমে মোর মন মজিল।" কেহ বা গলা কাঁপাইয়া লক্ষের সঙ্গে সুর ধরিয়াছে—"সুর করিয়া ডাকে বাঁশী রাধা কলঙ্কিনী।" আর সেই সকল নৌকায় দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ মাল্লারা গানের তালে বৈঠার মধ্যস্থল নৌকার পার্শ্বে স্পর্শ করাইয়া ঠকাঠক্ শব্দের সঙ্গে তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে বা ঠিক্ ফাঁক বুঝিয়া

'হা হা হায়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

মাল্লা-মাঝীদের সাজসজ্জাও বিচিত্র রকমের। কোন দল লাল পাগ্‌ড়ী, কোন দল নীল পাগ্‌ড়ী, কোন দল হরিদ্রাবর্ণ পাগ্‌ড়ীতে মস্তক বেষ্টন করিয়াছে। কোন বড় নৌকা বিশেষ দক্ষতার সহিত সজ্জিত হইয়াছে,—ঝাড়-লণ্ঠন টাঙান হইয়াছে, তার মধ্যে নৃত্য-গীত-বাদ্যের তুফান ছুটিয়াছে, আর সেই সম্মোহনী তরণী হেলিয়া ঢুলিয়া ধীরমন্থরগতিতে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। বজ্‌রা, ভাওলিয়া, 'মৌট্টা,' ডিঙি প্রভৃতি দর্শকমণ্ডলীর অগণ্য তরী দুই পার্শ্বের নিরাপদ্ স্থানে অতি সাবধানে বাঁধা রহিয়াছে; নিশানে নিশানে 'থলী' ছাইয়া ফেলিয়াছে; নৌকার বাহিরে, ভিতরে, ছাপরের উপরে, কেবল মনুষ্যমুণ্ড। কোন কোন সৌখীন বড় লোকের নৌকা হইতে ঘনঘন বন্দুকের আওয়াজ হইতেছে, কোন নৌকায় বা ডঙ্কা পিটান হইতেছে। থানার দারগা সঙ্গী সহ 'রথ দেখা ও কলা বেচা' প্রবচনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, টিকরা-ধ্বনি করিয়া সেই 'লাল-পাগ্‌ড়ী'র নৌকা চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বলা বাহুল্য, নিকটে মহকুমা থাকিলে এইরূপ ক্ষেত্রে হাকিম, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি যথাযোগ্য আড়ম্বরে 'থলীর' শোভা-বর্দ্ধন করিতে কিছুমাত্র উদাসীনতা প্রকাশ করেন না।

ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন অন্য আমোদ ছাড়িয়া বাচের নৌকায় পরস্পরে বাজি ধরিতে আরম্ভ করিল। দুই নৌকায় চারি নৌকায় বাজি ধরিয়া সকলেই প্রাণপণে আপন আপন তরণী বিদ্যুদ্‌বেগে চালাইতে লাগিল। তখন নৃত্য, গীত, বাদ্য, সমস্ত থামিয়া গেল। তরণিশ্রেণীর তীব্র পরিচালনে নদীতে প্রবল তরঙ্গ, সবল-ক্ষিপ্ত বৈঠার তাড়নে উৎক্ষিপ্ত জলরাশি, আর জয়লিপ্সু চালকগণের বলদৃপ্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ অব্যক্ত অট্ট কলরোল তখন উদ্যমে উৎসাহে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! অবিরাম দলে দলে দৌড়ের নৌকা ঝড়ের মত ছুটিয়াছে, চালকেরা উন্মত্তের মত 'বৈঠা' চালাইতেছে, কেবল মাঝি এই ভয়ানক তুফানে স্থির-ধীর-ভাবে নৌকার গতি ঠিক রাখিতেছে। কেহ জিতিল, কেহ হারিল, কোন কোন দল সমান হইল। যাহারা জিতিয়াছে, তাহারা ফিরিবার সময় নৌকার গলুইটি একখানি রুমাল বা বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়াছে,—ইহা জয়চিহ্ন! জয়শীল বাহকদের মনে, মুখে, ভঙ্গীতে হাসির রাশি। পরাজিতেরা ক্লিষ্ট ক্ষুণ্ণ বিষণ্ণ মনে ফিরিতেছে,—আর উপস্থিত অপ-মানের প্রতিশোধের উপায় ভাবিতেছে। এই জয়পরাজয় লইয়া, চালাইবার গুণদোষ লইয়া, অনেকসময় চাচাকুলের মধ্যে মারামারির পালা আরম্ভ হয়; তবে 'লাল-পাগ্‌ড়ী'র ভয়ে সেটা অবশ্য সকল সময় তেমন অগ্রসর হইতে পারে না।

ভাসান উপলক্ষেই 'থলী' জমে বটে, ভাসান কিন্তু প্রায়ই পূর্ব্বাহ্নে স্ব স্ব গ্রামের নদী বা নিজেদের পুষ্করিণীতে হইয়া যায়। অনেকে 'দেবীপ্রতিমা' সযত্নে গৃহে রাখিয়া দেন। 'থলী'তে যে কয়খানি প্রতিমা আইসে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই তৎসমস্তের ভাসান

হইয়া যায়। সন্ধ্যাগমে ক্রমে সকলে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন।

ভাদ্রের প্রথম উৎসব জন্মাষ্টমী। ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণ রজনীর নিশীথকালে শ্রীবৃন্দাবনের নন্দগৃহে যশোদার ক্রোড়দেশ আলোকিত করিয়াছিলেন। 'জন্মাষ্টমী' সেই শ্রীকৃষ্ণজন্মের উৎসব। নিশীথরাত্রি পর্য্যন্ত অল্প লোকই জাগিয়া থাকেন; সুতরাং জন্মবিষয়ক সঙ্গীতের মাধুরীতে ভক্তবিশেষেরাই মগ্ন হন। পঞ্চামৃত, চরণামৃত এবং নানাবিধ মুখরোচক-প্রসাদসুধাও কাজেই সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

পরদিন প্রভাতে নারীগণ আসিয়া যশোদার স্থান অধিকারপূর্ব্বক কৃষ্ণলাভের আনন্দসঙ্গীতলহরীতে অন্তঃপুর ঝঙ্কৃত করিয়া তোলেন। পুরুষসম্প্রদায় খোল-করতাল-সংযোগে কৃষ্ণ-জন্মানন্দ-বিভোর নন্দের আনন্দগাথা গাহিয়া মত্ত হইয়া উঠেন। নন্দোৎসব শেষে পঙ্কোৎসবে পরিণত হইয়া যায় এবং সমস্ত পল্লীপথ ও পল্লীনিবাস উৎসবমত্তগণের সনৃত্য সঞ্চরণে কম্পিত হইয়া উঠে।

রাধাষ্টমী-তালনবমীতে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা মনে হয় না। কিন্তু তালের পিষ্টকাদি ভাদ্রমাসের একটা প্রধান অঙ্গ। ভাদ্রমাসে প্রতি বাড়ীতেই তালের পিষ্টকাদি ভক্ষণের যথেষ্ট উদ্যোগ হইয়া থাকে। পরস্পরের নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণও খুব চলে। এই উপলক্ষ্যে অন্যান্য খাদ্যও রসনার তৃপ্তিসম্পাদন করিয়া থাকে। একটা প্রবাদ আছে, ভাদ্রে তালভক্ষণ করিলে সর্পভয় থাকে না। তজ্জন্যই তালের পায়স-পিষ্টকাদি পরিপাক করিতে যিনি অসমর্থ, তাঁহাকেও কিঞ্চিৎ তালযোগ করিয়া সর্পভয় বারণ করিতে হয়।

উল্লিখিত প্রদেশে ভাদ্রের শেষদিনে প্রদেশান্তরের অরন্ধনের পরিবর্ত্তে অগস্ত্য-মুনির পূজা প্রচলিত। প্রতি হিন্দুগৃহেই তাহা হইয়া থাকে।

এই পূজায়, দশ-বার-দিন পূর্ব্বে কাঠের পিঁড়ে বা আর কিছুতে কাদার ছোট ছোট ক্ষেত্র করিয়া তাহাতে ধান, মুগ, অরহর, তিল, তিসি প্রভৃতি শস্যবীজ ভাগে ভাগে রোপণ করা হয়। দুই-চারি-দিনেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িতে থাকে। সেগুলিকে 'জালা' কহে। পূজার দিনে সেই বিচিত্র 'জালা' কুম্ভকারনির্ম্মিত অগস্ত্য-লোপামুদ্রার যুগল-মূর্ত্তির চারিদিকে সাজাইয়া দেওয়া হয়। নয় প্রকারের তরকারি অপক্ব অবস্থায় পার্শ্বে রক্ষিত থাকে। সম্ভবত এই সকল তাঁহার চিরপ্রস্থানের পথের সম্বল। ফলমূল সজ্জিত করিয়া ধূপদীপনৈবেদ্য দিয়া মুনি-দম্পতির অর্চ্চনা করা হয়। অরন্ধন ঐ দেশে নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সেইদিনকার মধ্যাহ্ণ অধিকাংশেরই অগস্ত্য-প্রসাদভক্ষণে কাটিয়া থাকে। শক্তু তাহার প্রধান অংশ। কেন না, মুনিদম্পতি নিতান্তই বৃদ্ধ। সাধারণ ভাষায় সেইজন্যই এই পূজার নাম 'বুড়াই-বুড়ীর পূজা'। শাফ্‌লার মালা ও অলঙ্কার 'বুড়াই-বুড়ী-পূজা'য় যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরকারির পার্শ্বেও শাফ্‌লা-শাক শোভা পায়।

ক্রমে শরতে মেঘনির্ম্মুক্ত নবরবির হরিদ্রাবর্ণ উজ্জ্বল কিরণে প্রকৃতির শান্ত অঙ্গ

দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। কল্‌কল্‌ করিয়া নদী চলিতেছে, শীত-সুগন্ধ মৃদুসমীরণ পৃথিবীতে শান্তির সমাচার প্রচার করিতেছে, জলে স্থলে, গ্রহতারকায়, গগনে পবনে বিকশিত অবিচ্ছিন্ন-উজ্জ্বল শারদশ্রী নয়নে মনে আনন্দধারা ঢালিয়া দিতেছে!

আশ্বিনের আরম্ভেই গ্রামের সখের দল কবির মহলা আরম্ভ করিয়াছে। মাসিক মাহিয়ানা ধার্য্য করিয়া ঢুলী একজনও হাজির হইয়াছে। টাকার অনটনে অত আগে যদি ঢুলী না-ও আসে, খোল বাজাইয়াই মহলার কাজ চলিয়া যায়।

কবির মধ্যে টপ্পা, গান, কবি প্রভৃতি নানা শ্রেণীবিভাগ, আর তিন কলি, পাঁচ কলি প্রভৃতি গানের অঙ্গ-বিভাগ আছে। প্রতিদিন বিকালে ও রাত্রে পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া সেই বিচিত্র বিভিন্ন গানের আখ্‌ড়া চলিতে থাকে। প্রথম হইতেই গানের দল 'মোহাড়া' ও 'খাদ' দুই দলে বিভক্ত করা হয়। মোহাড়ায় প্রধান গায়ক বড় বড় আর পাঁচ-ছয়-জন সুকণ্ঠ গায়ককে লইয়া গান আরম্ভ করেন; আর খাদের দলে বাকি বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ জনে দুই-চারি-জন তাললয়জ্ঞের অধীনে ঠিক সমান সুরে তাহা পাল্টাইয়া গায়। পৌরাণিক সুরুচি-কুরুচি-সঙ্গত উপাখ্যানের মর্ম্ম লইয়াই কবির গান গ্রথিত। মধ্যে মধ্যে অন্যপ্রকারের বিচিত্র প্রহেলিকাও তাহাতে স্থানলাভ করে। সমস্ত গানের ভিতর কতকগুলি 'জিজ্ঞাসা' থাকে। অপর পক্ষ তাহার উত্তর দিতে বাধ্য হয়, না পারিলে সে উত্তর নিজেরা গাহিয়া দেয়।

এদিকে যাঁহাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব, তাঁহারা একটি শুভদিন দেখাইয়া, যাহার উপর প্রতিমানির্ম্মাণ হইবে, সেই বাঁশের বা কাঠের 'পাটাখানি' প্রস্তুত করাইলেন। জানপদ বালকবৃন্দ সেই শুষ্ক কারুহীন 'পাটাখানি'র ভিতর কল্পনায় কত-কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে লাগিল। যথাসময়ে একজন সহকারী সঙ্গে প্রতিমা-নির্ম্মাতা কারিকর আসিল, আর খড়, বাঁশ, পাট, কাটারী, তাহার কাছে ধরা হইল। তাহার হুকুমমতে বালকেরা ছোট-বড় সরু-মোটা নানারকমের দড়ি পাকাইতে বসিয়া গেল। কারিকর তখন তাম্রকূটের বিশেষ সমাদর করিয়া প্রথমে 'পাটাখানি'র উপর বাঁশ পুঁতিয়া কাঠামো বাঁধিল, তাহার পর তাহাতে খড় জড়াইয়া প্রতিমার আকার প্রস্তুত করিতে লাগিল। দুই তিন দিনে খড়ের কাজ শেষ হইল। অমনি মাটির ডাক্‌ পড়িয়া গেল; তালতাল আঁটাল মাটি বাছিয়া ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে,—সমস্ত কারিকরের কাছে উপস্থিত করা হইল। তখন খড়ের উপরে মাটির প্রতিমা তৈয়ার হইতে লাগিল। ক্রমে একমেটে, একমেটের পর দোমেটে হইয়া গেল। এইরূপে প্রতিমা-নির্ম্মাণের কার্য্য যতই অগ্রসর হইতে থাকে, সেই উৎসবাকুল জানপদমণ্ডলীও দিনে দিনে ততই উৎসুক হইয়া উঠে। মাটি শুষ্ক না হইলে আর রং দেওয়া চলে না; কাজেই মাঝে দুই-চারি-দিন প্রতিমার কাজ বন্ধ থাকে। সেই বন্ধের সময় শিশুরা বড়ই অধীর হইয়া পড়ে। পারিলে তাহারা বোধ হয় মাটির জল চুষিয়া লইয়া প্রতিমা শুষ্ক করিয়া

তবে নিশ্চিন্ত হইত। সকালে বিকালে শিশুরা প্রতিমার শুষ্কতা পরীক্ষা করিতে ভোলে না। কাজেই কারিকর বেটা অযথা বিলম্ব করিয়া মিথ্যামিথ্যি যে তাহাদিগকে অন্যায় কষ্ট দিতেছে, সে বিষয়ে তাহাদের আর কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। অবশেষে এইরূপ অন্যায় বিলম্বের পর যে দিন কারিকর রংমসলা ও তুলিকা সহ শুভাগমন করিল, সেই দিন বালক-বালিকার আনন্দসিন্ধু বাস্তবিকই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দের বেগে কারিকরের কর্ম্মের অতিরিক্ত সহায়তা করিতে গিয়া, কতবার কত বালক আকণ্ঠ ধমক্ ভক্ষণ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা নিঃশেষে হজম করিতে লাগিল। ক্রমে কার্ত্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী-সিংহ-মহিষাসুর-সমেত দুর্গা-প্রতিমা যথাযোগ্য বর্ণে রঞ্জিত হইলেন। চক্ষুদান অধিক পূর্ব্বে হওয়ার বিধি নাই; কাজেই সর্ব্বশেষে চক্ষুদান হইল। উপরের ‘চালে’ মধ্যস্থলে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত বা নির্ম্মিত করিয়া চারিধারে শুম্ভনিশুম্ভাদির যুদ্ধ চিত্রিত হইল। কোন কোন স্থলে প্রাচীন রসিক কারিকর শিবসঙ্গী ভূতপ্রেতের নামে স্থল-বিশেষে অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করিয়া রস-জ্ঞানের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিল না। পূজার পূর্ব্বদিন মধ্যাহ্নেই রন্ধন-ভোজন শেষ হইয়া গেল। তার পর অপরাহ্নে গ্রামের কৃতকর্ম্মা অনেকে মিলিয়া লাল নীল বস্ত্রে ও নানান্তর ডাকের গহনায় মনোমত করিয়া প্রতিমা সাজাইতে আরম্ভ করিলেন,—সে সময়ে প্রতিমার চারিধারে লোকে লোকারণ্য।

পূজাবাড়ী দুই-এক-দিন পূর্ব্ব হইতেই উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আত্মীয়-মহিলা-কুল সাদর নিমন্ত্রণে বালকবালিকা সহ পূজাবাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবেরা সমাগত। আবার বাহিরের নিমন্ত্রণ না পাইলেও উভয়পক্ষের অন্তরের আকর্ষণে গ্রামের প্রবাসীরা দূরদুরান্তরের প্রবাসভবন হইতে,—কেহ ছুটি পাইয়া, কেহ ছুটি লইয়া,—স্বগ্রামের স্নেহময় আশ্রয়ে বন্ধুবর্গের অন্তর্নিহিত করুণ আহ্বানে উপস্থিত হইয়াছেন।

পূজাবাড়ীর কর্ত্তা বা কর্ত্রীও দশজনের একজন, নিজের বাড়ীর পূজা বলিয়া তাঁহাদের বিশেষত্ব কিছুই নাই, দশজনেরই উৎসব, দশজনকে লইয়াই উৎসব। অন্তঃপুরে প্রমদামণ্ডলী পূজাবাড়ীর প্রয়োজনীয় রমণী-জনযোগ্য কার্য্যরাশি স্বেচ্ছায়, সহাস্যে, সানন্দে, দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। আবার কারুকার্য্যে যাঁহাদের হাত আছে, তাঁহারা তাঁহাদের নিপুণহস্তে পূজার জন্য কতই কারুখচিত উপহার প্রস্তুত করিতেছেন।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে অধিবাস। সেই সময় হইতেই বাদ্যভাণ্ডের তুমুলধ্বনিতে গ্রাম কম্পিত হইতে থাকে। পাড়ায় পাড়ায় পূজা। প্রতি পাড়ায় প্রতি পূজাবাড়ীতে সম-বেত বালকবৃন্দ নিজেদের উৎসবকে অধিক-তর গৌরবান্বিত করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। অন্য বিষয়ে বিশেষ অধিকার না থাকায় তাহারা ঘড়ি-কাঁসর, শঙ্খ-ঘণ্টা, ডঙ্কা-ঢক্কার উপরে সময়ে অসময়ে আপনাদের অধিকার সপ্রমাণ করে। সে-

গুলির সমবেত ধ্বনি যে পূজার জাঁক্‌-জমকের একটা প্রধান অঙ্গ, এ বিশ্বাস তাহাদের কিছুতেই টলাইতে পারে না।

অধিবাস-রজনীতেই দূরদূরান্তর হইতে শ্বেত-রক্ত পদ্মরাশি ও বিল্বপত্রের সম্ভার উপস্থিত হইতে থাকে; বাড়ীর নাটমন্দিরের সাজসজ্জা সমাধা হইয়া যায়; স্থানে স্থানে বিচিত্র পতাকা উড়িতে থাকে।

প্রভাত হইতে না হইতেই পূজার আয়োজনে সকলে ব্যস্ত। কি অটুট উৎসাহে রাশি-রাশি পুষ্প-বিল্বপত্র ও আর আর পূজার উপকরণ সংগৃহীত হইল, মণ্ডপ ভরিয়া নৈবেদ্য সুসজ্জিত হইতে লাগিল, পুরোহিত-গণ মণ্ডলাদি নির্ম্মাণ করিলেন। কি আন্ত-রিক অনুরাগে সকলে মিলিয়া স্বগৃহের ন্যায় এই মহামহোৎসবের যথাযোগ্য বিচিত্র কর্ম্ম অক্লান্তযত্নে সুসমাহিত করিতে লাগিলেন। কর্ম্মকর্ত্তা যথোচিত উপচারে পূজক, তন্ত্র-ধারক ও চণ্ডীপাঠককে ভক্তির সহিত বরণ করিলেন। পূজা আরম্ভ হইল। শুভ্রবাসা পুরোহিতগণের প্রতি সকলে ভক্তি-বিনম্র সাধুভাব পোষণ করিতে লাগি-লেন। ঢক্কার নিনাদে, শঙ্খের শব্দে, ঘড়ি-কাঁসরের রোলে, বালকের গোলে, উলু-ধ্বনিতে, ভক্তবৃন্দের গীতে, সমস্ত পল্লী-প্রকৃতি সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ধূপের গন্ধে, কুসুম-চন্দনের সৌরভে, দশদিক্‌ আমোদিত হইল। নববস্ত্রমণ্ডিত বালকবালিকাগণ চারিদিকে দলে দলে আমোদে আহ্লাদে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। পাছে কোন অঙ্গহানি হয়, এই আশঙ্কায় গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীর মুখে সদা বিনয়বিনম্র একটি স্নিগ্ধকোমল দীনভাব লাগিয়াই আছে। ক্ষণে ক্ষণে উত্তরীয়ধারী কর্ম্মকর্ত্তা কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রতিমার সম্মুখে দীনভাবে দাঁড়াইয়া মনে মনে নিজের শতক্রুটি ও অপরাধ জানাইয়া মায়ের চরণে ক্ষমাভিক্ষা করিতেছেন।

পূজা সমাপ্ত হইল। আবার বাদ্যরবে গগনতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, পুরোহিত মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ চণ্ডীপাঠের ধ্বনিতে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। তখন পরিস্নাত শুদ্ধবসন আত্মীয়-কুটুম্ব, স্বগ্রামবাসী স্বজাতীয় নরনারী, দলে দলে উপস্থিত হইয়া দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। পুরোহিতের উচ্চারিত খণ্ড খণ্ড শ্লোকের প্রতিধ্বনি পুরুষ-সম্প্রদায়ের বিচিত্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল। বারত্রয় তাঁহারা এইরূপে সচন্দন পুষ্প-বিল্বপত্রের অঞ্জলি প্রতিমার চরণে বা ঘটে উৎসর্গ করিলেন। অঙ্গনারা পুরোহিতের মন্ত্র ভক্তির সহিত মনে মনে পাঠ করিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে পুষ্পাঞ্জলি দান করিতে লাগিলেন। পরে সকলে গলায় বস্ত্র দিয়া জোড়হাতে দশভুজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে যথারুচি নানা প্রার্থনা আবৃত্তির পর মাটিতে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন। তখন ভোজনের—জলযোগের—প্রসাদ-প্রাপ্তির সার্থক কর্ম্ম আরম্ভ হইয়া গেল। কোনখানে নিমন্ত্রিতগণের, কোথাও বা রবা-হূতের পংক্তি জলপানাদিতে বসিয়া গেলেন। পূজার বিনাবেতনের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্ম্ম-চারীরা মহোল্লাসে এই পংক্তিভোজনের তত্ত্বা-বধান করিয়া শেষে আপনাদের উদরপূর্ত্তির

ব্যবস্থা করিতেও ত্রুটি করিলেন না। কর্ত্তৃপক্ষ কতবার আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'এই তুচ্ছ আয়োজনেও কোনপ্রকারে ক্ষুধানিবারণ করিতে হইবে', এই বলিয়া সকলের কাছে আপনার বিনয়-দৈন্য জানাইতে লাগিলেন। এইরূপে পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনা, আহার, আমোদ, প্রসাদ-বিতরণ ও পুনঃপুন বাদ্যধ্বনিতে দিবা-বসান হইল। তখন সান্ধ্য আরতির ঘটা পড়িয়া গেল। চিকের আড়ালে কুলবধূরা সাঁরি দিয়া দাঁড়াইলেন,—কোমল কামিনী-কণ্ঠের আরতি-গাথায় কাকলীনিক্কণ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বাদ্যভাণ্ডে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইল। পুরুষেরা খোল-করতালের সহিত আরতিগান গাহিতে লাগিলেন; শিশুকুলের কলধ্বনিতে আনন্দের লহরী উদ্বেলিত হইতে লাগিল; প্রবীণা মহিলারা হাত-জোড় করিয়া তদ্গতচিত্তে পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তখন বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইয়া পট্টবস্ত্রধারী পুরোহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচিত্রভঙ্গীতে আরতি করিতে লাগিলেন। আরতিশেষে সকলে প্রসাদী পঞ্চপ্রদীপের নির্ব্বাণোন্মুখ মঙ্গল-শিখায় হস্ত স্পর্শ করাইয়া সেই হস্ত বুকে মাথায় বুলাইতে লাগিলেন। তার পরে চরণা-মৃত পান করিয়া প্রণামান্তে পুরুষসম্প্রদায় সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনসমাপ্তির পর আবার আহারের ধুম লাগিয়া গেল।

যে বাড়ীতে গ্রামের সখের দলের কবি হইবে, সেখানে যথেষ্ট জনতা। সখের দলের সঙ্গে পাল্‌টা গাহিবার জন্য পেশাদার একদল কবির বায়না হইয়াছে অথবা অন্য এক সখের দল নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। প্রথম গান কে গাহিবে, তাহার একটা নিয়ম আছে। সে নিয়ম সব জায়গায় সমান নয়। যাই হোক, সেই পুরুষপরম্পরাগত সনাতন নিয়মের যথাবিধি মর্য্যাদারক্ষা করিয়া এক দলের ঢুলী ও কাঁসীওয়ালা আসরে উপস্থিত হইল। দেবী-মূর্ত্তি ও সভার প্রতি সেলাম ঠুকিয়া প্রথমে তাহারা চুল, মাথা, হাত, পা, মুখ, নানারকমে নাড়িয়া চাড়িয়া বাহাদুরী দেখাইতে লাগিল। তার পর সৌখীন গায়কেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহা-দের হাতে এক এক খানি রুমাল, পায়ে নূপুর, হৃদয় জয়লিপ্সায় পূর্ণ। তাহারা প্রথমে জয়প্রার্থনা জানাইয়া দেবীপ্রতিমার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পর বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ না করিয়া ঢুলীর বাদ্য-সঙ্কেতে বিচিত্ররঙ্গে অঙ্গসঞ্চালনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্যশেষে প্রবীণ দলপ্রধা-নেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে মিলিয়া একটা-কিছু নিরর্থক বা সার্থক শব্দ উচ্চারণ করিল এবং ক্রমে ক্রমে এইরূপে সপ্তমে গলা চড়াইয়া গলাটা শানাইয়া লইল। তখন মোহাড়ার দল মাল্‌সীগান আরম্ভ করিলেন। একজন মাতব্বর লোক বই দেখিয়া গানের কথাগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিতে লাগিলেন, আর খাদের দল তাহার প্রতি-ধ্বনি করিতে লাগিল। এইরূপে মাল্‌সীর পর প্রকৃত গান আরম্ভ হইল,—গান, টপ্পা, কবি, সমস্তই যথারীতি গাওয়া হইল।

প্রতিদলেই একজন 'পাঁচালীদার' থাকে, সে সর্ব্বশেষে নানা স্তব-স্তুতি-বন্দনাদি গাহিয়া

'পাঁচালী'র সূত্রপাত করে। দাশরথি রায় প্রভৃতির পাঁচালীর সহিত এই পাঁচালীর কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখা যায় না। ইহাতে পাঁচালীওয়ালা উপস্থিতমত বিচিত্র ছন্দে নিবদ্ধ পদ্য উত্তরপ্রত্যুত্তর ছোট-বড় নানা রাগ-রাগিণী ও ছোট-বড় নানাতালে গাহিয়া শ্রোতৃকুলকে একান্তই মুগ্ধ করিয়া দেয়। পাঁচালীদারকে 'সরকার'-নামে অভিহিত করা হয়।

সরকার 'পাঁচালী' শেষ করিলেই দ্বিতীয় দলের ঢুলী ও কাঁসীওয়ালা আসিয়া ঠিক পুর্ব্বের মত সমস্ত সূচনা করে,—সেইরূপ নৃত্য, মাল্‌সী, টপ্পা, গান, কবি, সমস্তই হইতে থাকে। অধিকন্তু তাহারা পূর্ব্বদলের গানের উত্তর গানে, টপ্পার উত্তর টপ্পায় গাহিয়া যায়। পাঁচালীদারও গৌরচন্দ্রিকা-সমাপনান্তে পাঁচালীর উত্তর দান করে, আবার নিজেও নূতন প্রশ্নের চাপান দেয়। অনেক স্থলে পূর্ব্ব পাঁচালীবক্তার প্রশ্ন হইতেই ধারাবাহিক একটা উত্তর-প্রত্যুত্তরের স্রোত চলিতে থাকে।

ক্রমান্বয়ে দুই দল উত্তর-প্রত্যুত্তর গাহিতে লাগিল,—গানের সঙ্গেও নৃত্যের বিরাম নাই। অশ্রুতপূর্ব্ব অজ্ঞাত গানের প্রশ্নোত্তর অপরদলের কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে ঠিক গানের আকারে 'তিনকলি' বা 'পাঁচকলি'তে মিলাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর গায়কেরা সেই সদ্যোরচিত গান জলের মত গাহিয়া যাইতে লাগিল; কোথাও তালমানের একটুও গোল বাধিল না। বস্তুত এ বড় সহজ শক্তির কথা নয়। পাঁচালীবক্তা উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবস্থা চিন্তা করিয়া একটা স্বপ্রণীত ধুয়া ধরিয়া দেয়, আর দলের লোকেরা দুই পার্শ্বে বসিয়া সেই ধুয়া গাহিতে থাকে। সরকারজি মধ্যে দাঁড়াইয়া হেলিয়া দুলিয়া, হাত নাড়িয়া, কেহ বা বাঁদরের মত লাফাইয়া, অনর্গল সেই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর ও অনেক অনাবশ্যক রসালাপ ছন্দোবন্ধে গাহিয়া যায়। নিরক্ষর পাঁচালী-বক্তাদের পৌরাণিকী অভিজ্ঞতা, বচনরচনা-চাতুরী ও কবিত্ব বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য।

অপর পক্ষের প্রশ্নের ঠিক জবাব না হইলে, যাহাদের জবাব ঠিক না হয়, তাহাদের প্রতি প্রতিপক্ষের শাণিত বাক্যবাণ অজস্র পতিত হইতে থাকে। সভাতেও সে দল নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা মুখের বাহাদুরী ছাড়ে না বা হাল ছাড়িয়া পালায় না।

সপ্তমীরাত্রির গান প্রভাতেই সমাপ্ত হইয়া যায়; কেন না, তখনই মহাষ্টমীর মহাপূজা,—পুরোহিতগণের মন্ত্রপাঠাদিকালে কোনরূপ গোলযোগ হইতে পারে না। অষ্টমীর সমস্ত ব্যাপারও পূর্ব্বদিনেরই অনুরূপ; তবে কতকটা অধিকতর উদ্যম, উৎসাহ, আনন্দ, আড়ম্বরে পূর্ণ। এইদিন অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজায় নরনারীর হৃদয় হইতে যে মাতৃভক্তির মহোচ্ছ্বাস উত্থিত হয়, তাহার আর তুলনা নাই!

অষ্টমীরাত্রির গানও প্রভাতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। মহানবমীপূজার তখন মহা আড়ম্বর। মহানবমীর মহামহোৎসবময়ী রজনীর আরব্ধ কবিগান কিন্তু দশমীর প্রভাতে নিবৃত্ত হয় না। সেদিন পূজা

অল্প-স্বল্প, চণ্ডীপাঠের ঘটা বা মন্ত্রের তেমন আড়ম্বর নাই। কাজেই সে দিন সখের দল সখ্ মিটাইয়া—কণ্ঠের কণ্ডূয়ন যথেষ্ট দূর করিয়া, প্রায় আড়াইপ্রহর বেলায় গান সমাপ্ত করেন। উভয় দলের মধ্যে সপ্তমী-অষ্টমীর সঞ্চিত বিবাদের বিষ সেইদিন সম্পূর্ণরূপে উদ্‌গীরিত হইয়া উঠে; পুরাণের উপাখ্যান সেদিন ক্রমশ অভদ্র গালাগালিতে পরিণত হয়। অনেক সময় সেই উন্মত্ত কবির লড়াই এতটা জঘন্য নীচ কলহের ভাষায় অগ্রসর হয় যে, অন্তঃপুরের চিকের অন্তরাল-বর্ত্তী মহিলাশ্রোতৃকুল বাধ্য হইয়া স্থানত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। বিশিষ্ট ভদ্র সভাকে তখন অগত্যা উভয়দলের বিবাদমীমাংসা করিয়া দিতে হয়। এই বিবাদমীমাংসাতেই গানের শেষ। ইতরশ্রেণীর লোক গালাগালির পটুতা-অপটুতা লইয়াই জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, তিনদিনের রাত্রিজাগরণ ও চীৎকারে গায়কদলের বায়ু এত প্রবল হইয়া পড়ে যে, সেই চীৎকারভগ্ন বিকৃত কণ্ঠে মহাকষ্টে গান করিয়াও তাহাদের সখ্ আর মেটে না। মাধুর্য্য, স্বাস্থ্য ও শিষ্টাচার শেষটায় তাহাদের নিকট হইতে যেন বহুদূরে সরিয়া যায়।

অপরাহ্লে ভাসান। ভাসানের নামে সকলের প্রাণই নিতান্ত কাতর-ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। গৃহলক্ষ্মীরা তখন বিচিত্র বাসাচ্ছাদন পরিধান করিয়া ধান্যদূর্ব্বাদি লইয়া মায়ের বিদায়সম্ভাষণ করিতে উপস্থিত হন। বিদায়-কালে তাঁহারা কত করুণভাবে সাশ্রুনয়নে মেনকার মত একবার মাতৃস্নেহ প্রকাশ করেন, আবার কন্যার মত—দীনহীনা দাসীর মত কত করুণ দীনতা—কত কাতরপ্রার্থনা জানাইয়া শত স্তুতি-প্রণতি সহকারে সকল দেবদেবীর সহিত পর্ব্বতনন্দিনীর বিদায়বন্দনা করেন।

যখন দেবীপ্রতিমা মণ্ডপ হইতে বাহিরে আনীত হইলেন, তখন বিদায়কালীন আরতির বাদ্যভাণ্ড ও কীর্ত্তনের ধ্বনির সঙ্গে ধূপধুনার সুবাস চতুর্দ্দিকে বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। সে বাদ্যধ্বনি, সে কীর্ত্তনের রাগিণী, সে ধূপের সৌগন্ধ, সকলের প্রাণে কি-এক করুণ আকুলতা জাগাইয়া তুলিল। অবশেষে দেবীপ্রতিমা বাহকের স্কন্ধে 'থলী', নদী বা পুষ্করিণীতে নীত হইতে লাগিলেন। শতশত বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সঙ্গে চলিল, কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনসম্প্রদায়ও সঙ্গ লইলেন। তাহার পর সকলে যথাস্থানে উপস্থিত হইলে, শত লোকের সজল করুণদৃষ্টির সম্মুখে গভীর জলে দেবীপ্রতিমার বিসর্জ্জন হইল। তখন মর্ম্মাহত অনুচরগণ কাতরভাবে গান ধরিলেন—"ছেড়ে যেতে বিদরে পরাণ গো অভয়া! মারে ভাসায়ে জলে কি লয়ে বঞ্চিব ঘরে, ছেড়ে যেতে বিদরে পরাণ গো অভয়া!" বাস্তবিকই তখন জানপদ-নরনারীর প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইতে থাকে। শূন্য প্রাণ, সাশ্রু নয়ন লইয়া সকলে ফিরিয়া আসিয়া যখন শূন্যমণ্ডপের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁহাদের দেহবন্ধনগুলি যেন শিথিল হইয়া পড়ে,—যথার্থই অন্তরে বাহিরে তখন একটা ব্যাকুল বিরহকাতরতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

সেই দুঃখের অন্ধকারে পুরোহিত

প্রশস্তিবন্ধন করিয়া সকলের মস্তকে শান্তিজল সেচন করিলেন, আর সকলে ভক্তির সহিত তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে করিয়া, একে একে ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিজয়ার সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ, অভিবাদন আরম্ভ হইল। সেই ক্লিষ্ট-কাতর অন্তঃকরণ লইয়া পরস্পরের এই সাদর-সম্ভাষণ সমবেদনার পরিচয় দিল এবং যথার্থই স্নিগ্ধকথায়, মিষ্ট-মুখ করিয়া, পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ভার লঘু করিয়া দিলেন। সেই আকুলতার দিনে শত্রুমিত্রের প্রভেদ লোপ পাইল। বিজয়ার বিজয়নিশানের নিম্নদেশে দাঁড়াইয়া মিত্রে মিত্রে—শত্রুতে শত্রুতে, বালকে বালকে—বালকে যুবকে, তরুণে তরুণে—তরুণে বৃদ্ধে, বৃদ্ধে বৃদ্ধে—বৃদ্ধে বালকে, ইতরে ভদ্রে—ব্রাহ্মণে শূদ্রে, অকপট সাদরসম্ভাষণ—আশীর্ব্বাদ-অভিবন্দনের বিনিময় এবং আলিঙ্গন-আপ্যায়ন চলিতে থাকিল। বালিকা-তরুণী, প্রৌঢ়া-বৃদ্ধার পরস্পরের প্রেম-বিনিময়ে বিজয়ার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গৌরব সকলের চিত্তে জাগ্রত হইয়া উঠিল। সম্পর্কের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আত্মীয় মহিলাকুলের সহিত আত্মীয় পুরুষসম্প্রদায়ের সম্ভাষণবিনিময়েও বিজয়ার কোমলমাধুরী বিকশিত হইতে লাগিল।

বাংলার শারদোৎসব একদিন এমনই আন্তরিকতাময়, এমনই মহিমান্বিত, এমনই মাধুর্য্যবর্ষী ছিল!

শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব।

বশীকরণ

(সংক্ষিপ্ত নাট্য)

প্রথম অঙ্ক।

আশু ও অন্নদা।

আশু। আচ্ছা অন্নদা, তুমি যেন ব্রাহ্মই হয়েছিলে, কিন্তু তাই বলে স্ত্রী-পরিত্যাগ করতে গেলে কেন? স্ত্রী ত তেত্রিশ কোটির মধ্যে একটিও নয়! ঐটুকু পৌত্তলিকতা—রাখ্‌লেও ক্ষতি ছিল না।

অন্নদা। সে ত ঠিক কথা। স্ত্রী-পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু স্ত্রীজাতি ত বিদায় হন না,—স্ত্রীকে ছাড়্‌লে স্ত্রীজাতি বিশ্বব্যাপী হয়ে দেখা দেন—স্ত্রীপূজার মাত্রা মনে মনে বেড়ে ওঠে।

আশু। তবে?

অন্নদা। তবে শোন। আমার শাশুড়ি

ছিলেন না, শ্বশুর ভয়ঙ্কর হিন্দু ছিলেন। যখন শুন্‌লেন আমি ব্রাহ্ম হয়েছি, আমার স্ত্রীকে বিধবার বেশ পরিয়ে ব্রহ্মচারিণী কোরে কাশীতে গিয়ে বাস কর্‌লেন। তার পরে শুন্‌চি হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত দেবতাতেও তৃপ্তি হয় নি, তার উপরে অল্‌কট্‌, ব্লাভাট্‌স্কি, অ্যানি বেসাণ্ট্‌, সূক্ষ্মশরীর, মহাত্মা, প্লান্‌চেট, ভূতপ্রেত, কিছুই বাদ যায় নি—

আশু। কেবল তুমি ছাড়া।

অন্নদা। আমাকে ব্রহ্মদৈত্য বলে বাদ দিলে।

আশু। তুমি তার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছ?

অন্নদা। আশার অপরাধ নেই—তার পশ্চাতে এত বড় রেজিমেণ্ট্‌ লেগেছে, সে আর টিঁক্‌ল না! শুনেছি আমার শ্বশুর মারা গেছেন, এবং আমার স্ত্রী এখন পতিত উদ্ধার কোরে বেড়াচ্চেন।

আশু। তুমি একবার চরণে পতিত হওগে না, যদি উদ্ধার করেন!

অন্নদা। ঠিকানাও জানিনে, প্রবৃত্তিও নেই।

আশু। তুমি কি এইরকম উড়ে উড়ে বেড়াবে?

অন্নদা। না হে, সোনার খাঁচার সন্ধানে আছি।

আশু। খাঁচাওয়ালার অভাব নেই, তবে সোনা-জিনিষটা দুর্লভ বটে!

অন্নদা। আচ্ছা, আমার আলোচনা পরে হবে, কিন্তু তোমার কি বল দেখি? তোমার ত আইবড়লোকপ্রাপ্তির বিধান কোন শাস্ত্রেই লেখে না। তার বেলা চুপ! থিওসফিতে তোমাকে খেলে! মন্ত্রতন্ত্র, প্রাণায়াম, হঠযোগ, সুষুম্না-ইড়া-পিঙ্গলা, এ সমস্তই তোমাকে ছাড়ে, যদি বিবাহ কর!

আশু। তুমি মনে কর, আমি সবই অন্ধভাবে বিশ্বাস করি—তা নয়। এ সমস্ত বিশ্বাসের যোগ্য কি না, তাই আমি পরীক্ষা কোরে দেখ্‌তে চাই! অবিশ্বাসকেও ত প্রমাণের উপর স্থাপন কর্‌তে হবে।

অন্নদা। বসে বসে তাই কর! মরীচিকা-স্থাপনের জন্যে পাথরের ভিত্তি গাঁথ। আমি এখন চল্লেম।

আশু। কোথায় যাচ্চ?

অন্নদা। শবসাধনায় নয়।

আশু। তা ত জানি।

অন্নদা। একটি সজীবের সন্ধান পেয়েছি।

আশু। তবে যাও! শুভকার্য্যে বাধা দেব না!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বাড়ীওয়ালা ও তাহার স্ত্রী।

স্ত্রী। মাতাজি যদি হবে, তবে অমন চেহারা কেন?

বাড়ীওয়ালা। দেখ্‌তে শুন্‌তে তাড়কা-রাক্ষসীর মত না হ'লেই বুঝি আর মাতাজি হয় না!

স্ত্রী। হবে না কেন! কিন্তু তা হ'লে কি এই সমর্থবয়সে স্বামীর ঘরে না থেকে তোমার মত বোকা ভোলাবার জন্যে মাতাজি-গিরি কর্‌তে বেরুত? তা হ'লে কি

পিতাজি তোমার মাতাজিকে ছাড়্ত ? আর এত টাকাই বা পেলে কোথায় ?

বাড়ীওয়ালা। ওগো, যারা যোগবিদ্যা জানে, তাদের যদি টাকা না হবে—চেহারা না হবে, তবে কি তোমার হবে ? রোস না,—ওঁর কাছে মন্তরটন্তরগুলো শিখে নেওয়া যাক্ না।

স্ত্রী। বুড়োবয়সে মন্তর শিখে হবে কি শুনি ! কাকে বশ করবে ?

বাড়ীওয়ালা। যাঁকে কিছুতেই বশ মানাতে পার্‌লেম না !

স্ত্রী। তিনি কে ?

বাড়ীওয়ালা। আগে বশ মানাই, তার পরে সাহস কোরে নাম বল্‌ব !

মাতাজির প্রবেশ।

মাতাজি। এ বাড়ীতে আমার থাকার সুবিধা হচ্চে না। এর চেয়ে বড় বাড়ী আমাকে দিতে হবে।

বাড়ীওয়ালা। এ বাড়ী ছাড়া আমার আর একটিমাত্র বড় বাড়ী আছে। সেটা বড় বটে, কিন্তু—

মাতাজি। তা ভাড়া বেশি দেব, কিন্তু সেই বাড়ীতেই আমি কাল যেতে চাই।

বাড়ীওয়ালা। সবে পশুদিন সেখানে একটি ভাড়াটে এসেছে। একটি কোন্ সদর্‌আলার বিধবা স্ত্রী,—পশ্চিম থেকে মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজ্‌তে এসে আমার সেই উনপঞ্চাশ নম্বরের বাড়ীতে উঠেছে।

মাতাজি। উনপঞ্চাশ নম্বর ! ঠিক আমি যা চাই ! তোমার এ বাড়ীর নম্বর ভাল নয় !

বাড়ীওয়ালা। বাইশ নম্বর ভাল নয় মাতাজি ? কারণটা কি বুঝিয়ে বলুন।

মাতাজি। বুঝ্‌তে পার্‌চ না—দুয়ের পিঠে দুই—

বাড়ীওয়ালা। ঠিক বলেছেন মাতাজি, দুয়ের পিঠে দুইই ত বটে ! এতদিন ওটা ভাবি নি !

মাতাজি। দুইয়েতে কিছু শেষ হয় না, তিন চাই। দেখ না, আমরা কথায় বলি, দু তিন জন—

বাড়ীওয়ালা। ঠিক ঠিক, তা ত বলেই থাকি।

মাতাজি। যদি দুই বল্লেই চুকে যেত, তা হ'লে তার সঙ্গে আবার তিন বল্‌ব কেন ? বুঝে দেখ !

বাড়ীওয়ালা। আমাদের কি বা বুদ্ধি, তাই বুঝ্‌ব ! সবই ত জান্‌তুম, তবু ত বুঝিনি !

মাতাজি। তাই, ঐ দুইয়ের পিঠে দুই বলেই আমার মন্ত্র কিছুই সফল হচ্চে না !

স্ত্রী। (আত্মগত) বেঁচে থাক্ আমার দুইয়ের পিঠে দুই ! মন্ত্র সফল হ'য়ে কাজ নেই !

মাতাজি। উনপঞ্চাশের মত এমন সংখ্যা আর হয় না !

বাড়ীওয়ালা। (জনান্তিকে) শুন্‌লে ত গিন্নি !

স্ত্রী। (জনান্তিকে) শুনে হবে কি ! তোমার উনপঞ্চাশ যে অনেককাল হ'ল পেরিয়েছে !

বাড়ীওয়ালা। কিন্তু মাতাজিকে কি কালই সে বাড়ীতে যেতে হবে ?

মাতাজি। কাল উনত্রিশে তারিখে

মঙ্গলবার পড়েছে, এমন দিন আর পাওয়া যাবে না!

বাড়ীওয়ালা। ঠিক কথা! কাল উনত্রিশেও বটে, আবার মঙ্গলবারও বটে! কি আশ্চর্য্য! তা হ'লে ত কালই যেতে হচ্চে বটে! তা-ই ঠিক কোরে দেব! (মাতাজির প্রস্থান) এখন আমার সেই নতুন ভাড়াটেদের ওঠাই কি বোলে? বিদেশ থেকে এসেছে, হঠাৎ তারা এখন বাড়ীই বা পায় কোথায়?

স্ত্রী। তাদের আপাতত এই বাড়ীতে এনেই রাখ না! আমরা না হয় কিছুদিন ঝামাপুকুরে জামাইবাড়ী গিয়েই থাকব! তোমার ঐ মন্তর-জানা মেয়েমানুষকে এখানে রেখে কাজ নেই! বিদায় কোরে দাও! ছেলেপিলের ঘর, কার্ কখন্ অপরাধ হয়, বলা যায় কি!

বাড়ীওয়ালা। সেই ভাল। তাদের কোনরকম কোরে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আজকের মধ্যেই উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে এনে ফেলা যাক্। বলি গে, পাড়ায় প্লেগ্ দেখা দিয়েছে, উনপঞ্চাশ নম্বরে প্লেগ্-হাঁস্‌পাতাল বস্‌বে!

তৃতীয় অঙ্ক।

আশু ও অন্নদা।

অন্নদা। তোমার ঐ টাট্‌কা-লঙ্কার ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে কর্‌লে যে হে! তোমার ঘরে আসা ছাড়্‌তে হল্!

আশু। টাট্‌কা লঙ্কার ধোঁয়া তুমি কোথায় পেলে?

অন্নদা। ঐ যে তোমার তর্কালঙ্কারের বকুনি! লোকটা ত বিস্তর টিকি নাড়্‌লে, মাথামুণ্ডু কিছু পেলে কি?

আশু। মাথামুণ্ডু নইলে শুধুটিকি নড়্‌বে কোথায়? কথাগুলো যদি শ্রদ্ধা কোরে শুন্‌তে, তবে বুঝ্‌তে।

অন্নদা। যদি বুঝ্‌তেম, তবে শ্রদ্ধা কর্‌তেম! তুমি আশু ফিজিকাল্ সায়ান্সে এম্, এ, দিয়ে এলে—তুমি যে এত ঘনঘন টিকিনাড়া বরদাস্ত কর্‌চ, এ যদি দেখতে পায়, তবে প্রেসিডেন্সি কালেজের চূণকামকরা দেয়ালগুলো বিনি খরচে লজ্জায় লাল হোয়ে ওঠে। আজ কথাটা কি হ'ল বুঝিয়ে বল দেখি!

আশু। পণ্ডিতমশায় পরিণয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর্‌ছিলেন।

অন্নদা। তত্ত্বটা আমার জানা খুব দরকার হোয়ে পড়েছে। তর্কালঙ্কারমশায় বল্‌ছিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার সঙ্গে জানাশুনার চেষ্টা না করাই কর্ত্তব্য। যুক্তিটা কি দিচ্ছিলেন, ভাল বোঝা গেল না।

আশু। তিনি বল্‌ছিলেন; সকল জিনিষের আরম্ভের মধ্যে একটা গোপনতা আছে। বীজ মাটির নীচে অন্ধকারের মধ্যে থাকে, তার পরে অঙ্কুরিত হ'লে তখন সূর্য্যচন্দ্র-জল-বাতাসের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই কর্‌বার সময় আসে। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার হৃদয়কে বিলাতী অনুকরণে বাইরে টানাটানি না কোরে তাকে আচ্ছন্ন আবৃত রাখাই কর্ত্ত... তখন তার উপরে তাড়াতাড়ি দৃষ্টিক্ষেপ কর্‌তে যেয়ো না। সে যখন স্বভাবতই নিজে অঙ্কুরিত হোয়ে তার 'অর্দ্ধ-

মুকুলিত সলজ্জ দৃষ্টিটুকু গোপনে তোমার দিকে অগ্রসর করতে থাকবে, তখনি তোমার অবসর।

অন্নদা। আমার অদৃষ্টে সে পরীক্ষা ত হ'য়ে গেছে। বিলাতী প্রথামতে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার হৃদয় নিয়ে টানাহেঁচ্ড়া করিনি;—হৃদয়টা এত অন্ধকারের মধ্যে ছিল যে, আমি তার কোন খোঁজ পাইনি, তার পরে অঙ্কুরিত হ'ল কি না হ'ল, তারো ত কোন ঠিকানা পেলেম না। এবারে উল্টো-রকম পরীক্ষা করতে চলেছি, এবার আগে হৃদয়, তার পরে অন্য কথা!

আশু। পরীক্ষার দিন কবে?

অন্নদা। কাল।

আশু। স্থান?

অন্নদা। উনপঞ্চাশ নম্বর রাম বৈরাগীর গলি।

আশু। নম্বরটা ত ভাল শোনাচ্চে না!

অন্নদা। কেন? উনপঞ্চাশ বায়ুর কথা ভাব্‌চ? সে আমাকে টলাতে পারবে না—তুমি হলে বিপদ্ ঘট্‌ত।

আশু। পাত্র?

অন্নদা। কন্যার বিধবা মা তাকে পশ্চিম থেকে সঙ্গে করে এনেছে। আমি ঘটককে বলে রেখেছি যে, ভাল কোরে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় কোরে নিয়ে তবে বিবাহের কথা হবে।

আশু। কিন্তু অন্নদা, শেষকালে বহু-বিবাহে প্রবৃত্ত হলে!

অন্নদা। তোমাদের মত আমি নাম দেখে ভড়্‌কাই নে। যে বহুবিবাহের মধ্যে আর সমস্ত আছে, কেবল বহুটুকুই নেই, তাকে দেখে চম্‌কাও কেন ভাই!

আশু। তবু একটা প্রিন্সিপ্‌ল্ আছে ত—বহুবিবাহকে বহুবিবাহ বল্‌তেই হবে।

অন্নদা। আমার নামমাত্র স্ত্রী যেখানে আছে, প্রিন্সিপ্‌ল্‌ও সেইখানে আছে। সে স্ত্রীও আস্‌চে না, প্রিন্সিপ্‌ল্‌ও রইল—অতএব এখন আমি ডঙ্কা মেরে বহুবিবাহ করব, প্রিন্সিপ্‌ল্-জুজুকে ডরাব না!

রাধাচরণের প্রবেশ।

রাধা। আশুবাবু!

আশু। কি হে রাধে!

রাধা। সেদিন আপনি আমার সঙ্গে মন্ত্র নিয়ে তর্ক করলেন—এক একটা শব্দের যে একএকপ্রকার বিশেষ ক্ষমতা আছে, আমার বোধ হল আপনি যেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।

অন্নদা। বল কি রাধে—তা হলে আশুর অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা এখনো সম্পূর্ণ লোপ হয় নি—এখনো দুটো একটা জায়গায় ঠেক্‌চে! শব্দের মধ্যে শক্তি আছে, এ কথা বাঙালীর ছেলে বিশ্বাস কর না।

রাধা। বলুন্ ত অন্নদাবাবু! তা হ'লে মারণ, উচাটন, বশীকরণ, এগুলো কি বেবাক্ গাঁজাখুরি!

অন্নদা। তাও কি কথনো হয়? সংসারে কি এত গাঁজার চাষ হতে পারে!

রাধা। পশ্চিম থেকে একজন যোগ-সিদ্ধ মাতাজি এসেছেন। শুনেছি তিনি মন্ত্রের বল একেবারে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে পারেন। দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, কিন্তু সকলকে তিনি

দেখা দেন না; বলেছেন, যোগ্য লোক পেলে তাকে তিনি তাঁর সমস্ত বিদ্যে দেখিয়ে দেবেন। আশুবাবু, আপনি চেষ্টা কর্‌লে নিশ্চয় বিফল হবেন না।

আশু। তিনি থাকেন কোথায়?

রাধা। বাইশনম্বর ভেড়াতলায়।

অন্নদা। বাইশনম্বরটা উনপঞ্চাশের চেয়ে ভাল হ'তে পারে, কিন্তু জায়গাটা ভাল ঠেক্‌চে না। একে বশীকরণ-বিদ্যে, তার উপরে ভেড়াতলা! মাতাজির কাছে মুণ্ডুটি খুইয়ে এসো না!

আশু। আরে ছি! কি বকো, তার ঠিক নেই! তাঁরা হলেন সাধু স্ত্রীলোক, সেখানে মুণ্ডুর ভাবনা ভাব্‌তে হয় না। তুমি বুঝে-সুঝে উনপঞ্চাশে পা বাড়িয়ো।

অন্নদা। তুমি ভাব্‌চ বাইশ একেবারেই নির্ব্বিষ! তা নয় হে! বিশের উপরেও দুই-মাত্রা চড়িয়ে তবে বাইশ! আপাদমস্তক জর্জ্জর হয়ে ফির্‌বে!

চতুর্থ অঙ্ক।

বাইশ নম্বরে কন্যার বিধবা মাতা শ্যামাসুন্দরী।

শ্যামা। পেলেগ্ শুনে ভয়ে বাঁচিনে! তাড়াতাড়ি কোরে পালিয়ে ত এলুম! কিন্তু অন্নদা বোলে ছেলেটির আজ যে সেই উন-পঞ্চাশ নম্বরে আস্‌বার কথা আছে, সে কি সেখান থেকে চিনে এখানে ঠিক আস্‌তে পার্‌বে? এত কোরে খাওয়াদাওয়ার জোগাড় কর্‌লেম্, সব মাটি হবে না ত? যে তাড়াটা লাগালে, একবার খবর দেবার সময় দিলে না! ঘটক বলেছে, ছেলেটি আমার নিরুপমাকে ভাল কোরে দেখে-শুনে নিতে চায়, ওর পড়াশুনো গানবাজ্‌না সব পরীক্ষা কর্‌বে—তা করুক! কর্ত্তা ত নিরুপমাকে সেই রকম কোরেই শিখিয়েচেন! বরাবর পশ্চিমে ছিলেন, আমা-দের কখনো ত বন্ধ কোরে রাখেন নি! তবু কল্‌কাতার ছেলে কিরকম জানিনে! ভয় হয়! আমাদের ধরণধারণ দেখে হয় ত অভদ্র মনে কর্‌বে! তারা মেয়েদের সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করে না কি, কে জানে! হয় ত ইংরাজিতে গুড্‌মর্ণিং বলে। শুনেচি তাদের নিজের হাতে চুরট জ্বালিয়ে দিতে হয়—এ সব ত পার্‌ব না! ঘটক বল্লে, ছেলেটি হ্যাট্‌-কোট্ পরে! আমার মেয়ে আবার ফিরিঙ্গির সাজ দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না! কি রকম যে হবে, বুঝ্‌তে পার্‌চি নে! মন্ত্র পড়ে' বিয়ে কর্‌তে রাজি হবে ত?

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। মা ঠাকরুণ, একটি বাবু এসে-চেন। আমি তাঁকে বল্লেম, বাড়ীতে পুরুষ-মানুষ কেউ নেই। তিনি বল্লেন, তিনি মার সঙ্গেই দেখা কর্‌তে এসেচেন।

শ্যামা। তবে ঠিক হয়েছে। সেই ছেলেটি এসেচে। ডেকে নিয়ে আয়। (ভৃত্যের প্রস্থান) ভয় হচ্চে—কল্‌কাতার ছেলে, তার সঙ্গে কি রকম কোরে চল্‌তে হবে! কি জানোয়ারই মনে কর্‌বে!

আশুর প্রবেশ।

(শ্যামাসুন্দরীর পায়ের কাছে একটি গিনি রাখিয়া আশুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

শ্যামা। (স্বগত) এ যে প্রণামী দিয়ে প্রণাম কর্‌লে গো! এ ত শেক্‌হ্যাণ্ড করে না! বাঁচালে! লক্ষ্মী ছেলে! কেমন ধুতি-চাদর পরে এসেছে!

আশু। মাতাজি, আমাকে যে আপনি দর্শন দেবেন, এ আমি আশা করিনি! বড় অনুগ্রহ করেচেন!

শ্যামা। (সস্নেহে সপুলকে) কেন বাবা, তুমি আমার ছেলের মত, তোমাকে দেখা দিতে দোষ কি!

আশু। স্নেহ রাখ্‌বেন। আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, এই অনুগ্রহ থেকে কখনো বঞ্চিত না হই!

শ্যামা। বাবা, তোমার কথা শুনে আমার কান জুড়ালো—আমি নিশ্চয় অনেক তপস্যা করেছিলেম, তাই—

আশু। মাতাজি, আপনি তপস্যার দ্বারা যে নিরুপমা-সম্পদ্‌ লাভ করেচেন, আমাকে তার—

শ্যামা। তোমাকে দেবার জন্যেই ত প্রস্তুত হয়ে এসেচি। অনেক সন্ধান কোরে যোগ্যপাত্র পেয়েছি—এখন দিতে পার্‌লেই ত নিশ্চিন্ত হই।

আশু। (শ্যামার পদধূলি লইয়া) মাতাজি, আমাকে কৃতার্থ কর্‌লেন—এত সহজেই যে ফললাভ কর্‌ব, এ আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না।

শ্যামা। বল কি বাবা, তোমার আগ্রহ যত, আমার আগ্রহ তার চেয়ে বেশি!

আশু। তা হ'লে যে কামনা কোরে এসেছিলেম, আজ কি তার কিছু পরিচয়—

শ্যামা। পরিচয় হবে বৈ কি বাবা, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই—

আশু। আপত্তি নেই মাতাজি? শুনে বড় আরাম পেলেম—

শ্যামা। দেখাশুনা সমস্তই হবে বাবা, আগে কিছু খেয়ে নাও!

আশু। আবার খাওয়া! আপনি আমাকে যথার্থ জননীর মতই স্নেহ দেখালেন!

শ্যামা। তুমিও আমাকে মার মতই দেখ্‌বে, এই আমার প্রাণের ইচ্ছা—আমার ত ছেলে নেই, তুমিই আমার ছেলের মত থাক্‌বে।

আহার্য্য লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

আশু। করেচেন কি? এত আয়োজন?

শ্যামা। আয়োজন আর কি কর্‌লেম? আজই ঠিক আস্‌তে পার্‌বে কি না, মনে একটু সন্দেহ ছিল, তাই—

আশু। সন্দেহ ছিল? আপনি কি জান্‌তেন্‌, আমি আস্‌ব?

শ্যামা। তা জান্‌তেম বৈ কি।

আশু। (আত্মগত) কি আশ্চর্য্য! আমাকে না জেনেই আমার জন্যে পূর্ব্ব হতেই অপেক্ষা কর্‌ছিলেন? তবু অন্নদা যোগবলে বিশ্বাস করে না! তাকে বল্লে বোধ হয় ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দেবে! (আহারে প্রবৃত্ত)

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি সোনার টুক্‌রো! যেমন কার্ত্তিকের মত দেখ্‌তে, তেম্‌নি মধুঢালা কথা! আমাকে প্রথম থেকেই মাতাজি বলে ডাকৃচে। পশ্চিম থেকে এসেছে কি না, তাই বোধ হয় মা না বলে' মাতাজি বল্‌চে (প্রকাশ্যে) কিছুই খেলে না যে বাবা?

আশু। আমার যা সাধ্য, তার চেয়ে বরঞ্চ বেশিই খেয়েছি মাতাজি।

শ্যামা। তা হ'লে একটু বোস—আমি ডেকে নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

আশু। রাধে বলেছিল বটে, মাতাজি কুমারী কন্যার দ্বারা মন্ত্রের ফল দেখিয়ে থাকেন। বশীকরণ-বিদ্যায় আমার একটু বিশ্বাস জন্মাচ্চে। এরি মধ্যে মাতাজির মাতৃস্নেহে আমার চিত্ত কেমন যেন আর্দ্র হয়ে এসেছে। আমার মা নেই, মনে হচ্চে যেন মাকে পেলেম! এ কোন্ মন্ত্রবলে কে জানে! মাতাজি স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা আমার সমস্ত শরীর যেন অভিষিক্ত কোরে দিয়েছেন। প্রথম দেখাতেই উনি যে আমাকে তাঁর পুত্রস্থানীয় করে নিয়েচেন, এ যেন পূর্ব্বজন্মের একটা সম্বন্ধের স্মৃতি।

নিরুপমাকে লইয়া শ্যামার প্রবেশ।

আশু। (স্বগত) আহা কি সুন্দর! মাতাজির বশীকরণ-বিদ্যা যেন মূর্ত্তিমতী। এঁর মুখে কোন মন্ত্রই বিফল হতে পারে না।

শ্যামা। যাও, লজ্জা কোরো না মা! উনি যা জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর দিয়ো!

আশু। লজ্জা কর্‌বেন না! মাতাজি আমার প্রতি যে-রকম অনুগ্রহ প্রকাশ করেচেন, আপনিও আমাকে আপনার লোকের মতই দেখ্‌বেন। (আত্মগত) মেয়েটি কি লাজুক! আমার কথা শুনে আরো যেন লাল হয়ে উঠ্‌ল।

শ্যামা। বাবা, তোমার ইচ্ছামত ওকে জিজ্ঞাসাপত্র কর!

আশু। আপনার কোন্ কোন্ বিদ্যায় অধিকার আছে, জান্‌তে উৎসুক হ'য়ে আছি।

শ্যামা। বয়স অল্প, বিদ্যা কতই বা বেশি হবে—তবে—

আশু। যত অল্পই হোক্ মাতাজি, আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

শ্যামা। (আত্মগত) বিদ্যার কোন পরিচয় না পেয়েই যখন এত সন্তুষ্ট, তখন মেয়েকে পছন্দ করেচে বলেই বোধ হচ্চে। বাঁচা গেল, আমার বড় ভাবনা ছিল। (প্রকাশ্যে) নিরু, একটি গান শুনিয়ে দাও ত মা।

আশু। গান! এ আমার আশার অতীত! আপনি বোধ হয় পূর্ব্বে থেকেই জানেন্, গানের চেয়ে আমি কিছুই ভাল বাসিনে। (স্বগত) অন্নদার মত এত বড় সন্দেহী, সে থাকৃলে আজ যোগের বল প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌ত! (প্রকাশ্যে নিরুপমার প্রতি) আপনারা আমাকে একদিনেই চিরঋণী করেচেন—যদি গান করেন, তবে বিক্রীত হ'য়ে থাকৃব!

(নিরুপমার গান)

কাফি—ঝাঁপতাল।

(আমি) কি বলে' করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণমন!

চিত্তে এসে দয়া করি' নিজে লহ অপহরি'
কর তারে আপনার ধন—
আমার হৃদয় প্রাণমন!
শুধু ধূলি শুধু ছাই মূল্য যার কিছু নাই
মূল্য তারে কর সমর্পণ
তব স্পর্শে পরশরতন!
তোমার গৌরবে যবে আমার গৌরব হবে
লজ্জাসহ দিব বিসর্জ্জন
চরণে হৃদয় প্রাণমন!

আশু। (স্বগত) আর মন্ত্রের দরকার নেই। বশীকরণের কি আর বাকি রইল! কন্যাটি দেবকন্যা! (প্রকাশ্যে) মাতাজি!

শ্যামা। কি বাবা!

আশু। আমাকে আপনার পুত্র কোরেই রাখ্‌বেন, এমন সুধাসঙ্গীত শোন্‌বার অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্‌বেন না। যা পাওয়া গেল, এই আমি পরম লাভ মনে কর্‌চি। মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভুলেই গেছি। এখন বুঝ্‌তে পার্‌চি, মন্ত্রের কোন দরকারই নেই!

শ্যামা। অমন কথা বোলো না বাবা! মন্ত্রের দরকার আছে বৈ কি! নইলে শাস্ত্রে—

আশু। সে ত ঠিক কথা! মন্ত্র আমি অগ্রাহ্য করি নে। আমি বল্‌ছিলেম, মন্ত্র পড়্‌লেই যে মন বশ হয়, তা নয়, গানের মোহিনী শক্তির কাছে কিছুই লাগে না। (স্বগত) মেয়েটি আবার লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল! ভারি লাজুক!

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি খুব ভাল! কিন্তু একটু যেন লজ্জা কম বলে' বোধ হয়! মন বশ করার কথাগুলো শাশুড়ির সাম্‌নে না বল্লেই ভাল হত।

আশু। কিন্তু আপনি বিরক্ত হবেন না, আমার যা মনে উদয় হচ্চে আমি বলি, তার পরে—

শ্যামা। তা বাবা, সে সব কথা এখন থাক্! আগে—

আশু। আমি বল্‌ছিলেম, গানে যে মন বশ হয়, সেও ত শব্দমাত্র—মনের সঙ্গে তার যদি যোগ থাকে, তা হলে মন্ত্রের শব্দশক্তিকেই বা না মানি কি বোলে?

শ্যামা। ঠিক কথা। মন্ত্রটা মানাই ভাল!

আশু। (সোৎসাহে) আপনার কাছে এ সব কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, কিন্তু শাব্দী শক্তির সঙ্গে আত্মার যে একটি নিগূঢ় যোগ আছে, তার স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন,—তর্কালঙ্কারমশায় বলেন, সে অনির্ব্বচনীয়। শাস্ত্রে যে বলে শব্দ ব্রহ্ম, তার কারণ কি? ব্রহ্মই যে শব্দ বা শব্দই যে ব্রহ্ম, তা নয়—কিন্তু ব্রহ্মের ব্যাবহারিক সত্তার মধ্যে শব্দস্বরূপই ব্রহ্মের সব চেয়ে যেন নিকটতম। (নিরুপমার প্রতি) আপনি ত এ সকল বিষয় অনেক আলোচনা করেচেন—আপনার কি মনে হয় না, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের চেয়ে শব্দই যেন আমাদের আত্মার অব্যবহিত প্রত্যক্ষের বিষয়। সেই-জন্যেই এক আত্মার সঙ্গে আর এক আত্মার মিলনসাধনের প্রধান উপায় শব্দ। আপনি কি বলেন? (স্বগত) মেয়েটি ভারি লাজুক।

শ্যামা। বল না মা, যা জিজ্ঞাসা কর্‌চেন বল! এত বিদ্যে শিখ্‌লে, এই কথাটার উত্তর দিতে পার্‌চ না? বাবা, প্রথমদিন কি না, তাই লজ্জা কর্‌চে। ও যে কিছু শেখে নি, তা মনে কোরো না।

আশু। ওঁর বিদ্যার উজ্জ্বলতা মুখশ্রীতেই প্রকাশ পাচ্চে। আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করচিনে।

শ্যামা। নিরু, মা, একবার ও-ঘরে যাও ত। (নিরুপমার প্রস্থান) দেখ বাবা, মেয়েটির বাপ নেই, সকল কথা আমাকেই কইতে হচ্চে—তুমি কিছু মনে কোরো না।

আশু। মনে করব! বলেন কি? আপনার কথা শুনতেই ত এসেছিলেম—বাচালের মত কেবল নিজেই কতকগুলো বোকে গেলেম। আমাকে মাপ করবেন।

শ্যামা। তোমার যদি মত থাকে, তা হ'লে একটা দিনস্থির করতে হচ্চে ত!

আশু। (স্বগত) আমি ভেবেছিলেম, আজই সমস্ত হ'য়ে যাবে। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার, তাই বোধ হয় হ'ল না। (প্রকাশ্যে) তা আসচে রবিবারেই যদি স্থির করেন!

শ্যামা। বল কি বাবা! আজ বৃহস্পতিবার, মাঝে ত কেবল দুটো দিন আছে!

আশু। এর জন্যে কি অনেক আয়োজনের দরকার হবে?

শ্যামা। তা হবে বৈ কি বাবা—যথাসাধ্য করতে হবে। তা ছাড়া, পাঁজি দেখে একটা শুভদিন স্থির করতে হবে ত।

আশু। তা বটে, শুভদিন দেখতে হবে বৈ কি! আসল কথা, যত শীঘ্র হয়! আমার যে-রকম আগ্রহ-ইচ্ছে হচ্চে, এই মুহূর্ত্তেই—

শ্যামা। তা আমি অনর্থক দেরি করব না বাবা। আসচে অগ্রাণমাসেই হ'য়ে যাবে। মেয়েটিরও বিবাহযোগ্য বয়স হ'য়ে এসেছে, ওকেও ত আর রাখা যাবে না।

আশু। ওঁর বিবাহ হ'য়ে গেলেই বুঝি—

শ্যামা। তা হলেই আবার আমি কাশীতে ফিরে যেতে পারি।

আশু। তা হ'লে তার আগেই আমাদের—

শ্যামা। সব ঠিক কোরে নিতে হবে।

আশু। তবে দিনক্ষণ দেখুন!

শ্যামা। তুমি ত রাজি আছ বাবা!

আশু। বিলক্ষণ! রাজি যদি না থাকবো ত এখানে এলেম কেন! আপনাকে নিয়ে কি আমি পরিহাস করচি! আমার সে-রকম স্বভাব নয়। আমি এখনকার ছেলেদের মত এ সকল বিষয় নিয়ে তামাসা করিনে!

শ্যামা। তোমার আর মত বদলাবে না!

আশু। কিছুতেই না! আপনার পদস্পর্শ কোরে আমি বলচি, আপনার কাছ থেকে যা গ্রহণ করতে এসেছি, তা আমি গ্রহণ কোরে তবে নিরস্ত হব!

শ্যামা। দেওয়া-থোওয়ার কথা কিছু হল না যে!

আশু। আপনি কি চান্ বলুন্।

শ্যামা। আমি কি চাইব বাবা! তুমি কি চাও, সেইটে বল!

আশু। আমি কেবল বিদ্যে চাই, আর কিছু চাইনে!

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কিন্তু বেহায়া, তা বলতেই হবে! ছি ছি ছি, বিদ্যেসুন্দরের কথা আমার কাছে পাড়লে কি কোরে! আমার নিরুকে বলে কি না বিদ্যে!

(প্রকাশ্যে) তা হ'লে পানপত্রটার কথা কি বল বাবা!

আশু। (স্বগত) পানপাত্র! এঁর দেখ্‌চি সমস্তই শাক্তমতে। এদিকে কুমারী কন্যা, তার পরে আবার পানপাত্র! এইটে আমার ভাল ঠেকচে না! (প্রকাশ্যে) তা মাতাজি, আপনি কিছু মনে করবেন না—অবশ্য যে কাজের যা অঙ্গ, তা করতেই হয়—কিন্তু ঐ যে পানপাত্রের কথা বল্লেন, ওটা ত আমার দ্বারা হবে না।

শ্যামা। বাবা তোমরা এ কালের ছেলে, তোমরা ওটাকে অসভ্যতা মনে কর, কিন্তু আমি ত ওতে কোন দোষ দেখিনে—

আশু। আপনি ওতে কোন দোষই দেখেন না? বলেন কি মাতাজি?

শ্যামা। তা না হয়, পানপত্র রইল, ওর জন্যে কিছু আট্‌কাবে না, এখন বিবাহের কথা ত পাকা?

আশু। কার বিবাহের কথা!

শ্যামা। তুমি আমাকে অবাক্ করলে বাপু! এতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করচ, কার্ বিবাহের কথা! তোমারি ত বিবাহের কথা হচ্ছিল—কেবল পানপত্রের কথা শুনেই তুমি চম্‌কে উঠ্‌লে। তা পান-পত্র না হয় না-ই হ'ল।

আশু। (হতবুদ্ধিভাবে) ও, হাঁ, তা বুঝেছি, তাই হচ্ছিল বটে! (স্বগত) মস্ত একটা কি ভুল হ'য়ে গেছে। না বুঝে একেবারে জড়িয়ে পড়েছি। কি করা যায়! (প্রকাশ্যে) কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিসের, আর-এক-দিন এ সব কথা খোলসা কোরে আলোচনা করা যাবে। কি বলেন?

শ্যামা। খোলসার আর কি বাকি রেখেচ বাবা! আর-এক-দিন এর চেয়ে আর কত খোলসা হবে। তাড়াতাড়ি ত তুমিই করছিলে! আস্‌চে রবিবারেই তুমি দিনস্থির করতে চেয়েছিলে!

আশু। তা চেয়েছিলেম বটে।

শ্যামা। তুমি দেখাশুনা করতে চাইলে বলেই আমি মেয়েকে তোমার সাক্ষাতে বের করলুম্; তার গানও শুনলে—এখন পানপত্রের কথা শুনেই যদি বেঁকে দাঁড়াও, তা হ'লে ত আমার আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না। তোমাকেই বা লোকে কি বলবে বাবা! ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার কি ভাল? আমার নিরু তোমার কাছে কি দোষ করেছিল যে (ক্রন্দন)—

নিরুপমার দ্রুত প্রবেশ।

নিরুপমা। মা, কি হয়েছে মা, অমন কোরে কাঁদ্‌চ কেন?

আশু। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আমাকে এঁরা সবাই কি মনে করবেন না জানি! (প্রকাশ্যে) কিছুই হয় নি, আমি সমস্তই ঠিক কোরে দিচ্চি। আপনারা কান্নাকাটি করবেন না। শুভকর্ম্মে ওতে অমঙ্গল হয়। (শ্যামার প্রতি) তা, আপনি একটা দিন-স্থির করে দিন্—আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

শ্যামা। তা বাবা যদি ভাল দিন হয়, তা হ'লে তুমি যা বলেছিলে, আস্‌চে রবি-বারেই হোয়ে যাক্। আমার আয়োজনে কাজ নেই। এই কটা দিন তোমার মত স্থির থাকলে বাঁচি।

আশু। অমন কথা বল্‌বেন না— আমার মতের কখ্‌নো নড়্‌চড়্‌ হয় না।

শ্যামা। আমার পা ছুঁয়ে ত তাই বলেওছিলে, কিন্তু দশমিনিট্‌ না যেতেই এক পানপত্রের কথা শুনেই তোমার মত বদ্‌লে গেল।

আশু। তা বটে। পানপত্রটা আমি আদবে পছন্দ করি না—

শ্যামা। কেন বল ত বাবা?

আশু। তা ঠিক বল্‌তে পার্‌চিনে— ওটা আমার কেমন—বোধ হয়, ওটা—কি জানেন, পানপত্রটা যেন—কে জানে ও কথাটাই কেমন—হঠাৎ শুন্‌লে কি যেন— তা এই বাড়ীটার নম্বর কি বলুন্‌ দেখি!

শ্যামা। ওঃ, তাই বুঝি ভাব্‌চ! আমরা তোমাকে ভাঁড়াচ্চি নে বাবা! আমরাই উনপঞ্চাশ নম্বরে ছিলুম, কাল এই বাইশ নম্বরে উঠে এসেচি। যদি মনে কোন সন্দেহ থাকে, উনপঞ্চাশ নম্বরে বরঞ্চ একবার খোঁজ কোরে আস্‌তে পার!

আশু। (স্বগত) উঃ, কি ভুলই করেছি! যা হোক্‌, এখন একটা পরিত্রাণের রাস্তা পাওয়া গেছে। অন্নদাকে এনে দিলেই সমস্ত গোল মিটে যাবে! যা হোক, অন্নদার অদৃষ্ট ভাল। একএকবার মনে হচ্চে, ভুলটা শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

শ্যামা। কি বাবা! এত ভাব্‌চ কেন? আমরা ভদ্রঘরের মেয়ে—তোমাকে ঠকাবার জন্যে পশ্চিম থেকে এখেনে আসিনি।

আশু। ও কথা বল্‌বেন না, আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এখন আমি যাচ্চি—একঘণ্টার মধ্যে ফিরে আস্‌ব— আজকের দিনের মধ্যেই একটা সন্তোষজনক বন্দোবস্ত কর্‌বই, এ আমি আপনার পা ছুঁয়ে শপথ কোরে যাচ্চি।

শ্যামা। বাবা, ও শপথে কাজ নেই— পা ছুঁয়ে আরো একবার শপথ করেছিলে—

আশু। আচ্ছা, আমি আমার ইষ্টদেবতার শপথ কোরে যাচ্চি, আজকের মধ্যেই সমস্ত পাকা কোরে তবে অন্য কথা।

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কথাবার্ত্তায় বেশ, কিন্তু ওকে কিছুই বোঝ্‌বার জো নেই! কখনো বা তাড়া দেয়, কখনো বা ঢিল দেয়, অথচ মুখ দেখে ওর প্রতি অবিশ্বাসও হয় না।

আশু। তবে অনুমতি করেন ত এখন আসি!

শ্যামা। তা এস বাবা। (প্রণাম করিয়া আশুর প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

অন্নদা।

অন্নদা। ব্যাপারখানা ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। ঘটকের কথা শুনে এলেম কন্যা দেখ্‌তে। যিনি দেখা দিলেন, তাঁকে ত বয়স দেখে কোনমতেই কন্যার মা বলে' বোধ হয় না—চেহারা দেখে বোধ হ'ল অপ্সরী—যদি চ অপ্সরীর চেহারা কিরকম, পূর্ব্বে কখনো দেখিনি। শেক্‌হ্যাণ্ড কর্‌তে যেম্‌নি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, অমনি ফস্‌ কোরে আমার হাতে কড়িবাঁধা এক-

গাছি লাল সুতো বেঁধে দিলে। আর কেউ হ'লে গোলমাল করতেম—কিন্তু যে সুন্দর চেহারা, গোলমাল কর্‌বার জো কি। কিন্তু এ সমস্ত কোন্-দেশী দস্তুর, তা ত বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।

মাতাজির প্রবেশ।

মাতাজি। (স্বগত) অনেক সন্ধান কোরে তবে পেয়েছি। আগে আমার গুরুদত্ত বশীকরণ-মন্ত্রটা খাটাই, তার পরে পরিচয় দেব। (অন্নদার কপালে নরকপাল ঠেকাইয়া) বল, হুর্‌লিং।

অন্নদা। হুর্‌লিং।

মাতাজি। (অন্নদার গলায় জবার মালা পরাইয়া) বল, কুড়বং কড়বং কৃড়াং!

অন্নদা। (স্বগত) ছি ছি ভারি হাস্যকর হ'য়ে উঠ্‌চে। একে আমার কোটের উপর জবার মালা, তার উপরে আবার এই অদ্ভুত-শব্দগুলো উচ্চারণ!

মাতাজি। চুপ কোরে রইলে যে!

অন্নদা। বল্‌চি। কি বল্‌ছিলেন বলুন!

মাতাজি। কুড়বং কড়বং কৃড়াং!

অন্নদা। কুড়বং কড়বং কৃড়াং! (স্বগত) রিডিক্লাস্!

মাতাজি। মাথাটা নীচু কর। কপালে সিঁদুর দিতে হবে!

অন্নদা। সিঁদুর! সিঁদুর কি এই বেশে আমাকে ঠিক মানাবে!

মাতাজি। তা জানিনে, কিন্তু ওটা দিতে হবে! (অন্নদার কপালে সিঁদুর লেপন)

অন্নদা। ইস্, সমস্ত কপালে যে একেবারে লেপে দিলেন!

মাতাজি। বল বজ্রযোগিন্যৈ নমঃ। (অন্নদার অনুরূপ আবৃত্তি) প্রণাম কর। (অন্নদাকর্ত্তৃক তথাকৃত) বল কুড়বে কড়বে নমঃ! প্রণাম কর! বল হুর্‌লিঙে ঘুর্‌লিঙে নমঃ! প্রণাম কর!

অন্নদা। (স্বগত) প্রহসনটা ক্রমেই জমে উঠ্‌চে!

মাতাজি। এইবার মাতা বজ্রযোগিনীর এই প্রসাদী বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধ!

অন্নদা। (স্বগত) এই শালুর টুক্‌রোটা মাথায় বাঁধ্‌তে হবে! ক্রমেই যে বাড়াবাড়ি হ'তে চল্ল! (প্রকাশ্যে) দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ আমি পাগ্‌ড়ি পর্‌তেও রাজি আছি—এমন কি, বাঙালিবাবুরা যে টুপি পরে, তাও পর্‌তে পারি—

মাতাজি। সে সমস্ত পরে হবে, আপাতত এইটে জড়িয়ে দিই!

অন্নদা। দিন্!

মাতাজি। এইবার এই পিঁড়িটাতে বসুন্!

অন্নদা। (স্বগত) মুস্কিলে ফেল্লে। আমি আবার ট্রাউজার্ পোরে এসেছি। যাই হোক্, কোনমতে বস্‌তেই হবে! (উপবেশন)

মাতাজি। চোখ্ বোজ। বল, খটকারিণী, হঠবারিণী, ঘটসারিণী, নটতারিণী ক্রং! প্রণাম কর। (অন্নদার তথাকরণ) কিছু দেখ্‌তে পাচ্চ?

অন্নদা। কিচ্ছু না।

মাতাজি। আচ্ছা, তা হ'লে পূব্‌মুখো হ'য়ে বস—ডান কানে হাত দাও। বল খটকারিণী, হঠবারিণী, ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। প্রণাম কর। এবার কিছু দেখ্‌তে পাচ্চ?

অন্নদা। কিছুই না।

মাতাজি। আচ্ছা তা হ'লে পিছন ফিরে বস! দুই কানে দুই হাত দাও! বল খটকারিণী হঠবারিণী ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। কিছু দেখ্‌তে পাচ্চ?

অন্নদা। কি দেখ্‌তে পাওয়া উচিত, আগে আমাকে বলুন্?

মাতাজি। একটা গর্দ্দভ দেখ্‌তে পাচ্চ ত?

অন্নদা। পাচ্চি বৈ কি! অত্যন্ত নিকটেই দেখ্‌তে পাচ্চি।

মাতাজি। তবে মন্ত্র ফলেচে। তার পিঠের উপরে—

অন্নদা। হাঁ হাঁ তার পিঠের উপরে একজনকে দেখ্‌তে পাচ্চি বৈ কি!

মাতাজি। গর্দ্দভের দুই কান দুই হাত চেপে ধরে'—

অন্নদা। ঠিক বলেচেন, কোসে চেপে ধরেচে—

মাতাজি। একটি সুন্দরী কন্যা—

অন্নদা। পরমা সুন্দরী—

মাতাজি। ঈশানকোণের দিকে চলেচেন—

অন্নদা। দিক্‌ভ্রম হোয়ে গেছে- কোন্ কোণে যাচ্চেন, তা ঠিক বল্‌তে পার্‌চিনে! কিন্তু ছুটিয়ে চলেচেন বটে! গাধাটার হাঁফ ধরে' গেল!

মাতাজি। ছুটিয়ে যাচ্চেন না কি? তবে ত আর একবার—

অন্নদা। না, না, ছুটিয়ে যাবেন কেন— কি-রকম যাওয়াটা আপনি স্থির করুচেন বলুন্ দেখি?

মাতাজি। একবার এগিয়ে যাচ্চেন, আবার পিছু হটে পিছিয়ে আস্‌চেন।

অন্নদা। ঠিক তাই! এগচ্চেন আর পিচচ্চেন! গাধাটার জিব বেরিয়ে পড়েচে।

মাতাজি। তা হ'লে ঠিক হয়েছে। এবার সময় হ'ল। ওলো মাতঙ্গিনী, তোরা সবাই আয়!

হুলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে স্ত্রীদলের প্রবেশ।

(অন্নদার বামে মাতাজির উপবেশন ও তাহার হস্তে হস্তস্থাপন)

অন্নদা। এটা বেশ লাগ্‌চে, কিন্তু ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চিনে!

রমণীগণের গান।

এবার সখি সোনার মৃগ
 দেয় বুঝি দেয় ধরা!
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা
 আয় সবে আয় ত্বরা!
ছুটেছিল পিয়াসভরে
মরীচিকা-বারির তরে,
ধরে' তারে কোমল করে
 কঠিন ফাঁসি পরা'!
দয়ামায়া করিস্‌নে গো,
 ওদের নয় সে ধারা!
দয়ার দোহাই মান্‌বে না গো
 একটু পেলেই ছাড়া!
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে
 বুদ্ধিবিচারহরা!

অন্নদা। বুদ্ধিবিচার একে বাহিরই যায় নি!

অতি সামান্যই বাকি আছে। তার থেকে মনে হচ্চে, ঐ যে যাকে জন্তু-জানোয়ার বলা হ'ল, সে সৌভাগ্যশালী আমি ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আর কেউ হতেই পারে না! গানটি ভাল, সুরটিও বেশ, কণ্ঠ-স্বরেরও নিন্দে করা যায় না—কিন্তু রূপক ভেঙে সাদাভাষায় একটু স্পষ্ট কোরে সবটা খুলে বলুন দেখি,—আমার সম্বন্ধে আপনারা কি করতে চান্! পালাব এমন আশঙ্কা করবেন না, আপনারা তাড়া দিলেও নয়। কিন্তু কোথায় এলুম, কেন এলুম, কোথায় যাব, এ সকল প্রশ্ন মানবমনে স্বভাবতই উদয় হ'য়ে থাকে।

মাতাজি। তোমার স্ত্রীকে কি মাঝে মাঝে স্মরণ কর?

অন্নদা। কোরে লাভ কি, কেবল সময় নষ্ট! তাঁকে স্মরণ কোরে যেটুকু সুখ, আপনাদের দর্শন কোরে তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ!

মাতাজি। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে স্মরণ কোরে সময় নষ্ট করেন?

অন্নদা। তা হ'লে তাঁর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, আর অধিক নষ্ট করা উচিত হয় না—হয় বিস্মরণ করতে আরম্ভ করুন, নয় দর্শন দিন্, সময়টা মূল্যবান্ জিনিষ!

মাতাজি। সেই উপদেশই শিরোধার্য্য। আমিই তোমার সেবিকা শ্রীমতী মহী-মোহিনী দেবী।

অন্নদা। বাঁচালে! মনে যে-রকম ভাবোদ্রেক করেছিলে, নিজের স্ত্রী না হ'লে গলায় দড়ি দিতে হ'ত। কিন্তু নিজের স্বামীর জন্যে এ সমস্ত ব্যাপার কেন?

মাতাজি। গুরুর কাছে যে বশীকরণ-মন্ত্র শিখেছিলেম, আগে সেইটে প্রয়োগ কোরে তবে আত্মপরিচয় দিলেম, এখন আর তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অন্নদা। আর কারো উপর এ মন্ত্রের পরীক্ষা করা হয়েছে?

মাতাজি। না, তোমার জন্যেই এত-দিন এ মন্ত্র ধারণ কোরে রেখেছিলেম। আজ এর আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষফল পেয়ে গুরুর চরণে মনে মনে শতবার প্রণাম করচি। অব্যর্থ মন্ত্র! মন্ত্রে তোমার কি বিশ্বাস হ'ল না?

অন্নদা। বশীকরণের কথা অস্বীকার করতে পারি নে। এখন তোমাকে একবার এই মন্ত্রগুলো পড়িয়ে নিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

(দাসীকর্ত্তৃক সম্মুখে আহার্য্যস্থাপন)

অন্নদা। এও বশীকরণের অঙ্গ। বন্য-মৃগই হোক্, আর সহুরে গাধাই হোক্, পোষ মানাবার পক্ষে এটা খুব দরকারী। (আহারে প্রবৃত্ত)

আশুর দ্রুত প্রবেশ। মাতাজি প্রভৃতির প্রস্থান।

আশু। ওহে অন্নদা, ভারি গোলমাল বেধে গেছে। বাঃ, তুমি যে দিব্যি আহার করতে বসেছ! তোমার এ কি রকমের সাজ! (উচ্চহাস্য) ব্যাপারখানা কি! নরমুণ্ড, খাঁড়া, বাতি, জবার মালা? তোমার বলিদান হবে না কি?

অন্নদা। হোয়ে গেছে।

আশু। হোয়ে গেছে কি রকম?

অন্নদা। সে সকল ব্যাখ্যা পরে কর্‌ব। তোমার খবরটা আগে বল।

আশু। তুমি বিবাহের জন্যে যে কন্যাটিকে দেখ্‌বে বোলে স্থির করেছিলে, তাঁরা হঠাৎ উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে উঠে গেছেন। আমি কন্যার বিধবা মাকে মাতাজি মনে কোরে বরাবর এমন নির্ব্বোধের মত কথাবার্ত্তা কয়ে গেছি যে, তাঁরা ঠিক কোরে নিয়েছেন—আমি মেয়েটিকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছি। এখন তুমি না গেলে ত আর উদ্ধার নেই!

অন্নদা। মেয়েটি দেখ্‌তে কেমন?

আশু। দেবকন্যার মত।

অন্নদা। তা হোক্, বহুবিবাহ আমার মতবিরুদ্ধ।

আশু। বল কি? সেদিন এত তর্ক কর্‌লে—

অন্নদা। সেদিনকার চেয়ে ঢের ভাল যুক্তি আজ পাওয়া গেছে—

আশু। একেবারে অখণ্ডনীয়?

অন্নদা। অখণ্ডনীয়।

আশু! যুক্তিটা কি-রকম দেখা যাক্!

অন্নদা।. তবে একটু বোস। (প্রস্থান ও মাতাজিকে লইয়া প্রবেশ) ইনি আমার স্ত্রী শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

আশু। অ্যাঁ! ইনি তোমার—আপনি আমাদের অন্নদার—কি আশ্চর্য্য! তা হ'লে ত হ'তে পারে না!

অন্নদা। হ'তে পারে না কি বল্‌চ! হয়েছে, আবার হ'তে পারে না কি! এক-বার হয়েছে, এই আবার দু'বার হ'ল, তুমি বল্‌চ হ'তে পারে না।

আশু। না আমি তা বল্‌চিনে। আমি বল্‌চি, সেই বাইশ নম্বরের কি করা যায়!

অন্নদা। সে আর শক্ত কি! সহজ উপায় আছে।

আশু। কি বল দেখি!

অন্নদা। বিয়ে কোরে ফেল।

আশু। সমস্ত বিসর্জ্জন দেব—আমার হঠযোগ, প্রাণায়াম, মন্ত্রসাধন—

অন্নদা। ভয় কি, তুমি যেগুলো ছাড়্‌বে, আমি সেগুলো গ্রহণ কর্‌ব। সে যাই হোক্, তোমার বশীকরণটা কি-রকম হ'ল?

আশু। তা নিতান্ত কম হয় নি! তোমার এই একটা ঠাট্টা কর্‌বার বিষয় হ'ল!

অন্নদা। আর ঠাট্টা চল্‌বে না।

আশু। কেন বল দেখি?

অন্নদা। আমারও বশীকরণ হোয়ে গেছে।

আশু। চল্লেম। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। কথাটা পাকা কোরে আসি গে!

——:O:——

পৌষ। নবম সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

—:o:—

সূচী।

৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিনযন্ত্রে

শ্রীরাখাল চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

বঙ্গদর্শন।

চোখের বালি।

(২৬)

একদিকে চন্দ্র অস্ত যায়, আর একদিকে সূর্য্য উঠে। আশা চলিয়া গেল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাগ্যে এখনো বিনোদিনীর দেখা নাই। মহেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছুতা করিয়া সময়ে অসময়ে তাহার মার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিনোদিনী কেবলি ফাঁকি দিয়া পালায়, ধরা দেয় না।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের এইরূপ অত্যন্ত শূন্যভাব দেখিয়া ভাবিলেন, 'বৌ গিয়াছে, তাই এ বাড়ীতে মহিনের কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না।' আজকাল মহেন্দ্রের সুখ-দুঃখের পক্ষে মা যে বৌয়ের তুলনায় একান্ত অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাঁহাকে বিঁধিল—তবু মহেন্দ্রের এই লক্ষ্মীছাড়া বিমর্ষভাব দেখিয়া তিনি বেদনা পাইলেন। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার পর হইতে আমার হাঁপানির মত হইয়াছে;—আমি ত আজকাল সিঁড়ি ভাঙিয়া ঘনঘন উপরে যাইতে পারি না। তোমাকে বাছা, নিজে থাকিয়া মহিনের খাওয়াদাওয়া সমস্তই দেখিতে হইবে। বরাবরকার অভ্যাস, একজন কেহ যত্ন না করিলে মহিন্ থাকিতে পারে না। দেখ না, বৌ যাওয়ার পর হইতে ও কেমন-একরকম হইয়া গেছে! বৌকেও ধন্য বলি! কেমন করিয়া গেল!"

বিনোদিনী একটুখানি মুখ বাঁকাইয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কি বৌ, কি ভাবিতেছ? ইহাতে ভাবিবার কথা কিছু নাই। যে যাহা বলে বলুক, তুমি আমাদের পর নও!"

বিনোদিনী কহিল—"কাজ নাই মা!"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে কাজ নাই। দেখি, আমি নিজে যা পারি, তাই করিব।"

বলিয়া তখনি তিনি মহেন্দ্রের তেতালার ঘর ঠিক করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তোমার অসুখ শরীর, তুমি যাইয়ো না, আমি যাইতেছি। আমাকে মাপ কর পিসিমা, তুমি যেমন আদেশ করিবে, আমি তাহাই করিব।"

রাজলক্ষ্মী লোকের কথা একেবারেই তুচ্ছ করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে

সংসারে এবং সমাজে তিনি মহেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। মহেন্দ্রসম্বন্ধে বিনোদিনী সমাজনিন্দার আভাস দেওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। আজন্মকাল তিনি মহিনকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহার মত এমন ভাল ছেলে আছে কোথায়! সেই মহিনের সম্বন্ধেও নিন্দা! যদি কেহ করে, তবে তাহার জিহ্বা খসিয়া যাক্! তাঁহার নিজের কাছে যেটা ভাল লাগে ও ভাল বোধ হয়, সে সম্বন্ধে বিশ্বের লোককে উপেক্ষা করিবার জন্য রাজলক্ষ্মীর একটা স্বাভাবিক জেদ ছিল।

আজ মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার শয়নঘর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। দ্বার খুলিয়াই দেখিল, চন্দনগুঁড়া ও ধুনার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া আছে। মশারিতে গোলাপী রেশমের ঝালর লাগানো। নীচের বিছানায় শুভ্র জাজিম তক্‌তক্ করিতেছে এবং তাহার উপরে পূর্ব্বেকার পুরাতন তাকিয়ার পরিবর্ত্তে রেশম ও পশমের ফুলকাটা বিলাতী চৌকা বালিশ সুসজ্জিত। তাহার কারুকার্য্য বিনোদিনীর বহুদিনের পরিশ্রমজাত। আশা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "এগুলি তুই কার্ জন্যে তৈরি করিতেছিস্ ভাই?"—বিনোদিনী হাসিয়া বলিত, "আমার চিতাশয্যার জন্য। মরণ ছাড়া ত সোহাগের লোক আমার আর কেহই নাই!"

দেয়ালে মহেন্দ্রের যে বাঁধানো ফোটোগ্রাফখানি ছিল, তাহার ফ্রেমের চার কোণে রঙীন্ ফিতার দ্বারা সুনিপুণভাবে চারিটি গ্রন্থি বাঁধা,—এবং সেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুই ধারে দুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া,—যেন মহেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি কোন অজ্ঞাত ভক্তের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। সবসুদ্ধ সমস্ত ঘরের চেহারা অন্যরকম। খাট যেখানে ছিল, সেখান হইতে একটুখানি সরানো। ঘরটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে; খাটের সম্মুখে দুটি বড় আলনায় কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া আড়ালের মত প্রস্তুত হওয়ায় নীচে বসিবার বিছানা ও রাত্রে শুইবার খাট স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। যে আলমারীতে আশার সমস্ত সখের জিনিষ, চীনের খেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল, সেই আলমারীর কাচের দরজায় ভিতরের গায়ে লাল সালু কুঞ্চিত করিয়া মারিয়া দেওয়া হইয়াছে,—এখন আর তাহার ভিতরের কোন জিনিষ দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে তাহার পূর্ব্ব ইতিহাসের যে কিছু চিহ্ন ছিল, তাহা নূতন হস্তের নব সজ্জায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

পরিশ্রান্ত মহেন্দ্র মেঝের উপরকার শুভ্র বিছানায় শুইয়া নূতন বালিশগুলির উপর মাথা রাখিবামাত্র একটি মৃদু সুগন্ধ অনুভব করিলেন—বালিশের ভিতরকার তুলার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নাগকেশর ফুলের রেণু ও কিছু আতর মিশ্রিত ছিল।

মহেন্দ্রের চোখ বুজিয়া আসিল, মনে হইতে লাগিল, এই বালিশের উপর যাহার নিপুণ হস্তের শিল্প, তাহারি কোমল চম্পক-অঙ্গুলির যেন গন্ধ পাওয়া যাইতেছে!

এমন সময় দাসী রূপার রেকাবিতে ফল ও মিষ্ট, এবং কাচের গ্লাসে বরফ-দেওয়া আনারসের সর্‌বৎ আনিয়া দিল। এ সমস্ত

পূর্ব্বপ্রথা হইতে কিছু বিভিন্ন এবং বহু যত্ন ও পারিপাট্যের সহিত রচিত। সমস্ত স্বাদে, গন্ধে, দৃশ্যে, নূতনত্ব আসিয়া মহেন্দ্রের ইন্দ্রিয়সকল আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন সমাধা হইলে, রূপার বাটায় পান ও মসলা লইয়া বিনোদিনী ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। হাসিতে হাসিতে কহিল—"এ কয়দিন তোমার খাবার সময় হাজির হইতে পারি নাই, মাপ করিয়ো ঠাকুরপো! আর যাই কর, আমার মাথার দিব্য রহিল, তোমার অযত্ন হইতেছে, এ খবরটা আমার চোখের বালিকে দিয়ো না। আমার যথাসাধ্য আমি করিতেছি—কিন্তু কি করিব ভাই, সংসারের সমস্ত কাজই আমার ঘাড়ে!"

এই বলিয়া বিনোদিনী পানের বাটা মহেন্দ্রের সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিল। আজিকার পানের মধ্যেও কেয়া-খয়েরের একটু বিশেষ নূতন গন্ধ পাওয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল—"যত্নের মাঝে মাঝে এমন এক একটা ত্রুটি থাকাই ভাল!"

বিনোদিনী কহিল—"ভাল কেন, শুনি!"

মহেন্দ্র উত্তর করিল, "তার পরে খোঁটা দিয়া সুদসুদ্ধ আদায় করা যায়।"

"মহাজন মশায়, সুদ কত জমিল?"

মহেন্দ্র কহিল—"খাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন খাবার পরে হাজ্‌রি পোষাইয়া আরো পাওনা বাকি থাকিবে।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "তোমার হিসাব যে রকম কড়াক্কড়, তোমার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্ধার নাই দেখিতেছি!"

মহেন্দ্র কহিল—"হিসাবে যাই থাক্, আদায় কি করিতে পারিলাম!"

বিনোদিনী কহিল—"আদায় করিবার মত আছে কি! তবু ত বন্দী করিয়া রাখিয়াছ!"—বলিয়া ঠাট্টাকে হঠাৎ গাম্ভীর্য্যে পরিণত করিয়া ঈষৎ একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্রও একটু গম্ভীর হইয়া কহিল—"ভাই বালি, এটা কি তবে জেলখানা?"

এমন সময় বেহারা নিয়মমত আলো আনিয়া টিপাইয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

হঠাৎ চোখে আলো লাগাতে মুখের সাম্‌নে একটু হাতের আড়াল করিয়া নতনেত্রে বিনোদিনী বলিল—"কি জানি ভাই! তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে! এখন যাই, কাজ আছে!"

মহেন্দ্র হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বন্ধন যখন স্বীকার করিয়াছ, তখন যাইবে কোথায়?"

বিনোদিনী কহিল—"ছি, ছি ছাড়! যাহার পালাইবার রাস্তা নাই, তাহাকে আবার বাঁধিবার চেষ্টা কেন?"

বিনোদিনী জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্র সেই বিছানায় সুগন্ধ বালিশের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, নির্জ্জন ঘর, নব বসন্তের বাতাস দিতেছে, বিনোদিনীর মন যেন ধরা দিল দিল,—উন্মাদ মহেন্দ্র আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, এমনি বোধ

হইল। তাড়াতাড়ি আলো নিবাইয়া ঘরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিল, তাহার উপরে শাসি আঁটিয়া দিল—এবং সময় না হইতেই বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল।

এও ত সে পুরাতন বিছানা নহে! চারপাঁচখানা তোষকে শয্যাতল পূর্ব্বের চেয়ে অনেক নরম। আবার একটি গন্ধ—সে অগুরুর, কি খস্‌খসের, কি কিসের ঠিক বুঝা গেল না! মহেন্দ্র অনেকবার এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল—কোথাও যেন পুরাতনের একটা কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাইয়া তাহা আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা। কিন্তু কিছুই হাতে ঠেকিল না।

রাত্রি নটার সময় রুদ্ধ দ্বারে ঘা পড়িল। বিনোদিনী বাহির হইতে কহিল—"ঠাকুর-পো, তোমার খাবার [illegible] আসিয়াছে, দুয়ার খোল!"

তখনি দ্বার মশারিতে [illegible] খুলিবার জন্য মহেন্দ্র ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া শাসির অর্গলে হাত লাগাইল। কিন্তু খুলিল না—মেজের উপর উপুড় হইয়া লুটাইয়া কহিল—"না, না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না!"

বাহির হইতে উদ্বিগ্নকণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল—"অসুখ করেনি ত? জল আনিয়া দিব? কিছু চাই কি?"

মহেন্দ্র কহিল—"আমার কিছুই চাই না—কোন প্রয়োজন নাই!"

বিনোদিনী কহিল—"মাথা খাও, আমার কাছে ভাঁড়াইয়ো না! আচ্ছা অসুখ না থাকে ত একবার দরজা খোল।"

মহেন্দ্র সবেগে বলিয়া উঠিল—"না খুলিব না, কিছুতেই না! তুমি যাও!"

বলিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুনর্ব্বার বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়ি[ল] এবং অন্তর্হিতা আশার স্মৃতিকে শূন্যশয্যা ও চঞ্চল হৃদয়ের মধ্যে অন্ধকারে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘুম যখন কিছুতেই আসিতে চায় না, তখন মহেন্দ্র বাতি জ্বালাইয়া দোয়াত-কলম লইয়া আশাকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল,—"আশা, আর অধিকদিন আমাকে একা ফেলিয়া রাখিয়ো না! আমার জীবনের লক্ষ্মী তুমি,—তুমি না থাকিলেই আমার সমস্ত প্রবৃত্তি শিকল ছিঁড়িয়া আমাকে কোন্ দিকে টানিয়া লইতে চায়, বুঝিতে পারি না! পথ দেখিয়া চলিব, তাহার আলো [illegible]—সে আলো তোমার বিশ্বাসপূর্ণ দুটি চোখের প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে! তুমি শীঘ্র এস, আমার শুভ, আমার ধ্রুব, আমার এক! আমাকে স্থির কর, রক্ষা কর, আমার হৃদয় পরিপূর্ণ কর! তোমার প্রতি লেশমাত্র অন্যায়ের মহাপাপ হইতে, তোমাকে মুহূর্ত্তকাল বিস্মরণের বিভীষিকা হইতে, আমাকে উদ্ধার কর!"

এমনি করিয়া মহেন্দ্র নিজেকে আশার অভিমুখে সবেগে তাড়না করিবার জন্য অনেক রাত ধরিয়া অনেক কথা লিখিল। দূর হইতে সুদূরে অনেকগুলি গির্জ্জার ঘড়িতে ঢংঢং করিয়া তিনটা বাজিল। কলিকাতার পথে গাড়ির শব্দ আর প্রায় নাই, পাড়ার পরপ্রান্তে কোন দোতলা হইতে নটীকণ্ঠে বেহাগ-রাগিণীর যে গান উঠিতেছিল, সেও বিশ্বব্যাপিনী শান্তি ও নিদ্রার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছে। মহেন্দ্র

একান্তমনে আশাকে স্মরণ করিয়া, এবং মনের উদ্বেগ দীর্ঘপত্রে নানারূপে ব্যক্ত করিয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইল এবং বিছানায় শুইবামাত্র ঘুম আসিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সকালে মহেন্দ্র যখন জাগিয়া উঠিল, তখন বেলা হইয়াছে, ঘরের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; নিদ্রার পর গতরাত্রির সমস্ত ব্যাপার মনের মধ্যে হাল্কা হইয়া আসিয়াছে। বিছানার বাহিরে আসিয়া মহেন্দ্র দেখিল—গতরাত্রে আশাকে সে যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা টিপাইয়ের উপর দোয়াত দিয়া চাপা রহিয়াছে। সেখানি পুনর্ব্বার পড়িয়া মহেন্দ্র ভাবিল—"করেছি কি! এ যে নভেলি ব্যাপার! ভাগ্যে পাঠাই নাই! আশা পড়িলে কি মনে করিত? সে ত এর অর্দ্ধেক কথা বুঝিতেই পারিত না! রাত্রে ক্ষণিক কারণে হৃদয়াবেগ যে অসঙ্গত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে মহেন্দ্র লজ্জা পাইল; চিঠিখানা টুক্‌রা টুক্‌রা ছিঁড়িয়া ফেলিল; সহজ ভাষায় আশাকে একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিল;—"তুমি আর কত দেরি করিবে? তোমার জ্যাঠামশায়দের যদি শীঘ্র ফিরিবার কথা না থাকে, তবে আমাকে লিখিয়ো, আমি নিজে গিয়া তোমাকে লইয়া আসিব। এখানে একলা আমার ভাল লাগিতেছে না!"

(২৭)

মহেন্দ্র চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আশা যখন কাশীতে আসিল, তখন অন্নপূর্ণার মনে বড়ই আশঙ্কা জন্মিল। আশাকে তিনি নানা প্রকারে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "হাঁরে চুনি, তুই যে তোর সেই চোখের বালির কথা বলিতেছিলি, তোর মতে তার মতন এমন গুণবতী মেয়ে আর জগতে নাই!"

"সত্যই মাসী আমি বাড়াইয়া বলিতেছি না। তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি রূপ, কাজকর্ম্মে তার তেমনি হাত!"

"তোর সখী, তুই ত তাহাকে সর্ব্বগুণবতী দেখিবি, বাড়ীর আর সকলে তাহাকে কে কি বলে শুনি।"

"মার মুখে ত তার প্রশংসা ধরে না! চোখের বালি দেশে যাইবার কথা বলিলেই তিনি অস্থির হইয়া ওঠেন। এমন সেবা করিতে কেহ জানে না। বাড়ীর চাকরদাসীরও যদি কারো ব্যামো হয়, তাকে বোনের মত—মার মত যত্ন করে!"

"মহেন্দ্রর মত কি?"

"তাঁকে ত জানই মাসী, নিতান্ত ঘরের লোক ছাড়া আর কাউকে তাঁর পছন্দই হয় না। আমার বালিকে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তার আজ পর্য্যন্ত ভাল বনে নাই!"

"কি রকম?"

"আমি যদি বা অনেক ক'রিয়া দেখাসাক্ষাৎ করাইয়া দিলাম, তার সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তাই প্রায় বন্ধ। তুমি ত জান, তিনি কি-রকম কুণো,—লোকে মনে করে, তিনি অহঙ্কারী, কিন্তু তা নয় মাসী, তিনি দুটি একটি লোক ছাড়া কাহাকেও সহ্য করিতে পারেন না।"

শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ

আশার লজ্জাবোধ হইল, গাল দুটি লাল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা খুসি হইয়া মনে মনে হাসিলেন—কহিলেন, "তাই বটে, সে-দিন মহীন্ যখন আসিয়াছিল, তোর বালির কথা একবার মুখেও আনে নাই!"

আশা দুঃখিত হইয়া কহিল, "ঐ তাঁর দোষ! যাকে ভালবাসেন না, সে যেন একেবারে নাই! তাকে যেন একদিনো দেখেন নাই—জানেন নাই, এমনি তাঁর ভাব।"

অন্নপূর্ণা শান্ত-স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, "আবার যাকে ভালবাসেন, মহীন যেন জন্ম-জন্মান্তর কেবল তাকেই দেখেন এবং জানেন, এ ভাবও তাঁর আছে। কি বলিস্ চুনি!"

আশা তাহার কোন উত্তর না করিয়া চোখ নীচু করিয়া হাসিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুনি, বিহারীর কি খবর বল্ দেখি? সে কি বিবাহ করিবে না?"

মুহূর্ত্তের মধ্যেই আশার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল,—সে কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না।

আশার নিরুত্তর ভাবে অত্যন্ত ভয় পাইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বল্ চুনি, বিহারীর অসুখ-বিসুখ কিছু হয় নি ত?"

বিহারী এই চিরপুত্রহীনা রমণীর স্নেহ-সিংহাসনে পুত্রের মানস-আদর্শরূপে বিরাজ করিত। বিহারীকে তিনি সংসারে প্রতি-ষ্ঠিত দেখিয়া আসিতে পারেন নাই, এ দুঃখ প্রবাসে আসিয়া প্রতিদিন তাঁহার মনে জাগিত। তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের আর সমস্তই একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল বিহারীর সেই গৃহহীন অবস্থা স্মরণ করিয়াই তাঁহার পরিপূর্ণ বৈরাগ্যচর্চ্চার ব্যাঘাত ঘটে!

আশা কহিল, "মাসী, বিহারি-ঠাকুরপোর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না!"

অন্নপূর্ণা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কেন বল্ দেখি!"

আশা কহিল, "সে আমি বলিতে পারিব না।"—বলিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।—"অমন সোনার ছেলে বেহারী, এরি মধ্যে তাহার কি এতই বদল হইয়াছে যে, চুনি আজ তাহার নাম শুনিয়া উঠিয়া যায়! অদৃষ্টেরই খেলা! কেন তাহার সহিত চুনীর বিবাহের কথা হইল, কেনই বা মহেন্দ্র তাহার হাতের কাছ হইতে চুনীকে কাড়িয়া লইল!"

অনেকদিন পরে আজ আবার অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া জল পড়িল;—মনে মনে তিনি কহিলেন, "আহা, আমার বেহারী যদি এমন কিছু করিয়া থাকে, যাহা আমার বেহারীর যোগ্য নহে, তবে সে তাহা অনেক দুঃখ পাইয়াই করিয়াছে, সহজে করে নাই!" বিহারীর সেই দুঃখের পরিমাণ কল্পনা করিয়া অন্নপূর্ণার বক্ষ ব্যথিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় যখন অন্নপূর্ণা আহ্নিকে বসিয়াছেন, তখন একটা গাড়ি আসিয়া দরজায় থামিল, এবং সহিস বাড়ীর লোককে ডাকিয়া রুদ্ধদ্বারে ঘা মারিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা পূজাগৃহ হইতে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যা, আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আজ কুঞ্জর শাশুড়ির এবং তার দুই বোন-

ঝির এলাহাবাদ হইতে আসিবার কথা ছিল। ঐ বুঝি তাহারা আসিল। চুনি, তুই একবার আলোটা লইয়া দরজা খুলিয়া দে!"

আশা লণ্ঠনহাতে দরজা খুলিয়া দিতেই দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া। বিহারী বলিয়া উঠিল, "এ কি বোঠা'ণ, তবে যে শুনিলাম, তুমি কাশী আসিবে না?"

আশার হাত হইতে লণ্ঠন পড়িয়া গেল! সে যেন প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়া এক নিশ্বাসে দোতলায় ছুটিয়া গিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"মাসীমা, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, উঁহাকে এখনি যাইতে বল!"

অন্নপূর্ণা পূজার আসন হইতে চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কাহাকে চুনি, কাহাকে?"

আশা কহিল—"বিহারি-ঠাকুরপো এখানেও আসিয়াছেন!"—বলিয়া সে পাশের ঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিল।

বিহারী নীচে হইতে সকল কথাই শুনিতে পাইল। সে তখনি ছুটিয়া যাইতে উদ্যত—কিন্তু অন্নপূর্ণা পূজাহ্নিক ফেলিয়া যখন নাবিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন—বিহারী দ্বারের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে,—তাহার শরীর হইতে সমস্ত শক্তি চলিয়া গেছে।

অন্নপূর্ণা আলো আনেন নাই। অন্ধকারে তিনি বিহারীর মুখের ভাব দেখিতে পাইলেন না, বিহারীও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

অন্নপূর্ণা কহিলেন—"বিহারি!"

হায়, সেই চিরদিনের স্নেহসুধাসিক্ত কণ্ঠস্বর কোথায়! এ কণ্ঠের মধ্যে যে কঠিন বিচারের বজ্রধ্বনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে! জননী অন্নপূর্ণা, সংহারখড়্গ তুলিলে কার 'পরে! ভাগ্যহীন বিহারী যে আজ অন্ধকারে তোমার মঙ্গল চরণাশ্রয়ে মাথা রাখিতে আসিয়াছিল!

বিহারীর অবশ শরীর আপাদমস্তক বিদ্যুতের আঘাতে চকিত হইয়া উঠিল—কহিল, "কাকীমা, আর নয়, আর একটি কথাও বলিয়ো না! আমি চলিলাম।"

বলিয়া বিহারী ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, অন্নপূর্ণার পা-ও স্পর্শ করিল না। জননী যেমন গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করে, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া বিহারীকে সেই রাত্রের অন্ধকারে নীরবে বিসর্জ্জন করিলেন, একবার ফিরিয়া ডাকিলেন না। গাড়ি বিহারীকে লইয়া দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই রাত্রেই আশা মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিল, "বিহারি-ঠাকুরপো হঠাৎ আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছিলেন। জ্যাঠামশায়রা কবে কলিকাতায় ফিরিবেন, ঠিক নাই—তুমি শীঘ্র আসিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও!"

(২৮)

সেদিন রাত্রিজাগরণ ও প্রবল আবেগের পরে সকাল বেলায় মহেন্দ্রের শরীর-মনে একটা অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন ফাল্গুনের মাঝামাঝি,—গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মহেন্দ্র অন্যদিন সকালে তাঁহার শয়নগৃহের কোণে টেবিলে বই লইয়া বসিতেন। আজ নীচের বিছানায় তাকিয়ায় হেলান দিয়া পড়িলেন। বেলা

হইয়া যায়, স্নানে গেলেন না। রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে। পথে আপিসের গাড়ির শব্দের বিরাম নাই। প্রতিবেশীর নূতন বাড়ী তৈরি হইতেছে, মিস্ত্রিকন্যারা তাহারই ছাত পিটাইবার তালে তালে সমস্বরে একঘেয়ে গান ধরিল। ঈষৎ-তপ্ত দক্ষিণের হাওয়ায় মহেন্দ্রের পীড়িত স্নায়ুজাল শিথিল হইয়া আসিয়াছে;—কোন কঠিন পণ, দুরূহ চেষ্টা, মানস সংগ্রাম আজিকার এই হাল-ছাড়া গা-ঢালা বসন্তের দিনের উপযুক্ত নহে!

"ঠাকুরপো, তোমার আজ হলো কি? স্নান করিবে না? এদিকে খাবার যে প্রস্তুত! ও কি ভাই, শুইয়া যে? অসুখ করিয়াছে? মাথা ধরিয়াছে?"—বলিয়া বিনোদিনী কাছে আসিয়া মহেন্দ্রের কপালে হাত দিল।

মহেন্দ্র অর্দ্ধেক চোখ বুজিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "আজ শরীরটা তেমন ভাল নাই—আজ আর স্নান করিব না!"

বিনোদিনী কহিল, "স্নান না কর ত দুটিখানি খাইয়া লও!"—বলিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া সে মহেন্দ্রকে ভোজনস্থানে লইয়া গেল, এবং উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত অনুরোধ করিয়া আহার করাইল।

আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় নীচের বিছানায় আসিয়া শুইলে, বিনোদিনী শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। মহেন্দ্র নিমীলিত-চক্ষে বলিল, "ভাই বালি, এখনো ত তোমার খাওয়া হয় নাই, তুমি খাইতে যাও!"—

বিনোদিনী কিছুতেই গেল না। অলস মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কম্পমান নারিকেলগাছের অর্থহীন মর্ম্মর-শব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড ক্রমশই দ্রুততর তালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘননিশ্বাস সেই তালে মহেন্দ্রের কপালের চুলগুলি কাঁপাইতে থাকিল। কাহারও কণ্ঠ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। মহেন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"অসীম বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছি, তরণী ক্ষণকালের জন্য কখন্ কোথায় ঠেকে, তাহাতে কাহার কি আসে যায় এবং কতদিনের জন্যই বা যায় আসে!—"

শিয়রের কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিহ্বল যৌবনের গুরুভারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মাথা নত হইয়া আসিতেছিল; অবশেষে তাহার কেশাগ্রভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিল। বাতাসে আন্দোলিত সেই কেশগুচ্ছের কম্পিত মৃদুস্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ যেন নিশ্বাস তাহার বুকের কাছে অবরুদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ পাইল না। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া মহেন্দ্র কহিল—"নাঃ আমার কালেজ আছে, আমি যাই!"—বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে না চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

বিনোদিনী কহিল—"ব্যস্ত হইয়ো না। আমি তোমার কাপড় আনিয়া দিই!"—বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজের কাপড় বাহির করিয়া আনিল।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কালেজে চলিয়া গেল, কিন্তু সেখানে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। পড়াশুনায় মন দিতে অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিয়া সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখে, বিনোদিনী বুকের তলায় বালিশ টানিয়া লইয়া নীচের বিছানায় উপুড় হইয়া কি-একটা বই পড়িতেছে—রাশীকৃত কালো চুল পিঠের উপর ছড়ানো। বোধ করি বা সে মহেন্দ্রের জুতার শব্দ শুনিতে পায় নাই। মহেন্দ্র আস্তে আস্তে পা টিপিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল, পড়িতে পড়িতে বিনোদিনী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্র কহিল, "ওগো করুণাময়ি, কাল্পনিক লোকের জন্য হৃদয়ের বাজে খরচ করিয়ো না! কি পড়া হইতেছে?"

বিনোদিনী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র কাড়িয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হাতাহাতি-কাড়াকাড়ির পর পরাভূত বিনোদিনীর অঞ্চল হইতে মহেন্দ্র বইখানি ছিনাইয়া লইয়া দেখিল—বিষবৃক্ষ। বিনোদিনী ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের বক্ষস্থল তোলপাড় করিতেছিল। অনেক চেষ্টায় সে হাসিয়া কহিল— "ছি ছি বড় ফাঁকি দিলে! আমি ভাবিয়াছিলাম, খুব একটা গোপনীয় কিছু হইবে বা! এত কাড়াকাড়ি করিয়া শেষকালে কি না বিষবৃক্ষ বাহির হইয়া পড়িল!"

বিনোদিনী কহিল, "আমার আবার গোপনীয় কি থাকিতে পারে শুনি!"

মহেন্দ্র ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল— "এই মনে কর যদি বিহারীর কাছ হইতে কোন চিঠি আসিত?"

নিমেষের মধ্যে বিনোদিনীর চোখে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। এতক্ষণ ফুলশর ঘরের কোণে খেলা করিতেছিল, সে যেন দ্বিতীয়বার ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তে-প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "মাপ কর, আমার পরিহাস মাপ কর!"

বিনোদিনী সবেগে হাত ছিনাইয়া লইয়া কহিল—"পরিহাস করিতেছ কাহাকে! যদি তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার যোগ্য হইতে, তবে তাঁহাকে পরিহাস করিলে সহ্য করিতাম! তোমার ছোট মন, বন্ধুত্ব করিবার শক্তি নাই, অথচ ঠাট্টা!"

বিনোদিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইবামাত্র মহেন্দ্র দুই হাতে তাহার পা বেষ্টন করিয়া বাধা দিল।

এমন সময় সম্মুখে এক ছায়া পড়িল, মহেন্দ্র বিনোদিনীর পা ছাড়িয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বিহারী।

বিহারী স্থির দৃষ্টিপাতে উভয়কে দগ্ধ করিয়া শান্ত ধীরস্বরে কহিল—"অত্যন্ত অসময়ে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিব না। একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। আমি কাশী গিয়াছিলাম, জানিতাম না, সেখানে বৌঠাকরুণ আছেন। না জানিয়া তাঁহার কাছে অপরাধী হইয়াছি; তাঁহার

কাছে ক্ষমা চাহিবার অবসর নাই, তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমার মনে জ্ঞানে-অজ্ঞানে যদি কখনো কোন পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে, সে জন্যে তাঁহাকে যেন কখনো কোন দুঃখ সহ্যকরিতে না হয়, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা!"

বিহারীর কাছে দুর্ব্বলতা হঠাৎ প্রকাশ পাইল বলিয়া মহেন্দ্রের মনটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। এখন তাহার ঔদার্য্যের সময় নহে। সে একটু হাসিয়া কহিল—"ঠাকুর-ঘরে কলা খাইবার যে গল্প আছে, তোমার ঠিক তাই দেখিতেছি! তোমাকে দোষ স্বীকার করিতেও বলি নাই, অস্বীকার করিতেও বলি নাই, তবে ক্ষমা চাহিয়া সাধু হইতে আসিয়াছ কেন?"

বিহারী কাঠের পুতুলের মত কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার পরে যখন কথা বলিবার প্রবল চেষ্টায় তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, তখন বিনোদিনী বলিয়া উঠিল—"বিহারি-ঠাকুরপো, তুমি কোন উত্তর দিয়ো না! কিছুই বলিয়ো না! ঐ লোকটি যাহা মুখে আনিল, তাহাতে উহারি মুখে কলঙ্ক লাগিয়া রহিল, সে কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করে নাই!"

বিনোদিনীর কথা বিহারীর কানে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ—সে যেন স্বপ্ন-চালিতের মত মহেন্দ্রের ঘরের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদিনী তাহার পশ্চাতে গিয়া কহিল, "বিহারি-ঠাকুরপো, আমাকে কি তোমার কোন কথা বলিবার নাই? যদি তিরস্কারের কিছু থাকে, তবে তিরস্কার কর!"

বিহারী যখন কোন উত্তর না করিয়া চলিতে লাগিল, বিনোদিনী সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে তাহার দক্ষিণ হাত চাপিয়া ধরিল। বিহারী অপরিসীম ঘৃণার সহিত তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই আঘাতে বিনোদিনী যে পড়িয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পতনশব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিল। দেখিল, বিনোদিনীর বাম হাতের কনুইয়ের কাছে কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

মহেন্দ্র কহিল, "ইস্, এ যে অনেকটা কাটিয়াছে।"—বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের পাতলা জামার খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিতে প্রস্তুত হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া কহিল—"না, না, কিছুই করিয়ো না, রক্ত পড়িতে দাও!"

মহেন্দ্র কহিল—"বাঁধিয়া একটা ঔষধ দিতেছি, তা হইলে আর ব্যথা হইবে না, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।"

বিনোদিনী সরিয়া গিয়া কহিল—"আমি ব্যথা সারাইতে চাই না, এ কাটা আমার থাক্!"

মহেন্দ্র কহিল—"আজ অধীর হইয়া তোমাকে আমি লোকের সাম্‌নে অপদস্থ করিয়াছি, আমাকে মাপ করিতে পারিবে কি?"

বিনোদিনী কহিল—"মাপ কিসের জন্য? বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি? আমি কাহাকেও মানি না! যাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়, তাহারাই কি আমার সব, আর যাহারা আমাকে পায়ে

ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায়, তাহারা আমার কেহই নহে ?”

মহেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“বিনোদিনি, তবে আমার ভালবাসা তুমি পায়ে ঠেলিবে না ?”

বিনোদিনী কহিল—“মাথায় করিয়া রাখিব। ভালবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, চাই না বলিয়া ফিরাইয়া দিব !”

মহেন্দ্র তখন দুই হাতে বিনোদিনীর দুই হাত ধরিয়া কহিল—“তবে এস, আমার ঘরে ! তোমাকে আজ আমি ব্যথা দিয়াছি, তুমিও আমাকে ব্যথা দিয়া চলিয়া আসিয়াছ—যতক্ষণে তাহা একেবারে মুছিয়া না যাইবে, ততক্ষণ আমার খাইয়া শুইয়া কিছুতেই সুখ নাই।”

বিনোদিনী কহিল—“আজ নয়—আজ আমাকে ছাড়িয়া দাও। যদি তোমাকে দুঃখ দিয়া থাকি, মাপ কর !”

মহেন্দ্র কহিল—“তুমিও আমাকে মাপ কর, নহিলে আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারিব না।”

বিনোদিনী কহিল—“মাপ করিলাম।”

মহেন্দ্র তখনি অধীর হইয়া বিনোদিনীর কাছে হাতে হাতে ক্ষমা ও ভালবাসার একটা নিদর্শন পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। বিনোদিনী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল—মহেন্দ্রও ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ছাদে বেড়াইতে লাগিল। বিহারীর কাছে হঠাৎ আজ মহেন্দ্র ধরা পড়িয়াছে, ইহাতে তাহার মনে একটা মুক্তির আনন্দ উপস্থিত হইল। লুকাচুরির যে একটা ঘৃণ্যতা আছে, একজনের কাছে প্রকাশ হইয়াই যেন তাহা অনেকটা দূর হইল। মহেন্দ্র মনে মনে কহিল—“আমি নিজেকে ভাল বলিয়া মিথ্যা করিয়া আর চালাইতে চাহি না—কিন্তু আমি ভালবাসি—আমি ভালবাসি সে কথা মিথ্যা নহে।” নিজের ভালবাসার গৌরবে তাহার স্পর্দ্ধা এতই বাড়িয়া উঠিল যে, নিজেকে মন্দ বলিয়া সে আপন মনে উদ্ধতভাবে গর্ব্ব করিতে লাগিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে নীরব জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-অধিরাজিত অনন্ত জগতের প্রতি একটা অবজ্ঞা নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিল—“যে আমাকে যত মন্দই মনে করে করুক, কিন্তু আমি ভালবাসি!” বলিয়া বিনোদিনীর মানসী মূর্ত্তিকে দিয়া মহেন্দ্র সমস্ত আকাশ, সমস্ত সংসার, সমস্ত কর্ত্তব্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি-আঁটা মসীপাত্র উল্টাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল—বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালী দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বেকার সমস্ত শাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল।

ক্রমশ।

মদন-মহোৎসব

——:০——

রত্নাবলী নাটিকার যে মদন-মহোৎসবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এক-সময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে সমুচিত সংবর্দ্ধনার সহিত সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইত। তখন নাগরিকগণ বসন্তসমাগমে আম্রমঞ্জরীর নবোদ্গম-প্রতীক্ষায় ঔৎসুক্যের সহিত দিন গণনা করিত, এবং উৎসবদিন উপনীত হইবামাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। কিয়দ্দিবসের জন্য প্রশান্ত শিষ্টাচার তিরোহিত হইয়া অশান্ত নৃত্যগীত,—সুরা, কুঙ্কুম ও আবীর প্রভাবে,—সগর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই সে মহা-মহোৎসবে যোগদান করিতেন। বসন্ত-বিজয়ঘোষণায় নাগরিক-হর্ষকোলাহল নভস্তল শব্দায়মান করিয়া তুলিত। ইহা ভারতবর্ষের বহু পুরাতন জাতীয় মহোৎসব।

বহুদিন হইল, এই জাতীয় মহোৎসব তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; কেবল তাহার স্থলে "হোলী" অধিকার রক্ষা করিয়া অদ্যাপি আবীর-কুঙ্কুমের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে;—কিন্তু শিক্ষিতসমাজে তাহার প্রভাবও ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে।

সম্প্রতি রত্নাবলী নাটিকার যে অত্যুৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় অনুবাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কোন্ সময় হইতে এ দেশে মদনোৎসব রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব আরম্ভ হয়, ইহা একটি ঐতিহাসিক রহস্য।" এই রহস্য ভেদ করিবার পর্য্যাপ্ত উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ, অতি ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। কিন্তু উৎসবের বাহ্যবেশের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; নামের পরিবর্ত্তনও যৎসামান্য। বর্ত্তমান "হোলি" বা "হোরী" শব্দ পুরাতন "হোলাকা" শব্দের সংক্ষিপ্ত পাঠ। হোলাকার অর্থ বসন্তোৎসব। বসন্ত-কালে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া মদনোৎসবকেই বসন্তোৎসব বলিত। জনসাধারণের মধ্যে বসন্তোৎসব "হোলাকা"নামে পরিচিত ছিল; তাহাই এখন "হোলী"নাম ধারণ করিয়াছে। হোলাকায় সেকালের নাগরিকগণ আবীর-কুঙ্কুমে সুশোভিত হইয়া, নাগরীসঙ্গে দোলারোহণ করিতেন বলিয়া, তাহা "দোল"-নামেও পরিচিত ছিল। এই দোল এক-দিনে শেষ হইত না; সমগ্র বসন্ত ঋতু ভরিয়া হিন্দোলা আন্দোলিত হইত; এবং রাজা, প্রজা, সকলেই হিন্দোলায় দোল খাইতে খাইতে বসন্তোৎসবের মাধুর্য্য বিস্তার করিতেন। মহাকবি কালিদাস নানাস্থানে এই দোলোৎসবের আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন। "মালবিকাগ্নিমিত্রে" রাজা অগ্নিমিত্র দোলখেলার জন্য রাণী ইরাবতী কর্ত্তৃক আদিষ্ট; "রঘুবংশে" দশরথ সত্যসত্যই

কামিনীভুজলতাশ্লেষকণ্টকিতকণ্ঠে হিন্দোলায় দোলায়মান। যথাঃ—

"অনুভবন্নবদোলমৃতূৎসবং
পটুরপি প্রিয়কণ্ঠজিঘৃক্ষয়া।
অনয়দাসনরজ্জুপরিগ্রহে
ভুজলতাং জলতামবলাজনঃ॥

এই মদনোৎসবের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, কোন্ সময় হইতে কিরূপেই বা তাহা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান দোলোৎসবমাত্রে পর্য্যবসিত হইল, তাহার ঐতিহাসিক তথ্যনির্ণয় করা কঠিন হইলেও, একেবারে অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার তথ্যানুসন্ধানপ্রণালী প্রদর্শিত হইল। পুরাণে মদনমহোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; নাটকাদিতে তাহার লৌকিক চিত্র স্পষ্ট চিত্রিত রহিয়াছে। প্রকৃতিনির্ণয়ের জন্য ইহাই আপাতত যথেষ্ট।

স্কন্দ, ভবিষ্য ও মৎস্য পুরাণে মদন-মহোৎসবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে সমধিক বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে এই মহোৎসবের আরম্ভ হইত। তিথিগুলি যথাক্রমে মদনদ্বাদশী, মদনত্রয়োদশী ও মদনচতুর্দ্দশী নামে পরিচিত ছিল। রঘুনন্দন স্মার্ত্তশিরোমণির 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে'ও মদনচতুর্দ্দশীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পুরাকালে ব্রতমধ্যে পরিগণিত হইত। অন্যান্য ব্রতের ন্যায় ইহারও ফলশ্রুতি ছিল; সাধারণ ফল আপদের বিনাশ, বিশেষ ফল পুত্রলাভ। সুপুত্রলাভকামনায় গৃহলক্ষ্মীগণ সমুচিত ভক্তিভরেই ব্রতপালন করিতেন। তাহাতে উপবাস ছিল, কঠোরতা ছিল, ত্যাগস্বীকার ছিল;—ব্রতশেষে দক্ষিণাদান ও ব্রাহ্মণভোজনেরও ব্যবস্থা ছিল। রত্নাবলী নাটিকার বিদূষক মহাশয় তাহা ইঙ্গিতে সুব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা :—

"রাজা। জিতশত্রু রাজ্য এই,
সুযোগ্য সচিবে ন্যস্ত এ রাজ্যের ভার
সম্যক্-পালিত প্রজা,
প্রশমিত উপদ্রব সর্ব্ব অত্যাচার।
প্রদ্যোততনয়া সেই
প্রেয়সী বাসবদত্তা রাণী,
তুমি বসন্তক ওগো,
প্রিয়সখা বসন্ত-সমানি।
করুন্ সে কামদেব,
নামে মাত্র তুষ্টি অনুভব,
এ তাঁর উৎসব নহে,
—আমারি এ মহান্ উৎসব।

বিদূষক। (সহর্ষে) মহারাজ! তা নয়। আপ্‌নি যে উৎসবের কথা বল্‌চেন, আমি বলি সে আপনারও নয়, কামদেবেরও নয়; সে শুধু এই ব্রাহ্মণ-বটুরই উৎসব।"

ব্রতান্তে রাজা পাদ্য, অর্ঘ্য, মাল্যচন্দন ও প্রণামমাত্র লাভ করিবার সময়ে বসন্তক-ঠাকুর রাণীর নিকট হইতে হাতভরা স্বস্তি-বাচনের ডালা দক্ষিণা পাইয়া এ কথার অর্থ নীরবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন! মদন-মহোৎসবের পূজাপদ্ধতি সংক্ষিপ্ত ছিল। বাহ্যপূজান্তে "চাপেষুধৃক্ কামদেবো রূপবান্ বিশ্বমোহনঃ" এই সংক্ষিপ্ত ধ্যান, এবং ধ্যানান্তে প্রণাম। যথা :—

"পুষ্পধন্বন্! নমস্তেঽস্তু নমস্তে মীনকেতন!
মুনীনাং লোকপালানাং ধৈর্য্যচ্যুতিকৃতে নমঃ॥
মাধবাত্মজ! কন্দর্প! সম্বরারে! রতিপ্রিয়!
নমস্তুভ্যং জিতাশেষভুবনায় মনোভু বে॥

আধয়ো মম নশ্যন্তু ব্যাধয়স্তু শরীরজাঃ।
সম্পদ্যতামভীষ্টং মে সম্পদঃ সন্তু মে স্থিরাঃ॥
নমো মারায় কামায় দেবদেবস্য মূর্ত্তয়ে।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেন্দ্রাণাং মনঃক্ষোভকরায় চ॥"

এই কামস্তুতি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা "কামগন্ধহীন," আধি-ব্যাধিবিনাশপ্রার্থনাত্মক সাধারণ ইষ্টসিদ্ধি-স্তব। সুতরাং নরনারীমাত্রেই মদনোৎসবে ব্যাপৃত হইতেন। পূজা, ব্রত, উপবাসাদি ইহার সাত্ত্বিক অঙ্গ, গীতবাদ্য ও নৃত্যোৎসব রাজসিক ও তামসিক অঙ্গ বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার সঙ্গেই জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংস্রব সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে যে যথেষ্ট বাহ্যাড়ম্বর প্রকাশিত হইত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাজারে আবীর-কুঙ্কুম মহার্ঘ হইয়া উঠিত, রাজপথে অনার্দ্রবস্ত্রে গমনাগমন করা কঠিন হইয়া পড়িত; উন্মুক্ত বাতায়নে উপবেশন করিবার উপায় ছিল না; ধারাযন্ত্রনিঃসৃত সলিলসেকে শীৎকার করিতে হইত!

রত্নাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী বাসবদত্তা অশোকবৃক্ষমূলে কামদেবের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অর্চ্চনান্তে সৌভাগ্যবতী সধবাগণ যে পতিপাদপদ্ম পূজা করিতেন, বাসবদত্তা তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। অশোকবৃক্ষই মদনপূজার প্রশস্ত ক্ষেত্র। সিদ্ধিদায়ক বলিয়া অশোক পঞ্চবটীর অন্তর্গত। ভগবান্ মকরকেতনের সঙ্গে অশোকবৃক্ষের ইহা অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। তাঁহার সুবিখ্যাত পঞ্চবাণ পুষ্পময়, তাহা পঞ্চপুষ্পে গঠিত হইত। তজ্জন্য কুসুমধন্বাকে পদ্ম, আম্র, নবমল্লিকা ও নীলোৎপলের ন্যায় অশোকপুষ্পেরও সন্ধান করিতে হইত। যথাঃ—

"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥"

বসন্তসমাগমে অশোকের পুষ্পোদ্গমে বিলম্ব ঘটিলে, প্রমদাকুল প্রমাদ গণনা করিতেন। সুতরাং অশোকের ফুল ফুটাইবার জন্য মন্ত্রতন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। ইহাকে অশোকের "সাধ" বলিত; "সাধ" দিলে ফুল ফুটিত। সে "সাধ" আর কিছু নয়,—সনূপুরচরণতাড়না।

"সনূপুররবেণ স্ত্রীচরণেনাভিতাড়নম্।
দোহদং যদশোকস্য ততঃ পুষ্পোদ্গমো ভবেৎ॥"

অভিধানে ইহাকে "কবিপ্রসিদ্ধি" বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহা কবিপ্রসিদ্ধিমাত্রই—সর্ব্বথা কাল্পনিক, এরূপ অনুমান করা যায় না। প্রমদাগণ সত্যসত্যই অশোককে এইরূপে "দোহদ" দান করিতেন। তজ্জন্য ফুল ফুটিত কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সেকালের মহিলাসমাজে যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, "মালবিকাগ্নিমিত্রে" তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজমহিষী ধারিণী দেবী বিদূষক গৌতমের "নষ্টামিতে দোলা হইতে পড়িয়া গিয়া" পায়ে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাই স্বয়ং অশোককে "দোহদ" দান করিতে অশক্ত হইয়া মালবিকার উপর ভারার্পণ করেন। মালবিকা অলক্তকে চরণরাগ সুসম্পন্ন করিয়া স্বর্ণনূপুরসুশোভিত চরণের তাড়নায় কিরূপে দোহদদানক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কবি তাহা বিলক্ষণ নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

অশোকবৃক্ষমূলে মদনপূজার ব্যবস্থা হইবার বোধ হয় আরও একটু কারণ ছিল। অশোক কামিনীকুলের সর্ব্বশোকবিনাশক; স্ত্রীরোগনিবারক অব্যর্থ ঔষধ। চৈত্রাগমে অশোকতরু মঞ্জরিত হইবার সময় হইতেই মহিলামণ্ডলীর নানারূপ অশোকব্রতপালনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্রশুক্লা ষষ্ঠীতে অশোকষষ্ঠী পুত্রবতীর পক্ষে অবশ্যপ্রতিপাল্য ব্রত; চৈত্রশুক্লা অষ্টমীতে অশোকাষ্টমী ব্রতে অষ্ট অশোককলিকা পানের অশেষ ফল কীর্ত্তিত। এই সকল কারণে মনে হয়, বুঝি বসন্তসমাগমে নানা ব্রতনিয়মব্যপদেশে মহিলাগণকে অশোক-মূলে সমবেত হইবার ব্যবস্থা করিয়া শাস্ত্র-কারগণ কৌশলে স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে অশোকের অনেক গুণ উল্লিখিত আছে। যথা :—

"অশোকঃ শীতলস্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ।
দোষাপচীতৃষাদাহকৃমিশোষবিষাস্রজিৎ ॥"

মদনদেবের পূজার জন্য অশোকবৃক্ষমূল প্রশস্ত হইলেও, অঞ্জলিদানে চূতমঞ্জরীর প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। "অভি-জ্ঞানশকুন্তলে" তাহার আভাস আছে। পশ্চাত্তাপতপ্ত দুষ্মন্ত মদনমহোৎসব নিবারণ করিবার জন্য চূতমঞ্জরীচয়ন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল পুরাতন প্রথা কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কি না, তাহা জানিতে না পারিলেও, সেকালের গৃহস্থের বাস্তুসংলগ্ন ক্ষুদ্রোদ্যানে আম্র ও অশোক যে পরম-সমাদরে প্রতিপালিত হইত, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন সেই সকল স্থান অন্যশ্রেণীর বিচিত্র বিদেশীয় পাদপ ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া লই-য়াছে। বিদেশীয় শাসনের ন্যায় বিদেশীয় রুচিও আমাদের আন্তরিক স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়া আমাদিগকে পরপাদপদ্মোপজীবি-দাসজাতিতে পরিণত করিয়াছে। এখন অশোক দুর্ল্লভ হইবে না কেন?

মদনমহোৎসবের বাহ্যাড়ম্বর বড় হৃদয়ো-ন্মাদক বলিয়া নরনারী সহজেই তাহার অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারত-বর্ষের ন্যায় সুখসেব্য বিচিত্র দেশের বসন্ত-সমাগম স্বভাবতই হৃদয়োন্মাদক। বোধ হয়, ঋতুরাজ আত্মপ্রভাবেই ভারতীয়গণকে প্রথমে বনজ লতাপুষ্পে সুশোভিত করিয়া উৎসবমগ্ন করিয়াছিলেন, কালে তাহাই জাতীয় মহোৎসবে পরিণত হইয়াছিল। কালক্রমে তাহার সহিত নৃত্যগীত, আবীর-কুঙ্কুম, হিন্দোলা ও সুরা সম্মিলিত হইয়া মোহাবেশে মধুমাসকে সত্যসত্যই মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল! সেই মধুসমাগমসময়ে বাঞ্ছিতজনসম্মুখে সম্ভ্রম-সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়া কত নিভৃত হৃদয়বেদনা সঙ্গীতচ্ছলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। বৎসরের মধ্যে সেই এক দিন! তাহার প্রতীক্ষায় কে না দিবস গণনা করে?

এই মহোৎসবের উদ্দাম দৃশ্য "রত্নাবলী"তে কেমন সুকৌশলে চিত্রিত হইয়াছে;—যেন এখনও তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান! রথ্যা-মুখ প্রতিশব্দিত করিয়া মাদলের উদ্দাম বাদ্যনিনাদ চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে; বিকীর্ণ আবীরচূর্ণে দিগ্দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে; ধারাযন্ত্রনিঃসৃত সুরঞ্জিত বারি-

ধারায় গৃহাঙ্গন প্লাবিত ও অঙ্গনাপদবিমর্দ্দন-বলে কর্দ্দমিত হইয়া উঠিতেছে। নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া কিশোরীগণ পরিশ্রান্ত হইলে, প্রণয়াস্পদের কণ্ঠাশ্লেষে বিশ্রামলাভ করিয়া, পুনরায় নাচিয়া উঠিতেছেন,—সে দৃশ্য কি হৃদয়োন্মাদক! কবি তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"স্তনভরে ক্ষীণ-মধ্য ভাঙে বুঝি—
তাহে নাহি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করি,
উন্মত্তা হইয়ে নাচে —পুষ্পদামশোভা ত্যজি
এলাইয়ে পড়য়ে কবরী।
চরণে নূপুর ওই দ্বিগুণ দ্বিগুণতর
ফুকারিয়ে করিছে ক্রন্দন।
অঙ্গের স্পন্দনভরে কণ্ঠহার অবিরত
বক্ষদেশ করিছে তাড়ন॥"

এই মদন-মহোৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীতের ন্যায় নাটকাভিনয়েরও ত্রুটি হইত না। শ্রীহর্ষদেবের সভায় মদন-মহোৎসব উপলক্ষেই রত্নাবলী নাটিকার প্রথম অভিনয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই শ্রীহর্ষদেব সুবিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের বংশধর দ্বিতীয় শীলাদিত্য নামে পরিচিত। তিনি ৬১০ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তৎকালে প্রসিদ্ধ চৈনিক সন্ন্যাসী হিয়ঙ্‌থ্‌সাঙ্‌ ইঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীহর্ষদেব সমগ্র উত্তর ভারতের সার্ব্বভৌমিক সম্রাট্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রত্নাবলীর প্রস্তাবনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহার রাজধানীতে মদন-মহোৎসব উপভোগ করিবার জন্য বহুসংখ্যক সামন্ত নরপতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রত্নাবলী শ্রীহর্ষদেবের রচিত বলিয়া প্রকাশ; মহামহোপাধ্যায় মম্মটভট্ট তাহা স্বীকার না করিয়া ধাবক-নামক কবির নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রত্নাবলী যাঁহারই লিখিত হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। ইহা যে শ্রীহর্ষদেবের সভায় মদনমহোৎসবে অভিনীত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই;—রত্নাবলীর প্রস্তাবনাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কথা। তখন পর্য্যন্তও ভারতবর্ষের প্রবল প্রতাপে এসিয়াখণ্ডের জলস্থল সমুজ্জ্বল ছিল;—স্থলপথে গান্ধার, বাহ্লীক, তিব্বৎ, তাতার ও মহাচীন, এবং জলপথে লঙ্কা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও জাপান পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-প্রভাব পরিলক্ষিত হইত; ভারত ও প্রশান্তমহাসাগরবক্ষে বাণিজ্যকুশল ভারতীয় বণিগ্‌বর্গ অর্ণবপোতে দ্বীপদ্বীপান্তরে গমনাগমন করিত; নালন্দার সুবিখ্যাত বৌদ্ধবিদ্যালয়ে নানা দেশের নানা জাতির অধ্যয়নশীল ছাত্রবৃন্দ বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন করিয়া ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার দেশবিদেশে বহন করিয়া ভারতগৌরব সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত করিত। সেই গৌরবের দিনে মদনমহোৎসবে যে পুঞ্জীকৃত বহুমূল্য কুঙ্কুমরাশি সমাহৃত হইত, তন্মধ্যে কাশ্মীর, বাহ্লীক ও পারসিক কুঙ্কুমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘ্রাণে ও বর্ণে পার্থক্য থাকায় কুঙ্কুম উত্তম, মধ্যম ও অধম, শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত ছিল। কাশ্মীরের কুঙ্কুম উত্তম, বাহ্লীকের মধ্যম এবং পারসিকের অধম বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। যথা :—

কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধি তৎ।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥ *

বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ।
কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্ ॥
কুঙ্কুমং পারসীকে যৎ মধুগন্ধি তদীরিতম্।
ঈষৎপাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্ ॥

এই সময়ে ইস্‌লামের নবোত্থিত মহাশক্তি ধীরে ধীরে পশ্চিমসমুদ্রতীরে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। ক্রমে তাহা যখন ভারতসীমায় সমুপাগত হয়, তখনও ভারতবর্ষে মদনমহোৎসবের প্রাধান্য ছিল। অল্‌বেরুণীকৃত ভারতবিবরণীতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন পর্য্যন্তও হোলাকা হোলীতে পরিণত হয় নাই! শ্রীপুরুষোত্তমদেবকৃত 'হারাবলী'নামক সুবিখ্যাত শব্দকোষেও হোলাকা বসন্তোৎসব নামেই ব্যাখ্যাত দেখিতে পাওয়া যায়। মরাঠী-ভাষানিবদ্ধ 'কবিচরিত্র'-নামক গ্রন্থে পুরুষোত্তমদেব শালিবাহন-শকাব্দীয় চতুর্দ্দশ শতকের কলিঙ্গাধিপতি বলিয়া পরিচিত। এই 'হোলাকা'শব্দ "হোলী ইতি ভাষা" বলিয়া দায়ভাগের টীকায় প্রথম ব্যাখ্যাত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মুসলমানশাসন-সময়েই যে পুরাতন হোলাকা আধুনিক হোলী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

যাহা জাতীয়মহোৎসবরূপে দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকে, তাহা সহসা তিরোহিত হইতে পারে না। বৌদ্ধযুগের রথযাত্রা তিরোহিত হয় নাই; রথারূঢ় বুদ্ধমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নারায়ণবিগ্রহ আসন গ্রহণ করিয়াছেন। মদনমহোৎসবেও এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মদনমহোৎসব পরাধীন জাতির মর্য্যাদারক্ষা করিতে অক্ষম। অবরোধপ্রথা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সুতরাং মুসলমানশাসনের সঙ্কোচ এই মহামহোৎসবের প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। পুরাকালে মদনপূজার সঙ্গে বিষ্ণুপূজাও অনুষ্ঠিত হইত; মদনপূজা অন্তর্হিত হইয়া বিষ্ণুপূজাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। উভয় পূজারই বাহ্যাঙ্গ একরূপ ছিল; সুতরাং আবীর-কুঙ্কুম, নৃত্য-গীত সমভাবে প্রচলিত আছে; কেবল যে উৎসব রমণীমণ্ডলীর বিশেষ অধিকারে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা পুরুষসমাজেই স্থানলাভ করিয়া রমণীগণকে নৃত্যগীত দোলারোহণ হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা অদ্যাপি আবীর-কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি করেন; কিন্তু তাহাতে মদনমহোৎসবের উন্মাদনৃত্যের অভাব।

মদনমহোৎসব হোলীতে পরিণত হইবার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব বলিয়া মুসলমানদিগের নিকট পরিচিত ছিল। কোম্পানীবাহাদুরের শাসনসূচনায় "কলিকাতা গেজেটে" যে ছুটির তালিকা মুদ্রিত হয়, তাহাতেও দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও হোলীর ছুটই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছুটি ছিল;—দুর্গোৎসব তাহার তুলনায় যেন কিছুই নয়! কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে জনসমাজের আচার-ব্যবহারের ন্যায় উৎসব-আনন্দের প্রকৃতিও যে কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সেকালে যে সকল জাতীয় মহোৎসব প্রচলিত ছিল, সে সমস্তই বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত হইয়া নূতন মহোৎসবের প্রচলন করিয়া দিয়াছে। ইতিহাসের অভাবে সনাতনবাদিগণ প্রচলিত

উৎসবগুলিকেই চিরপুরাতন বলিয়া তৃপ্তি-লাভ করিতেছেন।

"চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমদ্রবসংযুতম্।
আবীরচূর্ণং রুচিরং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর॥"

ইতিমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে আবীরচূর্ণ প্রদান করিবার কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে ইহাকেই হোলীর ঐতিহাসিক সূত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদনমহোৎসবে আবীরচূর্ণ লাভ করিতেন; তাহাই তখনকার দোল ছিল। মদনমহোৎসবের ন্যায় আবীরও ক্রমশ বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতেছে! আর কিছুদিন পরে আবীরের "লালে লাল" দুর্লভ হইয়া উঠিবে; এখনই দোলের সময় বিলাতী রঙের প্রভাবে নাগরিকগণের উত্তরীয় ও পরিধেয় নীল, বেগুনি, নানা বর্ণে সুরঞ্জিত হইতেছে! প্রাচীন মদনমহোৎসবে আবীরের লাল ও কুঙ্কুমের পীত বর্ণেরই প্রাধান্য ছিল; বস্ত্ররঞ্জনে "কৌসুম্ভ" ব্যবহৃত হইত। বাহ্যপ্রকৃতির বসন্তোদ্গত বিচিত্র বর্ণসমাবেশের সঙ্গে এই সকল দ্রব্যের বর্ণসামঞ্জস্য ছিল। যথা :—

"বিকীর্ণ আবীরচূর্ণে আভা যেন অরুণ উদয়,
কুঙ্কুমের চূর্ণে দেখ চারিদিক পীতবর্ণময়।
স্বর্ণ-আভরণ-আভা "কিঙ্কিরাত"পুষ্প ফোটে কত,
গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পভারে তরুশির কিবা অবনত॥"

মদনোৎসবে পুষ্পের যথেষ্ট সমাদর ছিল; হোলীতে সেরূপ পুষ্পসমাদর নাই। পুষ্পের সঙ্গে মাল্যের গৌরবও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। মদনমহোৎসবে যে সকল প্রিয় পদার্থ ব্যবহৃত হইত, তন্মধ্যে আবীর-কুঙ্কুমের নামমাত্রই বর্ত্তমান; দুর্মূল্য বলিয়া কুঙ্কুম পরিত্যক্ত হইয়াছে, বিলাতী-বর্ণচূর্ণ-প্রভাবে আবীর দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে!

মদনমহোৎসবে নাগর-নাগরী পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত হইয়া হিন্দোলায় দোল খাইত; তাহা এখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দে সমর্পিত হইয়াছে! এই পরিবর্ত্তনের মূলে মুসলমানশাসনের ন্যায় বৈষ্ণবাচারের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। ভক্ত বৈষ্ণব বিষয়বিরক্ত অনাসক্ত হৃদয়ে আত্মবৎ সেবা-পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন। যাহাতে আত্মসুখ, তাহাই ভগবানে অর্পিত হইয়াছে বলিয়া, ভগবান্‌কে এখন মশকদংশন-নিবারণের জন্য মশারি পর্য্যন্তও ব্যবহার করিতে হয়। ভক্তের মাল্যচন্দন ও দোলারোহণও এইরূপে ভগবানের দোলোৎসবের মহিমা বৃদ্ধি করিতেছে পুরাকালের মদনমহোৎসবে এরূপ আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা যাইত না। তখন মানবসমাজ সরল শিশুর ন্যায় আনন্দে হাসিত, উৎসবে নাচিত, উল্লাসে উন্মত্ত হইত; বুকের মধ্যে চিতার আগুন চাপিয়া রাখিয়া শুষ্কমুখে প্রসাদভিখারী ধর্ম্মকঞ্চুক-ধারী ভণ্ডভক্তের ন্যায় শূন্যমন্দিরে বসিয়া থাকিত না! এখন কামিজ-ঢাকা বুকের মধ্যে কি থাকে, কেমন করিয়া বলিব? তাই আমরা বেশ বুক ফুলাইয়া সেকালের মদন-মহোৎসবকে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল দেশাচার বলিয়া নিন্দা করি। আমাদের সুরুচি ও সদাচার আমাদিগকে কৃত্রিমতার অতল সলিলে কতদূর নিমজ্জিত করিতেছে, ভবিষ্যতের ইতিহাস তাহার গভীরতার পরিমাপ করিবে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স-রহস্য।

সোমবার। বিলাসপুরের থানায় চৌকীদারেরা হাজিরা দিতে আসিয়াছে। পুলিস-বাঙ্গলোর সম্মুখে দুই দুই খানি ইষ্টক-রচিত ক্ষুদ্র বেদী সমান্তরাল শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং সংখ্যায় প্রায় দেড় শত। ইহাই তাহাদের বসিবার স্থান। পুলিসের ভাষায় ইহার নামান্তর 'বিট' জনত্রিশেক নীল-কুর্ত্তা-পরিহিত এবং সেই রংয়ের পাগড়ীধারী চৌকীদার নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে এবং জমাদারসাহেবের আগমনপ্রতীক্ষায় অস্ফুটস্বরে নিজেদের ভিতর কলহ-কচ্‌কচি সুরু করিয়া দিয়াছে। তাহাতে লোষ্ট্রাহত মধুক্রমবৎ, হাটে সমাগত জনকল্লোলের দূরশ্রুত অস্পষ্টধ্বনিবৎ, একটা অব্যক্ত কণ্ঠ-মর্ম্মর স্থানটাকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেক চৌকীদারের হাতের কাছে হয় ঘৃত বা দুগ্ধভাণ্ড, পাবাঁধা দুটো একটা "মনুনিষিদ্ধ পক্ষী" অথবা তাহারই কয়টা অণ্ডমাত্র সাজান—নহিলে হাজিরা জমে না। জন কয়েক চৌকীদার থানার সংলগ্ন দারোগা-সাহেবের ফুল ও তরকারির বাগান কোদালি-সহযোগে খনন করিতেছে, তাহাদের গায়ের কুর্ত্তা ও মাথার পাগড়ী সম্মুখবর্ত্তী অশ্বত্থগাছের শাখাপ্রশাখায় লম্বমান হইয়া "উর্দ্দি"বিরহিত চৌকীদার-জীবন প্রত্যক্ষ করিতেছে। অদূরে নদীর ধারে জন কতক চৌকীদার উর্দ্দি ও কুর্ত্তি পরিহিত হইয়াই খুরপী হাতে জমাদার-সাহেবের ঘোড়ার ঘাস ছুলিতে বসিয়া গিয়াছে। আজ তাহারা বড় আনন্দে আছে, দুই প্রহরের পরই বাড়ী ফিরিতে পারিবে। কেন না, স্বয়ং দারোগা-সাহেব তাঁহার অশ্বযুগল লইয়া তিনদিন হইল দেহাৎ রওনা হইয়াছেন। তিনি সদরে থাকিলে বেচারীদের সন্ধ্যার পূর্ব্বে থানাত্যাগের হুকুম নাই।

সাধারণত জমাদারজী বেলা ৮টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করেন না, "অপ্‌সরের" অনুপস্থিতিতে আজ তাঁহার আয়েসের মাত্রা আরো ঘণ্টাখানেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অতএব দক্ষিণ কর্ণের শিরোভাগে গুটিকতক খড়িকা রক্ষা করিয়া বামহস্তধৃত আলবোলার নলটি তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করিতে করিতে দোদুল্যমান-উদর জমাদার কিষণসহায় যখন থানার আফিস বারান্দায় "তসরিফ্" লইয়া আসিলেন, বেলা তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

বৈশাখী সায়াহ্নের বাত্যাবর্ষাগর্ভ অকাল-জলদের সঙ্গে কিষণসহায়ের স্নেহ-চিক্কণ মূর্ত্তিখানির যাঁহারা তুলনা করিতে চান, তাঁহাদের সাদৃশ্যজ্ঞান নাই, এমত বলিলে

লেখক ধর্ম্মে পতিত হইবেন। সাদৃশ্য যথেষ্ট এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ ইহা বলিতে পারি যে, দূর হইতে তাঁহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া চৌকীদারের দল ইতিপূর্ব্বেই "চমকি সম্ভ্রমে উঠি যেন" দাঁড়াইয়াছিল। জমাদার-সাহেব বারান্দায় সমাগত হইবামাত্র তাহারা একযোগে সিপাহী-ধরণে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। সেখানে ঢালা-বিছানা ও চেয়ার-টেবিল, দুই রকম আসনেরই ব্যবস্থা ছিল। কিষণসহায় আরামটাই বুঝেন ভাল, অতএব অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার সমক্ষে "ভেট সওগাদ" উপস্থিত করার জন্য চৌকীদার-মহলে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কোন্ ভূম্যধিকারীর প্রতাপ ইহার সঙ্গে তুলনীয়? সরকারী খাজানা না দিয়াও যে দারোগা এবং জমাদার কনষ্টেবলের দল এদেশে এতটা আধিপত্যসুখ সম্ভোগ করে, ইহাতেই হয় ত জমীদারের দল ঈর্ষান্বিত; এবং সরকার বাহাদুরের বামহস্তস্বরূপ পুলিসবিভাগের এতটা নিন্দাবাদ যে শুনা যায়, তাহার প্রধান কারণ সম্ভবত ইহাই। যাহা হউক, জমাদারসাহেব সেই উপহারের রাশি নিতান্ত অপ্রসন্নদৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন না। পক্ষিজাতীয় উপহারের দিকে কটাক্ষ করিয়া তিনি দারোগা মসুব-আলীর বাসার দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিলেন। গব্যরসের বেলায় অঙ্গুলিটি স্বতই সেদিন—মহাহিন্দু তিনি—তাঁহার বাসগৃহের দিকে হেলিল। মুহূর্ত্তে সে সওগাদস্তূপ দুই দিকে চলিয়া গেল, অথচ কিষণসহায়কে একটি বাক্য ব্যয় করিতে হইল না। বাক্যবলের চেয়ে বাহুবলটাই যে শাসনপ্রণালীর পক্ষে অধিকতর উপযোগী, এই দৃষ্টান্তে তাহা প্রমাণ হয় কি না?

থানায় থানায় প্রতি সোম মঙ্গলবারে চৌকীদারদের যে হাজিরি হয়, তাহার বিবরণ হরেদরে একই-রকম। দারোগা বা জমাদার সাহেব রেজেষ্টারি উল্টাইয়া "বিটে"র ক্রমানুসারে হাঁকিয়া যাইতেছেন, অমনি ১০।১৫।২০ জন চৌকীদার খাড়া হইয়া উঠিয়া জন্ম, মৃত্যু, চুরী-চামারি প্রভৃতির ছাপা প্রশ্ন পাঠশালার ছেলেদের মত মুখস্থ উত্তরে পূর্ণ করিতেছে, কেহ সে অবস্থায় গালি খাইতেছে, কাহাকেও হুকুমমত আপনার কান আপনি মলিতে হইতেছে, এ দৃশ্য হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বোধ করি সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কিলটা ঘুষোটা চাপড়টা কখন বেত্রাঘাত—ইহারও অপ্রতুল নাই। জেলার বা মহকুমার হাকিম জরিমানার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আস্থাবান্, পুলিস কর্ম্মচারীদের এরূপ ধারণা হইয়া গেলে তাহার "কোসিসে"রও অভাব হয় না। ইহার ফলে তিনটাকার চৌকীদার তিনমাস পরে কখন কখন নগদ দেড় টাকা গৃহজাত করিয়া থাকে, তথাপি উর্দ্দি ও কুর্ত্তির মায়া ত্যাগ করিতে পারে না। চৌকীদারপত্নী তাহাতে খুঁৎ-খুঁৎ করিলে ভর্ত্তার কাছে শুনিতে পায়—"বলিস্ কি ক্ষেপি, পুলিসের অমন ইজ্জতের চাকরী এক কথায় ছেড়ে দেব? সময়ে অসময়ে অমন কত দেড়টাকা হাতে আসবে!" উর্দ্দু ও হিন্দী প্রচলিত জেলার পাঠকমহাশয় উক্তিটুকুকে মনে মনে অনু-

বাদ করিয়া লইলেই দেখিতে পাইবেন, মনুষ্যচরিত্র সর্ব্বত্র একরূপ!

ত্রা বক্ষ্যমাণ সোমবারে বিলাসপুর-থানার কথা হইতেছিল। সরকারী কাজ গরীব চৌকীদারদের হাসি-অশ্রুতে মিশামিশি হইয়া ঘণ্টাখানেক চলিয়াছে, কর্ণশীর্ষে রক্ষিত জমাদারসাহেবের সেই খড়িকাগুলি তাঁহার দন্তক্লেদ দূর করিতে অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে, বাটার পান প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, এমন সময়ে ডাকে মহুকুমার হাকিম "জইণ্ট'সাহেবের এক পরোয়ানা আসিয়া উপস্থিত। হুকুম, তাঁহার এলাকার ভিতর কত গর্দ্দভ, ঘোড়া এবং টাট্টু আছে, এবং সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন ঘোড়ার মাপ কি—তিন দিনের ভিতর রিপোর্ট করিতে হইবে। জমাদারসাহেব হুকুমটা পড়িয়া মনে মনে খানিকটা গজ্‌গজ্‌ করিলেন। তার পর জইণ্টসাহেব ও দারোগার উদ্দেশে একচোট বিনাম অভিধানবহির্ভূত বিশেষণ প্রয়োগপূর্ব্বক একছিলিম তামাকু চড়াইতে পার্শ্ববর্ত্তী চৌকীদারকে আদেশ করিয়া কনষ্টেবল মেঘুসিংকে তলব করিলেন। মেঘু অনেককাল পুলিসে চাকরী করিয়া বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল, থানার অপ্‌সরেরা তার মুঠার মধ্যে বলিলেই হয়। বাস্তবিকও তাঁহাদের কোনরূপ 'মুস্কিল' উপস্থিত হইলে মেঘুসিং সিপাহীজী ভিন্ন 'আসান' কেহ করিতে পারিত না। সিপাহী এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়া খড়মপায়ে তাহার সুপক্ক শিখাটি ঝাড়িতেছিল, সেই অবস্থায় হাজিরিক্ষেত্রে দেখা দিল। জমাদার সংক্ষেপে কতক বা হুকুম পড়িয়া, কতক ইঙ্গিতে, জইণ্টসাহেবের পরোয়ানার অর্থ তাহাকে জানাইতে না জানাইতে সে ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল। অতএব সেদিন চৌকীদারেরা ছাপার ফারমে লিখিত একুশটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া সভয়ে দেখিল, আর একটা উৎকট রকমের সওয়াল তাহাদের জবাবের প্রতীক্ষা করিতেছে।

গ্রামে মোট কয়টা ঘোড়া এবং গাধা আছে, এ খবর একরকম করিয়া বলা যায়, কিন্তু কোন্ ঘোড়াটা কত উঁচু, সহসা বলিয়া সরকারের দুয়ারে কে ফাঁদে পড়িবে? চৌকীদারেরা একবাক্যে আপত্তি করিয়া বসিল, একহপ্তা সময় না পাইলে তাহারা সে কথার জবাব দিতে অক্ষম।

জমাদারকিষণসহায়ের মতে এ বেয়াদবির মাফ্‌ নাই। শিকারী বিড়াল অতর্কিতভাবে যেমন মূষিকের উপর লাফাইয়া পড়ে, সেই ভাবে সহসা তিনি চৌকীদারমহলে পড়িলেন এবং পার্শ্বস্থিত বেত্রখণ্ড জনকয়েক চৌকীদারের পিঠে ও হাতে এরূপ জোরে জোরে বর্ষণ করিলেন যে, তাহাতে তাঁহার নিজের কোমল হাতখানিতে পর্য্যন্ত বেদনার সঞ্চার হইল—এবং তিনি ও তাঁহার অগ্রগামী দোদুল্যমান উদর যুগপৎ হাঁফাইতে হাঁফাইতে যে ভাবে সেই সুদীর্ঘ বারান্দা পরিক্রমণ করিতেছিলেন, চিত্রকর কেহ উপস্থিত থাকিলে তাহার সৌন্দর্য্যমর্ম্ম বুঝিত!

যাহার চোটে ভূত ভাগে এবং সাপের বিষ উড়িয়া যায়, তাহাতে যে গরিব চৌকীদারদের দ্বিধাশূন্য করিয়া দিবে, ইহা আর বেশী কথা কি? বাস্তবিক মেঘুসিংয়ের

সুপরামর্শে কিষণজী সেইদিনই বেলা ১২টার ভিতর বিলাসপুর-থানাভুক্ত ৫৪৯ গ্রামের মধ্যে বার-আনা মৌজার অশ্ব এবং অশ্বতরের সংবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন। যে চারি-আনা খবর বাকী ছিল, পরদিন মঙ্গলবার প্রাতে ৮টা বাজিতে না বাজিতে তাহারও কিনারা হইয়া গেল। কেন না, সোমবার মধ্যাহ্নে থানাপ্রাঙ্গণে যে ঝড় বহিয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে না হইতে ভুক্ত-ভোগী সহযোগীদের মুখে মুখে প্রবাহিত হইয়া তাহা গ্রাম্য-চৌকীদার-গৃহমাত্রকেই সবেগে আন্দোলিত করিয়াছিল। কাজেই নয়টার আমলে শয্যাত্যাগ করিয়া কিষণ-সহায় বাহিরে আসিলে, মেঘুসিং যখন সগর্ব্বে পক্ককেশ মাথাটি নাড়িয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিল যে, তিন-দিন কোন্ ছার, চারিপ্রহরের ভিতরই এমন পরোয়ানার কিনারা হইতে পারে, তখন তিনি সকৃতজ্ঞহৃদয়ে কথাটা মানিয়া লইলেন।

মেঘুসিং লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু কিষণসহায় হিন্দী ও ফারসীতে 'লায়েক' ব্যক্তি, সহজেই একটা সলার অঙ্কুর মঙ্গলবার প্রাতে আসন গ্রহণ করিতে না করিতে তাঁহার মাথায় গজা-ইয়া উঠিল। জইণ্টসাহেব রিপোর্ট চাহি-য়াছেন তিন দিনে, কিষণসহায় যদি আজ্ই সন্ধ্যার ডাকে তাহা পাঠাইয়া আপন 'খয়েরখাই' জাহির করিতে পারে, তবে তাহার 'তরক্কির' পথ প্রশস্ত হয় কি না? বিশেষত তাহার স্বসম্পর্কীয় বলদেও-সহায় জাইণ্টসাহেবের এজলাসে কোর্টবাবু; রিপোর্ট পড়িয়া দুটো তারিফ যে তিনি করিবেনই, ইহা ত জানা কথা। জমাদারসাহেব এমন সুযোগ উপেক্ষা করিবার পাত্র নহেন, সন্ধ্যার ডাকে রিপোর্ট চলিয়া গেল। সেই সঙ্গে কোর্ট সব্ ইনস্পেক্টার 'চাচাসাহেব'কে একখানি চিঠিও তিনি লিখিতে ভুলিলেন না।

জইণ্টসাহেব বুধবার প্রাতে বাঙালী হেড্ক্লার্ক বাবুর আনীত ডাক দেখিতেছেন ও তাঁহার বাঙ্লা পরীক্ষা দিবার সুবিধা হইবে বলিয়া সেই 'ভাষায় মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় কোর্টবাবু সেখানে হাজির হইয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিলেন। এটা ওটা পেসের পর কিষণ-সহায়ের রিপোর্ট তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহ সাহেববাহাদুরের নেত্রপথে এরূপ ভাবে ধরিলেন, যাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট 'অপ্সর' স্বতই খুসী হইয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের 'তরক্কি'র জন্য 'কোসিস্' করিতে পারেন। জইণ্টসাহেব সম্প্রতি কাঁয়েতি হিন্দীতে পাস্ করিয়াছেন, রিপোর্টটা নিজেই পড়িয়া উচ্চহাস্য সংবরণ করিলেন। কোর্টবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রিপোর্ট ঠিক কি না এবং "বহুৎ ঠিক হ্যায়—"উত্তর পাইয়া গর্দ্দভ, ঘোড়া ও টাটুর তালিকা তাহাকে পড়িতে বলিলেন। কোর্টবাবু স্মিতমুখে পড়িলেন, "গাধা ৪২, ঘোড়া ১২০, টাটু ৯২।" হেড্ক্লার্কের দিকে ফিরিয়া সাহেব গম্ভীরমুখে বাঙ্লায় বলিলেন, "গাধার নম্বর ঠিক না আছে!" বুঝিয়া কোর্টসাহেব মৃদু প্রতিবাদের জন্য বলিতেছিলেন, "জনাব আলি!"—জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট উচ্চ হাসিয়া

বলিলেন—"আর দুই নম্বর উহাটে যোগ করিয়া ডাও, যে লিষ্ট বানাইয়াছে ও যে টাহাটে াপ য় করে!" হেডক্লার্ক বাবু ওষ্ঠে মৃদুহাস্য চাপিয়া মুখ অবনত করিলেন। কোর্টবাবু একটু একটু বাঙালা বুঝিতেন, তিনিও মাথা চুলকাইয়া দৃষ্টি নত করিলেন।

মহাকর্ষণ।

আচার্য্যপ্রবর-নিউটন-প্রচারিত মহাকর্ষণ-সিদ্ধান্তটি বিদ্যালয়ের পণ্ডিতমহাশয়ের নির্ম্মম বেত্রভীতিতে আমরা অতি শৈশবেই গলাধঃকরণ করিয়া রাখিয়াছি। তার পর গতিবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিবিধগ্রন্থে তাহার সহিত বিশেষ পরিচিত হইয়াছি এবং বিশাল নক্ষত্র-জগতের ধাবন হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণারও চালচলন এই মহাকর্ষণ-তত্ত্বের সাহায্যে বুঝা ও বুঝান হইয়া থাকে, তাহা আমরা দেখিতেছি। কিন্তু জড়পদার্থে সেই মহাকর্ষণশক্তি আসিল কোথা হইতে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ইষ্টক আকাশে নিক্ষেপ করিলে, তাহা শেষকালে পড়ে কোথায়, তাহা মূর্খ এবং পণ্ডিত উভয়েই বলিতে পারে। মূর্খও বলিবে, পৃথিবীর টানে সেটা মাটিতেই পড়িবে। পণ্ডিতও অতি গম্ভীরভাবে সেই কথাটাই বড় করিয়া বলেন। তার পর জিজ্ঞাসা কর,—পৃথিবীর এই টান আসিল কোথা হইতে? তখন পণ্ডিতও যেমন, মূর্খও তেমন,—উভয়েই নিরুত্তর।

মহাকর্ষণের ন্যায় একটা বৃহৎ ব্যাপারের উৎপত্তির কারণ জানিবার জন্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ খুঁজিলে, তাহাতে কেবলমাত্র দুইটি অনুমানমূলক কারণের উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এই দুইটির মধ্যে একটি অধ্যাপক হেলম্হোজ্ ও লর্ড কেল্‌ভিন্ প্রবর্ত্তিত সেই আবর্ত্ত-সিদ্ধান্তের (Vortex theory of matter) সাহায্যে আবিষ্কৃত এবং অপরটি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লেসাজের (Le Sage) কতকগুলি আজগুবি যুক্তি দ্বারা গঠিত।

অধ্যাপক লেসাজের কল্পিত সিদ্ধান্তটির স্থূল মর্ম্ম এই যে,—অনন্ত বিশ্বটার সর্ব্বাংশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু নিয়তই এক

একটি নির্দ্দিষ্ট সরল পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাদের গতির দিকের স্থিরতা নাই,—সকল দিকে ইইহারা প্রচণ্ডগতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং জড়পদার্থমাত্রেই এই বেগবান্ অণুসাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া নিয়তই সেই সকল অণুদ্বারা আহত হইতেছে। লেসাজ বলেন, ঐ সকল আঘাতদ্বারা জড়পদার্থে যে বেগের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই আমরা আকর্ষণবেগ বলি। সমগ্র জগতে যদি একটিমাত্র জড়পিণ্ডের অস্তিত্ব থাকিত, তবে আমরা তাহাতে মহাকর্ষণের কোনই বিকাশ দেখিতে পাইতাম না, কারণ পূর্ব্বোক্ত অণুপ্রবাহের ঘা লাগিয়া তাহাতে যে গতি উৎপন্ন হইত, তাহার ঠিক বিপরীত পার্শ্বেও অণুসংঘাতে ঠিক বিপরীত গতির উৎপত্তি হইত, কাজেই দুই সমান ও বিপরীত গতিদ্বারা পদার্থে কোন বেগই উৎপন্ন হইতে পারিত না। কিন্তু একাধিক দ্রব্যের অস্তিত্ব কল্পনা করিলে, অন্যরূপ দেখা যায়। দুইটি দীপশিখার মাঝখানে সেই দীপদ্বয়ের সমসূত্রে যদি দুটি গোলা রাখা যায়, তাহা হইলে কি হয়? গোলার যে ভাগটা দীপের দিকে, সে ভাগটা আলোকিত ও অন্য ভাগটা অন্ধকারময় হয়; কেবল তাহাই নয়, পাশের গোলারও গায়ে পরস্পরে ছায়া ফেলে। এই আলোককে যদি অণুস্রোত মনে করা যায়, তবে দেখা যাইবে, দুই দিক্ হইতে বিপরীতগামী অণুস্রোত আসিলে দুই গোলার দুই পিঠে ঘা লাগিবে, অন্য পিঠে লাগিবে না; আলোককে প্রতিরোধ করিয়া তাহারা পরস্পরের যে পিঠে ছায়া ফেলিত, সেই পিঠে ধাক্কাকেও আসিতে দিবে না—সুতরাং তাহারা উভয়েই এক পিঠে ধাক্কা খাইয়া চলিতে থাকিবে—অবশেষে পরস্পরের গায়ে আসিয়া পড়িবে। সুতরাং লেসাজের মতে, পদার্থে মহাকর্ষণশক্তির একটা পৃথক্ অস্তিত্ব নাই,—আছে কেবল সেই সর্ব্বদিক্‌গামী অসংখ্যক অতীন্দ্রিয় অণুরাশি এবং তাহার অজস্র-ধাক্কা-জনিত জড়পদার্থের গতি।

লেসাজের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি কেবল অনুমান ও কল্পনা দ্বারা গঠিত। এই সিদ্ধান্তপ্রচারের পর প্রায় এক শতাব্দীকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত লেসাজ বা তাঁহার শিষ্যগণমধ্যে কেহই পূর্ব্বোক্ত অনুমানের পোষক কোন প্রমাণই দেখাইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় মহাকর্ষণের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে লেসাজের উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

এখন আবর্ত্তসিদ্ধান্তীদিগের মতে মহাকর্ষণের উৎপত্তির কারণ কি, দেখা যাউক। এই কারণটা বুঝিতে হইলে, আবর্ত্তসিদ্ধান্তটা কি, তাহা মোটামুটি জানা আবশ্যক। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড কেল্‌ভিন্ বলেন যে,—বিশ্বব্যাপী যে ঈথরের কম্পনাদি দ্বারা তাপ, আলোক ও চৌম্বকশক্তি ইত্যাদির বিকাশ দেখা যায়, তাহারই অবস্থাবিশেষ দ্বারা আকর্ষণাদি ধর্ম্মসহ জড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। চা-পূর্ণ পেয়ালার মধ্যে চামচ্ ঘুরাইলে চায়ে যে প্রকারে আবর্ত্ত জন্মে,—সেইরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে ঈথরের মধ্যে ঘূর্ণা জন্মিলে, ঈথরের সেই ঘূর্ণাদশাকেই বলে জড়পদার্থ।

পদার্থের আবর্ত্তনগতির অনেক তথ্য প্রাচীন পণ্ডিতগণের জানা ছিল, কিন্তু তৎসাহায্যে যে মহাকর্ষণশক্তির উৎপত্তি-তত্ত্বাবিষ্কার সম্ভবপর, এ কথা তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মনে স্থান পায় নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য হেলম্‌হোজ্‌ আবর্ত্তনগতিসম্বন্ধীয় কতকগুলি জটিল ব্যাপারের মীমাংসা জন্য কিছুদিন গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তখন সেই সকল ব্যাপারের মীমাংসার সহিত আবর্ত্তনগতি-সম্বন্ধীয়ও কয়েকটি নূতন তথ্য তিনি প্রচার করেন। সেই সময়ে ঘূর্ণাগতির সঙ্গে মহাকর্ষণশক্তির কোন একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়া কয়েকজন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন। গণিতসাহায্যে হেলম্‌হোজ্‌ স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন,—বহিস্থ বায়ু ইত্যাদির সংঘর্ষজাত বাধা না থাকিলে, যে কোন পদার্থে একবার ঘূর্ণাগতি উৎপন্ন করিতে পারিলে, সেই আবর্ত্তিত পদার্থের তাৎকালিক গঠন ও আবর্ত্তবেগ অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমভাবেই থাকিয়া যাইবে। আবর্ত্তনগতির এই অদ্ভুত বিশেষত্ব এবং ইহার আরো দুই একটি শক্তির কথা শুনিবামাত্রই, তদ্দ্বারা হয় ত ভবিষ্যতে জড়োৎপত্তি-সমস্যারও মীমাংসা হইবে বলিয়া লর্ড কেল্‌ভিনের মনে একটা সংস্কার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের সত্যতাপ্রতিপাদক যুক্তিগুলির মধ্যে পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণের একান্ত অভাব দেখিয়া, তিনি কেবল গণিতমূলক প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, হঠাৎ সেই মনোগত ভাব প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। এদিকে হেলম্‌হোজের অদ্ভুত আবিষ্কারবিবরণী দেখিয়া, অধ্যাপক টেট্‌ তাহার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সংগ্রহের জন্য নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং বায়ুর ঘূর্ণাগতি উৎপাদনের বহুচেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া শেষে বিস্কুটের ডালাখোলা বাক্সের ন্যায় একটা ছোট বাক্সের কোন এক পার্শ্বে একটি ছিদ্র করিয়া এবং তাহার ঠিক বিপরীত দিকে খোলা পার্শ্বে একখণ্ড স্থূল কাপড়ের আবরণ সংলগ্ন করিয়া, তিনি বায়ুর ঘূর্ণাগতি উৎপাদনের একটি অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই সামান্য যন্ত্রের বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রান্তটিতে ধীরে ধীরে চাপ দিলে, প্রত্যেক চাপ প্রয়োগে আবদ্ধ বায়ুর যে অংশ সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়া বহির্গত হয়, তাহা ঘূর্ণাগতি প্রাপ্ত হয়, অধ্যাপক টেট্‌ এই তথ্য সর্ব্বপ্রথমে এই সময়ে জগতে প্রচার করেন; এবং উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন বায়ুর অদৃশ্য আবর্ত্তন প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য, যন্ত্রমধ্যস্থিত বায়ুতে ক্লোরাইড এমনিয়া (Chloride of Ammonia) বাষ্প মিশ্রিত করিয়া দিবার যে পদ্ধতি আছে, তাহাও অধ্যাপক টেট্‌ দ্বারা এই সময়ে আবিষ্কৃত হয়।

হেলম্‌হোজের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুকে ঘূর্ণাগতিসম্পন্ন করিবার উল্লিখিত উপায়টি উদ্ভাবিত হওয়ায় লর্ড কেল্‌ভিনের গবেষণার খুব সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। যন্ত্রের উদ্ভাবক অধ্যাপক টেটের সহিত পরীক্ষা করিয়া, অধ্যাপক হেলম্‌হোজের গণনালব্ধ সকল ধর্ম্মই আবর্ত্তিত বায়ুতে তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত ইহার আরো কতকগুলি অদ্ভুত ধর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত

হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় পরীক্ষাগারে প্রচুর ঘূর্ণি বায়ু উৎপন্ন করিলে,—সেই দ্রুত ঘূর্ণায়মান অঙ্গুরীয়কগুলিতে অনুদ্যম (Inertia), আকর্ষণ ও স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি জড়প্রসিদ্ধ সকল ধর্ম্মই, ইঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। উক্ত পরীক্ষাগুলি দ্বারা কেল্‌ভিনের মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ঈথরে একবার আবর্ত্তনগতি উৎপন্ন হইলে, ঘর্ষণাদিজনিত বাধার অভাবে সেই আবর্ত্তগুলি অনন্তকাল ঈথরসাগরে ভাসমান থাকিয়া জগতে জড়ধর্ম্মের বিকাশ করিতে পারে। এই বিশ্বাসের উপরই লর্ড কেল্‌ভিন তাঁহার প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া একদল বলিতেছেন,—এই জগতে যত জড়পদার্থ দেখিতেছ, তাহাদের সকলেরই সূক্ষ্মতম অংশগুলি সর্ব্বদেশব্যাপী ঈথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণন ছাড়া আর কিছুই নহে; আর জড়পদার্থমাত্রেই মহাকর্ষণ-শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম দেখা যায়, তাহাও সেই ঈথরীয় ঘূর্ণনের স্বভাবসিদ্ধ স্থায়ী ধর্ম্ম। ঈথরপদার্থ সহজেই ঘর্ষণবাধার অতীত, সুতরাং কোনকালে উক্ত আবর্ত্তনগুলির লয় নাই, কাজেই জড়পদার্থ ও তাহার স্থায়ী ধর্ম্মগুলির ধ্বংস নাই। *

প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধ্যাপক ইয়ঙ্‌ কর্ত্তৃক সেই আলোকোৎপাদক ঈথর আবিষ্কারের পর হইতেই, যেন সকল সিদ্ধান্তগুলিরই গতি ঈথরের দিকে চালিত হইতেছে,—আধুনিক সিদ্ধান্তের মতে বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি এবং তাপালোক প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক ব্যাপারমাত্রই ঈথর দ্বারা উৎপন্ন। আবার দেখা যাইতেছে, আবর্ত্তসিদ্ধান্তের মতে জড় ও জড়ধর্ম্ম সেই ঈথরেরই অবস্থাবিশেষদ্বারা উৎপন্ন। পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া কেবল কতকগুলি সম্ভবপর যুক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আবর্ত্তবাদিগণ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন কি না, তাহা আমাদের ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির বিচার্য্য নয়। তবে সিদ্ধান্তটি যে কতদূর আনুমানিক, তাহা স্বয়ং আবিষ্কারক মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি হইতে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার উইলিয়ম্‌ প্রসঙ্গক্রমে লর্ড কেল্‌ভিনকে আবর্ত্তসিদ্ধান্তসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, কেল্‌ভিন স্পষ্ট বলিয়াছিলেন:—The Vortex theory is only a dream. Itself unproven, it can prove nothing and any speculations founded upon it are mere dreams about a dream.

কাজেই দেখা যাইতেছে, নিউটনের মহাকর্ষণসিদ্ধান্ত আবিষ্কারের পর হইতে

* অধ্যাপক ষ্টুয়ার্ট ও টেট্‌ বলেন, আমরা এ কাল পর্য্যন্ত ঈথরকে যে একবারে ঘর্ষণবাধাহীন বলিয়া আসিতেছি, তাহা ঠিক নয়। ঈথরেরও বাধা জন্মাইবার শক্তি আছে; কাজেই সেই বাধা দ্বারা জড়পদার্থের উৎপাদক আবর্ত্তনগুলির লয় অবশ্যম্ভাবী, এবং সঙ্গে সঙ্গে জড়ের ধ্বংসও নিশ্চিত।

সহস্র অগ্নিপরীক্ষায় তাহার ধ্রুবত্বের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু উপরোক্ত দুইটি সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়া সত্বেও সেই বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির উৎপত্তি আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা।*

রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত বৃহৎ কাব্যের মধ্যে আগাগোড়া যেন একটা তুফান উঠিয়াছে। জনসমুদ্র, কর্ম্মসমুদ্র, চিত্তসমুদ্র, একেবারে আকাশপাতাল উঠাপড়া করিতেছে। কেবল দ্বন্দ্ব এবং বিক্ষোভ এবং বৈচিত্র্য!

মহাভারতকে কোন ঘরের-কোণে-বসা শিল্পীর কারুকার্য্য বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, যেন তখনকার সেই স্তব্ধ অতীতকাল কবির প্রতিভাবলে ফুলিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে যত কথা ছিল—যুগান্তরীণ স্বর্গমর্ত্ত্যের, অরণ্যনগরের, দেবমনুষ্যের, তাপস ও বীরমণ্ডলীর যত পাপপুণ্য, যত সুখদুঃখ, সমস্ত ফেনাইয়া ফেনাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছে।

কাল আপনার বিশাল কার্য্য আচ্ছন্নভাবে সম্পন্ন করে। বর্ত্তমান কাল বসিয়া বসিয়া কি করিতেছে, তাহা আমরা কিই বা জানি! তাহার অসংখ্য অদৃশ্যশক্তি দিকে দিকে, ঘরে ঘরে, কত লক্ষ সূতায় কি জাল গাঁথিতেছে, তাহা কে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পায়? মহাভারত যেন একটা যুগের সেই প্রকাণ্ড কালের ঢাকাটা উপর হইতে তুলিয়া লইয়াছে—একটি বৃহৎ-জনতা চিরকালের জন্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেছে—আর তাহার লুকাইবার জো নাই, মরিবার জো নাই; তাহার চিন্তা-চেষ্টা-চরিত্র সমস্ত অনাবৃত।

এই মহা-ইতিহাসের ভিড়ের মধ্য হইতে কালিদাসে হঠাৎ আমরা একান্ত নিভৃতে আসিয়া উপস্থিত হই। এই কাব্যভবনটি শিল্পীর নিজের হাতে রচিত সৌন্দর্য্যের পর্দ্দা দিয়া ঘেরা,—ইহা কবিপ্রতিভার অন্তঃপুর—ঐতিহাসিক কাল ইহার মধ্যে তাহার দলবল লইয়া প্রবেশ করিতে পায় নাই। কোথায় মহাপ্রতাপশালী বিক্রমাদিত্য, কোথায় যবনের সহিত ভারতবর্ষের সংঘর্ষ, কোথায় শকেদের সঙ্গে হিন্দু রাজার যুদ্ধ-বিগ্রহ,—কালিদাসের পুষ্পিততরুচ্ছায়াঘন কাব্যনিকুঞ্জে তাহার কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

পুরাণ-ইতিহাসের কথা কালিদাসের কাব্যে যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু তাহারা কেমন ভাবে আছে? সূর্য্যের আলোক

* গত ২৩শে অগ্রহায়ণ মজুমদার লাইব্রেরীর অন্তর্গত আলোচনাসমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত।

যখন চন্দ্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আসে, তখন সে যেমন আপনার তাপ, আপনার মহিমা রাখিয়া আসে, সে যেমন সুপ্তরাত্রিকে কমনীয় করে, দিবসের কর্ম্মক্ষেত্রকে জাগাইয়া তোলে না—কালিদাসের কাব্যেও পুরাণ-ইতিহাস সেইরূপ কেবল শোভা দেয়, জীবন দেয় না। রঘুবংশের রাম-লক্ষ্মণ, অজ-দশরথ আমাদের কাছে আপনাদের কোন একটা নূতন পরিচয় আনিয়া উপস্থিত হয় নাই। তাহারা সারি সারি ছবি—কেবল সাজে সজ্জায়, উপমায় অলঙ্কারে, সূক্ষ্ম গুণপনায় সাহিত্যসৌধের ভিত্তি সাজাইয়া রাখিয়াছে। কালিদাসের কাব্য উত্তরঙ্গ কর্ম্মসমুদ্রের কাব্য নহে, তাহা নিভৃত ভাবরসসম্ভোগের কাব্য।

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া পাঠক টেনিসনের কলানিকেতনের কথা (Palace of Art) স্মরণ করিবেন। সুখদুঃখের, কাজকর্ম্মের সংসারকে দূরে রাখিয়া, যে বিলাসী নির্জ্জনে কলাসৌন্দর্য্যসম্ভোগেই নিজের আত্মাকে নিবিষ্ট রাখেন, টেনিসন্ তাঁহাকে ধিক্কার দিয়াছেন। কালিদাস কি সেই সৌন্দর্য্য-লোলুপ ভোগসুখবিলাসেরই কবি?

আপাতত সেইমতই মনে হয়। কিন্তু এইখানে এ কথা বলিয়া রাখা ভাল, আমরা ধর্ম্মনীতির বিচারে বসি নাই। সৌন্দর্য্যমাত্রই মানুষের মন হইতে সঙ্গীত টানিয়া আনিতে চায়। কবি সেই চেষ্টার উপলক্ষ্যমাত্র। ভোগসুখের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের উপকরণ আছে, সেও সাহিত্যে গীতধ্বনি জাগাইয়া তোলে;—মানুষের মনকে কোন্ সমালোচকের ভ্রূকুটি মুখচাপা দিয়া রাখিবে? কান্তার তরল কটাক্ষের সম্মুখে মানুষ কবিকণ্ঠস্বরের সন্ধান করিয়া ফিরে, আবার দেবমন্দিরের দ্বারেও কবির বীণার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাই সাহিত্যে সকল শ্রেণীর কাব্যই স্বস্থানে স্বপ্রধান, কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না।

কালিদাস একান্তই সৌন্দর্য্যসম্ভোগের কবি, এ মত লোকের মধ্যে প্রচলিত। সেইজন্য লৌকিক গল্পে-গুজবে কালিদাসের চরিত্র কলঙ্কে মাখানো। এই গল্পগুলিই জনসাধারণকর্ত্তৃক কালিদাসের কাব্যসমালোচনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে কোন বিষয়ে আস্থাস্থাপন করা যাক্, সাহিত্যসমালোচনা-সম্বন্ধে সেই অন্ধের উপরে অন্ধ নির্ভর করা চলে না।

মহাভারতের মধ্যে যে একটা বিপুল কর্ম্মের আন্দোলন দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটা বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষ ভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্ম্মেই কর্ম্মের চরম সমাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্য্য-বীর্য্য, রাগদ্বেষ, হিংসাপ্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে। রামায়ণেও তাহাই;—পরিপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়, করায়ত্ত সিদ্ধি স্খলিত হইয়া পড়ে,—সকলেরই পরিণামে পরিত্যাগ। অথচ এই ত্যাগে, দুঃখে, নিষ্ফলতাতেই কর্ম্মের মহত্ত্ব ও পৌরুষের প্রভাব রজতগিরির ন্যায় উজ্জ্বল অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে।

সেইরূপ কালিদাসের সৌন্দর্য্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম্ম এবং

বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্য্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্য্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় নাই—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।

কালিদাস কোথায় থামিয়াছেন এবং কোথায় থামেন নাই, সেইটে এখনকার আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আলোচনা করিবার বিষয়। পথের কোন একটা অংশে থামিয়া তাঁহাকে বিচার করা যায় না, তাঁহার গম্যস্থান কোথায়, তাহা দেখিতে হইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে দুষ্মন্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সেইখানে ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে য়ুরোপীয় কবি শকুন্তলা-নাটকের যবনিকা ফেলিতেন। শেষ অঙ্কে স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে দৈবক্রমে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার যে মিলন হইয়াছে, তাহা য়ুরোপের নাট্যরীতি অনুসারে অবশ্য-ঘটনীয় নহে। কারণ, শকুন্তলানাটকের আরম্ভে যে বীজবপন হইয়াছে, এই বিচ্ছেদই তাহার চরম ফল। তাহার পরেও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন বাহ্য উপায়ে দৈবানুগ্রহে ঘটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। নাটকের অন্তর্গত কোন ঘটনাসূত্রে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কোন ব্যবহারে এ মিলন ঘটিবার কোন পথ ছিল না।

তেমনি, এখনকার কবি কুমারসম্ভবে হত-মনোরথ পার্ব্বতীর দুঃখ ও লজ্জার মধ্যে কাব্য শেষ করিতেন। অকালবসন্তে রক্তবর্ণ অশোক-কুঞ্জে মদনদাহনের দীপ্ত দেবরোষাগ্নিচ্ছটায় নতমুখী লজ্জারুণা গিরিরাজকন্যা তাঁহার সমস্ত ব্যর্থ পুষ্পাভরণ বহিয়া পাঠকের ব্যথিত হৃদয়ের করুণ রক্তপদ্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেন,—অকৃতার্থ প্রেমের বেদনা তাঁহাকে চিরকালের জন্য ঘেরিয়া থাকিত। এখনকার সমালোচকের মতে এইখানেই কাব্যের উজ্জ্বলতম সূর্য্যাস্ত, তাহার পরে বিবাহের রাত্রি অত্যন্ত বর্ণচ্ছটাহীন।

বিবাহ প্রাত্যহিক সংসারের ভূমিকা; তাহা নিয়মবদ্ধ সমাজের অঙ্গ। বিবাহ এমন একটি পথ নির্দ্দেশ করে, যাহার এক-মাত্র সরল লক্ষ্য, যে পথে প্রবল প্রবৃত্তি দস্যুতা করিতে প্রবল নিষেধ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য এখনকার কবিরা বিবাহব্যাপারকে তাঁহাদের কাব্যে বড় করিয়া দেখাইতে চান না। যে প্রেম উদ্দামবেগে নর-নারীকে তাহার চারিদিকের সহস্র বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাদিগকে সংসারের চিরকালের অভ্যস্ত পথ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়,—যে প্রেমের বলে নর-নারী মনে করে, তাহারা আপনাতেই আপ-নারা সম্পূর্ণ, মনে করে যে, যদি সমস্ত সংসার বিমুখ হয়, তবু তাহাদের ভয় নাই—অভাব নাই, যে প্রেমের উত্তেজনায় তাহারা ঘূর্ণ-বেগে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত গ্রহের মত তাহাদের চারিদিক্ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের মধ্যেই নিবিড় হইয়া উঠে, সেই প্রেমই প্রধানরূপে কাব্যের বিষয়।

কালিদাস অনাহূত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করেন নাই—তাহাকে তরুণলাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া

তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন, সেই খানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা। মহাভারতের সমস্ত কর্ম্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে, তেমনি কুমারসম্ভবের সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গলমিলনেই পরিসমাপ্ত।

কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলাকে একত্রে তুলনা না করিয়া থাকা যায় না। দুটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে একই। দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পন্ন, অসম্পূর্ণ হইয়া, আপনার বিচিত্রকারুখচিত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ,—তাহা সৌন্দর্য্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরল নির্ম্মল বেশে কল্যাণের শুভ্রদীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

স্পর্দ্ধিত মদন যে মিলনের কর্ত্তৃত্বভার লইয়াছিল, তাহার আয়োজন প্রচুর। সমাজ-বেষ্টনের বাহিরে দুই তপোবনের মধ্যে অহেতুক আকস্মিক নবপ্রেমকে কবি যেমন কৌশলে, তেমনি সমারোহে, সুন্দর অবকাশ দান করিয়াছেন।

যতী কৃত্তিবাস তখন হিমালয়ের প্রস্থে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। শীতল বায়ু মৃগনাভির গন্ধ ও কিন্নরের গীতধ্বনি বহন করিয়া গঙ্গাপ্রবাহসিঞ্চিত দেবদারুশ্রেণীকে আন্দোলিত করিতেছিল। সেখানে হঠাৎ অকালবসন্তের সমাগম হইতেই দক্ষিণের দিগ্বধূ সদ্যঃপুষ্পিত অশোকের নবপল্লবজাল মর্ম্মরিত করিয়া আতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ভ্রমরযুগল এককুসুমপাত্রে মধু খাইতে লাগিল এবং কৃষ্ণসার মৃগ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষী হরিণীর গাত্র শৃঙ্গদ্বারা ঘর্ষণ করিল।

তপোবনে বসন্তসমাগম! তপস্যার সুকঠোর নিয়মসংযমের কঠিন বেষ্টনমধ্যে হঠাৎ প্রকৃতির আত্মস্বরূপবিস্তার! প্রমোদবনের মধ্যে বসন্তের বাসন্তিকতা এমন আশ্চর্য্যরূপে দেখা দেয় না।

মহর্ষি কণ্বের মালিনীতীরবর্ত্তী আশ্রমেও এইরূপ। সেখানে হুত হোমের ধূমে তপোবনতরুর পল্লবসকল বিবর্ণ, সেখানে জলাশয়ের পথসকল মুনিদের সিক্তবল্কল-ক্ষরিত জলরেখায় অঙ্কিত এবং সেখানে বিশ্বস্ত মৃগসকল রথচক্রধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ নির্ভয় কৌতূহলের সহিত শুনিতেছে। কিন্তু সেখান হইতেও প্রকৃতি দূরে পলায়ন করে নাই,—সেখানেও কখন্ রুক্ষবল্কলের নীচে হইতে শকুন্তলার নবযৌবন অলক্ষ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া দৃঢ়পিনদ্ধ বন্ধনকে চারিদিক্ হইতে ঠেলিতেছিল। সেখানেও বায়ুকম্পিত-পল্লবা-ঙ্গুলিদ্বারা চূতবৃক্ষ যে সঙ্কেত করে, তাহা সম্পূর্ণ সামমন্ত্রের অনুগত নহে এবং নবকুসুমযৌবনা নবমালিকা সহকারতরুকে বেষ্টন করিয়া প্রিয়মিলনের ঔৎসুক্য প্রচার করে।

চারিদিকে অকালবসন্তের অজস্র সমারোহ, তাহারই মাঝখানে গিরিরাজনন্দিনী কি মোহনবেশেই দেখা দিলেন। অশোক-

কর্ণিকারের পুষ্পভূষণে তিনি সজ্জিতা, অঙ্গে বালারুণবর্ণের বসন, কেসরমালার কাঞ্চী পুনঃপুন স্রস্ত হইয়া পড়িতেছে এবং ভয়-চঞ্চললোচনা গৌরী ক্ষণে ক্ষণে লীলাপদ্ম সঞ্চালন করিয়া দুরন্ত ভ্রমরগণকে নিবারণ করিতেছেন।

অন্যদিকে দেবদারুদ্রুমবেদিকার উপরে শার্দ্দূলচর্ম্মাসনে ধূর্জ্জটি ভুজঙ্গপাশবদ্ধ জটা-কলাপ এবং গ্রন্থিযুক্ত কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া ধ্যানস্তিমিতলোচনে অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের মত আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

অস্থানে অকালবসন্তে মদন এই দুই বিসদৃশ পুরুষ-রমণীর মধ্যে মিলনসাধনের জন্য উদ্যত ছিলেন।

কণ্বাশ্রমেও সেইরূপ। কোথায় বল্কল-বসনা তাপসকন্যা, এবং কোথায় সসাগরা ধরণীর চক্রবর্ত্তী অধীশ্বর! দেশকাল-পাত্রকে মুহূর্ত্তের মধ্যেই এমন করিয়া যে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়, সেই মীনকেতনের যে কি শক্তি, কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন।

কিন্তু কবি সেইখানেই থামেন নাই। এই শক্তির কাছেই তিনি তাঁহার কাব্যের সমস্ত রাজকর নিঃশেষ করিয়া দেন নাই। তিনি যেমন ইহার হঠাৎ জয়সংবাদ আনিয়াছেন, তেমনি পরক্ষণেই ইহার হঠাৎ পরাভব প্রচার করিয়াছেন। তিনি অন্য দুর্জ্জয় শক্তি দ্বারা পূর্ণতর চরম মিলন ঘটাইয়া তবে কাব্য বন্ধ করিয়াছেন। স্বর্গের দেবরাজের দ্বারা উৎসাহিত এবং বসন্তের মোহিনী শক্তির দ্বারা সহায়বান্ মদনকে কেবলমাত্র পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নাই, তাহার স্থলে যাহাকে জয়ী করিয়াছেন, তাহার সজ্জা নাই, সহায় নাই, তাহা তপস্যায় কৃশ, দুঃখে মলিন। স্বর্গের দেবরাজ তাহার কথা চিন্তাও করেন নাই।

যে প্রেমের কোন বন্ধন নাই, কোন নিয়ম নাই; যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম-দুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্ত্তৃ-শাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। শকুন্তলার কাছে যখন আতিথ্যধর্ম্ম কিছুই নহে, দুষ্যন্তই সমস্ত—তখন শকুন্তলার সে প্রেমে আর কল্যাণ রহিল না। যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেইজন্যই সে প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না। যে আত্ম-সংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকের ছোট এবং বড়, আত্মীয় এবং পর, কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়-জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গলমাধুর্য্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে-মানবে কেহ আঘাত করে না, আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু যাহা যতীর তপোবনে তপো-ভঙ্গরূপে, গৃহীর গৃহপ্রাঙ্গণে সংসারধর্ম্মের

অকস্মাৎ পরাভবস্বরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা ঝঞ্ঝার মত অন্যকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও নিজেই বহন করিয়া আনে।

কিন্তু এ তত্ত্বে কাব্যের কোন্ প্রয়োজন! কর্ম্মফলে কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, তাহা যে ভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচ্য, সে ভাবে কবির আলোচ্য নহে। বস্তুত ফলাফলের বিচারভার কবির উপর নাই। কবি বলিতেছেন, যখন,

"শরদচন্দ্র, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ,"

তখন বনের মধ্যে রাধিকাকে লইয়া শ্যামচন্দ্রের দুলিতে ইচ্ছা হইল। চিকিৎসক বলিতে পারেন, ইহার ফল ভাল নয়—শরৎকালের হিমে নিশ্চয় জ্বর, এবং ইহার আরম্ভে যতই মাধুর্য্য থাকুক্, ইহার পরিণামে কুইনীনের তিক্ততা—কিন্তু সে বিচারে কবিকে ফিরাইতে পারে না। যতক্ষণ আকাশে শরৎচন্দ্র এবং বনে পুষ্পগন্ধ আছে, ততক্ষণ ম্যালেরিয়ার আশঙ্কায় কাব্যের রসভঙ্গ হইবার কথা নাই।

কালিদাসও ভাল প্রেম ও মন্দ প্রেম লইয়া ঐহিক বা পারত্রিক লাভ-ক্ষতির হিসাবে কোন আলোচনা উত্থাপন করেন নাই। বরঞ্চ তিনি যদি অসংযত প্রেমের অপঘাতমৃত্যু দেখাইয়া বিভীষিকায় তাঁহার কাব্য-নাটকের উপসংহার করিতেন, তাহা হইলেও এমন সন্দেহ হইতে পারিত যে, কবি বুঝি ভয় দেখাইয়া উপদেশ দিতে বসিয়াছেন,—ওঝা যেমন অত্যাচার করিয়া ভূত ছাড়ায়, তিনিও তেমনি প্রেমের ভূতকে মারিয়া খেদাইবার আয়োজন করিয়াছেন। কালিদাস সে পথে যান নাই। ভালমন্দের বিচারভার তিনি শাস্ত্রকারের উপর রাখিয়াছেন এবং যে প্রেম সুন্দরতর, যে মিলনমাধুর্য্য সম্পূর্ণতর, তাহাকেই চরমে রাখিয়া তিনি তাঁহার কাব্যকে রসগৌরবে পূর্ণ করিয়াছেন।

ইহার বিপরীত কারণেই টেনিসনের 'প্যালাস্ অফ্ আর্ট' কবিতাটি আমার কাছে অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্তিকর ঠেকে। যে বিলাসী আপনার চারিদিকে সৌন্দর্য্যের উপকরণ সঞ্চয় করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগসুখে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার পরিণামফল বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। তিনি বলিয়াছেন, ঠিক তিন বৎসর পরে সেই বিলাসীর চিত্ত পীড়িত হইতে লাগিল, সৌন্দর্য্যচ্ছবি তাহার চারিদিকে বীভৎস হইয়া উঠিল। কিন্তু এ ত একটা সংবাদমাত্র। রোগের কারণ জন্মিবার কতদিন পরে রোগ জন্মে, এবং সে রোগ কতদিন পরে পূর্ণপরিণাম প্রাপ্ত হয়, ডাক্তার তাহার হিসাব দিয়া থাকেন। ভোগী তিন বৎসর সুখভোগ করিয়া চতুর্থ বৎসরে বিরক্তিবোধ করিল, তাহার কাব্যগত কারণ কি থাকিতে পারে? এ খবর আমরা বিশ্বাস করিতেও পারি, না-ও করিতে পারি।

কিন্তু কালিদাস এরূপ একটা সংবাদমাত্র দেন নাই। তিনি এমন কোন তত্ত্বকথার অবতারণা করেন নাই, যাহা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের বিশ্বাস যাচ্ঞা করে। তিনি রসের পথে গিয়াছেন। তিনি সদ্যঃপাতী ফুলের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যকে পরিপক্ব

ফলের সম্পূর্ণ মাধুর্য্যে পরিণত করাইয়া দেখাইয়াছেন।

পর্য্যাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় আসিয়া গিরিশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার কর্ণ হইতে পল্লব এবং অলক হইতে নবকর্ণিকার বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। মন্দাকিনীর জলে যে পদ্ম ফুটিত, সেই পদ্মের বীজ রৌদ্রকিরণে শুষ্ক করিয়া নিজের হাতে গৌরী যে জপমালা গাঁথিয়াছিলেন, সেই মালা তিনি তাঁহার তাম্ররুচি করে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। বিচলিতচিত্ত যোগী একবার উমার মুখে, উমার বিম্বাধরে তাঁহার তিন নেত্রকেই ব্যাপৃত করিয়া দিলেন। উমার শরীর তখন পুলকাকুল, দুই চক্ষু লজ্জায় পর্য্যস্ত এবং মুখ একদিকে সাচীকৃত।

কিন্তু অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে অকস্মাৎ উদ্ভাসমান এই যে হর্ষ, দেবতা ইহাকে বিশ্বাস করিলেন না,—সরোষে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। নিজের ললিতযৌবনের সৌন্দর্য্য অপমানিত হইল জানিয়া লজ্জাকুণ্ঠিতা রমণী কোনমতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

কণ্বদুহিতাকেও একদিন তাঁহার যৌবনলাবণ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ লইয়া অবমানিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। দুর্ব্বাসার শাপ কবির রূপকমাত্র। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বন্ধনবিহীন গোপনমিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত। উন্মত্ততার উজ্জ্বল উন্মেষ ক্ষণকালের জন্যই হয়—তাহার পরে অবসাদের, অপমানের, বিস্মৃতির অন্ধকার আসিয়া আক্রমণ করে। ইহা চিরকালের বিধান। কালে কালে দেশে দেশে অপমানিতা নারী "ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ" আপনার ললিত দেহকান্তিকে ব্যর্থ জ্ঞান করিয়া, "শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ" শূন্যহৃদয়ে কোনক্রমে গৃহের দিকে ফিরিয়াছে। ললিত দেহের সৌন্দর্য্যই নারীর পরম গৌরব চরম সৌন্দর্য্য নহে।

সেইজন্যই "নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী" পার্ব্বতী রূপকে মনে মনে নিন্দা করিলেন। এবং "ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাম্" তিনি আপনার রূপকে সফল করিতে ইচ্ছা করিলেন। রূপকে সফল করিতে হয় কি করিয়া? সাজে সজ্জায়, বসনে অলঙ্কারে? সে পরীক্ষা ত ব্যর্থ হইয়া গেছে।

ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ—

তিনি তপস্যাদ্বারা নিজের রূপকে অবন্ধ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। এবারে গৌরী তরুণার্করক্তিমবসনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না, কর্ণে চূতপল্লব এবং অলকে নবকর্ণিকার পরিলেন না;—তিনি কঠোর মৌঞ্জী মেখলা দ্বারা অঙ্গে বল্কল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন। বসন্তসখা পঞ্চশর মদনকে পরিত্যাগ করিয়া কঠিন দুঃখকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন।

শকুন্তলাও দিব্য আশ্রমে মদনের মাদকতাগ্লানিকে দুঃখতাপে দগ্ধ করিয়া কল্যাণী তাপসীর বেশে সার্থক প্রেমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যে ত্রিলোচন বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরীকে একমুহূর্ত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তিনি দিবসের শশিলেখার ন্যায় কর্শিতা, শ্লথ-লম্বিত-পিঙ্গলজটাধারিণী তপস্বিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণহৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। লাবণ্যপরাক্রান্ত যৌবনকে পরাকৃত করিয়া পার্ব্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতির্লেখার মত উদিত হইল। প্রার্থিতকে সে সৌন্দর্য্য বিচলিত করিল না, চরিতার্থ করিয়া দিল। তাহার মধ্যে লজ্জা-আশঙ্কা আঘাত-আলোড়ন রহিল না; সেই সৌন্দর্য্যের বন্ধনকে আত্মা আদরে আদরে বরণ করিল, তাহার মধ্যে নিজের পরাজয় অনুভব করিল না।

এতদিন পরে—

ধর্ম্মেণাপি পদং শর্ব্বে কারিতে পার্ব্বতীং প্রতি।
পূর্ব্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ॥—

ধর্ম্ম যখন মহাদেবের মনকে পার্ব্বতীর অভিমুখে আকর্ষণ করিলেন,তখন পূর্ব্বাপরাধভীত কামের মন আশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম যেখানে দুই হৃদয়কে একত্র করে, সেখানে মদনের সহিত কাহারো কোন বিরোধ নাই। সে যখন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাধাইতে চায়, তখনি বিপ্লব উপস্থিত হয়; তখনি প্রেমের মধ্যে ধ্রুবত্ব এবং সৌন্দর্য্যের মধ্যে শান্তি থাকে না। কিন্তু ধর্ম্মের অধীনে তাহার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, সেখানে সেও পরিপূর্ণতার একটি অঙ্গস্বরূপ, সেখানে থাকিয়া সে সুষমা ভঙ্গ করে না। কারণ, ধর্ম্মের অর্থই সামঞ্জস্য; এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্য্যকেও রক্ষা করে, মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলকে অভেদ করিয়া উভয়কে একটি আনন্দময়-সম্পূর্ণতা দান করে। সৌন্দর্য্য যেখানে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া ভাবের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে, সেখানে বাহ্যসৌন্দর্য্যের বিধান তাহাকে আর খাটে না। সেখানে তাহার আর ভূষণের প্রয়োজন কি? প্রেমের মন্ত্রবলে মন যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, তাহাকে বাহ্যসৌন্দর্য্যের নিয়মে বিচার করাই চলে না। টপ্পার সৌন্দর্য্য প্রধানত ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য, এইজন্য তাহার অলঙ্কার প্রচুর; ধ্রুপদের সৌন্দর্য্যভোগে অধিকতর পরিমাণে চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন হয়, এইজন্য তাহার অলঙ্কার বিরল—মন তাহাকে নিজের অলঙ্কার দিয়া সাজায়। উচ্চ অঙ্গের সৌন্দর্য্যমাত্রই মনের সহায়তা প্রার্থনা করে, সেইজন্য বিচিত্র আয়োজন দূর করিয়া সে নিজের মধ্যে মনের বিচরণের সুবিস্তীর্ণ অবকাশ রাখিয়া দেয়। প্রেমের সৌন্দর্য্যে, মঙ্গলের সৌন্দর্য্যে মনেরই অধিকার—এইজন্য বাহ্যসৌন্দর্য্যের সহায়তাকে সে উপেক্ষা করিতে পারে। শিবের ন্যায় তপস্বী গৌরীর ন্যায় কিশোরীর সঙ্গে বাহ্যসৌন্দর্য্যের নিয়মে ঠিক যেন সঙ্গত হইতে পারেন না। শিব নিজেই ছদ্মবেশে সে কথা তপস্যারতা উমাকে জানাইয়াছেন। উমা উত্তর দিয়াছেন, "মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্" আমার মন তাঁহাতেই ভাবৈকরস হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এ যে রস, এ ভাবের রস; সুতরাং ইহাতে আর কথা চলিতে পারে না। মন এখানে বাহিরের উপরে জয়ী—সে নিজের আনন্দকে নিজে সৃষ্টি করিতেছে। শম্ভুও একদিন বাহ্যসৌন্দর্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া-

ছিলেন, কিন্তু প্রেমের দৃষ্টি, মঙ্গলের দৃষ্টি, ধর্ম্মের দৃষ্টি দ্বারা যে সৌন্দর্য্য দেখিলেন, তাহা তপস্যাকৃশ ও আভরণহীন হইলেও, তাঁহাকে জয় করিল। কারণ, সে জয়ে তাঁহার নিজের মনই সহায়তা করিয়াছে—মনের কর্ত্তৃত্ব তাহাতে নষ্ট হয় নাই।

ধর্ম্ম যখন তাপস-তপস্বিনীর মিলনসাধন করিল, তখন স্বর্গমর্ত্ত্য এই প্রেমের সাক্ষি ও সহায় রূপে অবতীর্ণ হইল; এই প্রেমের আহ্বান সপ্তর্ষিবৃন্দকে স্পর্শ করিল; এই প্রেমের উৎসব লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে কোন গূঢ় চক্রান্ত, অকালে বসন্তের আবির্ভাব ও গোপনে মদনের শরপাতন রহিল না। ইহার যে অম্লানমঙ্গলশ্রী, তাহা সমস্ত সংসারের আনন্দের সামগ্রী। সমস্ত বিশ্ব এই শুভমিলনের নিমন্ত্রণে প্রসন্নমুখে যোগদান করিয়া ইহাকে সুসম্পন্ন করিয়া দিল।

সপ্তম সর্গে সেই বিশ্বব্যাপী উৎসব। এই বিবাহ-উৎসবেই কুমারসম্ভবের উপসংহার।

শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নহে। কালিদাস তাঁহার কাব্যের রসপ্রবাহকে সেই স্বর্গমর্ত্ত্যব্যাপী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শান্তির মধ্যে মিলিত করিয়া দিয়া তাহাকে মহান্ পরিণাম দান করিয়াছেন, তাহাকে অর্দ্ধপথে "ন যযৌ ন তস্থৌ" করিয়া রাখিয়া দেন নাই। মাঝে তাহাকে যে একবার বিক্ষুব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সে কেবল এই পরিণত সৌন্দর্য্যের প্রশান্তিকে গাঢ়তর করিয়া দেখাইবার জন্য,—ইহার [illegible] শুভ্র মঙ্গল[illegible]কে বিচিত্রবেশী উদ্ভ্রান্ত সৌন্দর্য্যের তুলনায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য।

মহেশ্বর যখন সপ্তর্ষিদের মধ্যে পতিব্রতা অরুন্ধতীকে দেখিলেন, তখন তিনি পত্নীর সৌন্দর্য্য যে কি, তাহা দেখিতে পাইলেন।

> তদ্দর্শনাদভূৎ শম্ভোর্ভূয়ান্ দারার্থমাদরঃ।
> ক্রিয়াণাং খলু ধর্ম্ম্যাণাং সৎপত্ন্যো মূলকারণম্॥

তাঁহাকে দেখিয়া শম্ভুর দারগ্রহণের জন্য অত্যন্ত আদর জন্মিল। সৎপত্নীই সমস্ত ধর্ম্ম্যকার্য্যের মূলকারণ।

পতিব্রতার মুখচ্ছবিতে বিবাহিতা রমণীর যে গৌরবশ্রী অঙ্কিত আছে, তাহা নিয়ত-আচরিত কল্যাণকর্ম্মের স্থির সৌন্দর্য্য,—শম্ভুর কল্পনানেত্রে সেই সৌন্দর্য্য যখন অরুন্ধতীর সৌম্যমূর্ত্তি হইতে প্রতিফলিত হইয়া নববধূবেশিনী গৌরীর ললাট স্পর্শ করিল, তখন শৈলসুতা যে লাবণ্যলাভ করিলেন, অকালবসন্তের সমস্ত পুষ্পসম্ভার তাঁহাকে সে সৌন্দর্য্য দান করিতে পারে নাই।

বিবাহের দিনে গৌরী—

> সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী
> গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।
> নির্বৃত্তপর্জ্জন্যজলাভিষেকা
> প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে॥

মঙ্গলস্নানে নির্ম্মলগাত্রী হইয়া যখন পতিমিলনের উপযুক্ত বসন পরিধান করিলেন, তখন বর্ষার জলাভিষেকের অবসানে কাশকুসুমে প্রফুল্লা বসুধার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এই যে মঙ্গলকান্তি নির্ম্মল শোভা, ইহার মধ্যে কি শান্তি, কি শ্রী, কি সম্পূর্ণতা! ইহার মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান, সমস্ত

সজ্জার শেষ পরিণতি।—ইহার মধ্যে ইন্দ্রসভার কোন প্রয়াস নাই, মদনের কোন মোহ নাই, বসন্তের কোন আনুকূল্য নাই—এখন ইহা আপনার নির্ম্মলতায়—মঙ্গলতায় আপনি অক্ষুব্ধ—আপনি সম্পূর্ণ।

জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গলব্যাপার। সেইজন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ"—তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা, পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্য কুমারজন্মরূপ মহৎব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শর নিক্ষেপ করিয়া ধৈর্য্যবাঁধ ভাঙিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে, তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। এইজন্য কবি মদনকে ভস্মসাৎ করাইয়া গৌরীকে দিয়া তপশ্চরণ করাইয়াছেন। এইজন্যই কবি প্রবৃত্তির চাঞ্চল্যস্থলে ধ্রুবনিষ্ঠার একাগ্রতা, সৌন্দর্য্যমোহের স্থলে কল্যাণের কমনীয় দ্যুতি এবং বসন্তবিহ্বল বনানীর স্থলে আনন্দনিমগ্ন বিশ্বলোককে দাঁড় করাইয়াছেন, তবে কুমারজন্মের সূচনা হইয়াছে। কুমারজন্ম ব্যাপারটা কি, তাহাই বুঝাইতে কবি মদনকে দেবরোষানলে আহুতি দিয়া অনাথা রতিকে বিলাপ করাইয়াছেন।

শকুন্তলাতেও প্রথম অঙ্কে প্রেয়সীর সহিত দুষ্যন্তের ব্যর্থ প্রণয় ও শেষ অঙ্কে ভরতজননীর সঙ্গে তাঁহার সার্থক মিলন কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্ক চাঞ্চল্যে-ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ; তাহাতে উদ্বেলযৌবনা ঋষিকন্যা, কৌতুকোচ্ছলিতা সখীদ্বয়, নবপুষ্পিতা বনতোষিণী, সৌরভভ্রান্ত মূঢ় ভ্রমর এবং তরু-অন্তরালবর্ত্তী মুগ্ধ রাজা তপোবনের একটি নিভৃত প্রান্ত আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য্যমদমোদিত এক অপরূপ দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে। এই প্রমোদস্বর্গ হইতে দুষ্যন্তপ্রেয়সী অপমানে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু কল্যাণরূপিণী ভরতজননী যে দিব্যতরা তপোভূমিতে আশ্রয় লইয়াছেন, সেখানকার দৃশ্য অন্যরূপ। সেখানে কিশোরী তাপসকন্যারা আলবালে জলসেচন করিতেছে না, লতাভগিনীকে স্নেহদৃষ্টিদ্বারা অভিষিক্ত করিতেছে না, কৃতকপুত্র মৃগশিশুকে নীবারমুষ্টিদ্বারা পালন করিতেছে না। সেখানে তরুলতা-পুষ্পপল্লবের সমুদয় চাঞ্চল্য একটিমাত্র বালক অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, সমস্ত বনানীর কোল সে ভরিয়া রহিয়াছে; সেখানে সহকারশাখায় মুকুল ধরে কি না, নবমল্লিকায় পুষ্পমঞ্জরী ফোটে কি না, সে কাহারো চক্ষেও পড়ে না। স্নেহব্যাকুলা তাপসী মাতারা দুরন্ত বালকটিকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার সহিত পরিচয় হইবার পূর্ব্বে দূর হইতে তাহার নবযৌবনের লাবণ্যলীলা দুষ্যন্তকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল। শেষ অঙ্কে শকুন্তলার বালকটি শকুন্তলার সমস্ত লাবণ্যের স্থান অধিকার করিয়া লইয়া রাজার অন্তরতম হৃদয় আর্দ্র করিয়া দিল।

এমন সময়—

> বসনে পরিধূসরে বসানা
> নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।—

মলিনধূসরবসনা, নিয়মচর্য্যায় শুষ্কমুখী, একবেণীধরা, বিরহব্রতচারিণী, শুদ্ধশীলা শকুন্তলা প্রবেশ করিলেন। এমন তপস্তার পরে অক্ষয়বরলাভ হইবে না? সুদীর্ঘব্রতচারণে প্রথম সমাগমের গ্লানি দগ্ধ হইয়া পুত্রশোভায় পরমভূষিতা যে করুণকল্যাণচ্ছবি জননীমূর্ত্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে কে প্রত্যাখ্যান করিবে?

ধূর্জটির মধ্যে গৌরী কোন অভাব—কোন দৈন্য দেখিতে পান নাই, তিনি তাঁহাকে ভাবের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে দৃষ্টিতে ধন-রত্ন রূপ-যৌবনের কোন হিসাব ছিল না। শকুন্তলার প্রেম সুতীব্র অপমানের পরেও মিলনকালে দুষ্যন্তের কোন অপরাধই লইল না, দুঃখিনীর দুই চক্ষু দিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল। যেখানে প্রেম নাই, সেখানে অভাবের, দৈন্যের, কুরূপের সীমা নাই—যেখানে প্রেম নাই, সেখানে পদে পদে অপরাধ। গৌরীর প্রেম যেমন নিজের সৌন্দর্য্যে-সম্পদে সন্ন্যাসীকে সুন্দর ও ঈশ্বর করিয়া দেখিয়াছিল, শকুন্তলার প্রেমও সেইরূপ নিজের মঙ্গলদৃষ্টিতে দুষ্যন্তের সমস্ত অপরাধকে দূর করিয়া দেখিয়াছিল। যুবক-যুবতীর মোহমুগ্ধ প্রেমে এত ক্ষমা কোথায়? ভরতজননী যেমন পুত্রকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন, সহিষ্ণুতাময়ী ক্ষমাকেও তেমনি শকুন্তলা তপোবনে বসিয়া আপনার অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বালক ভরত দুষ্যন্তকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এ কে আমাকে পুত্র বলিতেছে?" শকুন্তলা উত্তর করিলেন, "বাছা, আপনার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর!"—ইহার মধ্যে অভিমান ছিল না—ইহার অর্থ এই যে, 'যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তবে ইহার উত্তর পাইবে'—বলিয়া রাজার প্রসন্নতার অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। যেই বুঝিলেন, দুষ্যন্ত তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছেন না, তখনি নিরভিমানা নারী বিগলিত চিত্তকে দুষ্যন্তের চরণে পূজাঞ্জলি দান করিলেন, নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কাহারও কোন অপরাধ দেখিতে পাইলেন না। আত্মাভিমানের দ্বারা অন্যকে খণ্ডিত করিয়া দেখিলে তাহার দোষ-ত্রুটি বড় হইয়া উঠে—ভাবের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিলে, সে সমস্ত কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

যেমন শ্লোকের এক চরণ সম্পূর্ণ মিলের জন্য অন্য চরণের অপেক্ষা করে, তেমনি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রথম মিলন সম্পূর্ণতালাভের জন্য এই দ্বিতীয় মিলনের একান্ত-আকাঙ্ক্ষা রাখে। শকুন্তলার এত দুঃখকে নিষ্ফল করিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখা যায় না। যজ্ঞের আয়োজনে যদি কেবল অগ্নিই জ্বলে, কিন্তু তাহাতে অন্নপাক না হয়, তবে নিমন্ত্রিতদের কি দশা ঘটে? শকুন্তলার শেষ অঙ্ক, নাটকের বাহ্যরীতি অনুসারে নহে, তদপেক্ষা গভীরতর নিয়মের প্রবর্ত্তনায় উদ্ভূত হইয়াছে।

দেখা গেল, কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলায় কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ, মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত; দেখাইয়াছেন, ধর্ম্ম যে সৌন্দর্য্যকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ; বন্ধনেই যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায়

সৌন্দর্য্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরমগৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে—স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়,—যদি তাহা আপনার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে,—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা অতিথিপ্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্রসৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।

একদিকে গৃহধর্ম্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসারমধ্যে ভারতবর্ষ বহুলোকের সহিত বহুসম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না,—তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ—আদানপ্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায়-কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবকে-নরশিশুতে খেলা করিতেছে, তেমনি, তাঁহার কাব্যতপোবনে যোগীর ভাব, গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া, কবি তাহার উপরে বজ্রনিপাত করিয়া তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় গৃহের সহিত নিরাসক্ত তপোবনের সুপবিত্র সম্বন্ধ পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়াছেন। ঋষির আশ্রমভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূত নির্ম্মল যোগাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্য্যের উপকরণে গঠিত। সেই সৌন্দর্য্য শ্রী, হ্রী এবং কল্যাণে উদ্ভাসমান; তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একপরায়ণ এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থল। তাহা ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্ম্মের দ্বারা ধ্রুব। এই সৌন্দর্য্যে নরনারীর দুর্নিবার দুরন্ত প্রেমের প্রলয়বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গলমহাসমুদ্রের মধ্যে পরমস্তব্ধতা লাভ করিয়াছে—এইজন্য তাহা বন্ধনবিহীন দুর্দ্ধর্ষ প্রেমের অপেক্ষা মহান্ ও বিস্ময়কর।

মায়াবী প্রেম।

হারে জলন্ত প্রেম!
কে বলেছে তোরে পরশ-মাণিক,
কে বলেছে তোরে হেম!
আমি জানি তোর লীলা যুগে যুগে,
সব রহস্য ভাই;
যেই বরিয়াছে তোরে দুর্ভাগা,
তারি ভাগ্যেই ছাই!

ওরে প্রাণান্ত মায়া!
বৃথা আশ্বাসে ধরেছি আঁকড়ি'
তোর অশান্ত ছায়া!
নববসন্তে মরীচিকা গাঁথি'
চাহিনু পরিতে হার;
আজ কিছু নাই, বক্ষে কেবল
জ্বলিছে পিপাসা তার।

হারে অন্তিম শিখা!
পড়িয়া লয়েছি তোমার আলোকে
আমার ললাট-লিখা।
তোমারে সাজানু উৎসব-দীপ
বাসরশয়ন ঘিরে,
তুমি যে জ্বালাও চিতার আগুন
সর্ব্বনাশার তীরে।

ওরে অতৃপ্ত আশা!
আমার জীবনে বিবর খনিয়া
কেনরে করেছ বাসা!
যত ব্যথা পাই তবু তোরে চাই,
যত বাজে চাপি বুকে;
বাঁশরি বাজায়ে খেলাইয়া ফিরি
কাল-ফণীটিরে সুখে!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

সার সত্যের আলোচনা।

তিনে এক, একে তিন।

গতবারের আলোচনার শেষ-ভাগে ত্রিকের কথা উপস্থিত হওয়াতে তাহার গোটা-কত নমুনা যাহা দেখানো হইয়াছিল, তাহা এইরূপ :—

(১)	(২)	(৩)
প্রাণ	মন	বুদ্ধি
উদ্ভিদ্	মূঢ়জীব	মনুষ্য
সুষুপ্তি	স্বপ্ন	জাগ্রৎ
তম	রজ	সত্ত্ব
		ইত্যাদি।

ত্রিক দুই অক্ষরের শব্দ বই নয়, কিন্তু তাহার গুরুত্ব নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কুলায় না। বলা যাইতে পারে যে, তত্ত্বরত্নাগারের চাবি একটিমাত্র, আর সে চাবি ত্রিক। ত্রিকের দৌড় সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে—কোথাও তাহার পরিসমাপ্তি নাই।

ত্রিকের অভিব্যক্তির পথ একটি চক্রাকৃতি সোপান; আর, তাহারই নাম ব্রহ্মাণ্ড-চক্র; সংক্ষেপে—ব্রহ্মচক্র।

ব্রহ্মচক্রের দুইটি ক্রম—(১) নাবিবার ক্রম বা সৃষ্টির ক্রম বা অনুলোম-ক্রম; এবং (২) উঠিবার ক্রম বা সাধনের ক্রম বা প্রতি-লোম-ক্রম। অনুলোম-ক্রমের গতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে; প্রতিলোম-ক্রমের গতি স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে।

বলিলাম "দুই ক্রম"; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা দুই নহে; তাহা একই ক্রমের দুই অর্দ্ধাঙ্গ। এক দিবা + এক রাত্রি = দুই দিন নহে, পরন্তু তাহা একই দিনের দুই অর্দ্ধাঙ্গ; তেমনি অনুলোম-ক্রম + প্রতি-লোম-ক্রম = একই ক্রমের দুই অর্দ্ধাঙ্গ। কতকগুলি বিষয় এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সমগ্র ত্রিক-শ্রেণী একটি চক্রাকৃতি সোপান। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, ত্রিক-গুলি গোল সিঁড়ির ধাপের ন্যায় উপচক্র-পরম্পরা। এক-এক ত্রিক এক-এক উপচক্রের ফের।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, সমগ্র ত্রিক-চক্র দুই ভাগে বিভক্ত; সে দুই ভাগ দুইটি গোল সিঁড়ি। একটি গোল সিঁড়ি নাবিবার সিঁড়ি, আর একটি গোল সিঁড়ি উঠিবার সিঁড়ি। প্রথম গোল সিঁড়িতে ত্রিক-শ্রেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাবিয়া চলিয়াছে, দ্বিতীয় গোল সিঁড়িতে ত্রিক-শ্রেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহিয়া উঠিয়াছে। ঐ দুইটি গোল-সিঁড়ির যথাক্রমে নাম দেওয়া যাইতে পারে (১) অনুলোম-সোপান এবং (২) প্রতিলোম-সোপান।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য এই যে, যেমন রজনীর সমাপ্তিই দিবসের আরম্ভ এবং দিবসের

বিষয়। পৃষ্ঠা।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

সমাপ্তিই রজনীর আরম্ভ, তেমনি অনুলোম-সোপানের সমাপ্তিই প্রতিলোম-সোপানের আরম্ভ এবং প্রতিলোম-সোপানের সমাপ্তিই অনুলোম-সোপানের আরম্ভ। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, রজনীর শেষাংশ যেমন দিবসের প্রথমাংশে গিয়া ঠ্যাকে, তেমনি প্রতিলোম-সোপানের শেষ ত্রিক অনুলোম-সোপানের প্রথম ত্রিকে গিয়া ঠ্যাকে। অনুলোম-সোপানের প্রথম ত্রিক কি? না,—সৎ, চিৎ, আনন্দ; প্রতিলোম-সোপানের শেষ ত্রিক কি? না,—প্রাণ, মন, বুদ্ধি। দুয়ের সংশ্লেষ কোথায়? না,—সেখানে প্রাণ-মন-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ সৎ-চিৎ-আনন্দে গিয়া পর্য্যাপ্তি লাভ করে।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, কি গোড়ার ত্রিক, কি মাঝের ত্রিক, কি শেষের ত্রিক, সকল ত্রিকেরই ভিতরকার কল একই-প্রকার। সে কলের মুখ্য অবয়ব তিনটি—(১) শান্তি, (২) প্রতিযোগ, (৩) সংযোগ; আর, সে কলের গতি তাহার ঐ তিন অবয়বের মধ্যেই আবদ্ধ। সে গতি এইরূপ:—শান্তি হইতে প্রতিযোগে, প্রতিযোগ হইতে সংযোগে, সংযোগ হইতে নূতন শান্তিতে, নূতন শান্তি হইতে নূতন প্রতিযোগে, নূতন প্রতিযোগ হইতে নূতন সংযোগে, নূতন সংযোগ হইতে নবতর শান্তিতে; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ত্রিকের ঐ যে ভিতরকার কল, উহা একপ্রকার **রূপক-তাল**। রূপক-তালের অঙ্গ তিনটিমাত্র—দুই তাল এবং এক ফাঁক। দুই তাল হ'চ্চে প্রতিযোগ এবং সংযোগ; আর এক ফাঁক হ'চ্চে শান্তি।

সকল ত্রিকের ভিতরকার কল যেহেতু একই-প্রকার, এই জন্য আদি এবং অন্ত, এই দুই মুড়ার দুই ত্রিকের প্রতি আপাতত লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া, সেই দুই ত্রিককে মাঝখানের আর আর ত্রিক-শ্রেণীর আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমি এক্ষণে তাহাই করিব; তাহার পরিবর্ত্তে গোড়াতেই যদি আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিকের গোলোক-ধাঁদায় প্রবেশ করিয়া আপনিও বিভ্রান্ত হই এবং পাঠকবর্গকেও বিভ্রান্ত করিয়া তুলি, তাহা হইলে একূল ওকূল দুকূল যাইবে; তাহাতে কাজ নাই। আপাতত এইরূপ মনে করা যা'ক্ যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ত্রিক যেন তাহার দুই মুড়া'র দুই ত্রিকেই পরিসমাপ্ত; সৎ, চিৎ, আনন্দ—এই এক ত্রিক, এবং প্রাণ, মন, বুদ্ধি—এই আরেক ত্রিক, এই দুই ত্রিকেই পরিসমাপ্ত। তাহা হইলে সংক্ষেপে দাঁড়াইবে এই যে, সৎ-চিৎ-আনন্দ হইতে প্রাণ-মন-বুদ্ধিতে অবতরণ করিবার ক্রম অনুলোম-ক্রম, এবং প্রাণ-মন-বুদ্ধি হইতে সৎ-চিৎ-আনন্দে উত্থান করিবার ক্রম প্রতিলোম-ক্রম। উপনিষৎশাস্ত্রেও আছে—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূত জন্মগ্রহণ করে; * * * "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—কে বা প্রাণধারণ করিত, কাহারই বা প্রাণ-স্ফূর্ত্তি হইত, যদি এই আনন্দ আকাশে না থাকিতেন। অতএব আনন্দ হইতে অনুলোম-ক্রমে প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়াছে, এ কথা শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়-সম্মত। এ কথাও তেমনি উভয়-সম্মত যে, প্রাণ-

মন-বুদ্ধি প্রতিলোম-ক্রমে সৎ-চিৎ-আনন্দে উত্থান করিতেছে। সর্ব্বপ্রথমে প্রথম ত্রিকের অবয়ব-পারিপাট্য এবং ভিতরকার কল কিরূপ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

আমার সম্মুখে, মনে কর, একখণ্ড কাগজ উড়িয়া পড়িল। বলিলাম—"এক খণ্ড"; কিন্তু সেই একের মধ্যে তিন রহিয়াছে; তার সাক্ষী—(১) এ পিট, (২) ও পিট, এবং (৩) দুই পিটের উভয়-সাধারণ চারিধার। তেমনি সত্য এক; কিন্তু সেই একের মধ্যে তিন রহিয়াছে—সৎ রহিয়াছে, চিৎ রহিয়াছে, আনন্দ রহিয়াছে। এরূপ কাগজ কেহ কখনো চক্ষে দেখেও নাই, দেখিতে পাইবেও না—যাহার এ-পিট আছে, ও-পিট নাই; ও-পিট আছে, এ-পিট নাই; অথবা দুই পিটই আছে, কিন্তু উভয়-সাধারণ পরিধি (periphery) নাই। তেমনি এরূপ সত্য কেহ কখনো জ্ঞানে বা ধ্যানে উপলব্ধি করিতে পারেও না, পারিবেও না, যে-সত্যের অস্তি (অর্থাৎ সত্তা) আছে, ভাতি (অর্থাৎ প্রকাশ) নাই; ভাতি আছে, অস্তি নাই, অথবা অস্তি-ভাতি দুইই আছে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনো-প্রকার ঐক্যের বন্ধন নাই। কেমন করিয়াই বা সেরূপ অঙ্গহীন সত্যের উপলব্ধি সম্ভব হইবে?—মূলেই যাহার ভাতি নাই, কাহারো নিকটে কস্মিন্ কালেও যাহার প্রকাশ নাই—প্রকাশের সম্ভাবনাও নাই, তাহাকে "আছে" বলিলে কি বুঝায়? শুদ্ধ কেবল আ এবং ছে এই দুই অক্ষর বুঝায়, তাহা ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না যাহার ভাতি আছে, অস্তি নাই, তাহাই বা কিরূপ সত্য? "মাথা নাই, মাথাব্যথা" যেরূপ সত্য, "অস্তি নাই ভাতি" ঠিক্ সেই-রূপ সত্য, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাই-তেছে। তুমি বলিতেছ, "অস্তি আবার কি—সবই তো ভাতি"; তোমার এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তুমি আবার কে—সবই তো তোমার মুখের কথা! ফলে, সূর্য্য নাই, দিবালোক আছে এবং অস্তি নাই, ভাতি আছে, এ দুই কথা একই ধরণের কথা; দুয়ের কোনোটিরই অর্থ ঘুণাক্ষরেও কাহারো বোধগম্য হইবার নহে। যদি বল যে, অস্তিও আছে, ভাতিও আছে; কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনোপ্রকার ঐক্যের বন্ধন নাই—যোগ-সূত্র নাই—সম্বন্ধ নাই, তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—ভাতি যে, সে কাহার ভাতি? অস্তিরই তো ভাতি! অস্তি যে, সে কাহার অস্তি? যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহারই তো অস্তি—ভাতিরই তো অস্তি! তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, অস্তি এবং ভাতির মধ্যে কোনো-প্রকার ঐক্যের বন্ধন নাই—সম্বন্ধ নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অস্তি এবং ভাতির মধ্যে সেই যে বন্ধনের আঁট, তাহা কি? ইহার উত্তর এই যে, তাহা আনন্দ। এ যাহা বলিতেছি, ইহার প্রথম উপমাস্থল—পিতা-মাতার সহিত পুত্রকন্যাদিগের ঐক্যবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ। পৈতৃক ঐক্য-বন্ধন প্রকৃতপ্রস্তাবেই ঐক্যের (কিনা—একত্বের) বন্ধন; কেন না, পুত্রকন্যারা পিতা

মাতার শরীর-মন লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; পুত্রকন্যারা পিতামাতার সাক্ষাৎ ভাতি (কিনা—আবির্ভাব)। বর্ত্তমান বিষয়ের দ্বিতীয় উপমাস্থল—ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঐক্যবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ; এ ঐক্যবন্ধন বিভিন্নের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। তৃতীয় উপমাস্থল—পতিপত্নীর ঐক্যবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ; এ ঐক্যবন্ধন বিপরীতের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। এই তিনপ্রকার ঐক্যবন্ধন মনুষ্য-সমাজের গোড়া'র বাঁধুনি, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; অধিকন্তু এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, তিনই অস্তি এবং ভাতির ঐক্যবন্ধন। পিতামাতা পুত্রকন্যাতে আপনারই ভাতি দেখেন; ভ্রাতারা পরস্পরের আকারপ্রকার-ভাবভঙ্গীতে আপনাদের ভাতি দেখেন; স্বামি-স্ত্রী আপনাদিগের উভয়কে পরস্পরের সহিত অভেদ দেখেন; স্বামী স্ত্রীতে আপনার ভাতি দেখেন, স্ত্রী স্বামীতে আপনার ভাতি দেখেন। বিশেষত দম্পতির ঐক্যবন্ধনে আনন্দ অতীব সুপরিস্ফুট ভাব ধারণ করে; আর, তাহা যে করে, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে; সে কারণ আর কিছু না—প্রতিযোগের মধ্য দিয়া সংযোগের অভিব্যক্তি। এ যাহা বলিলাম, ইহার যৎকিঞ্চিৎ টীকা করা আবশ্যক; তাহা এই :—

পুত্রকন্যা পিতামাতার নিতান্তই আপনার। যাহা আপনার, তাহাতে আপনার ভাতি দেখিতে পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভ্রাতা-ভগিনীরা এক মায়ের গর্ভজাত, কাজেই পরস্পরের আকারপ্রকার, ভাব-ভঙ্গী এবং আচার-ব্যবহারের দর্পণে পরস্পরের মুখ দেখিতে পাওয়া, তাহাদের পক্ষেও কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পক্ষান্তরে, এক পিতামাতার পুত্র এবং আর-এক পিতামাতার কন্যা, দোঁহে দোঁহার নিতান্তই পর; তাহা সত্বেও যে, স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় আপনি বা আপনার অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন; হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্ত্রী স্বামীতে এবং স্বামী স্ত্রীতে আপনার ভাতি দর্শন করেন; তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বর-কন্যার শুভদৃষ্টি একপ্রকার ভাতি-বিনিময় অর্থাৎ পরস্পরের নয়ন-দর্পণে পরস্পরকে দেখা; নিতান্ত পর-ব্যক্তির নয়ন-দর্পণে আপনাকে দেখা; ইহারই নাম প্রতিযোগের মধ্য দিয়া সংযোগের সংঘটন। দাম্পত্য-বন্ধনে প্রতিযোগের সংশ্লেষে সংযোগ সুপরিস্ফুট হয় বলিয়া, সে বন্ধনে আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত ভাব ধারণ করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অস্তি এবং ভাতির ঐক্যবন্ধন আনন্দেরই প্রস্রবণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সকল ত্রিকেরই ভিতরকার কল একই-প্রকার; ইহাও বলিয়াছি যে, সে কলের মুখ্য অবয়ব তিনটি—(১) শান্তি, (২) প্রতিযোগ, এবং (৩) সংযোগ। এ তিনটি অবয়ব মূল ত্রিকে অতীব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে; তার সাক্ষী :—

প্রথমত সৎ অর্থাৎ নিত্যসত্য চিরকালই সমান। এই যে অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য-সত্যের ভাব বা সতের ভাব, এই প্রথম ভাবটি শান্তি-প্রধান, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয়ত অসতের প্রতিযোগে সতের, এবং সতের প্রতিযোগে অসতের যে প্রকাশ, তাহারই নাম চিৎ বা জ্ঞান; কাজেই বলিতে হইতেছে যে, চিৎ প্রতিযোগপ্রধান। কেহ বলিতে পারেন যে, ছায়ার উপলব্ধি আলোকের প্রতিযোগিতা-সাপেক্ষ, এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু আলোকের উপলব্ধিও যে ছায়ার প্রতিযোগিতা-সাপেক্ষ, তাহা কে বলিল? একটা ঘর যখন দীপালোকে আলোকিত হয়, তখন ছায়ার প্রতিযোগিতা তাহার মধ্যে কোথায়? ইহার উত্তর এই যে, একটা ঘর যখন দীপালোকে আলোকিত হয়, তখন সেই আলোকের প্রত্যেক ছেদ স্থানেই ছায়া নিপতিত হয়; কোথাও বা ঘনচ্ছায়া নিপতিত হয়, কোথাও বা অৰ্দ্ধ ছায়া নিপতিত হয়; তা ছাড়া ঘরের মধ্যে দীপালোক অপেক্ষা মলিন বর্ণের বস্তু যত কিছু আছে, যেমন আবলুষ কাঠ, সবুজ কাপড় ইত্যাদি, তাহাও ছায়ারই সামিল। ফল কথা এই যে, আমাদের চক্ষের সম্মুখে যদি কেবলমাত্র একরঙা আলোক নিত্যনিয়ত বর্ত্তমান থাকিত, আর তাহার কোনো স্থানে যদি কোনোপ্রকার রঞ্জন বা অঞ্জনের সংস্পর্শ না থাকিত, তাহা হইলে হইত এই যে, আমরা যেমন শতমন বায়ুর ভার মস্তকের উপরে অষ্টপ্রহর বহন করিয়াও তাহার সরিষা-ভোরও উপলব্ধি করি না, তেমনি আমাদের চক্ষুর উপরে অষ্টপ্রহর আলোকের বর্ষণ হইলেও আমরা তাহার কণামাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। যেখানেই আমরা সূর্য্যাতপ বা চন্দ্রাতপ দেখি, সেইখানেই তাহার আশে-পাশে, ছেদ-স্থানে এবং সীমাপ্রদেশে ছায়া বা বর্ণমালিন্য সংলগ্ন দেখি, আর সেই ছায়া বা বর্ণমালিন্য সংলগ্ন দেখি বলিয়া তাহারই প্রতিযোগে সূর্য্যাতপ বা চন্দ্রাতপ দেখিতে পাই—নচেৎ দেখিতে পাইতাম না।

অতএব এটা সুনিশ্চিত যে, ছায়ার প্রতিযোগেই আলোকের প্রকাশ সম্ভবে; অসতের প্রতিযোগেই সতের প্রকাশ সম্ভবে; আর সতের সেই যে প্রকাশ, তাহারি নাম চিৎ বা জ্ঞান। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সৎ: শান্তিপ্রধান, চিৎ প্রতিযোগ-প্রধান। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, আনন্দ সংযোগ-প্রধান। একদিকে সতের প্রশান্তি এবং অচল-প্রতিষ্ঠা, আর-এক দিকে চিতের উৎক্রান্তি এবং প্রকাশ, এই দুয়ের ঐকতানিক সংযোগই আনন্দের উৎস। গোড়া'র ত্রিকের ভিতরে রূপকতালের তরঙ্গলীলা, এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল —শেষের ত্রিকের ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলে অবিকল তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

শেষের ত্রিক হ'চ্চে—(১) প্রাণ, (২) মন, (৩) বুদ্ধি। কল-প্রধান শতাব্দীর (Mechanical ageএর) এক কথায়—কলিযুগের—প্রধান একজন তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত (আর কেহ নহেন—স্পেন্সর, প্রাণের সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করিতে গিয়া বিভ্রান্তির তরঙ্গকল্লোলে হাবুডুবু খাইয়াছেন! হাবুডুবু খাইবারই কথা। প্রাণকে বুদ্ধি এবং মন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে গিয়াছেন—কাজেই হাবুডুবু খাইয়াছেন।

তিনি যদি সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধিকে ধরিতেন, আর তাহার পরে মনকে অর্দ্ধপরিস্ফুট বুদ্ধি, এবং প্রাণকে অপরিস্ফুট মন বলিয়া অবধারণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হাবুডুবু খাইতে হইত না ; কিন্তু তিনি ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন ; তিনি প্রথমেই প্রাণকে একপ্রকার উচ্চ অঙ্গের ঘড়ির কল-রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন ; তাহার পরে তিনি মনকে উচ্চ অঙ্গের প্রাণ, এবং বুদ্ধিকে উচ্চ অঙ্গের মন করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন ; কাজেই হাবুডুবু খাইয়াছেন। বড়'দের দৃষ্টান্ত ছোটো'দের উপরে কাজ করে—ইহা খুবই সত্য ; কিন্তু সকল ছোটো'র উপরে সমানতরো কাজ করে না ; একদল ছোটো'র চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে, আর-এক-দল ছোটো'র চক্ষু ফুটাইয়া তোলে। বড় বড় বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের অনেকগুলা নিছক বলগর্ব্ব উক্তি (অর্থাৎ গায়ের জোরের কথা) আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের বালকদিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে—ইহা আমার দ্যাখা কথা। ক্যাণ্টের কথা ছাড়িয়া দেও —ক্যাণ্ট্ দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ ! তাঁহার ন্যায় অকৃত্রিম সত্যানুরাগী দার্শনিক পণ্ডিতের যুক্তিপূর্ণ বিবেচনাসিক্ত ওজনের বাক্যসকলের সহিত স্পেন্সর, মিল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি-সকলকে তুলাইয়া দেখিলে শেষোক্ত পণ্ডিতগণের বিপথগামিতার প্রতি কাহার না চক্ষু ফুটে ? নিতান্ত যে অন্ধ—তাহারও চক্ষু ফুটে। বলিতে কি—স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনিক খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ যে-পথে চলিয়া ভ্রান্তি-কূপে নিমগ্ন হইয়াছেন, আমি ঠিক্ তাহার বিপরীত পথে চলিয়া সে বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জড়কে জ্ঞানের সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, প্রাণকে একপ্রকার ঘড়ির কল করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। আমি তাহা না করিয়া প্রথমেই বুদ্ধিকে আলোচ্য-পদবীতে বরণ করিয়াছি। বুদ্ধির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলাম যে, বুদ্ধির ভিতরেই তিনপ্রকার সত্তা একত্র জমাটবদ্ধ রহিয়াছে ;—অব্যক্ত সত্তা গভীরে নিমগ্ন রহিয়াছে ; প্রাতিভাসিক সত্তা উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং বাস্তবিক সত্তা দুইকে ক্রোড়ে করিয়া বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। বুদ্ধির মুখ্য উপজীবিকাই হ'চ্চে বাস্তবিক সত্তা ; মনের মুখ্য উপজীবিকা--প্রাতিভাসিক সত্তা ; প্রাণের মুখ্য উপজীবিকা—অব্যক্ত সত্তা। এখন দেখিতে হইবে এই যে, প্রাণকে একপ্রকার উচ্চ অঙ্গের ঘড়ির কল বলিলে, তাহার পরিচয়-জ্ঞাপক প্রভেদ-লক্ষণের কিছুই বলা হয় না ; অর্থাৎ আর আর কল হইতে প্রাণের বিশেষত্ব যে কোন্খানটিতে, তাহার কিছুই বলা হয় না। স্পেন্সরের দলের পণ্ডিত-বর্গের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, প্রাণের সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন যদি করিতেই হয়, তবে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত যে, জল যেমন তরলীভূত বাষ্প এবং বরফ যেমন ঘনীভূত জল ; তেমনি, মন প্রাতিভাসিক বুদ্ধি, এবং প্রাণ অব্যক্ত মন। পূর্ব্বে আমি দেখাইয়াছি যে, সৎ শান্তি-প্রধান, চিৎ প্রতিযোগ-প্রধান; এবং আনন্দ সংযোগ-

প্রধান; এখন দেখাইতে চাই যে, প্রাণ শান্তি-প্রধান, মন প্রতিযোগ-প্রধান, এবং বুদ্ধি সংযোগ-প্রধান। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ ভেদাভেদ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রাণের প্রধান আড্ডা হ'চ্চে ভাব-রাজ্যে সুষুপ্তি, এবং আবির্ভাবরাজ্যে তরুলতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থ। মনের প্রধান আড্ডা হ'চ্চে ভাবরাজ্যে স্বপ্ন, এবং আবির্ভাব-রাজ্যে পশুপক্ষী প্রভৃতি মূঢ়জীব। বুদ্ধির প্রধান আড্ডা হ'চ্চে ভাব-জগতে জাগরিতাবস্থা এবং আবির্ভাব-জগতে মনুষ্য।

ত্রিক-গণের মধ্যে সৌহার্দ্দ-বন্ধন কি চমৎকার! একটা ত্রিককে ডাকিলে দশটা ত্রিক জোটবদ্ধ হইয়া তাহার পাছু-পাছু ছুটিয়া আইসে। ডাকিলাম প্রাণ-মন-বুদ্ধিকে; আর অমনি দেখিতে-না-দেখিতে সুষুপ্তি-স্বপ্ন-জাগ্রৎ এবং তরুলতা-পশুপক্ষি-মনুষ্য জোটবদ্ধ হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত! এক্ষণে আবার, আর-একটি ত্রিক নূতন দেখা দিতেছে—সে ত্রিক হ'চ্চে (১) ভোগ, (২) কর্ম্ম, (৩) জ্ঞান। এই নূতন ত্রিকটি'র সহিত উদ্ভিদ্, মূঢ়জীব এবং মনুষ্য—এই পরিদৃশ্যমান ত্রিকটির তাল-মান-লয়ের মিল যে কেমন চমৎকার, তাহা দেখিলে মন আশ্চর্য্য-রসে দ্রবীভূত হয়; তাহা এইরূপ:—

ভোগ-শব্দের মুখ্য অর্থ পূরণ—অভাবের পূরণ; তার সাক্ষী—অন্নদ্বারা শরীরে অভাব-পূরণের নাম অন্ন ভোগ করা; আনন্দদ্বারা মনের অভাব-পূরণের নাম আনন্দ ভোগ করা; ইত্যাদি। যে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির গৃহ ভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ, তাঁহাকে আমরা বলি "সুখী"। কিন্তু সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তি সহস্র সুখী হইলেও তাঁহার ভোগের সামগ্রী ক্রমাগতই ক্ষয় পাইতে থাকে; আর, সেইজন্য তাঁহাকে পুনঃপুন ভোগের সামগ্রী জোগাড় করিতে হয়। ভোগ্যবস্তুর আয়োজন কষ্টকর ব্যাপার; কাজেই, চেতনাবান্ জীবমাত্রকেই সুখ-ভোগের সঙ্গে সঙ্গে, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ফলে, দুঃখের প্রতিযোগেই সুখের স্বাদ-গ্রহণ সম্ভবে এবং সুখের প্রতিযোগেই দুঃখের স্বাদ-গ্রহণ সম্ভবে। পর্য্যায়-ক্রমে সুখদুঃখের ওলট্-পালট্ ব্যতিরেকে সুখও অনুভূত হইতে পারে না, দুঃখও অনুভূত হইতে পারে না। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থের ভোগের সামগ্রী প্রতিনিয়তই তাহাদের হাতের কাছে সাজানো রহিয়াছে:—তাহাদের একতালার ভাণ্ডার-ঘরে আর্দ্র মৃত্তিকা রহিয়াছে; সেই স্থান হইতে তাহারা পানীয় আহরণ করে; তাহাদের দোতালার মুক্ত ভাণ্ডারে বায়ু রহিয়াছে; সেই স্থান হইতে তাহারা কার্বনাদি অন্ন আহরণ করে; তাহাদের তেতালার ঘরে সূর্য্যাতপ রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে তাহারা আলোক এবং উত্তাপ আহরণ করে। বৃক্ষের কোনো দুঃখ নাই; দুঃখ নাই—কাজেই সুখও নাই; কেন না, (ইতিপূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি) দুঃখের প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে সুখের স্বাদ-গ্রহণ সম্ভবে না। সুখদুঃখের অনুভব উৎপাদন করিতে হইলে ভোগের আয়তন কিনা শরীর, এবং

ভোগের সামগ্রী কিনা অন্নাদি, এ-দুয়ের মাঝখানে একটা প্রাচীরের ব্যবধান নিতান্তই আবশ্যক। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, প্রকৃতি-মাতা বৃক্ষ-লতাদির ভোগ্য-সামগ্রী যেমন প্রতিনিয়তই তাহাদের হাতের কাছে সাজাইয়া রাখেন—পশুপক্ষীদিগের ভোগের সামগ্রী তেমন করিয়া কেহ তাহাদের হাতের কাছে সাজাইয়া রাখে না। পশুপক্ষীদিগের শরীর ক্ষুধাতৃষ্ণার অগ্নি-শরণ বা অগ্নিমন্দির, আর সেই অগ্নির হবনীয়-পদার্থ যোজন-যোজন দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; কাজেই, কর্ম্ম-চেষ্টার পথ দিয়া ঐ অগ্নি এবং ঐ হব্যসামগ্রীর মধ্যে ক্রমাগতই সংযোগ-বিয়োগ চলিতে থাকে, আর সেইগতিকে সুখ-দুঃখের ক্রমাগতই ওলট্-পালট্ হইতে থাকে।

বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থের কর্ম্ম-চেষ্টা নাই—ভোগই তাহাদের সর্ব্বস্ব। পশু-পক্ষীরা পর্য্যায়-ক্রমে ভোগ এবং কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়। একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থকার তাই বলিয়াছেন যে, মূঢ়জীবেরা "কুর্ব্বতে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে"—ভোগের জন্য কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মের জন্য ভোগ করে। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, দুঃখই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; অথচ, বিশ্ববিধাতার কি আশ্চর্য্য ন্যায় এবং দয়া, কর্ম্মেতে ভোগের সুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া দুঃখকে কেবল যে ভুলাইয়া দ্যায়, তাহা নহে, অধিকন্তু সুখকে দ্বিগুণিত—চতুর্গুণিত করিয়া তোলে। মনে কর, একটা বিজন প্রান্তরের মধ্যে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক হইয়াছে; আর, ক্রোশ-খানেক দূরে একটা দেবালয়ের অতিথি-শালা রহিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার প্রত্যভিমুখে আমি দ্রুতবেগে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। এরূপ অবস্থায়—কে বলিল যে, আমার ক্ষুধার জ্বালা দুঃখ, তাহা সুখের নিদান! আমি যে, অতিথি-শালায় অন্ন-ভোজন করিয়া সুখী হইব—আমার ক্ষুধার জ্বালা তাহারই শুভ-চিহ্ন। কে বলিল যে, দ্রুত-গমনের পরিশ্রম দুঃখ? তাহা সুখের নিদান! আমি যে, অচিরে অতিথি-শালায় উপনীত হইয়া বিশ্রামের সুখ উপ-ভোগ করিব—আমার দ্রুত-গমনের পরিশ্রম তাহারই শুভ-চিহ্ন। ক্ষুধার দুঃখ যদি সুখের বিষয় না হইত, তবে লোকে পয়সা খরচ করিয়া অগ্নিকর ঔষধ ক্রয় করিত না। অঙ্গ-চালনার পরিশ্রম যদি সুখের বিষয় না হইত, তবে ইউরোপের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নাচের মজ্‌লিসে নৃত্য করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভোগ-মন্দিরে প্রবেশ করিত না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জীবের কর্ম্ম-চেষ্টাতে এক-তো ভাবী সুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া কর্ম্মের দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই মনে করিতে দ্যায় না; তাহাতে আবার কর্ম্ম-চেষ্টা নিজেই একপ্রকার ভোগ (অর্থাৎ অভাবের পূরণ), যে হেতু কর্ম্মদ্বারা জড়তা-রূপী অভাবের পূরণ হয়।

স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বৃক্ষলতাতে ভোগ-ক্রিয়ারই একাধিপত্য; মূঢ়জীবে ভোগ-ক্রিয়া এবং কর্ম্মচেষ্টা উল্‌টিয়া-পাল্‌টিয়া পর্য্যায়-ক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়। মনুষ্য সময়ে সময়ে ভোগ এবং কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া—উভয়ের ভাল-মন্দের

বিচার করে ;—কোন্ সময়ে ভোগ ভাল—কোন্ সময়ে কর্ম্ম ভাল—কিরূপ ভোগ ভাল—কিরূপ কর্ম্ম ভাল—কতমাত্রা ভোগ ভাল—কতমাত্রা কর্ম্ম ভাল—কিরূপ প্রণালীতে ভোগ করা ভাল—কিরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম করা ভাল, এই সব ভাল-মন্দের বিচার করে ; ভালমন্দের বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে। ভাল-মন্দের বিচার সত্যাসত্যের প্রতীতির উপরে নির্ভর করে। যাহার সত্যাসত্যের জ্ঞান নাই, তাহার ভাল-মন্দ-বিবেচনার গোড়া'র বাঁধুনি নিতান্তই আল্‌গা। সত্যই বুদ্ধির মুখ্য আলোচ্য বিষয়। সত্য বস্তুত এক, কিন্তু কার্য্যত অনেক। ভিন্ন ভিন্ন সত্য ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উপযোগী। জ্যোতিষ্য সত্য পঞ্জিকা-প্রণয়ন-কার্য্যের উপযোগী ; জ্যামিতিক' সত্য স্থাপত্য-কার্য্যের উপযোগী ; রাসায়নিক সত্য ছায়াঙ্কন (photography), ঔষধ-প্রস্তুত-করণ প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী ; সমগ্র সত্য সমগ্র আত্মার পুরুষার্থ-সাধনের উপযোগী। সমগ্র সত্য অখণ্ড এবং অপরিচ্ছিন্ন ; ব্যাবহারিক সত্য খণ্ড খণ্ড এবং পরিচ্ছিন্ন ; তার সাক্ষী—দার্শনিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, বৈদিক সত্য, পৌরাণিক সত্য, 'জ্যামিতিক সত্য, রাসায়নিক সত্য, এবংবিধ নানাশ্রেণীর নানা সত্য একই অখণ্ড সত্যের বহুধা-বিচিত্র শাখা-প্রশাখা। সব সত্যই বুদ্ধির আলোচ্য বিষয়। একই অখণ্ড সত্যকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কাজের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়, তেমনি একই আত্মা পুরুষের বুদ্ধিকে ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার কার্য্যের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয় ; তার সাক্ষী—প্রজ্ঞা এক থাকের বুদ্ধি ; বিজ্ঞান দ্বিতীয় আর-এক থাকের বুদ্ধি ; ধর্ম্মবুদ্ধি তৃতীয় আর-এক থাকের বুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি চতুর্থ আর-এক থাকের বুদ্ধি ; ইত্যাদি। তাহার মধ্যে—প্রজ্ঞার আলোচ্য বিষয় অখণ্ড সত্য ; বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় জ্যামিতি, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড বৈজ্ঞানিক সত্য ; ধর্ম্মবুদ্ধির আলোচ্য বিষয় মনুষ্যের পুরুষকার, বিশ্ববিধাতার ন্যায় এবং দয়া, কর্ম্মফল প্রভৃতি' আধ্যাত্মিক সত্য ; বিষয়-বুদ্ধির আলোচ্য বিষয় অর্থের আয়-ব্যয়, সামাজিক রীতি-নীতি-প্রথা প্রভৃতি লৌকিক সত্য !

এখানে একটি বিষয় সবিশেষ দ্রষ্টব্য—বিষয়টি গুরুতর ; তাহা এই যে, উপরের উপরের ধাপে নীচের নীচের ধাপ সর্ব্বতোভাবে সম্ভুক্ত থাকে ; অর্থাৎ নীচের নীচের ধাপে যাহা কিছু আছে, সমস্তই উপরের উপরের ধাপে মোট-বাঁধা হয়—কোনো-কিছুই বাদ পড়ে না। তার সাক্ষী— বিদ্যালয়ের বালক যখন নীচের শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়িয়া-চুকিয়া উপরের শ্রেণীতে রঘুবংশ পড়িতে আরম্ভ করে, তখন সে রঘুবংশের ভিতরে তাহার পূর্ব্বশিক্ষিত সমস্ত বৈয়াকরণিক সত্যই সম্ভুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। ইহাও তেমনি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বুদ্ধির ভিতরে মন এবং প্রাণ, দুইই সম্ভুক্ত রহিয়াছে ; বাস্তবিক সত্তাতে প্রাতিভাসিক সত্তা এবং অব্যক্ত সত্তা, দুইই সম্ভুক্ত রহিয়াছে ; অখণ্ড এবং অপরিচ্ছিন্ন সত্যে সমস্ত সত্যই সম্ভুক্ত

রহিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, অখণ্ড সত্য বুঝি বা খণ্ড সত্য হইতে পরিচ্ছিন্ন একটা কিছু। তাঁহাদের এ বোধ নাই যে, অখণ্ড সত্য যদি খণ্ড সত্য হইতে পরিচ্ছিন্নই হ'ন, তবে তাহা তো পরিচ্ছিন্ন সত্য! পরিচ্ছিন্ন সত্যের নামই তো খণ্ড সত্য! পরিচ্ছিন্ন সত্য আবার অখণ্ড সত্য হইল কিরূপে? তেমনি আবার, অনেকে মনে করেন যে, বুদ্ধি প্রাণ-মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের পদার্থ। ইঁহাদের এ বোধ নাই যে, প্রাণ-মনের সহিত বুদ্ধির যদি কোনো প্রকার একাত্মভাব না থাকে, তবে বুদ্ধি রাজ্যহীন রাজার ন্যায় অথবা রথহীন রথীর ন্যায় কেবল একটা আভিধানিক শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির মধ্যে যে, কোনো হিসাবেই প্রভেদ নাই—এ কথা কেহই বলিতেছে না। প্রভেদ খুবই আছে। কিন্তু প্রভেদ যাহা আছে, তাহা অভেদেরই পরিপোষক, তা বই তাহা অভেদের হন্তারক নহে। আমি এখানে দেখাইতে চাই এই যে, তিনের মধ্যে প্রভেদের ছেদচিহ্ন যেমন সুস্পষ্ট, একাত্মভাবের বন্ধন তেমনি সুদৃঢ়; দুয়েরই গুরুত্ব সমান। প্রভেদ কেমন সুস্পষ্ট, এবং একাত্মভাবের বন্ধন কেমন সুদৃঢ়, তাহা পরে পরে ক্রমশই অধিকাধিক প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলা ব্যাকরণ

তর্কের বিষয়টা কি, অধিকাংশ সময়ে তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই তর্ক বাধিয়া যায়। সেটা যতই কম বোঝা যায়, তর্কের বেগ ততই প্রবল হয়—অবশেষে খুনাখুনি-রক্তপাতের পর হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে, দুই পক্ষের মধ্যে মতের বিশেষ অনৈক্য নাই। অতএব ঝগড়াটা কোন্‌খানে, সেইটে আবিষ্কার করা একটা মস্ত কাজ।

আমি কতকগুলা বাংলা প্রত্যয় ও তাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া বিচারের জন্য 'পরিষৎ'সভার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। আমার সে লেখাটা এখনো পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির হয় নাই, সুতরাং আমার তরফের বক্তব্য পাঠকের সম্মুখে অনুপস্থিত। শুনিয়াছি, কোন সুযোগে তাহার প্রুফ্‌টি সংগ্রহ করিয়া লইয়া কোন কাগজে তাহার প্রতি-

বাদ বাহির হইয়া গেছে। আমার সাক্ষী হাজির নাই, এই অবকাশে বাদের পূর্ব্বেই প্রতিবাদকে পাঠকসভায় উপস্থিত করিয়া একতরফা মীমাংসার চেষ্টা করাকে ঠিক ধর্ম্মযুদ্ধ বলে না।

এখন সে লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা।

বাংলায় জল হইতে জোলো, মদ হইতে মোদো, পানি হইতে পান্‌তা, নুন্‌ হইতে নোন্‌তা, বাঁদর হইতে বাঁদ্‌রাম, জ্যাঠা হইতে জ্যাঠাম প্রভৃতি চলিত কথাগুলি হইতে উয়া, তা, আম প্রভৃতি প্রত্যয় সঙ্কলন করিয়া ভাবী ব্যাকরণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ তাঁহারাই করিবেন, আমার কেবল মজুরিই সার। সেই মজুরির জন্য, যে অল্প একটুখানি বেতন আমার পাওনা আছে বলিয়া আমি সাধারণের কাছে মনে মনে দাবি করিয়াছিলাম, তাহা নামঞ্জুর হইয়া গেলেও বিশেষ ক্ষতিবোধ করিতাম না। সম্প্রতি দাঁড়াইয়াছে এই যে, ভিক্ষায় কাজ নাই, এখন কুত্তা বুলাইয়া লইলে বাঁচি।

এখন আমার নামে উল্টা অভিযোগ আসিয়াছে যে, আমি এই চলিতকথাগুলা ও তাহার প্রত্যয় সংগ্রহে সহায়তা করিয়া বাংলা ভাষাটাকেই মাটি করিবার চেষ্টায় আছি।

যে কথাগুলা লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বাংলায় রাখা বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর কাহারো সাধ্যই নহে। তাহারা আছে, এবং কাহারো কথায় তাহারা নিজের স্থান ছাড়িবে না। জগতে যে কোন জিনিষই আছে, তাহা ছোট হউক আর বড় হউক, কুৎসিত হউক আর সুশ্রী হউক, প্রাদেশিক হউক আর নাগরিক হউক, তাহার তত্ত্বনির্ণয় বিজ্ঞানের কাজ। শরীরতত্ত্ব কেবল উত্তমাঙ্গেরই বিচার করে এমন নহে, পদাঙ্গুলিকেও অবজ্ঞা করে না। বিজ্ঞানের ঘৃণা নাই, পক্ষপাত নাই।

কিন্তু এই বাংলা চলিতকথাগুলি এবং তাহাদের সংস্কৃত-ব্যাকরণ-নিরপেক্ষ বিশেষ নিয়মগুলির উল্লেখমাত্র করিলেই বাংলা ভাষা নষ্ট হইয়া যাইবে, এমন ধারণা কেন হয়? হিন্দুঘরে গ্রাম্য আত্মীয়ের—দরিদ্র আত্মীয়েরও ত প্রবেশনিষেধ নাই। যদি কেহ নিষেধ করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয় ত জবাব দেয়, উহারা আত্মীয় বটে, কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে।

বাংলায় যাহা কিছু সংস্কৃতের নিয়ম মানে না, তাহাকে একদল লোক কুলত্যাগী বলিয়া ত্যাগ করিতে চান। এবং সংস্কৃতের নিয়মকে বাংলার সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের চেষ্টা। তাঁহাদের বিশ্বাস, স্বরচিত ব্যাকরণে তাঁহারা সংস্কৃত-নিয়মকে জাহির করিলে এবং বাংলা নিয়মের উল্লেখ না করিলেই, বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহারা মনে করেন, "পাগ্‌লাম" এবং "সাহেবিয়ানা" কথা যে বাংলায় আছে, ও "আম" এবং "আনা" নামক সংস্কৃতেতর প্রত্যয় দ্বারা তাহারা সিদ্ধ, এ কথা না তুলিলেই আপদ্‌ চুকিয়া যায়—এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন "উন্মত্ততা" ও "ইংরাজানুকৃতিশীলত্ব" কথা ব্যবহার করিলেই গ্রাম্যকথা-দুটার অস্তিত্বই ঢাকিয়া রাখা যাইবে।

বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত-কারক-বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান।

সংস্কৃতভাষায় সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্ম্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত-ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে? যদি "ধোপাকে কাপড় দিলাম" কর্ম্ম এবং "গরিবকে কাপড় দিলাম" সম্প্রদান হয়, তবে একবচনে "বালক", দ্বিবচনে "বালকেরা" ও বহুবচনেও "বালকেরা" না হইবে কেন? তবে বাংলা ক্রিয়াপদেই বা একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন ছাড়া যায় কি জন্য? তবে ছেলেদের মুখস্থ করাইতে হয়—একবচন "হইল", দ্বিবচন "হইল", বহুবচন "হইল"; একবচন "দিয়াছে", দ্বিবচন "দিয়াছে", বহুবচন "দিয়াছে"। ইত্যাদি। "তাহাকে দিলাম" যদি সম্প্রদানকারকের কোঠায় পড়ে, তবে "তাহাকে মারিলাম" সন্তাড়ন-কারক, "ছেলেকে কোলে লইলাম" সংলালন-কারক, "সন্দেশ খাইলাম" সম্ভোজন-কারক, "মাথা নাড়িলাম" সঞ্চালনকারক এবং এক বাংলা কর্ম্মকারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে।

সংস্কৃত ও বাংলায় কেবল যে কারক-বিভক্তির সংখ্যায় মিল নাই, তাহা নহে। তাহার চেয়ে গুরুতর অনৈক্য আছে। সংস্কৃতভাষায় কর্ত্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের জটিলতা বিস্তর, এইজন্য আধুনিক গৌড়ীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত-কর্ম্মবাচ্য অবলম্বন করিয়াই প্রধানত উদ্ভূত। "করিল" ক্রিয়াপদ "কৃত" হইতে, "করিব করিবে" "কর্ত্তব্য" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে হওয়া সম্ভবপর নহে; হর্ণ্‌লে-সাহেব তাঁহার তুলনামূলক গৌড়ীয় ব্যাকরণে ইহার প্রভূত প্রমাণ দিয়াছেন। এই কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়া বাংলায় কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহার হইতে থাকায় সংস্কৃত ব্যাকরণ আর তাহাকে বাগ্ মানাইতে পারে না। সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তি "এন" বাংলায় "এ" হইয়াছে—যেমন, "বাঁশে মাথা ফাটিয়াছে", "চোখে দেখিতে পাই না" ইত্যাদি। "বাঘে খাইল" কথাটার ঠিক সংস্কৃত তর্জ্জমা "ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ"—কিন্তু "খাদিত"শব্দ বাংলায় "খাইল" আকার ধরিয়া কর্ত্তৃবাচ্যের কাজ করিতে লাগিল—সুতরাং বাঘ যাহাকে খাইল, সে বেচারা আর কর্ত্তৃকারকের রূপ ধরিতে পারে না—এইজন্য "ব্যাঘ্রেণ রামঃ খাদিতঃ" বাংলায় হইল "বাঘে রামকে খাইল"—"বাঘে"শব্দে করণকারকের একার বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও "রাম"শব্দে কর্ম্মকারকের "কে" বিভক্তি লাগিল। এ খিচুড়ি সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন পর্য্যায়েই পড়ে না। পণ্ডিতমশায় বলিতে পারেন, হর্ণ্‌লে সাহেব-টাহেব আমি মানি না, বাংলায় "একার" বিভক্তি কর্ত্তৃকারকের বিভক্তি। আচ্ছা দেখা যাক্, তেমন করিয়া মেলানো যায় কি না। "ধনে শ্যামকে বশ করা গেছে" ইহার সংস্কৃত

অনুবাদ, "ধনেন শ্যামো বশীকৃতঃ"। কিন্তু বাংলা বাক্যটির কর্ত্তা কে? "ধনে" যদি কর্ত্তা হইত, তবে "করা গেছে" ক্রিয়া "করিয়াছে" রূপ ধরিত। "তাঁহাকে"শব্দ কর্ত্তা নহে, "কে" বিভক্তিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কর্ত্তা উহ্য আছে বলা যায় না—কারণ "করা গেছে" ক্রিয়া কর্ত্তা মানে না, "আমরা করা গেছে", "তাঁহারা করা গেছে" হয় না। অথচ ভাবার্থ দেখিতে গেলে, "বশ করা গেছে" ক্রিয়ার কর্ত্তা উহ্যভাবে "আমরা"। করা গেছে, খাওয়া গেছে, হওয়া গেছে, সর্ব্বত্রই উত্তম পুরুষ। কিন্তু এই "আমরা" কথাটাকে স্পষ্টভাবে ব্যবহার করিবার জো নাই—"আমরা আয়োজন করা গেছে" বলিতেই পারি না। এইরূপ কর্ত্তৃহীন কবন্ধ-বাক্য সংস্কৃতভাষায় হয় না বলিয়া কি পণ্ডিতমশায় বাংলা হইতে ইহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন? তাহা হইলে ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে। "তাঁহাকে নাচিতে হইবে" কথাটার সংস্কৃত কি? "তাং নর্ত্তিতুং ভবিষ্যতি" নহে। যদি বলি, "নাচিতে হইবে" এক কথা, তবু "তাং নর্ত্তব্যম্" হয় না—অতএব দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতে যেখানে "তয়া নর্ত্তব্যম্", বাংলায় সেখানে "তাহাকে নাচিতে হইবে"। ইহা বাংলা ব্যাকরণ, না সংস্কৃত ব্যাকরণ? "আমার করা চাই"—এই "চাই" ক্রিয়াটা কি? ইহার আকার দেখিয়া ইহাকে উত্তমপুরুষ বোধ হয়—কিন্তু সংস্কৃতে ইহাকে "মম করণং যাচে" বলা চলে না। বাংলাতেও "আমি আমার করা চাই" এমন কথনো বলি না। বস্তুত "আমার করা চাই" যখন বলি, তখন অধিকাংশ সময়েই সেটা আমি চাই না, পেয়াদায় চায়। অতএব এই "চাই"ক্রিয়াটা সংস্কৃত-ব্যাকরণের কোন্ জিনিষটার কোন্ সম্বন্ধী? "আমাকে তোমার পড়াতে হবে", এখানে "তোমার" সর্ব্বনামটি সংস্কৃত কোন্ নিয়মমতে সম্বন্ধপদ হয়? এই বাক্যের সংস্কৃত অনুবাদ—"ত্বং মাং পাঠয়িতুম্ অর্হসি"; এখানে "ত্বং" কর্ত্তৃকারক ও প্রথমা এবং "অর্হসি" মধ্যমপুরুষ—কিন্তু বাংলায় "তোমার" সম্বন্ধপদ এবং "হবে" প্রথম-পুরুষ। সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়মে এ সকল বাক্য সাধ্য অসাধ্য, বাংলা ভাষার নিয়মে এগুলিকে পরিত্যাগ করা ততোধিক অসাধ্য—পণ্ডিতমশায় কোন্ পথে যাইবেন? "আমাকে তোমার পড়াতে হবে" বাক্যটির প্রত্যেক শব্দই সংস্কৃতমূলক, অথচ ইহার প্রত্যেক শব্দটিতেই সংস্কৃত-নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে।

অপরপক্ষে বলিতে পারেন, যেখানে সংস্কৃতে-বাংলায় যথার্থ প্রভেদ ঘটিয়াছে, সেখানে প্রভেদ মানিতে রাজি আছি, কিন্তু যেখানে প্রভেদ নাই, সেখানে ত ঐক্য স্বীকার করিতে হয়। যেমন সংস্কৃতভাষায় "ইন্"প্রত্যয়যোগে "বাস" হইতে "বাসী" হয়, তেমনি সেই সংস্কৃত "ইন্"প্রত্যয়যোগেই বাংলা "দাগ" হইতে "দাগী" হয়—বাংলা প্রত্যয়টাকে কেহ যদি "ই"প্রত্যয় নাম দেয়, তবে সে অন্যায় করে।

আমরা বলিয়াছিলাম বটে যে, চাষি, দামি, দাগি, দোকানি প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত "ইন্"প্রত্যয়যোগে নহে, বাংলা "ই"প্রত্যয়-যোগে হইয়াছে। কেন বলিয়াছিলাম, বলি।

জিজ্ঞাস্য এই যে, "বাসী"শব্দ যে প্রত্যয়-যোগে "ঈ" গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে "ঈ"-প্রত্যয় না বলিয়া "ইন্"প্রত্যয় কেন বলা হইয়াছে? "ইন্"প্রত্যয়ের "ন্"টা মাঝে মাঝে "বাসিন্" "বাসিনী" রূপে বাহির হইয়া পড়ে বলিয়াই ত! যদি কোথাও কোন অবস্থা-তেই সে "ন" না দেখা যায়, তবু কি ইহাকে "ইন্"প্রত্যয় বলিব? ব্যাঙাচির ল্যাজ ছিল বটে, কিন্তু সে ল্যাজটা খসিয়া গেলেও কি ব্যাংকে ল্যাজবিশিষ্ট বলিতে হইবে? কিন্তু পণ্ডিতমশায় বলেন, সংস্কৃত "মানী"শব্দও ত বাংলায় "মানিন্" হয় না! আমাদের বক্তব্য এই যে, কেহ যদি সেইভাবে কোথাও ব্যবহার করেন, তাঁহাকে কেহ এক-ঘরে করিবে না, অন্তত "মানী"শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গে "মানিনী" হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী-বিদ্যালয়ের মসীচিহ্নিত বালিকাকে যদি "দাগিনী" বলা যায়, তবে ছাত্রীও হাঁ করিয়া থাকিবে, তাহার পণ্ডিতও টাকে হাত বুলাইবেন।

তখন বৈয়াকরণ পণ্ডিতমশায় উঠিয়া বলিবেন, "দাগ" কথাটা যে বাংলা কথা, ওটা ত সংস্কৃত নয়, সেইজন্য স্ত্রীলিঙ্গে তাহার ব্যবহার হয় না। ঠিক কথা, যেমন বাংলায় বিশেষণশব্দ স্ত্রীলিঙ্গরূপ পরিত্যাগ করি-য়াছে, তেমনি বাংলায় "ইন্"প্রত্যয় তাহার "ন্" বর্জ্জন করিয়া "ই"প্রত্যয় হইয়াছে।

ভাল, একটি সংস্কৃত কথাই বাহির করা যাক্! "ভার"শব্দ সংস্কৃত। তবু আমা-দের মতে "ভারি" কথায় বাংলা "ই"প্রত্যয় হইয়াছে, সংস্কৃত "ইন্"প্রত্যয় হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, "ভারিণী নৌকা" লিখিতে পণ্ডিতমশায়ের কলমও দ্বিধা করিবে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, "মানী" কথাটা প্রত্যয়সমেত সংস্কৃতভাষা হইতে লইয়াছি। কিন্তু "ভার" কথাটা আমরা সংস্কৃত হইতে পাইয়াছি, "ভারি" কথাটা পাই নাই,—আমাদের প্রয়োজনমত আমরা উহাকে বাংলা প্রত্যয়ের ছাঁচে ঢালিয়া তৈরি করিয়া লইয়াছি। "মাষ্টার" কথা আমরা ইংরাজি হইতে পাইয়াছি, কিন্তু "মাষ্টারি" (মাষ্টার-বৃত্তি) কথায় আমরা বাংলা "ই"প্রত্যয় যোগ করিয়াছি; এই "ই" ইংরাজি mastery শব্দের y নহে। সংস্কৃত ছাঁদে বাংলা লিখিবার সময় কেহ যদি "ভো স্বদেশিন্" লেখেন, তাঁহাকে অনেক পণ্ডিত সমালোচক প্রশংসা করিবেন—কিন্তু কেহ যদি "ভো বিলাতিন্" লিখিয়া রচনায় গাম্ভীর্য্যসঞ্চার করিতে চান্, তবে ঘরে-পরে সকলেই হাসিয়া উঠিবে। কেহ বলিতে পারেন, "বিলাতি" সংস্কৃত "ই"প্রত্যয়, "ইন্"প্রত্যয় নহে। আচ্ছা, দোকান যাহার আছে, সেই "দোকানি"কে সম্ভাষণকালে "দোকানিন্" ও তাহার স্ত্রীকে "দোকানিনী" বলা যায় কি?

আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাংলায় "রাগ"শব্দের অর্থ ক্রোধ। সেই "রাগ"শব্দের উত্তর "ই"প্রত্যয়ে "রাগি" হয়। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব-পদাবলীর কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পণ্ডিত অপণ্ডিত কেহই রুষ্টা স্ত্রীলোককে "রাগিণী" বলিয়া সম্ভাষণ করেন নাই।

গোবিন্দদাস রাধিকার বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন :—

নব অনুরাগিণী অখিল-সোহাগিনী,
পঞ্চম-রাগিণী মোহিনীরে!

গোবিন্দদাস মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, রাধিকার রাগ সর্ব্বদা পঞ্চমেই চড়িয়া আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সঙ্গীতের "রাগিণী" কথাটা সংস্কৃত প্রত্যয়ের দ্বারা তৈরি। "অনুরাগী" কথাটাও সেইরূপ।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, সে যেমনি হউক, এ সমস্তই সংস্কৃতভাষার ব্যবহার হইতে উৎপন্ন, আমিও সে কথা স্বীকার করি। প্রমাণ হইয়াছে, একই মূল হইতে "হংস" এবং ইংরাজি "গ্যাণ্ডার" শব্দ উৎপন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া "গ্যাণ্ডার" সংস্কৃত "হংস"-শব্দের ব্যাকরণগত নিয়ম মানে না, এবং তাহার স্ত্রীলিঙ্গে "গ্যাণ্ডারী" না হইয়া "গূস্" হয়। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, একই আর্য্যপিতামহ হইতে বপ্, বার্ণুফ্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় শাব্দিক ও বাঙালি ব্যাকরণজ্ঞ পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা ব্যাকরণকে যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপকভাবে দেখেন, আমাদের পণ্ডিতরা তাহা দেখেন না; অতএব উৎপত্তি একই হইলেও ব্যুৎপত্তি ভিন্ন প্রকারের হওয়া অসম্ভব নহে। "ইন্"প্রত্যয় হইতে বাংলা "ই"প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে বটে, তবু তাহা "ইন্"প্রত্যয়ের সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলে না,—এইজন্য এই দুটিকে ভিন্ন কোঠায় না ফেলিলে কাজ চালাইবার অসুবিধা হয়। লাঙলের ফলার লোহা হইতে ছুঁচ তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই ছুঁচ দিয়া মাটি চষিবার চেষ্টা করা পাণ্ডিত্য নহে।

বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক্, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামত করিয়া বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। উর্দ্দু ভাষায় পারসি আরবি কথা ঢের আছে, কিন্তু সে কেবল আপনার ছাঁচেই চতুর ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে হিন্দীর বৈমাত্র সহোদর বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। আমাদের বাঙালি কেহ যদি মাথায় হ্যাট্, পায়ে বুট্, গলায় কলার এবং সর্ব্বাঙ্গে বিলাতী পোষাক পরেন, তবু তাঁহার রঙে এবং দেহের ছাঁচে কুললক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃতশব্দ ক'টা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন্ বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কি ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ। সুতরাং ভাষার এই আসল ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে, এখনকার ঘরগড়া কেতাবি ভাষার বাহিরে গিয়া চলিত কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সে সব কথা গ্রাম্য হইতে পারে, ছাপাখানার কালির ছাপে বঞ্চিত হইতে পারে, সাধুভাষায় ব্যবহারের অযোগ্য হইতে পারে, তবু ব্যাকরণকারের ব্যবসা রক্ষা করিতে হইলে, তাহাদের মধ্যেই গতিবিধি রাখিতে হয়।

"ইন্"প্রত্যয়সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, স্ত্রীলিঙ্গে "ইনী" ও "ঈ" সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে "ইনি" "ই" পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃত-ব্যাকরণের ছাঁচ মানে না। সে বাঙালী হইয়া আর এক পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে। রয়ের পরে সে আর মূর্দ্ধন্য ণ গ্রহণ করে না (কলমের মুখে করিতে পারে, কিন্তু জিহ্বাগ্রে করে না)—সংস্কৃত-বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে না, এইজন্য সে অধীনাকে অধীনি বলে। সে যদি নিজেকে সংস্কৃত বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যাকুল হইত, তবে "পাঠা" হইতে "পাঠি" হইত না, "বাঘ" হইতে "বাঘিনি" হইত না। কলু হইতে কলুনি, ঘোড়া হইতে ঘুড়ি, পুরুৎ হইতে পুরুৎনি নিষ্পন্ন করিতে হইলে, মুগ্ধবোধের সূত্র টুক্‌রা টুক্‌রা এবং বিদ্যাবাগীশের টীকা আগুন হইয়া উঠিত।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, ছিছি ও কথাগুলা অকিঞ্চিৎকর, উহাদের সম্বন্ধে কোন বাক্যব্যয় না করাই উচিত। তাহার উত্তর এই যে, "কম্‌লি নেই ছোড়্‌তা!" পণ্ডিতমশায়ও ঘরের মধ্যে কলুর স্ত্রীকে "কল্বী" অথবা "তৈলযন্ত্রপরিচালিকা" বলেন না, সে স্থলে আমরা কোন্ ছার! মাকে মা বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই মা বলিতে যাওয়া দোষের হয়—সেইরূপ বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না।

পণ্ডিত বলেন, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গশব্দে তুমি দীর্ঘ ঈ ছাড়িয়া হ্রস্ব ই ধরিলে যে? আমি বলিব, ছাড়িলাম আর কই? একতলাতেই যাহার বাস, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, নীচে নামিলে যে, সে বলিবে, নামিলাম আর কই, নীচেই ত আছি। "ঘোটকী"র দীর্ঘ হইতে দাবি আছে; সে ব্যাকরণের প্রাচীন সনন্দ দেখাইতে পারে,—কিন্তু "ঘুড়ি"র তাহা নাই। প্রাচীন ভাষা তাহাকে এ অধিকার দেয় নাই, কারণ, তখন তাহার জন্ম হয় নাই,—তাহার পরে জন্মাবধি সে তাহার ইকারের পৈতৃক দীর্ঘতা খোয়াইয়া বসিয়াছে। টিপুসুলতানের কোন বংশধর যদি নিজেকে মৈশুরের রাজা বলেন, তবে তাঁহার পারিষদরা তাহাতে সায় দিতে পারে, কিন্তু রাজত্ব মিলিবে না। হ্রস্ব ইকে জোর করিয়া দীর্ঘ লিখিতে পার, কিন্তু দীর্ঘত্ব মিলিবে না। যেখানে খাস্ বাংলা স্ত্রীলিঙ্গশব্দ, সেখানে হ্রস্ব ইকারের অধিকার, সুতরাং দীর্ঘ ঈর সেখান হইতে ভাসুরের মত দূরে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, বানানের মধ্যে পূর্ব্ব ইতিহাসের চিহ্ন বজায় রাখা উচিত। দেখা যাক্, "মেছনি" কথাটার মধ্যে পূর্ব্ব ইতিহাস কতটা বজায় আছে। ৎ, স এবং যফলা কোথায় গেল? ময়ে একার কোন্ প্রাচীন ব্যবহারের চিহ্ন? "ন"টা কোথাকার কে? ওটা কি মৎস্যজীবিনীর "ন"? তবে জীবিটা গেল কোথায়? এমন আরো অনেক প্রশ্ন হইতে পারে। সদুত্তর এই যে, ৎ এবং স বাংলায় ছ হইয়া গেছে—এই "ছ"ই ৎ এবং সয়ের ঐতিহাসিক চিহ্ন, এই চিহ্ন বাংলা "বাছা"শব্দের মধ্যেও

আছে। পরিবর্ত্তনপরম্পরায় যফলা লোপ পাইয়া পূর্ব্ববর্ণের অকারকে আকার করিয়াছে, যেমন লুপ্ত যফলা অদ্যকে আজ, কল্যকে কাল করিয়াছে—অতএব এই আকারই লুপ্ত যফলার ঐতিহাসিক চিহ্ন। ইহারা পূর্ব্ব ইতিহাসেরও চিহ্ন, এখনকার ইতিহাসেরও চিহ্ন। "মাছ"শব্দের উত্তর বাংলা প্রত্যয় "উয়া" যোগ হইয়া "মাছুয়া" হয়—"মাছুয়া"শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার "মেছো"; "মেছো"শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে "নি"প্রত্যয় হইয়াছে। এই "নি"প্রত্যয়ের হ্রস্ব ই প্রাচীন দীর্ঘ ঈকারের ঐতিহাসিক অবশেষ। আমরা যদি বাংলার অনুরোধে মৎস্যকে কাটিয়া-কুটিয়া মাছ করিয়া লইতে পারি এবং তাহাতে যদি ইতিহাসের জাতি নষ্ট না হইয়া থাকে, তবে বাংলা উচ্চারণের সত্যরক্ষা করিতে দীর্ঘ ঈর স্থলে হ্রস্ব ই বসাইলেও ইতিহাসের ব্যাঘাত হইবে না। মুখে যাহাই করি, লেখাতেই যদি প্রাচীন ইতিহাস রক্ষা করাই বিধি হয়, তবে "মৎস্য" লিখিয়া 'মাছ' পড়িলে ক্ষতি নাই। পণ্ডিত বলিবেন, আমরা সংস্কৃত শব্দেও তিন স, দুই ন, য ও হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরকে লিখি শুদ্ধ, কিন্তু পড়ি অশুদ্ধ, অতএব ঠিক সেই পরিমাণ উচ্চারণের সহিত বানানের অনৈক্য বাংলাতেও চালানো যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, অনেক বাঙালি ইংরাজি w বর্ণের উচ্চারণ করেন না—তাঁহারা লেখেন Wood, কিন্তু উচ্চারণ করেন ood, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের উচ্চারণ-দোষের অনুরূপ বানান করিবার অধিকার তাঁহার নাই; ইহা তাঁহার নিজস্ব নহে;—ইহার বানানে হস্তক্ষেপ করিলে অর্থবোধই হইবে না। কিন্তু "আলমারি"শব্দ "আলমাইরা"হইতে উৎপন্ন হইলেও, উহা জন্মান্তরগ্রহণকালে বাঙালি হইয়া গেছে; সুতরাং বাংলা "আলমারি"কে "আলমাইরা" লিখিলে চলিবে না। সহস্র পারসি কথা বিকৃত হইয়া বাংলা হইয়া গেছে, এখন তাহাদের আর জাতে তোলা চলে না; আমরা "লোকসান্"কে "নুকসান্" লিখিলে ভুল হইবে, এমন কি "লুক্সানও" লিখিতে পারি না। কিন্তু যে পার্সিশব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, অথচ আমাদের রসনার অভ্যাসবশত যাহার উচ্চারণের কিছু ব্যতিক্রম হয়, তাহার বানান্ বিশুদ্ধ আদর্শের অনুরূপ লেখা উচিত। অনেক হিন্দুস্থানি নাইয়ের নীচে ধুতি পরে, আমরা তাহাদের প্রথা জানি, সুতরাং আশ্চর্য্য হই না—কিন্তু সে যদি নাইয়ের নীচে প্যাণ্ট্‌লুন্ পরে, তবে তাহাকে বন্ধুভাবে নিষেধ করিয়া দিতে হয়। নিজের জিনিষ নিজের নিয়মেই ব্যবহার করিতে হয়, পরের জিনিষে নিজের নিয়ম খাটাইতে গেলেই গোল বাধিয়া যায়। যে সংস্কৃতশব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, তাহা সংস্কৃতই আছে,যাহা বাংলা হইয়া গেছে, তাহা বাংলাই হইয়াছে—এই সহজ কথাটা মনে রাখা শক্ত নহে।

কিন্তু কেতাবের বাংলায় প্রতিদিন ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে। আমরা "জড়ে"র "জ" এবং "যখনে"র "য" একইরকম উচ্চারণ করি, আলাদারকম লিখি। উপায় নাই। শিশু বাংলাগদ্যের ধাত্রী ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছেন।

সাবেক কালে "যখন"শব্দটাকে বর্গ্য "জ" দিয়া লেখা চলিত—ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতরা সংস্কৃতের "যৎ"শব্দের অনুরোধে বর্গ্য জকে অন্তস্থ য করিয়া লইলেন, অথচ "ক্ষণ"-শব্দের মূর্দ্ধন্য ণকে বাংলায় দন্ত্য ন-ই রাখিয়া দিলেন। তাহাতে, এই "যখন"শব্দটা একাঙ্গীভূত হরগৌরীর মত হইল —তাহার,

আধভালে শুদ্ধ অন্তস্থ সাজে,
আধভালে বঙ্গ বর্গীয় রাজে।

সৌভাগ্যক্রমে আধুনিক পণ্ডিতরা খাঁট বাংলাশব্দকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের রচনাপংক্তির মধ্যে পারৎপক্ষে স্থান দেন নাই—কেবল যে সকল ক্রিয়া ও অব্যয় পদ নহিলে নয়, সেইগুলাকে সংস্কৃত বানানের দ্বারা যথাসাধ্য শোধন করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদের লেখার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন। এইজন্ত অধিকাংশ খাস্ বাংলা-কথা-সম্বন্ধে এখনো আমাদের অভ্যাস খারাপ হয় নাই—সেগুলার খাঁটি বাংলা বানান্ চালাইবার সময় এখনো আছে।

আমরা এ কথা বলিয়া থাকি, সংস্কৃত-ব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত বলে, বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলা যায় না। ইহাতে যিনি সংস্কৃত-ব্যাকরণের অপমান বোধ করেন, তিনি বলেন, কেন ণিজন্ত বলিব না, অবশ্য বলিব। কবিবর নবীন সেন মহাশয়ের দুইটি লাইন মনে পড়ে—

কেন গাহিব না, অবশ্য গাহিব,
গাহে না কি কেহ সুস্বর বিহনে ?

"ণিজন্ত"শব্দসম্বন্ধেও পণ্ডিতমহাশয়ের সেইরূপ অটল জেদ্—তিনি বলেন, ণিজন্ত—

কেন বলিব না, অবশ্য বলিব !
বলে না কি কেহ কারণ বিহনে ?

আমরা ব্যাকরণে পণ্ডিত নই, তবু আমরা যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে "ণিচ্" একটা সঙ্কেতমাত্র—যেখানে সে সঙ্কেত খাটে না, সেখানে তাহার কোনই অর্থ নাই। ণিচের সঙ্কেত বাংলায় খাটে না, তবু পণ্ডিতমশায় যদি ঐ কথাটাকে বাংলায় চালাইতে চান তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সংস্কৃত নৌকা দাঁড়ে চলে, অতএব বাংলা ফসলের ক্ষেতে লাঙল্ চলিবে কেন, নিশ্চয়ই দাঁড় চলিবে। কিন্তু দাঁড়-জিনিষ অত্যন্ত দামী উৎকৃষ্ট জিনিষ হইলেও তবু চলিবে না। শ্রুধাতু যে নিয়মে "শ্রাবি" হয়, সেই নিয়মে "শুন্" ধাতুর "শু" "শৌ" হইয়া ও পরে ইকারযোগে "শৌনিতেছে" হইত। হয় ত খুব ভালই হইত, কিন্তু হয় না যে, সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষ নহে। সংস্কৃতে পঠ্ধাতুর উত্তরে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া পাঠন হয়, বাংলায় সেই অর্থে পড়্-ধাতু হইতে "পড়ান" হয়, "পাড়ন" হয় না। অতএব যেখানে তাহার সঙ্কেতই কেহ মানিবে না, সেখানে অস্থানে অকারণে বৃদ্ধ ণিচ্ সিগ্নালার্ তাহার প্রাচীন পতাকা তুলিয়া কেন বসিয়া থাকিবে, সে নাই-ও। তাহার স্থলে আর একটি যে সঙ্কেত বসিয়া আছে, সে হয় ত তাহারই শ্রীমান্ পৌত্র, আমাদের ভক্তিভাজন ণিচ্ নহে;—কৌলিক সাদৃশ্য ত কিছু থাকিবেই, কিন্তু ব্যবহারের ব্যতিক্রমেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। তবু যদি বাংলায় সেই ণিচ্প্রত্যয়ই আছে

বলিতে হয়, তবে ধ্রুপদের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য কাওয়ালিকে চৌতাল নাম দিলেও দোষ হয় না। প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে—"যে সকল শব্দ লইয়া অভিনব ব্যাকরণ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে, উহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল শব্দের বহুলপ্রয়োগে ভাষার গুরুত্ব ও মাধুর্য্য কতদূর রক্ষিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।"

বাংলা বলিয়া একটা ভাষা আছে, তাহার গুরুত্ব-মাধুর্য্য ওজন করা ব্যাকরণ-কারের কাজ নহে। সেই ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার কাজ। সে ভাষা যে ইচ্ছা ব্যবহার করুক্ বা না করুক্, তিনি উদাসীন। কাহারও প্রতি তাঁহার কোন আদেশ নাই—অনুশাসন নাই। জীবতত্ত্ববিৎ কুকুরের বিষয়ও লেখেন, শেয়ালের বিষয়ও লেখেন;—কোন পণ্ডিত যদি তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে আসেন যে, তুমি যে শেয়ালের কথাটা এত আনুপূর্ব্বিক লিখিতে বসিয়াছ, শেষকালে যদি লোকে শেয়াল পুষিতে আরম্ভ করে! তবে, জীবতত্ত্ববিদ্ তাহার কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার শেয়ালসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটা শেষ করিতেই প্রবৃত্ত হন। বঙ্গদর্শনসম্পাদক যদি তাঁহার কাগজে মাছের তেলের উপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন, তবে আশা করি, কোন পণ্ডিত তাঁহাকে এ অপবাদ দিবেন না যে, তিনি মাছের তেল মাথায় মাখিবার জন্য পাঠকদিগকে অন্যায় উত্তেজিত করিতেছেন।

প্রতিবাদলেখক মহাশয় হাস্যরসের অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন—"যদি কেহ লেখেন 'যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিলেন—প্রিয়ে তুমি যে কথা বলিতেছ তাহার বিস্‌মোল্লায়ই গলদ্' তাহা হইলে প্রয়োগটি কি অতিশোভন হইবে?"

প্রয়োগের শোভনতাবিচার ব্যাকরণের কাজ নহে, অলঙ্কারশাস্ত্রের কাজ—ইহা পণ্ডিতমহাশয় জানেন না, এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের সাহস হয় না। উল্লিখিত প্রয়োগে ব্যাকরণের কোন ভুলই নাই—অলঙ্কারের দোষ আছে। "বিস্‌মোল্লায় গলদ্" কথাটা এমন জায়গাতে বসিতে পারে, যেখানে অলঙ্কারের দোষ না হইয়া গুণ হইবে। অতএব পণ্ডিতমহাশয়ের রসিকতা এখানে বাজে খরচ হইল। যাঁহারা প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণ লিখিতেছেন, তাঁহারা এই হাস্যবাণে ধরাশায়ী হইয়া মরিয়া থাকিবেন না। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতমহাশয় এ কথাও মনে রাখিবেন যে, চলিত ভাষা অস্থানে বসাইলেই যে কেবল ভাষার প্রয়োগদোষ হয়, তাহা নহে; বিশুদ্ধ সংস্কৃত-শব্দ বিশুদ্ধ-সংস্কৃত-নিয়মে বাংলায় বসাইলেও অলঙ্কারদোষ ঘটিতে পারে। কেহ যদি বলেন, "আপনার সুন্দরী বক্তৃতা শুনিয়া অদ্যকার সভা আপ্যায়িতা হইয়াছে," তবে তাহাতে স্বর্গীয় বোপদেবের কোন আপত্তি থাকিবার কথা নাই, কিন্তু শ্রোতারা গাম্ভীর্য্যরক্ষা না করিতেও পারেন।

খাঁটি বাংলা কথাগুলির নিয়ম অত্যন্ত পাকা;—"উট্" কথাটাকে কোনমতেই স্ত্রী-লিঙ্গে "উটী" করা যাইবে না, অথবা "দাগ"-শব্দের উত্তর কোনমতেই "ইত"প্রত্যয়

করিয়া "দাগিত" হইবে না, ইহাতে সংস্কৃত-ব্যাকরণ যতই চক্ষু রক্তবর্ণ করুন্! কিন্তু সংস্কৃতশব্দের বেলায় আমাদের স্বাধীনতা অনেকটা বেশি। আমরা ইচ্ছা করিলে "এই মেয়েটি বড় সুন্দরী" ইহাও বলিতে পারি, আবার "এই মেয়েটি বড় সুন্দর" ইহাও বলা চলে। আমাদের পণ্ডিতমশায় এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "বিদ্যা যশের হেতুরূপে প্রতীয়মান হয়।" "প্রতীয়মান" কথাটা তিনি বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু যদি সংস্কৃত-নিয়মে "প্রতীয়মানা" লিখিতেন, তাহাও চলিত। আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "বিভীষিকাময়ী ছায়াটাকে বঙ্গভাষার অধিকার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে পারেন" —ছায়া-শব্দের এক বিশেষণ "বিভীষিকাময়ী" সংস্কৃত-বিধানে হইল, অন্য বিশেষণ "নিষ্কাশিত" বাংলা নিয়মেই হইল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতশব্দ বাংলা ভাষায় সুবিধামত কখনো নিজের নিয়মে চলে, কখনো বাংলা নিয়মে চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলা কথার সে স্বাধীনতা নাই,— "কথাটা উপযুক্তা হইয়াছে" এমন প্রয়োগ চলিতেও পারে, কিন্তু "কথাটা ঠিক হইয়াছে" না বলিয়া যদি "ঠিকা হইয়াছে" বলি, তবে তাহা সহ্য করা অন্যায় হইবে। অতএব বাংলা রচনায় সংস্কৃতশব্দ কোথায় বাংলা-নিয়মে, কোথায় সংস্কৃত-নিয়মে চলিবে, তাহা ব্যাকরণকার বাঁধিয়া দিবেন না, তাহা অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচ্য। কিন্তু বাংলা শব্দ ভাষার ভূষণ নহে, তাহা ভাষার অঙ্গ—সুতরাং তাহাকে বোপদেবের সূত্রে মোচড় দিলে চলিবে না, তাহাতে সমস্ত ভাষার গায়ে ব্যথা লাগিবে। এইজন্যই, "ভ্রাতৃবধূ একাকী আছেন" অথবা "একাকিনী আছেন," দুইই বলিতে পারি—কিন্তু "আমার ভাজ একলা আছেন" না বলিয়া "একলানী আছেন", এমন প্রয়োগ প্রাণান্ত সঙ্কটে পড়িলেও করা যায় না। অতএব, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কিরূপ নিয়মে ব্যবহার করা যাইবে, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত ইচ্ছা লড়াই করুন, বাংলা বৈয়াকরণের সে যুদ্ধে রক্তপাত করিবার অবকাশ নাই।

আমার প্রবন্ধে আমি ইংরাজি mono-syllabic অর্থে "একমাত্রিক" কথা ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং "দেখ্‌মাত্" প্রভৃতি ধাতুকে একমাত্রিক বলিয়াছিলাম, ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয় অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে হ্রস্বস্বরের একমাত্রা, দীর্ঘস্বরের দুইমাত্রা, প্লুতস্বরের তিনমাত্রা ও ব্যঞ্জনবর্ণের অর্দ্ধমাত্রা গণনা করা হয়।" অতএব তাঁহার মতে "দেখ্"ধাতু আড়াইমাত্রিক। এই যুক্তি অনুসারে "একমাত্রিক"শব্দটাকে তিনি বিদেশী বলিয়াই গণ্য করেন।

ইহাকেই বলে বিস্‌মোল্লায় গলদ্! মাত্রা ইংরাজিই কি, বাংলাই কি, আর সংস্কৃতই কি! যদিচ প্রাচীন ভারতবর্ষ আধুনিক ভারতের চেয়ে অনেক বিষয়ে অনেক বড় ছিল, তবু "এক" তখনো "এক"ই ছিল এবং "দুই" ছিল "দুই"। পণ্ডিতমশায় যদি যথেষ্টপরিমাণে ভাবিয়া দেখেন, তবে হয় ত বুঝিতে পারিবেন, গণিতশাস্ত্রের

এক ইংলণ্ডেও এক, বাংলাদেশেও এক এবং ভীষ্মদ্রোণ-ভীমার্জ্জুনের নিকটও তাহা একই ছিল। তবে আমরা যেখানে এক ব্যবহার করি, অন্যত্র সেখানে দুই ব্যবহার করিতে পারে। যেমন, আমরা এক হাতে খাই, ইংরাজ দুই হাতে খায়, লঙ্কেশ্বর রাবণ হয় ত দশ হাতে খাইতেন, আমরা কেবল আমাদেরই খাওয়ার নিয়মকে স্মরণ করিয়া ঐ সকল 'বাহুহাস্তিক' খাওয়াকে 'ঐকহাস্তিক' বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি না। সংস্কৃত ভাষায় যে শব্দ আড়াইমাত্রা কাল ধরিয়া উচ্চারিত হইত, বাংলায় সেটা যদি একমাত্রা কাল লইয়া উচ্চারিত হয়, তবুও তাহাকে আড়াইমাত্রিক বলিবই,—সংস্কৃত ব্যাকরণের খাতিরে বুদ্ধির প্রতি এতটা জুলুম সহ্য হয় না। পণ্ডিতমহাশয়কে যদি নামতা পড়িতে হয়, তবে "সাত সাত্তে উনপঞ্চাশ" কথাটা তিনি কতক্ষণ ধরিয়া উচ্চারণ করেন? বাংলা ব্যবহারে ইহার মাত্রা ছয়—সংস্কৃত-মতে ষোল। তিনি যদি পাণিনির প্রতি সম্মান রাখিবার জন্য ষোলমাত্রায় সা-ত-সা-ত-তে-উ-ন-প-ঞ্চা-শ উচ্চারণ করিতেন, তবে তাঁহার অপেক্ষা নির্ব্বোধ ছেলে দ্রুত আওড়াইয়া দিয়া ক্লাসে তাঁহার উপরে উঠিয়া যাইত। সংস্কৃত-ব্যাকরণকেই যদি মানিতে হয়, তবে কেবল মাত্রায় কেন, উচ্চারণেও মানিতে হয়। পণ্ডিতমহাশয়ের যদি লক্ষ্মীনারাণ বলিয়া চাকর থাকে এবং তিনি অষ্টাধ্যায়ীর মতে দীর্ঘ-হ্রস্ব-প্লুত স্বরের মাত্রা ও কণ্ঠ্য-তালব্য-মূর্দ্ধন্যের নিয়ম রাখিয়া "লক্ষ্মীনারায়ড়" বলিয়া ডাক পাড়েন, তবে একা লক্ষ্মীনারাণ কেন, রাস্তার লোকসুদ্ধ আসিয়া হাজির হয়। কাজেই বাংলা "ক্ষ" সংস্কৃত "ক্ষ" নহে এবং বাংলার মাত্রা সংস্কৃতের মাত্রা নহে, এ কথা বাংলাব্যাকরণকার প্রচার করা কর্ত্তব্য বোধ করেন। এইজন্য স্বয়ং মাতা সরস্বতীও যখন বাংলা বলেন, বাঙালির ছেলেরা তাহা নিজের মাতৃভাষা বলিয়া চিনিতে পারে—তবে তাঁহারই বরপুত্র হইয়া পণ্ডিতমহাশয় বাংলা ভাষার বাংলা নিয়মের প্রতি এত অসহিষ্ণু কেন? তিনি অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি আ[র] কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিবেন না কেবল "একমাত্রিক শব্দের দেশীয় ব্যাকর[ণ] ও অভিধানানুযায়ী অর্থই গ্রহণ" করিবেন তাই করুন, আমরা বাধা দিব না। কি[ন্তু] ইহা দেখা যাইতেছে, অর্থ জিনিষটাকে গ্রহ[ণ] করিব বলিলেই করা যায় না। অভিধান ব্যাকরণ অর্থের লোহার সিন্ধুক—তাহা[রা] অর্থ দিতে পারে না, বহন করিতে পা[রে] মাত্র। চাবি লাগাইয়া সেই অর্থ লইতে হয়।

প্রতিবাদী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের এ[ক] স্থলে প্রশ্ন করিয়াছেন, "রবীন্দ্রবাবু লিখিয়া[]ছেন 'থ্যালো মাংস'—এই থ্যালোটা কি? অবশেষে শ্রান্ত, বিমর্ষ, হতাশ হইয়া লিখিয়া[]ছেন—"অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম কেহ বলিতে পারিলেন না। কলিকাতার অ[ধি]বাসী অথচ যাঁহাদের গৃহে সাহিত্যচর্চ্চা আছে এবং নির্ব্বিশেষে মৎস্যমাংসের গ[তি]বিধিও আছে এমন ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞা[সু] হইয়াছি তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। পণ্ডিতমহাশয়ের যে এত প্রচুর শ্রম দুঃখের কারণ হইয়াছি, ইহাতে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়! আমার প্রব[ন্ধে]

বহন করিয়া আজপর্য্যন্ত পরিষৎপত্রিকা বাহির হয় নাই, এবং পণ্ডিতমহাশয় আমার পাঠ শুনিয়াই প্রতিবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা স্বীকারই করিয়াছেন। অতএব, যখন আমি "থ্যাংলা" বলিয়াছিলাম, তখন যদি বক্তার দুরদৃষ্টক্রমে শ্রোতা "থ্যালো"ই শুনিয়া থাকেন, তবে সেজন্য বক্তা ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, দুষ্কৃতিকারীকে তৎক্ষণাৎ শাসন না করিয়া যে সকল নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ লোক কলিকাতায় বাস করেন অথচ সাহিত্যচর্চ্চা করেন এবং মৎস্য-মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে খামকা জবাবদিহিতে ফেলিলেন কেন? প্রতিবাদী মহাশয় যদি কোন সুযোগে পরিষৎ-পত্রিকার প্রুফ্ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে এই ভুল দেখিয়া থাকেন, তবে সেজন্যও আমাকে ক্ষমা করিবেন। ছাপার ভুলে যদি দণ্ডিত হইতে হয়, তবে দণ্ডশালায় পণ্ডিতমহাশয়েরও সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এরূপ ছোট ছোট ভুল খুঁটিয়া মূলপ্রবন্ধের বিচার সঙ্গত নহে। "থ্যালো", শব্দটা রাখিলে বা বাদ দিলে আসল কথাটার কিছুই আসে যায় না। বাংলা "আল্" প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তস্থলে ভ্রমক্রমে যদি "বাচাল" সংস্কৃত কথাটা বসিয়া থাকে, তবে সেটাকে অনায়াসে উৎপাটন করিয়া ফেলা যায়, তাহাতে বিবেচ্য বিষয়ের মূলে আঘাত করে না। "ছাগল" যদি সংস্কৃত-শব্দ হয়, তবে তাহাকে বাংলা "ল" প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তগণ্ডী হইতে বিনা ক্লেশে মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে; খাঁটি বাংলা দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। ধানের ক্ষেতের মধ্যে যদি দুটো একটা গত বৎসরের যবের শীষ উঠিয়া থাকে, তাহাকে রাখ বা ফেলিয়া দাও, বিশেষ আসে যায় না, তাই বলিয়াই ধানের ক্ষেতকে যবের ক্ষেত বলা চলে না।

মোট কথাটার এবং আসল কথাটার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অনুবীক্ষণহাতে ছোট ছোট খুঁৎ ধরিবার চেষ্টায় বেড়াইলে খুঁৎ সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।—যে গাছ হইতে ফল পাড়া যাইতে পারে, সে গাছ হইতে কীটও পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই কীটের দ্বারা গাছের বিচার করা যায় না।

একটি গল্প মনে পড়িল। কোন রাজপুৎ গোঁফে চাড়া দিয়া রাস্তায় চলিয়াছিল। একজন পাঠান আসিয়া বলিল, লড়াই কর! রাজপুৎ বলিল, খামকা লড়াই করিতে আসিলে, ঘরে কি স্ত্রী-পুত্র নাই? পাঠান বলিল, আছে বটে, আচ্ছা তাহাদের একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিগে। বলিয়া বাড়ি গিয়া সব কটাকে কাটিয়া-কুটিয়া নিঃশেষ করিয়া আসিল। পাঠান দ্বিতীয়বার লড়াইয়ের প্রস্তাব করিতেই রাজপুৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, তুমি যে লড়াই করিতে বলিতেছ, আমার অপরাধটা কি? পাঠান বলিল, তুমি যে আমার সাম্‌নে গোঁফ তুলিয়া আছ, সেই অপরাধ। রাজপুৎ তৎক্ষণাৎ গোঁফ নামাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা ভাই, গোঁফ নামাইয়া দিতেছি!

প্রতিবাদী মহাশয়ের কাছে আমারও প্রশ্ন এই যে, ঐ "ছাগল", "বাচাল", "থ্যালো" এবং "নৈমিত্তিক" শব্দ কয়েকটি লইয়াই কি আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাদ?

আচ্ছা আমি গোঁফ নামাইয়া লইতেছি—ও শব্দ কয়টা একেবারেই ত্যাগ করিলাম। তাহাতে মূলপ্রবন্ধের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। ইহাতে বিবাদ মিটিবে কি? প্রতিবাদী বলিবেন, অকিঞ্চিৎকর কথাগুলো বাংলায় ঢোকাইয়া তুমি ভাষাটাকে মাটি করিবার চেষ্টায় আছ। আমার বিনীত উত্তর এই যে, ঐ কথাগুলা আমার এবং তাঁহার বহুপূর্ব্ব পিতামহ-পিতামহীরা প্রচলিত করিয়া গেছেন, আমি তাহাদের রাখিবারই বা কে, মারিবারই বা কে?

প্রতিবাদী মহাশয়ের হুকুম হইতে পারে, আচ্ছা বেশ, ভাষায় আছে থাক্, তুমি ওগুলার নিয়ম আলোচনা করিয়ো না! কিন্তু এ হুকুম চলিবে না! গোঁফের এই ডগাটুকু নামাইতে পারিব না।

যে কথাগুলি লইয়া আজ এত তর্ক উঠিল, তাহা এতই সোজা যে, পাঠক ও শ্রোতাদের এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ'-সভার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শেক্স্পিয়র্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই খাটে; তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য একা আসে না, দলবল সঙ্গে করিয়াই আসে। প্রতিবাদী মহাশয়ও একা নহেন, তাঁহার দলবল আছে। তিনি শাসাইয়াছেন যে, "বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বি, এ, এম্, এ উপাধিধারী" এবং "বর্ত্তমান সময়ে যে সকল লেখক ও লেখিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন" তাঁহারা, এবং "ইংলণ্ড-প্রত্যাগত অনেক কৃতবিদ্য" তাঁহার দলে আছেন।—ইহাতে অকস্মাৎ বাংলা ভাষার এত হিতৈষী অভিভাবকের ভিড় দেখিয়া এতকালের উপেক্ষিতা মাতৃভাষার জন্য আশাও জন্মে, অথচ নিজের অসহায়তায় হৃৎকম্পও উপস্থিত হয়। সেই কারণে পণ্ডিতমহাশয়ের দল ভাঙাইয়া লইবার জন্যই আমার আজিকার এই চেষ্টা। তাঁহাদিগকে আমি আশ্বাস দিতেছি, এ দলে আসিয়াও তাঁহারা "ভাষার বিশুদ্ধি ও মাধুর্য্য রক্ষায়" মনোযোগ করিলে আমরা কেহ বাধা দিব না, চাই কি, আমরাও শিক্ষালাভ করিতে পারিব।

কেবল তাঁহাদিগকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত-ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে। ইহাতে তাঁহাদের কৃতবিদ্যতা ও ইংলণ্ডপ্রত্যাগমনের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না, অথচ আমিও যথেষ্ট সম্মানিত ও সহায়বান্ হইব।

মাঘ। দশম সংখ্যা

বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

—:০:—

সূচী।

৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিনযন্ত্রে
শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

বঙ্গদর্শন।

মাতা মনু।

আমরা এ প্রবন্ধে যে দুইটি ঋকের ব্যাখ্যা লইয়া আলোচনা করিব, সভাষ্য সে ঋক্ দুইটি এই—

১। ত্বমগ্নে বসূঁরিহ রুদ্রাঁন্ আদিত্যান্ উত।
যজা স্বধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃতপ্রুষম্॥

১—৪৫ সূ—১ম—ঋগ্বেদ।

২। মাতঃ পরেণ ধর্ম্মণা যৎ সবৃদ্ভিঃ সহাভুবঃ।
পিতা যৎ কশ্যপস্যাগ্নিঃ শ্রদ্ধা মাতা মনুঃ কবিঃ॥

১০—১০ সূ—আগ্নেয়পর্ব্ব সাম।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—

হে অগ্নে ত্বমিহ কর্ম্মণি বস্বাদীন্ আ যজ। উত অপি চ জনং অন্যমপি দেবতারূপং প্রাণিনং যজ। কীদৃশম্? স্বধ্বরং শোভনযাগযুক্তং মনুজাতং মনুনা প্রজাপতিনা উৎপাদিতং ঘৃতপ্রুষম্ উদকস্য সেক্তারম্। ১।

হে অগ্নে ত্বং পরেণ উৎকৃষ্টেন ধর্ম্মণা আধানাদিকর্ম্মণা জাতঃ প্রাদুর্ভূতোঽসি। যৎ যঃ সবৃদ্ভিঃ যজ্ঞৈঃ সহ বর্ত্তন্তে ইতি সবৃতঃ ঋত্বিজঃ তৈঃ সহ অভুবঃ ভূমিসম্বন্ধিযজ্ঞে বর্ত্তসে। কশ্যপস্যাগ্নিরিত্যেতয়োঃ পরস্পরং বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। যৎ যস্যাগ্নেঃ কশ্যপঃ পিতা শ্রদ্ধা দেবী মাতা চ মনুঃ কবিঃ ক্রান্তকর্ম্মা মেধাবী বা মনুর্বৈবস্বতঃ স্তোতা আসীৎ। সোঽগ্নির্যজমানায় অভীষ্টং ফলং প্রযচ্ছতু। অনেন সূচিতমুপাখ্যানং ব্রাহ্মণান্তরে দ্রষ্টব্যম্।

আমরা সায়ণের ভাষ্যে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। কেন না, আমাদিগের ধারণা ও বিশ্বাস যে, উল্লিখিত দুইটি ঋকের একটিতেও মনুশব্দ পুমান্ মনু অর্থাৎ প্রজাপতি মনু অথবা বৈবস্বত মনুর বাচক নহে। এই মনুশব্দ দ্বারা কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী মহামতি মনু অববোধিত হইবেন ও হইয়াছেন। এবং তাঁহারই গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আমরা মানবনামে সমাখ্যাত হইয়াছি। পুমান্ চতুর্দ্দশজন মনু আমাদিগের বহু-বংশের পিতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য বটেন, কিন্তু আমাদিগের মানবনাম পুরুষ মনু হইতে ব্যুৎপাদিত হয় নাই।

পাঠক, প্রথম ঋকে ঋক্‌প্রণেতা ঋষি যেমন ভিন্নমাতৃক বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণের যজনের কথা বলিতেছেন, তেমনই মনুজাত আর একটি স্বতন্ত্র দেবতার কথাও

নির্দ্দেশ করিতেছেন। শাস্ত্রে দেবতারা ৮টি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্গণাঃ।
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চৈব হ্যষ্টৌ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ॥

২—২ অ, বায়ু, উত্তরখণ্ড।

ইহার মধ্যে রুদ্র, মরুৎ ও আদিত্যগণ কশ্যপাত্মজ, * সুতরাং ইঁহারা স্বায়ম্ভুব মনুর অনন্তরবংশ্য। কেন না, মনুর পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ—

"মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাত্তু ইমাঃ প্রজাঃ।"

মনুসংহিতাতে মরীচি মনুর তনয় বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন। সুতরাং প্রথম ঋকের রুদ্র ও আদিত্যগণ মনুর সন্তান হইলেও, ঋক্প্রণেতা ঋষি "রুদ্রান্" ও "আদিত্যান্" এই বহুবচনান্ত পদ ভিন্ন একবচনান্ত একটি "মনুজাত"শব্দের যে প্রয়োগ করিয়াছেন, এই মনু কখনই সেই পুরুষ স্বায়ম্ভুব মনু অর্থাৎ প্রজাপতি মনু নহেন। সায়ণ সাহস করিয়া উঁহাকে চতুর্দ্দশেতর অন্য কোন পুরুষ মনুর সন্তান বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন নাই, সুতরাং এই মনু কখনই পুরুষ মনু নহেন।

হে অগ্নে ত্বমিহ কর্ম্মণি যজ্ঞবিধৌ বসূন্ বসুমাতৃকান্ অষ্ট ধর্ম্মপুত্রান্ রুদ্রান্ একাদশাত্মকান্ আদিত্যান্ দ্বাদশাত্মকান্ দ্বিবিধান্ কশ্যপাত্মজান্ তথা ঘৃতপ্রুষং ঘৃতসেক্তারং ঘৃতাহুতিপ্রদাতারং স্বধ্বরং শোভনযজ্ঞশীলং মনুজাতং দক্ষকন্যামনুপ্রভবং মানবদেবং যজ।

দেবতাদের ন্যায় দৈত্যদানবগণও দেবসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতেন। ইঁহারা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দেবত্ব হইতে বিচ্যুত হন। মরুদ্গণ ও ঋভুগণ মানুষ হইয়াও কেবল স্বর্গাধিবাস-নিবন্ধন পুনরায় দেবত্ব লাভ করেন, † ঋগ্বেদের বহুস্থলে স্বয়ং সায়ণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দৈত্যদানবগণ "পূর্ব্বদেবাঃ" বলিয়া প্রখ্যাত। মনুও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে পূর্ব্বদেব বলিয়া সংকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যথা—

অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ॥ ১৯২।
ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ॥ ২০১॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সুতরাং মনুজাত মানব-দেবগণের ভজনার কথা যে এ ঋকে বিবৃত হইয়াছে, তাহা ধ্রুবই। এই মনু মাতা মনু, পিতা মনু নহেন। পিতা মনু হইলে, পিতা মনুর সন্তান রুদ্রাদিত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিত না, এক "মনুজাত"শব্দে তাঁহারাও অববোধিত হইতে পারিতেন।

দ্বিতীয় ঋক্‌টিতেও সায়ণ যে মনুকে বৈবস্বত মনু বলিয়াছেন, উহা সঙ্গত হয় নাই। কেন না, "পিতা কশ্যপ"শব্দের সাহচর্য্য ও মাতৃশব্দের সান্নিধ্য বশত আমরা এই "মনু"শব্দকেও মাতার সহিত সমানাধিকরণ করিতে সমুদ্গ্রীব। এই ঋকের শেষার্দ্ধের অর্থ এই যে, পিতা কশ্যপ ও শ্রদ্ধেয়া

* আদিত্যা মরুতো রুদ্রা বিজ্ঞেয়াঃ কশ্যপাত্মজাঃ।
সাধ্যাশ্চ বসবো বিশ্বে ধর্ম্মপুত্রাস্ত্রয়ো গণাঃ॥ ৩—২ অ, উত্তরখণ্ড, বায়ু।

† অনবঃ ঋভবঃ তে চ মনুষ্যাঃ, মর্ত্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ। শ্রুতি।

মাতা মনু—অগ্নির কবি অর্থাৎ স্তোতা ছিলেন।

অবশ্য এখানে এই বিতর্ক হইতে পারে যে, কশ্যপের মনুনামে কোন স্ত্রী অথবা মনুনামে কোন স্ত্রীলোকের সত্তার কথা এ জগৎ অবগত নহে। তা ঠিক। মহাভারতে কশ্যপের এক স্ত্রী "মুনি"নামে সমাখ্যাতা, বিষ্ণুপুরাণও মহাভারতের অনুগমন করিয়াছেন। কিন্তু দিতির পুত্র দৈত্য বা অদিতির পুত্র আদিত্যের ন্যায়, মুনির পুত্র "মৌনেয়"-নামে কেহ আছেন, তাহাও কেহ অবগত নহেন। বিষ্ণুপুরাণকর্ত্তা অপ্সরোগণকে মুনির সন্তান বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা উহা লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া পরিগণনা করিয়া থাকি। আরও দেখ, পূর্ব্বকালে দেব, দৈত্য, দানব, বৈনতেয়, কাদ্রবেয়, সকলেই মাতৃনামে পরিচিত হইতেন। যথা—

"দিবৌকসাং সর্গ এষ প্রোচ্যতে মাতৃনামভিঃ"

বায়ুপুরাণের এই উক্তি দ্বারাও জানা যাইতেছে যে, দিতির পুত্র দৈত্য, অদিতির পুত্র আদিত্য, বিনতার পুত্র বৈনতেয়, কদ্রুর পুত্র কাদ্রবেয় ও দনুর পুত্র দানবেরা, সকলেই মাতৃনামা। তবে মানবের বেলা কেন এ ব্যভিচার ঘটিবে? যদি মানবশব্দ পুরুষ মনু দ্বারা ব্যুৎপাদিত হইত, তাহা হইলে এই মানবশব্দ দ্বারা স্বায়ম্ভুব মনুর অনন্তর-বংশ্য দৈত্য, দানব, আদিত্য প্রভৃতি সকলেই সংসূচিত হইতেন। কিন্তু আমরা কি দৈত্য-দানবাদিকে কখনও 'মানব' বলিয়া অবগত আছি? কখনই নহে। তবে এ 'মানব'-শব্দের নিদান কি? মনুশব্দ দ্বারা যে কোন স্ত্রী মনু সূচিত হইতেন, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়!

আমরা দেখিতেছি, মনুবৎ জগন্মান্য রামায়ণে বিবৃত আছে—

প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভূবুরিতি নঃ শ্রুতম্।
ষষ্টির্দুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাযশঃ॥ ১০॥
কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসামষ্টৌ সুমধ্যমাঃ।
অদিতিঞ্চ দিতিঞ্চৈব দনুমপি চ কালকাম্॥ ১১॥
তাম্রাং ক্রোধবশাঞ্চৈব মনুঞ্চাপ্যনলামপি।
তাস্তু কন্যাস্ততঃ প্রীতঃ কশ্যপঃ পুনরব্রবীৎ॥ ১২॥

আরণ্যকাণ্ড,
হেমচন্দ্র-সম্পাদিত সংস্করণের ১৪শ সর্গ।

অতএব কশ্যপের এক স্ত্রীর নাম "মনু," ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। অবশ্য পুরাণান্তরে কশ্যপের স্ত্রী ১৩টি বলিয়া বিবৃত এবং সেই তেরটির মধ্যে মনুর নাম ধৃত হয় নাই। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের "মুনি"-নাম যে রামায়ণের মনুর বিপরিণতি, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। যদি বল, মনু হইতে যে মনুষ্য বা মানবগণ সমুৎপন্ন, তাহার প্রমাণ কোথায়? তাহার প্রমাণও রামায়ণের উক্ত সর্গেই বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—

মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপাত্তু মহাত্মনঃ॥ ২৯॥

অতএব এই মনু কশ্যপের সহধর্ম্মিণী ভিন্ন কশ্যপের পিতামহ অর্থাৎ, মরীচিপিতা স্বায়ম্ভুব মনু, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। এই মনুর স্ত্রীত্ব ও কশ্যপসহধর্ম্মিণীত্ব নিরাপত্তিতেই স্বীকার করিতে হইতেছে। যদি তাহা স্বীকার কর, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সামবেদ ও ঋগ্বেদের উল্লিখিত-ঋক্-সংস্থ মনুশব্দও পুমান্ মনুর বাচক নহে।

জর্ম্মাণেরা এখনও আপনাদিগকে মনুর সন্তান বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। এবং সেই মনুকে আবার তাঁহারা টুইস্কোপুত্র বলিয়া অবগত আছেন। যথা—

Although without a common name the ancient Germans believed that they had a common origin, all of them regarding as their forefather Mannu the first man the son of god Tuisco.

Encyclopedia Britannica.

আমরা এই অন্ধকার হইতেই এই আলোকে উপনীত হইতেছি যে, যেমন আমরা মাতা মনুর কথা অবগত নহি, পিতা মনুর কথাই অবগত, তেমনই আমাদিগের দেশ হইতে শকহূনগণসহগামী জর্ম্মাণগণও সেই পিতা মনুর জ্ঞান লইয়া গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা মনুকে বৈরাজ বা বিরাট্‌তনয় বলিয়া অবগত, তাঁহারা টুইস্কোর আত্মজ বলিয়া বিদিত। তাহাতেই বোধ হইতেছে ইউরোপগত জর্ম্মাণেরা এরূপ এক মনুর কথা অবগত ছিলেন, যাঁহার পিতা বিরাট্ নহেন, টুইস্কো।

এদিকে আমরা রামায়ণে দক্ষকে মনুর পিতা বলিয়া বিবৃত দেখিতেছি। টুইস্কো (Tuisco)-শব্দ যে দক্ষশব্দের সদ্যোবিকৃতি, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। অতএব জর্ম্মাণদিগের মনু যে আমাদের রামায়ণ ও সামবেদের মাতা মনুর সহিত অভিন্ন, তাহা প্রত্যেক চেতস্বান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। যদি তাহা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সায়ণেরও স্খলন ঘটিয়াছে, ইহা মনে করিতে হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত।

চোখের বালি।

(২৯)

পরদিন ঘুম ভাঙিয়া বিছানা হইতে উঠিবামাত্রই একটি মধুর আবেগে মহেন্দ্রের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। প্রভাতের সূর্য্যালোক যেন তাহার সমস্ত ভাবনায়-বাসনায় সোনা মাখাইয়া দিল। কি সুন্দর পৃথিবী, কি মধুময় আকাশ, বাতাস যেন পুষ্পরেণুর মত সমস্ত মনকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

সকালবেলায় বৈষ্ণব ভিক্ষুক খোল-করতাল বাজাইয়া গান জুড়িয়া দিয়াছিল। দরোয়ান তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইলে মহেন্দ্র দরোয়ানকে ভৎসনা করিয়া তখনি

তাহাদিগকে একটা টাকা দিয়া ফেলিল। বেহারা কেরোসিনের ল্যাম্প লইয়া যাইবার সময় অসাবধানে ফেলিয়া দিয়া চুরমার করিল,—মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। মহেন্দ্র তিরস্কারমাত্র না করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল, "ওরে ওখানটা ভাল করিয়া ঝাঁট্ দিয়া ফেলিস্—যেন কাহারো পায়ে কাঁচ না ফোটে!"—আজ কোন ক্ষতিকেই ক্ষতি বলিয়া মনে হইল না।

প্রেম এতদিন নেপথ্যের আড়ালে লুকাইয়া বসিয়াছিল—আজ সে সম্মুখে আসিয়া পর্দ্দা উঠাইয়া দিয়াছে। জগৎ-সংসারের উপর হইতে আবরণ উঠিয়া গেছে। প্রতিদিনের পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতা আজ অন্তর্হিত হইল। গাছপালা, পশুপাখী, পথের জনতা, নগরের কোলাহল, সকলই আজ অপরূপ! এই বিশ্বব্যাপি-নূতনতা এতকাল ছিল কোথায়!

মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, আজ যেন বিনোদিনীর সঙ্গে অন্তদিনের মত সামান্তভাবে মিলন হইবে না। আজ যেন কবিতায় কথা বলিলে এবং সঙ্গীতে ভাবপ্রকাশ করিলে তবে ঠিক উপযুক্ত হয়। আজিকার দিনকে ঐশ্বর্য্যে-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া মহেন্দ্র সৃষ্টিছাড়া সমাজছাড়া একটা আরব্য উপন্যাসের অদ্ভুত দিনের মত করিয়া তুলিতে চায়। তাহা সত্য হইবে, অথচ স্বপ্ন হইবে—তাহাতে সংসারের কোন বিধি-বিধান, কোন দায়িত্ব, কোন বাস্তবিকতা থাকিবে না।

আজ সকাল হইতে মহেন্দ্র চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে লাগিল, কলেজে যাইতে পারিল না; কারণ, মিলনের লগ্নটি কখন্ অকস্মাৎ আবির্ভূত হইবে, তাহা ত কোন পঞ্জিকায় লেখে না।

গৃহকার্য্যে রত বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে ভাঁড়ার হইতে—রান্নাঘর হইতে মহেন্দ্রের কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। আজ তাহা মহেন্দ্রের ভাল লাগিল না—আজ সে বিনোদিনীকে মনে মনে সংসার হইতে বহুদূরে স্থাপন করিয়াছে।

সময় কাটিতে চায় না। মহেন্দ্রের স্নানাহার হইয়া গেল—সমস্ত গৃহকর্ম্মের বিরামে মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। তবু বিনোদিনীর দেখা নাই। দুঃখে এবং সুখে, অধৈর্য্যে এবং আশায় মহেন্দ্রের মনোযন্ত্রের সমস্ত তারগুলা ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

কালিকার কাড়াকাড়ি-করা সেই বিষবৃক্ষখানি নীচের বিছানায় পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র সেই কাড়াকাড়ির স্মৃতিতে মহেন্দ্রের মনে পুলকাবেশ জাগিয়া উঠিল। বিনোদিনী যে বালিশ চাপিয়া শুইয়াছিল, সেই বালিশটা টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র তাহাতে মাথা রাখিল; এবং বিষবৃক্ষখানি তুলিয়া লইয়া তাহার পাত ওল্টাইতে লাগিল। ক্রমে কখন্ একসময় পড়ায় মন লাগিয়া গেল, কখন্ পাঁচটা বাজিয়া গেল,—হুঁস্ হইল না।

এমন সময় একটি মোরাদাবাদী খুঞ্চের উপর থালায় ফল ও সন্দেশ এবং রেকাবে বরফচিনিসংযুক্ত সুগন্ধি দলিত খর্ম্মুজা লইয়া বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিল এবং মহেন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া কহিল—"কি করি-

তেছ ঠাকুরপো? তোমার হইল কি? পাঁচটা বাজিয়া গেছে, এখনো তোমার হাত-মুখ-ধোয়া—কাপড়-ছাড়া হইল না?”

মহেন্দ্রের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। মহেন্দ্রের কি হইয়াছে, সে কি জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়? বিনোদিনীর সে কি অগোচর থাকা উচিত? আজিকার দিন কি অন্য দিনেরই মত? পাছে যাহা আশা করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উণ্টা কিছু দেখিতে পায়, এই ভয়ে মহেন্দ্র গতকল্যকার কথা স্মরণ করাইয়া কোন দাবী উথাপন করিতে পারিল না।

মহেন্দ্র খাইতে বসিল। বিনোদিনী ছাতে-বিছানো রৌদ্রে-দেওয়া মহেন্দ্রের কাপড়গুলি দ্রুতপদে ঘরে বহিয়া আনিয়া নিপুণহস্তে ভাঁজ করিয়া কাপড়ের আলমারির মধ্যে তুলিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “একটু রোসো, আমি খাইয়া উঠিয়া তোমার সাহায্য করিতেছি!”

বিনোদিনী জোড়হাত করিয়া কহিল—“দোহাই তোমার, আর যা কর, সাহায্য করিয়ো না!”

মহেন্দ্র খাইয়া উঠিয়া কহিল, “বটে! আমাকে অকর্ম্মণ্য ঠাওরাইয়াছ! আচ্ছা, আজ আমার পরীক্ষা হোক্।”—বলিয়া কাপড় ভাঁজ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের হাত হইতে কাপড় কাড়িয়া লইয়া কহিল—“ওগো মশায়, তুমি রাখ, আমার কাজ বাড়াইয়ো না!”

মহেন্দ্র কহিল—“তবে তুমি কাজ করিয়া যাও, আমি দেখিয়া শিক্ষালাভ করি।”—বলিয়া আলমারির সমুখে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া মাটিতে আসন করিয়া বসিল। বিনোদিনী কাপড় ঝাড়িবার ছলে একবার করিয়া মহেন্দ্রের পিঠের উপর আছড়াইয়া কাপড়গুলি পরিপাটিপূর্ব্বক ভাঁজ করিয়া আলমারিতে তুলিতে লাগিল।

আজিকার মিলন এমনি করিয়া আরম্ভ হইল। মহেন্দ্র প্রত্যূষ হইতে যেরূপ কল্পনা করিতেছিল, সেই অপূর্ব্বতার কোন লক্ষণই নাই। এরূপ ভাবে মিলন কাব্যে লিখিবার, সঙ্গীতে গাহিবার, উপন্যাসে রচিবার যোগ্য নহে। কিন্তু তবু মহেন্দ্র দুঃখিত হইল না—বরঞ্চ একটু আরাম পাইল। তাহার কাল্পনিক আদর্শকে কেমন করিয়া খাড়া করিয়া রাখিত—কিরূপ তাহার আয়োজন, কি কথা বলিত, কি ভাব প্রকাশ করিতে হইত, সকলপ্রকার সামান্যতাকে কি উপায়ে দূরে রাখিত, তাহা মহেন্দ্র ঠাওরাইতে পারিতেছিল না—এই কাপড় ঝাড়া ও ভাঁজ করার মধ্যে হাসি-তামাসা করিয়া সে যেন স্বরচিত একটা অসম্ভব দুরূহ আদর্শের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

এমন সময় রাজলক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রকে কহিলেন, “মহিন্, বউ কাপড় তুলিতেছে, তুই ওখানে বসিয়া কি করিতেছিস্?”

বিনোদিনী কহিল—“দেখ ত পিসিমা, মিছামিছি কেবল আমার কাজে দেরি করাইয়া দিতেছেন!”

মহেন্দ্র কহিল—"বিলক্ষণ! আমি আরো ওঁর কাজে সাহায্য করিতেছিলাম।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"আমার কপাল! তুই আবার সাহায্য করিবি! জান বউ, মহিনের বরাবর ঐ রকম! চিরকাল মা-খুড়ির আদর পাইয়া ও যদি কোন কাজ নিজের হাতে করিতে পারে!"

এই বলিয়া মাতা পরমস্নেহে কর্ম্মে-অপটু মহেন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। কেমন করিয়া এই অকর্ম্মণ্য একান্ত-মাতৃ-স্নেহাপেক্ষী বয়স্ক সন্তানটিকে সর্ব্বপ্রকার আরামে রাখিতে পারিবেন, বিনোদিনীর সহিত রাজলক্ষ্মীর সেই একমাত্র পরামর্শ। এই পুত্রসেবাব্যাপারে বিনোদিনীর প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি নিতান্ত নিশ্চিন্ত, পরম সুখী। সম্প্রতি বিনোদিনীর মর্য্যাদা যে মহেন্দ্র বুঝিয়াছে, এবং বিনোদিনীকে রাখিবার জন্য তাহার যত্ন হইয়াছে, ইহাতেও রাজলক্ষ্মী আনন্দিত। মহেন্দ্রকে শুনাইয়া শুনাইয়া তিনি কহিলেন, "বউ, আজ ত তুমি মহিনের গরম কাপড় রোদে দিয়া তুলিলে, কাল মহিনের নূতন রুমালগুলিতে উহার নামের অক্ষর শেলাই করিয়া দিতে হইবে। তোমাকে এখানে আনিয়া অবধি যত্ন-আদর করিতে পারিলাম না বাছা, কেবল খাটাইয়া মারিলাম!"

বিনোদিনী কহিল, "পিসিমা, অমন করিয়া যদি বল, তবে বুঝিব, তুমি আমাকে পর ভাবিতেছ।"

রাজলক্ষ্মী আদর করিয়া কহিলেন—"আহা মা, তোমার মত আপন আমি পাব কোথায়!"

বিনোদিনীর কাপড়-তোলা শেষ হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"এখন কি তবে সেই চিনির রসটা চড়াইয়া দিব, না, এখন তোমার অন্য কাজ আছে!"

বিনোদিনী কহিল—"না পিসিমা, অন্য কাজ আর কই? চল, মিঠাইগুলি তৈরি করিয়া আসি গে!"

মহেন্দ্র কহিল—"মা, এইমাত্র অনুতাপ করিতেছিলে উঁহাকে খাটাইয়া মারিতেছ, আবার এখনি কাজে টানিয়া লইয়া চলিলে?"

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে যে কাজ করিতেই ভালবাসে!"

মহেন্দ্র কহিল—"আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার হাতে কোন কাজ নাই, ভাবিয়াছিলাম বালিকে লইয়া একটা বই পড়িব।"

বিনোদিনী কহিল—"পিসিমা, বেশ ত, আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনেই ঠাকুর-পোর বই-পড়া শুনিতে আসিব—কি বল?"

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, "মহিন্ আমার নিতান্ত একলা পড়িয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা আবশ্যক।"—কহিলেন—"তা বেশ ত, মহিনের খাবার-তৈরি শেষ করিয়া আমরা আজ সন্ধ্যাবেলা পড়া শুনিতে আসিব। কি বলিস্ মহিন্?"

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া একবার দেখিয়া লইল। মহেন্দ্র কহিল—"আচ্ছা!" কিন্তু তাহার আর উৎসাহ রহিল না। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র রাগ করিয়া ভাবিল, "আমিও

আজ বাহির হইয়া যাইব—দেরি করিয়া বাড়ী ফিরিব।" বলিয়া তখনি বাহিরে যাইবার কাপড় পরিল। কিন্তু সঙ্কল্প কাজে পরিণত হইল না। মহেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া ছাতে পায়চারী করিয়া বেড়াইল, সিঁড়ির দিকে অনেকবার চাহিল, শেষ ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিল—"আমি আজ মিঠাই স্পর্শ না করিয়া মাকে জানাইয়া দিব, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চিনির রস জ্বাল দিলে তাহাতে মিষ্টত্ব থাকে না!"

আজ আহারের সময় বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার হাঁপানির ভয়ে প্রায় উপরে উঠিতে চান না, বিনোদিনী তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছে। মহেন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীর মুখে খাইতে বসিল।

বিনোদিনী কহিল—"ও কি ঠাকুরপো, আজ তুমি কিছুই খাইতেছ না যে!"

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু অসুখ করে নাই ত?"

বিনোদিনী কহিল—"এত করিয়া মিঠাই করিলাম, কিছু মুখে দিতেই হইবে! ভাল হয় নি বুঝি! তবে থাক্! না, না, অনুরোধে পড়িয়া জোর করিয়া খাওয়া কিছু নয়। না, না, কাজ নাই!"

মহেন্দ্র কহিল—"ভাল মুস্কিলেই ফেলিলে! মিঠাইটাই সব চেয়ে খাইবার ইচ্ছা, লাগিতেছেও ভাল, তুমি বাধা দিলে শুনিব কেন?"

দুইটি মিঠাই মহেন্দ্র নিঃশেষপূর্ব্বক খাইল—তাহার একটি দানা—একটু গুঁড়া পর্য্যন্ত ফেলিল না!

আহারান্তে তিনজনে মহেন্দ্রের শোবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। পড়িবার প্রস্তাবটা মহেন্দ্র আর তুলিল না। রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"তুই যে কি বই পড়িবি বলিয়াছিলি, আরম্ভ কর্ না!"

মহেন্দ্র কহিল—"কিন্তু তাহাতে ঠাকুরদেবতার কথা কিছুই নাই, তোমার শুনিতে ভাল লাগিবে না!"

ভাল লাগিবে না! যেমন করিয়া হোক্ ভাল লাগিবার জন্য রাজলক্ষ্মী কৃতসঙ্কল্প। মহেন্দ্র যদি তুর্কি-ভাষাও পড়ে, তবু তাঁহার ভাল লাগিতেই হইবে! আহা বেচারা মহিন্, বউ কাশী গেছে, একলা পড়িয়া আছে—তাহার যা ভাল লাগিবে, মার তাহা ভাল না লাগিলে চলিবে কেন?

বিনোদিনী কহিল—"এক কাজ কর ঠাকুরপো, পিসিমার ঘরে বাংলা শান্তিশত আছে, অন্য বই রাখিয়া আজ সেই পড়িয়া শোনাও না! পিসিমারও ভাল লাগিবে, সন্ধ্যাটাও কাটিবে ভাল!"

মহেন্দ্র নিতান্ত করুণভাবে একবার বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল, "মা, কায়েৎ ঠাকরুণ আসিয়া তোমার ঘরে বসিয়া আছেন।"

কায়েৎ-ঠাকরুণ রাজলক্ষ্মীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে গল্প করিবার প্রলোভন সংবরণ করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে দুঃসাধ্য। তবু ঝিকে বলিলেন—"কা ঠাকরুণকে বল্, আজ মহিনের ঘরে আ একটু কাজ আছে, কাল তিনি যেন অ অবশ্য করিয়া আসেন!"

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল—"কেন মা, তুমি তার সঙ্গে দেখা করিয়াই এস না!"

বিনোদিনী কহিল—"কাজ কি পিসিমা, তুমি এখানে থাক, আমি বরঞ্চ কায়েৎ-ঠাকরুণের কাছে গিয়া বসি গে!"

রাজলক্ষ্মী প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন—"বউ, তুমি ততক্ষণ এখানে বস—দেখি যদি কায়েৎ-ঠাকরুণকে বিদায় করিয়া আসিতে পারি। তোমরা পড়া আরম্ভ করিয়া দাও—আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো না!"

রাজলক্ষ্মী ঘরের বাহির হইবামাত্র মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না—বলিয়া উঠিল, "কেন তুমি আমাকে ইচ্ছা করিয়া [illegible]মন করিয়া মিছামিছি পীড়ন কর?"

বিনোদিনী যেন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—[illegible] কি ভাই? আমি তোমাকে পীড়ন কি [illegible]লাম? তবে কি তোমার ঘরে আসা [illegible]াত্র দোষ হইয়াছে? কাজ নাই, আমি [illegible]!"—বলিয়া বিমর্ষমুখে উঠিবার উপক্রম [illegible]রিল।

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "অমনি করিয়াই ত তুমি আমাকে দগ্ধ কর!"

বিনোদিনী কহিল—"ইস্ আমার যে এত তেজ, তাহা ত আমি জানিতাম না! তোমারও ত প্রাণ কঠিন কম নয়, অনেক সহ্য করিতে পার! খুব যে ঝল্‌সিয়া পুড়িয়া গেছ, চেহারা দেখিয়া তাহা কিছু বুঝিবার জো নাই!"

মহেন্দ্র কহিল, "চেহারায় কি বুঝিবে!'—বলিয়া বিনোদিনীর হাত বলপূর্ব্বক লইয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

বিনোদিনী "উঃ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "লাগিল কি?"

দেখিল, কাল বিনোদিনীর হাতের যেখানটা কাটিয়া গিয়াছিল, সেইখান দিয়া আবার রক্ত পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র অনুতপ্ত হইয়া কহিল, "আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম—ভারি অন্যায় করিয়াছি। আজ কিন্তু এখনি তোমার ও জায়গাটা বাঁধিয়া ওষুধ লাগাইয়া দিব—কিছুতেই ছাড়িব না।"

বিনোদিনী কহিল—"না, ও কিছুই না। আমি ওষুধ দিব না।"

মহেন্দ্র কহিল—"কেন দিবে না?"

বিনোদিনী কহিল—"কেন আবার কি? তোমার আর ডাক্তারী করিতে হইবে না, ও যেমন আছে থাক্!"

মহেন্দ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে গম্ভীর হইয়া গেল—মনে মনে কহিল—"কিছুই বুঝিবার জো নাই! স্ত্রীলোকের মন!"

বিনোদিনী উঠিল। অভিমানী মহেন্দ্র বাধা না দিয়া কহিল, "কোথায় যাইতেছ?"

বিনোদিনী কহিল, "কাজ আছে।"—বলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক বসিয়াই মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্রুত উঠিয়া পড়িল;—সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া একলা ছাদে বেড়াইতে লাগিল।

বিনোদিনী অহরহ আকর্ষণও করে, অথচ বিনোদিনী একমুহূর্ত্ত কাছে আসিতেও

দেয় না। অন্যে তাহাকে জিনিতে পারে না, এ গর্ব্ব মহেন্দ্রের ছিল, তাহা সে সম্প্রতি বিসর্জ্জন দিয়াছে,—কিন্তু সে চেষ্টা করিলেই অন্যকে জিনিতে পারে, এ গর্ব্বটুকুও কি রাখিতে পারিবে না? আজ সে হার মানিল, অথচ হার মানাইতে পারিল না! হৃদয়ক্ষেত্রে মহেন্দ্রের মাথা বড় উচ্চেই ছিল—সে কাহাকেও আপনার সমকক্ষ বলিয়া জানিত না—আজ সেইখানেই তাহাকে ধূলায় মাথা লুটাইতে হইল! যে শ্রেষ্ঠতা হারাইল, তাহার বদলে কিছু পাইলও না! ভিক্ষুকের মত রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় রিক্তহস্তে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল!

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিহারীদের জমিদারি হইতে শর্ষে ফুলের মধু আসিত, প্রতিবৎসরই সে তাহা রাজলক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিত—এবারও পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনী মধুভাণ্ড লইয়া স্বয়ং রাজলক্ষ্মীর কাছে গিয়া কহিল—"পিসিমা, বিহারি-ঠাকুরপো মধু পাঠাইয়াছেন।"

রাজলক্ষ্মী তাহা ভাঁড়ারে তুলিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। বিনোদিনী মধু তুলিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে বসিল—কহিল, "বিহারি-ঠাকুরপো কখনো তোমাদের তত্ত্ব লইতে ভোলেন না। বেচারার নিজের মা নাই না কি, তাই তোমাকেই মার মত দেখেন।"

বিহারীকে রাজলক্ষ্মী এমনি মহেন্দ্রের ছায়া বলিয়া জানিতেন যে, তাহার কথা তিনি বিশেষ কিছু ভাবিতেন না—সে তাঁহাদের বিনা মূল্যের, বিনা যত্নের, বিনা চিন্তার অনুগত লোক ছিল। বিনোদিনী যখন রাজলক্ষ্মীকে মাতৃহীন বিহারীর মাতৃস্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয় অকস্মাৎ স্পর্শ করিল। হঠাৎ মনে হইল;—'তা বটে, বিহারীর মা নাই এবং আমাকেই সে মার মত দেখে।' মনে পড়িল, রোগে তাপে সঙ্কটে বিহারী বরাবর বিনা আহ্বানে—বিনা আড়ম্বরে তাঁহাকে নিঃশব্দ নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছে; রাজলক্ষ্মী তাহা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মত সহজে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেজন্য কাহারো কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু বিহারীর খোঁজখবর কে রাখিয়াছে? যখন অন্নপূর্ণা ছিলেন, তিনি রাখিতেন বটে—রাজলক্ষ্মী ভাবিতেন, 'বিহারীকে বশে রাখিবার জন্য অন্নপূর্ণা স্নেহের আড়ম্বর করিতেছেন।'

রাজলক্ষ্মী আজ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন —"বিহারী আমার আপন ছেলের মতই বটে!"

বলিয়াই মনে উদয় হইল, বিহারী তাঁহার আপন ছেলের চেয়ে ঢের বেশি করে—এবং কখনো বিশেষ কিছু প্রতিদান না পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি সে ভক্তি স্থির রাখিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তাঁহার অন্তরের মধ্য হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

বিনোদিনী কহিল—"বিহারি-ঠাকুরপো তোমার হাতের রান্না খাইতে বড় ভালবাসেন।"

রাজলক্ষ্মী সস্নেহগর্ব্বে কহিলেন, "আর কারো মাছের ঝোল তাহার মুখে রোচে না।"

বলিতে বলিতে মনে পড়িল, অনেকদিন

বিহারী আসে নাই। কহিলেন, "আচ্ছা বউ, বিহারীকে আজকাল দেখিতে পাই না কেন ?"

বিনোদিনী কহিল—"আমিও ত তাই ভাবিতেছিলাম পিসিমা। তা, তোমার ছেলেটি বিবাহের পর হইতে নিজের বউকে লইয়াই এমনি মাতিয়া রহিয়াছে—বন্ধুবান্ধবরা আসিয়া আর কি করিবে বল ?"

কথাটা রাজলক্ষ্মীর অত্যন্ত সঙ্গত বোধ হইল। স্ত্রীকে লইয়া মহেন্দ্র তাহার সমস্ত হিতৈষীদের দূর করিয়াছে! বিহারীর ত অভিমান হইতেই পারে—কেন সে আসিবে! বিহারীকে নিজের দলে পাইয়া তাহার প্রতি রাজলক্ষ্মীর সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল। বিহারী যে ছেলেবেলা হইতে একান্ত নিঃস্বার্থভাবে মহেন্দ্রের কত উপকার করিয়াছে, তাহার জন্য কতবার কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে সমস্ত তিনি বিনোদিনীর কাছে বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন—ছেলের উপর তাঁহার নিজের যা' নালিশ, তা' বিহারীর বিবরণদ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। দু'দিন বউকে পাইয়া মহেন্দ্র যদি তাহার চিরকালের বন্ধুকে এমন অনাদর করে, তবে সংসারে ন্যায়ধর্ম্ম আর রহিল কোথায়!

বিনোদিনী কহিল—"কাল রবিবার আছে, তুমি বিহারি-ঠাকুরপোকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও, তিনি খুসি হইবেন।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ বউ, তা হইলে মহিনকে ডাকাই, সে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে।"

বিনোদিনী। না পিসিমা, তুমি নিজে নিমন্ত্রণ কর!

রাজলক্ষ্মী। আমি কি তোমাদের মত লিখিতে পড়িতে জানি!

বিনোদিনী। তা হোক্, তোমার হইয়া না হয় আমিই লিখিয়া দিতেছি।

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর নাম দিয়া নিজেই নিমন্ত্রণচিঠি লিখিয়া পাঠাইল।

রবিবার-দিন মহেন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহের দিন। পূর্ব্বরাত্রি হইতেই তাহার কল্পনা উদ্দাম হইয়া উঠিতে থাকে, যদিও এ পর্য্যন্ত তাহার কল্পনার অনুরূপ কিছুই হয় নাই—তবু রবিবারের ভোরের আলো তাহার চক্ষে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। জাগ্রত নগরীর সমস্ত কোলাহল তাহার কানে অপরূপ সঙ্গীতের মত আসিয়া প্রবেশ করিল।

কিন্তু ব্যাপারখানা কি ? মার আজ কোন ব্রত আছে না কি ? অন্যদিনের মত বিনোদিনীর প্রতি গৃহকর্ম্মের ভার দিয়া তিনি ত বিশ্রাম করিতেছেন না! আজ তিনি নিজেই ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

এই হাঙ্গামে দশটা বাজিয়া গেল—ইতিমধ্যে মহেন্দ্র কোন ছুতায় বিনোদিনীর সঙ্গে একমুহূর্ত্ত বিরলে দেখা করিতে পারিল না। বই পড়িতে চেষ্টা করিল, পড়ায় কিছুতেই মন বসিল না—খবরের কাগজের একটা অনাবশ্যক বিজ্ঞাপনে পনেরো-মিনিট দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া রহিল। আর থাকিতে পারিল না। নীচে গিয়া দেখিল, মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় একটা তোলা উনানে রাঁধিতেছেন এবং বিনোদিনী কটিদেশে দৃঢ় করিয়া আঁচল জড়াইয়া জোগান্ দিতে ব্যস্ত।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তোমাদের ব্যাপারটা কি ? এত ধুমধাম যে!"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"বউ তোমাকে বলে নাই ? আজ যে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি !"

বিহারীকে নিমন্ত্রণ ! মহেন্দ্রের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল—"কিন্তু মা, আমি ত থাকিতে পারিব না।"

রাজলক্ষ্মী। কেন ?

মহেন্দ্র। আমায় যে বাহিরে যাইতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী। খাওয়া-দাওয়া করিয়া যাস্, বেশি দেরি হইবে না।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে !

বিনোদিনী মুহূর্ত্তের জন্য মহেন্দ্রের মুখে কটাক্ষপাত করিয়া কহিল—"যদি নিমন্ত্রণ থাকে, তা হইলে উনি যান্ না পিসিমা ! না হয় আজ বিহারি-ঠাকুরপো একলাই খাইবেন।"

কিন্তু নিজের হাতের যত্নের রান্না মহিন্‌কে খাওয়াইতে পারিবেন না, ইহা রাজলক্ষ্মীর সহিবে কেন ? তিনি যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মহিন্ ততই বাঁকিয়া দাঁড়াইল,—'অত্যন্ত জরুরি নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কাটাইবার জো নাই—বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্ব্বে আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল'—ইত্যাদি।

রাগ করিয়া মহেন্দ্র এইরূপে মাকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিল। রাজলক্ষ্মীর সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রান্না ফেলিয়া তিনি চলিয়া যান। বিনোদিনী কহিল, "পিসিমা, তুমি কিছু ভাবিয়ো না—ঠাকুরপো মুখে আস্ফালন করিতেছেন, কিন্তু আজ উঁহার বাহিরে নিমন্ত্রণে যাওয়া হইতেছে না।"

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না বাছা, তুমি মহিন্‌কে জান না, ও যা একবার ধরে, তা কিছুতেই ছাড়ে না।"

কিন্তু বিনোদিনী মহেন্দ্রকে রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কম জানে না, তাহাই প্রমাণ হইল। মহেন্দ্র বুঝিয়াছিল, বিহারীকে বিনোদিনীই নিমন্ত্রণ করাইয়াছে। ইহাতে তাহার হৃদয় ঈর্ষায় যতই পীড়িত হইতে লাগিল, ততই তাহার পক্ষে দূরে যাওয়া কঠিন হইল। বিহারী কি করে, বিনোদিনী কি করে, তাহা না দেখিয়া সে বাঁচিবে কি করিয়া ? দেখিয়া জ্বলিতে হইবে, কিন্তু দেখা-ও চাই !

বিহারী আজ অনেকদিন পরে নিমন্ত্রিত-আত্মীয়ভাবে মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাল্যকাল হইতে যে ঘর তাহার পরিচিত, এবং যেখানে সে ঘরের ছেলের মত অবারিতভাবে প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—একটা অশ্রুতরঙ্গ পলকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার জন্য তাহার বক্ষঃকবাটে আঘাত করিল। সেই আঘাত সংবরণ করিয়া লইয়া সে স্মিতহাস্যে ঘরে প্রবেশ করিয়া সদ্যঃস্নাত রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। বিহারী যখন সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, তখন এরূপ অভিবাদন তাহাদের প্রথা ছিল না। আজ যেন সে বহুদূর প্রবাস হইতে পুনর্ব্বার ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিহারী প্রণাম করিয়া উঠিবার

সময় রাজলক্ষ্মী সস্নেহে তাহার মাথায় হস্ত-স্পর্শ করিলেন।

রাজলক্ষ্মী আজ নিগূঢ়-সহানুভূতি-বশত বিহারীর প্রতি পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি আদর ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন—"ও বেহারি, তুই এতদিন আসিস্ নাই কেন? আমি রোজ মনে করিতাম, আজ নিশ্চয় বেহারী আসিবে, কিন্তু তোর আর দেখা নাই।"

বিহারী হাসিয়া কহিল—"রোজ আসিলে ত তোমার বিহারীকে রোজ মনে করিতে না মা! মহিন্দা কোথায়?"

রাজলক্ষ্মী বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, "মহিনের আজ কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, সে আজ কিছুতেই থাকিতে পারিল না।"

শুনিবামাত্র বিহারীর মনটা বিকল হইয়া গেল। আশৈশব প্রণয়ের শেষ এই পরিণাম? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মন হইতে সমস্ত বিষাদবাষ্প উপস্থিতমত তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি রান্না হইয়াছে শুনি!"—বলিয়া তাহার নিজের প্রিয় ব্যঞ্জনগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীর রন্ধনের দিন বিহারী কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বর করিয়া নিজেকে লুব্ধ বলিয়া পরিচয় দিত,—আহারলোলুপতা দেখাইয়া বিহারী মাতৃহৃদয়শালিনী রাজলক্ষ্মীর স্নেহ কাড়িয়া লইত। আজও তাঁহার স্বরচিত-ব্যঞ্জন-সম্বন্ধে বিহারীর অতিমাত্রায় কৌতূহল দেখিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে তাঁহার লোভাতুর অতিথিকে আশ্বাস দিলেন।

এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া বিহারীকে শুষ্কস্বরে দস্তুরমত জিজ্ঞাসা করিল, "কি বিহারি, কেমন আছ?"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কই মহিন্, তুই তোর নিমন্ত্রণে গেলি না?"

মহেন্দ্র লজ্জা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—"না, সেটা কাটাইয়া দেওয়া গেছে।"

স্নান করিয়া আসিয়া বিনোদিনী যখন দেখা দিল, তখন বিহারী প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিল না। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের যে দৃশ্য সে দেখিয়াছিল, তাহা তাহার মনে মুদ্রিত ছিল।

বিনোদিনী বিহারীর অনতিদূরে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"কি ঠাকুরপো, একেবারে চিনিতেই পার না নাকি?"

বিহারী কহিল, "সকলকেই কি চেনা যায়?"

বিনোদিনী কহিল—"একটু বিবেচনা থাকিলেই যায়।" বলিয়া খবর দিল, "পিসিমা, খাবার প্রস্তুত হইয়াছে।"

মহেন্দ্র-বিহারী খাইতে বসিল; রাজলক্ষ্মী অদূরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বিনোদিনী পরিবেষণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের খাওয়ায় মনোযোগ ছিল না, সে কেবল পরিবেষণে পক্ষপাত লক্ষ্য করিতে লাগিল। মহেন্দ্রের মনে হইল, বিহারীকে পরিবেষণ করিয়া বিনোদিনী যেন একটা বিশেষ সুখ পাইতেছে। বিহারীর পাতেই যে বিশেষ করিয়া মাছের মুড়া ও দধির সর পড়িল, তাহার উত্তম কৈফিয়ৎ ছিল—মহেন্দ্র ঘরের ছেলে, বিহারী নিমন্ত্রিত। কিন্তু মুখ ফুটিয়া নালিশ করিবার

ভাল হেতুবাদ ছিল না বলিয়াই মহেন্দ্র আরো বেশি করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অসময়ে বিশেষ সন্ধানে তপ্‌সি-মাছ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি ডিমওয়ালা ছিল; সেই মাছটি বিনোদিনী বিহারীর পাতে দিতে গেলে বিহারী কহিল—"না, না, মহিন্‌দাকে দাও, মহিন্‌দা ভালবাসে।"—মহেন্দ্র তীব্র অভিমানে বলিয়া উঠিল—"না, না, আমি চাই না।" শুনিয়া বিনোদিনী দ্বিতীয়বার অনুরোধমাত্র না করিয়া সে মাছ বিহারীর পাতে ফেলিয়া দিল।

আহারান্তে দুই বন্ধু উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিলে বিনোদিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল—"বিহারি-ঠাকুরপো, এখনি যাইয়ো না, উপরের ঘরে একটু বসিবে চল!"

বিহারী কহিল, "তুমি খাইতে যাইবে না?"

বিনোদিনী কহিল,—"না, আজ একাদশী।"

নিষ্ঠুর বিদ্রূপের একটি সূক্ষ্ম হাস্যরেখা বিহারীর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল—তাহার অর্থ এই যে, একাদশী করা-ও আছে! অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই!

সেই হাস্যের আভাসটুকু বিনোদিনীর দৃষ্টি এড়ায় নাই—তবু সে যেমন তাহার হাতের কাটা ঘা সহ্য করিয়াছিল, তেমনি করিয়া ইহাও সহ্য করিল। নিতান্ত মিনতির স্বরে কহিল—"আমার মাথা খাও, একবার বসিবে চল।"

মহেন্দ্র হঠাৎ অসঙ্গতভাবে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"তোমাদের কিছুই ত বিবেচনা নাই—কাজ থাক্‌ কর্ম্ম থাক্‌, ইচ্ছা থাক্‌ বা না থাক্‌, তবু বসিতেই হইবে! এত অধিক আদরের আমি ত কোন মানে বুঝিতে পারি না!"

বিনোদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—কহিল, "বিহারি-ঠাকুরপো, শোন একবার, তোমার মহিন্‌দার কথা শোন! আদরের মানে আদর, অভিধানে তাহার আর কোন দ্বিতীয় মানে লেখে না।" (মহেন্দ্রের প্রতি) "যাই বল ঠাকুরপো, অধিক আদরের মানে শিশুকাল হইতে তুমি যত পরিষ্কার বোঝ, এমন আর কেহ বোঝে না!"

বিহারী কহিল, "মহিন্‌দা একটা কথা আছে, একবার শুনিয়া যাও!"—বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে কোন বিদায়সম্ভাষণ না করিয়া মহেন্দ্রকে লইয়া বাহিরে গেল। বিনোদিনী বারান্দার রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শূন্য উঠানের শূন্যতার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিহারী বাহিরে আসিয়া কহিল, "মহিন্‌দা, আমি জানিতে চাই, এইখানেই কি আমাদের বন্ধুত্ব শেষ হইল?"

মহেন্দ্রের বুকের ভিতর তখন জ্বলিতেছিল, বিনোদিনীর পরিহাস-হাস্য বিদ্যুৎ-শিখার মত তাহার মস্তিষ্কের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া বিঁধিতেছিল—সে কহিল, "মিট্‌মাট্‌ হইলে তোমার তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তাহা প্রার্থনীয় বোধ হয় না! আমার সংসারের মধ্যে আমি বাহিরের লোক ঢুকাইতে চাই না—অন্তঃপুরকে আমি অন্তঃপুর রাখিতে চাই!"

বিহারী কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল!

ঈর্ষাজর্জ্জর মহেন্দ্র একবার প্রতিজ্ঞা করিল—বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করিব না—তাহার পরে বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় ঘরে-বাহিরে, উপরে-নীচে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্রমশ।

কয়েকখানি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড্‌-সাহেব বাংলা-ভাষার সর্ব্বপ্রথম একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। চার্লস উইলকিন্স্‌-সাহেব এই সময়ে স্বহস্তে কুদিয়া ও ঢালিয়া একসেট বাংলা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই অক্ষর দ্বারা তাঁহার বন্ধু হালহেড্‌-সাহেবের ব্যাকরণ হুগলীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই ব্যাকরণের ভূমিকার শেষে একটি অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয়;—"বিজ্ঞাপন—এতদ্দ্বারা এই অনুরোধ করা যাইতেছে যে, এই পুস্তক যেন গ্রীষ্মকাল আরম্ভ না হইলে বাইণ্ডিং করিতে না দেওয়া হয়, যেহেতুক ইহার অধিকাংশ বর্ষাকালে ছাপা হইয়াছে।"*

এই পুস্তকখানিকে ঠিক ব্যাকরণ-সংজ্ঞা দেওয়া সঙ্গত কি না বলা যায় না; ভাষা-সূত্র-সঙ্কলনের কিছু চেষ্টা ইহাতে না আছে, এমন নহে; কিন্তু তাহা বড় অসম্পূর্ণ। পুস্তকখানির অনেকাংশ জুড়িয়া বাংলা শব্দ ও রচনার ইংরেজী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে,—আবার বাংলা পাটীগণিতের অনেক কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক কতকটা শিশুবোধকের মত। ব্যাকরণের নাম দিয়া ইহাতে বাঙ্‌লাভাষাসম্বন্ধে অনেক কথারই আলোচনা করা হইয়াছে।

হাল্‌হেড্‌-সাহেব পুস্তকখানির একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে বাংলা-ভাষার তাৎকালিক-অবস্থা-সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এই ভূমিকা পাঠে জানা যায়, বাংলা-ভাষায় সেই সময় বঙ্গদেশের

* ADVERTISEMENT.

It is recommended not to bind this book till the setting in of the dry season as the greatest part has been printed during the rains."

সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। এ দেশের সমস্ত দলিল, পাট্টা, লগ্নীকারবারের চিঠিপত্র ও যাবতীয় লেখাপড়া, আড়ঙ্-গুলির হিসাবপত্র, বন্ধুবান্ধবের নিকট পত্রাদি, সমস্তই বাংলা-ভাষায় লিখিত হইত। বড় বড় জমিদারবর্গের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই পার্শী কি আরবীতে অধিকার ছিল; যদিও কাজিদের বিচারগৃহে পার্শীর চর্চ্চা হইত, তথাপি পার্শী দলিলপত্রের একটা বাংলা অনুবাদ দেওয়া অপরিহার্য্য ছিল,—প্রত্যেক বিচারালয়েই বাংলা-অনুবাদক (মতরজ্জম্) নিযুক্ত থাকিতেন এবং সাধারণের অবগতির জন্য যে সকল পার্শী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইত, তাহার সকলগুলির সঙ্গে সঙ্গেই একটা বাংলা অনুবাদ দেওয়া আবশ্যক হইত। জমিদারগণ প্রজাদিগকে বাংলাভাষায় লিখিত দলিলপত্র প্রদান করিতেন।

সুতরাং মনে হইতে পারে, ইংরেজদিগের আগমনের পূর্ব্বেই বাংলা গদ্য এতাদৃশ বিস্তৃত প্রচারদ্বারা বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। যে ভাষাকে হালহেড্-সাহেব বাংলা-ভাষা-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কি প্রকারের সামগ্রী, তাহা তদীয় মন্তব্য পাঠেই অবগত হওয়া যায়;—"যে সকল ব্যক্তি বাঙ্‌লা ক্রিয়াবাচক শব্দের সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আরবী কি পার্শী নাম-শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাংলাই বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়া পরিচিত।" * পাঠকগণ সাবেকী দলিলপত্র অনেকই দেখিয়া থাকিবেন, হালহেড্-সাহেব নিম্নলিখিত দলিলটি উদ্ধৃত করিয়া বাংলাভাষার স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন—

"৭ † শ্রীরাম।

গবিবনে ওজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোন তাহার দুই গ্রাম দরিয়া শীকস্তি হইয়াছে। সেই দুই গ্রাম পয়স্তী হইয়াছে চাক্‌লে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরী আজবায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার জে শরকার হইতে এক আমিন ও এক চোপদার শরজমিনতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হক দোলায়া দেন্ ইতি সন ১১৮৫ সাল তারিখ ১১ শ্রাবণ। ফিদবি

জগতবির রায়"

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এই বাংলাকে অবজ্ঞা করিতেন; যাঁহারা যবনস্পৃষ্ট সমস্ত দ্রব্যই পরিহার করিতেন, তাঁহারা যে এরূপ বাংলার প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রদর্শন

* "And at present those persons are thought to speak this compound idiom with the most elegance who mix with pure Indian verbs the greatest number of Persian and Arabic nouns."

† এই "৭" কেন প্রয়োগ করা হইত, তাহা রাজা রামমোহন রায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পত্রাদির উপরিভাগে (৭) এই সপ্ত সংখ্যার অঙ্ক যাহার দ্বারা শুণ্ডাকার সাদৃশ্যে গণেশকে বোধ হয়, বিঘ্ননাশের নিমিত্ত তাহাকে কেহ কেহ লিখিয়া থাকেন।"

রাজা রামমোহন রায় কৃত ব্যাকরণ।

করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। হালহেড্-সাহেব লিখিয়াছেন—"কিন্তু ব্রাহ্মণবর্গ এবং অপরাপর সুশিক্ষিত হিন্দু, যাঁহারা সরকারী উচ্চপদবী প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার নিকট জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেন নাই, তাঁহারা এখনও একান্ত অনুরাগ ও বিশ্বাসের সহিত তাঁহাদের প্রাচীনভাষারই (সংস্কৃতের) চর্চ্চা করিয়া থাকেন।"* বাংলা-গদ্য-সম্বন্ধে হালহেড্-সাহেব লিখিয়াছেন,—"থুসিডাইডিসের পূর্ব্বে গ্রীক্‌ভাষার যে অবস্থা ছিল, এখন বাংলাভাষার কতক-পরিমাণে সেইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়। যদিও বৈষয়িক বাণিজ্যাদি ব্যাপার ও সরকারী কাজের জন্য বাংলা-গদ্য সর্ব্বদা ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়, তথাপি ধর্ম্ম, ইতিহাস কিংবা নীতি সম্বন্ধীয় কোন গুরুতর বিষয়ে কিছু লিখিতে হইলেই বাঙালীরা পদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।+

বাঙালীরা যে ভাবে পূর্ব্বে লেখনী পরিচালনা করিতেন, এখন সে দৃশ্য আর সুলভ নহে। প্রাচীন লেখকমহাশয়ের সে অদ্ভুত ভঙ্গিটি এখনও নিতান্ত অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই, কিন্তু বোধ হয় কালে উহা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাসযোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে। হালহেড্-সাহেব অতীব বিস্ময়ের সহিত বাঙালী লেখকের লেখনীচালনকার্য্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। "তাঁহারা যে হস্তে লেখনী ধারণ করেন, সে হস্তটি মুষ্টিবদ্ধ থাকে এবং মধ্যম অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা লেখনীটিকে বৃদ্ধাঙ্গুলীর তলদেশে ঠেকাইয়া ধরেন। তাঁহাদের চেয়ার কিংবা টেবিল নাই, সুতরাং তাঁহাদের লিখিবার প্রণালী অদ্ভুত রকমের, তাঁহারা গুল্‌ফ কিংবা জানুর নিম্নভাগের উপর ভর দিয়া উপবেশন করেন এবং তাঁহাদের বামহস্ত ডেস্কের কাজ করে, কারণ লিখিবার কাগজখানি সেই হস্তের উপর রক্ষিত হয়। ‡

ডোডো-পক্ষীর ন্যায় এই লেখকের মূর্ত্তিও যে ধরাপৃষ্ঠে ক্রমশ অতীব দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সাহেব বাংলা শিখিতে যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; প্রথমত কোন ব্রাহ্মণই তাঁহাকে বাংলা শিখাইতে সম্মত হন নাই, বহুকষ্টে

* "But the Brahmins and all other well-educated Jentoos. whose ambition has not overpowered their principles, still adhere with a certain conscientious tenacity to their primeval tongue."

+ I might observe that Bengal is at present in the same state with Greece before Thucydides, when poetry was the only style to which authors applied themselves and studied prose was utterly unknown. Letters of business, petitions and public notifications &c. are necessarily and of course written in prose, but all compositions dedicated to religion, history and morality are in poetry.

‡ They write, with the hand closed in which they hold the pen pressing it against the ball of the thumb with the tip of the middle finger. As they have neither chairs nor tables their posture in writing is very different from ours. They sit upon their heels or sometimes upon their hams, left hand serves as a desk whereupon to lay the paper on which they write.

অবশেষে একজনকে তিনি নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশদানে স্বীকৃত হইলেও তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটি বর্ণও সাহেবকে বলিতে স্বীকার করেন নাই। হালহেড্ বাংলা-ভাষাকে পার্শী হইতে অনেক পরিমাণে বিষয়কর্ম্মের উপযোগি-ভাষা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন—উহা পার্শীর মত বৃথাকথার বাহুল্যে পল্লবিত হয় না,—বাংলা স্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য ভাষা, বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য এই বাহুল্যবর্জ্জিত নিরাভরণ ভাষা উৎকৃষ্টরূপে উপযোগী। তিনি লিখিয়াছেন, ইংরেজী অপেক্ষা বাংলা বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট এবং শিক্ষার পক্ষে সহজ। এ কথা কিছু নূতন নহে; ক, খ, গ, ঘ,—'স,.ঋ, গ, ম'এর ন্যায় কণ্ঠস্বরের ক্রমিক-পরিণতি-জ্ঞাপক। ইংরেজী 'এ, বি, সি, ডি'র ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলভাবে সন্নিবদ্ধ নহে। ইহাতে বাঙালীর গৌরব করিবার কিছুই নাই; যে অসাধারণ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত-ব্যাকরণকে অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত করিয়াছিলেন, বর্ণমালার এই পর্য্যায়বিভাগও তাঁহাদেরই কার্য্য।

হালহেডের ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে বাংলা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব হইতে অনেকাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই সকল অংশ কি ভাবে উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হইবে, তাহা ইংরেজীভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দসকলের লিঙ্গনির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু পুংলিঙ্গ "শান্তিপুরী"শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ "শান্তিপুরিণী" একটুকু অদ্ভুত রকমের। এইরূপ আরও আছে—এই সকল শব্দ কি পূর্ব্বে এই ভাবেই রূপান্তরিত হইত অথবা উহা সাহেবমহাশয়ের অনভিজ্ঞতার ফল, বলিতে পারা গেল না। তৎপরের অধ্যায়টি বিভক্তিসম্বন্ধীয়। সাহেব লিখিয়াছেন—"এ" বর্ণটি অনেকসময় প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী এবং সপ্তমী, এই পাঁচ কারকেরই চিহ্নরূপে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। প্রথমায় যথা —"আমি যদি সেনাপতি হইব সমরে। তবে অস্ত্র না ধরিবে কর্ণ মহাবীরে॥" দ্বিতীয়ায় যথা—"যুধিষ্ঠিরে ধরে দেহ।" তৃতীয়ায়—"বাণে কাটিলেক সৈন্য।" পঞ্চমী ও সপ্তমীতে—"এত শ্রাবণমাসে ধারা বরিষে গগনে"—এস্থলে "মাসে" সপ্তমী এবং "গগনে" পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে। বিভক্তিসম্বন্ধে অন্যান্য মন্তব্যের কোন নূতনত্ব নাই। তৎপরে শব্দের বচন নির্ণীত হইয়াছে। সাহেব মনে করেন, বহুবচনবাচক 'দিগ'শব্দ সংস্কৃতের 'দিক্'-শব্দ হইতে উদ্ভূত। ইহার পরে সর্ব্বনাম-শব্দ-বিচার। ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি সম্বন্ধে গ্রন্থকার এক অদ্ভুত তালিকা প্রদান করিয়াছেন;—কর্ত্তৃকারকের একবচনের উত্তর "করিস" এবং বহুবচনের উত্তর "কর" এই ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়, যথা, "তুমি করিস"—"তোমরা কর", "তুমি করিবি"—এবং "তোমরা করিবা"। এই ভাবের বহুসংখ্যক উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়-গুলিতে ক্রিয়াবিশেষণ এবং পাটীগণিতের কথা আছে,—সংখ্যা ও পরিমাণ বোধক

আনা, পাই, রতি প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ে কবিতা-রচনার নিয়মাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। "ধুয়া" এবং "ধুয়াতান", এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সাহেব লিখিয়াছেন যে, যখন হাতে তালির সঙ্গে "ধুয়া" গীত হইয়া থাকে, তখন উহা "ধুয়াতান"নামে অভিহিত হয়। প্রাচীন বাংলা পুঁথিগুলিতে "ধুয়া" এবং "ধুয়াতান", উভয় শব্দই অনেক-স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে, পাঠকবর্গ দেখিয়া থাকিবেন।

বাংলা-ব্যাকরণ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন সূত্র এই পুস্তকে না পাওয়া গেলেও, এই পুস্তকখানি বাংলা ব্যাকরণের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই; হালহেড্ নিজেও সে কথা লিখিয়াছেন। * ভূমিকা ছাড়া, এই ব্যাকরণখানি ক্রাউন আটপেজী ২১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

এখনও বাংলাভাষার একখানি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ রচিত হয় নাই। যিনি ভবিষ্যতে সে চেষ্টায় ব্রতী হইবেন, তাঁহাকে হালহেড্-সাহেবের পুস্তকখানিকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতে হইবে।

হালহেডের ব্যাকরণের পরে রাজা রাম-মোহন রায় এবং ভগবান্ চন্দ্র সেন বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সম্ভবত ইহা-দের পরে কীথ-সাহেব ও ব্রজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তক-গুলির মধ্যে ভগবান্ চন্দ্র সেনের ব্যাকরণ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়,—ইহার দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তক এখন দুর্লভ; ইহার একখানি হস্তলিখিত পুঁথি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' সভাকে উপহারপ্রদান করিয়াছেন। পুঁথি-খানির কোনস্থানে সন-তারিখ খুঁজিয়া পাইলাম না, তবে লেখা ও পুঁথির অবস্থা দৃষ্টে বোধ হইল, ইহা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হওয়ার সমসাময়িক হইবে। ব্যাকরণ-প্রণেতা ভগবান্ চন্দ্র বৈদ্যবংশীয় এবং গৌরীভা-গ্রাম-নিবাসী। পুস্তক-প্রণয়ন-কালে তিনি চুঁচুড়াগ্রামে মহম্মদ-মহসিনের বিদ্যা-লয়ে পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। আলোচ্য পুঁথিখানি নকল করিয়াছেন রামহরি লাহিড়ী ও জগদ্দুর্লভ গাঙুলী নামক ব্যক্তিদ্বয়। গ্রন্থকার সংস্কৃত-ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই ব্যাকরণখানির নাম—"বঙ্গভাষা সাধু ভাষা ব্যাকরণ সারসংগ্রহ।" কিন্তু এখান একটি ক্ষুদ্র কলাপ বা সংক্ষিপ্ত পাণিনি নামেও অভিহিত হইতে পারে; ইহাতে সংস্কৃত-ব্যাকরণের সূত্রগুলিই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—বাংলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সংস্কৃতের সূত্রদ্বারা যে ইহার সকল কথা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহা ভগবান্ চন্দ্র অল্পই চিন্তা করিয়াছিলেন। ধ্বন্যাত্মক, বর্ণাত্মক প্রভৃতি শব্দ পর্য্যালোচনা করিয়া ইনি কণ্ঠৌষ্ঠ, কণ্ঠ্য-তালব্য প্রভৃতি বর্ণ বিচার করিয়াছেন; তৎ-পর প্রাচীন সনাতন নিয়মে সন্ধি ও সমাসের

* "The path which I have attempted to clear was never trodden before."

সূত্র সঙ্কলন করিয়া যোজক, পার্থক্যসূচক, সন্দেহসূচক, হেতুবোধক, ভাববোধক অব্যয় শব্দগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। স্বরূপ-বিশেষণ, প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ প্রভৃতিরও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ক্রিয়াগুলির কাল-বিচার করিতে গিয়া যোগ্য বর্ত্তমান, বর্ত্তমান-সামীপ্যভূতে বিহিত বর্ত্তমান প্রভৃতির উল্লেখ ও উদাহরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সংস্কৃতানভিজ্ঞের নিকট এই পুস্তক-খানি একটি দুর্ব্বোধ প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইবে। নামশব্দের বিভক্তিনির্ণয় ও ক্রিয়ার রূপান্তর সম্বন্ধে বৈয়াকরণমহাশয় স্বাধীনভাবে বাংলার জন্য দু'একটি সূত্র সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তথাপি এই প্রাচীন পুঁথিখানি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়া প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। বাংলাভাষার ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিতে হইলে এই পুঁথিখানি হইতে কিছু-না-কিছু সাহায্য পাওয়া যাইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্কুল্-বুক্-সোসাইটি তাঁহাকে একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তখন তিনি বিলাত-যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং অতি তাড়াতাড়ি একখানি ব্যাকরণ লিখিয়া শুদ্ধ করিবার ভার স্কুল্-বুক্-সোসাইটির উপর অর্পণ করিয়া তিনি বিলাতযাত্রা করেন। এই পুস্তকখানির ৫টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথমবারে ১০০০খানি, দ্বিতীয়বারে ৫০০, তৃতীয়বারে ১০০০, চতুর্থবারে ১০০০, এবং পঞ্চমবারে (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) ১৫০০ পুস্তক, মোট ৫০০০ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। বহীখানি ডিমাই ১২পেজী ১০৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, বাংলাভাষাতত্ত্বের যদি সূত্রসঙ্কলনের কোন চেষ্টা হইয়া থাকে, তবে এই পুস্তকখানিতেই তাহার নিদর্শন বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মৌলিকতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাষার সূত্র উদ্ভাবনের নিদর্শন এই পুস্তকে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাংলাভাষার ব্যাকরণ-প্রণয়ন-কল্পে এই প্রতিভাশালী মহাজন যেটুকু শ্রম-স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য নাই ;— বঙ্কিমবাবুর কথায় বলিতে গেলে, "ইহা মুষ্টি-ভিক্ষা হইলেও সুবর্ণের মুষ্টি।"

রাজা রামমোহন রায় বাংলাভাষার যে সকল সূত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। আমরা সূত্রগুলি রাজার ভাষায় না দিয়া অনেকস্থলেই সংক্ষেপে আমাদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। কর্ত্তৃকারকে সাধারণত নামশব্দের পরিবর্ত্তন হয় না, যথা—হরিদাস কহিলেন।

২। কিন্তু ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে কখনও কখনও কর্ত্তৃকারকে নামশব্দের অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে "এ"কার যুক্ত হয়, যথা—বেদে কহিলেন। ঘোড়ায় তাহাকে মারিলেক।

৩। কর্ম্ম দুইপ্রকার, যথা—গৌণ ও মুখ্য কর্ম্ম। গৌণকর্ম্মে অনেকসময়েই "কে" যুক্ত হয়, যথা—হরি বহু ধন হরিদাসকে দিলেন। কিন্তু কখনও কখনও যদি মুখ্য-কর্ম্মোক্ত মনুষ্য নিশ্চিতরূপে জ্ঞেয় হয়,

তাহার অন্তেও "কে"বিভক্তি সংযুক্ত হইয়া থাকে, যথা—আপন পুত্রকে আমাকে দেও।

৪। অধিকরণের চিহ্ন, "এ", "য়" এবং "এতে"।

যে সকল নামশব্দের শেষে "আ" থাকে, অধিকরণকারকে তাহাদের উত্তর "তে" কিংবা "য়" হয়, যথা—মৃত্তিকাতে, মৃত্তিকায়।

যে সকল নামশব্দের শেষে "ই" "ঈ", "উ" "ঊ", "এ" "ঐ", "ও" "ঔ", এই সকল বর্ণের কোন বর্ণ থাকে, তাহার অন্তে "তে" হয়, যথা—ছুরি, ছুরিতে। হাতী, হাতীতে।

৫। যদি নামশব্দ হলন্ত কিংবা অকারান্ত হয়, তবে সম্বন্ধবোধের নিমিত্ত তাহার অন্তে "এর" সংযোগ করা হয়, যথা—রামের ঘর, কৃষ্ণের ঘর। এতদ্ভিন্ন বর্ণ শব্দের অন্তে থাকিলে তাহার সম্বন্ধবোধের জন্য কেবল রেফের সংযোগ করা যায়, যেমন—রাজার ধন, বাঁশীর শব্দ।

৬। করণকারকের জন্য পৃথক্ নিয়মের আবশ্যক নাই। যদি শব্দ অপ্রাণিবাচক হয়, তবে তদুত্তরে অধিকরণের চিহ্ন "তে"র আগম হয়, যথা—ছুরিতে কাটিলেক। অন্যান্য স্থলে "দিয়া" কিংবা "দ্বারা" শব্দের যোগে সিদ্ধ হয়।

৭। বঙ্গভাষায় মনুষ্যবাচক কিংবা মনুষ্যের গুণবাচক শব্দসকলের বহুবচনে একবচনের রূপ থাকে না, যথা—পণ্ডিত, পণ্ডিতেরা। কিন্তু বস্তুবাচক শব্দের বহুত্বাভিপ্রায়ে একবচনের রূপই থাকে,—শুধু তাহার উত্তরে বহুত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা—গোরু, গোরুসকল। কিন্তু যখন গোরু, পশু ইত্যাদি শব্দ মূর্খতাজ্ঞাপনের জন্য মনুষ্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন বহুবচনে তাহাদের রূপের অন্যথা হয়, যথা—গোরুরা, গোরুদিগকে। বহুত্ববাচক শব্দ সময়ে সময়ে মনুষ্যের অন্তেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যথা—মনুষ্যসকল।

৮। তুচ্ছতাবোধের জন্য নামশব্দের অন্ত্যবর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আর সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় অন্যান্য কারকের চিহ্ন বর্ত্তিয়া থাকে, যেমন—রাম, তুচ্ছার্থে "রামা"; তৎপর অন্যান্য কারকে, "রামাকে," "রামায়," "রামাতে"।

হলন্ত শব্দ এবং অকারান্ত শব্দের উত্তর তুচ্ছার্থে "আ" হয়, যথা—রাম, রামা; কৃষ্ণ, কৃষ্ণা। কিন্তু "যে সকল হলন্ত শব্দ একপ্রযত্নে উচ্চারিত হয় না, তাহার উত্তর 'এ'কার আইসে, যেমন—মা-ণিক, মাণিকে, গো-পাল, গোপালে। কিন্তু যে সকল শব্দ শব্দান্তরে মিলিত হয়, এবং তাহার শেষ শব্দে দীর্ঘস্বর' না থাকে, সে সকল শব্দের একপ্রযত্নে উচ্চারিত শব্দের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে, যথা—রামধন, রামধনা। আর যে সকল শব্দের অন্তে ই, ঈ থাকে, তাহার পরিবর্ত্তে একার হয়, যেমন—হরি, হরে, কাশী—কাশে ও কেশে। উকারান্ত শব্দের উকারের স্থানে ওকার হয়, যেমন—শম্ভু, শম্ভো। যে সকল শব্দ আকারান্তস্বরদ্বয়যুক্ত হয় ও তাহার প্রথম অক্ষরে 'আ' থাকে, তাহার প্রথম আকারের একারে ও দ্বিতীয়ের ওকারে পরিবর্ত্তন হয়, যেমন—রাধা, রেধো। কিন্তু অন্যস্থলে প্রায়ই পরিবর্ত্তন হয় না, যথা—রামা, শ্যামা, ইত্যাদি।"

ক্ষুদ্র পুস্তকখানির আদ্যন্ত এই ভাবে বাংলাভাষার উপযোগী স্বতন্ত্র ব্যাকরণ প্রস্তুত. করিবার চেষ্টা দৃষ্ট হয়,—দুঃখের বিষয়, এই চেষ্টার বিকাশের জন্য তাঁহার পরে আর কেহ অগ্রসর হন নাই। পরবর্ত্তী ব্যাকরণগুলি সংস্কৃত-ব্যাকরণের আদর্শে, শুধু অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের জন্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলাভাষাকে বৈজ্ঞানিকের চক্ষে দেখিয়া,—ইহার জন্য সাধারণ সূত্র সঙ্কলন করা আবশ্যক হইলেও তদুপযোগী প্রতিভাবান্ ব্যক্তি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না,—ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

রাজা রামমোহন রায় আমাদের প্রাচীন বাংলা কবিতাগুলিকে বড় আদরের চক্ষে দেখিতেন না। আলোচ্য পুস্তকখানির পদ্য-রচনার অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"গৌড়দেশে না গীতের শৃংখলা আছে, না গৌড়দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য উত্তমরূপ আছে।"*

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মানসী।

ধরা যে তোমার পাব, কেমনে—কোথায়?—
লেলিহান দীর্ঘ তৃষা মিটাই কেমনে?
কোন্ রূপে বহুরূপী, হৃদয়-বেলায়—
তোমারে করিয়া বন্দী, নিবাই চরণে
অশেষ-বাসনা-ঊর্ম্মি— সংক্ষুব্ধ-জীবনে?
ধ্যান বল, প্রেম বল,— নিষ্ফল প্রয়াস!
পাইলেও পাই নাই— মিটে না তিয়াস।
চির উপভোগ মেশা— চির অন্বেষণে!

জড়রূপে দেখা দিলে,— সদা কাঁদে প্রাণ
চেতনার সাড়া পেতে;— অমূর্ত্ত যখন,—
দরশ-পরশ-আশে হৃদি ম্রিয়মাণ;—
দেহ-প্রাণ ধরি এলে,— কোথা সে মিলন
তব অঙ্গে প্রতি-অঙ্গ পাবে পরিত্রাণ,
প্রাণ পাবে তব প্রাণে নিশ্চিন্ত নির্ব্বাণ?

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

---

* প্রবন্ধটি পূজার পূর্ব্বেই আমাদের হস্তগত হইয়াছিল কেবল স্থানাভাবে এতদিন প্রকাশিত হইয়া উঠে নাই। বং সং।

সার সত্যের আলোচনা।

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের কার্য্যগত প্রভেদ।

ডারুইনের শাস্ত্র-অনুসারে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (survival of the fittest) সৃষ্টির প্রধান প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। আমার ইচ্ছা হইতেছে, ডারুইনের ঐ কথাটির উপরে-উপরে ভাসিয়া না বেড়াইয়া উহার ভিতরে কি আছে, তাহা একবার ডুব দিয়া দেখিতে; অতএব দেখা যা'ক্ :—

যে-কোনো সীমাবদ্ধ বস্তু হউক্ না কেন, —যেমন তুমি বা আমি—সেই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র বস্তুটকেই সমস্ত জগতের একতম খণ্ড বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোনো এক ব্যক্তিকে—যেমন দেবদত্তকে—যদি সমস্ত জগতের একতম খণ্ড বলিয়া ধরা যায়, তবে কাজেই দাঁড়ায় যে, দেবদত্তের শরীরের সীমার বাহিরে জগতের মধ্যে আর আর যত কিছু পদার্থ আছে, সমস্তের মোট বাঁধিলে যাহা দাঁড়ায়, তাহা নিখিল জগতের অন্যতম খণ্ড। তবেই হইতেছে যে, নিখিল জগৎ দুই খণ্ডে বিভক্ত; এক খণ্ড হ'চ্চে দেবদত্ত নিজে, আর-এক খণ্ড হ'চ্চে দেবদত্তের শরীরের সীমার বাহিরে যেখানে যাহা কিছু আছে, তা-সবা'র সমষ্টি। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, তুমি নিজে একজন এবং তোমার শরীরের সীমার বাহিরে যেখানে যত-কিছু পদার্থ আছে, সমস্তের সমষ্টি আর-এক জন। তোমরা দুইজন প্রকৃত-প্রস্তাবে দুই নহ; পরন্তু একেরই দুই অপরিহার্য্য অঙ্গ;—সে এক কি? না, সমস্ত জগৎ। তুমি, এবং তোমা-ছাড়া জগতে আর যাহা কিছু আছে সমস্ত— এই দুই ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ খণ্ড-পদার্থ—যখন একেরই দুই অপরিহার্য্য অঙ্গ, তখন দুয়ের মধ্যে ঐকান্তিক বিচ্ছেদ অসম্ভব—সুতরাং দুয়ের মধ্যে যোগ অবশ্যম্ভাবী। এই তো পাইলাম যোগ। এখন যোগ্যতা কি— তাহাই জিজ্ঞাস্য।

যে-কোনো সীমাবদ্ধ বস্তু হউক্ না কেন, তাহার যোগ্যতা বলিতে বুঝায় আর কিছু না—তাহার নিজত্বের সীমার বাহিরের বস্তুসকলের সহিত যোগ-ক্ষমতা। তুমি যদি তোমার পরিবার-বর্গের সহিত—রাজ-পুরুষদিগের সহিত—কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সহিত—ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের সহিত—এক কথায় সময়ের সহিত যোগে চলিতে পার, তবে তোমাকে বলিব যোগ্য-চূড়ামণি। কিন্তু যোগের পাত্র-ভেদ আছে—সেটা ভুলিলে চলিবে না। এই পাত্র-ভেদের ব্যাপারটি চরাচর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া

নিরন্তর চলিতেছে, সুতরাং ডারুইনের ন্যায় একজন বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অনুসন্ধান-চক্ষে তাহা গোপন থাকিতে পারে না। ডারুইন তাহার নাম দিয়াছেন—Natural selection নৈসর্গিক পাত্র-নির্ব্বাচন। চোর-ডাকাত প্রভৃতি যে সকল দুষ্ট-লোক জন-সমাজের যোগ-ভঙ্গ করিতেই সর্ব্বদা তৎপর, তাহারা যোগের অনুপযুক্ত পাত্র। এইজন্য যে রাজা দুষ্টের সহিত যোগযুক্ত হইয়া শিষ্টের নির্যাতন করেন, সে রাজাকে যোগ্য রাজা বলিতে পারা যায় না। ফলেও আমরা সেই রাজাকেই বলি যোগ্য রাজা, যিনি শিষ্টের সহিত যোগযুক্ত হইয়া দুষ্টের দমন করেন। শিষ্টের সহিত যোগই প্রকৃত যোগ। "শিষ্ট" কিনা শেষিত—পরিণত (finished—accomplished)। জ্ঞান-শব্দ হইতে যেমন জ্ঞেয়-শব্দ এবং জ্ঞাত-শব্দ হইয়াছে, শেষ-শব্দ হইতে তেমনি শিষ্য-শব্দ এবং শিষ্ট-শব্দ হইয়াছে। গুরু যাঁহাকে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন—পাকাইয়া তুলিতেছেন—finish করিয়া তুলিতেছেন—শেষিত করিয়া তুলিতেছেন—তিনিই শিষ্য; এবং যিনি শেষিত হইয়াছেন, তিনিই শিষ্ট। শিষ্ট হ'চ্চে finished product of শিক্ষা ("শিক্ষা" অর্থাৎ শেষিত হইবার ইচ্ছা বা চেষ্টা), এবং প্রকারান্তরে finished product of nature। প্রকৃতির গতিই শিষ্টের দিকে—দুষ্টের দিকে নহে; কেন না, দুষ্টেরা কালে আপনাদের দোষেই আপনারা মারা পড়ে। শিষ্টেরাই জনসমাজের যোগবন্ধনের ভিত্তিমূল; শিষ্টের সহিত যোগই প্রকৃত যোগ। কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, জন-সমাজে যিনি যে পরিমাণে শিষ্টদিগের সহিত যোগ-ক্ষম, তিনি সেই পরিমাণে যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে:—কথায় বলে, "ঠক বাছিতে গাঁ উজাড়"। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জন-সমাজে কেহ বা বেশী দুষ্ট, কেহ বা কম দুষ্ট; কেহ বা কম শিষ্ট, কেহ বা বেশী শিষ্ট; তা বই, একেবারেই পরম শিষ্ট কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না; এক কথায়—দুষ্ট এবং শিষ্টের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের ব্যবধান নাই; ব্যবধান না থাকিবারই কথা; যেহেতু শিষ্ট এবং দুষ্ট—রাম-রাবণ—উভয়েই প্রকৃতি-মাতার সন্তান। এমন কি, রাবণ না থাকিলে রামায়ণই হইতে পারিত না। দুষ্ট এবং শিষ্ট দুয়ের মধ্যে যদি অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর থাকিত, তবে চৈতন্য-মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে শিষ্ট করিয়া তুলিতে পারিতেন না। যে রাজা শিষ্টের সহিত যোগযুক্ত হইয়া দুষ্টের দমন করেন, তিনি সুযোগ্য রাজা তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহা অপেক্ষাও যোগ্যতর রাজা যদি থাকেন, তবে তিনি সেই রাজা—যিনি তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না, পরন্তু দুষ্টকে আপন সদ্‌গুণের দৈবী মায়ার প্রভাবে শিষ্ট করিয়া তোলেন। জীবের প্রাণ যেমন নির্জীব অন্নকে সজীব রক্ত করিয়া তোলে—মহাপুরুষদিগের প্রেম এবং দয়া তেমনি অধম পাপীকেও উত্তম সাধু করিয়া তোলে। এ সকল আশপাশের

কথা এখন যাইতে দেওয়া হো'ক্। প্রকৃত বক্তব্য যাহা, তাহা এই যে, সীমাবদ্ধ বস্তুগণের মধ্যে, যে বস্তু যে পরিমাণে আপন সীমার বাহিরের বস্তুসকলের সহিত যোগে চলিতে পারে, সে বস্তু সেই পরিমাণে যোগ্য-শব্দের বাচ্য। মোটামুটি সকলেই জানে যে, তরু-লতা অপেক্ষা পশু-পক্ষী, এবং পশু-পক্ষী অপেক্ষা মনুষ্য যোগ্যতর জীব; কিন্তু সে-প্রকার জানা কাজের জানা নহে। স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সকলেই তো যোগ্য; তবে কেন একজনকে বলা হয় যোগ্য, আরেক জনকে বলা হয় অযোগ্য? যে যোগ্য, সে কিসে যোগ্য—ইহার একটা ঠিক্-ঠাক্ উত্তর দিতে পারা চাই;—তা যদি তুমি না পার, আর, তবুও যদি বল যে, "আমি জানি যে, উদ্ভিদপদার্থ অপেক্ষা অধম-জন্তু এবং অধম-জন্তু অপেক্ষা মনুষ্য যোগ্যতর জীব", তবে সেরূপ জানা বিজ্ঞানের কোনো কার্য্যে আসিতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, উদ্ভিদপদার্থ অপেক্ষা মূঢ়জীব এবং মূঢ়জীব অপেক্ষা মনুষ্য যে কিসের গুণে অধিকতর যোগ্য, তাহার একটি কস্‌টি-পাথর আছে; তাহা ঘষিয়া দেখিলেই—যে যোগ্য, সে কিসে যোগ্য, তাহা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। সে কস্‌টি পাথর যে কি, তাহা বলিতেছি।

সীমাবদ্ধ বস্তু-মাত্রেরই যোগ্যতার অভি-জ্ঞান-চিহ্ন বা নিদর্শন কি—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার নিজত্বের সীমাবহির্ভূত বস্তুসকলের সহিত তাহার যোগের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা একবার ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখ। যাহার যোগের দৌড় আপন শরীরের সীমা ছাড়াইয়া যত বেশীদূর যায়, সে সেই পরিমাণে অধিকতর যোগ্য। উদ্ভিদপদার্থ-সকলের যোগের দৌড় তাহা-দের শরীরের সীমা-ঘ্যাঁসা পদার্থ-সকলেতেই পর্য্যাপ্ত; তার সাক্ষী—তাহারা তাহাদের মূল-ঘ্যাঁসা মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করে, পত্র-ঘ্যাঁসা বায়ু হইতে কার্বনাদি অন্ন আহরণ করে, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মূঢ়জীবদিগের যোগের দৌড় চলে তাহাদের শরীরের সীমা ছাড়াইয়া তাহার ও-দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত। তার সাক্ষী—মৌমাছিরা থাকে মৌচাকে, মধু অন্বেষণ করে সরোবরের পদ্মবনে। এ বিষয়ে, মনুষ্য এবং নিকৃষ্ট জন্তুদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, আর আর জীবদিগের যোগের দৌড় যতই দূরে প্রসারিত হউক না কেন, তথাপি তাহা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ; মনুষ্যের কিন্তু তাহা নহে; মনুষ্যের যোগের দৌড় কোনোপ্রকার প্রাচীরের অবরোধ মানে না; মনুষ্যের যোগের দৌড় আকাশ-পাতাল-ব্যাপী সমগ্র সত্যে প্রধাবিত হয়; মনুষ্য সমগ্র আত্মার সম্যক্ চরিতার্থতা চায়; তাহারই জন্য "সার সত্যের আলোচনা"। সার সত্যের আলোচনা পশু-পক্ষীদিগের অধিকার-বহির্ভূত।

এখন দেখিতে হইবে এই যে, উদ্ভিদ-পদার্থ-সকলের যোগের নিদান তাহাদের প্রাণ; মূঢ়-জন্তুদিগের যোগের নিদান তাহা-দের মন; মনুষ্যের যোগের নিদান তাহার বুদ্ধি। সেই সঙ্গে আর-একটি দেখিতে হইবে এই যে, প্রাণের বিচরণ-ক্ষেত্র অব্যক্ত সত্তা; মনের বিচরণ-ক্ষেত্র প্রাতি-

ভাসিক সত্তা; বুদ্ধির বিচরণ-ক্ষেত্র বাস্তবিক সত্তা।

পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি—একটা ত্রিকের কথা উঠিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দশটা ত্রিক সারি বাঁধিয়া আসিয়া হুড়াহুড়ি আরম্ভ করে। বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, মনুষ্য, এই ত্রিকটি যেই ডাক শুনিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, আর অমনি ত্রিকের শ্রেণী-পরম্পরা—এটির পশ্চাতে ওটি—ওটির পশ্চাতে সেটি—দেখা দিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে দেখা দিল—ভোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান; তাহার পরে দেখা দিল—প্রাণ, মন, বুদ্ধি; এখন আবার আরেক ত্রিক আসিয়া উপস্থিত☞অব্যক্ত সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা, বাস্তবিক সত্তা। ত্রিকের ভিমরুলের চাকে ঘা দিলে আর নিস্তার নাই! প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, তিনের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ সুস্পষ্ট, অথচ একাত্মভাব কিরূপ সুদৃঢ়, তাহা দেখাইবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বাহির হইয়াছিলাম, পথের মাঝখানে ত্রিকের ভিড় সামলাইতে না পারিয়া, সে প্রতিজ্ঞা মন হইতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। নূতন অভ্যাগত ত্রিকটিকেও সন্তুষ্ট করা চাই এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয়টিরও মীমাংসা করা চাই; দুই কূল রক্ষা করা চাই; তাহারই এখন চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

অভ্যাগত ত্রিক হ'চ্চে—অব্যক্ত সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা, বাস্তবিক সত্তা; অধিবাসী ত্রিক হ'চ্চে—প্রাণ, মন, বুদ্ধি। দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে—তাহা এইরূপ:—

জীবের অভ্যন্তরে কার্য্য করিবার সময়, প্রাণ কার্য্য করে অব্যক্ত-ভাবে, মন এবং বুদ্ধি কার্য্য করে ব্যক্ত-ভাবে। শরীরের ভিতরে প্রাণ একাকী একশত ব্যক্তির কার্য্য করে;—অন্ন পরিপাক করে, অন্নের নির্য্যাস রক্তে পরিণত করে, রক্ত শোধন করিয়া তাহাকে দিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ম্যারামত করাইয়া লয়—ইত্যাদি-প্রকার কত যে কার্য্য করে, তাহার সংখ্যা নাই; অথচ সে সমস্ত কার্য্য এমনি অব্যক্ত-ভাবে নিষ্পাদন করে যে, শরীরের যিনি গৃহস্বামী, তিনি তাহা জানিতেও পারেন না। পক্ষান্তরে, মন যখন লোভের চাবুক কসিয়া জীবকে সম্মুখস্থিত বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত করে, অথবা ভয়ের তাড়া দিয়া সম্মুখস্থিত বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনে, তখন দুইই সে করে ব্যক্ত-ভাবে। বুদ্ধির তো কথাই নাই;—রাজা যখন বুদ্ধিপূর্ব্বক রাজ-কার্য্য নিষ্পাদন করেন, অথবা সেনাপতি যখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ব্যূহ-রচনা করেন, তখন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে সুব্যক্ত-ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রাণ অব্যক্ত সত্তার ভিতরে ডুব দিয়া কার্য্য করে; মন এবং বুদ্ধি উভয়েই ব্যক্ত সত্তার আলোকে বিনির্গত হইয়া কার্য্য করে। বুদ্ধি এবং মন দুয়েরই কার্য্যের সহিত প্রাণের কার্য্যের এ-যেমন প্রভেদ দেখা গেল; বুদ্ধি এবং মনের আপনাদের কার্য্যের মধ্যেও তেমনি আর-এক দিকে আরেক-প্রকার প্রভেদ আছে—সে প্রভেদটিও বিবেচ্য। সে প্রভেদ এইরূপ:—

মনের নিকটে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে উপস্থিত বিষয়ই ব্যক্ত হয়; আর, অন্ধ-সংস্কার-সূত্রে উপস্থিত বিষয়ের সহিত অনুপস্থিত বিষয়ের যোগ অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে, বুদ্ধির নিকটে উপস্থিত-এবং-অনুপস্থিত-উভয়-সংবলিত সমগ্র আলোচ্য বিষয় প্রতিভাত হয় এবং (অন্ধ-সংস্কার-সূত্রে নহে, পরন্তু) বাস্তবিক সত্তার বন্ধন-সূত্রে সমস্তের সহিত সমস্তের যোগ অনুভূত হয়। বুদ্ধি এবং মনের মধ্যে এই যে কার্য্যগত প্রভেদ, ইহা একপ্রকার যোগের প্রকার-ভেদ; যথা:—

যোগ দুই-প্রকার—(১) প্রতিযোগ এবং (২) সংযোগ। যোজ্য বস্তুর সহিত তাহার অব্যবহিত-পরবর্ত্তী বস্তুর যে যোগ (যেমন পারম্পর্য্য-সূত্রে ক-এর সহিত খ-এর, খ-এর সহিত গ-এর, গ-এর সহিত ঘ-এর যে যোগ), তাহারই নাম প্রতিযোগ; আর মৌলিক-একতা-সূত্রে সমস্তের সহিত সমস্তের যে যোগ (যেমন কণ্ঠ্যতা-সূত্রে কখগঘঙ এই পাঁচটি বর্ণের সকলের সহিত সকলের যোগ), তাহারই নাম সংযোগ। এখন আমি দেখাইতে চাই এই যে, মন প্রতিযোগ-তরঙ্গের ধাক্কায় ধাক্কায় গম্যপথে অগ্রসর হয়, বুদ্ধি সংযোগ-সূত্রে অগ্রপশ্চাৎ বেষ্টন করিয়া পরিধি-পরম্পরা-ক্রমে গম্যপথে অগ্রসর হয়।

মনে কর, আমি বিদেশে একটা বৃহৎ-পান্থশালায় দুই-চারি-দিন-মাত্র বাস করিয়াছি। পরদিন প্রাতঃকালে আমি নগর-পর্য্যটন করিয়া যখন সেই পান্থশালার দ্বার-দেশে উপনীত হইলাম, তখন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না—সকলেই সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে গিয়াছে। পান্থশালার প্রাঙ্গণের দশদিক্ দিয়া দশটা সুঁড়ি পথ গিয়াছে; কোন্ পথটা আমার ঘরে পৌঁছিবার পথ, তাহা ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। একদিকের একটা পথ ধরিয়া চলিয়া আমার ঘরে যাইবার সিঁড়ি দেখিতে পাইলাম। সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে তো উঠিলাম, কিন্তু আমার বামে একটা এবং আমার ডাহিনে একটা, দুই দিকে দুইটা বারাণ্ডা রহিয়াছে—কোন্‌টা আমার ঘরের পাশের বারাণ্ডা, তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ব্যাকুলভাবে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছি, ইতিমধ্যে—বামদিকের বারাণ্ডার এক কোণে একটা প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে—তাহার প্রতি আমার চক্ষু পড়িল; চক্ষু পড়িবামাত্র আমার মনে হইল যে, আমার ঘরের দ্বারের একপার্শ্বে একটা শ্বেত-প্রস্তরের মূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে যেন আমি দেখিয়াছি। তখন আমি সেই প্রস্তরমূর্ত্তিটির সন্নিধানবর্ত্তী একটি দ্বারে উঁকি দিবামাত্র দেখিতে পাইলাম যে, আমার ঘরের জিনিস্‌-পত্র যেখানকার যাহা, সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্ সাজানো রহিয়াছে। সিঁড়ি আমাকে বারাণ্ডায় পৌঁছাইয়া দিল, বারাণ্ডা আমাকে প্রস্তরমূর্ত্তিতে পৌঁছাইয়া দিল, প্রস্তরমূর্ত্তি আমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। ক আমাকে খ-এ পৌঁছাইয়া দিল, খ আমাকে গ-এ পৌঁছাইয়া দিল, গ আমাকে ঘ-এ পৌঁছাইয়া দিল। এইরূপ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-নিরপেক্ষ উত্তরোত্তর ক্রমই মনের ক্রম। "পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-নিরপেক্ষ" অর্থাৎ

যখন আমি খ-এ পৌঁছিলাম, তখন খ-এর প্রতিযোগে আমার মনে গ যেমনি আবির্ভূত হইল, ক অমনি মন হইতে তিরোভূত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী ক আমার মন হইতে সরিয়া পলাইল, উত্তরবর্ত্তী গ আসিয়া তাহার স্থানে জুড়িয়া বসিল; ইহারই নাম পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-নিরপেক্ষ উত্তরোত্তর ক্রম। বুদ্ধির ক্রম কিন্তু আর-এক-প্রকার; সে ক্রমের নাম দেওয়া যাইতে পারে—যুক্তিপূর্ব্বক 'বিচরণ-পদ্ধতি বা বিচার-পদ্ধতি। বিচার-পদ্ধতি আর কিছু না—অগ্র-পশ্চাতের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া পরপরবর্ত্তী পথে পা-বাড়ানো। পান্থশালার যিনি কর্ত্তা, তাঁহার মনোমধ্যে পান্থশালার কোথায় কোন্ ঘর, কোথায় যাইবার কোন্ পথ, সমস্তই নখ-দর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; কাজেই, তিনি যখন পান্থশালার কার্য্যালয় হইতে ভোজনালয়ে গমন করেন—তখন সমস্ত পান্থশালার সমস্ত-ঘরের-সহিত-সমস্ত-ঘরের কিরূপ যোগাযোগ, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সমস্তের মধ্য হইতে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ বাছিয়া ল'ন, এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া গম্যস্থানে উপনীত হ'ন। পাঠশালার একটি কচি বালককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, গ এর পরে কোন্ অক্ষর, তবে সে তৎক্ষণাৎ বলিবে ঘ; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কবর্গের চতুর্থ বর্ণ কি? তবে সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। এরূপ যে হয়, তাহার কারণ কি? কারণ অতীব সুস্পষ্ট—বালকটির বুদ্ধি এখনো পরিস্ফুট হয় নাই। ক বলিলে তাহার মনে খ আসিয়া পড়ে, খ বলিলে গ আসিয়া পড়ে, গ বলিলে ঘ আসিয়া পড়ে; প্রথমের প্রতিযোগে দ্বিতীয় আসিয়া পড়ে, দ্বিতীয়ের প্রতিযোগে তৃতীয় আসিয়া পড়ে, ইত্যাদি; তা বই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সমস্তের মোট বাঁধিয়া যে একটা বর্গ হয়,—ক-বর্গ হয়; আর, ঘ যে সেই ক-বর্গের চতুর্থ বর্ণ; এরূপ যুক্তিমূলক বিচার একটি কচি-বালকের নিকট হইতে প্রত্যাশা করাই পাগলামি। ক হইতে খ, খ হইতে গ, গ হইতে ঘ, এরূপ করিয়া মন যখন উপস্থিত বিষয় হইতে অনুপস্থিত বিষয়ে প্রধাবিত হয়, তখন উপস্থিত বিষয়ের ভাবের টানে অনুপস্থিত বিষয়ের ভাব মনোমধ্যে আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে; আর, ভাবের পশ্চাতে ভাবের সমাগম যাহা ঐরূপে সংঘটিত হয়, তাহার দার্শনিক নাম ভাবের অনুবন্ধিতা অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে association of ideas। স্বপ্নের মনোরাজ্যে ভাবের অনুবন্ধিতাই সমস্ত প্রাতিভাসিক দৃশ্যের মূল উৎস। জাগ্রৎকালে নির্দ্দিষ্ট পথ অতিবাহন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছিতে হয়; স্বপ্নকালে তাহার কিছুই করিতে হয় না; স্বপ্নের অনুজ্ঞা হইলে যে-সে পথ দিয়া যেখানে-সেখানে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে। হনুমানের নিকট হইতে রামচন্দ্র যে-দিন অশোকবনের সংবাদ শুনিলেন, খুব সম্ভব যে, সে-দিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্নযোগে অশোকবনে সীতার দর্শন লাভ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন; তখন, সমুদ্রে সেতু বাঁধিবার জন্য তাঁহাকে একমুহূর্ত্তও উপায়-

চিন্তা করিয়া কষ্ট পাইতে হয় নাই। এইখানে জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তা এবং স্বপ্নের প্রাতিভাসিক সত্তা, দুয়ের প্রভেদ স্পষ্ট ধরা পড়িতেছে। বাস্তবিক সত্তার রাজ্যে বস্তু-সকলের সংযোগের ব্যবস্থা অতীব সুনির্দ্দিষ্ট; ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাইবার পথ অতীব সুনির্দ্দিষ্ট; পৃথিবী হইতে সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক পদার্থসকলের দূরত্ব অতীব সুনির্দ্দিষ্ট; কার্য্য-কারণের পারম্পর্য্য-শৃঙ্খলা অতীব সুনির্দ্দিষ্ট; সহযোগী বস্তুসকলের পরস্পরের সহিত পরস্পরের বাধাবাধকতা অতীব সুনির্দ্দিষ্ট। পক্ষান্তরে, স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজ্যে দেশকালঘটিত দূরত্ব-নিকটত্বেরও কোনো ঠিকানা নাই—দিক্-বিদিকেরও কোনো ঠিকানা নাই—কার্য্য-কারণের যোগাযোগ্যতারও কোনো ঠিকানা নাই; স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজ্যে সবই সব-স্থানে সম্ভবে—পঙ্গুকর্ত্তৃক গিরিলঙ্ঘন সম্ভবে, মরুভূমিতে উৎসের উৎসারণ সম্ভবে; সব-কার্য্যই সব-কারণে সম্ভবে; জোনাক-পোকার মশালে অরণ্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, ভেক হস্তীকে গিলিয়া খাইতে পারে। অতএব এটা স্থির যে, যে-রাজ্যে দিক্-বিদিকের ঠিকানা আছে, যে-রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেশের ব্যবধান সুনির্দ্দিষ্ট; যে-রাজ্যে প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে কালের ব্যবধান সুনির্দ্দিষ্ট; যে-রাজ্যে কার্য্য-কারণ প্রবাহের পারম্পর্য্য-ব্যবস্থা সুনির্দ্দিষ্ট; যে-রাজ্যে বিভিন্ন বস্তুসকলের পরস্পর বাধাবাধকতা সুনির্দ্দিষ্ট; সেই রাজ্যই বাস্তবিক সত্তার রাজ্য; আর, সেই বাস্তবিক সত্তার রাজ্যই বুদ্ধির বিচরণ-ভূমি। বিচরণ-ভূমি এবং বিচার-ভূমি—এই দুই শব্দের একই অর্থ। ঐ যে বাস্তবিক সত্তা—যাহা বুদ্ধির বিচার-ভূমি—তাহা একই অদ্বিতীয় সত্যের বিশ্ব-ব্যাপী বন্ধন-সূত্র। দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে, যেখানে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তই ঐ একই বন্ধন-সূত্রের টানে পরস্পরের সহিত যোগে বিধৃত রহিয়াছে। পান্থশালার গৃহ-স্বামীর মনোমধ্যে যেমন—পান্থশালার কোথায় কোন্ ঘর, কোথায় কোন্ পথ, কোথায় কোন্ কার্য্যশালা, সমস্তই নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; এক অদ্বিতীয় সত্যে সেইরূপ সমস্ত বস্তুর সংযোগ-ব্যবস্থা নখ-দর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; সে সংযোগ-ব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি সুনির্দ্দিষ্ট এবং পরিপাটী; তাহা নিয়তির বন্ধন; তাহার, একচুলও এদিক্-ওদিক্ হইবার নহে। শাস্ত্রে যে বলে—"বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি", তাহার অর্থই ঐ। নিশ্চয়াত্মিকা-শব্দের অর্থই হ'চ্চে—বাস্তবিক-সত্তা-মূলক সংযোগ-ব্যবস্থার নিশ্চয়ীকরণ যাহার মুখ্যতম কার্য্য। বুদ্ধি যখন নিশ্চয় করে যে, ইহা মৃত্তিকা, ইহা জল, ইহা বায়ু ইত্যাদি, তখন প্রত্যেক নিশ্চয়-ক্রিয়ার সঙ্গে এই একটি মৌলিক নিশ্চয়-ক্রিয়া জোড়া-লাগানো থাকে যে, ইহা বাস্তবিক পদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, সত্য-নিশ্চয়ই গোড়া'র নিশ্চয়, পরম নিশ্চয়, এবং চরম নিশ্চয়। পুনশ্চ, শাস্ত্রে বলে যে, মন সংকল্প-বিকল্পাত্মক। সংকল্প-বিকল্প কি? না, কল্পনা-বিকল্পনা। ভাবনা-বিভাবনাও তাহারই নামান্তর। বর্ত্তমান প্রবন্ধের গোড়া'তেই বলিয়াছি যে, ভাবন-শব্দ ভূ-ধাতু হইতে

হইয়াছে—তাহার অর্থ হওয়ানো। মনোমধ্যে ধ্যেয় বস্তু হওয়ানো, মনোমধ্যে ধ্যেয় বস্তু গড়িয়া তোলা, মনোমধ্যে ধ্যেয় বস্তু কল্পনা করা, একই কথা। সংকল্প-বিকল্প আর কিছু না—মনোমধ্যে ভাবের তরঙ্গ-ভঙ্গ। বুদ্ধির সত্য-নির্ণয় বাস্তবিক-সত্তা-মূলক-সংযোগ-প্রধান; মনের সংকল্প-বিকল্প কবিতাচ্ছন্দের লঘু-গুরু মাত্রার ন্যায় প্রতি-যোগ-প্রধান; আর সেই প্রতিযোগের মূল প্রবর্ত্তক হ'চ্চে—ভাবের অনুবন্ধিতা (association of ideas)। স্বপ্নে এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র নহে যে, এই আমি উদ্যানে বসিয়া পক্ষীর কলরব শুনিতেছি, পরক্ষণেই উদ্যান অরণ্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিল এবং তাহার মধ্য হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন-ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। উদ্যান ভাঙিয়া গেল, অরণ্য গঠিত হইয়া উঠিল। এইরূপ ভাঙন-গড়নই সংকল্প-বিকল্প এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতিযোগী।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির মধ্যে প্রভেদ খুবই স্পষ্ট। প্রাণের সহিত মনোবুদ্ধির প্রভেদ এই যে, প্রাণ অব্যক্ত সত্তায় ব্যাপৃত হয়—প্রাণের ব্যাপার-ক্ষেত্র অব্যক্ত সত্তা। মন এবং বুদ্ধি উভয়েরই ব্যাপার-ক্ষেত্র ব্যক্ত সত্তা। ব্যক্ত সত্তা আবার দুই থাকে বিভক্ত—(১) প্রাতি-ভাসিক সত্তা এবং (২) বাস্তবিক সত্তা। মনের ব্যাপার-ক্ষেত্র প্রাতিভাসিক সত্তা; বুদ্ধির ব্যাপার-ক্ষেত্র বাস্তবিক সত্তা। যাহা বাস্তবিক, তাহা আদ্যোপান্ত সবটা ধরিয়া বাস্তবিক। একটা কাগজ তাহার এ-পিট ও-পিট এবং চারিধার, সবটা ধরিয়া বাস্তবিক-কাগজ। পক্ষান্তরে, ও-পিটের সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত এ-পিট, এবং দু-পিটের সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত চারিধার, দুইই অবাস্তবিক। "বুদ্ধিতে বাস্তবিক সত্তা প্রকাশ পায়", এ কথার অর্থ এই যে, বুদ্ধিতে আলোচ্য-বিষয়ের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সবটা একযোগে প্রকাশ পায়, আর সেই সঙ্গে কেন্দ্র, পরিধি এবং অরাবলী (radii) প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সংযোগের ব্যবস্থা, তাহাও প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, মন যখন এ-পিটে ব্যাপৃত হয়, তখন ও-পিটের কোনো তোয়াক্কা রাখে না। মন যখন যে-পিটে ব্যাপৃত হয়, তখন সেই পিটের প্রাতিভাসিক সত্তাই তাহার নিকটে ব্যক্ত হয়। মন প্রাতিভাসিক সত্তা লইয়া—ঐকাংশিক সত্তা লইয়া—এক-পিট লইয়া কারবার করে। এইজন্য মন এ-পিট হইতে ও-পিটে, ও-পিট হইতে চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়, ক হইতে খ-এ, খ হইতে গ-এ ঘুরিয়া বেড়ায়। মন সর্ব্বদাই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়; বিক্ষিপ্ত হইবারই কথা—কেন না, কোনো আংশিক সত্তাই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে। মন এলোমেলো ভাবনার তরঙ্গে এরূপ অষ্টপ্রহর তরঙ্গিত হয় যে, একদণ্ডও তাহাকে দেখিলাম না যে, সে নিজ নিকেতনে ভর-পুর জমাট্ বাঁধিয়া বসিয়া আছে। জমাট্ ভাব, সমাহিত ভাব, বা সমাধি, পরিপক্ব বুদ্ধির লক্ষণ—প্রজ্ঞার লক্ষণ। এক অদ্বিতীয় বাস্তবিক সত্যের বাহিরে

দ্বিতীয় কিছুই নাই; কাজেই, প্রজ্ঞা যখন কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সবটা ধরিয়া সমগ্র বাস্তবিক সত্যে ব্যাপৃত হয়; তখন সে-সত্য হইতে সে যে পদস্খলিত হইয়া তাহার বাহিরে পড়িয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা থাকে না; কেন না, যাহার বাহিরই নাই, তাহার বাহিরে পড়িবে কিরূপে? মন আংশিক সত্য লইয়া কারবার করে, এইজন্যই ভাবের অনুবন্ধিতা (association of ideas) তাহাকে নাকে দড়ি দিয়া ক হইতে খ-এ, খ হইতে গ-এ, গ হইতে ঘ-এ ক্রমাগতই ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়।

এই তো গেল, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, এই তিনের মধ্যেকার প্রভেদ। তিনের মধ্যে একাত্মভাব কিরূপ, তাহা বারান্তরে আলোচনার জন্য রহিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুন্দর।

—o—

ও গো সুন্দর!　　আসিবে যখন
　　বসন্ত কুতূহলে
বকুল-বাসিত　　নব পীতবাস
　　লুটায়ে ধরণীতলে।
মলিন-বিকল　　বধূর চরণে
　　নূপুর উঠিবে বাজি,
শাখায় শাখায়　　শিহরি উঠিবে
　　রক্ত অশোকরাজি।
তুমি এস' নামি'　　নির্ম্মল নীল
　　উজ্জ্বল দেশ'হ'তে,
আমারে লইয়ো　　আমারে লইয়ো
　　তুলিয়া তোমার রথে।

ও গো সুন্দর!　　আসিবে যখন
　　বরষা এলায়ে কেশ।
সজল আঁধারে　　দিন হবে লীন
　　উদাস নিরুদ্দেশ।

ঘন-নির্ঘোষে বিরহশয়নে
গোপনে কামিনী যবে,
দীর্ঘ যামিনী জাগিয়া জাগিয়া
কাঁদিয়া ক্লান্ত হবে,—
ওগো সুন্দর! নামিয়ো তখন
উজ্জ্বল দেশ হ'তে,—
আমারে লইয়ো আমারে লইয়ো
তুলিয়া তোমার রথে।

ওগো সুন্দর! শারদ-রজনী
শুচি শশিরুচি বেশে,
আপনার রূপে স্মিত-বিস্মিত
দাঁড়াবে আকাশে এসে।
তরুর তলায় ঝরিবে হেলায়
শেফালি-পুষ্প-রাশি,
জগদম্বিকা নর-নারী-মুখে
ফুটাবে মধুর হাসি,—
ওগো সুন্দর! নামিয়ো তখন
উজ্জ্বল দেশ হ'তে,
আমার অশ্রু মুছায়ে আমারে
লইয়ো তোমার রথে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কালিকানন্দ।

কালিকানন্দ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ-অঞ্চলে বাস করেন। নিষ্ঠাবান্ শাক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁর খ্যাতি; দুর্গোৎসব এবং কালীপূজা বিশেষ সমারোহে তিনি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সকলেই জানেন, বঙ্গীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ কোনকালে চৈতন্যধর্ম্মের পক্ষপাতী নহে। এখনও এই মধুর ভাবের নবীভূত অনুরাগোচ্ছ্বাসের দিনে পাশ্চাত্য-শিক্ষাগৌরব বিস্মৃত হইয়া বঙ্গীয় ভক্তগণ যখন শচীনন্দনের জন্মভূমি-দর্শনকামনায় ছুটিয়া চলিয়াছেন, নবদ্বীপ-বাসী কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসলীলার মহোৎ-সব শান্তিপুরে বিদায় দিয়া নিজেরা তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যামূর্ত্তির আরাধনায় বিভোর হইয়া আছে। শান্তিপুরের রাসরসিক কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের "পট-পূর্ণিমায়" আদৌ আমল পান না। অতএব নিমাই-পণ্ডিত নিজগ্রামে চিরদিন "গেঁয়ো যোগী" রহিয়া গেলেন। সেখানকার শিষ্টসমাজে অন্তত তাঁহার অবতারত্ব স্বীকৃত নহে। সে কথা শুনিলে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠে, এখনও এমন লোকের অসদ্ভাব নাই।

কালিকানন্দ ভট্টাচার্য্য তাহারই এক-জন—গোঁড়া শাক্ত যারে বলে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের প্রতি বিদ্বেষটুকু কখন রাখিয়া-ঢাকিয়া প্রকাশ করিতে জানেন না। বৈষ্ণব-বাবাজীরা কণ্ঠী পরিয়া শিখা রাখিয়া ঝুলির সহায়তায় হরিনাম করে, অথচ কাছা দেয় না, তাঁহার চক্ষে এমন হাস্যকর ব্যাপার এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই। তথাপি রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া রক্তচন্দনচর্চ্চিত দেহে কালীনামাঙ্কিত নামাবলী গায়ে নিজে তিনি "জগদম্বা" এবং "দুর্গা দুর্গতিহারিণী"কে ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে যখন ডাকেন, প্রেমাশ্রুতে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যায়।

বৈষ্ণববিদ্বেষ ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের অস্থি-মজ্জাগত হইলেও তাঁহার নিজকুটুম্বেরা সকলেই প্রায় বৈষ্ণববংশীয় এবং কাটোয়া-অঞ্চল-বাসী। একমাত্র পুত্র সর্ব্বানন্দকেও বৈষ্ণববংশে বিবাহ দিতে হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার হাত ছিল না। সর্ব্বানন্দের যখন ছয়বৎসরমাত্র বয়স, পিতামহ পুরা-তন-কুটুম্ব-গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং তিনমাসের একটি টুক্‌টুকে মেয়েকে প্রাঙ্গণে বিস্তৃত ক্ষুদ্রশয্যায় সূর্য্যকিরণে খেলিতে দেখিয়া তাহাকেই "নাত-বউ" করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া আসেন। কাজেই স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় বার-বছরের পৌত্রকে

ছয়-বৎসরের গৌরীতে পরিণীত করিয়া সুখে গঙ্গালাভ করিতে চাহিলে, পিতৃভক্ত কালিকানন্দ তাহাতে বাধা দিতে পারেন নাই।

সেই বিবাহের পর দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বানন্দ ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে পাস্ করিয়া বেহারে সরকারী ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার পত্নী যোগমায়া, বছর-দুই হইল, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া প্রবাস-গৃহে একটি পুত্র-রত্ন তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষে দ্বিরাগমনের পর একবারমাত্র বধূমাতা শ্বশুরের ঘর করিয়াছিলেন, তাহাও মাস-ছয়েকের জন্য। অতএব সর্ব্বানন্দ শ্বশুর-শাশুড়ীর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার সুযোগ পাইয়া সেই সঙ্গে বধূকে কর্ম্মস্থানে আনাইয়া লওয়ায় সস্ত্রীক কালিকানন্দ বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—বউ ঘর করিল না বলিয়া নবদ্বীপের প্রতিবেশিনীমণ্ডলে দিনকতক খুব হাসি-টিট্‌কারি এবং নিন্দা-কুৎসার ধুম পড়িয়া গেল। তাঁহাদের মতে শ্বশুরের বাস্তভিটা-টুকুই গৃহনামের যোগ্য এবং বধূ সেইখানে থাকিয়া ঘর-সংসার করিলেই হইল "ঘর-করা"। স্বামীর সঙ্গে প্রবাসে বাস, সেটা বোধ করি "বন-করা"—কেন না, জনকনন্দিনী যে কয় বছর বাহিরে-বাহিরে ছিলেন, তাহার নাম বনবাস!

বেহাই এবং বেহান যে তীর্থযাত্রার পথে—বিশেষত বৈষ্ণবদের চরমতীর্থ শ্রীবৃন্দাবনের পথে বধূমাতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে কালে ছেলের উপর রাগ পড়িলেও কালিকানন্দ তাঁহাদের তিনজনের উপর হাড়ে চটিয়া রহিলেন। বছর দেড় পরে পুত্রের এক বন্ধুর পত্রাভাসে পুত্রবধূর সম্ভাবিত সন্তানাবস্থা জানিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "তোমার-আমার সেখানে যাওয়া হ'তে পারে না। সেই নেড়ানেড়ীর দল বৃন্দাবন থেকে এসে যা হয় করুক!" কিন্তু মার মন ইহাতে বুঝিবে কেন? সবুর মা ওরফে সর্ব্বানন্দের গর্ভধারিণী অনেক সাধ্য-সাধনায় একাই বেহারে যাইবার অনুমতি পাইলেন।—সঙ্গে গেল বামা চাকরাণী—সে ইতিপূর্ব্বে আর কখন গ্রামের বাহির হয় নাই। গুণের মধ্যে প্রধান গুণ গ্রাম্য বক্তৃতামঞ্চে—যথা, মেয়েদের স্নানের ঘাটে—এবং পাড়ায় কোঁদল বাধিলে তাহার জোড়া নাই। গ্রামের সুরসিক কাব্যচঞ্চু-মহাশয় একদিন সেই বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"বামাসুন্দরি, নামটি তোমার যাহা, তাহাতে অমন রুদ্ররস ত শোভা পায় না! বামা কিনা অবলা!" শুনিয়া বামা-কৈবর্ত্তানী ওরফে বামাসুন্দরী দাসী মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু অসুর-সাম্রাজ্ঞীর মতনই ভ্রুভঙ্গী করিয়া তাঁহাকে যাহা শুনাইয়া দিয়াছিল, অন্বয় করিয়া বুঝিলে তাহার মানে দাঁড়ায়—"বামা আমি না তুমি?"

কালিকানন্দ বামার কদর বুঝিতেন। এই বামাদাসী এবং পুত্রের প্রেরিত বাঙালী কম্পাউণ্ডার সঙ্গে তিনি গৃহিণীকে বেহারে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার মাস-দুই পরে সবুর মা পৌত্রমুখ সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার আহ্লাদ রাখিবার ঠাঁই রহিল না। বহুজীর প্রসববেদনা আরম্ভ হইতে না হইতে হিন্দুস্থানী দাইয়েরা

"সোহর" গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহার ভিতর বৃন্দাবন, নন্দরাণী ও নন্দ-লালা ছাড়া আর কোন কথা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বড় হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। মহা ব্যস্ততা ও উদ্বেগের মধ্যে মাঝে-মাঝে কর্ত্তাটিকে মনে পড়িতেছিল এবং এই সময়ে বৃন্দাবনের গান শুনিলে তিনি কেমন গালে-মুখে চড়াইতেন, সে দৃশ্যও তদীয় মানসচক্ষুকে এড়াইতে পারিতেছিল না। বামাসুন্দরী দাইদের পুরুষোচিত ধরণে বস্ত্রপরিধান দেখিয়া প্রথম-প্রথম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং দুইচারিদিনের ভিতর তাহাদের নামকরণ করিয়াছিল—"মেয়ে মরদী।" তাহাদের কাঁইমাই গান শুনিয়া আজ তাহার ভারি হাসি পাইতেছিল, কিন্তু বউমার মুখ চাহিয়া সে তাহা সংবরণ করিল। খোকা ভূমিষ্ঠ হইলে সেই সংবৃত হাস্যলহরীর উৎস সে খুলিয়া দিল, এবং কর্ত্তামার নূতন একটি বর জুটিল বলিয়া শতবার তাঁহাকে অভিনন্দন করিল।

সর্ব্বানন্দকে ডাকিয়া মা বলিলেন—"সবু, তাঁকে এখুনি চিঠি লেখ বাবা! আমার জবানি লেখ যে, এ আমার টাকার সুদ,—বড় মিষ্টি! তিনি যেন শীগ্‌গির একবার আসেন।" সবু লজ্জিত হইয়া কহিল, "আর কাউকে দিয়ে লেখাও মা, আমি পারবো না।" পুত্রের সে লজ্জানম্র মুখ দেখিয়া মাতার চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূরিয়া উঠিল।

কিন্তু কর্ত্তা ত আসিলেন না। গৃহিণীর চিঠিতে বারংবার বেহারে আসার নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার উপর পর্য্যন্ত চটিয়া গেলেন। এদিকে সর্ব্বানন্দ-নন্দন বামাদাসীর বিবিধ প্রকারের মুখভঙ্গী এবং সোহাগে-আদরে হাসিয়া হাসিয়া পিতামহীর ক্রোড়ে শশিকলার মত বাড়িতে বাড়িতে ছয় মাসের হইল। তখন সর্ব্বানন্দ মাতার অনুরোধে ছুটীর দরখাস্ত করিল, দেশে গিয়া ছেলের অন্নপ্রাশন হইবে। গৃহযাত্রার সকল বন্দোবস্ত ঠিক্ হইয়াছে, এমন সময়ে খবর আসিল, ছুটী মঞ্জুর হয় নাই। ইহাতে গোসার মুখে সর্ব্বানন্দ চাকরী ছাড়িয়া দেশে গিয়া ডাক্তারি করিয়া খাইবে, অনুপস্থিত সরকার-বাহাদুরকে দুইচারিবার এরূপ শাসাইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে আবার ছুটী চাহিলেই পাইবে ভরসা করিয়া দুই-চারিদিনে জল হইয়া গেল। খোকা প্রবাসে ভাত খাওয়ায় ঠাকুরমা আদর করিয়া নাম দিলেন—"ছাতুখোর!" বামা নাম রাখিল, "মেড়ুয়াবাদী।"

পৌত্রের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে সমারোহ করিবার অভিপ্রায়ে কালিকানন্দ যে-কিছু উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সর্ব্বানন্দের বিদায়-বিভ্রাটে তাহার সকলই পণ্ড হইয়া গেল। ইহাতে তিনি বড় দুঃখিত হইলেন, কিন্তু ভ্রমেও সন্দেহ করিলেন না যে, ছুটীর এই গোলযোগ পুত্র এবং পুত্রবধূর ইচ্ছাকৃত,—একটা বাহানামাত্র। ইহাতে কিন্তু প্রতিবেশী বিশেষত প্রতিবেশিনীদের মন উঠিল না। যোগমায়া এই উপলক্ষে আর একবার তাঁহাদের সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষায় পড়িলেন। জ্ঞাতিকন্যা হাবুর মা কিছু উৎসাহিত হইয়া কালিকানন্দের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। বলিলেন—"আর শুনেচো দাদা, গাঁয়ে ঢিঢি হ'য়ে গেল যে!"

কালিকানন্দ কিছু মিতভাষী, বিস্ময় বা অদ্ভুত রসের ধার বড় ধারেন না। স্মিত-মুখে ধীরে উত্তর দিলেন—"কি ভগিনি ?"

ইহাতে হাবুর মা ওরফে দিগম্বরী ঠাকুরাণীর করুণরস উছলিয়া উঠিল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কিছু বেগের সহিত তিনি বলিলেন, "আহা দাদা, তোমার দুঃখু দেখে আমার বড় দুঃখু হয়; ছেলে-বউ তারা ত গেরাহ্যিই করে না, বউও কিনা পর হ'য়ে গেল!" এটা ঠিক করুণরস কি হাস্যরস, বুঝিয়া উঠিতে ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের একটু দেরি হইল। সহজেই তাঁহার মনে পড়িল, বিধবা ভাগিনেয়ীটি পীড়িত হইলে স্বহস্তে তাঁহাকে পাক করিয়া খাইতে হইয়াছিল, জ্ঞাতি-ভাই-ভগিনীরা তখন ডাকিয়া সুধান নাই। অতএব কিছু কৌতূহলী হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপারখানা কি? উত্তরে শুনিলেন যে, পূজা সম্মুখে, বলিদান দেখার ভয়ে সবুর বউ নাকি ছল করিয়া বাড়ী আসিল না। ইহার পর কথাটা নানা-সূত্রে অনেকবার তাঁহার কর্ণগোচর হইল। নেড়ানেড়ীর বংশে সকলই সম্ভব, ধ্রুব জানিয়া কালিকানন্দ পুত্রকে চিঠি লিখিলেন যে, "শ্যামাপূজার পর আমি সস্ত্রীক তীর্থ-দর্শনে বাহির হইব স্থির করিয়াছি, যত সত্বর হইতে পারে, তোমার গর্ভধারিণীকে বাড়ী পাঠাইবে। বধূমাতাদের এখন পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।"

নিতান্ত অনিচ্ছায় পৌত্রকে সহস্রবার চুম্বন করিয়া সাশ্রুনয়নে কর্ত্রী ঠাকুরাণী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। দেশের কলাই-দাল এবং বড়ির টক মনে পড়ায় বামা-দাসীরও আর মন টিকিল না। তবে যোগমায়ার মত লক্ষ্মী বউটিকে, বিশেষত খোকাবাবুকে ছাড়িয়া যাইতে তাহারও প্রথম-প্রথম মন-কেমন করিয়াছিল।

গৃহিণীর মুখে পুত্রবধূর অতিরিক্ত প্রশংসা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বুঝিতে পারিলেন যে, নেড়ানেড়ীর পুত্রকন্যারা তবে যাদুকরী বিদ্যাও জানে! কিন্তু নথনাড়ার ভয়ে মনের সন্দেহ স্পষ্টীকৃত করিতে পারিতেন না। নাতি দেখিতে ঠিক্ তাঁহারই মত হইয়াছে শুনিয়া ভারি খুসী হইলেন; স্থির করিলেন, মাতামহগৃহে কখন তাহাকে যাইতে দিবেন না।

বামাসুন্দরী প্রায় দশমাস বেহার-অঞ্চলে বাস করিয়া অভ্যস্ত গালিগুলির পুঁজি বাড়াইয়া আনিয়াছিল, সে যেন কতকটা অস্ত্রে শাণ দেওয়ার মত। পাড়ার শতেক-খুয়ারীরা নিরীহ বউমার নিন্দা রটাইয়াছে শুনিয়া, "দুরন্ত জবানে" উদ্দেশে সে হিন্দী "গারি"গুলির যেরূপ সংস্কার ও সদ্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার পরিচয়ে আর কাজ নাই।

এই সকল ঘটনার প্রায় দেড়বৎসর পরে সর্ব্বানন্দ ছুটী লইয়া বাটী আসিল। তখন পূজা আগতপ্রায়, শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্র বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে এবং হিল্লোলিত ধান্যক্ষেত্রে প্রতিভাত হইতেছিল। পরিপূর্ণা ভাগীরথীর অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ঘাটে সর্ব্বানন্দের নৌকা আসিয়া লাগিয়াছে। তখন বেলা প্রায় দেড়প্রহর। স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া, খড়ম পায়ে, নামাবলী গায়, স্বয়ং কালিকানন্দ সেখানে বিচরণ করিতেছিলেন।

রক্তচন্দনচর্চ্চিত ললাটতল কুঞ্চিত করিয়া যে ভাবে তখন তিনি সুদীর্ঘ এবং সুপক্ক গুম্ফাগ্রভাগ দক্ষিণকরে লাঞ্ছিত করিতে-ছিলেন, তাহাতে সেই পুরাকালের ভীমমূর্ত্তি কাপালিকের সাদৃশ্য কতকটা অনুভূত হইতেছিল। দেখিয়া সরলা যোগমায়া অপরাধিনীর মত ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। সর্ব্বানন্দ সসম্ভ্রমে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পিতৃপদ বন্দনা করিল।

খোকাবাবু হাঁটিতে শিখিয়াছেন এবং কথাবার্ত্তাও বিস্তর বলেন, কিন্তু তার পনর-আনা তিন-পাই হিন্দী। বামাদাসীর কোলে চড়িয়া পিতামহের সমীপবর্ত্তী হইয়াই বলিলেন—"সেলাম মহারাজ!" তিনি ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহুপ্রসারণ করিলে, তাঁহার দীর্ঘ গুম্ফ দুই কচি-কচি হাতে অধিকৃত করিয়া সুধাইল—"তুম্ কোন্ হ্যায় হো!"

চব্বিশঘণ্টার ভিতর এই ছাতুখোর শিশুটি ঠাকুরদাদার সঙ্গে দিব্য সখ্যসংস্থাপন করিল। পিতামহদত্ত অভয়ানন্দ-নাম অব্যব-হারে পোষাকী কাপড়ের মত এতদিন তোলা ছিল, অতএব প্রথম-প্রথম তাহাতে অভিহিত হইলে খোকা রাগিয়া বলিত—"হাম্‌কো গারি দেতা হ্যায়?" মার কাছে ছুটিয়া গিয়া দুই-চারিবার নালিশও সেজন্য করিয়াছিল। কালিকানন্দ পৌত্রের সর্ব্বকার্য্যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন, মুগ্ধের ন্যায় অহোরাত্র তাহার অনুসরণ করেন। পূজা-আহ্নিকের সময় অভয়ার চরণকমল ভাবিতে ভাবিতে অভয়ানন্দকে তাঁর মনে পড়িয়া যায়। তার পর পূজাশেষে তাহার বিমল ললাটতলে ফোঁটা কাটিয়া দিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরেন। এবং গদ্গদ-কণ্ঠে ডাকেন—"দুর্গে দুর্গে, একি মায়ায় ফেলিলে!"

যোগমায়া কৈশোরে শ্বশুরকে দেখিয়া-ছিল, বৈষ্ণবদ্বেষী গোঁড়াশাক্ত বলিয়া পিতৃ-গৃহে তাঁহার যে নাম ছিল, তাহাতেই সে বরাবর বড় ভয় পাইত। কিন্তু ছেলে অভয়ানন্দ তাহার সে ভয় ভাঙাইয়া দিল। ঠাকুরদাদার ক্রোড়ে অন্যমনস্কভাবে খেলিতে খেলিতে যখন-তখন বলিয়া উঠিত "মা যাব" এবং এইরূপে দিনে দশ-বার-বার সে তাঁহাকে মাতার সান্নিধ্যে লইয়া যাইত। শেষে কালিকানন্দ ঝগড়া করিতেন—"তোর মা না আমার মা!" তখন সেই বৃদ্ধ ভাইতে ও শিশু ভাইতে মা লইয়া ঝুটোপুটি বাধিয়া যাইত।

বাস্তবিক কালিকানন্দ দেখিলেন গৃহি-ণীর কথা সত্য, লক্ষ্মী বউটি তাঁর। গৃহ-কর্ম্মে তার বিরাম-বিশ্রাম নাই, অথচ মুখে কথাটি নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় তাহার যেমন আনন্দ, তেমনই তন্ময়তা, বিরূপ প্রতিবেশিনীরা পর্য্যন্ত তাহার আচ-রণের সমালোচনায় সুর বদলাইতে বাধ্য হইয়াছে। স্নেহে শ্বশুর বলিলেন—"বউমা, আমার ত মেয়ে নাই, তোমায় পেয়ে সে অভাব আমার দূর হয়েচে। আমার সঙ্গে কথা কহিয়ো মা, লজ্জা করিলে চলিবে না।" ছেলে পিতামহের অনুকরণ করিয়া আধ-আধ স্বরে বলিত—"কথা কও মা, কথা কও।" শাশুড়ী শুনিয়া শুনিয়া হাসি-তেন, আর বলিতেন—"সত্যিই ত বউমা,

আমাদের আর কে আছে ?" কিন্তু যোগমায়া শ্বশুরের কাছে মুখ ফুটিতে পারিত না, তবে ক্রমে দীর্ঘ ঘোমটাকে সংযত করিয়া আনিল বটে।

শ্বশুর পুত্রবধূর মধুর প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবীর বেটীটি যে শাক্তদ্বেষিণী, এ সন্দেহ কিছুতে তাঁর দূর হয় না। যখন-তখন গৃহিণীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলেন—"বৈষ্ণবীর বেটী আজ পর্য্যন্ত বাড়ীর পূজো কখন দেখেন নি, এবার সে দুঃখ আমার ঘুচ্‌বে।" সবুর মা অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর করেন—"কিন্তু বউমা আমার বড় মায়াবী আর ভীতু, বলিদান দেখ্‌তে পারবে না !" ইহাতে কালিকানন্দ উষ্ণ হইয়া উঠেন।—"তোমার যেমন কথা, শাক্ত-ঘরের বউ, বলিদান না দেখ্‌লে শুদ্ধ হয় না।"

নবমীপূজার দিন মধ্যাহ্নে ভটাচার্য্য-গৃহে বড় ধুম—ঢাক-ঢোলের বাদ্যে কান পাতা যায় না। বলিদান সুরু হইতে আর বড় দেরি নাই, মহিষশাবকটা স্নাত হইয়া যূপকাষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে, অন্যূন ২৫।৩০টা ছাগ আর্দ্রদেহে কাঁপিতেছে, তাহাদের গলায় দড়িধারীরা কোমরে গামছা জড়াইয়া উৎফুল্লমুখে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছে। কর্ম্মকার তীক্ষ্ন অসি উদ্যত করিয়া দুর্গা-নাম জপিতেছিল, মহিষ এবং ছাগের দল দুর্গা দুর্গতিহারিণীকে প্রাণভয়ে ডাকিতে-ছিল কি না, বলিতে পারি না।

কালিকানন্দ পৌত্রকে ক্রোড়ে করিয়া চণ্ডীমণ্ডপসম্মুখে দাঁড়াইলেন। বলিদান সুরু হইয়া গেল। সহসা অন্দরপথে আর্ত্ত-কণ্ঠের করুণ চীৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপতল কম্পিত করিয়া "জয় জগদম্বে" রব তখন আকাশে উঠিতেছিল, সে রোদন এক সর্ব্বানন্দ ছাড়া আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। মাতা ডাকিয়া পাঠাইতে না পাঠাইতে সর্ব্বানন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল—দেখিল, তাহার অনুমান সত্য, পশুশোণিতপাতের সে বিকট দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া যোগমায়া মূর্চ্ছিত হইয়াছে। মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার মুখে-চোখে জল-সেচন করিতেছেন।

বলিদান শেষ হইতে না হইতে খোকাও বড় ভয় পাইয়া গেল। "মা যাব" বলিয়া সে এমন চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, কালিকানন্দ সেখানে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

যোগমায়ার মূর্চ্ছা ভাঙিল বটে, কিন্তু আতঙ্কে তাহার জ্বরবিকার হইল। মাতার অসুখে অভয়ানন্দ রাত্রিদিন কাঁদিতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে শোণিত-স্নাত উদ্যতখড়্গধারী ঘাতকের মূর্ত্তি মনে করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিত। বিকারা-বস্থায় যোগমায়া প্রায় বলিত—"মাগো, এ যে রক্তের নদী, কি ক'রে পার হব !"

লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূর রুগ্নশয্যাপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া কালিকানন্দ মনঃস্থির করি-লেন, ভবিষ্যতে বলিদান উঠাইয়া দিবেন। যোগমায়া ভাগ্যে-ভাগ্যে সারিয়া উঠিল। কালিকানন্দের গৃহে সেই হইতে বলি উঠিয়া গিয়াছে—বলিদান হয় বটে, কিন্তু সে কেবল ইক্ষু, লাউ ও কুমড়ার।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ভারতের অধঃপতন।

ভারতবর্ষের একখানিও সম্পূর্ণ ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। কতদিনে যে হইবে, তাহা বলা যায় না। জাতীয় জীবন বৈজ্ঞানিক-ভাবে দেখা আমাদের প্রকৃতিগত নহে। ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিলেই আমরা পুরাণ গড়িয়া ফেলি। কাজে কাজেই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্যতীত "নাস্তি গতিরন্যথা।" কিন্তু যে দেবতাদিগের উপর আমাদের ষোল-আনা নির্ভর, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় স্বচ্ছ ঐতিহাসিক সত্যগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া এক বিপুল প্রমাদচ্ছবি আঁকিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই বা দোষ কি? য়ুরোপীয় রাজসিক রঙীন লাল চশ্‌মার দ্বারা হিন্দুর সত্বশুভ্র কার্য্যকলাপ ও রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বরূপের পরিবর্ত্তে বৈরূপ্যই প্রতিভাত হইবে। যতগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাস আছে, সকলগুলিই যেন জোড়া-তাড়া-দেওয়া। অনেক অসম্বদ্ধ ঘটনাবলিকে প্রতীচ্যস্বভাবসুলভ কল্পনাডোরে জোর করিয়া কার্য্যকারণভাবে সংযোজিত করা হইয়াছে। যখন আমাদের ইতিবৃত্তের এইরূপ দুরবস্থা, তখন ভারতের অধঃপতনবিবরণী যথাযথ লিখিয়া উঠা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এই প্রবন্ধে দুই-একটা কথার অবতারণা করা যাইবে, যাহা ভবিষ্যতে তথ্যনিরূপণকার্য্যে লাগিতে পারে।

য়ুরোপে ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লবের পর হইতে অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, পূর্ব্বতন মত বা প্রথার বিরুদ্ধে যত সংগ্রাম ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, তাহা সকলই ন্যায্য ও বীরোচিত। 'বিদ্রোহ'শব্দটি তাহাদিগকে একেবারে মাতোয়ারা করে। এই য়ুরোপীয় বিদ্রোহিদল বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ঘোর বিরোধী; ইঁহাদের দৃষ্টিতে বেদবিপ্লাবী বৌদ্ধমত অত্যন্ত উচ্চ; কেন না, ইহা পুরাতনকে ভাঙিয়াছে। ক্রমভঙ্গপ্রবণ য়ুরোপীয় বিবেক বেদবিহিত বর্ণধর্ম্মকে মানবকুলের বৈরী বলিয়া ঘৃণা করে, বেদান্তের নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান ও মায়াবাদকে পরিহাস করে, কিন্তু নাস্তিকবৌদ্ধমার্গকে স্বর্গে তোলে। এই বিদ্রোহবিকৃত দৃষ্টিই আমাদের পুরাতন ইতিহাসে অলীকতার আরোপ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই হিন্দুস্থানের অধঃপতনের মূলকারণ—এই ভ্রমসঙ্কুল সিদ্ধান্তে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ে ভারতের অভ্যুদয়। বৌদ্ধদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারত কি অন্ধকারময় ছিল না এবং তাহাদিগের তিরোভাবে ভারত কি আবার অজ্ঞানতমিস্রায় আচ্ছাদিত হয় নাই? ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য ঠিক বটে, কিন্তু তাহারা কার্য্যকারণশৃঙ্খলায় সম্বদ্ধ নহে।

হিন্দুত্ব দুইভাগে বিভক্ত;—ধর্ম্ম এবং জ্ঞান। ধর্ম্ম ব্যাবহারিক। ইহা বিধিনিষেধ-ব্যবস্থাপক। জ্ঞান পারমার্থিক। ইহা চির-পরিনিষ্ঠিত নিত্যবস্তুর পরিচায়ক। বেদ ও সংহিতা ধর্ম্মের আধার। বেদান্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। ধর্ম্ম জ্ঞানবিরহিত হইলে সমাজ ক্ষীণপ্রাণ ও অধোগামী হয়; বাহ্যাড়ম্বর ভাবকে মারিয়া ফেলে; স্থূল সূক্ষ্মের উপর আধিপত্য করে; জড়প্রকৃতি চিদাত্মাকে পদদলিত করে। দুর্দ্দমকালপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জ্ঞানচ্যুতি ঘটিয়াছিল; যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ উদ্দেশ্যবিহীন হইয়াছিল। জ্ঞানের আদর্শ—কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা—যাহাতে কর্ম্মের বন্ধন ঘুচিয়া যায়। এই মহান্ আদর্শে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় হয়। কিন্তু এই আদর্শভ্রষ্ট হইলে কর্ম্ম-চক্রের পেষণে পিষ্ট হইতে হয় ফলসম্ভোগও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। বুদ্ধের আবি-র্ভাবের অনতিপূর্ব্বে হিন্দুসন্তানেরা পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গের এষণাতে মুগ্ধ হইয়া মোক্ষবিমুখ হইয়াছিল। পরমার্থবিয়োজিত রসবিবর্জ্জিত সকামবেদবাদরতি তাঁহাদিগকে তেজোহীন করিয়াছিল। এই হীনতার কারণ কি? য়ুরোপীয়েরা বলিবেন—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম। যত দোষ নন্দঘোষ। অন্ধকারে ঢিল মারিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। যে আদর্শের কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাহা অনিন্দনীয়। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে প্রবৃত্তির বহ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া অদ্বৈত-শান্তিসাগরে দ্বৈতকে নিঃশেষ করাই সমগ্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যদি লক্ষ্য এত বড়, তবে লোকে ইহা ছাড়ে কেন? অবিদ্যাপ্রসূত কর্ম্মনিয়ন্ত্রিত কালকে জিজ্ঞাসা কর। এই প্রপঞ্চবহুল ভবে স্থিতির ভঙ্গ আছেই আছে। সংসারে থাকিয়া কালকে এড়াইয়া কতদিন থাকা যায়। যত বড়ই সমাজ হউক না কেন, কালবশে তাহা নিস্তেজ অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। আর্য্যসন্তানেরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কালের তরঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হইয়া-ছিল। এই উদ্যমের অবসাদ অবশ্যম্ভাবী।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, হিন্দুরা কর্ম্মবিমুখ বলিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল। হিন্দুরা কর্ম্মবিমুখ নহে, কিন্তু কর্ম্মফলবিমুখ। তাহারা কর্ম্মকে ভালবাসে, কিন্তু কর্ম্মসঞ্চিত ঐশ্বর্য্যকে পরিবর্জ্জন করে। কোন্ দেশে বিশাম্পতি চক্রবর্ত্তী রাজা রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বার্দ্ধক্যে ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করি-তেন? কর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাই জয়লাভ হইত, বিত্ত সঞ্চিত হইত, বিনা সংসারচেষ্টায় ফলভোগের সময় আসিত, অমনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আর্য্যগৃহস্থ বনে প্রয়াণ করিত। এই ত যথার্থ কর্ম্মানুরাগ। কোন ব্রাহ্মণ, বা ক্ষত্রিয় যদি স্বধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পিতৃপিতামহাগত ঐশ্বর্য্যের উপর আপনার সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইত, তাহা হইলে সেই কাপুরুষ লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত হইত। অন্যান্য দেশে সামাজিক প্রতিষ্ঠা কর্ম্মগত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে কর্ম্মের উপরে পদমর্য্যাদা আলম্বিত ছিল। এ কথা সত্য বটে যে, ফলকামনা ত্যাগ করিলে উদ্যমের উষ্ণতা কমিয়া যায়। ঐহি-

তুক প্রেম কিছু শান্ত-দান্ত হয়। অলঙ্কারের জন্য পতিকে ভালবাসিলে প্রেমের আলোড়নটা অধিক হয় বটে, কিন্তু মঙ্গলভাব-প্রণোদিত প্রণয় স্থির ও গম্ভীর হইয়া থাকে। আমাদের কর্ম্মানুরাগ অহৈতুক, তাই আমরা স্থির ও শান্তিপ্রিয়। আর যাহারা ঐশ্বর্য্যের জন্য কর্ম্মকে ভালবাসে, তাহাদের উদ্যমের জ্বালায় উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ক্ষুব্ধ ও প্রপীড়িত। আমরা কর্ম্মকেই ভালবাসি। ভালবাসিয়া তাহাকে গ্রহণ করিব। যে স্থিরতা ও শান্তিতে কর্ম্মবন্ধ টুটিয়া যায়, তাহাই অবলম্বনীয়। ঐশ্বর্য্যবাসনাসম্ভূত দুর্দান্ত প্রতাপ আমাদের কাজ নাই।

উপরি-দর্শিত হিন্দুপ্রকৃতি, প্রতীচ্য সজ্জনেরা বুঝেন না বলিয়াই বেদ-বেদান্তের উপর তাঁহাদের এত রোষ। গভীরভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, নিষ্কামকর্ম্মেই হিন্দুজাতির মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, ঐশ্বর্য্যসঞ্চয়ে নহে। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মসাধন, বিত্তত্যাগপূর্ব্বক কুলগতকর্ম্মরক্ষা, বার্দ্ধক্যে বনগমন, দুর্ব্বল মানবের পক্ষে সহজ নহে। তথাচ আর্য্য-সন্তান ভীত হন নাই;—প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই ফলত্যাগের ফল কি হইয়াছে? বেদান্ত-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানববুদ্ধি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরমসীমা লাভ করিয়াছে। কিন্তু কাল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। ধীরে ধীরে অসীম চেষ্টার ভিতরে অবসাদ আনিয়াছিল। অবসন্নতা-গ্রস্ত হিন্দুসন্তান উচ্চ জ্ঞানের পথে আর চলিতে পারেন নাই। অবশেষে কালের জয় হইয়াছিল।

বেদান্তের নিষ্কামধর্ম্ম ও নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহার অন্য এক কারণ আছে। কালক্রমে আর্য্যে ও অনার্য্যে, দ্বিজে (আর্য্য) ও শূদ্রে সংমিশ্রণ হইয়া বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইয়াছিল; আর্য্যরক্ত দূষিত হইয়াছিল। বর্ণধর্ম্ম ভিন্নকে অভিন্ন করে। প্রথমে দুইএর মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়া দেয়; পরে তাহারা যেমন সম্মেলনের অনুকূল অবস্থা লাভ করে, অমনি ব্যবধানটি তুলিয়া দেয়। প্রথমে দ্বিজে ও শূদ্রে কঠোর প্রভেদ ছিল। ক্রমশ তাহারা মিলিয়া গেল। কিন্তু এই মিলনে ভালও হইল, মন্দও হইল। বর্ণসঙ্করগুলি নিষ্কামধর্ম্মের মর্ম্ম তত বুঝিতে পারিল না। আর্য্যসমাজ নিবৃত্তির অনুশাসনে শাসিত ছিল। এই অনুশাসন অভ্যাগতদিগের একটা বোঝা বলিয়া মনে হইত। তাহারা মিশিয়াছিল বটে, কিন্তু আর্য্যনীতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই আগন্তুক অজ্ঞ নিবৃত্তিবিরোধী সঙ্করজাতিসকল আর্য্য-সমাজের বক্ষে একটা গুরুভারের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছিল। তাই উন্নতির পথ শীঘ্র শীঘ্র রুদ্ধ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উদারতাই আর্য্যজাতির পতনের কারণ। অনুদার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জন্য হিন্দুজাতি হীন হইয়া গিয়াছে—এইরূপ নিন্দা কাল্পনিক। আর্য্যেরা যেরূপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা আছে কি না, সন্দেহ। এমন শাদায়-কালোয় মিলন আর কোথাও এ-পর্য্যন্ত হয় নাই।

যখন হিন্দুজাতি সংসারসংগ্রামে অবসন্ন হইয়াছিল,—বিষমসম্মেলনে ক্ষীণচেষ্ট হইয়া-

ছিল,—লক্ষ্যবিহীন হইয়া কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, তখন বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন। তিনি কর্ম্মচক্র হইতে সংসারকে রক্ষা করিবার সংবাদ ঘোষণা করিলেন। ভেদবাদী বৈদিকধর্ম্মের পরিবর্ত্তে মৈত্রী সংস্থাপন করিতে, ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর দূর করিয়া মনুষ্যজাতিকে যথার্থধর্ম্মভাবাপন্ন করিতে, কল্পনাপ্রসূত বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানের স্থানে ব্যক্তিগতসাধনসম্ভূত নির্ব্বাণশান্তি দান করিতে, বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই সংবাদ গুরুভারগ্রস্ত আর্য্যজাতির অতি মিষ্ট লাগিয়াছিল। জ্ঞানবিহীন কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদিগের প্রতিবাদ যে ন্যায়সঙ্গত, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহারা প্রাচীর ভাঙিতে গিয়া অন্তঃপুর ভাঙিয়া ফেলিল। ভেদভাব দূর করিতে গিয়া হিন্দুর সারধন আস্তিক্যবুদ্ধি ও বর্ণধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিল। তজ্জন্য শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে "বৈনাশিক" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈনাশিকবৌদ্ধবিদ্রোহ অবসাদের শীতলতাকে উষ্ণ করিয়া তুলিল। বিশেষত নিম্নস্তরস্থ সঙ্করজাতিরা মৈত্রীতত্ত্বসংবাদটি উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিল। তাহাদের শূদ্রত্ব গিয়াছিল বটে, কিন্তু যথার্থ আর্য্যত্ব লাভ হয় নাই। তজ্জন্য আর্য্যসংহিতাবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে তাহাদের আগ্রহাতিশয্য হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বিশুদ্ধবর্ণ আর্য্যেরাও অনেক পরিমাণে বিচলিত হইলেন। অবসাদের আবল্যে প্রপীড়িত হইলে পুরাতনের উপর কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মে, কোন একটা নূতন পন্থার জন্য প্রাণটা কেমন করে। তাই তেজোহীন আর্য্যরাও বৌদ্ধমত সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের আর একটা বিশেষ কারণ আছে। বৌদ্ধদিগের বৈনাশিকতা ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিল। বুদ্ধ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া উপাসিত হইতে লাগিলেন। শ্রমণেরা আচার্য্য হইয়া বসিলেন। সংহিতার পরিবর্ত্তে ধম্মপদ প্রতিষ্ঠিত হইল। শঙ্খঘণ্টাধূপদীপসমন্বিত গৈরিকবাসাবৃত শূন্যবাদ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিল। হিন্দুরা ধর্ম্মপ্রাণ। ধর্ম্মের আকার দেখিয়া ভুলিয়া গেল। আর সেই যোগিবাঞ্ছিত নির্ব্বাণমুক্তির কথা কোন্ হিন্দুকে মুগ্ধ না করে? কিন্তু নির্ব্বাণমুক্তির ভিতর হইতে যে শুদ্ধাদ্বৈতরস ব্রহ্মজ্ঞান ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা আর্য্যেরা বুঝিতে পারেন নাই। না বুঝিয়া বাগ্‌জালে জড়িত হইয়াছিলেন। য়ুরোপের বৈনাশিকতা (nihilism) ভারতে কখনই স্থান পাইতে পারে না। ইহা আসুরিক ভাবে পরিপূর্ণ। ইহা ধর্ম্মকে পদদলিত করে, ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। বৌদ্ধবাদ নাস্তিকতা হইলেও ধর্ম্মের আকারে আসিয়াছিল বলিয়া গ্রহণীয় হইয়াছিল।

যদি বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকতার পরিপোষক, তবে ভারত কেমন করিয়া বৌদ্ধপ্রভাবে জাতীয়মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিল। মগধরাজ্যের মহিমা দেখিয়া কে না বিস্মিত হয়? রাজনীতির পরিপুষ্টি, বাণিজ্যের বৃদ্ধি, সমুদ্রপার হইয়া বিদেশযাত্রা, আরোগ্যালয়প্রতিষ্ঠা, সার্ব্বজনীনবিদ্যালয়সংস্থাপন, শিল্প-

বিজ্ঞানের উন্নতি, বৌদ্ধভারতেই হইয়াছিল। নাস্তিকতার কি এত শুভবল আছে?

সুবিচারদৃষ্টির সহিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নাস্তিকতার বা উচ্ছৃঙ্খলতার শুভবল নাই,—মঙ্গলকারিতা নাই, কিন্তু একটা রাজসিক তেজ—উদ্দাম চেষ্টা আছে;—যাহার নিকট আস্তিক্যবুদ্ধি-জনিত ধর্ম্মবিধিনিয়মিত স্থির-গম্ভীর মঙ্গল-ভাব পার্থিব ব্যবহারে হার মানিয়া যায়। গৃহত্যাগী স্বেচ্ছাচালিত বিধিবহির্ভূত বালক গুরুজনবশগ বালকের অপেক্ষা সাহসে, উদ্যমে, ক্ষিপ্রকারিতায়, বিঘ্নবাধাজয়ে, ব্যবহারপটুতায়, নির্ম্মাণদক্ষতায় নিশ্চয়ই গরীয়ান্ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কর্ম্মকুশলতার আতিশয্য, বুদ্ধিকে স্থূল ও পাশব করিয়া ফেলে, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানকে নাশ করে। আর কুলশীলবান্ বালক অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠে ও অবশেষে সুদৃঢ় আত্মস্থিতি লাভ করে। স্বৈরিণী শক্তির মধ্যে বিনাশবিষ নিবিষ্ট থাকে। তাই তাহার মত্ততা ও আস্ফালন অধিক। কিন্তু আস্ফালন মরিবার জন্য। সুনিয়মিত শক্তির ঘটা ও আড়ম্বর অল্প, কিন্তু স্থায়িত্ব অমর। আজ বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। কোথায় বা সেই মগধরাজ্য, কোথায় বা ধম্মপদ ও ত্রিপীটক!—সব বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু নিপীড়িত, অবসন্ন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আবার জাগিয়া উঠিয়া আপনার প্রভুত্ববিস্তার করিয়াছে। যেরূপ শীতপ্রধান দেশে তুষারগর্ভে পুষ্পলতার বীজসকল হিমের অত্যাচার হইতে রক্ষিত থাকে ও বসন্তসমাগমে পুনরঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আর্য্যপ্রকৃতিগর্ভে রক্ষিত হইয়াছিল। শঙ্করপ্রমুখ সন্ন্যাসীদিগের আহ্বানে আবার জাগরিত হইয়াছে।

জাগরিত হইল বটে, কিন্তু সে পুরাতন তেজ ফিরিয়া আসিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্য-জাতির ঊর্দ্ধদৃষ্টিকে নীচগামী করিয়া দিয়াছিল। শূন্যবাদের কচ্‌কচিতে উপনিষদের গভীর জ্ঞান একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছিল। হিন্দুর নিবৃত্তির দিকে আর মন ছিল না। আস্তিক্যবুদ্ধিবিরহিত হইয়া আর্য্যসন্তানেরা প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য যখন তাহার বেদান্তের ভেরী বাজাইলেন, তখন মৃতকল্প ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সঞ্জীবিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ণশক্তির সঞ্চার হইল না। হিন্দুসমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব অসাড় হইয়াছিল। জীবনপ্রবাহ বহিল, কিন্তু অতিক্ষীণধারে। বেদান্তের জ্ঞান পুনরুদ্ধৃত হইল, কিন্তু জনসাধারণে তাহা বুঝিল না। বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুর চরিত্রকে এত কলঙ্কিত করিয়াছিল যে, কামনাবিবর্জ্জিত সাধন তাহাদের নিকট অত্যন্ত অরুচিকর হইয়া উঠিয়াছিল। নিবৃত্তিমার্গ আর তাহাদের ভাল লাগিল না। শত শত সাম্প্রদায়িক প্রবৃত্তিমার্গ দেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। হিন্দুরাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে আর একতা রহিল না। যখন জ্ঞানে ঐক্য নাই, লক্ষ্যে ঐক্য নাই, তখন ব্যবহারে কিরূপে থাকিতে পারে? ঐক্যবিহীন হইয়া যবনদিগের পদানত হইতে হইল।

রাজনৈতিক অনৈক্য অপেক্ষা পারমার্থিক অনৈক্য হিন্দুজাতিকে অধিকতর হীন করিয়াছে। আর্য্যমাত্রেরই বেদাধ্যয়নের অধিকার ছিল। সকলেই এক-

মেবাদ্বিতীয়ের তত্ত্ব শিক্ষা করিত, বেদগাথা গাহিত, উপনিষদের মন্ত্র অভ্যাস করিত। তাহাদের মধ্যে সংসারের কর্ম্মে, ব্যবহারে, পদমর্য্যাদায় প্রভেদ ছিল, কিন্তু পরমার্থবিষয়ে সমানাধিকার ছিল। পিতার সহিত সকল সন্তানেরই—জ্ঞানী বা অজ্ঞানীর, সুশ্রী বা বিশ্রীর, ধনী বা দরিদ্রের—তুল্য সম্বন্ধ। পুত্র অজ্ঞানী বলিয়া ভৃত্য বা কোন ইতর পুরুষকে পিতৃত্বে বরণ করে না; পিতাকেই পিতা বলে। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, ঋষিবংশসম্ভূত নবীন হিন্দু উপনিষদের সবল-গম্ভীর তত্ত্ব আর বুঝিতে পারে না। কেবল জনকতক লোকে বুঝে। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে। আর যাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নূতন প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্রোহভয়ে অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়াছিলেন। অজ্ঞজনের হস্তে বেদরূপ খনিত্র দেন নাই, পাছে আবার বৌদ্ধদিগের ন্যায় ধর্ম্মের মূল খুঁড়িয়া ফেলে। এই ব্যবস্থার ফল বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক ভেদবাদী ও প্রবৃত্তিমার্গের উপাসক হইয়া যাইতেছে। যতদিন না আর্য্যসন্তানেরা পূর্ব্বের ন্যায় পরমার্থবিষয়ে এক হয়, ততদিন ভারত অধোগামী থাকিবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ তিনটি—(১) অহৈতুককর্ম্মজন্য নৈসর্গিক অবসাদ; (২) আর্য্যানার্য্যের অত্যুদারসম্মেলন; (৩) বৌদ্ধবিদ্রোহ। য়ুরোপীয়েরা ঠিক ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দুজাতির কর্ম্মবৈমুখ্য, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুদারতা ও বৈদিক আশ্রমধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব—এই তিন কারণে ভারতবর্ষ পতিত হইয়াছে। এই বিদেশীয় সিদ্ধান্ত আমাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে। আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, আমরা কর্ম্মবিমুখ। তজ্জন্য আমরা আর্য্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া প্রতীচ্য আদর্শ গ্রহণে উৎসুক হইয়াছি। সঞ্চয়ের জন্য কর্ম্ম না করিলে বিজিগীষা (competition) হয় না; আর বিজিগীষা না হইলে হুড়োহুড়ি, মারামারি, কাটাকাটি হয় না,—কর্ম্মের ভূমি প্রসারিত হয় না,—ঐশ্বর্য্যলাভ হয় না। বেদবিহিত আশ্রম ধর্ম্মে বিজিগীষার স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, অতএব বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া বর্ণধর্ম্মকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দাও। এই ভয়ানক ম্লেচ্ছভাব আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অভিভূত করিয়াছে। বৌদ্ধবিদ্রোহে হিন্দুস্থানের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে; এইবারকার বিদ্রোহে হিন্দুজাতি একেবারে বিনষ্ট না হয়। এই ঘোর সঙ্কটে আর্য্য আদর্শ পুনরুদ্ধৃত না করিলে নিশ্চয়ই কালকবলে পড়িতে হইবে। আশ্রমধর্ম্ম সেই আদর্শে গঠিত। কুলগত কর্ম্ম ও সঞ্চয়ে অনাসক্তি, বর্ণধর্ম্মপালনে পরিপুষ্ট হয়। বর্ণধর্ম্মভঙ্গেই জাতীয় হীনতা আসিয়াছে। যতদিন হিন্দুস্থান আশ্রমী হইয়া কর্ম্মফললিপ্সা পরিবর্জ্জন করিয়া কর্ম্মনিষ্ঠ না হয়, ততদিন ভারতের উত্থান দুরাশামাত্র।

আশা করা যায় যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দুই-একটা চির-প্রচলিত ঐতিহাসিক ভ্রম দূর হইতে পারে।

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

ফাল্গুন। একাদশ সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

—:০:—

সূচী।

---

৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিনযন্ত্রে
শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

বঙ্গদর্শন।

চোখের বালি।

(৩০)

আশা একদিন অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মাসীমা, মেসোমশায়কে তোমার মনে পড়ে ?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন—"আমি এগারো-বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছি, স্বামীর মূর্ত্তি ছায়ার মত মনে হয়।"

আশা জিজ্ঞাসা করিল, "মাসি, তবে তুমি কাহার কথা ভাব ?"

অন্নপূর্ণা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার স্বামী এখন যাঁহার মধ্যে আছেন, সেই ভগবানের কথা ভাবি।"

আশা কহিল—"তাহাতে তুমি সুখ পাও ?"

অন্নপূর্ণা সস্নেহে আশার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন—"আমার সে মনের কথা তুই কি বুঝিবি বাছা ! সে আমার মন জানে, আর যাঁর কথা ভাবি, তিনিই জানেন !"

আশা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি যাঁর কথা রাত্রিদিন ভাবি, তিনি কি আমার মনের কথা জানেন না ? আমি ভাল করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না বলিয়া তিনি কেন আমাকে চিঠি-লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন ?"

আশা কয়দিন মহেন্দ্রের চিঠি পায় নাই। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে ভাবিল—"চোখের বালি যদি হাতের কাছে থাকিত, সে আমার মনের কথা ঠিকমত করিয়া লিখিয়া দিতে পারিত।"

কুলিখিত তুচ্ছপত্র স্বামীর কাছে আদর পাইবে না মনে করিয়া চিঠি লিখিতে কিছুতে আশার হাত সরিত না। যতই যত্ন করিয়া লিখিতে চাহিত, ততই তাহার অক্ষর খারাপ হইয়া যাইত। মনের কথা যতই ভাল করিয়া গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিত, ততই তাহার পদ কোনমতেই সম্পূর্ণ হইত না। যদি একটিমাত্র "শ্রীচরণেষু" লিখিয়া নাম সহি করিলেই মহেন্দ্র অন্তর্যামী দেবতার মত সকল কথা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলেই আশার চিঠি-লেখা সার্থক হইত। বিধাতা এতখানি

ভালবাসা দিয়াছেন, একটুখানি ভাষা দেন নাই কেন?

মন্দিরে সন্ধ্যারতির পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আশা অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দের পর বলিল—"মাসি, তুমি যে বল স্বামীকে দেবতার মত করিয়া সেবা-করা স্ত্রীর ধর্ম্ম, কিন্তু যে স্ত্রী মূর্খ, যাহার বুদ্ধি নাই, কেমন করিয়া স্বামীর সেবা করিতে হয় যে জানে না, সে কি করিবে?"

অন্নপূর্ণা কিছুক্ষণ আশার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাছা, আমিও ত মূর্খ, তবুও ত ভগবানের সেবা করিয়া থাকি!"

আশা কহিল, "তিনি যে তোমার মন জানেন, তাই খুসি হন। কিন্তু মনে কর, স্বামী যদি মূর্খের সেবায় খুসি না হন!"

অন্নপূর্ণা কহিলেন—"সকলকে খুসি করিবার শক্তি সকলের থাকে না বাছা! স্ত্রী যদি আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিযত্নের সঙ্গে স্বামীর সেবা ও সংসারের কাজ করে, তবে স্বামী তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেও স্বয়ং জগদীশ্বর তাহা কুড়াইয়া লন্।"

আশা নিরুত্তরে চুপ করিয়া রহিল। মাসীর এই কথা হইতে সান্ত্বনাগ্রহণের অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বামী যাহাকে তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিবেন, জগদীশ্বরও যে তাহাকে সার্থকতা দিতে পারিবেন, একথা কিছুতেই তাহার মনে লইল না। সে নতমুখে বসিয়া তাহার মাসীর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা তখন আশার হাত ধরিয়া তাহাকে আরো কাছে টানিয়া লইলেন; তাহার মস্তকচুম্বন করিলেন; রুদ্ধকণ্ঠকে দৃঢ়চেষ্টায় বাধামুক্ত করিয়া কহিলেন, "চুনি, দুঃখে-কষ্টে যে শিক্ষা লাভ হয়, শুধু কানে শুনিয়া তাহা পাইবি না। তোর এই মাসীও একদিন তোর বয়সে তোরই মত সংসারের সঙ্গে মস্ত করিয়া দেনাপাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন আমিও তোরই মত মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব, তাহার সন্তোষ না জন্মিবে কেন? যাহার পূজা করিব, তাহার প্রসাদ না পাইব কেন? যাহার ভালর চেষ্টা করিব, সে আমার চেষ্টাকে ভাল বলিয়া না বুঝিবে কেন? পদে পদে দেখিলাম, সেরূপ হয় না। অবশেষে একদিন অসহ্য হইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে আমার সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে—সেইদিনই সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলাম। আজ দেখিতেছি আমার কিছুই নিষ্ফল হয় নাই! ওরে বাছা, যাঁর সঙ্গে আসল দেনা-পাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসারহাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্তই লইতে-ছিলেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম্ম বলিয়া সংসারের কর্ম্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম, তা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত!"

আশা বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনেক কথা ভাবিল, তবু ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পুণ্যবতী মাসীর প্রতি তাহার অসীম ভক্তি

ছিল, সেই মাসীর কথা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও একপ্রকার শিরোধার্য্য করিয়া লইল। মাসী সকল সংসারের উপরে যাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে অন্ধকারে বিছানার উঠিয়া বসিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিল। বলিল—"আমি বালিকা, তোমাকে জানি না, আমি কেবল আমার স্বামীকে জানি, সে-জন্যে অপরাধ লইয়ো না! আমার স্বামীকে আমি যে পূজা দিই, ভগবান্, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়ো! তিনি যদি তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেন, তবে আমি আর বাঁচিব না! আমি আমার মাসীমার মত পুণ্যবতী নই, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি রক্ষা পাইব না!" এই বলিয়া আশা বারবার বিছানার উপর গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আশার জ্যাঠামশায়ের ফিরিবার সময় হইল। বিদায়ের পূর্ব্বসন্ধ্যায় অন্নপূর্ণা আশাকে আপনার কোলে বসাইয়া কহিলেন—"চুনি, মা আমার, সংসারের শোক-দুঃখ-অমঙ্গল হইতে তোকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এই উপদেশ, যেখান থেকে যত কষ্টই পাস্, তোর বিশ্বাস—তোর ভক্তি স্থির রাখিস্, তোর ধর্ম্ম যেন অটল থাকে!"

আশা তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া কহিল—"আশীর্ব্বাদ কর মাসীমা, তাই হইবে!"

(৩১)

বিনোদিনীর সহিত প্রথম সংঘাতে মহেন্দ্রের মনে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, অভ্যাসক্রমে তাহা শান্ত হইয়া আসিল। বিনোদিনী এবং মহেন্দ্রের মাঝখানে যে একটা বাঁধের মত ছিল, তাহা প্রত্যহ তলে তলে তিলে তিলে ক্ষইয়া আসিয়া মহেন্দ্রের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগকে কোন্ একসময় পথ ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন সে আর নিজের ভিতরে কোন একটা বিরোধ অনুভব করে না। এখন মহেন্দ্রের দৈনিক জীবনযাত্রায় বিনোদিনী জলের উপর পদ্মের মত অতি সহজেই ভাসিতেছে।

রাজলক্ষ্মী সর্ব্বদাই মনে করেন, "আহা, আমার গৃহস্থালীর ভিতর বিনোদিনীকে কেমন সুন্দর মানাইয়াছে! বিধাতা উহাকে সর্ব্বাংশে এই ঘরের জন্যই গড়িয়াছিলেন কেবল মহেন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধি এবং অন্নপূর্ণার চক্রান্তেই বিনোদিনী ঘরের হইয়াও ঘরে আসিল না।" রাজলক্ষ্মীর মনের একপ্রান্তে এ ইচ্ছাটা ছিল যে, মাকে অতিক্রম করিয়া অন্নপূর্ণার ছলপ্রলোভনে মহেন্দ্র যে কিরূপ প্রতারিত হইয়াছে, তাহা সে বোঝে,—মনে মনে অনুতাপ করে, এবং গর্ভধারিণী মা এবং খুড়ির মধ্যে কে যে যথার্থ আপনার, তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে। বিনোদিনী কাজে-কর্ম্মে অবসরবিনোদনে যতই মহেন্দ্রের পক্ষে দিনে দিনে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িতেছে, রাজলক্ষ্মী ততই মনে মনে খুসি হইয়া বলিতেছেন, "কেমন, তখন যে বড় মার পছন্দে পছন্দ হইল না!" সংসারকার্য্যের উপযোগিতায় আশা বিনোদিনীর তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইতেছে, ইহাতে রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার হার ও নিজের জিত বলিয়া মানিতেছেন। এইজন্য বধূহীন গৃহে বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের এতটা

মেলামেশা অবৈধ হইলেও, রাজলক্ষ্মী তাহাতে একপ্রকার অন্ধ হইয়া ছিলেন। বিশেষত তিনি দেখিতেন, আজকাল মহেন্দ্র একদিনও কালেজ কামাই করে না; তাহার স্নানাহার-শয়ন বিনোদিনীর ব্যবস্থায় ঠিক ঘড়ির কলের মত সম্পন্ন হইতেছে। প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে জীবনযাত্রাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, আশা ও মহেন্দ্রের প্রথম মিলনকালে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল;—এখন সমস্তই পরিপাটী—সুসংযত। অতএব এখন আশঙ্কার বিষয় বাহির হইতে কিছুই দেখা যাইতেছে না।

আশা ফিরিয়া আসিল। বিনোদিনী তাহার পরে খুব অভিমান করিল।—"বলি, এতদিন বিদেশে রহিলে, একখানা চিঠি লিখিতে নাই?"

আশা কহিল—"তুমিই কোন্ লিখিলে ভাই বালি!"

বিনোদিনী। আমি কেন প্রথমে লিখিব? তোমারই ত লিখিবার কথা!—"

আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। কহিল, "জান ত ভাই, আমি ভাল লিখিতে জানি না। বিশেষ তোমার মত পণ্ডিতের কাছে লিখিতে আমার লজ্জা করে।"

দেখিতে দেখিতে দুইজনের বিবাদ মিটিয়া গিয়া প্রণয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী কহিল, "দিনরাত্রি সঙ্গ দিয়া তোমার স্বামীটির অভ্যাস তুমি একেবারে খারাপ করিয়া দিয়াছ। একটি কেহ কাছে নহিলে থাকিতে পারে না!"

আশা। সেইজন্যই ত তোমার উপরে ভার দিয়া গিয়াছিলাম। কেমন করিয়া সঙ্গ দিতে হয়, আমার চেয়ে তুমি ভাল জান!

বিনোদিনী। দিনটা ত একরকম করিয়া কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কোনমতেই ছাড়াছুড়ি নাই—গল্প করিতে হইবে, বই পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আবদারের শেষ নাই!

আশা। কেমন জব্দ! লোকের মন ভুলাইতে যখন পার, তখন লোকেই বা ছাড়িবে কেন!

বিনোদিনী। সাবধান থাকিস্ ভাই! ঠাকুরপো যে-রকম বাড়াবাড়ি করেন, এক-একবার সন্দেহ হয়, বুঝি বশ করিবার বিদ্যা জানি বা!

আশা হাসিয়া কহিল, "তুমি জান না ত কে জানে। তোমার বিদ্যা আমি একটু-খানি পাইলে বাঁচিয়া যাইতাম!"

বিনোদিনী। কেন, কার সর্ব্বনাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে! ঘরে যেটি আছে, সেইটিকে রক্ষা কর্, পরকে ভোলাইবার চেষ্টা করিস্ নে ভাই বালি! বড় ল্যাঠা!

আশা বিনোদিনীকে হস্তদ্বারা তর্জ্জন করিয়া বলিল, "আঃ, কি বকিস্ তার ঠিক নেই!"

কাশী হইতে ফিরিয়া আসার পর প্রথম সাক্ষাতেই মহেন্দ্র কহিল, "তোমার শরীর বেশ ভাল ছিল দেখিতেছি, দিব্য মোটা হইয়া আসিয়াছ!"

আশা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিল। কোনমতেই তাহার শরীর ভাল থাকা উচিত ছিল না,—কিন্তু মূঢ় আশার কিছুই ঠিকমত চলে না; তাহার মন যখন এত

খারাপ ছিল, তখনো তাহার পোড়াশরীর মোটা হইয়া উঠিয়াছিল ; একে ত মনের ভাব ব্যক্ত করিতে কথা জোটে না, তাহাতে আবার শরীরটাও উল্টা বলিতে থাকে!

আশা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কেমন ছিলে?"

আগে হইলে মহেন্দ্র কতক ঠাট্টা, কতক মনের সঙ্গে বলিত—"মরিয়া ছিলাম ;" এখন আর ঠাট্টা করিতে পারিল না, গলার কাছে আসিয়া বাধিয়া গেল। কহিল, "বেশ ছিলাম, মন্দ ছিলাম না।"

আশা চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র পূর্ব্বের চেয়ে যেন রোগাই হইয়াছেন,—তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চোখে একপ্রকার তীব্র দীপ্তি। একটা যেন আভ্যন্তরিক ক্ষুধায় তাঁহাকে অগ্নিজিহ্বা দিয়া লেহন করিয়া খাইতেছে। আশা মনে মনে ব্যথা অনুভব করিয়া ভাবিল, "আহা, আমার স্বামী ভাল ছিলেন না, কেন আমি উঁহাকে ফেলিয়া কাশী চলিয়া গেলাম!"—স্বামী রোগা হইলেন, অথচ নিজে মোটা হইল, ইহাতেও নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি আশার অত্যন্ত ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র আর কি কথা তুলিবে ভাবিতে ভাবিতে খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করিল—"কাকিমা ভাল আছেন ত?"

সে প্রশ্নের উত্তরে কুশলসংবাদ পাইয়া তাহার আর দ্বিতীয় কথা মনে আনা দুঃসাধ্য হইল। কাছে একটা ছিন্ন পুরাতন খবরের কাগজ ছিল, সেইটে টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে পড়িতে লাগিল। আশা মুখ নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল, "এতদিন পরে দেখা হইল, কিন্তু উনি আমার সঙ্গে কেন ভাল করিয়া কথা কহিলেন না, এমন কি, আমার মুখের দিকেও যেন চাহিতে পারিলেন না। আমি তিন-চার-দিন চিঠি লিখিতে পারি নাই বলিয়া কি রাগ করিয়াছেন, আমি মাসীর অনুরোধে বেশিদিন কাশীতে ছিলাম বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছেন?" অপরাধ কোন্ ছিদ্র দিয়া কেমন করিয়া প্রবেশ করিল, ইহাই সে নিতান্ত ক্লিষ্ট হৃদয়ে সন্ধান করিতে লাগিল।

এদিকে বিনোদিনী অদৃশ্য। ভাবটা এই যে, যাঁহার সম্পত্তি তিনি আসিয়াছেন, এখন আমি নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া খালাস হইলাম। অন্যদিন স্নানের ঘরে গিয়া মহেন্দ্র একটি ছোট রূপার বাটিতে চন্দন-ঘষা প্রস্তুত দেখিত, গ্রীষ্মের দিনে স্নানান্তে তাহা গায়ে মাখিয়া আরাম বোধ করিত, আজ আর তাহা নাই। স্নানের পর কাপড় প্রস্তুত পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে খস্‌খসের এসেন্সের স্নিগ্ধগন্ধ কেহ মাখাইয়া রাখে নাই। মধ্যাহ্নভোজনের সময় বিনোদিনী অনুপস্থিত। পানের মধ্যে কেয়াখয়েরের সে গন্ধটুকু নাই। আহারের পর মহেন্দ্র গাড়ি-তৈরির খবর পাইল, কিন্তু নিত্য-প্রথানুসারে বিনোদিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল না, "আজ বিকালে তোমার জন্যে সরবৎ তৈরি করিয়া রাখিব, না, হোটেল হইতে তুমি আইস্‌ক্রীম্ লইয়া আসিবে?" মহেন্দ্র অনর্থক চিত্তব্যাকুলতা ভোগ না করিয়া অনায়াসে আশাকে বলিতে পারিত, 'চোখের বালিকে একবার ডাকিয়া দাও!' কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে পারিল না।

মনে হইল, বিনোদিনীর নাম মুখে আনিলেই যেন নামের চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, আশার কাছে যেন কিছুই ছাপা থাকিবে না।

বৃথা আশ্বাসে মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিল। অপরাহ্নে জলপানের সময় রাজলক্ষ্মী ছিলেন, আশাও ঘোমটা দিয়া অদূরে দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আর কেহই ছিল না।

রাজলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি তোর অসুখ করিয়াছে মহিন্?"

মহেন্দ্র বিরক্তভাবে কহিল, "না মা, অসুখ কেন কোর্‌বে?"

রাজলক্ষ্মী। তবে তুই যে কিছু খাইতেছিস্ না।

মহেন্দ্র পুনর্ব্বার উত্যক্তস্বরে কহিল, "এই ত, খাচ্চি না ত কি!"

মহেন্দ্র গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় একখানা পাৎলা চাদর গায়ে ছাদের এধারে ওধারে বেড়াইতে লাগিল। মনে বড় আশা ছিল, তাহাদের নিয়মিত পড়াটা আজ ক্ষান্ত থাকিবে না। আনন্দমঠ প্রায় শেষ হইয়াছে, আর শুটি-দুইতিন অধ্যায় বাকি আছে মাত্র,—বিনোদিনী যত নিষ্ঠুর হোক্, সে কয়টা অধ্যায় আজ তাহাকে নিশ্চয় শুনাইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা অতীত হইল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গুরুভার নৈরাশ্য বহিয়া মহেন্দ্রকে শুইতে যাইতে হইল। নিষ্ঠুরা বিনোদিনী তখন অত্যন্ত যত্নে আশার খোঁপায় মালা জড়াইয়া, তাহার চোখে কাজল পরাইয়া, তাহার ওষ্ঠাধরে ঈষৎ আল্‌তা রাঙাইয়া সাজাইয়া দিতেছিল।

সজ্জিত লজ্জান্বিত আশা ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, বিছানায় মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়াছে। তখন, কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে, ভাবিয়া পাইল না। বিচ্ছেদের পর কিছুক্ষণ একটা নূতন লজ্জা আসে,—যেখানটিতে ছাড়িয়া যাওয়া যায়, ঠিক সেইখানটিতে মিলিবার পূর্ব্বে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নূতন সম্ভাষণের প্রত্যাশা করে। আশা তাহার সেই চিরপরিচিত আনন্দশয্যাটিতে আজ অনাহূত কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? দ্বারের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—মহেন্দ্রের কোন সাড়া পাইল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যদি অসতর্কে দৈবাৎ কোন গহনা বাজিয়া উঠে ত সে লজ্জায় মরিয়া যায়। কম্পিতহৃদয়ে আশা মশারির কাছে আসিয়া অনুভব করিল, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছে। তখন তাহার নিজের সাজসজ্জা তাহাকে সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, বিদ্যুদ্‌-বেগে এ ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য কোথাও গিয়া শোয়।

আশা যথাসাধ্য নিঃশব্দে সঙ্কুচিত হইয়া খাটের উপর গিয়া উঠিল। তবু তাহাতে এতটুকু শব্দ ও নড়াচড়া হইল যে, মহেন্দ্র যদি সত্যই ঘুমাইত, তাহা হইলে জাগিয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার চক্ষু খুলিল না, কেন না, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছিল না। মহেন্দ্র খাটের অপর প্রান্তে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, সুতরাং আশা তাহার পশ্চাতে শুইয়া রহিল। আশা যে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছিল, তাহা পিছন ফিরিয়াও মহেন্দ্র

স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল। নিজের নিষ্ঠুরতায় তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন জাঁতার মত পেষণ করিয়া ব্যথা দিতেছিল। কিন্তু কি কথা বলিবে, কেমন করিয়া আদর করিবে, মহেন্দ্র তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না;—মনে মনে নিজেকে সুতীব্র কশাঘাত করিতে লাগিল,—তাহাতে আঘাত পাইল, কিন্তু উপায় পাইল না। ভাবিল, "প্রাতঃকালে ত ঘুমের ভাণ করা যাইবে না, তখন মুখোমুখি হইলে আশাকে কি কথা বলিব?"

আশা নিজেই মহেন্দ্রের সে সঙ্কট দূর করিয়া দিল। সে অতি প্রত্যুষেই অপমানিত সাজসজ্জা লইয়া বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সেও মহেন্দ্রকে মুখ দেখাইতে পারিল না।

(৩২)

পরদিনও বিনোদিনী মহেন্দ্রকে দর্শন দিল না। মহেন্দ্রের দিবসের অধিকাংশ মুহূর্ত্ত যাহাকে অবলম্বন করিয়া ছিল, মহেন্দ্রের ভোজন, শয়ন, উপবেশন, অধ্যয়ন, অনধ্যায়, মহেন্দ্রের সমস্ত নিত্যকৃত্য যে একটি বৃন্ত আশ্রয় করিয়া ছিল, সে অপসৃত হইবামাত্র তাহার যাহা কিছু, সমস্ত যেন উল্‌টাপাল্‌টা হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র কখনো ছাদে, কখনো ঘরে, কখনো বাহিরের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কালেজে যাইতেও পারিল না, অথচ শয়নঘরেও কিছুতেই তাহার মন টিকিল না।

সেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যাহ্নে মহেন্দ্র মায়ের ঘরে গেল। মা তখন আহারান্তে বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছিলেন।

পূর্ব্বে এক দিন ছিল, যখন মহেন্দ্র সময়-অসময় বিচার না করিয়া যখন-তখন মার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইত, কিন্তু সে দিন আর নাই। তাই বহুকাল পরে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে মধ্যাহ্নে তাঁহার ঘরে আসিতে দেখিয়া আনন্দবোধ করিলেন। মহেন্দ্র আজ পূর্ব্বের মত মার কাছে আসিয়া তাঁহার বিছানায় শুইয়া পড়িল। মা পুলকিতস্নেহে মহেন্দ্রের মাথার চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইয়া দিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঘুম মহেন্দ্রের চোখে কোথায়? মহেন্দ্র কেন প্রত্যেক শব্দে চমকিয়া উঠিতেছিল, কেন ক্ষণে ক্ষণে দ্বারের দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিপাত করিতেছিল? অনেকক্ষণ যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে কেন সে স্ফীতবক্ষে ভগ্নকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"মা!"

মা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মহিন্?"

মহেন্দ্র কহিল—"কিছুই না মা!"

মা সান্ত্বনস্বরে কহিলেন—"কি বলিতে চাস্. বল্ মহিন? আমার কাছে লুকাস্‌নে!"

মহেন্দ্র পুনরায় কহিল—"নাঃ, কিছুই না!"

বলিয়া মহেন্দ্র মাতার একটি পদতল ডান হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার কোলের উপরে মাথা রাখিল। মাতা উদ্বিগ্নচিত্তে বিগলিতস্নেহে মহেন্দ্রের মাথায়, ললাটে, কপোলে, হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রতিদিন বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর পাকাচুল তুলিয়া বাতাস করিয়া ঘুম পাড়াইয়া দেয়। আজ সে আর ঘরে প্রবেশ

করিল না। মহেন্দ্র একসময়ে হঠাৎ অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া বসিল। মা কহিলেন, "কোথায় যাস্ মহিন্, একটু ঘুমো না!"

মহেন্দ্র কহিল, "নাঃ, আমার বাহিরে কাজ আছে!"

বলিয়া মহেন্দ্র ঘরের বাহিরে গেল। অন্তঃপুরে যে ঘরে বিনোদিনী থাকে, দূর হইতে সেইদিকে চাহিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। ব্যগ্রদৃষ্টির যদি কোন শক্তি থাকিত, তবে রুদ্ধদ্বার তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইয়া খুলিয়া যাইত।

এদিকে বিনোদিনী কুণ্ঠিত আশাকে বিরলে আপনার ঘরে টানিয়া লইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তার পরে ভাই চোখের বালি, অনেকদিন পরে দেখার পর কাল ঠাকুরপো তোমাকে কি বল্লেন?"

দুঃখের ভারে আশার বুক পূরিয়া উঠিয়াছিল, তবু আশা কোন কথা বলিল না,—প্রাণপণশক্তিতে ম্লানমুখে একটুখানি হাসি আনিল।

বিনোদিনী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"আমার কাছে লজ্জা কিসের ভাই!"

আশা তবু কোন উত্তর করিল না, কোনমতে আর একবার হাসিল মাত্র।

পীড়াপীড়ির পালা সাঙ্গ হইলে বিনোদিনী কহিল, "আয় ভাই, আজ আবার তেম্নি করিয়া সাজাইয়া দিই।"

এ প্রস্তাব যেন আশাকে বেত মারিল। তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ বিমুখ হইলেও, সে বিনোদিনীর কাছে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে যে, আমার আর সাজসজ্জায় দরকার নাই!

বিনোদিনী আশার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও মুখশ্রীর প্রশংসা করিতে করিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া বহুধীরে বহুযত্নে যতই তাহাকে সাজাইল, ততই আশা অঙ্গে-অঙ্গে দগ্ধ হইতে লাগিল। তবু এই প্রসাধনের যন্ত্রণা সে পরমধৈর্য্যে সহ্য করিল। সব শেষ করিয়া বামহাতে আশার গাল টিপিয়া ধরিয়া ডানহাতের তর্জ্জনীর অগ্র দিয়া যখন বিনোদিনী আশার দুই চোখে কাজল পরাইয়া দিল, তখন হঠাৎ তাহার দুই চোখ বাহিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল—"ভাই, নখের খোঁচা লাগিল কি?"

আশা "নাঃ, বিশেষ কিছু হয় নি" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল। উপরের তলায় একটি নির্জ্জন ঘরের মধ্যে গিয়া আশা তাহার সমস্ত সাজসজ্জা খুলিয়া ফেলিল। জল দিয়া আল্তার রাগ, কাজলের দাগ, সমস্ত ধুইয়া দিল—একখানি সাদাসিধা কাপড় পরিয়া বস্ত্রাঞ্চল মাথায় টানিয়া কিঞ্চিৎ অধিক রাত্রে নিঃশব্দপদে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল।

পূর্ব্বরাত্রের মতই মহেন্দ্র শয্যাশেষে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। ঘুমের ঘোরে মানুষ যেটুকু নড়েচড়ে, তাহাও তাহার নাই; মজ্জমান ব্যক্তি যেমন আড়ষ্টভাবে মাস্তুল আঁকড়াইয়া থাকে, সে তেম্নি করিয়া পাশ-বালিশ ধরিয়া আছে।

আশা স্থির করিল, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছে। ধীরে ধীরে সে বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিল, দুটি হাত জোড় করিয়া বসিল,—তাহার মাসীমা যে দেবতাকে ডাকেন, সেই দেব-

তাকে গড় করিয়া প্রণাম করিল। আস্তে আস্তে একবার মহেন্দ্রের সুপ্তমুখ দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই দেখা গেল না। মহেন্দ্র একটা হাত তুলিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইয়া ছিল। পরদিন আশা ঘুম হইতে জাগিয়াই দেখিল, মহেন্দ্র তাহার পূর্ব্বেই কখন্ উঠিয়া চলিয়া গেছে!

(৩৩)

আশা ভাবিতে লাগিল, "এমন কেন হইল? আমি কি করিয়াছি?" যে জায়গায় যথার্থ বিপদ্, সে জায়গায় তাহার চোখ পড়িল না। বিনোদিনীকে যে মহেন্দ্র ভালবাসিতে পারে, এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কিছুই ছিল না। তা ছাড়া বিবাহের অনতিকাল পর হইতেই সে মহেন্দ্রকে যাহা বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছিল, মহেন্দ্র যে তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে, ইহা কখনো তাহার কল্পনাতেও আসে নাই।

মহেন্দ্র আজ সকাল-সকাল কলেজে গেল। কলেজযাত্রাকালে আশা বরাবর জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং মহেন্দ্র গাড়ি হইতে একবার মুখ তুলিয়া দেখিত, ইহা তাহাদের চিরকালের নিত্য-প্রথা ছিল। সেই অভ্যাস অনুসারে গাড়ির শব্দ শুনিবামাত্র যন্ত্রচালিতের মত আশা জানালার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রও অভ্যাসের খাতিরে একবার চকিতের মত উপরে চোখ তুলিল; দেখিল, আশা দাঁড়াইয়া আছে—তখনো তাহার স্নান হয় নাই,—মলিন বস্ত্র, অসংযত কেশ, শুষ্ক মুখ—দেখিয়া নিমেষের মধ্যেই মহেন্দ্র চোখ নামাইয়া কোলের বই দেখিতে লাগিল। কোথায় চোখে-চোখে সেই নীরব সম্ভাষণ, সেই ভাষাপূর্ণ হাসি!

গাড়ি চলিয়া গেল; আশা সেইখানেই মাটির উপরে বসিয়া পড়িল। পৃথিবী, সংসার, সমস্ত বিস্বাদ হইয়া গেল। কলি-কাতার কর্ম্মপ্রবাহে তখন জোয়ার আসিবার সময়। সাড়ে দশটা বাজিয়াছে—আপিসের গাড়ির বিরাম নাই, ট্র্যামের পশ্চাতে ট্র্যাম ছুটিতেছে—সেই ব্যস্ততাবেগবান্ কর্ম্মকল্লো-লের অদূরে এই একটি বেদনাস্তম্ভিত মুহ্যমান হৃদয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

হঠাৎ এক-সময় আশার মনে হইল, "বুঝিয়াছি! ঠাকুরপো কাশী গিয়াছিলেন, সেই খবর পাইয়া উনি রাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে আর ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু আমার তাহা'তে কি দোষ ছিল?"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ একমুহূর্ত্তের জন্য যেন আশার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ তাহার আশঙ্কা হইল, মহেন্দ্র বুঝি সন্দেহ করিয়াছেন, বিহারীর কাশী যাওয়ার সঙ্গে আশারও কোন যোগ আছে! দুইজনে পরামর্শ করিয়া এই কাজ! ছিছিছি এমন সন্দেহ! কি লজ্জা! একে ত বিহারীর সঙ্গে তাহার নাম জড়িত হইয়া ধিক্কারের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার উপরে মহেন্দ্র যদি এমন সন্দেহ করে, তবে ত আর প্রাণ রাখা যায় না। কিন্তু যদি কোন সন্দেহের কারণ হয়, যদি কোন অপরাধ ঘটিয়া থাকে, মহেন্দ্র কেন স্পষ্ট করিয়া বলে না—বিচার করিয়া তাহার উপযুক্ত

দণ্ড কেন না দেয়! মহেন্দ্র খোলসা কোন কথা না বলিয়া কেবলি আশাকে যেন এড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাই আশার বারবার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের মনে এমন কোন সন্দেহ আসিয়াছে, যাহা নিজেই সে অন্যায় বলিয়া জানে; যাহা সে আশার কাছে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জাবোধ করিতেছে। নহিলে এমন অপরাধীর মত তাহার চেহারা হইবে কেন? ক্রুদ্ধ বিচারকের ত এমন কুণ্ঠিতভাব হইবার কথা নহে।

মহেন্দ্র গাড়ি হইতে চকিতের মত সেই যে আশার ম্লান করুণমুখ দেখিয়া গেল, তাহা সমস্তদিনে সে মন হইতে মুছিতে পারিল না। কলেজের লেক্‌চারের মধ্যে, শ্রেণীবদ্ধ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে, সেই বাতায়ন, আশার সেই অস্নাত রুক্ষকেশ, সেই মলিন বস্ত্র, সেই ব্যথিতব্যাকুল দৃষ্টিপাত সুস্পষ্টরেখায় বারংবার অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কলেজের কাজ সারিয়া সে গোলদিঘির ধারে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আশার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না—সদয় ছলনা, না অকপট নিষ্ঠুরতা, কোন্‌টা উচিত? বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবে কি না, সে তর্ক আর মনে উদয়ই হয় না। দয়া এবং প্রেম, মহেন্দ্র উভয়ের দাবী কেমন করিয়া রাখিবে?

মহেন্দ্র তখন মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, আশার প্রতি এখনো তাহার যে ভালবাসা আছে, তাহা অল্প স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে। সেই স্নেহ—সেই ভালবাসা পাইলে আশা কেন না সন্তুষ্ট থাকিবে? বিনোদিনী এবং আশা, উভয়কেই স্থান দিবার মত প্রশস্ত হৃদয় মহেন্দ্রের আছে। বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের যে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ, তাহাতে দাম্পত্যনীতির কোন ব্যাঘাত হইবে না।

এইরূপ বুঝাইয়া মহেন্দ্র মন হইতে একটা ভার নামাইয়া ফেলিল। বিনোদিনী এবং আশা কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া দুইচন্দ্রসেবিত গ্রহের মত এইভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আজ রাত্রে সে সকাল-সকাল বিছানায় প্রবেশ করিয়া আদরে, যত্নে, স্নিগ্ধ আলাপে, আশার মন হইতে সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রুতপদে বাড়ী চলিয়া আসিল।

আহারের সময় আশা উপস্থিত ছিল না, কিন্তু সে একসময় শুইতে আসিবে ত, এই মনে করিয়া মহেন্দ্র বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিস্তব্ধঘরে সেই শূন্যশয্যার মধ্যে কোন্ স্মৃতি মহেন্দ্রের হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া তুলিল? আশার সহিত নবপরিণয়ের নিত্যনূতন লীলাখেলা? না। সূর্য্যালোকের কাছে জ্যোৎস্না যেমন মিলাইয়া যায়, সে সকল স্মৃতি তেমনি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে,—একটি তীব্র-উজ্জ্বল তরুণীমূর্ত্তি, সরলা বালিকার সলজ্জ স্নিগ্ধচ্ছবিকে কোথায় আবৃত-আচ্ছন্ন করিয়া দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে! বিনোদিনীর সঙ্গে বিষবৃক্ষ লইয়া সেই কাড়াকাড়ি মনে পড়িতে লাগিল; সন্ধ্যার পর বিনোদিনী কপালকুণ্ডলা পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিত, রাড়ীর

লোক ঘুমাইয়া পড়িত, রাত্রে নিভৃতকক্ষের সেই স্তব্ধ নির্জ্জনতায় বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর যেন আবেশে মৃদুতর ও রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিত, হঠাৎ সে আত্মসংবরণ করিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িত, মহেন্দ্র বলিত—"তোমাকে সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসি";—সেই একদিন মনে পড়ে, বিনোদিনীর নিষেধসত্ত্বেও মহেন্দ্র নির্ব্বাণদীপ অন্ধকার সিঁড়িতে তাহাকে সঙ্গদান করিতে গেল, অবশেষে অন্ধকারে একসময় হঠাৎ অনিবার্য্য আবেগে বিনোদিনীকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল, বিনোদিনী প্রথম দুই-এক-মুহূর্ত্ত বিহ্বলভাবে সে চুম্বনে বাধা দিল না, তাহার পর অকস্মাৎ সক্রোধে "যাও" বলিয়া মহেন্দ্রকে বলপূর্ব্বক ঠেলিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল ;—সেই সকল কথা বারংবার মনে পড়িয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার করিতে লাগিল। রাত্রি বাড়িয়া চলিল—মহেন্দ্রের মনে মনে ঈষৎ আশঙ্কা হইতে লাগিল, এখনি আশা আসিয়া পড়িবে—কিন্তু আশা আসিল না। মহেন্দ্র ভাবিল, "আমি ত কর্ত্তব্যের জন্ত প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আশা যদি অন্যায় রাগ করিয়া না আসে ত আমি কি করিব ?" এই বলিয়া নিশীথরাত্রে বিনোদিনীর ধ্যানকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

ঘড়িতে যখন একটা বাজিল, তখন মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, মশারি খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছাতে আসিয়া দেখিল, গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নারাত্রি বড় রমণীয় হইয়াছে। কলিকাতার প্রকাণ্ড নিঃশব্দতা এবং সুপ্তি যেন স্তব্ধসমুদ্রের জলরাশির ন্যায় স্পর্শগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে—অসংখ্য হর্ম্ম্যশ্রেণীর উপর দিয়া মহানগরীর নিদ্রাকে নিবিড়তর করিয়া বাতাস মৃদুগমনে পদচারণ করিয়া আসিতেছে।

মহেন্দ্রের বহুদিনের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আশা কাশী হইতে ফিরিয়া অবধি বিনোদিনী তাহাকে দেখা দেয় নাই। জ্যোৎস্নামদবিহ্বল নির্জ্জনরাত্রি মহেন্দ্রকে মোহাবিষ্ট করিয়া বিনোদিনীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দেখিল, ঘর বন্ধ নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিছানা তৈরি রহিয়াছে, কেহ শোয় নাই। ঘরের মধ্যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ঘরের দক্ষিণদিকের খোলা বারান্দা হইতে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কে ও ?"

মহেন্দ্র অভিভূত আর্দ্র কণ্ঠে উত্তর করিল, "বিনোদ, আমি !"

বলিয়া সে একেবারে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রীষ্মরাত্রিতে বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মী শুইয়াছিলেন—তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহীন্, এতরাত্রে তুই এখানে যে !"

বিনোদিনী [illegible] ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগের নীচে হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রমশ।

সার সত্যের আলোচনা।

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের মধ্যে একাত্মভাবের সূচনা।

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের মধ্যে একাত্মভাব কিরূপ, তাহা দেখিতে হইলে, বুদ্ধির নিজাধিকারের অভ্যন্তরেই মন এবং প্রাণ কিরূপ এক-যোগে কার্য্য করে, তাহার প্রতি প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধি বড়, মন মেজো, এবং প্রাণ ছোটো। যিনি যখন বড় হ'ন, তিনি ছোটো এবং মেজো'র ধাপ মাড়াইয়া বড়'র ধাপে উত্তীর্ণ হ'ন। বুদ্ধি—প্রাণ এবং মনের ধাপ মাড়াইয়া নিজাধিকারে সমুত্থান করিয়াছে; কাজেই মন এবং প্রাণের মধ্যে সত্ব যাহা কিছু আছে, সবই বুদ্ধির মধ্যে একাধারে সম্ভুক্ত থাকিবারই কথা। বুদ্ধির নিজাধিকারে মন এবং প্রাণ কি ভাবে সম্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে হইলে, বুদ্ধির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচন করা আবশ্যক—সর্ব্বপ্রথমে তাহাই করা যা'ক্।

বুদ্ধির অঙ্গ-নির্ব্বাচন।

কি পশু, কি পক্ষী, কি মনুষ্য—নূতন নূতন অভাব-বোধ সকলকেই নূতন নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। একটা বন-মানুষ—যে ইতিপূর্ব্বে কোনো জন্মে জলে নাবে নাই, তাহাকে যদি একদল শিকারী ঘেরাও করে, তাহা হইলে—পলাইবার আর কোনো পথ না থাকিলে—সম্মুখস্থিত নদীতে ঝম্পপ্রদান করিয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হওয়া তাহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। বন-মানুষের এইরূপ যতপ্রকার বুদ্ধির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই শুদ্ধ-কেবল অভাব-বোধের উত্তেজনায় উপস্থিত-মতে ঘটিয়া থাকে। বন-মানুষ কেন—ওরূপ সঙ্কটে পড়িলে জাত্-মানুষও অভাব-বোধের উত্তেজনায় ঐরূপে নদী পার হয়। কিন্তু মনুষ্য তাহাতেই ক্ষান্ত থাকে না। মনুষ্যের মনে যখন "নদী পার হওয়া আবশ্যক" এইরূপ একটি অভাব-বোধ উপস্থিত হয়, তখন সে—আর কোনো জন্তু নদীতে সন্তরণ করে কি না, তাহা চিন্তা করে; তাহার পরে হংস কিরূপে সন্তরণ করে, মৎস্য কিরূপে সন্তরণ করে, নৌমীন (Nautilus) কিরূপে সন্তরণ করে, তাহা অনুসন্ধান করে; তাহার পরে, হংসের মুখ্য অবয়বের আদর্শ-অনুসারে একটা কাষ্ঠের বাহন নির্ম্মাণ করে; হংসের পদদ্বয়ের আদর্শ-অনুসারে তাহার দুইটা দাঁড় নির্ম্মাণ করে; মৎস্যের ল্যাজার আদর্শ-অনুসারে তাহার হাইল নির্ম্মাণ করে, নৌমীনের আদর্শ-অনুসারে তাহার পাইল্

নির্ম্মাণ করে; এইরূপ একটি বাহন নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দ্যায়—নৌকা।

মনে কর, কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য আমার একটা পাত্রের প্রয়োজন হইয়াছে; অথবা যাহা একই কথা—আমার মনে ঐরূপ একটা পাত্রের অভাব-বোধ হইয়াছে। প্রথমত সে পাত্রের উদর স্ফীত হওয়া চাই—কেন না, তাহা হইলে তাহার অভ্যন্তরে যথেষ্ট-পরিমাণ জল ধরিবে; দ্বিতীয়ত তাহার কণ্ঠ উদর অপেক্ষা সরু ও হ্রস্ব হওয়া চাই এবং মুখরন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্ব বাহিরের দিকে বিকুঞ্চিত হওয়া চাই—কেন না, তাহা হইলে তাহার কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইবার সুবিধা হইবে। তৃতীয়ত তাহার উদর এবং কণ্ঠের মধ্যে পরিমাণের সৌষম্য থাকা চাই, এক কথায়—তাহা মানান্-সই হওয়া চাই; কেন না, তাহা বেমানান্ হইলে আমার মন খুঁৎখুঁৎ করিবে এবং সেই কারণে তাহাকে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইবে। মৃত্তিকার উপাদানে আমি এইরূপ একটা পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দিলাম—ঘট। তাহার পরে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, মৃত্তিকার উপাদানেই যে ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নাই;—যে-কোনো কঠিন উপাদানে ঐরূপ একটা পাত্র নির্ম্মিত হউক্ না কেন, তাহাতেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব মৃত্তিকার উপাদান ঘটের মুখ্য অঙ্গ নহে। ঘটের মুখ্য অঙ্গ কি? না, জল-ধারণ-ক্ষম কাঠিন্য—স্ফীত উদর, হ্রস্ব কণ্ঠ, বিকুঞ্চিত মুখরন্ধ্র, এবং সমস্তের আয়তনের পরিমাণ-সৌষম্য; এইগুলি ঘটের মুখ্য অঙ্গ। এইরূপে, ঘটের মধ্য হইতে তাহার মুখ্য অবয়বগুলি বিবিক্ত করিয়া লওয়াকে বিবেচনা কহে।

মনে কর যেন, আমিই ঘটের প্রথম উদ্ভাবন-কর্ত্তা এবং লোক-মধ্যে তাহার ব্যবহার-প্রচারের আমিই আদি-গুরু। আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঘট উদ্ভাবন করিয়াছি, এইজন্য ঘট দেখিলেই একটি যুক্তি আমার মনে অতীব সুস্পষ্ট আকারে প্রতিভাত হয়। সে যুক্তি এই:—

যে-হেতু ইহা জল-ধারণ-ক্ষম কঠিন, স্ফীতোদর, হ্রস্ব-কণ্ঠ, বিকুঞ্চিত-মুখরন্ধ্র এবং আদ্যোপান্ত মানান্-সই, অতএব ইহা ঘট। যেহেতু এবং অতএবের মধ্যে এই যে যোগ, ইহারই নাম যুক্তি। যুক্তি-শব্দের অর্থ যে এক-প্রকার যোজনা-ক্রিয়া, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। কিসের সহিত কিসের যোজনা? যেহেতুর সহিত অতএবের যোজনা; অথবা যাহা একই কথা—প্রমেয়ের সহিত প্রমাণের যোজনা। প্রমাণ-শব্দের যে অর্থ কি—তাহাও তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। প্রমাণ কি? না, সম্মুখবর্ত্তী বিষয়ের মান-কার্য্য কিনা মাপন-কার্য্য। "হস্ত প্রসারণ করা" বলিলে বুঝায়—হস্তকে সম্মুখ-দিকে সারণ করা কিনা সরানো বা বাড়ানো। "প্রতাপ-স্ফূর্ত্তি" বলিলে বুঝায়—সম্মুখ-দিকে তাপের বা প্রভাবের স্ফূর্ত্তি। তেমনি "প্রমাণ" বলিলে বুঝায়—সম্মুখবর্ত্তী বিষয়ের মান-ক্রিয়া বা মাপন-ক্রিয়া। তাল-

প্রমাণ তরঙ্গ বলিলে বুঝায় যে, তরঙ্গ এত উচ্চে উঠিতেছে যে, তাহা তাল-গাছ দিয়া মাপিয়া দেখিবার বস্তু। কোনো বস্তুকে মাপিয়া দেখিতে হইলে তাহার গাত্রে মান-দণ্ড যোজনা করিতে হয়। যদি বলি যে, এই বস্ত্রখানি এত-হাত লম্বা, তবে তাহার প্রমাণ দেখাইতে হইলে, সেই বস্ত্রখানির দৈর্ঘ্য-অংশ বিস্তারিত করিয়া তাহাতে হস্ত-যোজনা করা আবশ্যক হয়। তেমনি, "এটা ঘট", ইহার প্রমাণ দেখাইতে হইলে, ঘটের গাত্রে ঘটত্বের যোজনা করিতে হয়;—ঘটত্বের যোজনা কিরূপ? না, ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটি ভাবকে ঘটের মুখ্য অবয়ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি—সেইগুলির একত্র সমাবেশ। বলিতেছ "এটা ঘট"—আচ্ছা দেখা যা'ক্ তোমার কথা কতদূর সত্য;—উহার উদর চৌকোণা বাক্সোর মতো—অতএব উহা ঘট নহে; উহার কণ্ঠ কুঁজার মতো দীর্ঘ—অতএব উহা ঘট নহে। পক্ষান্তরে এ বস্তুটার উদর স্ফীত, কণ্ঠ হ্রস্ব, মুখরন্ধ্র বিকুঞ্চিত, অতএব, এই বস্তুটাই ঘট। এই-রূপ দেখা যাইতেছে যে, বস্ত্রের দৈর্ঘ্য-অংশে হস্তযোজনা করিয়া আমরা যেমন বলি যে, বস্ত্রখানি এক-হাত লম্বা; তেমনি ঘটের গাত্রে ঘটত্বের ভাব যোজনা করিয়া যখন আমরা দেখি যে, ঐ বস্তুটির সহিত ঐ ভাবটির ঠিক্ মিল রহিয়াছে, তখন আমরা বলি যে, এটা ঘটই বটে। বস্ত্রের ব্যালায়—বস্ত্র প্রমেয়, মানদণ্ড প্রমাণ; ঘটের ব্যালায় ঘট প্রমেয়, ঘটত্ব প্রমাণ। বস্ত্রে মানদণ্ডের যোজনা এবং ঘটে ঘটত্বের যোজনা—দুইই প্রমাণ-শব্দের বাচ্য; এবং বিশেষত শেষোক্ত-প্রকার যোজনা—অর্থাৎ ঘটে ঘটত্বের যোজনা—যুক্তি-শব্দের বাচ্য।

মনে কর, আমি একটা ঘটের দোকান খুলিয়া, তাহাতে কাংস্য-ঘট, রৌপ্য-ঘট, মৃদ্ঘট প্রভৃতি নানাপ্রকার ঘট সাজাইয়া রাখিলাম। অচিরে আমার সেই দোকানে ক্রেতাগণের গমনাগমন হইতে লাগিল। একজন ক্রেতা আমার দোকানে আসিয়া বারবার কাংস্য-ঘট ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার দোকানে কাংস্য-ঘট যত ছিল, সব যখন উঠিয়া গিয়াছে, তখন সে ব্যক্তি পুনরায় আমার দোকানে ঘট ক্রয় করিতে আসিল। আমি তাহাকে একটা মৃত্তিকার ঘট দেখাইলাম; তাহা দেখিবামাত্র সে বলিল যে, এটা ঘটই বটে। এ যাহা সে বলিল—কিসের জোরে বলিল? আমিই যখন ঘটের নূতন সৃষ্টিকার, আর, ইতিপূর্ব্বে কোনো ক্রেতার নিকটে আমি যখন মৃদ্ঘটের কথা পর্য্যন্ত উত্থাপন করি নাই, তখন উপস্থিত ক্রেতা ইতিপূর্ব্বে মৃদ্ঘট চক্ষে দেখে নাই, ইহা নিঃসংশয়; অথচ আমি তাহার সম্মুখে একটা মৃদ্ঘট উপস্থিত করিবামাত্র, তৎ-ক্ষণাৎ সে বলিল, "এটা ঘটই বটে।" এ যাহা সে বলিল, কিসের জোরে বলিল? কিসের জোরে বলিল, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ক্রেতাটি আমার দোকানে আসিয়া অনেকবার অনেকগুলি কাংস্য-ঘট ক্রয় করাতে, ঘট যে কিরূপ বস্তু, সে-সম্বন্ধে তাহার মনোমধ্যে একটা সংস্কার বদ্ধ-মূল হইয়া গিয়াছে; মৃদ্ঘট দেখিবামাত্র সেই-তাহার-মনের-সংস্কারটি উপস্থিত মৃদ্ঘটে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিল। তাহার ভিতরের

সংস্কারটি ভিতর হইতে বাহিরে বিচরণ করিল—মনের মধ্য হইতে ঘটে বিচরণ করিল, আর অমনি সে বলিয়া উঠিল—"এটা ঘট"। ভাবের এইরূপ বিচরণ-ক্রিয়ার নাম বিচার; ইংরাজিতে যাহাকে বলে—Judgment। এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, সেই যে ঘটের ভাব, যাহা ক্রেতার নিজেরই মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহা যে কি, তাহা সে জানে না; কেন না, সে-ভাবটি তাহার মনের মধ্যে এখনো বিবেচনা দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। সে যখন বলিতেছে যে, "এটা ঘট", তখন তাহার সেই বিচারকার্য্যেতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, ঘটের ভাব তাহার মনোমধ্যে আছে। তাহা যে তাহার মনোমধ্যে আছে—এটা তাহার কাজে প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু তাহা যে কি, তাহা তাহার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে না। সে ব্যক্তি অভ্যস্ত সংস্কারের বলে ঠিক্‌ই বিচার করিয়াছিল যে, এটা ঘট; কিন্তু হইলে হইবে কি—তাহা একটা সংস্কার বই নহে। পরদিন তাহার একজন বন্ধু তাহাকে বলিল—"ওটা দেখ্‌চি হাঁড়ি!" ইহা শুনিয়া তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হওয়াতে, সে আমার দোকানে আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি আমাকে একটা হাঁড়ি দিয়াছ?" আমি তাহাকে বলিলাম যে, হাঁড়ির কণ্ঠ এরূপ কম-চওড়া হয় না, এবং হাঁড়ির ওষ্ঠ এরূপ বিকুঞ্চিত হয় না। তখন তাহার চক্ষু ফুটিল। প্রথমে তাহার মনে সহজেই এইরূপ একটা বিচার উপস্থিত হইয়াছিল যে, "এটা ঘট"; কিন্তু সে বিচার অন্ধ-সংস্কার-মূলক। এবারে তাহার মনে সেই বিচারই দৃঢ়তা-প্রাপ্ত হইল—কিন্তু এবারকার বিচার পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধ সংস্কার নহে; এবারকার বিচার বিবেচনাত্মক এবং যুক্তি-সম্ভাবিত। এবারে সে—ঘটত্ব কিসে হয়, তাহা বিবেচনা-দ্বারা নিষ্কাসন করিয়া এবং সেই ঘটত্বকে ঘটের সহিত যোজনা করিয়া যুক্তি-পূর্ব্বক বিচার করিল যে, এটা ঘট।

এখানে একটি অতি নিগূঢ় রহস্য আছে; সেটা একে তো বুদ্ধিতে আয়ত্ত করা কঠিন—তাহাতে আবার মনে বুঝিলেও, মুখে কিংবা লেখনীতে বাহির করা কঠিন। কিন্তু তাহা কঠিন বলিয়া তাহাকে সরাইয়া রাখা উচিত হয় না। আমের শাঁস সরস বলিয়া তাহার আঁটিও যে সরস হইবে, এরূপ মনে করা অন্যায়। এইটি এখানে বিবেচনা করা উচিত যে, ভূমিতে আমের আঁটি সমাধান করিলেই আম-গাছ গজাইয়া ওঠে; তাহার পরিবর্ত্তে আমের রস সিঞ্চন করিলে কোনো ফলই দর্শে না। বিষয়টা এই :—

অগ্নির দুই অঙ্গ—আলোক এবং উত্তাপ। যে অগ্নির উত্তাপই সর্ব্বস্ব, অথবা আলোকই সর্ব্বস্ব, সে অগ্নি অঙ্গহীন। যে অগ্নির উত্তাপ আছে—আলোক নাই, সে অগ্নি পরিস্ফুট অগ্নি নহে; তেমনি আবার, যে অগ্নির আলোক আছে—উত্তাপ নাই, সে অগ্নি কাজের অগ্নি নহে। অগ্নির যেমন দুই অঙ্গ—উত্তাপ এবং আলোক; বুদ্ধির তেমনি দুই অঙ্গ—শক্তি এবং জ্ঞান। বুদ্ধির বিচার-স্ফূর্ত্তি বা বিচরণ-স্ফূর্ত্তি তাহার শক্তিপ্রধান অঙ্গ এবং বিবেচনা তাহার জ্ঞানপ্রধান অঙ্গ। যে বুদ্ধির বিবেচনা অপেক্ষা বিচার-স্ফূর্ত্তি বেশী প্রবল—সে বুদ্ধি উপস্থিত বুদ্ধি।

যে বুদ্ধি বিচারে অপটু, কিন্তু বিবেচনায় সুনিপুণ, সে বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। না উপস্থিত বুদ্ধি—না বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি—অথচ দুইই একাধারে, এইরূপ তৃতীয় আর-এক-প্রকার বুদ্ধি আছে; তাহার নাম প্রতিভা। উপস্থিত বুদ্ধি বিচার-প্রধান; বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিবেচনা-প্রধান; প্রতিভা যুক্তি-প্রধান। যুক্তি-শব্দে এখানে বুঝিতে হইবে জ্যান্ত যুক্তি;—মৃত ন্যায়শাস্ত্রীয় যুক্তি বা পুঁথিগত যুক্তি বুঝিলে চলিবে না। একজন প্রতিভাশালী সুবিজ্ঞ চিকিৎসক যেরূপ যুক্তিতে রোগীর রোগনির্ণয় করেন, তাহা স্বতন্ত্র; এবং একজন বিবিধ ইংরাজি-সংস্কৃত উপাধি-মালায় বিভূষিত আনাড়ি চিকিৎসক যেরূপ যুক্তিতে রোগ নির্ণয় করেন, তাহা স্বতন্ত্র। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট্ যেরূপ যুক্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহ সাজাইতেন, তাহা স্বতন্ত্র এবং তাঁহার বিপক্ষদলের সেনাপতি যেরূপ যুক্তিতে ব্যূহ সাজাইতেন, তাহা স্বতন্ত্র। পুঁথিগত যুক্তি যুক্তির একপ্রকার ভাণ—তা বই তাহা প্রকৃত যুক্তি নহে।

বিচারই বুদ্ধির শক্তি-অঙ্গ। বিচার-প্রধান বুদ্ধি স্বীয় শক্তি-প্রভাবে উপস্থিত-মতে কার্য্যোদ্ধার করে বলিয়া তাহার নাম আমরা দিই—উপস্থিত বুদ্ধি। বিচার যেমন বুদ্ধির শক্তি-অঙ্গ—বিবেচনা তেমনি বুদ্ধির জ্ঞানাঙ্গ। বিচার বুদ্ধির হাত-পা—বিবেচনা বুদ্ধির চক্ষু। যে বুদ্ধিতে উপস্থিত বিচার এবং বৈজ্ঞানিক বিবেচনা, দুইই যুক্তি-সূত্রে গ্রথিত—তাহাই যুক্তি-প্রধান বুদ্ধি। যুক্তি-প্রধান বুদ্ধিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বুদ্ধি এবং তাহারই আর-এক নাম প্রতিভা। বিচার দক্ষিণ হস্তে কার্য্য করে, বিবেচনা বাম হস্তে কার্য্য করে; যুক্তি এক হস্তে দুই হস্তেরই কার্য্য করে। এ যাহা আমি রূপকচ্ছলে হেঁয়ালিচ্ছন্দে বলিলাম—ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, তাহা হইলেই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সকলেরই বোধগম্য হইবে। একটি শিশুকে আমরা বলি অবোধ শিশু; কেন না, তাহার বুদ্ধি এখনো পরিস্ফুট হয় নাই। তাহার বুদ্ধিরূপী অগ্নির উত্তাপ আছে, কিন্তু আলোক নাই। সেই অবোধ শিশুও বুদ্ধি-চালনা করিয়া মাতৃভাষা আয়ত্ত করে—শুদ্ধ-কেবল স্বাভাবিকী বিচারশক্তির প্রভাবে। একজন ইংরাজ বিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্‌লা-ভাষা শিক্ষা করিলেও, সে, বাঙ্‌লা-ভাষা রীতিমত আয়ত্ত করিতে পারে না; কিন্তু একটি বাঙালীর ছেলে সাত বৎসরের মধ্যেই বাঙ্‌লা-ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফ্যালে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, স্বাভাবিক বিচার-স্ফূর্ত্তির শক্তি বেশী—যদিচ তাহার দৃষ্টি কম। তাহার পরে, যে মাতৃভাষা বালক পিত্রালয়ে শিখিয়াছে, তাহাই বিদ্যালয়ে নূতন করিয়া শেখে। বিদ্যালয়ে বালকের বিবেচনা মার্জ্জিত হয়—দৃষ্টি মার্জ্জিত হয়। তাহা যখন হয়—তখন বালক তাহার পূর্ব্ব-শিক্ষিত মাতৃভাষা হইতে ভাষার মুখ্য অঙ্গগুলি ক্রমে ক্রমে বিবিক্ত করিয়া লয়। তখন সে বুঝিতে পারে—ভাষা পদার্থটা কি। কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিলেও—একখানি পত্র লিখিতে তাহার বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। তাহার যেমন

বিবেচনা কতকটা ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে—তাহার বিচার-শক্তিও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়া চাই—কিন্তু তাহা তাহার এখনো হয় নাই। পিত্রালয়ে বালক স্বাভাবিকী বিচার-শক্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল; বিদ্যালয়ে মার্জ্জিত বিবেচনা-দৃষ্টি উপার্জ্জন করিল। তাহার পরে সে যখন বিদ্যালয় হইতে কর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিল, তখন সে যুক্তি-দ্বারা স্বাভাবিক বিচার এবং শিক্ষিত বিবেচনা, দুয়ের যোগ-বন্ধন করিয়া সাধুভাষায় চিঠিপত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিল। যুক্তি-দ্বারা বিচার এবং বিবেচনার মধ্যে এই যে যোগবন্ধন, ইহার কতক আভাস ইতিপূর্ব্বে আমি জ্ঞাপন করিয়াছি;—তাহা আর কিছু না—যেহেতু'র সহিত অতএবের যোগবন্ধন। যেহেতু এ পত্রখানি বিষয়-কর্ম্ম-ঘটিত—অতএব ইহার উত্তর দিতে হইবে সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জল ভাষায়; যেহেতু এ পত্রখানি বাড়ী'র লোকের নিকট হইতে আসিয়াছে, অতএব ইহার উত্তর দিতে হইবে ঘরাও ভাষায়। যেহেতু এ পত্রখানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত, অতএব ইহার উত্তর দিতে হইবে বৈজ্ঞানিক ভাষায়। উপযুক্ত ভাষা দ্বারা সুনিপুণরূপে কাজ চালাইতে হইলে—শুদ্ধ-কেবল অন্তঃপুরের অশিক্ষিত বিচার-স্ফূর্ত্তি দ্বারাও তাহা সম্ভাবনীয় নহে, আর, শুধু-কেবল পুঁথিগত বৈয়াকরণিক শুদ্ধাশুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারাও তাহা সম্ভাবনীয় নহে। কাজের সময়, অশিক্ষিত বিচার এবং শিক্ষিত বিবেচনা, দুয়ের মধ্যে পদে পদে যোগ-বন্ধন করা নিতান্তই প্রয়োজনীয়; অতএব এবং যেহেতুর মধ্যে পদে পদে যোগ-বন্ধন করা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। কাজের লোক হইতে হইলে, বালক হইলেও চলিবে না, ভট্টাচার্য্য হইলেও চলিবে না। নিজের বুদ্ধি-অনুসারে পদে পদে যেহেতু এবং অতএবের সহিত যোগ-বন্ধন করিতে না পারিলে, কাজের মতো কোনো কাজ কাহারো কর্ত্তৃক সম্ভাবনীয় নহে।

বালক যখন পিত্রালয় হইতে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির জ্ঞানোপার্জ্জন-পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়, তখন সে নূতন ব্রতী নব নব বিদ্যার আলোকে অন্ধ হইয়া অন্তঃপুরের অশিক্ষিত সহজ জ্ঞানকে আগাগোড়া কুসংস্কার বলিয়া মনে মনে ঠিক্ দিয়া রাখে, এবং সমস্তেরই প্রতিবাদ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেই বালক যখন আর-কিছু-কাল পরে কর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিয়া শিক্ষিত বিদ্যাকে পরীক্ষানলে গলাইয়া তাহাকে কাজে খাটায়, তখন সে অন্তঃপুর-মহলের অকৃত্রিম সহজজ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে। তখন সে বুঝিতে পারে যে, অন্তঃপুর-সদনের এবং কৃষক-পল্লীর নৈসর্গিক সহজজ্ঞানের মূল্য এক হিসাবে যেমন পণ্ডিতের মার্জ্জিত জ্ঞান অপেক্ষা অনেক কম, আর-এক হিসাবে তেমনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। যাঁহারা আজীবন চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ পড়িয়া প্রৌঢ়বয়সে অসামান্য বৈয়াকরণিক হইয়া উঠেন, আর, সেই ব্যাকরণ-জ্ঞানকে মহাজ্ঞান মনে করিয়া সভামধ্যে বুক ফুলাইয়া বেড়া'ন, তাঁহারা একেবারেই কাজের বা'র হইয়া যা'ন।

পক্ষান্তরে, যাঁহারা শিক্ষিত ব্যাকরণ-জ্ঞানকে ব্যবহার্য্য-ভাষার গায়ে মাখাইয়া সেই ভাষাকে কাজের ভাষা করিয়া দাঁড় করা'ন, আর, সেই ফলপ্রসবিনী ভাষার ব্যবহারে ক্রমে যখন তাঁহাদের হাত পাকিয়া ওঠে, তখন তাঁহাদের ভাষা ফিরেফির্তি আবার বালকের ভাষার ন্যায় স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের আকার ধারণ করে। অন্তঃপুর-সদনের এবং কৃষক-পল্লীর ভাষা সকল সময়ে ব্যাকরণ-সঙ্গত না হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে বক্তার মনের ভাব এরূপ অকৃত্রিম সহজ-শোভন ভাবে উদ্বেলিত হয় যে, কবির নিকটে তাহার মূল্য আঁটাসাঁটা পোষাক-পরাণো কৃত্রিম ভাষা অপেক্ষা শতসহস্র-গুণ অধিক। প্রথম ধাপের অশিক্ষিত ভাষাতে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের ভাবই—ফোয়ারার ভাবই—প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয় ধাপের বিদ্যাবাগীশী ভাষাতে বন্ধনের ভাব—নিয়মের ভাব—ব্যবস্থার ভাব—প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায়; তৃতীয় ধাপের পরিপক্ব ভাষাতে, উচ্ছ্বাসের ভাব এবং বন্ধনের ভাব, দুইই একাধারে স্ফূর্ত্তি পায়; আর, সেই-কারণ-বশত তৃতীয় ধাপের ভাষাতে নীচের দুই ধাপের ভাষার দুইপ্রকার গুণ দ্বিগুণ হইয়া উঠে, এবং দুইপ্রকার দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। প্রথম ধাপের ভাষার গুণ অকৃত্রিম স্ফূর্ত্তি—দ্বিতীয় ধাপের ভাষার গুণ সুব্যবস্থা। তৃতীয় ধাপের ভাষায় দুয়ের ঐ দুই গুণ একত্র জমাট্ বাঁধিয়া যায়; আর সেই সঙ্গে দুয়ের দুই দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। প্রথম ধাপের ভাষার দোষ হ'চ্চে—অব্যবস্থিত স্ফূর্ত্তি; সে দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়; এবং দ্বিতীয় ধাপের ভাষার দোষ হ'চ্চে—কৃত্রিম কারিকরি; তাহাও প্রক্ষালিত হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্তটির মধ্যে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, প্রথম ধাপের ভাষাজ্ঞান বিচার-প্রধান উপস্থিত বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়; দ্বিতীয় ধাপের ভাষাজ্ঞান বিবেচনা-প্রধান বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়; তৃতীয় ধাপের ভাষাজ্ঞান যুক্তিপ্রধান ব্যুৎপন্ন বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, স্বাভাবিক বিচার-স্ফূর্ত্তি বুদ্ধির শক্তি-প্রধান অঙ্গ; বিবেচনার নিয়ম-বন্ধন বুদ্ধির ভাবনা-প্রধান অঙ্গ; এবং দুয়ের একত্র সমাবেশ-জনিত প্রয়োগ-নৈপুণ্য বুদ্ধির যুক্তি-প্রধান পূর্ণাবয়ব।

যতদূর সহজ প্রণালীতে বুদ্ধির অঙ্গ-নির্ব্বাচন করা সম্ভবে—উপরে তাহা আমি সাধ্যমতে করিলাম। ভাষার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম কেন? না, যেহেতু ভাষা বুদ্ধিরই সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি। তার সাক্ষী—জ্ঞানগর্ভ ভাষা শ্রবণ করানোর নামই বুদ্ধি-দান করা; আর, জ্ঞানগর্ভ ভাষা শ্রবণ করার নামই বুদ্ধি-গ্রহণ করা। ভাষাকে ছাড়িয়া বুদ্ধিকে নাগাল পাওয়াও কঠিন—আর, ভাষা-বায়ুর সাহায্য ব্যতিরেকে বুদ্ধির আগুন ধরানোও কঠিন। এইজন্য বুদ্ধির ব্যাপার বুঝিবার এবং বুঝাইবার পক্ষে ভাষার দৃষ্টান্ত খুব কাজে লাগে। Logic শব্দ Logos শব্দ হইতে হইয়াছে। Logos শব্দের অর্থ Reason এবং language দুইই একাধারে।

এতক্ষণের আলোচনায়, বুদ্ধির তিনটি মুখ্য অবয়বের সন্ধান পাওয়া গেল; সে তিনটি অবয়ব হ'চ্চে—বিচার, বিবেচনা এবং যুক্তি। বিচার কি? না, বিচরণ; মনের ভাব হইতে লক্ষ্য-বস্তুতে বিচরণ—অথবা মনের ভাবকে লক্ষ্য-বস্তুতে চারাইয়া দেওয়া। তাহা আর কিছু না—"এটা ঘট" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঘটত্বের ভাবকে সাক্ষাৎ-পরিদৃশ্যমান ঘটে প্রতিফলিত দেখা। বিবেচনা কি? না, দৃশ্যমান ঘট হইতে ঘটের ভাবকে বিবিক্ত করিয়া (অর্থাৎ বিযুক্ত করিয়া) দেখা। যুক্তি কি? না, ঘটত্বের ভাব দিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটকে মাপিয়া দেখা। যুক্তিতে বিবেচনা এবং বিচার, দুইই একযোগে স্ফূর্ত্তি পায়; আর, এক-যোগে স্ফূর্ত্তি পায় বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে যুক্তি। একজন পাকা জহরী প্রথমত "ভাল হীরা" কাহাকে বলে, তাহা জানে—এইরূপ জানা বিবেচনার কার্য্য; দ্বিতীয়ত হীরা দেখিলেই বলিতে পারে যে, এটা অমুক মূল্যের হীরা; এইরূপ বলিতে পারা বিচার-শক্তির কার্য্য। তৃতীয়ত কিরূপ ক্রেতাকে কিরূপ হীরা গছাইতে হইবে—ইহা ঠিক্ করা যুক্তির কার্য্য। যুক্তিতে বিবেচনা এবং বিচার, যেহেতু এবং অতএব, দুইই একযোগে কার্য্য করে।

বুদ্ধির অঙ্গ-নির্ব্বাচন মাত্র করিয়াই এ-যাত্রা ক্ষান্ত হইতেছি; বুদ্ধির ভিতরে মন এবং প্রাণ কি-ভাবে সম্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা বারান্তরের আলোচনার জন্য রহিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন ও বৃষ্টি।

তরুলতাচিহ্নরহিত উন্মুক্ত প্রান্তর অপেক্ষা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অধিক বৃষ্টিপাত হয়,—এই কথাটা আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এই উক্তির মূলে কতটা সত্য আছে, বিজ্ঞানগ্রন্থে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা বড়-একটা দেখা যায় না।

বৃহৎ-দেশের বৃষ্টিবাত্যাদি-সম্বন্ধীয় অবস্থা যে ভৌগোলিক অবস্থান ও বাণিজ্যবায়ু (Trade-winds) প্রভৃতি স্থায়ী বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতের পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতশ্রেণীতে দক্ষিণপশ্চিমের বায়ুপ্রবাহচালিত মেঘরাশি

বাধাপ্রাপ্ত হয়,—এবং তাহারই ফলে ঘাটসন্নিহিত স্থানে প্রচুর বারিপাত দেখা যায়। এইজন্যই দাক্ষিণাত্যের বার্ষিক বারিপাত-পরিমাণ গড়ে ত্রিশ ইঞ্চির অধিক না হইলেও, ঘাটের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের বারিপাত প্রায়ই ৮০ ইঞ্চিরও অধিক হইয়া পড়ে।' কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্টস্থানের কয়েকবর্গমাইলবিস্তৃত বনভূমি এবং ঠিক্ সেই স্থানেরই সম-আয়তন-বিশিষ্ট একটি উন্মুক্ত প্রান্তরের বার্ষিক বারিপাত-পরিমাণ তুলনা করিলে উভয়ের যে একতা দেখা যাইবে, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না,—পরীক্ষা করিলে বনাবৃত-ভূমির বারিপাত-পরিমাণ, উন্মুক্ত প্রান্তরে পতিত বৃষ্টির তুলনায় নিশ্চয়ই অধিক দেখা যাইবে।

এখন দেখা যাউক, বৃক্ষশূন্যস্থান অপেক্ষা বনভূমিতে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণ কি। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, মিছ্‌রি বা ফট্‌কিরি প্রভৃতি কোন দানাদার পদার্থ জলে মিশ্রিত করিলে এবং তাহাতে উক্ত পদার্থের মিশ্রণ প্রচুর হইলে,—সেই পদার্থই আবার জলের মধ্যে আপনিই দানা বাঁধিয়া যায়। কিন্তু সেই মিশ্রিত পদার্থটাকে যদি স্থির রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাতে প্রায়ই দানা সঞ্চিত হয় না;—দানা বাঁধাইবার জন্য বাহির হইতে একটা উত্তেজনা আবশ্যক। সেই উত্তেজনা দ্বারা একবার দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিলে, জলমিশ্রিত সমস্ত পদার্থটা ক্রমে দানাময় হইয়া যায়। এইজন্য মিছ্‌রি প্রস্তুত করিতে হইলে, দানা উৎপাদনের উত্তেজনাস্বরূপ একখণ্ড সূত্র চিনির রসে নিক্ষেপ করিতে হয়; এবং প্রচুর-ফট্‌কিরি-মিশ্রিত জল হইতে জমাট ফট্‌কিরি পুন উৎপন্ন করিতে হইলে, মিশ্র পদার্থটাকে কিঞ্চিৎ আলোড়িত করা বা তাহাতে তজ্জাতীয় একখণ্ড দানাদার পদার্থ নিক্ষেপ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের অত্যুচ্চ বৃক্ষসকল, প্রচুর-জলীয়বাষ্পপূর্ণ মেঘে,—সেই চিনির রসে নিক্ষিপ্ত সূত্রের ন্যায় কার্য্য করে। যখন আকাশের নিম্নস্তরস্থ বর্ষণোন্মুখ মেঘরাশি বায়ুপ্রবাহে চলিতে থাকে, বর্ষণের জন্য তখন ইহাতে আর নূতন বাষ্পসঞ্চারের আবশ্যকতা থাকে না; বর্ষণারম্ভের জন্য কেবল একটা উত্তেজনার অভাব থাকিয়া যায় মাত্র। তা'র পর উচ্চ বৃক্ষশিরে আহত হইয়া সেই উত্তেজনা প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত মেঘই বনভূমিতে বর্ষণ করিতে থাকে।

এতদ্ব্যতীত যে কারণে বায়ুচালিত মেঘরাশি পর্ব্বতপার্শ্বে প্রতিহত হইয়া প্রচুর বারিবর্ষণ করে, সেটাকেও আরণ্যভূমির বর্ষণাধিক্যের কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে,—এইপ্রকার বর্ষণ উপকূলস্থ বনভূমি ও অরণ্যবহুল দ্বীপে প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে।

এই ত গেল বাহ্যশক্তিজাত বর্ষণাধিক্যের কথা। ইহা ছাড়া বনভূমিতে অধিক বর্ষণের আরো কতকগুলি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রৌদ্রতাপে বনভূমির বৃক্ষপত্রাদি হইতে প্রতিদিন যে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া আকাশস্থ হয়, তাহার পরিমাণ এত অধিক যে, সেই বাষ্প মেঘাকারে পরিণত হইয়া বর্ষণ করিলে, তথাকার দৈনিক বারিপাতের পরিমাণ প্রায় এক-ইঞ্চি হইয়া

পড়ে। পত্রকাণ্ডাদি হইতে প্রতিদিন কি পরিমাণে জলীয়-বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য একটা সুন্দর পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই পরীক্ষায় প্রথমে কোন এক সজীব বৃক্ষশাখা একটা জলপূর্ণ বৃহৎ-পাত্রে অহোরাত্র নিমজ্জিত রাখা হয় এবং পাত্রে কি-পরিমাণ জল আছে, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখা হয়। তা'র পর উক্ত সজীব শাখার শোষণজনিত পাত্রের জল কতটা কম পড়িল, তাহা ঠিক্ করা হইয়া থাকে। এই পরীক্ষাপদ্ধতিক্রমে গণনা করিলে দেখা যায়,—একটি পরিণত বৃক্ষ ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রতিদিনই প্রায় ৫৫মণ জল পত্রমূলাদি দ্বারা শোষণ করিয়া লয় এবং ঠিক্ সেই-পরিমাণ জলই প্রতিদিন বাষ্পাকারে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে।

স্থানীয় উষ্ণতা এবং পরীক্ষাস্থলের বায়ু ও আকাশের অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্ত্তনের সহিত উৎপন্ন বাষ্পের পরিমাণও পরিবর্ত্তিত হয়,—এইজন্য পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষালব্ধ গণনায় অল্পাধিক ভ্রম, অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বৃক্ষের পত্রকাণ্ডাদি হইতে প্রতিনিয়তই যে প্রভূত জলীয়-বাষ্প আকাশস্থ হইয়া মেঘোৎপত্তির সহায়তা করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৎসরের নানা সময়ে শীতপ্রধান দেশের অরণ্যতলের অবস্থা পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বোক্ত উক্তির সত্যতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শীতকালে ঐ সকল আরণ্যভূমির অধিকাংশ স্থানই যেন সদ্যোবর্ষণে সিক্ত থাকে, কিন্তু অপর ঋতুতে, এমন কি বর্ষা-কালেও, তথায় তদ্রূপ আদ্রতা দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঋতুবিশেষে শীতপ্রধান-দেশজ উদ্ভিদের জলশোষণশক্তির অত্যধিক হ্রাসবৃদ্ধি হয় বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত বিসদৃশ ঘটনাটি আমরা দেখিতে পাই। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সত্য, কিন্তু সেই ঋতুতে বৃক্ষাদির জৈবক্রিয়া পূর্ণভাবে চলিতে থাকে, কাজেই ভূশোষিত হওয়ার পর যে জল উদ্বৃত্ত থাকে, তাহার সকলই উদ্ভিদমূল দ্বারা শোষিত হইয়া যায়, অরণ্যতলে জল সঞ্চিত থাকিতে পারে না। যদি তলসঞ্চিত জলের তুলনায় বৃক্ষের পত্রকাণ্ডাদিস্থ স্থান অল্প হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও জলশোষণের বিরাম হয় না,—উদ্ভিদসকল স্বতই সদ্য-উদ্গত শাখাপত্রাদিতে ভূষিত হইয়া সমগ্র জলের স্থান-সংকুলান করিয়া লয়। এইপ্রকারে অতিবর্ষণ-সত্ত্বেও অরণ্যতল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের অধিকাংশ উদ্ভিদকে শীতের প্রারম্ভ হইতেই ভ্রষ্টপত্র হইয়া সুপ্তাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়, এই সময়ে ইহাদের মূলের আর পূর্ব্ববৎ রসাকর্ষণ-শক্তি থাকে না,—কাজেই হীনবীর্য্য-সৌর-কিরণে বাষ্পীভূত এবং ভূশোষিত হওয়ার পর যে জল উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা ক্রমে সঞ্চিত হইয়া অরণ্যতলটাকে আর্দ্র করিয়া তোলে। যে সকল বৃক্ষের শোষণাভাবে বর্ষণবিরল শীতকালেও অরণ্যতল পঙ্কিল হইয়া পড়ে এবং অজস্র-বারিপাত-সত্ত্বেও যে সকল বৃক্ষের জলশোষণশক্তিসাহায্যে বর্ষাকালেও বনভূমি শুষ্কপ্রায় থাকিয়া যায়, সেই সকল আরণ্যবৃক্ষ দ্বারা প্রতিদিন কত জল শোষিত হইয়া বাষ্পীভূত হই-তেছে, তাহা বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণ এখন কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—অসংখ্য-আরণ্য-বৃক্ষ-পরিত্যক্ত উল্লিখিত বিশাল বাষ্পরাশি বনভূমির বর্ষণাধিক্যের আর একটা কারণ। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন,—এক সীমাবদ্ধ স্থানের নির্দ্দিষ্টপরিমাণ বাষ্পরাশি জমাইয়া তরলীভূত করিবার স্থূলত দুইটি উপায় আছে। প্রথম চাপপ্রয়োগ, দ্বিতীয় শৈত্যসংযোগ। একটা গোলকের মধ্যবর্ত্তী আবদ্ধ বাষ্প বরফদ্বারা শীতল কর, শৈত্যের পরিমাণ প্রচুর হইলে, বাষ্প জমিয়া যাইবে। আবার সেই বাষ্প সঙ্কুচিত করিয়া বা বাহির হইতে গোলকে আরো বাষ্প প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহার চাপবৃদ্ধি কর, তাহা হইলেও দেখিবে, বাষ্প তরলীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আকাশ প্রচুর মেঘে আচ্ছন্ন, কিন্তু বর্ষণ নাই,—ইহার কারণও পূর্ব্বোক্ত চাপ বা শৈত্যের অভাব ব্যতীত আর কিছুই নয়। শীতল-বায়ু-সংস্পর্শাদি কারণে সেই বাষ্পরাশির তাপের হ্রাস হইলে বা নূতন বাষ্প সঞ্চারিত হইয়া তাহার চাপবৃদ্ধি করিলে, সেই মেঘই আবার জলে পরিণত হইয়া বর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উষ্ণতাধিক্য বা চাপস্বল্পতা প্রযুক্ত বর্ষণের অনুপযোগী উল্লিখিত মেঘসকল যখন বায়ুবিতাড়িত হইয়া বনভূমির উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, আরণ্যবৃক্ষপরিত্যক্ত সেই প্রভূত বাষ্পরাশি তাহাতে সংযুক্ত হইয়া বর্ষণোপযোগী চাপের অভাব পূরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তদ্দ্বারা বনভূমিতে প্রচুর বারিপাত হইয়া যায়।

বাষ্পীভূত হইবার সময় পদার্থমাত্রেরই তাপের ক্ষয় হয়—স্নানের পর গাত্রসংলগ্ন জল শারীরিক ও বাহ্যিক তাপে বাষ্পীভূত হইবার সময়, সেই তাপের অনেকটা আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, এইজন্য আমরা স্নানান্তে বেশ একটা শৈত্য অনুভব করিতে পারি। সেইপ্রকারে বৃক্ষপত্রাদিস্থ জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হইবার সময় আরণ্যভূমির উপরিস্থ বায়ুরাশির অধিকাংশ তাপই অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং কাজেই তদ্দ্বারা আরণ্যবায়ুতে একটা স্নিগ্ধতার উৎপত্তি হয়। এই স্নিগ্ধতা বনভূমির বর্ষণাধিক্যের অন্যতম-কারণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘরাশি ভাসিতে ভাসিতে বনভূমির উপরিস্থ সেই শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিবামাত্র তাহার উষ্ণতার হ্রাস হইয়া যায়,—কাজেই এই অবস্থায় বনভূমিতেই অধিক বর্ষণ হইয়া পড়ে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

নিদ্রিতা।

এতদিন সমাদরে রাখিয়াছি হৃদে ধরে'
যতনে সোহাগে
দুঃখময় ধরণীতে ভয় হয় জাগাইতে
পাছে ব্যথা লাগে।
নিমীলিত আঁখিপাতা কি রহস্য কোন্ কথা
রয়েছে গোপন।
মুখখানি মাঝে মাঝে কেন রাঙা হয় লাজে
কি দেখে স্বপন!
গতজন্মে বুঝি কারে দিয়েছিল বারেবারে
বেদনা কঠোর,
তারি প্রেম-অভিশাপে এ জনম তাই যাপে
স্বপন-বিভোর!
ইহা যদি সত্য হয়, জাগো দেবি ত্যজ ভয়,
সে নহে প্রেমিক।
প্রণয়ী কাঁদিতে আসে আঁখিজল ভালবাসে
চাহে না অধিক!
একবার আঁখি মেলি দেখে লহ সত্যগুলি
কেমন ধরণী?
তোমার ও স্বপ্ন-পুরে, এরাই কি ফিরে-ঘুরে,
সব কি এমনি?
নিশিদিন দুই জনে, দেখা দেয় নিশিদিনে,
আলো ও আঁধার?
হেথাকার মত সেথা, আছে কি গো বিভিন্নতা,
গরল-সুধার?
ফুটে' ফুল ঝরে' যায়, কেঁদে কি মলয়-বায়
তোলে হাহাকার?

কাঁদিয়া জানালে ব্যথা বল দেবি কভু সেথা
হয় প্রতিকার!
হেথাকার মত প্রাণে বসন্ত কি নাহি আনে
নব জাগরণ,
ফুলের প্রফুল্লহাস, কোকিলের কুহুভাষ,
মত্ত সমীরণ?
সেথাও উল্লাসরোল, শিশুর মধুর বোল,
প্রেম-আলাপন
শ্মশানের চিতাধূমে সহসা কি চিরঘুমে
হয় সমাপন?
লহ প্রাণ, ভিক্ষা মাগি, একবার উঠ জাগি'
বল দুটি কথা,
তার পরে চিরতরে লহ মোরে সাথি করে'
সাধিব না বৃথা!

শ্রীহরিহরপ্রসাদ ঘোষ।

প্রাচীন ভারতের "একঃ"।

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন—সেই এক। সেই পুরুষে—সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

হে সৌম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসবৃক্ষে আসিয়া স্থির হয়, তেমনি এই যাহা কিছু, সমস্তই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নদী যেমন নানা বক্রপথে—সরলপথে, নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা নির্ঝরধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধা-বিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়—মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্য-স্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলি এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ডখণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণু-পরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যুবিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া,—অন্তহীন তৃষ্ণার

দ্বারা তাড়িত হইয়া,—পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য্য-বায়ু-বজ্র-মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্ভ্রান্ত হইতেছিল?

এমন সময় সেই অন্তবিহীন পথপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ দিশাহারা পথিক শুনিতে পাইল—পথের প্রান্তে ছায়া-নিবিড় তপোবনে গম্ভীর মন্ত্রে এই বার্ত্তা উদ্গীত হইতেছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন—সেই এক। সেই পুরুষে—সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কষ্ট দূর হইয়া গেল। তখন অন্তহীন কার্য্য-কারণের ক্লান্তিকর শাখা-প্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বলিল—

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।

বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একধাই দেখিতে হইবে। সহস্র বিভীষিকা ও বিস্ময়ের মধ্যে দেবতাসন্ধানশ্রান্ত ভক্তি তখন বলিল—

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবের পালনকর্ত্তা—এই একই সেতুস্বরূপ হইয়া সকল লোককে ধারণ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন। বাহিরের বহুতর আঘাতে-আকর্ষণে ক্লিষ্ট-বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সেই যে এক, তিনিই সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতেই প্রিয়। মুহূর্ত্তেই বিশ্বের বহুত্ববিরোধের মধ্যে একের ধ্রুবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল,—একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্য্যে গাঁথিয়া তুলিল।

শিশির-নিষিক্ত শীতের প্রত্যূষে পূর্ব্বদিক্ যখন অরুণবর্ণ, লঘুবাষ্পাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসন্ন জাগরণের একটি অখণ্ড শান্তি বিরাজমান,—যখন মনে হয়, যেন জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, এখনো সেই বিশ্বগেহিনী তাঁহার বিপুল গৃহের অসংখ্যজীবপালনকার্য্য আরম্ভ করেন নাই, তিনি যেন, দিবসারম্ভে ওঙ্কারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্মন্দিরের উদ্ঘাটিত স্বর্ণতোরণদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন—তখন যদি চিন্তা করিয়া দেখি, তবে প্রতীতি হইবে, সেই নির্জ্জন নিঃশব্দ নীহারমণ্ডিত প্রান্তরের মধ্যে প্রয়াসের অন্ত নাই। প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র চেষ্টা নিরন্তর, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজন-বিযোজন–আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য্য বিশ্রামবিহীন। অথচ এই অশ্রান্ত অপরিমেয় কর্ম্মব্যাপারের মধ্যে শান্তি-সৌন্দর্য্য অচল হইয়া আছে। অদ্য এই মুহূর্ত্তে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে যে প্রচণ্ড-

গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারিদিক্‌কে কি নিভৃত এবং নিজেকে কি একাকী বলিয়া মনে হয়! অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান! এ কি অপরূপ আশ্চর্য্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জ্জনতা! কত জ্যোতির্ম্ময় এবং কত জ্যোতিহীন মহাসূর্য্যমণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্পসংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি-উচ্ছ্বাস—তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে—একান্ত নির্জ্জনে রহিয়াছি—শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই! এমন সম্ভব হইল কি করিয়া? ইহার কারণ—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কি ভয়ঙ্কর! বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি এক-সূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তিসকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত হইয়া না থাকে, তবে তাহা কি করাল, তবে বিশ্বসংসার কি অনির্ব্বচনীয় বিভীষিকা! তবে আমরা দুর্দ্ধর্ষ জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি? এই মহা-অপরিচিত, যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মত অনুভব করিতেছি! এই যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আছি, ইহার মধ্যে সংযোজন-

শক্তি প্রবলবেগে শূন্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে শক্তি আমাদের কাছে কথাটিমাত্র কহিতেছে না, শব্দটিমাত্র করিতেছে না। অদ্য এই মুহূর্ত্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাসমুদ্রে যে লক্ষলক্ষ তরঙ্গ সগর্জ্জন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, শতসহস্র নদনদীনির্ঝরে যে কল্লোল উঠিতেছে, অরণ্যে-অরণ্যে যে আন্দোলন, পল্লবে-পল্লবে যে মর্ম্মরধ্বনি, আমরা তাহার কি জানিতেছি! বিশ্বব্যাপী যে মহাকর্ম্মশালায় দিবারাত্রি লক্ষকোটি জ্যোতিষ্ক-দীপের নির্ব্বাণ নাই, তাহার অনন্ত কলরব কাহাকে বধির করিয়াছে,—তাহার প্রচণ্ড প্রয়াসের দৃশ্য কাহাকে পীড়িত করিতেছে? এই কর্ম্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহদ্‌ভাবে দেখি, তখন দেখি, তাহা চিরদিন অক্লান্ত, অক্লিষ্ট, প্রশান্ত, সুন্দর—এত কর্ম্মে, এত চেষ্টায়, এত জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিহ্নিত, চিহ্নিত, ভারাক্রান্ত হয় নাই। চিরদিনই তাহার প্রভাত কি সৌম্যসুন্দর, তাহার মধ্যাহ্ন কি শান্তগম্ভীর, তাহার সায়াহ্ন কি করুণ-কোমল, তাহার রাত্রি কি উদার-উদাসীন! এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি এবং সৌন্দর্য্য, এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সঙ্গীত কি করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার এক উত্তর এই যে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ—

মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন—সেই এক। সেইজন্যই বৈচিত্র্যও সুন্দর এবং বিশ্বকর্ম্মের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজমান।

বিযোজনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা এই আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্য-লোক-নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-অখণ্ড ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোকলোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত-পৃথক্কৃত করিতেছে, আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভরে আরামে বসিয়া আছি, তাহার ভীষণ সত্তাকে জানিতেও পারিতেছি না—সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট্ ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা খেলিতেছি, গৃহনির্ম্মাণ করিতেছি—এ আমাদের কে? ইহাকে প্রশ্ন করিলে এ কোনই উত্তর দেয় না। ইহা দিকে-দিকে আকাশ হইতে আকাশান্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া শতধা-সহস্রধা চলিয়া গেছে—এই মূক মূঢ় মহা-বহুরূপীর সঙ্গে কে আমাদের এমন প্রিয়, পরিচিত, আত্মীয়সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন? তিনি—যিনি,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

এই একক্কে আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তি-স্বরূপে দেখিতেছি, তেমনি মানুষের সংসারের মধ্যে সেই স্তব্ধ একের ভাবটি কি? সেই ভাবটি মঙ্গল। এখানে আঘাত-প্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে সুখদুঃখ, বিরহ-মিলন, বিপৎসম্পদ্, লাভক্ষতিতে সংসারের সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য—এই সংগ্রামের মধ্যে সেই এক নিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেইজন্যই নানা বিরোধ-বিদ্বেষের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যজাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে যতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি, ততই তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। যেমন খণ্ডভাবে আমরা জগতের মধ্যে অসংখ্য কদর্য্যতা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত জগৎ মহাসৌন্দর্য্যে প্রকাশিত—তেমনি খণ্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিচ্ছিন্ন মঙ্গল-সূত্রে চিরদিন ধৃত হইয়া আছে। ইহার অংশের মধ্যে কত অশান্তি—কত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবু দেখি, ইহার সমগ্রের মঙ্গল-আদর্শ কিছুতে নষ্ট হয় না। সেই-জন্য মানুষ সংসারকে এমন সহজে আশ্রয় করিয়া আছে। এত বৃহৎ লোকসংঘ, এত অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল স্বার্থ-সংঘাত, তবু এ সংসার রমণীয়, তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না। ইহার দুঃখতাপও মহামঙ্গলসঙ্গীতের একতানে অপূর্ব্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে—কেন না,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতিক্ষণে খণ্ড-খণ্ড করি বলিয়াই সংসারতাপ দুঃসহ হয়। সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান্ একের মধ্যে গ্রথিত করিতে পারিলে, সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সমস্ত হৃদয়বৃত্তি—সমস্ত কর্ম্মচেষ্টাকে তাঁহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে কোন্ বাধার

আমার অধীরতা, কোন্ বিঘ্নে আমার নৈরাশ্য, কোন্ লোকের কথায় আমার ক্ষোভ, কোন্ সক্ষমতায় আমার অহঙ্কার, কোন্ বিফলতায় আমার গ্লানি! তাহা হইলেই আমার সকল কর্ম্মের মধ্যেই ধৈর্য্য ও শান্তি, সকল হৃদ্বৃত্তির মধ্যেই সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল উদ্ভাসিত হয়, দুঃখতাপ পুণ্যে বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাতবেদনা মাধুর্য্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তখন সর্ব্বত্র সেই শুদ্ধ একের মঙ্গলবন্ধন অনুভব করিয়া সংসারে দুঃখের অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য করি না—দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে, অভাবের মধ্যে নতমস্তকে তাঁহাকেই স্বীকার করি—যাঁহার মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে সমস্ত জগৎসংসারের সমস্ত দুঃখতাপের সমস্ত তাৎপর্য্য অখণ্ড মঙ্গলে পরিসমাপ্ত হইয়া আছে।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, যে ইঁহাকে নানা করিয়া দেখে।

খণ্ডতার মধ্যে কদর্য্যতা, সৌন্দর্য্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই এককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধনজনমান বড় আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্ব-রথ-ইষ্টক-কাষ্ঠ মর্য্যাদালাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিজেকে খণ্ড-খণ্ড করিতে থাকি, এবং মৃত্যু যখন আমাদের এই ভাণ্ডারদ্বার হইতে আমাদিগকে অকস্মাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই শেষ মুহূর্ত্তে সমস্ত জীবনের বহুবিরোধের সঞ্চিত স্তূপাকার দ্রব্যসামগ্রীগুলাকেই প্রিয়তম বলিয়া, আত্মার পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া, অন্তিমবলে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মনের দ্বারাই ইহা পাওয়া যায় যে, ইহাতে 'নানা' কিছুই নাই।

বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন,—মনই নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের সুখ-শান্তি-মঙ্গল নাই, তাহার উদ্ভ্রান্ত-ভ্রমণের অবসান নাই। সেই ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে, সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না—সে খণ্ডখণ্ড মৃত্যুদ্বারা আহত, তাড়িত, বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিক-ধর্ম্মবশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে, কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায়, তখন

একমুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠে—আমি অমৃতকে পাইয়াছি,—বলিয়া উঠে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অন্ধকারের পারে আমি এই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে, তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়—কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই একেকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন; তাঁহার কোন ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে-যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; বিপৎসম্পদ্ মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমো লোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—

সেই এক রহিয়াছেন—যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ।

রেশম-পশম, আসন-বসন, কাষ্ঠ-লোষ্ট্র, স্বর্ণ-রৌপ্য লইয়া কে বিরোধ করিবে? তাহারা আমার কে? তাহারা আমাকে কি দিতে পারে? তাহারা আমার পরম-সম্পৎকে অন্তরাল করিতেছে, তাহাতে দিবারাত্রির মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অনুভব করিতেছি না, কেবল তাহাদের পুঞ্জীকৃত সঞ্চয়ে গর্ব্ববোধ করিতেছি! হস্তি-অশ্ব-কাচ-প্রস্তরেরই গৌরব, আত্মার গৌরব নাই, শূন্য হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের স্থান নাই! সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা, তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত, শ্রীহীন, মলিন, কেবল বসনে-ভূষণে, উপকরণে-আয়োজনে আমি স্ফীত! জগদীশ্বরের কাজ করিতে পারি না; কেন না, শয্যা-আসন-বেশ-ভূষার কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছি, জড়-উপকরণ-জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া বসিয়াছি—সেই সকল ধূলিময় পদার্থের ধূলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়!—ঈশ্বরের কাজে আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, কারণ খট্টা-পর্য্যঙ্ক-অশ্ব-রথে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত! সমস্ত

মঙ্গলকর্ম্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচজনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান! শত-ছিদ্র কলসের মধ্যে জলসঞ্চয় করিবার জন্য জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছি, অবারিত অমৃতপারাবার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানে-ধর্ম্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না—এত বড় অন্ধতা লইয়া আমি পরিতৃপ্ত। যিনি আনন্দরূপমমৃতম্, যে আনন্দের কণামাত্র আনন্দে সমস্ত জীবজন্তুর প্রাণের চেষ্টা, মনের চেষ্টা, প্রীতির চেষ্টা, পুণ্যের চেষ্টা উৎসাহিত রহিয়াছে, তাঁহাতে আমার আনন্দ নাই, আমার আনন্দ—আমার গর্ব্ব কেবল উপকরণসামগ্রীতে,—এমন বৃহৎ জড়ত্বে আমি পরিবৃত; যাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলিনির্দ্দেশে জীবপ্রকৃতি অজ্ঞাত অকীর্ত্তিত সহস্রসহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া স্বার্থ হইতে পরমার্থে, স্বেচ্ছাচার হইতে সংযমে, এককতা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্, যিনি অদগ্ধেন্ধন ইবানলঃ, সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে যিনি আমার ঈশ্বর, তাঁহার আদেশবাক্য আমার কর্ণগোচর হয় না, তাঁহার কর্ম্মে আমার কোন আস্থা নাই, কেবল জীবনের কয়েকদিনমাত্র যে কয়েকটি লোককে পাঁচজন বলিয়া জানি, তাহাদেরই ভয়ে এবং তাহাদেরই চাটুবাক্যে চালিত হওয়াই আমার দুর্লভ মানবজন্মের একমাত্র লক্ষ্য—এমন মহামূঢ়তার দ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন! আমি জানি না, আমি দেখিতে পাই না—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

আমার কাছে সমস্ত জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সমস্ত বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমস্ত জীবনের লক্ষ্য ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সহস্র অংশে বিভক্ত-বিদীর্ণ!

হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম এক পরমাত্মন্, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ কর! তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহে-মনে, অন্তরে বাহিরে, জ্ঞানে-কর্ম্মে-ভাবে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি! আমি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে তোমার দ্বারা আবৃত রাখিয়া নীরবে নিরভিমানে তোমার কর্ম্ম করিতে চাই। অহরহ তুমি আদেশ কর, তুমি আহ্বান কর, তোমার প্রসন্ন-দৃষ্টিদ্বারা আমাকে আনন্দ দাও, তোমার দক্ষিণবাহুদ্বারা আমাকে বল দান কর। অবসাদের দুর্দ্দিন যখন আসিবে, বন্ধুরা যখন নিরস্ত হইবে, লোকেরা যখন লাঞ্ছনা করিবে, আনুকূল্য যখন দুর্লভ হইবে, তুমি আমাকে পরাস্ত-ভূলুণ্ঠিত হইতে দিয়ো না; আমাকে সহস্রের মুখাপেক্ষী করিয়ো না; আমাকে সহস্রের ভয়ে ভীত, সহস্রের বাক্যে বিচলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতে যেন না হয়! এক-তুমি আমার চিত্তের একাসনে অধীশ্বর হও, আমার সমস্ত কর্ম্মকে একাকী অধিকার কর, আমার সমস্ত অভিমানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে তোমার পদপ্রান্তে একত্রে সংযত করিয়া রাখ! হে অক্ষয়পুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা

প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয়, ব্রহ্মের আনন্দ যে কি, তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান্ হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্ম পুনর্ব্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্ম্মল নির্ভয় জ্যোতির্ম্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি! পৃথিবীতলে আর একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও! আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ, যন্ত্রতন্ত্র, বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্ম্মল সন্তোষ-বলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি! আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই! তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই! আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই--কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্য্যাদা সকল মর্য্যাদার ঊর্দ্ধে থাকে, তোমারি দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিষ্মৎ হইয়া উঠে! আমাদের চতুর্দ্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞান-মদমত্ত বাহুবলগর্ব্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনই অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্ব্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা, ধনমত্ততা, সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে! হে অদ্বিতীয় এক, তপস্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বল্কলবসন পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই মধুরকণ্ঠে বলিতে পারে—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্—

যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

কামান-ধূম্র এবং স্বর্ণধূলির দ্বারা সমাচ্ছন্ন তমসাবৃত রাষ্ট্রগৌরবের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ো না; তোমার সেই অনন্ধকার লোকের প্রতি দীন ভারতের নতশির উত্থিত কর।

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

যখন তোমার সেই অনন্ধকার আবির্ভূত হয়, তখন কোথায় দিবা, কোথায় রাত্রি, কোথায় সৎ, কোথায় অসৎ! শিব এব কেবলঃ, তখন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল!

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ!

হে শম্ভব, হে ময়োভব, তোমাকে নমস্কার; হে শঙ্কর, হে ময়স্কর, তোমাকে নমস্কার; হে শিব, হে শিবতর, তোমাকে নমস্কার

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা উত্থাপন করিলেই ভ্রাতৃভাবাপন্ন নব্য সভ্যেরা নাসিকাগ্র আকুঞ্চিত করিয়া থাকেন। আজকাল জাতিভেদ-সমর্থনচেষ্টা অংগলীভূত (anglicised) হিন্দুর নিকট ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদবিহিত বর্ণধর্ম্ম এক্ষণে হাস্যপরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

ইদানীন্তন ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব রায়মহাশয়ের বংশদণ্ডবিপণীই উপজীবিকা। কিন্তু পংক্তিভোজনকালে তিনি তাঁহার বংশমর্য্যাদারক্ষণে অতিশয় পটু। লক্ষপতি বসুজাই হউন, আর বেদান্তজ্ঞ দত্তজাই আসুন—সাধ্য কি যে, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ সপিষ্টক কদলীপত্র অধিকার করেন। অর্থ বা বিদ্যার বলে বংশদণ্ডপ্রহারবেদনার অতীত হওয়া যায় না। আহা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কি প্রভাব!

স্থূলকায় স্বেদস্রাবী হস্তিমূর্খ—মারিলে কোঁক করে না, পাছে 'ক' উচ্চারণ হয়—ব্রাহ্মণের প্রসাদভক্ষণে বর্ণধর্ম্ম সম্মানিত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু গৌরতনু শুভ্রবাসা সুবিদ্বান্ অংগলদেশবাসীর সহিত একটু শ্যামপর্ণিরস (চা) পান করিলে সমাজভ্রষ্ট হইতে হয়।

এই ত তোমার বর্ণধর্ম্ম! ধিক্ হিন্দুত্বকে, যাহা এই বিষমবাদ পোষণ করে।

সাম্যবাদী সভ্যদলের এইরূপ নিন্দাবাদ সাদরে স্বীকার করি। স্বীকার করি বলিয়াই সাহসের সহিত ঘোষণা করিতে পারি যে, বংশদণ্ডব্যবসায়ী রায়মহাশয় ও হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণবর ও নব্য হিন্দুসন্তান—তিন জনে মিলিয়া-মিশিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মনাশে বদ্ধপরিকর হওয়াতে ভারতের পুনরভ্যুত্থান একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

আমি গত বৈশাখমাসে—হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা—এতচ্ছীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা হিন্দুত্বের ভিত্তি। একনিষ্ঠতা কি, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। সমষ্টির ভিতর দিয়া ব্যষ্টিকে দেখা—একের গর্ভে বহুত্বের সমাধান করাই একনিষ্ঠতা। কিন্তু কি প্রকারে এই একনিষ্ঠতা বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিয়াছিল, তাহাই এই প্রবন্ধে পর্য্যালোচিত হইবে।

কোন বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে গেলে অল্পস্বল্প ধৈর্য্যের প্রয়োজন। তবে ধৈর্য্যেরও ত সীমা আছে। য়ুরোপীয়বেশধারী কালাবাঙালী প্রকৃতপক্ষে সাহেব হইতে পারে কি না, অথবা দাঁড়কাক ময়ূর হইতে পারে কি না—এবম্প্রকার প্রশ্ন কেহ যদি উত্থাপন করে, তাহা হইলে প্রশ্নকারীকে সাহেবি-ভাষায় দুই-একটা গালি না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেইরূপ বর্ণধর্ম্মকে ঘষিয়া-মাজিয়া খাড়া করা যায় কি না, আর কালাকে শাদা করা যায় কি না—এ দুই

একই কথা। জাতিভেদটা আগাগোড়া অত্যাচারে ভরা। অত্যাচারে ইহার জন্ম, অত্যাচারে ইহার পূর্ত্তি। মনুস্মৃতি যতদিন থাকিবে, ততদিন ভ্রাতৃবিদ্বেষজনিত বৈষম্যের ছবি হিন্দুধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবে। শূদ্রকে পশুর অপেক্ষা নীচ করা, আর ব্রাহ্মণকে দেবতার অপেক্ষা বাড়ান—ইহাই ত বর্ণধর্ম্মের সারতত্ত্ব। বড় বড় য়ুরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ও দিগ্‌গজ দেশী সংস্কারকেরা যাহার অনুমোদন করিয়াছেন, তাহার বিপক্ষে বলিতে যাওয়া বাতুলতামাত্র। এতটা যখন অধীরতা, তখন পর্য্যালোচনা চলা বড় শক্ত কথা। তজ্জন্য প্রথমে ধৈর্য্যের উদ্ভাবন করিতে হইবে।

শূদ্রজাতিবিদ্বেষী বলিয়া যে বর্ণধর্ম্মের নিন্দা আছে, তাহা অমূলক। পুরাকালে কৃষ্ণকায় কাষ্ঠপ্রস্তরভূতপ্রেতাদিপূজক অনার্য্যেরাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইত। তাহারা আর্য্যতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিল। তাহাদের সহিত সংমিশ্রণে পাছে আর্য্যরক্ত দূষিত হয় ও সঙ্করজাতির উৎপত্তি হয় ও বেদধর্ম্মের বিঘ্ন হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে দূরেদূরে রাখিতে হইয়াছিল। কোন উচ্চজাতির সহিত বিরুদ্ধধর্ম্ম ও নীচ জাতির সহসা সম্মেলনে ক্রমোন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়। গরীয়ান্ অংশ লঘু হইয়া পড়ে ও লঘীয়ানেরও স্বাভাবিক তেজ অবসন্ন হইয়া যায়। আমাদের দেশের ফিরিঙ্গীরা বিষমসংযোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। সঙ্করসৃষ্টিবিভ্রাটনিবারণের জন্যই সংহিতাকারেরা শূদ্রজাতিসংসৃষ্ট অন্নপানীয় পর্য্যন্ত পরিহর্ত্তব্য বলিয়া বিধি দিয়াছেন। আমাদের স্বভাব এই যে, যাহাদের সহিত আমাদের আহারপান, তাহাদের সহিত আমাদের আদানপ্রদান হইয়া থাকে। আমাদের নিকট আহারসংসর্গ সামাজিক সমতার পরিচায়ক। এই প্রাচ্য সহৃদয়তার বেগ বিধিনিষেধাদি দ্বারা সুনিয়ত হওয়াতে, আর্য্যজাতির বর্ণ ও ধর্ম্ম ও শুদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছিল। যদি দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা শূদ্রের সহিত আচারব্যবহার সুদৃঢ়রূপে বিধিবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের যেটুকু আর্য্যত্ব অবশিষ্ট আছে, তাহাও থাকিত না। বীরপ্রসূ রাজপুতানা আজ চেপ্‌টা নাক আর পিঙ্গলাক্ষিতে ভরিয়া যাইত। কমলমুখী হিন্দুরমণীর স্থানে টিপ্‌কপালী ও উনান্‌মুখীরা কাব্যকানন শোভিত করিতেন। ইহুদিবিধিপ্রবর্ত্তক মুশা অনীশ্বরোপাসক ইতরজাতিগণকে যত কঠোররূপে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়াছেন, মন্বাদি সংহিতাকারগণ বোধ হয় তত কঠোরতার পরিচয় দেন নাই। সাধারণতন্ত্র সভ্য মার্কিনদেশে শ্বেতচর্ম্ম ও কৃষ্ণচর্ম্মে এখনও যে কঠিন ব্যবধান আছে, পুরাকালে আর্য্যে ও অনার্য্যে তত প্রভেদ ছিল কি না, সন্দেহ। এরূপ সামাজিক ব্যবধান ত অনেক সময়ে মঙ্গলপ্রদ। মেলনপ্রবৃত্তি যদি স্বৈরিণী হয়, আর কোনপ্রকার বিধি না মানে, তাহা হইলে ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা চলিয়া যায়। অংগলদেশে সেদিন যে নবঘনশ্যাম স্থূলোষ্ঠ কাফ্রিরাজকুমার শ্রীমান্ লবঙ্গুলকে পূর্ণচন্দ্রপ্রভা বিম্বোষ্ঠা ইংরেজকুলোদ্ভবা কোন শ্রীমতী বরণ করিবেন বলিয়া ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা কি বিশেষ নিন্দার বিষয়? আজ

যদি ইংরেজরা এইরূপ বিবাহের প্রশ্রয় দেন, তাহা হইলে তাহাদের জাতীয় হীনতা ও বিকৃতি কি হইবে না? বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রধানত বর্ণসঙ্করসৃষ্টিভয়েই এই আর্য্যানার্য্যের মধ্যে আহারপানাদিসম্বন্ধীয় ব্যবহারগত ভেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরমার্থহানিরও ভয় ছিল। কেন না, অনার্য্যেরা সংস্কারহীন প্রবৃত্তিপ্রণোদিত মার্গের উপাসক ছিল। যেমন আধুনিক মার্জ্জিতমতাবলম্বীরা কুসংস্কারবশতাপন্ন পরিবারে কন্যাদান করিতে কুণ্ঠিত হন, তদ্রূপ আর্য্যেরাও পারলৌকিক ইষ্টহানির ভয়ে শূদ্রগণের সহিত আদানপ্রদান করিতেন না।

কিন্তু এই ভেদজন্য কঠোরতা ক্রমশ শ্লথ হইয়াছিল। যেমন অনার্য্যেরা আর্য্যসহবাসে উন্নত ও সংস্কৃত হইতে লাগিল, তেমনি তাহাদের সহিত ব্যবহারসম্বন্ধে উদারতা বাড়িতে লাগিল। মনুর বিধি-অনুসারে—যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্যকর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে তাহাদিগের অন্নভোজন করা যায় এবং যে যাহার নিকট আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহারও অন্নভোজন করা যায় (মনুসংহিতা ৪, ২৫৩)। দাস, গোপালক, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী (অর্থাৎ যাহার সহিত এক জমিতে আধাআধি করিয়া চাষ দেওয়া হয়), নাপিত এবং যে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রজাতির মধ্যে কেবল ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য (যাজ্ঞবল্ক্য—১৬৫)। পরাশরসংহিতাতেও একাদশ অধ্যায়ে শূদ্রের অন্ন ভোজ্য, এইরূপ বিধি আছে। শূদ্রসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যসংহিতায় যে অনুদারতা আরোপ করা হইয়াছে, তাহা কাল্পনিক। ইংরেজের নিকট কালো রংই শূদ্রবর্ণ। আমাদের বর্ণধর্ম্মবিদ্বেষী ভ্রাতৃভাবাপন্ন সংস্কারকদের দল থেকে খুব কালো-কালো জনকতক বাচাই করিয়া যদি একটা বিলাতে উপনিবেশ (colony) স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে সাহেব-মহোদয়দিগকে আগন্তুক ভ্রাতৃপ্রেমের উচ্ছ্বাস রোধ করিবার জন্য দুইচারিখানি মনুসংহিতা অপেক্ষা কড়াকড়া শাসনপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে হয়। তখন আমাদের সংস্কারকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, সাহেবদের বাচনিক ভ্রাতৃভাবের চোটে হিন্দুজাতির হীনতা স্বীকার করিয়া পিতৃপুরুষদিগের নামটা ডুবান বড় ভাল কাজ হয় নাই।

আরও দেখা যায় যে, এই আহারপাননিষেধ আমাদিগকে বাচাইয়া রাখিয়াছে। মুসলমানের জল পর্য্যন্ত ছুঁইতে নাই—এইরূপ কঠোর বিধি যদি না থাকিত, তাহা হইলে একটা জাতিবিভ্রাট ঘটিয়া যাইত। শনি যেমন স্নানের জলের ছুতা করিয়া শ্রীবৎস রাজাকে পাইয়া বসিয়াছিল, তেমনি মুসলমানেরা পানীয় জলের ছুতা করিয়া তাহাদের হিন্দুরমণীপরিণয়লিপ্সা চরিতার্থ করিয়া ফেলিত। অগ্রেই বলা হইয়াছে যে, অন্নভোজন আমাদের কাছে সামাজিক নৈকট্য অথবা মিলনের প্রবর্ত্তক ও পরিচায়ক; সাহেবদের নিকট তাহা নহে। তাহারা তাহাদের জুতাবরদারের হাতে খাইতে পারে এবং তাহাকে জুতাও মারিতে পারে।

আমাদের নেতারা তাই গোঁড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুসলমানের সব লওয়া হইল—পোষাক, ব্যবহার, বিদ্যা, রীতি-নীতি, কিন্তু জলটা বন্ধ। এই কঠোরতা আমাদিগকে বাঁচাইয়াছে। আজকাল আবার ইংরেজ আসিয়াছে। এখন আমাদের কেহ নেতা নাই। তাই ইংরেজের খানা খাইবার বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ইংরেজ বড় গর্ব্বিত জাতি, তজ্জন্য আমাদের বড়-একটা গ্রাহ্য করে না। আমাদের সভ্যদলের তাহাদের উপর যেরূপ টান, তদ্রূপ যদি ইংরেজদের আমাদের প্রতি টান হইত, তাহা হইলে আজ কতশত শ্রীমতী হেমলতা ও মৃণালিনী, মিসেস্ ফক্স্ (Mrs. Fox) ও মিসেস্ হগ (Mrs. Hogg) হইয়া যাইত, আর দেশটা জবড়জঙ্গী জাত্‌ফিরিঙ্গিতে ভরিয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজরা একলষেঁড়ে, তাই রক্ষা। কিন্তু কি জানি কোন্‌দিন বা তাহাদের ভ্রাতৃপ্রেমের উদয় হয়। তাই আগে থাকিতেই পঞ্চগব্যের ভয় দেখাইয়া খানাটা বন্ধ করিয়া দিলেই ভাল হয়।

এই ত গেল আর্য্যানার্য্যের ভেদবৃত্তান্ত। মিলনে উন্নতি হয়, কিন্তু মিলন ঘটিবার পূর্ব্বে মেলনীয় বস্তুর কতকটা পরিপুষ্টি আবশ্যক। সেই পরিপুষ্টির জন্য ভেদব্যবধানের প্রয়োজন হয়। একথাটা সত্য বটে। কিন্তু বংশদণ্ডব্যবসায়ী রায়মহাশয়কে বা হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণসন্তানকে যে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দেওয়া হয়, তাহা কি ঘোর অন্যায় নহে? ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই হইল। তাহার কর্ম্ম দেখিবার আবশ্যক নাই, জন্ম দেখিলেই হইবে। ইহা কে অস্বীকার করিবে যে, জন্মগত মর্য্যাদাই বর্ণভেদের মূল? এই অসঙ্গত অন্যায্য প্রথা যে মানবসমাজে কখন চলিয়াছে বা চলিতে পারে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারা যায় না। এইরূপ বর্ণভেদবিধি কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দিলে ভাল হয় না?

স্থিরো ভব।

সকল সংহিতার এই বিধি যে, কর্ম্মভ্রষ্ট হইলেই বর্ণমর্য্যাদা নষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন—চোর, নাস্তিক, বেদাধ্যয়নশূন্য, প্রতিমা-পরিচারক দেবল, মাংসবিক্রয়ী, বাণিজ্যজীবী, রাজভৃত্য, কুসীদজীবী, পশুপালক, মিথ্যাসাক্ষীর সৃষ্টিকর্ত্তা, নিষ্ঠুরভাষী, সোমলতাবিক্রয়ী ও মদ্যপ প্রভৃতি আচারহীন ও উন্মার্গগামী ব্রাহ্মণগণকে দৈব ও পৈত্র্য উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবে (মনুসংহিতা—৩,১৫০ হইতে ১৮৩)। পরাশরসংহিতানুসারে উপাসনাবর্জ্জিত বেদাধ্যয়নরহিত ব্রাহ্মণকে বৃষল বলে। আর্য্যসন্তানদিগের নিকট কুলগতকর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা অধিকতর কাপুরুষতা আর কিছুই ছিল না। কোন দ্বিজ যদি কৌলিক ধর্ম্মকর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া উপায়ান্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকিত না। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ—এই বাক্য শ্রবণ করিলে কোন্ হিন্দুর শোণিতপ্রবাহ খরতর না বহিতে থাকে? বর্ণধর্ম্ম কর্ম্মকে অবহেলা করিয়া মর্য্যাদাকে কেবল কুলেতেই আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। আর্য্যদিগের প্রতিষ্ঠা কেবল কুলগত ছিল, কর্ম্মগত ছিল না, এরূপ মত ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বা মর্য্যাদা হইতে পারে না, তবে কেবল গুণ বা প্রবৃত্তি বা নৈসর্গিক পটুতা দেখিয়া কর্ম্মবিভাগ কেন করা হয় নাই ? কর্ম্মকে কেন কুলানুযায়ী করা হইয়াছিল ? কুলের গুণদড়ি দিয়া গুণকে বাঁধিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন ? এই বাঁধাবাঁধিতেই আর্য্যদিগের প্রতিভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুলগতকর্ম্মরক্ষাতেই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে ! এই অপবাদ সত্য নহে। বেগবতী স্বৈরগতি কর্ম্মনদীকে কুল দিয়া বাঁধিয়া রাখাতে ভারত ডুবিয়া যায় নাই, কিন্তু সমৃদ্ধিশালীই হইয়াছিল। বরং কুলের বাঁধ ভাঙিয়া দেওয়াতে ভারতের শ্রী ভাসিয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে কর্ম্মকে কেন কুলগত করা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

হিন্দুত্বের ভিত্তি একনিষ্ঠতা। হিন্দুর চিন্তা-প্রণালী, হিন্দুর দর্শন, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ—সমস্তই একমুখীন। বস্তু একই, দুই নহে; একই বহুরূপে প্রতিভাত হয়—ইহাই হিন্দুদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমগ্র বেদগাথায় একেরই মহিমা বর্ণিত আছে। অগ্নির দেবতা অগ্নি, বায়ুর দেবতা বায়ু, সূর্য্যের দেবতা সূর্য্য। কর্ত্তাই কার্য্যরূপে প্রতিবিম্বিত, স্রষ্টাই সৃষ্টিরূপে প্রতিফলিত। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, দাতা, গ্রহীতা ও দান—এই তিনের পারমার্থিক একত্ব বেদমন্ত্রে আভাসিত হইয়াছিল, আর বেদান্তের আনন্দজ্যোতিতে বিলীন হইয়া ব্যাবহারিক ত্রিত্ব-সমূহ বস্তুঘটিত একত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আজকাল য়ুরোপীয় বিদ্যা শিখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, কাজ করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হিন্দুর পরম আদর্শ। প্রতিষ্ঠা,—স্থিতি,—টিঁকিয়া থাকাই, অস্তির স্বরূপ। প্রতিষ্ঠার অভাবে,—স্থিতির অপূর্ণতাপূরণে,—টিঁকিয়া থাকার বিঘ্ন-অপসারণে, কর্ম্ম বা চেষ্টা বা সাধনার উদ্ভব হয়। কার্য্য অভাবসূচক, অপূর্ণতার পরিচায়ক। যেখানে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা, —যেখানে আত্মস্থিতি, সেখানে কার্য্য তিষ্ঠিতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন—অস্তিত্ব কি তবে স্বার্থেই পূর্ণতা-লাভ করে ? প্রেমহীনতায় কি অস্তিত্বের চরম বিকাশ ? যদি প্রেম ছট্‌ফট্ করাতেই হয়,—শান্তিতে না হয়, আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতে হয়,—মিলনের পর্য্যাপ্তিতে না হয়, তবে প্রেমের অভাবই অস্তিত্বের সার। আর যদি ভিন্নতাকে একতার মধ্যে সমাহিত করিয়া স্থিতির নাম প্রেম হয়, তাহা হইলে অস্তিত্ব প্রেমময়, শিবময়, আনন্দময়। বাসনার বহ্নিকে প্রশমিত করিয়া, চেষ্টাকে পূর্ণস্থিতিতে পরিণত করিয়া, দ্বৈতকে নিঃশেষ করিয়া, অদ্বৈতানন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর্য্য-দিগের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সাধনা নহিলে সিদ্ধি হয় না। অদ্বৈতপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে গেলে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করা প্রয়োজন। সকাম কর্ম্ম করিলে দ্বৈতচক্রে নিষ্পিষ্ট হইতে হয়, আর নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হয়,—আত্মস্থিতির দ্বার উন্মুক্ত হয়,—অদ্বৈতব্রহ্মপদ নিকট হয়। তজ্জন্যই গীতাশাস্ত্রে নিষ্কামকর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তিত

হইয়াছে। আর্য্যসমাজকে ধীরে ধীরে এই আদর্শমুখীন করা আশ্রমধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

নিষ্কামকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত চতুরাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল। কঠোর-ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে ভোগবাসনা সুসংযত হইত, দৈন্য-ভার বহন করিয়াও কুলধর্ম্মরক্ষণে জিগীষা-প্রবৃত্তি সুশমিত হইত, বার্দ্ধক্যে পুত্রকলত্র বর্জ্জন করিয়া,—কষ্টসাধ্য বিত্তৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রয়াণে কামনার গ্রন্থি ছিন্ন হইত, স্বর্গসুখ তুচ্ছ হইত, ভূমানন্দে ডুবিবার জন্য আয়োজন হইত। বানপ্রস্থাশ্রমের কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া, হর্ষশোকের তরঙ্গে আলোড়িত হইয়া, মানাবমানের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রপীড়িত হইয়া, জয়পরাজয়ের সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, যাই ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হইল, অমনি সকল সুখভোগে বিরক্ত হইয়া আর্য্য গৃহস্থেরা বনে প্রস্থান করিতেন। তাঁহারা কর্ম্মের অধিকারী ছিলেন, ফলের অধিকারী ছিলেন না। গীতার উপদেশ—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। এই গীতানির্দ্দিষ্ট আদর্শে সমস্ত আর্য্যজীবন সুনিয়মিত ছিল। বর্ণাশ্রমও এই কর্ম্মফলত্যাগব্রত-উদ্‌যাপনের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছিল।

সমাজ ব্যক্তিগণের সমষ্টি। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যক্তি মরণশীল, সমাজ অমর। যদি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা মরণের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর অধিকারে আসিত, তাহা হইলে সমাজের স্থায়িত্ব নষ্ট হইয়া যাইত। ব্যক্তি মরে, কিন্তু তাহার যদি কোন প্রতিষ্ঠা বা সঞ্চয় থাকে, তাহা মরে না। তাহার উত্তরাধিকারীরা তাহা পায়। এই সামাজিক নিয়ম বিশ্বজনীন।

আর্য্যগৃহস্থ যখন বনপ্রয়াণকালে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে কর্ম্মোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য দিয়া যাইতেন, তখন তাঁহার জলন্ত—জীবন্ত ত্যাগের উদাহরণ সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিত যে, কর্ম্মেতেই প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা অবস্থিত,—কর্ম্মফলভোগে নয়। এই বানপ্রস্থাশ্রমবিহিত ঐশ্বর্য্যত্যাগে কর্ম্মের প্রতি এক মঙ্গলময় অভিমান জনিত হইত। যে-সে কর্ম্মে অভিমান জন্মে না। যে কর্ম্মের দ্বারা আমার পিতৃপুরুষেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, যে কর্ম্মপালনে সমস্ত ঐশ্বর্য্য বর্জ্জন করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। ধন যায়,—প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তত্রাপি কৌলিক কর্ম্ম ছাড়িব না। যদি কর্ম্মকে ফললিপ্সাসঙ্গদোষবিবর্জ্জিত করিয়া কুলগৌরবে গরীয়ান্ না করা হইত, তাহা হইলে সমগ্র সমাজকে নিষ্কাম-কর্ম্মনিষ্ঠ করা অসম্ভব হইত। মর্য্যাদার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে পরমার্থে লইয়া যাইতে হয়। আত্মমর্য্যাদা না হইলে পরমার্থদৃষ্টি ফুটে না। ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ উপদেশ দিয়া সাধারণ লোককে সুপথে লওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। তজ্জন্যই দূরদর্শী ঋষিরা কুলমর্য্যাদা ও জাতিগতপ্রতিষ্ঠার তেজোময় অভিমানবলে আর্য্যসমাজকে চালিত করিয়াছিলেন। এই ঘোর দুর্দ্দিনেও সেই কর্ম্মাভিমানবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে আজও শত শত ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা দৈন্যভারগ্রস্ত,—উদর-

জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অপক্ব রম্ভার উপদ্রব এড়াইয়া ক্ষীরসরনবনীতভোজনে পরিতুষ্ট হইতে পারেন, তথাপি পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। গৃহে ব্যঞ্জন নাই; গৃহিণী তিন্তিড়ীপর্ণ রন্ধন করিয়া দেন; আপনারা তাহা আনন্দের সহিত ভোজন করেন ও শিষ্যদিগকে ভোজন করান। মরিয়া যাইবেন, সেও ভাল, তবু বিত্তগ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করিবেন না! আসুন সকলে মিলিয়া চোগাচাপ্‌কানধারী পরধর্ম্মী ব্রাহ্মণদিগকে দূর হইতে সম্মান দিয়া, সেই কুলধর্ম্মপালক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণ করি। তাঁহারা দীন বটেন, কিন্তু হীন নন। তাঁহাদিগের সম্মানে, তাঁহাদিগের গৌরবে, আর্য্য ঋষিদিগের সম্মান ও গৌরব হয়। আজও শতসহস্র ক্ষত্রিয় দেখা যায়, যাঁহারা অন্নের জন্য লালায়িত, কিন্তু তরবারি ছাড়িয়া জীবিকার্থে লেখনী ধারণ করিতে ঘৃণা করেন। আর আজ যদি আমাদের বণিকেরা কুলধর্ম্ম ছাড়িয়া দু-চার-পাতা ইংরেজি উল্টাইয়া উকিল-ডেপুটী হইতেন, তাহা হইলে ভারতের অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি পড়িত। এখনও কুলগত কর্ম্মাভিমান হিন্দুজাতির গৌরবকে যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছে, ভারতকে অশেষ দৈন্য হইতে বাঁচাইয়াছে।

ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্মকে ভালবাসা, নিষ্কামকর্ম্মসাধনে কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন করাই, হিন্দুর হিন্দুত্ব। যাঁহারা নিষ্ক্রিয় পূর্ণ অদ্বৈতানন্দে ডুবিতে চান, তাঁহারাই এই উচ্চ আদর্শের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

কর্ম্মনদীর চঞ্চলপ্রবাহ জ্ঞানসাগরে মিশাইয়া না গেলে নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয় না। আবার কামনা থাকিতে কর্ম্মের ঘূর্ণীপাক শেষ হয় না। কর্ম্মবিতাড়িত সংসারোর্ম্মি হইতে রক্ষা পাইবার কর্ম্মই প্রশস্ত উপায়—যদি তাহা কামনাদুষ্ট না হয়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে পুত্রবিত্ত ও স্বর্গের এষণা পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। চেষ্টা, সাধনা, কার্য্য প্রাণপণে করিবে, কিন্তু সঞ্চয়ের অধিকারী হইবে না। এরূপ বাসনাবিরহিত উত্তম সহজ কথা নহে। কর্ম্মের উপর বিশেষ প্রীতি না হইলে, তাহা সম্ভব নহে। এতটা ভালবাসা চাই যে, কর্ম্মকে কোন অবান্তর বস্তুর সংমিশ্রণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক অভিমানের বেড়া দিয়া বেষ্টন করিতে পারা যায়। আর্য্যসমাজ সেই অভিমান কুলমর্য্যাদা হইতে, পিতৃপুরুষদের গৌরব হইতে উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। এই কুলমর্য্যাদারক্ষণপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এই প্রীতিপূর্ণ বংশাভিমানের ডোরে পূর্ব্বপুরুষ ও ভাবী সন্ততিগণ যথাবরে বদ্ধ আছে। শোণিতের টান মৃত, জাত ও অজাত ব্যক্তিগণকে কৌলিক বা জাতীয় একত্বে আকৃষ্ট করে। এই শোণিতগত, বংশগত, জাতিগত, মর্য্যাদাপরিপুষ্ট, অভিমানসংরক্ষিত একতাই মানবসমাজের ভিত্তি। আর্য্যেরা এই ভাবের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া কুলকর্ম্মসূত্রে সমাজকে বাঁধিয়াছিলেন। সভ্য য়ুরোপেও এই বংশমর্য্যাদায় যথেষ্ট পরাক্রম আছে, কিন্তু তথায় জিগীষা, প্রতিযোগিতা, ঐশ্বর্য্যলিপ্সা, প্রাবল্য পাইয়াছে। ভূতপ্রপঞ্চকে জয় করা, প্রকৃতিকে বশ করা, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দ্দমনীয় সংসারে

প্রভুত্ব লাভ করা—য়ুরোপের আদর্শ। এই আদর্শ যে মহান্ ও প্রশংসার্হ, তাহার সন্দেহ নাই। প্রকৃতিকে ব্যবহারক্ষেত্রে জয় করা পরমার্থলাভের আর এক প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এ আদর্শ ঈশার আদর্শ নহে। ইহা য়ুরোপীয়স্বভাবসুলভ, কিন্তু ঈশা-প্রণোদিত নহে। ইহা ঈশার আদর্শের একটা কার্য্য-ভূমিমাত্র। অনেক সময়ে দুই আদর্শে ভয়ানক বিরোধ ঘটিয়াছে। কখন য়ুরোপের জয় হইয়াছে, কখন ঈশার জয় হইয়াছে। য়ুরোপের ক্রমোন্নতির ইতিহাস এই জয়-পরাজয়ের ইতিহাস। এই দুই আদর্শের প্রভেদ জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাহা না হইলে য়ুরোপীয় ইতিহাসতত্ত্ব বুঝা কঠিন হইবে। ভারতের আদর্শ কর্ম্মজয়, ঐশ্বর্য্য-লাভ নহে। তাই এখানে কর্ম্মের এত অভি-মান, বর্ণধর্ম্মের প্রতি এত ভালবাসা, জিগীষার অনাদর, শান্তভাবের আদর। য়ুরোপের আদর্শ জয়, তাই সেখানে শান্তভাবের এত অভাব, প্রতিযোগিতার এত বাহুল্য। হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা ভেদপ্রসূ কর্ম্মবীজকে নাশ করিয়া শুদ্ধানন্দ লাভ করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মসাধন অবলম্বন করিয়াছিল, আর এই একনিষ্ঠতাই বর্ণবিভাগক্রমের প্রণোদনা করিয়াছিল।

অদ্বয়াত্মা মায়াপ্রভাবে অন্নময়াদিপঞ্চ-কোষে প্রবিষ্ট হইয়া অহম্প্রত্যয়ী জীবাত্মা-রূপে প্রতিভাত হন। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির পঞ্চকোষ আছে, তদ্রূপ সমাজেরও পঞ্চকোষ আছে। জীবের অন্নময়কোষ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় সমাজের শ্রমসেবাজীবীদিগের অনুরূপ; প্রাণময়কোষ বাণিজ্যজীবীদিগের সদৃশ। কেন না, ক্রয়বিক্রয়জন্য আদান-প্রদানে সমাজ বাঁচিয়া থাকে। সমাজের শাসনরক্ষণকারীদিগের দল মনোময় কোষের তুল্য। মন ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া চালন করে; ক্ষত্রিয়েরাও প্রজাদিগকে শাসন করে। ব্রাহ্মণেরা বিজ্ঞানময়কোষ-প্রতিম; কারণ বিজ্ঞানময়-বুদ্ধিবৃত্তি অন্ত-র্মুখী। তাঁহাদিগের বিশেষ কার্য্য অধ্যাপন ও যাজন, তাঁহারা শিষ্যদের অন্তঃকরণকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যান, অন্তর্দৃষ্টি উদ্ঘাটিত করেন, মনের সঙ্কল্পবিকল্পকে এক-মুখীন করেন। সন্ন্যাসীরা আনন্দময়কোষ-প্রতিভ। তাঁহারা অত্যাশ্রমী বিধিনিষেধা-দির অতীত, যদৃচ্ছাগতি; সংসারের পরমার্থ-গতির মুখ্যভার তাঁহাদেরই উপরে ন্যস্ত। আনন্দ হইতেই সৃষ্টি, আনন্দেতেই স্থিতি, আনন্দেতেই বিশ্বসংসারের পর্য্যবসান। তাই যাঁহারা ত্যাগানন্দভুক্, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রভু, জগদ্গুরু।

ঋষিরা একমেবাদ্বিতীয়ের কৌষিক পঞ্চী-করণ অনুসারে সমাজকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়াছেন; আর ব্যক্তিরও যে সাধন, সমাজেরও সেই সাধন ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সপ্রাণ জ্ঞানেন্দ্রি-য়ের বশে আনিতে হয়; তার পর জ্ঞানে-ন্দ্রিয়দিগকে মনের অধীন করিতে হয়; বহির্মুখী মনকে আবার অন্তর্মুখী বিবেকের শাসনে রাখিতে হয়, তবে আনন্দের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নহিলে বিরোধ, বিদ্রোহ ও বহুলতার উপদ্রবে জীব ক্লিষ্ট ও মঙ্গলভ্রষ্ট হয়। আর্য্যসমাজেও সেইরূপ ছিল। চতুর্বর্ণের পারম্পর্য্য ও সম্বন্ধ জীবকোষানুযায়ী

ছিল। ব্রাহ্মণেরা সকলকে জ্ঞান শিক্ষা দিত, ক্ষত্রিয়েরা সকলকে রক্ষণ করিত; বৈশ্যেরা সকলের জন্য আহরণ ও উপার্জ্জন করিত ও শূদ্রেরা সকলের সেবা করিত। যেমন প্রত্যেক আর্য্যবর্ণের এক একটি বিশেষত্ব ছিল, তেমনি নির্ব্বিশেষত্বও ছিল। সকল আর্য্যেরই বর্ণ-নির্ব্বিশেষে অধ্যয়ন ও যজন করিবার অধিকার ছিল। সত্যযুগে মনু, ত্রেতায় গোতম, দ্বাপরে শঙ্খ, কলিতে পরাশর—সকল যুগে সকল সংহিতাকার এই সমানাধিকার দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না। অনার্য্য শূদ্রেরা যে কেন সমানাধিকার পায় নাই, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ বর্ণবিভাগে কর্ম্মের আদর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পিতার স্বভাবত ইচ্ছা হয় যে, তাঁহার উপার্জ্জিত প্রতিষ্ঠা সন্তানদিগকে দান করিয়া যান। হিন্দুর প্রতিষ্ঠা কর্ম্মে, কর্ম্মলব্ধ সঞ্চয়ে নহে। তাই হিন্দু পিতা হিন্দু সন্তানকে কর্ম্মের অধিকারী করিয়া যাইতেন। কোন ক্ষত্রিয় বনপ্রয়াণকালে পুত্রদিগকে এই বলিয়াই আশীর্ব্বাদ করিতেন—সম্মুখসমরে প্রাণ দিও, সমাজকে বিন্দুবিন্দু শোণিতদানে শত্রুনিগ্রহ হইতে রক্ষা করিও, কিন্তু দেখিও, যেন ঐশ্বর্য্যলিপ্সামোহে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া পিতৃপুরুষদিগের নামে কলঙ্ক আনিও না। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরাও এইরূপ গৌরবান্বিত আশীর্ব্বচন দানে কুলমহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। আর সন্তানেরাও আশৈশব পূর্ব্বপুরুষদের ক্রমভঙ্গরহিত বর্ণধর্ম্মরক্ষণ-কীর্ত্তি শ্রবণ ও মনন করিয়া মর্য্যাদাপূর্ণ হইত। যদি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোন বিশেষ শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে বালকদিগের অল্পবয়স হইতেই সেই শিক্ষা আরম্ভ না করিলে কর্ম্মঠতা জন্মে না। শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, যুদ্ধ বা অন্য কোন বিশেষ বিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিতে গেলে, যৌবনের পূর্ব্ব হইতেই তাহার সাধন আবশ্যক। বিংশতিবর্ষীয় যুবকের পক্ষে সূত্রধরের ব্যবসায়শিক্ষা বড়ই কষ্টকর। অত বয়সে তাহার হস্তের ক্ষিপ্রকারিতা চলিয়া যায়। বর্ণধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া আজকাল আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি। আমাদের সন্তানদের কি শিখাইব, বুঝিতে পারি না। আমরা অন্ধকারে ঢিল মারি। চতুর্দ্দশ বা ষোড়শ বর্ষবয়স্ক বালকের বিশেষ প্রতিভা না থাকিলে, নৈসর্গিক চিত্তগতি জানা যায় না। আর কুলধর্ম্মের উপরও আস্থা নাই। তাই তাহাকে সুবিধানুযায়ী একটা বিশেষ শিক্ষালাভে (profession) বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত করি। আর না হয় তাহারা কেবল সাধারণভাবে বিদ্যার্জ্জন করিয়া উপাধিবিশিষ্ট হইয়া উকিলি বা যে-কোন চাকরি অবলম্বন করে। যখন বর্ণ-ধর্ম্মের প্রভাব ছিল, তখন পিতা এবং বালক, উভয়েই প্রথম হইতেই জানিত যে, কোন্ বিশেষ বিদ্যায় নিপুণ হইতে হইবে।

বর্ণধর্ম্মবিভাগসম্বন্ধে অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। আমাদের সংস্কারকেরা য়ুরোপীয় বর্ণবিভাগহীন সমাজের সহিত তুলনা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। সেই আপত্তিগুলি ও তুলনার যাথাযথ্য বিচার করা আবশ্যক।

বর্ণধর্ম্মে কর্ম্মের মর্য্যাদা থাকে না।

ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর, অতএব ক্ষত্রিয়সন্তান সদাই আপনার কর্ম্মগত হীনতা অনুভব করিয়া কর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। আর সভ্য য়ুরোপে সকল কর্ম্মই আদরণীয়। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের চক্ষে নীচ ও ঘৃণার্হ, ইহা অলীক কথা। ভিখারী ব্রাহ্মণেরাই ত ক্ষত্রিয়ের বীরকীর্ত্তি ঘোষিত করিয়া থাকেন। দান লইতে ক্ষত্রিয় ঘৃণা করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের আজীবিকা প্রতিগ্রহ। আজ যদি কোন দরিদ্র ধূলিধূসরিত নগ্নপদ ব্রাহ্মণ তাঁহার লক্ষপতি কায়স্থ শিষ্যের নিকট গমন করেন, আর সেই চীনাংশুকবাসা ছাত্র ছিন্নবসন গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করে, তাহা হইলে কি সেই ধনিসন্তান সম্মানে হীন হইয়া যায়? তবে কি ব্রাহ্মণ উচ্চতর নহেন? শিক্ষক যেমন সম্মানসম্বন্ধে উচ্চস্থান অধিকার করিলে শিষ্যের অবমাননা হয় না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণের সম্মানে ক্ষত্রিয়ের হীনতা হয় না। কৃপাচার্য্য অপেক্ষা অর্জ্জুনের বীরোচিত সম্মান অধিকতর ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃপাচার্য্য গুরু, তজ্জন্য অর্জ্জুন নিশ্চয়ই তাঁহার পাদস্পর্শ করিতেন। পাদস্পর্শ করিতে গিয়া অর্জ্জুন কি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের হীনতা অনুভব করিয়াছিলেন? বর্ণবিয়োজিত কর্ম্মের বরঞ্চ একপক্ষে অমর্য্যাদা হইতে পারে। সঙ্করের জন্য কর্ম্ম, অতএব সঙ্কর হইলেই হইল; কর্ম্মটা যেমনি হউক না কেন—উচ্চ বা নীচ, শুভ বা অশুভ। অলঙ্কার লইয়া কাজ, পতি কেবল একটা উপায়মাত্র।

আর এক আপত্তি, বর্ণবিভাগে অত্যন্ত ভেদভাব হয়। বর্ণমর্য্যাদার আধিক্যবশত এক বর্ণের অপর বর্ণের সহিত আহারপান, আদানপ্রদান বা পরিণয়ঘটিত সম্বন্ধ স্বভাবত রহিত হইয়া যায়। য়ুরোপে দেখ এরূপ ভেদভাব নাই। ঐশ্বর্য্যলাভের প্রতিযোগিতায় ভেদভাব চূড়ান্ত হয়। যদি কোন সামান্য বণিক্ আজ কোটিপতি হয়, তাহার বাটীতে স্বয়ং সম্রাট্ ও লর্ডেরা ভোজন করিতে আসিবেন, কিন্তু সেই হঠাৎ-নবাব বণিকের ভ্রাতার গৃহে কেন?—পিতারও গৃহে তাঁহারা কোনদিন পদার্পণ করিবেন না। আর ঐ বণিকের কন্যার বিবাহের সময় যখন ভোজ হইবে, তখন সাধ্য কি যে, সেই ভোজগৃহে তাহার দরিদ্র ভ্রাতা-ভগিনী এমন কি জনকজননী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া আমন্ত্রিত বড়মানুষদের সঙ্গে একটু চা পান করেন। আর আজ এখানে যদি কোন হাইকোর্টের জজের বাটীতে বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহার দীনহীন কপর্দ্দকবিহীন জ্ঞাতিকুটুম্ব, যে যেখানে আছে, সকলকেই তাঁহাকে গলবস্ত্র হইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা সকলে আসিয়া এক পংক্তিতে ভোজন না করিলে, বিবাহকার্য্য পূর্ণ হইবে না। ভেদভাব সকল সমাজেই আছে। তবে আমাদের না কি অত্যন্ত দুর্দ্দশা, তাই য়ুরোপীয়েরা আমাদিগকে বর্ণধর্ম্মত্যাগ করিয়া অভেদভ্রাতৃভাব গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেন। আর আহারপানের নিষেধবিধি কি এতই অনুদার? যদি অন্য বর্ণের সহিত আহারসংসর্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে; ঘনিষ্ঠতাআবার যদি গুণবিশিষ্টতাকে মিশ্রণদূষিত করে, তাহা হইলে যথেচ্ছ আহারপানের নিষেধ কি হিতকর নয়? কিন্তু একবর্ণের দ্বিজেরা

অন্য বর্ণের দ্বিজদিগের অন্নভোজনে কখনই নিবারিত হন নাই। দ্বিজ বলিতে সকল বর্ণের আর্য্যদিগকে বুঝায়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য (বসিষ্ঠসংহিতা—২ অধ্যায়)। দ্বিজমাত্রেরই অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দানে অধিকার ছিল (গৌতমসংহিতা—১০)। তাঁহাদের মধ্যে একটা মৌলিক সমতা ছিল, তজ্জন্য সহভোজনের নিষেধব্যবধানে তাঁহারা ব্যবচ্ছিন্ন হন নাই। যজ্ঞবিরোধী শূদ্রদিগেরই সহিত কেবল ব্যবধান ছিল। কিন্তু যখন বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে ভারত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল হইল, তখনই বিদ্রোহকে দমন করিবার নিমিত্ত আহারপানবিধির কিছু কড়াকড়ি হইল। তবুও ভিন্ন বর্ণের সহিত ভোজন বন্ধ হয় নাই। কেবল মর্য্যাদারক্ষণার্থে দুইএকপ্রকার ভোজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করায় নিষেধ হইয়াছে।

বর্ণভেদ যে একেবারে অনুল্লঙ্ঘনীয় ছিল, তাহা নহে। একবর্ণের সহিত অপর বর্ণের আদানপ্রদান চলিত। কর্ম্মাভিমানরক্ষার জন্য সবর্ণবিবাহ প্রশংসনীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। কিন্তু লোকরক্ষার্থে অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ছিল। বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত ; বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ; এবং শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাদ বা পারশব। ক্ষত্রিয়ের অনুলোমজাত পুত্র যথাক্রমে মাহিষ্য ও উগ্র, আর বৈশ্যের অনুলোমজাত পুত্র করণ বলিয়া কথিত হয়। প্রতিলোমক্রমে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র সূত, বৈদেহক ও চাণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার মাগধ ও ক্ষত্তা, আর বৈশ্যার আয়োগব নামে অভিহিত হইয়া থাকে (যাজ্ঞবল্ক্য—১৬) প্রতিলোমবিবাহ আদরণীয় ছিল না; বিশেষত শূদ্রের প্রতিলোমদাম্পত্য অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। হীনজাতির কন্যা গ্রহণ করায় তত ক্ষতি হয় না, যত কন্যাদানে হয়। কোল-ভিলেরা যদি আমাদের কন্যাগুলিকে লইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা কি মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হই না? দ্বিজবর্ণের মধ্যে অনুলোম বা প্রতিলোমজাত পুত্র দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত হয়। মেধাতিথির মতে প্রতিলোমজাত পুত্রেরও উপনয়ন কর্ত্তব্য (মনুসংহিতা—১০,২৮)। এই সকল অসবর্ণসম্মেলনসম্ভূত জাতিসকল বর্ণোৎকর্ষও লাভ করিত (যাজ্ঞবল্ক্য—১)। মনু বলেন যে, শূদ্রও ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্টজাতিভাবাপন্ন হয় (১০ম অধ্যায়—৩৩৫)। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, বর্ণোৎকর্ষলাভ এক পুরুষে হইত না, কারণ বর্ণধর্ম্ম ব্যক্তিগতকর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু কৌলিক কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কোন অম্বষ্ঠবংশ তিনচারপুরুষ শুদ্ধব্রাহ্মণাচারী হয়, তাহা হইলে সেই বংশ বিপ্রত্ব লাভ করে—এইরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেবল এক পুরুষ ব্রাহ্মণধর্ম্মী হয়, আর সেই ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরাগত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণত্বলাভ হয় না।

বর্ণবিভাগ যে কেবলমাত্র ভেদভাবের পোষণ করে, ইহা সত্য নহে। ইহা অবস্থানুসারে উদার হয়। কালে ইহা এত উদার হইয়া উঠিল যে, শূদ্রসম্মেলনজাত সঙ্করবর্ণের গুরুভারে আর্য্যেরা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সঙ্করজাতিরা আর্য্য-

জাতির উচ্চ লক্ষ্য বুঝিতে পারে নাই। তাহারা আর্য্যতন্ত্রের ভিতর বৈষম্য আনিয়াছিল, নিবৃত্তিমার্গকে প্রবৃত্তির দ্বারা কলুষিত করিয়াছিল। বৈষম্যদোষে আর্য্যসমাজ অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অবসাদ বৈনাশিক বৌদ্ধবাদের প্রসরভূমি হইয়াছিল। ভারত আর্য্য-আদর্শ-বিরহিত হইয়া অধঃপতিত হইল। যে আর্য্যেরা অত্যুদারতার জন্য বিখ্যাত, তাহারাই আজ অনুদার বলিয়া নিন্দিত। আর নিন্দা করে কারা?—যারা পরাজিত জাতিসকলের সহিত কখনও মিলিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাদিগকে নাশ করে। ইংরেজের হস্তে মার্কিনের আদিম জাতির আজ কি দুর্দশা হইয়াছে। আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতেও তথৈব চ। কেবল পুঁথিগত উদারতার আড়ম্বর দেখিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে অনুদার ও নিষ্ঠুর বলিয়া গুরুনিন্দাপাতকে পাতকী হইয়াছি।

য়ুরোপের বর্ণভেদ নাই বলিয়া তথায় সামাজিক ভেদভাব নাই, এই ধারণা মনগড়া। সেখানে ঐশ্বর্য্যশালীতে আর দীন শ্রমজীবীতে এত প্রভেদ যে, তাহাদের জিগীষার আদর্শ জিঘাংসায় পরিণত হইয়াছে। বৈনাশিকেরা (nihilist) ও সামাজিক সাম্যবাদীরা (socialist) তাহার সাক্ষী। শ্রমজীবীদিগের বিপুল ধর্ম্মঘটসকল য়ুরোপকে ব্যস্ত করিয়াছে, বিরোধের ভয়ঙ্কর ছবি দেখাইয়া য়ুরোপীয় সমাজকে ভীত করিয়াছে।

বর্ণধর্ম্মে জিগীষা প্রবৃত্তির পরিপুষ্টি হয় না, মানববুদ্ধি কর্ম্মবদ্ধ হইয়া পড়ে ও কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। য়ুরোপে ওরূপ বন্ধন নাই, তাই তথায় জিগীষা আছে, বিজয়লক্ষ্মীর শোভা আছে, প্রতিভার স্ফূর্ত্তির জন্য প্রশস্ত ভূমি আছে, উন্নতির অনন্ত পথ খোলা আছে। আর এখানে কোন ব্যক্তি যদি কৌলিক কর্ম্ম করিতে অপটু হয়, যদি তাহার প্রতিভা পরধর্ম্মপালনে স্বভাবত ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোন উপায় নাই। তাহাকে বর্ণের বেড়ার মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া তাহার নৈসর্গিক বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিতে হয়। বর্ণধর্ম্ম এপ্রকার অপ্রশস্ত নয়। বর্ণধর্ম্মপালনে প্রতিভার যথেষ্ট উৎকর্ষ হইত। তাহাতে প্রতিভার স্বাধীনতা নষ্ট হইত না। জনক ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের গুরু হইয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সকলে আপন-আপন বর্ণধর্ম্মপালন করিবে, এইরূপ শাসন ছিল বটে, কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা এই শাসন যে অতিক্রম করিতে পারিত না, এমত নহে। আর আপৎকালে বা লোকরক্ষার্থে জনসাধারণে পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত। গৌতম বলিয়াছেন—আপৎকালে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং যে পর্য্যন্ত শিক্ষাসমাপ্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের শুশ্রূষা এবং অনুগমন করিবে (গৌতমসংহিতা—৭)। ব্রাহ্মণ স্বকীয় ধর্ম্মপালনে শ্রেষ্ঠতা লাভ না করিতে পারিলে, ক্ষত্রিয়বৃত্তি বা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে ও কালের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। কৌলিক কর্ম্মে নিরত থাকাই বিধি ছিল।

কিন্তু বিধি লোকস্থিতির জন্য। তজ্জন্য বিধি-সকলকে কালানুসারে প্রসারিত বা সংকুচিত করিতে হয়। যদি রাজা বিদেশীয় হয়, তাহা হইলে কুলধর্ম্মনিষ্ঠা আর জীবিকায় বিরোধ হইয়া থাকে। তখন একটা সামঞ্জস্য হওয়া আবশ্যক। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুলমর্য্যাদা-রক্ষা হয়, অথচ স্থিতিভঙ্গ না হয়—এই সংহিতাকারদিগের উদ্দেশ্য ছিল। আর্য্যদিগের ইতিহাসে সকল সময়ে স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের সামঞ্জস্য যথাযথ হইয়াছিল কি না, তাহা বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, বর্ণধর্ম্ম স্থিতিশীল হইলেও কালের গতির সহিত অগ্রসর হইতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বংশগৌরবের দ্বারা চালিত না হইলে সমাজ কর্ম্মহীন হইয়া পড়ে। বিলাতে বর্ণধর্ম্ম নাই। তথায় মোটামুটি ঐশ্বর্য্যলাভানুসারে কর্ম্মের আদর। তাই আজ সেখানে যুদ্ধে যাইবার জন্য লোক পাওয়া যাইতেছে না। লর্ড কিচনর দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, আনাড়ি লোক পাঠাইলে আর চলিবে না। শস্ত্রব্যবসায়ে তত পয়সা আসে না, তত প্রতিষ্ঠা নাই; তজ্জন্য লোকের ইহাতে তত আস্থা নাই। রাজপুরুষেরা তথায় বলপূর্ব্বক লোকদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। কর্ম্ম কুলগত হইলেই যে হীন হয়, আর স্বাধীন হইলেই যে শোভন হয়, এমন নহে।

এক হইতেই বহু হইয়াছে বা একই বহুরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। যাহাতে একেতেই আবার সব পর্য্যবসিত হয়, তাহাই আমাদের সাধন। কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে কর্ম্মসূত্র বিনষ্ট হয়। কিন্তু সংসারে রজোগুণেরই প্রাবল্য। মর্য্যাদা রজোগুণের উত্তমাংশ এই উত্তমাংশকে চালিত করিলে প্রকৃতি সত্ত্বানুকূল হয়। পরমার্থতত্ত্ব রজোবিশিষ্ট প্রকৃতিতে ভাল স্থান পায় না। তজ্জন্য সেই প্রকৃতিকে রজোগুণেরই সুবিহিত চালনার দ্বারা সুপথে লইয়া যাইতে হয়। অতএব ঋষিরা আশ্রমধর্ম্মনিয়মিত কুলমর্য্যাদার ভিত্তিতে কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফললিপ্সা-দোষ হইতে উহাকে সংস্কৃত করিয়াছিলেন। বর্ণবিভাগ রজ ও সত্ত্বের বিরোধ ভঙ্গ করে, রজোগুণকে সত্ত্বানুযায়ী করে, প্রকৃতিকে সাম্যাবস্থায় আনয়নের উদ্যোগ করে। এই একনিষ্ঠতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা ও সমাজকে রাজসিক আড়ম্বরের ভিতর দিয়া সাত্বিক পথে লইয়া যাওয়া অতি দুষ্কর। নেতারা জ্ঞানী ও ত্যাগী না হইলে আদর্শ নষ্ট হইবার আশু সম্ভাবনা। এই দুরূহ নেতৃত্বভার লইবার জন্য ব্রাহ্মণবর্ণের উদ্ভাবনা। তাঁহাদের বিশেষ কার্য্য অধ্যাপন ও যাজন। তাঁহাদের আজীবিকা প্রধানত প্রতিগ্রহ অর্থাৎ অযাচিত দানের উপর নির্ভর করিত। ঐশ্বর্য্যসঞ্চয় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল। কঠোর শমদমসংযমে তাঁহাদের জীবন নিয়মিত ছিল। ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে তাঁহারা অবমানিত, লাঞ্ছিত, পরিবর্জ্জিত হইতেন। মনু বলেন—যে দ্বিজ বেদাধ্যায়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। বসিষ্ঠ বলেন—বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ হইলে তাহার অতিক্রমে

ব্রাহ্মণাতিক্রম হয় না (বসিষ্ঠসংহিতা—৩)। সমাজকে একত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইঁহাদেরই উপর ভার ছিল। ইঁহারা ব্যবসায়ী ছিলেন না, শস্ত্রজীবী ছিলেন না। তাই তাঁহাদের স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইবার অল্প সম্ভাবনা ছিল। ইংরেজ রাজনীতি তন্তুবায় ও মদ্যবিক্রয়ীদিগের হস্তে পড়িয়া আজ কত না কলুষিত হইয়াছে? সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতির শুদ্ধত্ব রাখিবার জন্যই নেতাদিগকে স্বার্থশূন্য শুদ্ধতায় ভূষিত করা হইয়াছিল।

একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপ্রধান আশ্রমধর্ম্ম হিন্দুত্বের ভিত্তি। এই আশ্রমধর্ম্ম হিন্দুজাতিকে ঘোর বিপ্লবসমূহ হইতে রক্ষা করিয়াছে, আর্য্যত্বকে স্থায়ী করিয়াছে। হিন্দুত্বের এক অটল ভিত্তি আছে, এইরূপ বোধ ও আত্মমর্য্যাদা উদ্ভাবিত করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। এই আত্মমর্য্যাদা ব্যতীত বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সংস্কার করিতে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িবে।

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

উপকথা ?

প্রথম প্রার্থনা।

রামশঙ্কর রায় বিকালবেলায় ফুলের বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সঙ্গে ছোট-ছোট পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী। তাহারা দাদামশায়কে বাগানের মধ্যে বেঞ্চের উপর বসাইয়া ফলফুলপত্রপল্লবে তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া দিল। পৌত্রী-দৌহিত্রীরা ফুলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরাইল, পৌত্র-দৌহিত্রেরা সপুষ্পপত্র কামিনীর একটি ক্ষুদ্রশাখা তাঁহার মস্তকে চূড়ার ন্যায় বাঁধিয়া সেই চৈত্রমাসেই রাসলীলার আয়োজন-উদ্যোগ করিল। এমন সময় ঠাকুরবাড়ীতে শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদিত হইয়া বিগ্রহের সান্ধ্য আরতি সূচিত হইল। আরতি-অন্তে সেদিন ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তনের কথা ছিল,—তাহারা প্রস্তাবিত রাসনাট্য পরিত্যাগ করিয়া সেই দিকে ছুটিল।

সে দিন পূর্ণিমা। দেখিতে দেখিতে দূরস্থ আমগাছের মাথার উপর দিয়া পূর্ণচন্দ্র উদয় হইল। চৈত্রের শেষ; সুগন্ধ মৃদুবায়ু ঝুরঝুর্ করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে মালতী, বেল, মল্লিকা, রজনীগন্ধা ফুটিয়া বাগান প্রফুল্ল, হাসিময় করিয়া তুলিল। আর কোকিল?—সে তো ডাকিয়া আকুল!—ভ্রমরও আসিল।

সেই চন্দ্রালোকফুল্ল, স্ফুটকুসুমামোদিত কুহুস্বরমুখরিত উদ্যানে রামশঙ্কর একাকী বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বয়স ষাটবৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। মস্তকে বিরল কেশ, তাহাও পক্ব, শরীর বলিত, দন্ত স্খলিত।

কিন্তু স্থান ও ঋতু মাহাত্ম্যে তাঁহার শীর্ণশরীরও যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ফুল যুবকযুবতীর সাক্ষাতেও ফোটে, বৃদ্ধের সাক্ষাতেও ফোটে; সুবাসিত বায়ু আবালবৃদ্ধযুবক সকলের শরীরেই মৃদু প্রহত হয়; গাছে বসিয়া যখন কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করে, তখন শ্রোতার যৌবন কি বার্দ্ধক্য কিছুই লক্ষ্য করে না। আর পূর্ণিমার চাঁদ? সে তো পৃথিবী ভরিয়া হাসি ছড়ায়; যুবা-বৃদ্ধ, অন্ধ-কুব্জ বাছে না, জল-স্থল বিচার করে না, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্ব্বত, চেতন-অচেতন, কোন প্রভেদ মানে না। বসিয়া বসিয়া দেখিয়া শুনিয়া রামশঙ্কর রায়ের জীর্ণশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া রামশঙ্কর ভাবিলেন—সেই ফুল ফোটে, সেই কোকিল ডাকে, সেই বাতাস বহিয়া যায়, সেই চাঁদ হাসে, সেই আমিও আছি; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্‌, সকলই তো আছে;—তবে কেন ফুল ফুটিয়াও ফোটে না, কোকিল ডাকিয়াও ডাকে না, চাঁদ হাসিয়াও—" রামশঙ্কর দাঁড়াইলেন, কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"বিধাতা, কেন এমন হইল?"

জ্যোতির্ম্ময় বিধাতা পুরুষ রামশঙ্করের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—

"কি, রামশঙ্কর, কি চাও?"

রামশঙ্করের শিরায় শিরায় প্রবলবেগে রক্তপ্রবাহ ছুটিতেছিল, তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন—

"প্রভু, কামনা ফুরায় নাই, কাম্যবস্তুতে সংসার ভরা, ভোগের শক্তি কেন নষ্ট করিয়াছ?—ফুল ফোটে, চাঁদ উঠে,—চক্ষু কেন কোয়াসায় ঢাকা? কোকিল ডাকে, পাপিয়া ডাকে, কর্ণ—"

বিধাতা। রামশঙ্কর, তোমার প্রার্থনা কি?

রাম। সেই চক্ষু, সেই কর্ণ দাও; সেই হস্ত, সেই পদ, সেই শরীর-মন দাও।

বিধাতা। কোন্ চক্ষু, কোন্ কর্ণ?

রাম। পঁচিশবৎসর বয়সকালে যে চক্ষুকর্ণ, দেহমন ছিল, তাহা ফিরাইয়া দাও।

বিধাতা পুরুষ "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রামশঙ্কর চাহিয়া দেখিলেন,—বসন্তপূর্ণিমার চন্দ্রবিম্বে কত শোভা হইয়াছে! চন্দ্রালোকপ্রফুল্ল নীলাকাশে কত সুন্দর, কত শতসহস্র গ্রহতারা শোভা পাইতেছে! মালতী-মল্লিকা-যূথী কেমন হাসিতেছে,—মৃদু মলয়সমীরে কেমন দুলিতেছে! কত কোকিল ডাকিতেছে, কি মধুমাখা স্বর! তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। নিজের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—সে বলিত জীর্ণদেহ আর নাই; কি সুগঠিত বলিষ্ঠ গৌরবাহু, কি বিশালবিস্তার বক্ষ! মস্তকে হাত দিয়া দেখিলেন, অনতিদীর্ঘ নিবিড় কেশদাম বায়ুস্পর্শে কম্পিত হইতেছে; চক্ষুর কি নবীন পরিষ্কার দৃষ্টি! বহুদূরসমানীত কলবিহঙ্গনিনাদও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল! সমস্ত শরীরে উৎসাহ, হৃদয় উৎফুল্ল! বাহুবিস্তার করিয়া, বক্ষ স্ফীত করিয়া, রামশঙ্কর কুসুমসুবাসিত সেই মলয়প্রবাহে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন; অভিনব উদ্যমে ক্ষুদ্র উল্লম্ফন দিয়া পদযুগল ও কটিদেশের দৃঢ়তা ও সমস্ত শরীরের নবীন সজীবতা পরীক্ষা করিয়া অব-

শেষে স্মিতপ্রফুল্ল মুখে রামশঙ্কর গুপ্তদ্বার দিয়া আপনার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এক কোণে প্রাচীনা গৃহিণীর একখানি আরসি ছিল, তাহার পারদলেপ প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল, সেখানি আলোর নিকট আনিয়া রামশঙ্কর তাহাতে আপনার মুখ দেখিলেন। স্বয়ং বিধাতার বর; রামশঙ্করের সে কুঞ্চিত ললাট, কোটরগত চক্ষু, শুভ্র ভ্রূ, বিরলদন্ত মুখ আর নাই! পঞ্চবিংশতিবর্ষের নবীন যুবকের মনোহর শ্রী তাঁহার আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় কে যেন বারান্দা হইতে জিজ্ঞাসা করিল—

"ফিরেছ কি ?"

গৃহিণী! রামশঙ্করের ধমনীমধ্যে শোণিতপ্রবাহ খরস্রোতে ছুটিয়া চলিল। তিনি স্মিতমুখে চঞ্চলচরণে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—

"ফিরেছি গো, এস।"

গৃহিণী। এত রাত, বাগানে না ঘুরিলে কি হয় না ?—সর্দ্দি, কাশী—"

গৃহিণী ঘরে প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।—এ কে ? মনে পড়ে-পড়ে, স্বপ্নের কথা, বহুদিনের কথা! রামশঙ্কর স্মিতমুখে চঞ্চলচরণে অগ্রসর হইয়াছিলেন, গৃহিণীকে দেখিয়া তিনিও থামিলেন।—এ কি রূপ ?

দন্তহীনা, পক্ককেশী, জীর্ণশীর্ণশুষ্কাঙ্গী—ঠাকুরাণীদিদির উপযুক্তা গৃহিণী! মধুর স্বাগতসম্ভাষণ আর উচ্চারিত হইল না, হস্তাবলম্বনজন্ত উত্তোলিত কর অবনমিত হইল। ক্ষণকাল উভয়ে নীরব—নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। বৃদ্ধা গৃহিণী স্মৃতিমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, চিনিলেন; নবীন বয়সের সেই অভিরামরূপ স্বামীকে সাক্ষাতে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিল; তরুণ স্বামী প্রাচীনা গৃহিণীর সেই জীর্ণশীর্ণশুষ্ক বিরূপমূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

গৃহিণী। "কি গো, বসন্ত কি আবার ফিরল ?—শুষ্ক তরুতে যে নূতন মঞ্জরী!

রাম। কই নূতন মঞ্জরী ?—বসন্ত ফিরিয়াছে কই ?

তখন উভয়ে কথা হইল। বিধাতার বরে যে নূতন বয়স ফিরাইয়া পাইয়াছেন, স্বামী তাহা বলিলেন। তখন বর্ষীয়সী গৃহিণী বলিলেন—

"নূতন বয়স পাইয়াছ, নূতন গৃহিণী আন;—এ বিরূপা মূর্ত্তিতে তো আর তোমার তৃপ্তি হইবে না!"

রামশঙ্কর রায় উঠিলেন। বলিলেন—

"তুমি একটুকু বসো; আমি আসিতেছি।"

রামশঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী বহু—বহুকাল হইল বিগত, শুধু স্মৃতির সাহায্যে মানসচক্ষে ম্লানোদিত, নিজের ষোড়শী যুবতী মূর্ত্তি ও কমনীয় কান্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় প্রার্থনা।

রামশঙ্কর রায় দ্রুতপদে ফুলের বাগানে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে কাতরকণ্ঠে কহিলেন —

"বিধাতা, এ কেমন করিলে?"

বিধাতা পুরুষ আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি হইয়াছে, রামশঙ্কর?"

রাম। কি করিব এ যুবাবয়স নিয়া, ঘরে গৃহিণী যে বর্ষীয়সী!"

বিধাতা। তোমার প্রার্থনা কি?

রাম। আমার নবীন বয়স আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছ, পার্শ্বে বর্ষীয়সী স্ত্রী, এ বিড়ম্বনা কেন? যদি দয়াই করিয়াছ প্রভু, তবে আমার সে বয়সের সেই নবীনা স্ত্রী ফিরাইয়া দাও।

"তথাস্তু" বলিয়া বিধাতা অন্তর্হিত হইলেন।

রামশঙ্করের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি দ্রুতহস্তে রাশীকৃত মল্লিকা-মালতী, যুঁই-বেল চয়ন করিয়া নিজের পরিহিত বস্ত্র-প্রান্তে বাঁধিয়া লইলেন, সূক্ষ্ম লতাসূত্রে একটি সুরম্য মালা গাঁথিয়া সঙ্গে লইলেন; আর বিলম্ব করিলেন না; নবীন আশা, নবীন উদ্যমে শয়নগৃহের দিকে চলিলেন।

এদিকে শয়নকক্ষে অকস্মাৎ বর্ষীয়সী গৃহিণীর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল; মন্থরগতি রক্তপ্রবাহ হঠাৎ তাঁহার শিরায় শিরায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিল। চক্ষুর দৃষ্টিপ্রসার পরিষ্কৃত, বিস্তৃত হইল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল যেন নবীন উৎসাহ-উদ্যমে নৃত্য করিয়া উঠিল। গৃহিণী উঠিয়া দর্পণে আপনার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আর সে বৃদ্ধত্ব নাই; অষ্টাদশ-বর্ষীয়ার সুন্দরারক্তলাবণ্যময় অধরোষ্ঠ, সুগোল পূর্ণগণ্ড, সুগঠিত পীবর অংশদেশ, সুদীর্ঘ বেণীবদ্ধ কেশরাশি দেখিয়া গৃহিণীর চিত্ত উদ্বেলতরঙ্গময় হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর প্রতীক্ষায় চকিতনয়নে দ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় স্বামী সে ঘরে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ বিধাতার বর! স্মৃতি-রাজ্যে চিরবিহারিণী সেই যৌবনসঙ্গিনীকে সম্মুখে দেখিয়া রামশঙ্কর মনে মনে বিধাতার উদ্দেশে শতপ্রণাম করিলেন। আলোর নিকটে বসিয়া দুজনে কত কথা হইল, কত প্রসঙ্গ হইল; পৃথিবী নন্দনকানন হইল। এমন সময় জ্যেষ্ঠপৌত্রবধূ সুহাসিনী চরণকমলযুগ-পরিহিত মলচতুষ্টয়ের মৃদু রুণু-ঝুনু শব্দে বারান্দা নিনাদিত করিয়া সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। সুহাসিনী পঞ্চদশ বর্ষ এখনো অতিক্রম করে নাই; চারুমুখে নিত্যবিরাজিত হাসির কিরণ লইয়া দাদা-মশায়ের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। প্রতি-দিন সন্ধ্যার পর বৃদ্ধ দাদামশায়ের জন্য পান ছেঁচিয়া আনে, আজও আনিল। বৃদ্ধ দাদামশায় স্নেহে তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকেন, মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং পৌত্রের সঙ্গে ভার্য্যাবিনিময়ের ভয় দেখান। আজ কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কের উপর অপরিচিত যুবক-যুবতীকে দেখিয়া সুহাসিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। রামশঙ্কর বলিলেন—

"আন, দিদি, পান এখানে রাখ।"

স্বর শুনিয়া সুহাসিনী অতিত্বরে সে ঘর হইতে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। সুহাসিনী ভাবিল, 'দাদামহাশয়ের শয়নঘরে ইহারা কে বসিয়া?'—সে তাড়াতাড়ি আপনার শয়ন-

কক্ষে স্বামীর নিকট এই অপরিচিত স্ত্রী-পুরুষের আগমনের কথা বলিতে গেল।

এদিকে রামশঙ্কর বলিলেন—

"ওগো, আজও কি ছেঁচা পান খাইব ?"

গৃহিণী বলিলেন—

"কেন ? আমি পান সাজিয়া দিব এখন।"

রামশঙ্কর বাগান হইতে আনীত ফুলরাশি দিয়া গৃহিণীকে সজ্জিত করিয়াছেন। গৃহিণীর গলায় ফুলের মালা, কানে ফুল, মাথায় ফুল, বেণীতে ফুল, শয্যায় কত ফুল পড়িয়া রহিয়াছে !

এমন সময় পুত্র অবিনাশচন্দ্র পিতা-মাতাকে প্রণাম করিবার জন্য সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন ;—এ কি ? পিতার শয়নগৃহে পুত্র-পুত্রবধূ বসিয়া নাকি ?—অবিনাশচন্দ্র লজ্জায় তন্মুহূর্ত্তেই সে ঘর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

রামশঙ্কর ডাকিলেন—

"বাবা এসেছ ! এস, এস।"

অবিনাশচন্দ্র দেখিলেন, এ তো ঠিক পুত্র প্রতাপচন্দ্রের স্বর ! ভাবিলেন, পুত্র-পুত্রবধূ বুঝি আজ রাত্রিতে এ ঘরে শয়ন করিবে। নিশ্চয় জানিবার জন্য কিছু দূরে যাইয়া "প্রতাপ" "প্রতাপ" বলিয়া পুত্রকে ডাকিলেন। অপর এক ঘর হইতে উত্তর দিয়া প্রতাপ পিতার নিকট উপস্থিত হইল। অপর ঘর হইতে তাহাকে বাহির হইতে দেখিয়া অবিনাশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কর্ত্তার ঘরে তুমি ছিলে না ?"

প্রতাপ। না ; আমি তো আমার ঘর হইতে আসিতেছি।

অবিনাশ। তবে কর্ত্তার ঘরে কাহারা বসিয়া ?

প্রতাপ। জানি না। আমিও শুনিয়াছি, সে ঘরে যেন কাহারা বসিয়া আছেন।

অবিনাশ। যাদব কি আজ এখানে আসিয়াছে ?

যাদব তাঁহার জামাতা। প্রতাপ বলিল—

"না ; যাদববাবু তো আজ আসেন নাই।"

অবিনাশ। তবে কে ইঁহারা !—তুই যা ; আমি জানিয়া আসি।

অবিনাশচন্দ্র পুনরায় পিতার শয়নগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনের শব্দ পাইয়া রামশঙ্কর ডাকিয়া বলিলেন—

"কে ও ? অবিনাশ নাকি ? এস, ঘরে এস।"

অবিনাশচন্দ্রের বয়স চল্লিশ হইয়াছে ; তাঁহার মস্তকে, শ্মশ্রুতে পক্বকেশ দেখা দিয়াছে। গৃহে প্রবেশ করিয়া অসঙ্কোচে অবস্থিত যুবকযুবতীকে দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন।

রাম। কি অবিনাশ, অমন করিয়া রহিলে কেন ?

এই তরুণবয়স্ক লোকটা তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, 'তুমি-আমি' বলিয়া কথা বলিতেছে,—কে এ ? পাশে বসিয়া এই তরুণীই বা কে ?—অবিনাশচন্দ্র মহা চিন্তায় পড়িলেন।

রাম। অবিনাশ, ব্যাপারটা কি ?

অবিনাশ। ব্যাপারটা কি, বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা কে ?—কোথা হইতে আসিয়াছেন ?

রাম। সে কি রে! আমাকে চিনিতে পারিস্ না?—ইনি তোর জননী।

গৃহিণী বলিলেন—"কিরে, এখনি ভুলিলি?"

অবিনাশচন্দ্রের মুখে বাক্য নাই! হঠাৎ তখন রামশঙ্করের মনে পড়িল। পুত্রকে বলিলেন—

"তা তোমার দোষ নাই। আমাদের এ বেশ, এ বয়স দেখিতেছ; কেমন করিয়া চিনিবে? বিধাতার বরে আজ আমরা নবীন বয়স ফিরিয়া পাইয়াছি। আমাদিগকে প্রণাম কর।"

পুত্র-পুত্রবধূবৎ দৃশ্যমান সেই যুবকযুবতীর মুখের দিকে বিস্মিতনেত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অবিনাশচন্দ্র তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিলেন। প্রণিপাতকালে পুত্রের পক্ক কেশ, আগতপ্রায় বার্দ্ধক্য দেখিয়া গৃহিণী বড় লজ্জিতা হইলেন। অবিনাশচন্দ্র সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।—বিধাতার বর, কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা!

পুত্র চলিয়া গেলে গৃহিণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"এ কি রকম হইল?—ফুলের মালায় সেজেগুজে এই নবীন বয়সে আমরা বৃদ্ধ পুত্রের প্রণাম লইব না কি?"

রামশঙ্কর বলিলেন—

"তাই তো, এ কেমন হইল!—তুমি একটুকু বসো; আমি আর একবার দেখিয়া আসি।"

তৃতীয় প্রার্থনা।

রামশঙ্কর তখন খড়্গদ্বার দিয়া পুনরায় ফুলের বাগানে উপস্থিত হইয়া কাতরস্বরে ডাকিলেন—

"প্রভু, এ কি রকম হইল?"

বিধাতা পুরুষ পুনরায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—

"কি, রামশঙ্কর?—আবার কেন?"

রাম। এও যে যেন কেমন হইল! স্ত্রীপুরুষ আমরা যুবকযুবতী হইয়াছি; কিন্তু বৃদ্ধ পুত্র আসিয়া অভিবাদন করে! মার বয়সী পুত্রবধূ আসিয়া প্রণাম করিবে?

বিধাতা। কি ইচ্ছা তোমার?

রাম। ইহার একটা উপায়, একটা প্রতিবিধান কর; নতুবা এ নবীন বয়স পাইয়াও সুখ হইতেছে না। সম্মুখে বৃদ্ধ পুত্র-পুত্রবধূ; যুবা পৌত্র-পৌত্রবধূ; আর আমরা এই বেশে বিলাসে মত্ত হইব?—প্রভু, ইহার একটা উপায় করিয়া দাও।

বিধাতা। উপায় করিব?—ভাল, তোমার পুত্র-কন্যা, পৌত্র-দৌহিত্র, পুত্রবধূ-পৌত্রবধূ—সকলে পরলোকে চলিয়া আসুক; তোমরা যুবক-যুবতী স্ত্রী-পুরুষ নিঃসঙ্কোচে সংসারে যা কিছু কাম্য আছে, উপভোগ কর।

রাম। সে কি, প্রভু! এত স্নেহের পুত্র-পৌত্র, কন্যা-দৌহিত্র—সকলে চলিয়া যাইবে?—আর আমরা বাঁচিয়া থাকিব?

বিধাতা। তবে কি করিতে চাও? তুমি পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সের রূপযৌবন উপভোগ করিবে, অথচ এই সকল পুত্র-পৌত্র, কন্যা-দৌহিত্র, সকলই তোমার থাকিবে, এও কি সম্ভব হয়? তুমি যখন পঁচিশ বৎ-

সরের ছিলে, তখন কি তোমার এ সকল ছিল ? তোমার পুত্র অবিনাশ তখন তিন বৎসরের শিশুমাত্র ছিল, সেই শিশু-পুত্র তোমার থাকিবে ; আর সকলে চলিয়া যাইবে।

রাম। পৌত্র প্রতাপ, অক্ষয়, যদু; দৌহিত্র শরৎ, বিপিন ; কন্যা শ্যামা ; পুত্র-বধূ সুহাসিনী, নলিনী, মাধুরী—

বিধাতা। সকলকেই আমি পরলোকে পাঠাইব।

রামশঙ্কর জোড়হস্তে বলিলেন—

"প্রভু, তাহা সহিতে পারিব না। সকল ছাড়িয়া কি লইয়া থাকিব ?"

বিধাতা। রূপযৌবন লইয়া, রূপবতী যুবতী ভার্য্যা লইয়া, কামনার বস্তুপূর্ণ এই বিপুল সংসার লইয়া!—দেখিতেছ না, ইহারা কেহই তোমাদিগকে চিনিতে পারে না। তোমার যৌবনে ইহারা কোথায় ছিল ? কেমন করিয়া তোমাদিগকে চিনিবে ? রাত্রিশেষে ইহারা চলিয়া যাইবে।

রামশঙ্করের চক্ষে জল আসিল। তাঁহার নবযৌবনোদ্ভাসিত মনোহর মুখশ্রীতে কালিমার ছায়া পড়িল। জোড়হস্তে কাতরকণ্ঠে রামশঙ্কর বলিলেন—

"কি করিব রূপযৌবন দিয়া ?—একটি-দুইটি করিয়া এত কালে যে এত স্নেহবন্ধনে মনকে বাঁধিয়াছি, একদিনে সে সমস্ত ছিন্ন করিব ?—কি লোভে, কিসের বিনিময়ে? রূপযৌবন! চাহি না প্রভু, চাহি না;—বৃদ্ধত্বই আমার ভাল।"

বিধাতা। নিজের যৌবন, স্ত্রীর রূপ-যৌবন, ধনধান্যে ভরা এই সংসার,—এ সকলে তোমার তৃপ্তি হইবে না ?

রাম। রূপ, যৌবন, সংসার—! কিন্তু প্রভু, এই যে কিশোরকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রী একত্র বাস করিয়াছি, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, অবস্থার শত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কত-সহস্র মধুর স্মৃতিতে জীবন পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে সকল স্মৃতিও থাকিবে না ?

বিধাতা। না। পঁচিশবৎসর বয়সের যুবা হইয়াছ, সেই বয়সের-পরের স্মৃতি তোমার কিছুই থাকিবে না; সমস্ত ভুলিয়া যাইবে। তাহার পর তোমার পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, যাহা কিছু হইয়াছে, সকল চলিয়া যাইবে। আবার তোমাদের নূতন জীবন আরম্ভ করিতে হইবে।

রাম। তাহা পারিব না, প্রভু; চাহি না রূপযৌবন; যে বার্দ্ধক্য আমার, তাহাই ফিরাইয়া দাও।

"তথাস্তু" বলিয়া বিধাতা পুরুষ সেই চন্দ্রালোকফুল্ল নীলাকাশে লীন হইয়া গেলেন।

এদিকে গৃহিণীর আবার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল। বিম্বাধর আবার শুষ্ক, নীরস হইল; সুরম্য দন্তশ্রেণী লোপ হইল; কমনীয় মুখমণ্ডল, সমস্ত দেহ—বলিত, লোলচর্ম্ম হইল; চক্ষুর সে বিশদ দৃষ্টি ঘোর হইল; নিবিড় নীল কেশদামের পরিবর্ত্তে মস্তকে পক্ব বিরল কেশ দেখা দিল! বৃদ্ধ রামশঙ্কর গৃহে আসিয়া সেই পঞ্চপঞ্চাশদ্‌বর্ষীয়া বৃদ্ধা ভার্য্যার শুষ্কমুখ বক্ষে ধরিয়া পরম তৃপ্তি বোধ করিলেন।

তখন পুত্রকে ডাকিলেন; পৌত্র, দৌহিত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রবধূ, সকলকে ডাকিলেন; সকলের শিরশ্চুম্বন করিয়া দীর্ঘজীবী হইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া রামশঙ্কর রায় বলিলেন—

"বাছাসকল, আজ আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম;—বিধাতার বরে যেন আমার পঁচিশ-বৎসর বয়সের রূপযৌবন ফিরিয়া আসিয়াছিল;—কিন্তু তোমাদিগকে হারাইতে বসিয়াছিলাম। ঈশ্বর-আশীর্ব্বাদে সে স্বপ্ন মিথ্যা হইয়াছে।"

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সরমার সুখ। "পরিণয়কাহিনী"-প্রণেতা প্রণীত। মূল্য,—ফ্যান্সি কাগজের মলাট একটাকা; উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁধাই পাঁচসিকা।

উপন্যাসখানি পড়িয়া মোটের উপর প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার সহৃদয়। কুলীন-কন্যাদিগের দুঃখে তিনি যে ব্যথিত-হৃদয়, তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার রচিত 'পরিণয়-কাহিনীতে' পাইয়াছিলাম। এই পুস্তকে সেই চিত্রই অধিকতর বিস্তৃতভাবে এবং উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পাপিষ্ঠেরা নিজের পাপানুষ্ঠানের দ্বারাই নিজের সর্ব্বনাশ কেমন করিয়া ডাকিয়া আনে, তাহা অনন্তবাবুর চরিত্রে পরিষ্কাররূপে এবং সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সরমা ও সুরেশের বিবাহ যে হইল না, সরমা যে মরিয়া গেল, ইহাতে সাধারণ বাঙালী পাঠক—বিশেষত উৎকট সমাজ-সংস্কারকের দল—বোধ হয় বড়ই ক্ষুণ্ণ হইবেন; কিন্তু আমরা প্রীত হইয়াছি। যেরূপ চরিত্র-সমাবেশ, যেরূপ ঘটনা-পরম্পরা, তাহাতে সরমার মরিয়া যাওয়াই ঠিক হইয়াছে। অন্যরূপ হইলে, গুণগ্রাহী বাঙালী পাঠকেরা হয় ত সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্য্যের অপচয় হইত।

কুলীন-গৃহের চিত্রে যেন খানিকটা অস্বাভাবিকতা দেখিলাম। আমরা নিজের জ্ঞানেও জানি, এবং বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের পুস্তক পড়িয়াও জানি যে, কুলীন-গৃহে কন্যারই স্থান, কন্যারই প্রভুত্ব; পুত্রবধূর স্থান সেখানে নাই, থাকিলেও এত সামান্য যে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ভবানীবাবুর অঙ্কিত চিত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। কিন্তু যে পুস্তক পড়িয়া প্রীত হইয়াছি, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ধরিবার প্রয়োজন দেখি না।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

দ্বাদশ-সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

সূচী।

৫৫৫ পৃষ্ঠা হইতে ৫৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত
৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিন প্রেসে
শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ দ্বারা ও অবশিষ্টাংশ 'কলিকাতা' মেশিন প্রেসে
শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

বঙ্গদর্শন।

বারোয়ারি-মঙ্গল।

আমাদের দেশের কোন বন্ধু অথবা বড়লোকের মৃত্যুর পর আমরা বিশেষ কিছুই করি না। এইজন্য আমরা পরস্পরকে অনেকদিন হইতে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতেছি—অথচ সংশোধনের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ধিক্কার যদি আন্তরিক হইত, লজ্জা যদি যথার্থ পাইতাম, তবে এত-দিনে আমাদের ব্যবহারে তাহার কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত।

কিন্তু কেন আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই, অথচ লজ্জা পাই না? ইহার কারণ আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ঘা মারিলে যদি দরজা না খোলে, তবে দেখিতে হয়, তালা বন্ধ আছে কি না।

স্বীকার করিতেই হইবে, মৃত মান্য-ব্যক্তির জন্য পাথরের মূর্ত্তি গড়া আমাদের দেশে চলিত ছিল না; এইপ্রকার মার্ব্বল-পাথরের পিণ্ডদানপ্রথা আমাদের কাছে অভ্যস্ত নহে। আমরা হাহাকার করিয়াছি, অশ্রুপাত করিয়াছি, বলিয়াছি, 'আহা, দেশের এত-বড় লোকটাও গেল'—কিন্তু কমিটির উপর স্মৃতিরক্ষার ভার দিই নাই।

এখন আমরা শিখিয়াছি এইরূপই কর্ত্তব্য, অথচ তাহা আমাদের সংস্কারগত হয় নাই, এইজন্য কর্ত্তব্য পালিত না হইলে মুখে লজ্জা দিই, কিন্তু হৃদয়ে আঘাত পাই না।

ভিন্ন মানুষের হৃদয়ের বৃত্তি একরকম হইলেও বাহিরে তাহার প্রকাশ নানা-কারণে নানারকম হইয়া থাকে। ইংরাজ প্রিয়ব্যক্তির মৃতদেহ মাটির মধ্যে ঢাকিয়া পাথরে চাপা দিয়া রাখে, তাহাতে নাম-ধাম-তারিখ খুদিয়া রাখিয়া দেয় এবং তাহার চারিদিকে ফুলের গাছ করে। আমরা পরমাত্মীয়ের মৃতদেহ শ্মশানে ভস্ম করিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু প্রিয়জনের প্রিয়ত্ব কি আমাদের কাছে কিছুমাত্র অল্প? ভাল-বাসিতে এবং শোক করিতে আমরা জানি না, ইংরাজ জানে, এ কথা কবর এবং শ্মশানের সাক্ষ্য লইয়া ঘোষণা করিলেও, হৃদয় তাহাতে সায় দিতে পারে না।

ইহার অনুরূপ তর্ক এই যে, "থ্যাঙ্ক্ য়ু"র প্রতিবাক্য আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না, অতএব আমরা অকৃতজ্ঞ। আমাদের হৃদয় ইহার উত্তর এই বলিয়া দেয় যে, কৃতজ্ঞতা আমার যে আছে, আমিই তাহা জানি, অতএব "থ্যাঙ্ক্ য়ু"বাক্য ব্যবহারই যে কৃতজ্ঞতার একমাত্র পরিচয়, তাহা হইতেই পারে না।

"থ্যাঙ্ক্ য়ু"-শব্দের দ্বারা হাতে-হাতে কৃতজ্ঞতা ঝাড়িয়া ফেলিবার একটা চেষ্টা আছে, সেটা আমরা জবাবস্বরূপ বলিতে পারি। য়ুরোপ কাহারো কাছে বাধ্য থাকিতে চাহে না—সে স্বতন্ত্র। কাহারো কাছে তাহার কোন দাবী নাই, সুতরাং যাহা পায়, তাহা সে গায়ে রাখে না। শুধিয়া তখনি নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবী আছে, আমাদের সমাজের গঠনই সেইরূপ। আমাদের সমাজে যে ধনী, সে দান করিবে; যে গৃহী, সে আতিথ্য করিবে; যে জ্ঞানী, সে অধ্যাপন করিবে; যে জ্যেষ্ঠ, সে পালন করিবে; যে কনিষ্ঠ, সে সেবা করিবে;—ইহাই বিধান। পরস্পরের দাবীতে আমরা পরস্পর বাধ্য। ইহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া জানি। প্রার্থী যদি ফিরিয়া যায়, তবে ধনীর পক্ষেই তাহা অশুভ, অতিথি যদি ফিরিয়া যায়, তবে গৃহীর পক্ষেই তাহা অকল্যাণ। শুভকর্ম্ম কর্ম্মকর্তার পক্ষেই শুভ। এইজন্য নিমন্ত্রণকারীই নিমন্ত্রিতের নিকট কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করেন। আহূতবর্গের সন্তোষে যে একটি মঙ্গলজ্যোতি গৃহ পরিব্যাপ্ত করিয়া উদ্ভাসিত হয়, তাহা নিমন্ত্রণকারীর পক্ষেই পুরস্কার। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের প্রধানতম ফল নিমন্ত্রিত পায় না, নিমন্ত্রণকারীই পায়—তাহা, মঙ্গলকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার আনন্দ, তাহা রসনাতৃপ্তির অপেক্ষা অধিক।

এই মঙ্গল যদি আমাদের সমাজের মুখ্য অবলম্বন না হইত, তবে সমাজের প্রকৃতি এবং কর্ম্ম অন্য রকমের হইত। স্বার্থ এবং স্বাতন্ত্র্যকে যে বড় করিয়া দেখে, পরের জন্য কাজ করিতে তাহার সর্ব্বদা উত্তেজনা আবশ্যক করে। সে যাহা দেয়, অন্তত তাহার একটা রসিদ লিখিয়া রাখিতে চায়। তাহার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার দ্বারা অন্যের উপরে সে যদি প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট উৎসাহ তাহার না থাকিতে পারে। এইজন্য স্বাতন্ত্র্যপ্রধান সমাজকে ক্ষমতাশালী লোকের কাছ হইতে কাজ আদায় করিবার জন্য সর্ব্বদা বাহবা দিতে হয়; যে দান করে, তাহার যেমন সমারোহ, যে গ্রহণ করে, তাহারও তেমনি অনেক আয়োজনের দরকার হয়। প্রত্যেক সমাজ নিজের বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ আবশ্যক অনুসারে নিজের নিয়মে নিজের কাজ উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। দাতা দান করিয়াই কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই আমরা অত্যন্ত ঝোঁক দিয়া থাকি; আর গ্রহীতা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই য়ুরোপ অধিক ঝোঁক দিয়া থাকে। স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিলে যে গ্রহণ করে, তাহারই গরজ বেশি, মঙ্গলের দিক্ দিয়া দেখিলে যে দান করে, তাহারই গরজ বেশি। অতএব আদর্শভেদে ভিন্ন সমাজ ভিন্ন পথ দিয়া নিজের কাজে যাত্রা করে।

কিন্তু স্বার্থের উত্তেজনা মানবপ্রকৃতিতে মঙ্গলের উত্তেজনা অপেক্ষা সহজ এবং প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থনীতি-শাস্ত্রে বলে, ডিমাণ্ড্ অনুসারে সাপ্লাই অর্থাৎ চাহিদা অনুসারে যোগান্ হইয়া থাকে। খরিদ্দারের তরফে যেখানে অধিক মূল্য হাঁকে, ব্যবসাদারের তরফ হইতে সেইখানেই অধিক মাল আসিয়া পড়ে। যে সমাজে ক্ষমতার মূল্য বেশি, সেই সমাজেই ক্ষমতা-শালীর চেষ্টা বেশি হইয়া থাকে, ইহাই সহজ স্বভাবের নিয়ম।

কিন্তু আমাদের সৃষ্টিছাড়া ভারতবর্ষ বরাবর সহজ স্বভাবের নিয়মের উপর জয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অর্থনীতিশাস্ত্র আর সব জায়গাতেই খাটে, কেবল ভারত-বর্ষেই তাহা উলট্‌পালট্ হইয়া যায়। ছোট-বড় সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ মানবস্বভাবকে সহজ স্বভাবের ঊর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করি-য়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া ধনমানসম্ভোগ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই তাহার চালচলন সহজরকম নহে। আর কিছু না পায় ত অন্তত তিথিনক্ষত্রের দোহাই দিয়া সে আমাদের অত্যন্ত স্বাভা-বিক প্রবৃত্তিগুলাকে পদে-পদে প্রতিহত করিয়া রাখে। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে সে, অনেকসময় মূঢ়তাকে সহায় করিয়া অব-শেষে সেই মূঢ়তার দ্বারা নিজের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছে। ইহা হইতে, তাহার চেষ্টার একান্ত লক্ষ্য কোন্ দিকে, তাহা বুঝা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। এই-জন্য তাহার প্রবল চেষ্টা এমন-সকল উপায় অবলম্বন করে, যাহাতে শেষকালে সেই উপায়ের দ্বারাতেই সে মারা পড়ে। সমস্ত সমাজকে নিষ্কাম মঙ্গলকর্ম্মে দীক্ষিত করি-বার প্রবল আবেগে ভারতবর্ষ অন্ধতাকেও শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছে। এ কথা ভুলিয়া গেছে যে, বরঞ্চ স্বার্থের কাজ অন্ধভাবে চলিতে পারে, কিন্তু মঙ্গলের কাজ তাহা পারে না। সজ্ঞান ইচ্ছার উপরেই মঙ্গলের মঙ্গলত্ব প্রতিষ্ঠিত। কলেই হউক, আর বলেই হউক, উপযুক্ত কাজটি করাইয়া লইতে পারিলেই স্বার্থসাধন হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে কাজ না করিলে কেবল কাজের দ্বারা মঙ্গলসাধন হইতে পারে না। তিথিনক্ষত্রের বিভীষিকা এবং জন্মজন্মান্তরের সদ্গতির লোভ দ্বারা মঙ্গল-কাজ করাইবার চেষ্টা করিলে, কেবল কাজই করান হয়, মঙ্গল করান হয় না। কারণ, মঙ্গল স্বার্থের ন্যায় অন্য লক্ষ্যের অপেক্ষা করে না, মঙ্গলেই মঙ্গলের পূর্ণতা।

কিন্তু বৃহৎ জনসমাজকে এক আদর্শে বাঁধিবার সময় মানুষের ধৈর্য্য থাকে না। তখন ফললাভের প্রতি তাহার আগ্রহ ক্রমে যতই বাড়িতে থাকে, ততই উপায়সম্বন্ধে তাহার আর বিচার থাকে না। রাষ্ট্র-হিতৈষা যে-সকল দেশের উচ্চতম আদর্শ, সেখানেও এই অন্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রহিতৈষার চেষ্টাবেগ যতই বাড়িতে থাকে, ততই সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের বুদ্ধি তিরোহিত হইতে থাকে। ইতিহাসকে অলীক করিয়া, প্রতিজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিয়া, ভদ্রনীতিকে উপেক্ষা করিয়া, রাষ্ট্রমহিমাকে বড় করিবার চেষ্টা হয়,—

অন্ধ অহঙ্কারকে প্রতিদিন অভ্রভেদী করিয়া তোলাকেও শ্রেয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে—অবশেষে, ধর্ম্ম, যিনি সকলকে ধারণ করিয়া রক্ষা করেন, তাঁহাকে সবলে আঘাত করিয়া নিজের আশ্রয়শাখাটিকেই ছেদন করা হয়। ধর্ম্ম কলের মধ্যেও বিনষ্ট হন, বলের দ্বারাও বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা আমাদের মঙ্গলকে কলের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি, য়ুরোপ স্বার্থোন্নতিকে বলপূর্ব্বক চাপিয়া রাখিতে গিয়া প্রত্যহই বিনাশ করিতেছে।

অতএব, আমাদের প্রাচীনসমাজ আজ নিজের মঙ্গল হারাইয়াছে, দুর্গতির বিস্তীর্ণ জালের মধ্যে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে জড়ীভূত হইয়া আছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বটে; তবু বলিতে হইবে, মঙ্গলকেই লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ চেষ্টা ছিল। স্বার্থসাধনের প্রয়াসই যদি স্বভাবের সহজ নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মকে ভারতবর্ষ উপেক্ষা করিয়াছিল। সেই নিয়মকে উপেক্ষা করিয়াই যে তাহার দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহা নহে; কারণ, সে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াও গুরুতর দুর্গতি ঘটে—কিন্তু সমাজকে সকল দিক্ হইতে মঙ্গলজালে জড়িত করিবার প্রবল চেষ্টায় অন্ধ হইয়া, সে নিজের চেষ্টাকে নিজে ব্যর্থ করিয়াছে। ধৈর্য্যের সহিত যদি জ্ঞানের উপর এই মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করি, তবে আমাদের সামাজিক আদর্শ সভ্য জগতের সমুদয় আদর্শের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ আমাদের পিতামহদের শুভ ইচ্ছাকে যদি কলের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা করি, তবে ধর্ম্ম আমাদের সহায় হইবেন।

কিন্তু কল-জিনিষটাকে একেবারে বরখাস্ত করা যায় না। এক এক দেবতার এক এক বাহন আছে—সম্প্রদায়দেবতার বাহন কল। বহুতর লোককে এক আদর্শে গঠিত করিতে গেলে বোধ করি বারো-আনা লোককে অন্ধ অভ্যাসের বশবর্ত্তী করিতে হয়। জগতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে সজ্ঞান নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক বেশি পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টান-জাতির মধ্যে আন্তরিক খ্রীষ্টান কত অল্প, তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জানিতে পাইয়াছি। এবং হিন্দুদের মধ্যে অন্ধসংস্কার-বিমুক্ত যথার্থ জ্ঞানী হিন্দু যে কত বিরল, তাহা আমরা চিরাভ্যাসের জড়তাবশত ভাল করিয়া জানিতেও পাই না। সকল লোকের প্রকৃতি যখন এক হয় না, তখন এক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে অনেক বাজে মাল্‌মস্‌লা আসিয়া পড়ে। যে সকল বাছা-বাছা লোক এই আদর্শের অনুসারী, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক কলের ভাবটাকে প্রাণের দ্বারা ঢাকিয়া লন। কিন্তু কলটাই যদি বিপুল হইয়া উঠিয়া প্রাণকে পিষিয়া ফেলে, প্রাণকে খেলিবার সুবিধা না দেয়, তবেই বিপদ্‌। সকল দেশেই মাঝেমাঝে মহাপুরুষরা উঠিয়া সামাজিক কলের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করিতে চেষ্টা করেন—সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন, কলের অন্ধ গতিকেই সকলে প্রাণের গতি বলিয়া যেন ভ্রম না করে। অল্পদিন হইল, ইংরাজসমাজে কার্লাইল এইরূপ

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব বাহনটিই যখন সমাজদেবতার কাঁধের উপর চড়িয়া বসিবার চেষ্টা করে, যন্ত্র যখন যন্ত্রীকেই নিজের যন্ত্রস্বরূপ করিবার উপক্রম করে, তখন সমাজে ও সমাজের কলে মাঝেমাঝে ঝুটাপুটি বাধিয়া যায়। মানুষ যদি সেই যুদ্ধে কলের উপর জয়ী হয় ত ভাল, আর কল যদি মানুষকে পরাভূত করিয়া চাকার নীচে চাপিয়া রাখে, তবেই সর্ব্বনাশ।

আমাদের সমাজের প্রাচীন কলটা নিজের সচেতন আদর্শকে অন্তরাল করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, জড় অনুষ্ঠানে জ্ঞানকে সে আধমারা করিয়া পিঞ্জরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া, আমরা য়ুরোপীয় আদর্শের সহিত নিজেদের আদর্শের তুলনা করিয়া গৌরব অনুভব করিবার অবকাশ পাই না। আমরা কথায়-কথায় লজ্জা পাই। আমাদের সমাজের দুর্ভেদ্য জড়স্তূপ হিন্দুসভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে—ইহার অনেকটাই সুদীর্ঘকালের অযত্নসঞ্চিত ধূলামাত্র। অনেকসময় য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে ধিক্কার পাইয়া আমরা এই ধূলিস্তূপকে লইয়াই গায়ের জোরে গর্ব্ব করি—কালের এই সমস্ত অনাহূত আবর্জ্জনারাশিকেই আমরা আপনার বলিয়া অভিমান করি—ইহার অভ্যন্তরে যেখানে আমাদের যথার্থ গর্ব্বের ধন হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন আদর্শ আলোক ও বায়ুর অভাবে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িয়া আছে, সেখানে দৃষ্টিপাত করিবার পথ পাই না।

প্রাচীন ভারতবর্ষ সুখ, স্বার্থ, এমন কি ঐশ্বর্য্যকে পর্য্যন্ত খর্ব্ব করিয়া মঙ্গলকেই যে ভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠাস্থল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। অন্যদেশে ধনমানের জন্য, প্রভুত্ব-অর্জ্জনের জন্য, হানাহানি-কাড়াকাড়ি করিতে সমাজ প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষ সেই উৎসাহকে সর্ব্বপ্রকারে নিরস্ত করিয়াছে; কারণ স্বার্থোন্নতি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল। আমরা—ইংরাজের ছাত্র আজ বলিতেছি, এই প্রতিযোগিতা—এই হানাহানির অভাবে আমাদের আজ দুর্গতি হইয়াছে। প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর প্রশ্রয়ে ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জর্ম্মাণি-রাশিয়া-আমেরিকাকে ক্রমশ কিরূপ উগ্র হিংস্রতার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিরূপ প্রচণ্ড সংঘাতের মুখের কাছে দাঁড় করাইয়াছে, সভ্যনীতিকে প্রতিদিন কিরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে, তাহা দেখিলে প্রতিযোগিতাপ্রধান সভ্যতাকেই চরম সভ্যতা বলিতে কোনমতেই প্রবৃত্তি হয় না। বলবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু শান্তি, সামঞ্জস্য এবং মঙ্গলও কি তদপেক্ষা উচ্চতর অঙ্গ নহে? তাহার আদর্শ এখন কোথায়? এখনকার কোন্ বণিকের আপিসে, কোন্ রণক্ষেত্রে? কোন্ কালো কোর্ত্তায়, লাল কোর্ত্তায় বা খাখি কোর্ত্তায় সে সজ্জিত হইয়াছে? সে ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের কুটীরপ্রাঙ্গণে শুভ্র উত্তরীয় পরিয়া। সে ছিল ব্রহ্মপরায়ণ তপস্বীর স্তিমিত ধ্যানাসনে, সে ছিল ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্য গৃহস্থের কর্ম্মমুখরিত যজ্ঞশালায়। দল বাঁধিয়া পূজা, কমিটি করিয়া শোক বা চাঁদা করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, এ

আমাদের জাতির প্রকৃতিগত নহে, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এ গৌরবের অধিকার আমাদের নাই—কিন্তু তাই বলিয়া আমরা লজ্জা পাইতে প্রস্তুত নহি। সংসারের সর্ব্বত্রই হরণ-পূরণের নিয়ম আছে। আমাদের বাঁ-দিকে কমৃতি থাকিলেও ডান-দিকে বাড়্তি থাকিতে পারে। যে ওড়ে, তাহার ডানা বড়, কিন্তু পা ছোট ; যে দৌড়ায়, তাহার পা বড়, কিন্তু ডানা নাই।

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে—ভক্তি-ভাজনকে দিবসারম্ভে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্মরণ করে, তাহার মঙ্গল হয়,—মহাপুরুষদের তাহাতে উৎসাহবৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে, সে ভাল হয়। ভক্তি-করা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য।

কিন্তু তবে ত একটা লম্বা নামের মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ আওড়াইতে হয় এবং সে মালা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। তাহা হয় না। যথার্থ ভক্তিই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে মালা বেশি বাড়িতে পারে না। ভক্তি যদি নির্জ্জীব না হয়, তবে সে জীবনের ধর্ম্ম-অনুসারে গ্রহণ-বর্জ্জন করিতে থাকে, কেবলি সঞ্চয় করিতে থাকে না।

পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে—কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, যদি মনে করি, কেবল যে বইগুলি যথার্থই আমার প্রিয়, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য, সেইগুলিই রক্ষা করিব, তবে শতবৎসর পরমায়ু হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে দুর্ভর হইয়া উঠে না।

তেমনি আমার প্রকৃতি যে মহাত্মাদের প্রত্যহস্মরণযোগ্য বলিয়া ভক্তি করে, তাঁহাদের নাম যদি উচ্চারণ করি, তবে কতটুকু সময় লয়! প্রত্যেক পাঠক যদি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে কয়টি নাম তাঁহাদের মুখে আসে? ভক্তি যাঁহাদিগকে হৃদয়ে সজীব করিয়া না রাখে, বাহিরে তাঁহাদের পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিলে আমার তাহাতে কি লাভ?

তাঁহাদের তাহাতে' লাভ আছে, এমন কথা উঠিতেও পারে। লোকে দল বাঁধিয়া প্রতিমা স্থাপন করিবে, অথবা মৃতদেহ বিশেষ স্থানে সমাহিত হইয়া গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দ্বারা খ্যাতি লাভ করিবার একটা মোহ আছে, তাহা তাজমহল প্রভৃতির ইতিহাস হইতে জানা যায়।

কিন্তু আমাদের সমাজ মহাত্মাদিগকে সেই বেতন দিয়া বিদায় করিতে চাহে নাই। আমাদের সমাজে মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বিনা-বেতনের। ভারতবর্ষে অধ্যাপক, সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দান-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার বেতন শোধ করিয়া দিয়া আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমানিত করে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলকর্ম্ম যিনি করিবেন, তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন, ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ। কোন বাহ্যমূল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়।

দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক—তাহা মূঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তাহার অনেকটা অলীক। "গোলে হরিবোল" ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে, গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া পড়ে। দলের আন্দোলনে অনেকসময় তুচ্ছ উপলক্ষ্যে ভক্তির ঝড় উঠিতে পারে—তাহার সাময়িক প্রবলতা যতই হোক্ না কেন, ঝড়-জিনিষটা কখনই স্থায়ী নহে। সংসারে এমন কতবার কতশত দলের দেবতার অকস্মাৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং জয়ঢাক বাজিতে বাজিতে অতলস্পর্শ বিস্মৃতির মধ্যে তাহাদের বিসর্জ্জন হইয়া গেছে। পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া জবরদস্তি করিয়া কি কাহাকেও মনে রাখা যায়? ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবিতে কি এমন অনেকের নাম পাথরে খোদা হয় নাই, ইতিহাসে যাহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষুদ্র ও ম্লান হইয়া আসিতেছে। এই সকল ক্ষণকালের দেবতাগণকে দলীয় উৎসাহে চিরকালের আসনে বসাইবার চেষ্টা করা, না দেবতার পক্ষে ভাল, না দলের পক্ষে শুভকর। দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধে-বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি—কিন্তু স্নেহ-প্রেম-দয়া-ভক্তির পক্ষে সংযত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অনুকূল, কারণ তাহা অকৃত্রিমতা এবং ধ্রুবতা চাহে, উন্মত্ততায় তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।

য়ুরোপেও আমরা কি দেখিতে পাই? সেখানে দল বাঁধিয়া যে ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা কি যথার্থ ভক্তিভাজনের বিচার করে? তাহা কি সাময়িক উপকারকে চিরন্তন উপকারের অপেক্ষা বড় করে না, তাহা কি গ্রাম্যদেবতাকে বিশ্বদেবতার চেয়ে উচ্চে বসায় না? তাহা মুখর দলপতিগণকে যত সম্মান দেয়, নিভৃতবাসী মহাতপস্বীদিগকে কি তেমন সম্মান দিতে পারে? শুনিয়াছি লর্ড্ পামার্‌ষ্টনের সমাধিকালে যেরূপ বিরাট্ সম্মানের সমারোহ হইয়াছিল, এমন কচিৎ হইয়া থাকে। দূরে হইতে আমাদের মনে একথা উদয় হয় যে, এই ভক্তিই কি শ্রেয়? পামার্‌ষ্টনের নামই কি ইংলণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয়ের মধ্যে—সর্ব্বাগ্রগণনীয়ের মধ্যে স্থান পাইল? দলের চেষ্টায় যদি কৃত্রিম উপায়ে সেই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে, তবে দলের চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে পারি না—যদি না হইয়া থাকে, তবে সেই বৃহৎ আড়ম্বরে বিশেষ গৌরব করিবার এমনি কি কারণ আছে?

যাঁহাদের নামস্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঙ্গলচেষ্টার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাঁহারাই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাহার অধিক আর বোঝাই করিবার কোন দরকার নাই। ব্যয়কাতর কৃপণের ধনের মত, ছোট-বড়-মাঝারি, ক্ষণিক এবং চিরন্তন, সকলপ্রকার মাহাত্ম্যকেই শাদা পাথর দিয়া চাপা দিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের না হয়, তবে তাহা লইয়া লজ্জা না করিলেও চলে। ভক্তিকে যদি প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য করিতে হয়, তবে

তাহা হইতে প্রতিদিনের অভ্যাগত অনাবশ্যক ভারগুলি বিদায় করিবার উপায় রাখিতে হয়, তাহার বিপরীত প্রণালীতে সমস্তই স্তূপাকার করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

যাহা বিনষ্ট হইবার, তাহাকে বিনষ্ট হইতে দিতে হইবে, যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার, তাহা ভস্ম হইয়া যাক্! মৃতদেহ যদি লুপ্ত হইয়া না যাইত, তবে পৃথিবীতে জীবিতের অবকাশ থাকিত না, ধরাতল একটি প্রকাণ্ড কবরস্থান হইয়া থাকিত। আমাদের হৃদয়ের ভক্তিকে পৃথিবীর ছোট এবং বড়, খাঁটি এবং ঝুঁটা, সমস্ত বড়ত্বের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না। যাহা চিরজীবী, তাহাই থাক্; যাহা মৃতদেহ, আজবাদে-কাল কীটের খাদ্য হইবে, তাহাকে মুগ্ধস্নেহে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া শোকের সহিত অথচ বৈরাগ্যের সহিত শ্মশানে ভস্ম করিয়া আসাই বিহিত। পাছে ভুলি, এই আশঙ্কায় নিজেকে উত্তেজিত রাখিবার জন্য কল বানাইবার চেয়ে ভোলাই ভাল। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াই বিস্মরণশক্তি দিয়াছেন।

সঞ্চয় নিতান্ত অধিক হইয়া উঠিতে থাকিলে, বাছাই-করা দুঃসাধ্য হয়। তাহা ছাড়া সঞ্চয়ের নেশা বড় দুর্জ্জয় নেশা—একবার যদি হাতে কিছু জমিয়া যায়, তবে জমাইবার ঝোঁক আর সামলানো যায় না। আমাদের দেশে ইহাকেই বলে—নিরানব্বইয়ের ধাক্কা। য়ুরোপ একবার বড়লোক জমাইতে আরম্ভ করিয়া এই নিরানব্বইয়ের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেছে। য়ুরোপে দেখিতে পাই, কেহ বা ডাকের টিকিট জমায়, কেহ বা দেশালাইয়ের বাক্সের কাগজের আচ্ছাদন জমায়, কেহ বা পুরাতন জুতা, কেহ বা বিজ্ঞাপনের ছবি জমাইতে থাকে — সেই নেশার রোখ যতই চড়িতে থাকে, ততই এই সকল জিনিষের একটা কৃত্রিম মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠে। তেমনি য়ুরোপে মৃত বড়লোক জমাইবার যে একটা প্রচণ্ড নেশা আছে, তাহাতে মূল্যের বিচার আর থাকে না। কাহাকেও আর বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। যেখানে একটুমাত্র উচ্চতা বা বিশেষত্ব আছে, সেইখানেই য়ুরোপ তাড়াতাড়ি সিঁদুর মাখাইয়া দিয়া ঘণ্টা নাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে দল জুটিয়া যায়।

বস্তুত মাহাত্ম্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার প্রভেদ আছে। মহাত্মারা আমাদের কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান, যাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে স্মরণ করিলে জীবন মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষমতাশালীকে স্মরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা নহে। ভক্তিভাবে শেক্স্‌পিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্স্‌পিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোন সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎপরিমাণেও সরল হইয়া আসে।

তবে গুণিসম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য? গুণীকে তাঁহার গুণের দ্বারা স্মরণ করাই আমাদের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত তানসেনের গানের চর্চ্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ

গায়কগণ তানসেনকে যথার্থভাবে স্মরণ করে ধ্রুপদ শুনিলে যাহার গায়ে জ্বর আসে, সে-ও তানসেনের প্রতিমা গড়িবার জন্য চাঁদা দিয়া ঐহিক-পারত্রিক কোন ফললাভ করে, এ কথা মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে, এমন কোন অবশ্যবাধ্যতা নাই। কিন্তু সাধুতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে আদর্শ। সাধুদিগের এবং মহৎকর্ম্মে প্রাণ-বিসর্জ্জনপর বীরদিগের স্মৃতি সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঋণ-শোধ-করাকে সেই স্মৃতিপালন কহে না, ইহা প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যহের কর্ত্তব্য।

য়ুরোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্যের প্রভেদ লুপ্তপ্রায়। উভয়েরই জয়ধ্বজা একই-রকম—এমন কি, মাহাত্ম্যের পতাকাই যেন কিছু খাটো। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাতে অভিনেতা আর্ভিঙের সম্মান পরম-সাধুর প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অল্প নহে। রামমোহন রায় আজ যদি ইংলণ্ডে যাইতেন, তবে তাঁহার গৌরব ক্রিকেট্-খেলোয়াড় রঞ্জিৎসিংহের গৌরবের কাছে খর্ব্ব হইয়া থাকিত।

আমরা কবিচরিতনামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, য়ুরোপে ক্ষমতাশালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশয় উদ্যম আছে। য়ুরোপকে চরিতবায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনমতে একটা যে-কোন-প্রকারের বড়লোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুমে জীবনচরিত লিখিবার জন্য লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে, তাহার জীবনচরিত, যে গান করে, তাহার জীবন-চরিত, যে হাসাইতে পারে, তাহার জীবন-চরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু-একটা পারে, তাহারই জীবন-চরিত! কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক—যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোন কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য—যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কি প্রয়োজন? টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসন্‌কে যত বড় করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট করিয়া জানিয়াছি মাত্র!

কৃত্রিম আদর্শে মানুষকে এইরূপ নির্বিবেক করিয়া তোলে। মেকি এবং খাঁটির এক দর হইয়া আসে। আমাদের দেশে আধুনিক কালে পাপপুণ্যের আদর্শ কৃত্রিম হওয়াতে তাহার ফল কি হইয়াছে? ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা লওয়া এবং গঙ্গায় স্নান করাও পুণ্য, আবার অচৌর্য্য ও সত্য-পরায়ণতাও পুণ্য, কিন্তু কৃত্রিমের সহিত খাঁটি পুণ্যের কোন জাতিবিচার না থাকাতে, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গাস্নান ও আচারপালন করে, সমাজে অলুব্ধ ও সত্য-পরায়ণের অপেক্ষা তাহার পুণ্যের সম্মান

কম নহে, বরঞ্চ বেশি। যে ব্যক্তি যবনের অন্ন খাইয়াছে, আর যে ব্যক্তি জাল মকদ্দমায় যবনের অন্নের উপায় অপহরণ করিয়াছে, উভয়েই পাপীর কোঠায় পড়ায় প্রথমোক্ত পাপীর প্রতি ঘৃণা ও দণ্ড যেন মাত্রায় বাড়িয়া উঠে।

য়ুরোপে তেমনি মাহাত্ম্যের মধ্যে জাতিবিচার উঠিয়া গেছে। যে ব্যক্তি ক্রিকেট্‌-খেলায় শ্রেষ্ঠ, যে অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ, যে দানে শ্রেষ্ঠ, যে সাধুতায় শ্রেষ্ঠ, সকলেই গ্রেট্‌ ম্যান্‌। একই-জাতীয় সম্মানস্বর্গে সকলেরই সদ্গতি। ইহাতে ক্রমেই যেন ক্ষমতার অর্ঘ্য মাহাত্ম্যের অপেক্ষা বেশি দাঁড়াইয়াছে। দলের হাতে বিচারের ভার থাকিলে, এইরূপ ঘটাই অনিবার্য্য। যে আচারপরায়ণ, সে ধর্ম্মপরায়ণের সমান হইয়া দাঁড়ায়, এমন কি, বেশি হইয়া ওঠে; যে ক্ষমতাশালী, সে মহাত্মাদের সমান, এমন কি, তাঁহাদের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়। আমাদের সমাজে দলের লোকে যেমন আচারকে পূজ্য করিয়া ধর্ম্মকে খর্ব্ব করে, তেমনি য়ুরোপের সমাজে দলের লোকে ক্ষমতাকে পূজ্য করিয়া মাহাত্ম্যকে ছোট করিয়া ফেলে।

যথার্থ ভক্তির উপর পূজার ভার না দিয়া লোকারণ্যের উপর পূজার ভার দিলে দেবপূজার ব্যাঘাত ঘটে। বারোয়ারির দেবতার যত ধুম, গৃহদেবতা—ইষ্টদেবতার তত ধুম নহে। কিন্তু বারোয়ারির দেবতা কি মুখ্যত একটা অবাস্তর উত্তেজনার উপলক্ষ্যমাত্র নহে? ইহাতে ভক্তির চর্চ্চা না হইয়া ভক্তির অবমাননা হয় না কি?

আমাদের দেশে আধুনিক কালের বারোয়ারির শোকের মধ্যে—বারোয়ারির স্মৃতিপালনচেষ্টার মধ্যে, গভীর শূন্যতা দেখিয়া আমরা পদে-পদে ক্ষুব্ধ হই। নিজের দেবতাকে কোন্‌ প্রাণে এমন কৃত্রিম সভায় উপস্থিত করিয়া পূজার অভিনয় করা হয়, বুঝিতে পারি না। সেই অভিনয়ের আয়োজনে যদি মাল্‌মস্‌লা কিছু কম হয়, তবে আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই—কিন্তু লজ্জার বিষয় গোড়াতেই। যিনি ভক্ত, তিনি মহতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই শুভফলপ্রদ; কিন্তু মহাত্মাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন বারোয়ারির কোলাহল তুলিয়া কর্ত্তব্যসমাধার চেষ্টা লজ্জাকর এবং নিষ্ফল।

বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে ভক্তিলাভ করেন নাই, এ কথা কোনমতেই বলা যায় না। তাঁহার প্রতি বাঙালিমাত্রেরই ভক্তি অকৃত্রিম। কিন্তু যাঁহারা বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসাগরের স্মরণসভা আহ্বান করেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার জন্য সমুচিত চেষ্টা হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় যে, বিদ্যাসাগরের জীবন আমাদের দেশে নিষ্ফল হইয়াছে? তাহা নহে। তিনি আপন মহত্ত্বদ্বারা দেশের হৃদয়ে অমরস্থান অধিকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। নিষ্ফল হইয়াছে তাঁহার স্মরণসভা। বিদ্যাসাগরের জীবনের যে উদ্দেশ্য, তাহা তিনি নিজের ক্ষমতাবলেই সাধন করিয়াছেন—স্মরণসভার যে উদ্দেশ্য, তাহা সাধন করিবার ক্ষমতা স্মরণসভার নাই, উপায় সে জানে না।

মঙ্গলভাব স্বভাবতই আমাদের কাছে কত পূজ্য, বিদ্যাসাগর তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা অনেক ছিল, কিন্তু সেই সকল ক্ষমতায় তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করেন নাই। তাঁহার দয়া, তাঁহার অকৃত্রিম অশ্রান্ত লোকহিতৈষাই তাঁহাকে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নূতন ফ্যাশনের টানে পড়িয়া আমরা যতই আড়ম্বর করিয়া যত চেষ্টাই করি না কেন, আমাদের অন্তঃকরণ স্বভাবতই শক্তি-উপাসনায় মাতে না। ক্ষমতা আমাদের আরাধ্য নহে, মঙ্গলই আমাদের আরাধ্য। আমাদের ভক্তি শক্তির অভ্রভেদী সিংহদ্বারে নহে, পুণ্যের স্নিগ্ধ-নিভৃত দেবমন্দিরেই মস্তক নত করে।

আমরা বলি—কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। যিনি ক্ষমতাপন্ন লোক, তিনি নিজের কীর্ত্তির মধ্যেই নিজে বাঁচিয়া থাকেন। তিনি যদি নিজেকে বাঁচাইতে না পারেন, তবে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা আমরা করিলে তাহা হাস্যকর হয়। বঙ্কিমকে কি আমরা স্বহস্তরচিত পাথরের মূর্ত্তিদ্বারা অমরত্বলাভে সহায়তা করিব? আমাদের চেয়ে তাঁহার ক্ষমতা কি অধিক ছিল না? তিনি কি নিজের কীর্ত্তিকে স্থায়ী করিয়া যান নাই? হিমালয়কে স্মরণ রাখিবার জন্য কি চাঁদা করিয়া তাহার একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করার প্রয়োজন আছে? হিমালয়কে দর্শন করিতে গেলেই তাহার দেখা পাইব—অন্যত্র তাহাকে স্মরণ করিবার উপায় করিতে যাওয়া মূঢ়তা। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে বাঙালি একটা কোন প্রকারের ধুমধাম করে নাই বলিয়া বাঙালি কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? যেমন "গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে", তেমনি বাংলাদেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিদ্বারাই কৃত্তিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষ পূজা আর কিসে হইতে পারে?

য়ুরোপে যে দল বাঁধিবার ভাব আছে, তাহার উপযোগিতা নাই, এ কথা বলা মূঢ়তা। যে সকল কাজ বলসাধ্য,—বহুলোকেরই আলোচনার দ্বারা সাধ্য, সে সকল কাজে দল না বাঁধিলে চলে না। দল বাঁধিয়া য়ুরোপ যুদ্ধে, বিগ্রহে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্রব্যাপারে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। মৌমাছির পক্ষে যেমন চাক-বাঁধা, য়ুরোপের পক্ষে তেমনি দল-বাঁধা প্রকৃতিসিদ্ধ। সেইজন্য য়ুরোপ দল বাঁধিয়া দয়া করে, ব্যক্তিগত দয়াকে প্রশ্রয় দেয় না; দল বাঁধিয়া পূজা করিতে যায়, ব্যক্তিগত পূজাহ্নিকে মন দেয় না; দল বাঁধিয়া ত্যাগ স্বীকার করে, ব্যক্তিগত ত্যাগে তাহাদের আস্থা নাই। এই উপায়ে য়ুরোপ একপ্রকার মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, অন্যপ্রকার মহত্ত্ব খোয়াইয়াছে। একাকী কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার উৎসাহ তাহার নাই। আমাদের সমাজে প্রত্যেককে প্রত্যহই প্রত্যেক প্রহরেই ধর্ম্মপালন করিতে বাধ্য বলিয়া জানে। য়ুরোপে ধর্ম্মপালন করিতে হইলে কমিটিতে বা ধর্ম্মসভায় যাইতে হয়। সেখানে সম্প্রদায়গণই সদনুষ্ঠানে রত—সাধারণ লোকেরা স্বার্থসাধনে তৎপর। কৃত্রিম উত্তেজনার দোষ এই যে,

তাহার অভাবে মানুষ অসহায় হইয়া পড়ে। দল বাঁধিলে পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া খাড়া করিয়া রাখে, কিন্তু দলের বাহিরে, নামিয়া পড়িতে হয়। আমাদের দেশে প্রত্যেকের প্রত্যহের কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে আবালবৃদ্ধবনিতাকে যথাসম্ভব নিজের স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পশুপ্রকৃতিকে সংযত করিয়া পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে হয়, ইহাই আমাদের আদর্শ। ইহার জন্য সভা করিতে বা খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠাইতে হয় না। এইজন্য সাধারণত সমস্ত হিন্দুসমাজে একটি সাত্ত্বিক ভাব বিরাজমান—এখানে ছোট-বড় সকলেই মঙ্গলচর্চ্চায় রত, কারণ গৃহই তাহাদের মঙ্গলচর্চ্চার স্থান। এই যে আমাদের ব্যক্তিগত মঙ্গলভাব, ইহাকে আমরা শিক্ষার দ্বারা উন্নত, অভিজ্ঞতার দ্বারা বিস্তৃত এবং জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বলতর করিতে পারি; কিন্তু ইহাকে নষ্ট হইতে দিতে পারি না, ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না,—য়ুরোপে ইহার প্রাদুর্ভাব নাই বলিয়া ইহাকে লজ্জা দিতে এবং ইহাকে লইয়া লজ্জা করিতে পারি না—দলকেই একমাত্র দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট ইহাকে ধূলিলুণ্ঠিত করিতে পারি না। যেখানে দল-বাঁধা অত্যাবশ্যক, সেখানে যদি দল বাঁধিতে পারি ত ভাল, যেখানে অনাবশ্যক, এমন কি, অসঙ্গত, সেখানেও দল বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া শেষকালে দলের উগ্র নেশা যেন অভ্যাস না করিয়া বসি। সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বোচ্চে নিজের ব্যক্তিগতকৃত্য, তাহা প্রাত্যহিক, তাহা চিরন্তন; তাহার পরে দলীয় কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ আবশ্যকসাধনের জন্য ক্ষণকালীন—তাহা অনেকটা-পরিমাণে যন্ত্রমাত্র, তাহাতে নিজের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ চর্চ্চা হয় না। তাহা ধর্ম্মসাধন অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী।

কিন্তু কালের এবং ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে। চারিদিকেই দল বাঁধিয়া উঠিতেছে—কিছুই নিভৃত এবং কেহই গোপন থাকিতেছে না। নিজের কীর্ত্তির মধ্যেই নিজেকে কৃতার্থ করা, নিজের মঙ্গলচেষ্টার মধ্যেই নিজেকে পুরস্কৃত করা, এখন আর টেঁকে না। শুভকর্ম্ম এখন আর সহজ এবং আত্মবিস্মৃত নহে, এখন তাহা সর্ব্বদাই উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে। যে সকল ভাল কাজ ধ্বনিত হইয়া উঠে না, আমাদের কাছে তাহার মূল্য প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, এইজন্য ক্রমশ আমাদের গৃহ পরিত্যক্ত, আমাদের জনপদ নিঃসহায়, আমাদের জন্মগ্রাম রোগজীর্ণ, আমাদের পল্লীর সরোবরসকল পঙ্কদূষিত, আমাদের সমস্ত চেষ্টাই কেবল সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রহাটের মধ্যে। ভ্রাতৃভাব এখন ভ্রাতাকে ছাড়িয়া বাহিরে ফিরিতেছে, দয়া এখন দীনকে ছাড়িয়া সংবাদদাতার স্তম্ভের উপর চড়িয়া দাঁড়াইতেছে এবং লোকহিতৈষা এখন লোককে ছাড়িয়া রাজদ্বারে খেতাব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের তাড়া না থাইলে এখন আমাদের গ্রামে স্কুল হয় না, রোগী ঔষধ পায় না, দেশের জলকষ্ট দূর হয় না। এখন ধ্বনি এবং ধন্যবাদ এবং করতালির নেশা যখন ক্রমে চড়িয়া উঠিয়াছে, তখন সেই প্রলোভনের ব্যবস্থা রাখিতে হয়।

ঠিক যেন বাছুরটাকে কশাইখানায় বিক্রয় করিয়া ফুঁকা-দেওয়া দুধের ব্যবসায় চালাইতে হইতেছে।

অতএব আমরা যে দল বাঁধিয়া শোক, দল বাঁধিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের জন্য পরস্পরকে প্রাণপণে উৎসাহিত করিতেছি, এখন তাহার সময় আসিয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের সন্ধিকালে ঠিক নিয়মমত কিছুই হয় না। সকালে হয় ত শীতের আভাস, বিকালে হয় ত বসন্তের বাতাস দিতে থাকে। দিশি হাল্কা কাপড় গায়ে দিলে হঠাৎ সর্দ্দি লাগে, বিলাতি মোটা কাপড় গায়ে দিলে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইতে হয়। সেইজন্য আজকাল দেশি ও বিলাতি কোন নিয়মই পূরাপূরি খাটে না। যখন বিলাতি-প্রথায় কাজ করিতে যাই, দেশি সংস্কার অলক্ষ্যে হৃদয়ের অন্তঃপুরে থাকিয়া বাধা দিতে থাকে, আমরা লজ্জায় ধিক্কারে অস্থির হইয়া উঠি—দেশিভাবে যখন কাজ ফাঁদিয়া বসি, তখন বিলাতের রাজ-অতিথি আসিয়া নিজের বসিবার উপযুক্ত আসন না পাইয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া সমস্ত মাটি করিয়া দেয়। সভাসমিতি নিয়মমত ডাকি, অথচ তাহা সফল হয় না,—চাঁদার খাতা খুলি, অথচ তাহাতে যেটুকু অঙ্কপাত হয়, তাহাতে কেবল আমাদের কলঙ্ক ফুটিয়া উঠে।

আমাদের সমাজে যেরূপ বিধান ছিল, তাহাতে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন চাঁদা দিতে হইত। তাহার তহবিল আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, দীনদুঃখী, সকলের জন্যই ছিল। এখনো আমাদের দেশে যে দরিদ্র, সে নিজের ছোট ভাইকে স্কুলে পড়াইতেছে, ভগিনীর বিবাহ দিতেছে, পৈতৃক নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধন করিতেছে, বিধবা পিসী-মাসীকে সসন্তান পালন করিতেছে। ইহাই দিশিমতে চাঁদা, ইহার উপরে আবার বিলাতিমতে চাঁদা লোকের সহ্য হয় কি করিয়া? ইংরাজ নিজের বয়স্ক ছেলেকে পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া দেয়, তাহার কাছে চাঁদার দাবী করা অসঙ্গত নহে। নিজের ভোগেরই জন্য যাহার তহবিল, তাহাকে বাহ্য উপায়ে স্বার্থত্যাগ করাইলে ভালই হয়। আমাদের কয়জন লোকের নিজের ভোগের জন্য কতটুকু উদ্বৃত্ত থাকে? ইহার উপরে বারোমাসে তেরোশত নূতন-নূতন অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা চাহিতে আসিলে বিলাতী সভ্যতার উত্তেজনাসত্ত্বেও গৃহীর পক্ষে বিনয়রক্ষা করা কঠিন হয়। আমরা ক্রমাগতই লজ্জিত হইয়া বলিতেছি, এত-বড় অনুষ্ঠানপত্র বাহির করিলাম, টাকা আসিতেছে না কেন, এত-বড় ঢাক পিটাইতেছি, টাকা আসিয়া পড়িতেছে না কেন, এত-বড় কাজ আরম্ভ করিলাম, অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া যাইতেছে কেন? বিলাতে হইলে এমন হইত, তেমন হইত, হুহু করিয়া মুষলধারে টাকা বর্ষিত হইয়া যাইত,—কবে আমরা বিলাতের মত হইব?

বিলাতের আদর্শ আসিয়া পৌছিয়াছে, বিলাতের অবস্থা এখনো বহুদূরে। বিলাতী মতের লজ্জা পাইয়াছি, কিন্তু সে লজ্জা নিবারণের বহুমূল্য বিলাতী বস্ত্র এখনো পাই নাই। সকলদিকেই টানাটানি করিয়া মরিতেছি। এখন সর্ব্বসাধারণে চাঁদা দিয়া যে-সকল কাজের চেষ্টা করে,

পূর্ব্বে আমাদের দেশে ধনীরা তাহা একাকী করিতেন—তাহাতেই তাঁহাদের ধনের সার্থকতা ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে সাধারণ গৃহস্থ সমাজকৃত্য শেষ করিয়া নিজের স্বাধীন ভোগের জন্য উদ্বৃত্ত কিছুই পাইত না, সুতরাং অতিরিক্ত কোন কাজ না করিতে পারা তাহার পক্ষে লজ্জার বিষয় ছিল না। যে সকল ধনীর ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিত, ইষ্টাপূর্ত্তকাজের জন্য তাহাদেরই উপর সমাজের সম্পূর্ণ দাবী থাকিত। তাহারা সাধারণের অভাবপূরণ করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য মঙ্গলকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে সকলের কাছে লাঞ্ছিত হইত—তাহাদের নামোচ্চারণও অশুভকর বলিয়া গণ্য হইত। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরই বিলাতী ধনীর প্রধান শোভা, মঙ্গলের আয়োজন ভারতের ধনীর প্রধান শোভা। সমাজস্থ বন্ধুদিগকে বহুমূল্য পাত্রে বহুমূল্য ভোজ দিয়া বিলাতের ধনী তৃপ্ত, আহূত-রবাহূত-অনাহূতদিগকে কলার পাতায় অন্নদান করিয়া আমাদের ধনীরা তৃপ্ত। ঐশ্বর্য্যকে মঙ্গলদানের মধ্যে প্রকাশ করাই ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য—ইহা নীতিশাস্ত্রের নীতিকথা নহে—আমাদের সমাজে ইহা এতকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহই ব্যক্ত হইয়াছে—সেইজন্যই সাধারণ গৃহস্থের কাছে আমাদিগকে চাঁদা চাহিতে হয় নাই। ধনীরাই আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষকালে অন্ন, জলাভাবকালে জল দান করিয়াছে,—তাহারাই দেশের শিক্ষাবিধান, শিল্পের উন্নতি, আনন্দকর উৎসবরক্ষা ও গুণীর উৎসাহসাধন করিয়াছে। হিতানুষ্ঠানে আজ যদি আমরা পূর্ব্বাভ্যাসক্রমে তাহাদের দ্বারস্থ হই, তবে সামান্য ফল পাইয়া অথবা নিষ্ফল হইয়া কেন ফিরিয়া আসি? বরঞ্চ আমাদের মধ্যবিত্তগণ সাধারণ কাজে যেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, সম্পদের তুলনা করিয়া দেখিলে ধনীরা তাহা করেন না। তাঁহাদের দ্বারবান্‌গণ স্বদেশের অভাবকে দেউড়ি পার হইয়া প্রাসাদে ঢুকিতে দেয় না—ভ্রমক্রমে ঢুকিতে দিলেও ফিরিবার সময় তাহার মুখে অধিক উল্লাসের লক্ষণ দেখা যায় না! ইহার কারণ, আমাদের ধনীদের ঘরে বিলাতের বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, অথচ বিলাতের ঐশ্বর্য্য নাই। নিজেদের ভোগের জন্য তাহাদের অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে বটে, কিন্তু সেই ভোগের আদর্শ বিলাতের। বিলাতের ভোগীরা ভারবিহীন স্বাধীন ঐশ্বর্য্যশালী, নিজের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ কর্ত্তা। সমাজবিধানে আমরা তাহা নহি। অথচ ভোগের আদর্শ সেই বিলাতি ভোগীর অনুরূপ হওয়াতে খাটে-পালঙ্কে, বসনে-ভূষণে, গৃহসজ্জায়, গাড়িতে-জুড়িতে আমাদের ধনীদিগকে আর বদান্যতার অবসর দেয় না—তাহাদের বদান্যতা বিলাতী জুতাওয়ালা, টুপিওয়ালা, ঝাড়লণ্ঠনওয়ালা, চৌকিটেবিলওয়ালার সুবৃহৎ পকেটের মধ্যে নিজেকে উজাড় করিয়া দেয়, শীর্ণ কঙ্কালসার দেশ রিক্তহস্তে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। দেশী গৃহস্থের বিপুল কর্ত্তব্য এবং বিলাতি ভোগীর বিপুল ভোগ, এই দুই ভার একলা কয়জনে বহন করিতে পারে?

কিন্তু আমাদের পরাধীন দরিদ্র দেশ কি বিলাতের সঙ্গে বরাবর এমনি করিয়া

টক্কর দিয়া চলিবে? পরের দুঃসাধ্য আদর্শে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবার কঠিন চেষ্টায় কি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে? নিজেদের চিরকালের সহজপথে অবতীর্ণ হইয়া কি নিজেকে লজ্জা হইতে রক্ষা করিবে না?

বিজ্ঞসম্প্রদায় বলেন, যাহা ঘটিতেছে তাহা অনিবার্য্য, এখন এই নূতন আদর্শেই নিজেকে গড়িতে হইবে। এখন প্রতিযোগিতার যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে হইবে, শক্তির প্রতি শক্তি-অস্ত্র হানিতে হইবে।

এ কথা কোনমতেই মানিতে পারি না। আমাদের ভারতবর্ষের যে মঙ্গল-আদর্শ ছিল, তাহা মৃত আদর্শ নহে, তাহা সকল সভ্যতার পক্ষেই চিরন্তন আদর্শ এবং আমাদের অন্তরে-বাহিরে কোথাও ভগ্ন, কোথাও সম্পূর্ণ আকারে তাহা বিরাজ করিতেছে। সেই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে থাকিয়া য়ুরোপের স্বার্থপ্রধান, শক্তিপ্রধান, স্বাতন্ত্র্যপ্রধান আদর্শের সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ করিতেছে। সে যদি না থাকিত, তবে আমরা অনেক পূর্ব্বেই ফিরিঙ্গি হইয়া যাইতাম। ক্ষণে ক্ষণে আমাদের সেই ভীষ্ম-পিতামহতুল্য প্রাচীন সেনাপতির পরাজয়ে এখনো আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যতক্ষণ আমাদের সেই বেদনাবোধ আছে, ততক্ষণ আমাদের আশা আছে। মানবপ্রকৃতিতে স্বার্থ এবং স্বাতন্ত্র্যই যে মঙ্গলের অপেক্ষা বৃহত্তর সত্য এবং ধ্রুবতর আশ্রয়স্থল, এ নাস্তিকতাকে যেন আমরা প্রশ্রয় না দিই। আত্মত্যাগ যদি স্বার্থের উপর জয়ী না হইত, তবে আমরা চিরদিন বর্ব্বর থাকিয়া যাইতাম। এখনও বহুলপরিমাণে বর্ব্বরতা পশ্চিমদেশে সভ্যতার নামাবলী পরিয়া বিচরণ করিতেছে বলিয়াই তাহাকে সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপে বরণ করিতে হইবে, আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির এমন ভীরুতা যেন না ঘটে! য়ুরোপ আজকাল সত্যযুগকে উদ্ধতভাবে পরিহাস করিতেছে বলিয়া আমরা যেন সত্যযুগের আশা কোনকালে পরিত্যাগ না করি! আমরা যে পথে চলিয়াছি, সে পথের পাথেয় আমাদের নাই—অপমানিত হইয়া আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে। দরখাস্ত করিয়া এ পর্য্যন্ত কোন দেশই রাষ্ট্রনীতিতে বড় হয় নাই, অধীনে থাকিয়া কোন দেশ বাণিজ্যে স্বাধীন দেশকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই—এবং ভোগবিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে বাণিজ্যজীবিদেশের সহিত কোন ভূমিজীবিদেশ সমকক্ষতা রাখিতে পারে নাই। যেখানে প্রকৃতিগত এবং অবস্থাগত বৈষম্য, সেখানে প্রতিযোগিতা অপঘাতমৃত্যুর কারণ। আমাদিগকে দায়ে পড়িয়া, বিপদে পড়িয়া, একদিন ফিরিতেই হইবে—তখন কি লজ্জার সহিত নতশিরে ফিরিব? ভারতবর্ষের পর্ণকুটীরের মধ্যে তখন কি কেবল দারিদ্র্য ও অবনতি দেখিব? ভারতবর্ষ যে অলক্ষ্য ঐশ্বর্য্যবলে দরিদ্রকে শিব, শিবকে দরিদ্র করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা কি আধুনিক ভারতসন্তানের চাকচিক্য-অন্ধ চক্ষে একেবারেই পড়িবে না? কখনই না। ইহা নিশ্চয় সত্য যে, আমাদের নূতন শিক্ষাই ভারতের প্রাচীন মাহাত্ম্যকে আমাদের চক্ষে নূতন করিয়া—সজীব করিয়া দেখাইবে, আমাদের

ক্ষণিক বিচ্ছেদের পরেই চিরন্তন আত্মীয়তাকে নবীনতর নিবিড়তার সহিত সমস্ত হৃদয় দিয়া সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিব। চিরসহিষ্ণু ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে তাহার সন্তানদের গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে; গৃহে আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে, বাহিরে আমাদিগকে কেহ আশ্রয় দিবে না এবং ভিক্ষার অন্নে চিরকাল আমাদের পেট ভরিবে না।

সার সত্যের আলোচনা।

বুদ্ধির নিজাধিকারে মন এবং প্রাণের অভিসরণ-চিহ্ন।

প্রথমে দেখা যা'ক্—বুদ্ধির নিজাধিকারে মন কি-বেশে বিচরণ করে এবং কি-ভাবে কার্য্য করে।

বলিয়াছি যে, বুদ্ধির মুখ্য অবয়ব তিনটি—বিচার, বিবেচনা এবং যুক্তি; আর, সেই সঙ্গে বলিয়াছি যে, বিচার বুদ্ধির শক্তি-প্রধান অবয়ব; বিবেচনা বুদ্ধির জ্ঞান-প্রধান অবয়ব। এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, লোকের প্রথম উদ্যমের বিচার-কার্য্য প্রায়শই উপস্থিতমতে চট্‌পট্ সারিয়া ফ্যালা' হইয়া থাকে—সে কার্য্যে বিবেচনাকে বড়-একটা কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে অবকাশ দেওয়া হয় না। পাছে বিবেচনা মনের চির-পোষিত সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে, এই ভয়ে গতানুগতিক লোকেরা সচরাচর বিবেচনাকে ঘাঁটাইতে চাহে না। এক ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র আমি বলিলাম, "এ ব্যক্তি গণ্ডমূর্খ"; দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র বলিলাম, "এ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত"; তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র বলিলাম, "এ ব্যক্তি মস্ত ধনী"। হয় তো আমার সমস্ত কথাই আগা-গোড়া ভুল। প্রথম ব্যক্তি অনেকানেক শাস্ত্রালোচনার বাগ্‌ঝঞ্ঝার মাঝখানে মুখে ছিপি আঁটিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে—ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, "এ ব্যক্তি গণ্ডমূর্খ"; কিন্তু তাঁহাকে যে ব্যক্তি চেনে, সে মনে জানে যে, ইনি একজন মহাপণ্ডিত। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূরিভূরি অজীর্ণ পুঁথির বচন উদ্গীরণ করিয়া সভার মাঝখানে ব্যাপকতা করিতেছে—ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, "এ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত"; কিন্তু সত্য এই যে, তিনি তাঁহার নিজের মুখ-বিনিঃসৃত শাস্ত্র-বচনের অর্থ নিজেই বোঝেন না—অথবা সোজা অর্থ বাঁকা বোঝেন; মূলের পরিষ্কার অর্থ নানালোকের স্বস্বমতানুযায়ী টীকা এবং ভাষ্যের কর্দ্দম দ্বারা ঘোলা-

ইয়া ক্যালেন। তৃতীয় ব্যক্তির জম্‌কালো পোষাক্ দেখিয়া আমার মনে হইল, "এ ব্যক্তি মস্ত ধনী"; কিন্তু বাস্তবিক এই যে, সে ব্যক্তি তাহার একজন ধনাঢ্য বন্ধুর নিকট হইতে ধার-করিয়া-আনা পোষাক্ পরিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে আসিয়াছে। যাহাই হো'ক—ভুলই হো'ক্ আর সত্যই হো'ক্—বুদ্ধির বিচার-ক্রিয়া উপস্থিতমতে অষ্টপ্রহরই চলিতে থাকে—তাহা একমুহূর্ত্তও বারণ মানে না; এমন কি—খুনী ব্যক্তিও মহোচ্চ বিচার-পতির সূক্ষ্ম বিচারের উপরে আপনার মনের অনুরূপ নির্দ্দয় বিচারের ছুরি না চালাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। লোকের প্রথম উদ্যমের বিচার কার্য্য প্রায়শই পুরাতন সংস্কারের প্রবল স্রোতের টানে ভাসিয়া চলে। সেরূপ সরাসরি-রকমের বিচার-কার্য্য জ্ঞান-মূলক তত নহে—যত শক্তি-মূলক; আর সে-যে শক্তি, তাহা একপ্রকার গায়ের জোর; তাহাতে যুক্তির তো কথাই নাই—বিবেচনারও স্পষ্ট কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিলাম—"গায়ের জোর"; তাহার ভাবার্থ আর-কিছু না পুরাতন সংস্কারের বল। পুরাতন-সংস্কার-জনিত বাসনা এবং রাগ-দ্বেষ মনের ধর্ম্ম; আর সেই সকল জঞ্জালের মধ্য হইতে সত্যকে টানিয়া বাহির করা বুদ্ধির ধর্ম্ম; এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

এটাও কিন্তু দেখা চাই যে, অন্যকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, আপনার গায়ে পঙ্ক না লাগাইয়া সে কার্য্য করিয়া উঠিতে পারা সম্ভবে না। বুদ্ধি যখন মনের নানাপ্রকার সংস্কারের মধ্য হইতে সত্য মন্থন করিয়া বাহির করে, তখন সেই সকল সংস্কারের ফেণের ছিটা বুদ্ধির নিজাধিকারে উপসংক্রমণ করে। বাঙালী যুবকেরা যেমন ইংলণ্ডে গিয়া লণ্ডন-নগরে বাঙালি-টোলা পত্তন করে, মন তেমনি বুদ্ধির নিজাধিকারের বক্ষের মাঝে—দলবল লইয়া অবস্থিতি করিতে পারিবার মতো একটা উপনিবেশ পত্তন করে। পুনশ্চ, ইংলণ্ড-বাসী বাঙালী যুবকের হ্যাট্‌কোটের মধ্য দিয়া যেমন বাঙালিত্ব ফুটিয়া বাহির হয়, তেমনি বুদ্ধির ক্রোড়স্থিত মনের নব-প্রস্ফুটিত বিচার-চক্ষুর মধ্য দিয়া পুরাতন সংস্কারের অন্ধতা ফুটিয়া বাহির হয়। এ যাহা আমি বলিতেছি, ইহার জুড়ি-দৃষ্টান্ত অনেক আছে; তাহার মধ্যে নিম্নের উপমাটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর লগ্ন-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। মনোরাজ্যের এক-ধাপ-নীচের প্রাণরাজ্যে উহার একটি উপমা দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ :—

রসায়ন-বিদ্যা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) ভৌতিক রসায়ন (inorganic chemistry), এবং (২) শারীরিক রসায়ন (organic chemistry)। বিরাটপুরীতে ভীম যেমন পাচকবেশে দাখা দিয়াছিলেন; শরীরপুরীতে ভৌতিক রসায়ন তেমনি শারীরিক-রসায়ন-বেশে আবির্ভূত হয়। অন্ন-জলাদির ভৌতিক শক্তি প্রাণের সংস্পর্শে প্রাণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠে। কিন্তু তথাপি সময়ে-সময়ে নূতন-পিনদ্ধ প্রাণের আবরণের মধ্য দিয়া ভৌতিক শক্তি আপনার পূর্ব্বতন অপ্রাণিকতা'র পরিচয় প্রদান করিতে ছাড়ে

না; অজীর্ণ অন্ন প্রাণের শাসন না মানিয়া সময়ে-সময়ে পাকস্থলীতে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে ছাড়ে না। তাহা হো'ক্—তাহাতে বিশেষ কিছুই আইসে যায় না;—অন্ন-জলের সারাংশ প্রাণের সহিত মিশিয়া প্রাণ হইয়া যায়, ইহা সকলেরই জানা কথা। তেমনি, মন যখন বুদ্ধির নিজাধিকারে প্রবেশ করে, তখন, শরীর যেমন অন্নের ভৌতিক শক্তিকে আপনার প্রাণের সহিত মিশাইয়া আপনার করিয়া লয়, বুদ্ধি তেমনি আপনার ক্রোড়াশ্রিত মনকে আপনার জ্ঞানের সহিত মিশাইয়া আপনার করিয়া লয়। পুনশ্চ, পাকস্থলী যে পরিমাণে অভ্যাগত অন্নকে আপনার করিয়া লয়, সেই পরিমাণে যেমন শরীরে বলাধান হয়; তেমনি, বুদ্ধি যে পরিমাণে মনকে আপনার করিয়া লয়, সেই পরিমাণে তাহার বিচার-কার্য্যে বল পৌঁছে। প্রাণ যেমন ভুক্ত অন্নকে জঠরানলে গলাইয়া তাহাকে আত্মসাৎ করে, বুদ্ধি তেমনি মনের সমস্ত পূর্ব্বতন প্রাতিভাসিক সংস্কারকে জ্ঞানানলে গলাইয়া আত্মসাৎ করে; আর তাহাই উপস্থিত বুদ্ধির স্বাভাবিক-বিচার-শক্তি-রূপে পরিণত হয়। স্বাভাবিকী বিচার-শক্তি কিয়ৎকাল ধরিয়া হামাগুড়ি দিতে-দিতে ক্রমে যখন দাঁড়াইতে শেখে, তখন বিবেচনা তাহাকে পথ প্রদর্শন করে এবং বিবেচনার দেখাইয়া-দেওয়া পথে বুক্তি তাহাকে হাত ধরিয়া পায়চারি করাইয়া লইয়া বেড়ায়।

বুদ্ধির প্রথমাবস্থায় বিচার-কার্য্যের সহিত যখন, অবসর বুঝিয়া অল্পে-অল্পে পা বাড়াইয়া, বিবেচনা আসিয়া জোটে, তখন বিচার-কার্য্যের মধ্য হইতে "আমি বিচার করিতেছি", এইরূপ একটা কর্ত্তৃত্ব-বোধ ফুটিয়া বাহির হয়;—সাংখ্য-দর্শন এইপ্রকার কর্ত্তৃত্ব-বোধের নাম দিয়াছেন অহঙ্কার। কর্ত্তৃত্ব-বোধ জন্মে কখন্? না, যখন বিবেচনা আসিয়া বিচার্য্য-বিষয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচন করে—"ইহার নাম কর্ত্তা, ইহার নাম কর্ম্ম, ইহার নাম ক্রিয়া", এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচন করে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে—বিবেচনার আগমনের পূর্ব্বে—বিচার-কার্য্য, কতক বা স্বাভাবিক সংস্কারের টানে, কতক বা শিক্ষিত সংস্কারের টানে, উৎস-উৎসারণের ন্যায় সহজ-ভাবে চলিয়া যাইতে থাকে। মনুষ্যের এক-প্রকার স্বাভাবিক বিচার-শক্তি আছে—ইংরাজিতে যাহাকে বলে common sense। বিবেচনা এবং যুক্তি আসিয়া সেই লৌকিক জ্ঞানের (common sense এর) ভূমির উপরে মার্জ্জিত জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের মূল পত্তন করে। বুদ্ধির নিজাধিকারের সীমার অভ্যন্তরে যদি পুরাতন মানসিক সংস্কারের, এক কথায়—মনের, নূতন মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে লৌকিক জ্ঞানের স্বাভাবিক বিচারশক্তিই সেই বুদ্ধি-ঘাঁসা মন বা মন-ঘাঁসা বুদ্ধি, যাহার তুমি দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম, তাহাতে এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বুদ্ধি মনকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া আপনার করিয়া লয়। সেনা যেমন সেনাপতির বল বা শক্তি বা তেজ, এবং সেনাপতি যেমন সেনার চক্ষু বা মস্তক বা নিয়ামক, মন

তেমনি বুদ্ধির শক্তি, এবং বুদ্ধি তেমনি মনের চক্ষু। বুদ্ধি শুধু যে কেবল মনকেই নিজাধিকারে টানিয়া তুলিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহা নহে, প্রাণকেও আপনার করিয়া লয়। আমরা অনেক সময়ে বলি যে, "অমুককে আমি প্রাণতুল্য ভালবাসি"; কিন্তু একটি-বারও কাহারো মুখ দিয়া এরূপ কথা বাহির হয় না যে, "আমি অমুককে মনতুল্য ভালবাসি"। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, মন যদিও মধ্যম এবং প্রাণ যদিও কনিষ্ঠ, তথাপি স্নেহ যেহেতু নিম্নগামী, এইজন্য বুদ্ধির ভালবাসা মেজোকে ডিঙাইয়া ছোটো'র প্রতি দৌড়ায়, মনকে ডিঙাইয়া প্রাণের প্রতি দৌড়ায়। প্রাণ অপেক্ষা মন বয়সে বুদ্ধির নিকটবর্ত্তী, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তথাপি বুদ্ধি আপনার জ্ঞানের চরম পরিপক্বতার আদর্শ প্রাণেতে যেমন মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পায়, মনেতে তেমন নহে। মনেতে তাহা দেখিতে না পাইবারই কথা; ধান্যবৃক্ষের শীর্ষস্থিত ধান্য মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজেই আপনার সাদৃশ্য দেখিতে পায়, মাঝের বৃন্ত এবং পত্রাদিতে তাহা দেখিতে পায় না; উন্নত বিজ্ঞান যেমন মূল-স্থানীয় বেদোপনিষৎ-শাস্ত্রে চরম জ্ঞানের কথা খুঁজিয়া পায়—মধ্যম-স্থানীয় পুরাণাদিতে তেমন নহে। ফল কথা এই যে, মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বিক্ষেপের ভাব প্রথমেই দর্শকের চক্ষে পড়ে; এ ভাবটি অপেক্ষাকৃত অপ্রীতিকর। পক্ষান্তরে প্রাণের সঙ্গে একপ্রকার নিরাকুল প্রশান্তির ভাব সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে—সে ভাবটি জ্ঞানের আদর্শ-স্থানীয়। জীবের অন্তর-মহলে সুষুপ্তি এবং বাহির-মহলে তরুলতাদি উদ্ভিদ-পদার্থ প্রাণের মুখ্য বসতিস্থান। কচি বালক যখন নিদ্রা যায়, তখন তাহার সর্ব্বশরীরে, বিশেষত মুখমণ্ডলে, নিরুদ্বেগ প্রশান্তির ভাব কেমন মনোহর-মূর্ত্তি ধারণ করে—মাতা যেমন তাহার মর্ম্মজ্ঞ, এমন আর কেহই নহে। বৃক্ষলতাদিতে কি-যে-এক রমণীয় সর্ব্বসহ অটল স্থৈর্য্যের ভাব বিরাজমান রহিয়াছে—কবি যেমন তাহার মর্ম্মজ্ঞ, এমন আর কেহই নহে। কালিদাস বলিয়াছেন :—

"অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥"
মস্তকে পাদপ সহে রৌদ্রের প্রকোপ।
ছায়াদানে আশ্রিতের তাপ করে লোপ॥

প্রাণের নিরাকুল প্রশান্তি এবং অটল স্থৈর্য্য, স্থির-বুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ। দ্বিপ্রহর রজনীর ঝিল্লীরব-নিনাদিত নিস্তব্ধতার সহিত নিবিড় অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষের নিস্তব্ধতার সুর মেলে কেমন চমৎকার! দ্বিপ্রহর-রজনীতে যেমন নিদ্রিত জগতের প্রাণ নিস্তব্ধভাবে স্পন্দিত হয়, আরণ্যক ওষধি-বনস্পতির মধ্যে সেইরূপ নিস্তব্ধ-ভাবে প্রাণক্রিয়া চলিতে থাকে।

বলিতেছি বটে যে, নিদ্রিত বালকের এবং বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ-পদার্থের দেহাশ্রিত প্রাণ-ক্রিয়ার নিরাকুল প্রশান্ত-ভাব, স্থির-বুদ্ধির আদর্শস্থল; কিন্তু তাহা কিরূপ আদর্শস্থল? শিশুর অমায়িক সরলতা যেমন প্রবীণ জ্ঞানীদিগের আদর্শ-স্থল, উহা সেইরূপ ঐকাংশিক আদর্শস্থল; তা বই, সার্ব্বাংশিক আদর্শস্থল নহে। স্পষ্টই দেখা

যাইতেছে যে, জল-বায়ু-মৃত্তিকার নির্যাসই বৃক্ষলতাদির প্রাণ; মাতার স্তন্য-দুগ্ধই কচি বালকের প্রাণ; দোঁহার প্রাণের সম্বল দোঁহার হাতের কাছেই অষ্টপ্রহর বাঁধা রহিয়াছে; এরূপ অবস্থায়, জীব প্রশান্ত এবং নিরাকুল হইবে না তো কি?—তাহা তো হইবারই কথা। কিন্তু একটা আরণ্যক সিংহের ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তাহাকে কত করিয়া দিগ্‌বিদিক্ অন্বেষণ করিতে হয়, কত ফন্দি করিয়া শিকার সংগ্রহ করিতে হয়? এরূপ প্রাত্যহিক কাজের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সিংহ যে আপনার রাজকীয় স্থৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়—ইহাই আশ্চর্য্য! প্রাণের স্থৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য মনের নিজাধিকারে প্রবেশ করিলে তাহা যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাই আমরা সিংহেতে দেখিতে পাই; কিন্তু সেই প্রাণের স্থৈর্য্য যখন আরো একধাপ উপরে উত্থান করে; মনের ধাপ ছাড়াইয়া বুদ্ধির নিজাধিকারে উত্থান করে; প্রাণের স্থৈর্য্য যখন বুদ্ধির স্থৈর্য্যরূপে পরিণত হয়; তখন তাহা অপর কোনো জীবেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—কেবল বিশেষ বিশেষ প্রভাবশালী মনুষ্যেতেই আদর্শীভূত দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষণ যুদ্ধের প্রারম্ভ-কালে যখন বিপক্ষদলের সৈন্য-সামন্ত চতুর্দ্দিক্ দিয়া ঝাঁকিয়া পড়িয়া প্রথম নেপোলিয়নের সেনা-মণ্ডলীকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত; প্রথম নেপোলিয়ন তখন রণ-ক্ষেত্রে বসিয়া পারিস্-নগরের বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হইলে ভাল হয়, তাহার একটা সমীচীন ব্যবস্থা-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতেছেন; লিপিবদ্ধ করিয়াই তাহা দূতযোগে পারিস্-নগরের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকটে প্রেরণ করিলেন। পারিস্-নগরে বিদ্রোহের ভস্মাচ্ছাদিত অনল কখন্ কোন্ দিক্ দিয়া ফুঁড়িয়া বাহির হয়, তাহার ঠিকানা নাই; রণস্থলের কোন্ দিক্ দিয়া প্রলয়াগ্নির বজ্র-বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাহার ঠিকানা নাই—এরূপ অবস্থায় চারিদিকের মহাভীষণ ব্যাপারের মধ্যে মুহূর্ত্তেকের জন্য বুদ্ধিকে স্থির রাখাই কঠিন; কিন্তু সেই পৃথিবীর ওলট্-পালটের সময় নেপোলিয়ন শুধু যে বুদ্ধিকে স্থির রাখিতেছেন, তাহা নহে—বুদ্ধিকে সম্যক্ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্যে খাটাইতেছেন; একটা বুদ্ধিকে দিয়া দশটা বুদ্ধির কাজ করাইয়া লইতেছেন। জ্ঞানবান্ মনুষ্যের এইরূপ যে অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য, তাহার গোড়া'র কথা—স্বাভাবিক সংস্কারও নহে—অভ্যস্ত সংস্কারও নহে—তাহার গোড়া'র কথা বুদ্ধির স্থৈর্য্য।

প্রাণ উদ্ভিদ-পদার্থের ন্যায় স্থির-ভাবে স্পন্দিত হয়, মন পশুপক্ষীদিগের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। দুয়েরই গায়ে দুইপ্রকার গুণ এবং দুইপ্রকার দোষ জড়ানো রহিয়াছে। দুয়ের দুই গুণও পরস্পরের বিপরীত; দুয়ের দুই দোষও পরস্পরের বিপরীত। বৃক্ষলতাদির গুণ স্থৈর্য্য, দোষ অল্পদেশব্যাপিতা এবং জড়তা; পশুপক্ষীদিগের গুণ সচেতনতা এবং বহুদেশব্যাপিতা; দোষ বিক্ষেপ এবং চঞ্চলতা। মনের বিক্ষেপ এবং প্রাণের স্থৈর্য্য, দুইকেই বুদ্ধি নিজাধিকারে টানিয়া তুলিয়া আপনার করিয়া লয়; ইহাতে ফল হয় এই যে, দুয়ের

দুইপ্রকার দোষ পরস্পরের সংঘর্ষে মার্জ্জিত হইয়া যায়; এবং দুয়ের দুইপ্রকার গুণ পরস্পরের সংসর্গগুণে দ্বৈগুণ্য লাভ করে। একজন স্থির-বুদ্ধি রাজাকে দেখ—দেখিবে যে, তিনি বহুধা-বিচিত্র রাজকার্য্যের মধ্যে আপনার মনের স্থৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতেছেন। বহুধা-বিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত-হওয়া মনের ধর্ম্ম; পক্ষান্তরে বহুধা-বিচিত্র কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও বিভ্রান্ত-না-হওয়া বুদ্ধির ধর্ম্ম। স্থির-ভাবে বাঁধা-নিয়মে নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি কার্য্য চালানো প্রাণের ধর্ম্ম; পক্ষান্তরে, রাজধর্ম্মে অচলের ন্যায় স্থির থাকিয়াও চোকোলো-ভাবে সমস্ত রাজ্যের শুভাশুভের বার্ত্তা-গ্রহণ-করা ও তৎপরতা এবং বিচক্ষণতার সহিত শুভের সাহায্য এবং অশুভের প্রতীকার করা বুদ্ধির ধর্ম্ম। এইরূপ, বুদ্ধিতে যখন একদিকে প্রাণের স্থৈর্য্য এবং আর-এক দিকে মনের বহুব্যাপিতা, দুইই একাধারে মিলিত হয়, তখন দুয়ের দুই দোষ খণ্ডিত হইয়া যায়, এবং দুয়ের দুই গুণ দ্বিগুণিত হয়। বুদ্ধি যখন মন এবং প্রাণকে নিজাধিকারে টানিয়া তুলিয়া দুইকে আপনার করিয়া লয় —তখনই বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করে; তখন বুদ্ধির অভ্যন্তরে একদিকে বহুত্ব একত্ব-গর্ভ হইয়া জ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ করে এবং আর-এক দিকে একত্ব বহুত্ব-গর্ভ হইয়া শক্তির বলবত্তা সাধন করে। এইরূপ পরিপক্ক বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রাণও থাকে, মনও থাকে; থাকে দুইই, তবে কি না, প্রাণের সংসর্গ-গুণে মনের চঞ্চলতা সংশোধিত হইয়া যায়, এবং মনের সংসর্গ-গুণে প্রাণের জড়তা সংশোধিত হইয়া যায়। প্রাণ বা মনের নিজ-গুণে এরূপ হয় না;—হয় তা কেবল বুদ্ধির সংস্পর্শ-গুণে। একবাটি জলে মিছরির ড্যালা এবং বাতাসা ফেলিয়া দিলে, সেই মিছরির ড্যালা এবং বাতাসা জলেরই সংস্পর্শ-গুণে একীভূত হইয়া যায়, তাহাদের আপন-গুণে নহে; তেমনি বুদ্ধিরই নিজগুণে বুদ্ধির নিজাধিকারে মন এবং প্রাণ একীভূত হইয়া যায়। এবারে পাঠকবর্গের ধারণার উপযোগী করিয়া অনেকগুলি নিগূঢ় কথা উপমাচ্ছলে বলিলাম;—কিন্তু ঐ কথা-গুলির ভিতরে প্রকৃত তত্ত্ব যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা এখনো বিবৃত করিয়া বলা হইল না। সময়ান্তরে অবকাশমতো এই বিষয়টির প্রকৃত তত্ত্বে অবতীর্ণ হওয়া যাইবে—এবারে তাহার একটা মুখপাত করা হইল মাত্র।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চোখের বালি।

(৩৫).

পরদিন প্রত্যূষ হইতে ঘনঘটা করিয়া আছে। কিছুকাল অসহ্য উত্তাপের পর স্নিগ্ধশ্যামল মেঘে দগ্ধ আকাশ জুড়াইয়া গেল। আজ মহেন্দ্র সময় হইবার পূর্ব্বেই কলেজে গেছে। তাহার ছাড়া-কাপড়গুলা মেঝের উপর পড়িয়া। আশা মহেন্দ্রের ময়লা কাপড় গণিয়া গণিয়া, তাহার হিসাব রাখিয়া ধোবাকে বুঝাইয়া দিতেছে।

মহেন্দ্র স্বভাবত ভোলামন অসাবধান লোক; 'এইজন্য' আশার প্রতি তাহার অনুরোধ ছিল, ধোবার বাড়ী দিবার পূর্ব্বে তাহার ছাড়া-কাপড়ের পকেট তদন্ত করিয়া লওয়া হয় যেন। মহেন্দ্রের একটা ছাড়া-জামার পকেটে হাত দিতেই একখানা চিঠি আশার হাতে ঠেকিল।

সেই চিঠি যদি বিষধর সাপের মূর্ত্তি ধরিয়া তখনি আশার অঙ্গুলি দংশন করিত, তবে ভাল হইত;—কারণ উগ্র বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে পাঁচমিনিটের মধ্যেই তাহার চরমফল ফলিয়া শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিষ মনে প্রবেশ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা আনে—মৃত্যু আনে না!

খোলা চিঠি বাহির করিবামাত্র দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষর। চকিতের মধ্যে আশার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। চিঠি হাতে লইয়া সে পাশের ঘরে গিয়া পড়িল:—

"কাল রাত্রে তুমি যে কাণ্ডটা করিলে, তাহাতেও কি তোমার তৃপ্তি হইল না? আজ আবার কেন ক্ষেমীর হাত দিয়া আমাকে গোপনে চিঠি পাঠাইলে? ছি ছি সে কি মনে করিল? আমাকে তুমি কি জগতে কাহারো কাছে মুখ দেখাইতে দিবে না?

আমার কাছে কি চাও তুমি? ভালবাসা? তোমার এ ভিক্ষাবৃত্তি কেন? জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অন্ত নাই!

জগতে আমার ভালবাসিবার এবং ভালবাসা পাইবার কোন স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়া ভালবাসার খেদ মিটাইয়া থাকি। যখন তোমার অবসর ছিল, তখন সেই মিথ্যা খেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু খেলার ছুটি কি ফুরায় না? ঘরের মধ্যে তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আবার খেলার ঘরে উঁকিঝুঁকি কেন? এখন ধূলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। আমার ত ঘর নাই, আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।

তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালবাস। খেলার বেলায় সে কথা শোনা যাইতে পারে—কিন্তু যদি সত্য বলিতে হয়, ও কথা বিশ্বাস করি না। একসময় মনে করিতে

তুমি আশাকে ভালবাসিতে, সেও মিথ্যা,—এখন মনে করিতেছ তুমি আমাকে ভালবাসিতেছ, এও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালবাস।

ভালবাসার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে—সে তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছি। আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ কর, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না। আমার খেলার সখও মিটিয়াছে; এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না। চিঠিতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছ—সে কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমার কিছু দয়াও আছে—তাই আজ তোমাকে আমি দয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম। এ চিঠির যদি উত্তর দাও, তবে বুঝিব, না পালাইলে তোমার হাত হইতে আমার আর নিষ্কৃতি নাই!"

চিঠিখানি পড়িবামাত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিক্ হইতে আশার সমস্ত অবলম্বন যেন খসিয়া পড়িয়া গেল, শরীরের সমস্ত স্নায়ুপেশী যেন একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল,—নিশ্বাস লইবার জন্য যেন বাতাসটুকু পর্য্যন্ত রহিল না, সূর্য্য তাহার চোখের উপর হইতে সমস্ত আলো যেন তুলিয়া লইল। আশা প্রথমে দেয়াল, তাহার পর আলমারি, তাহার পর চৌকি ধরিতে ধরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া চিঠিখানা আর একবার পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে কিছুতেই তাহার অর্থগ্রহ করিতে পারিল না—কালো-কালো অক্ষরগুলা তাহার চোখের উপর নাচিতে লাগিল। এ কি! এ কি হইল! এ কেমন করিয়া হইল! এ কি সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ! সে কি করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ডাঙার উপরে উঠিয়া মাছ যেমন খাবি খায়, তাহার বুকের ভিতরটা তেমনি করিতে লাগিল। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোন-একটা আশ্রয় পাইবার জন্য জলের উপরে হস্ত প্রসারিত করিয়া আকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি আশা, মনের মধ্যে একটা-যা-হয়-কিছু প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিল, অবশেষে বুক চাপিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মাসি মা!"

সেই স্নেহের সম্ভাষণ উচ্ছ্বসিত হইবামাত্র তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাটিতে বসিয়া কান্নার উপর কান্না,—কান্নার উপর কান্না যখন ফিরিয়া ফিরিয়া শেষ হইল, তখন সে ভাবিতে লাগিল, "এ চিঠি লইয়া আমি কি করিব?" স্বামী যদি জানিতে পারেন, এ চিঠি আশার হাতে পড়িয়াছে, তবে সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার নিদারুণ লজ্জা স্মরণ করিয়া আশা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। স্থির করিল, চিঠিখানি সেই ছাড়া-জামার পকেটে পুনরায় রাখিয়া জামাটি আল্‌নায় ঝুলাইয়া রাখিবে, ধোবার বাড়ী দিবে না।

এই ভাবিয়া চিঠিহাতে সে শয়নগৃহে আসিল। ধোবাটা ইতিমধ্যে ময়লা কাপড়ের গাঁঠরির উপর ঠেস্ দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্রের ছাড়া-জামাটা তুলিয়া লইয়া আশা

তাহার পকেটে চিঠি পুরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সাড়া পাইল, "ভাই বালি!"

তাড়াতাড়ি চিঠি ও জামাটা খাটের উপর ফেলিয়া সে তাহা চাপিয়া বসিল। বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ধোবা বড় কাপড় বদল করিতেছে। যে কাপড়গুলায় মার্কা দেওয়া হয় নাই, সেগুলা আমি লইয়া যাই।"

আশা বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। পাছে মুখের ভাবে সকল কথা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, এইজন্য সে জংনালার দিকে মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া রহিল, পাছে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে।

বিনোদিনী থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া একবার আশাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। মনে মনে কহিল, "ওঃ বুঝিয়াছি! কাল রাত্রের বিবরণ তবে জানিতে পারিয়াছ! আমার উপরেই সমস্ত রাগ! যেন অপরাধ আমারই!"

বিনোদিনী আশার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার কোন চেষ্টাই করিল না। খানকয়েক কাপড় বাছিয়া লইয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর সঙ্গে আশা যে এতদিন সরলচিত্তে বন্ধুত্ব করিয়া আসিতেছে, সেই লজ্জা নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও তাহার হৃদয়ে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিল! তাহার মনের মধ্যে সখীর যে আদর্শ ছিল, সেই আদর্শের সঙ্গে নিষ্ঠুর চিঠিখানা আর একবার মিলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল।

চিঠিখানা খুলিয়া দেখিতেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। হঠাৎ কি মনে করিয়া কালেজের একটা লেক্‌চারের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া সে ছুটিয়া বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে।

আশা চিঠিখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্রও ঘরে আশাকে দেখিয়া একটু থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ব্যগ্রদৃষ্টিতে ঘরের এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আশা বুঝিয়াছিল, মহেন্দ্র কি খুঁজিতেছে; কিন্তু কেমন করিয়া সে হাতের চিঠিখানা অলক্ষিতে যথাস্থানে রাখিয়া পালাইয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

মহেন্দ্র তখন একটা একটা করিয়া ময়লা কাপড় তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্রের সেই নিষ্ফল প্রয়াস দেখিয়া আশা আর থাকিতে পারিল না, চিঠিখানা ও জামাটা মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া ডান হাতে খাটের থামটা ধরিয়া সেই হাতে মুখ লুকাইল। মহেন্দ্র বিদ্যুদ্বেগে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। নিমেষের জন্য স্তব্ধ হইয়া আশার দিকে চাহিল। তাহার পরে আশা সিঁড়ি দিয়া মহেন্দ্রের দ্রুতধাবনের শব্দ শুনিতে পাইল। তখন ধোবা ডাকিতেছে, "মা-ঠাকরুণ, কাপড় দিতে আর কত দেরি করিবে? বেলা অনেক হইল, আমার বাড়ী ত এখানে নয়।"

(৩৬)

রাজলক্ষ্মী আজ সকাল হইতে আর বিনোদিনীকে ডাকেন নাই। বিনোদিনী নিয়মমত ভাঁড়ারে গেল, দেখিল, রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

সে তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিল—"পিসিমা, তোমার অসুখ করিয়াছে বুঝি? করিবারই কথা। কাল রাত্রে ঠাকুরপো যে কীর্ত্তি করিলেন! একেবারে পাগলের মত আসিয়া উপস্থিত। আমার ত তার পরে ঘুম হইল না।"

রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া রহিলেন, হাঁ, না, কোন উত্তরই করিলেন না।

বিনোদিনী বলিল—"হয় ত চোখের বালির সঙ্গে সামান্ত কিছু খিটিমিটি হইয়া থাকিবে, আর দেখে কে! তখনি নালিশ কিংবা নিষ্পত্তির জন্তে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া চাই, রাত পোহাইতে তর সয় না! যাই বল পিসিমা, তুমি রাগ করিয়ো না, তোমার ছেলের সহস্র গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য্যের লেশমাত্র নাই! ঐ জন্তই আমার সঙ্গে কেবলি ঝগ্‌ড়া হয়।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"বউ, তুমি মিথ্যা বকিতেছ—আমার আজ আর কোন কথা ভাল লাগিতেছে না।"

বিনোদিনী কহিল—"আমারও কিছু ভাল লাগিতেছে না পিসিমা। তোমার মনে আঘাত লাগিবে, এই ভয়েই মিথ্যা কথা দিয়া তোমার ছেলের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এমন হইয়াছে যে আর ঢাকা পড়ে না!"

রাজলক্ষ্মী। আমার ছেলের দোষ-গুণ আমি জানি—কিন্তু তুমি যে কেমন মায়াবিনী, তাহা আমি জানিতাম না।

বিনোদিনী কি-একটা বলিবার জন্ত উদ্যত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিল—কহিল, "সে কথা ঠিক পিসিমা,—কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে? তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই? একবার ঠাহর করিয়া দেখ দেখি?"

রাজলক্ষ্মী অগ্নির মত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন—কহিলেন—"হতভাগিনি, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ দিতে পারিস্? তোর জিব্ খসিয়া পড়িবে না?"

বিনোদিনী অবিচলিতভাবে কহিল—"পিসিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত, আমার মধ্যে কি মায়া ছিল, তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ,—তোমার মধ্যেও কি মায়া ছিল, তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি। কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটিত না। ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি, ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম্ম এইরূপ,—আমরা মায়াবিনী।"

রোষে রাজলক্ষ্মীর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া গেল—তিনি ঘর ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী একলা-ঘরে ক্ষণকালের জন্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার দুই চক্ষে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সকাল-বেলাকার গৃহকার্য্য হইয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহেন্দ্র বুঝিল, কাল রাত্রিকার ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইবে। তখন বিনোদিনীর কাছ হইতে পত্রোত্তর পাইয়া তাহার মন

বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আঘাতের প্রতিঘাত-স্বরূপে তাহার সমস্ত তরঙ্গিত হৃদয় বিনোদিনীর দিকে সবেগে ধাবমান হইতেছিল। ইহার উপরে আবার মার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। মহেন্দ্র জানিত, মা তাহাকে বিনোদিনী-সম্বন্ধে ভর্ৎসনা করিলেই বিদ্রোহিভাবে সে যথার্থ মনের কথা বলিয়া ফেলিবে এবং বলিয়া ফেলিলেই নিদারুণ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। অতএব এ সময়ে বাড়ী হইতে দূরে গিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। মহেন্দ্র চাকরকে বলিল—"মাকে বলিস্, আজ কালেজে আমার বিশেষ কাজ আছে, এখনি যাইতে হইবে, ফিরিয়া আসিয়া দেখা হইবে।" বলিয়া পলাতক বালকের মত তখনি তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া না খাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনীর যে দারুণ চিঠিখানা আজ সকাল হইতে বারবার করিয়া সে পড়িয়াছে এবং পকেটে লইয়া ফিরিয়াছে, আজ নিতান্ত তাড়াতাড়িতে সেই চিঠিসুদ্ধ জামা ছাড়িয়াই সে চলিয়া গেল।

একপসলা ঘন বৃষ্টি হইয়া তাহার পরে বাদ্‌লার মত করিয়া রহিল। বিনোদিনীর মন আজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছে। মনের কোন অসুখ হইলে বিনোদিনী কাজের মাত্রা বাড়ায়। তাই সে আজ যত-রাজ্যের কাপড় জড় করিয়া চিহ্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার নিকট হইতে কাপড় চাহিতে গিয়া আশার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার মন আরো বিগ্‌ড়াইয়া গেছে। সংসারে যদি অপরাধীই হইতে হয়, তবে অপরাধের যত লাঞ্ছনা তাহাই কেন ভোগ করিবে, অপরাধের যত সুখ তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবে?

ঝুপঝুপ্‌শব্দে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল। বিনোদিনী তাহার ঘরে মেঝের উপরে বসিয়া। সম্মুখে কাপড় স্তূপাকার। ক্ষেমীদাসী এক-এক-খানি কাপড় অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আর বিনোদিনী মার্কা দিবার কালী দিয়া তাহাতে অক্ষর মুদ্রিত করিতেছে।

মহেন্দ্র কোন সাড়া না দিয়া দরজা খুলিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষেমীদাসী কাজ ফেলিয়া মাথায় কাপড় দিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুট্ দিল।

বিনোদিনী কোলের কাপড় মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"যাও, আমার এ ঘর হইতে চলিয়া যাও!"

মহেন্দ্র কহিল, "কেন, কি করিয়াছি?"

বিনোদিনী। কি করিয়াছি! ভীরু কাপুরুষ! কি করিবার সাধ্য আছে তোমার? না জান ভালবাসিতে, না জান কর্ত্তব্য করিতে? মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ?

মহেন্দ্র। তোমাকে আমি ভালবাসি নাই, এমন কথা বলিলে?

বিনোদিনী। আমি সেই কথাই বলিতেছি। তুমি যদি আমাকে তেমন জোর করিয়া পুরুষের মত ভালবাসিতে, যদি আমাকে কাড়িয়া লইতে, লুট্ করিয়া লইতে, তবে আমারও মন তুমি পাইতে। তা নয়, লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, একবার এদিক্ এক-

বার ওদিক্—তোমার এই চোরের মত প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেছে। আর ভাল লাগে না। তুমি যাও।

মহেন্দ্র একেবারে মুহ্যমান হইয়া কহিল, "তুমি আমাকে ঘৃণা কর বিনোদ ?"

বিনোদিনী। হাঁ ঘৃণা করি। আর একটু হইলেই তোমাকে আমি ভালবাসিতে পারিতাম—কিন্তু কিছুতেই ভালবাসিতে দিলে না, দিনরাত্রি কেবল মিন্‌মিন্ করিয়া সমস্ত নষ্ট করিলে।

মহেন্দ্র। এখনো প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আছে বিনোদ! আমি যদি আর দ্বিধা না করি, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছ ?

বিনোদিনী। এখন আর হয় না। কিছুতেই না! কিছুকাল পূর্ব্বে আর একদিন যদি বলিতে, তবে হাঁ বলিতে দেরি করিতাম না।

মহেন্দ্র। সে দিন যায় নাই, সে দিন যায় নাই! আমি যখন তোমার পায়ের কাছে আমার সমস্ত সংসার ফেলিয়া দিতেছি, তখন সে দিন আবার ফিরিয়াছে!

বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর দুই হাত সবলে ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। বিনোদিনী কহিল, "ছাড় আমার লাগিতেছে!"

মহেন্দ্র। তা লাগুক্! বল, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে!

বিনোদিনী। না, যাইব না! কোনমতেই না!

মহেন্দ্র। কেন যাইবে না? তুমিই আমাকে সর্ব্বনাশের মুখে টানিয়া আনিয়াছ, আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তোমাকে যাইতেই হইবে!

বলিয়া মহেন্দ্র সুদৃঢ়বলে বিনোদিনীকে বুকের উপরে টানিয়া লইল, জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল—"তোমার ঘৃণাও আমাকে ফিরাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে লইয়া যাইবই, এবং যেমন করিয়াই হোক্, তুমি আমাকে ভালবাসিবেই!"

বিনোদিনী সবলে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

মহেন্দ্র কহিল—"চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছ, এখন আর নিবাইতেও পারিবে না, পালাইতেও পারিবে না।"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া উঠিল, উচ্চৈঃস্বরে সে কহিল—"এমন খেলা কেন খেলিলে বিনোদ? এখন আর ইহাকে খেলা বলিয়া মুক্তি পাইবে না। এখন তোমার-আমার একই মৃত্যু!"

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন—"মহীন্, কি কর্‌চিস্?"

মহেন্দ্রের উন্মত্ত দৃষ্টি এক নিমেষমাত্র মাতার মুখের দিকে ঘুরিয়া আসিল; তাহার পরে পুনরায় বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া মহেন্দ্র কহিল, "আমি সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি, বল তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?"

বিনোদিনী ক্রুদ্ধ রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া অবিচলিতভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, "যাইব!"

মহেন্দ্র কহিল—"তবে আজকের মত অপেক্ষা কর, আমি চলিলাম, কাল হইতে তুমি ছাড়া আমার আর কেহ রহিবে না!"

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বৌ, এ সব ব্যাপার কি ?"

বিনোদিনী। সমস্তই ত চোখের সাম্‌নে দেখিলে পিসিমা! জিজ্ঞাসা আর কি করিতেছ ?

রাজলক্ষ্মী। এমন কতদিন চলিতেছে ?

বিনোদিনী। আজ হইতে পুরাপুরি আরম্ভ হইল।

রাজলক্ষ্মী। তবে এখন হইতে কি এমনি করিয়াই চলিবে ?

বিনোদিনী। সে আমার চেয়ে তুমি ভাল জান পিসিমা—তোমার ছেলে, তুমি নিজের হাতে গড়িয়াছ। তবে এ কথা ঠিক বটে, চিরকাল চলিবার মত ভাবখানা নয়।

রাজলক্ষ্মী। তুমি কি করিবে বউ ?

বিনোদ। ঠাকুরপো ফিরিয়া আসুন, কাল দেখিতে পাইবে।

রাজলক্ষ্মী জোড়হাত করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন—"আমার সর্ব্বনাশ করিয়ো না বউ। এতদিন আমি তোমাকে ঘরের লোকের মত রাখিয়াছিলাম, আমার একটিমাত্র ছেলেকে পর করিয়া দিয়া যাইয়ো না।"

এমন-সময় ধোবা আসিয়া বিনোদিনীকে কহিল, "মাঠাকরুণ, আর ত বসিতে পারি না। আজ যদি তোমাদের ফুরসৎ না থাকে ত আমি কাল আসিয়া কাপড় লইয়া যাইব।"

ক্ষেমী আসিয়া কহিল, "বৌঠাকরুণ, সহিস বলিতেছে, দানা ফুরাইয়া গেছে।"

বিনোদিনী সাত দিনের দানা ওজন করিয়া আস্তাবলে পাঠাইয়া দিত, এবং নিজে জানলায় দাঁড়াইয়া ঘোড়ার খাওয়া দেখিত।

গোপাল-চাকর আসিয়া কহিল, "বৌ-ঠাকরুণ, ঝড়ু-বেহারা আজ দাদামশায়ের (সাধুচরণের) সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে। সে বলিতেছে, তাহার কেরোসিনের হিসাব বুঝিয়া লইলেই সে সরকার-বাবুর কাছ হইতে বেতন চুকাইয়া লইয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে।"

সংসারের সমস্ত কর্ম্মই পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

(৩৭)

বিহারী এতদিন মেডিকাল কলেজে পড়িতেছিল। ঠিক পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই সে ছাড়িয়া দিল। কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে বলিত, 'পরের স্বাস্থ্য পরে দেখিব, আপাতত নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চাই।'

আসল কথা, বিহারীর উদ্যম অশেষ; একটা-কিছু না করিয়া তাহার থাকিবার জো নাই, অথচ যশের তৃষ্ণা, টাকার লোভ এবং জীবিকার জন্য উপার্জ্জনের প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র ছিল না। কলেজে ডিগ্রি লইয়া প্রথমে সে শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে গিয়াছিল। যতটুকু জানিতে তাহার কৌতূহল ছিল এবং হাতের কাজে যতটুকু দক্ষতালাভ সে আবশ্যক বোধ করিত, সেইটুকু সমাধা করিয়াই সে মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করে। মহেন্দ্র এক-বৎসর পূর্ব্বে ডিগ্রি লইয়া মেডিকাল কালেজে ভর্ত্তি হয়। কলেজের বাঙালী ছাত্রদের নিকট তাহাদের দুই জনের বন্ধুত্ব বিখ্যাত ছিল। তাহারা ঠাট্টা করিয়া ইহাদের দুজনকে শ্যামদেশীয় জোড়া-যমজ বলিয়া ডাকিত।

গতবৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল্ করাতে দুই বন্ধু এক শ্রেণীতে আসিয়া মিলিল। এমন-সময় হঠাৎ জোড় কেন যে ভাঙিল, তাহা ছাত্রেরা বুঝিতে পারিল না। রোজ যেখানে মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইবেই, অথচ তেমন করিয়া দেখা হইবে না, সেখানে বিহারী কিছুতেই যাইতে পারিল না। সকলেই জানিত, বিহারী ভালরকম পাস্ করিয়া নিশ্চয় সম্মান ও পুরস্কার পাইবে, কিন্তু তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তাহাদের বাড়ীর পার্শ্বে এক কুটীরে রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিয়া এক গরীব ব্রাহ্মণ বাস করিত;—ছাপাখানায় বারো-টাকা বেতনে কম্পোজিটারি করিয়া সে জীবিকা চালাইত। বিহারী তাহাকে বলিল, "তোমার ছেলেকে আমার কাছে রাখ, আমি উহাকে নিজে লেখাপড়া শিখাইব।"

ব্রাহ্মণ বাঁচিয়া গেল। খুসি হইয়া তাহার আটবছরের ছেলে বসন্তকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিল।

বিহারী তাহাকে নিজের প্রণালীমতে শিক্ষা দিতে লাগিল। বলিল, "দশবৎসর বয়সের পূর্ব্বে আমি ইহাকে বই পড়াইব না, সব মুখে-মুখে শিখাইব।" তাহাকে লইয়া খেলা করিয়া, তাহাকে লইয়া গড়ের মাঠে, মিউজিয়ামে, আলিপুর-পশুশালায়, শিবপুরের বাগানে ঘুরিয়া বিহারী দিন কাটাইতে লাগিল। তাহাকে মুখে-মুখে ইংরাজি শেখান, ইতিহাস গল্প করিয়া শোনান, নানাপ্রকারে বালকের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা ও তাহার পরিণতিসাধন, বিহারীর সমস্ত দিনের কাজ এই ছিল—সে নিজেকে মুহূর্ত্তমাত্র অবসর দিত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাহির হইবার জো ছিল না। দুপুরবেলায় বৃষ্টি থামিয়া আবার বিকাল হইতে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বিহারী তাহার দোতলার বড় ঘরে আলো জ্বালিয়া বসিয়া বসন্তকে লইয়া নিজের নূতন প্রণালীর খেলা করিতেছিল।

"বসন্ত, এ ঘরে কটা কড়ি আছে, চট্ করিয়া বল। না, গুণিতে পাইবে না!"

বসন্ত। কুড়িটা।

বিহারী। হার হইল; আঠারটা।

ফস্ করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ খড়খড়িতে কটা পাল্লা আছে?"—বলিয়া খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

বসন্ত বলিল—"ছয়টা।"

'জিৎ! এই বেঞ্চিটা লম্বায় কত হইবে? এই বইটার কত ওজন?' এমনি করিয়া বিহারী বসন্তর ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন করিতেছিল, এমন-সময় বেহারা আসিয়া কহিল,—"বাবুজি, একঠো ঔরৎ—"

কথা শেষ করিতে না করিতে বিনোদিনী ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিহারী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"এ কি কাণ্ড বোঠা'ণ?"

বিনোদিনী কহিল, "তোমার এখানে তোমার আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ নাই?"

বিহারী। আত্মীয়ও নাই, পরও নাই। পিসি আছেন দেশের বাড়ীতে।

বিনোদিনী। তবে তোমার দেশের বাড়ীতে আমাকে লইয়া চল।

বিহারী। কি বলিয়া লইয়া যাইব?

বিনোদিনী। দাসী বলিয়া। আমি সেখানে ঘরের কাজ করিব।

বিহারী। পিসি কিছু আশ্চর্য্য হইবেন, তিনি আমাকে দাসীর অভাব ত জানান্ নাই। আগে শুনি, এ সঙ্কল্প কেন মনে উদয় হইল? বসন্ত, যাও, শুইতে যাও!

বসন্ত চলিয়া গেল। বিনোদিনী কহিল, "বাহিরের ঘটনা শুনিয়া তুমি ভিতরের কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।"

বিহারী। নাই বুঝিলাম, না হয় ভুলই বুঝিব, ক্ষতি কি!

বিনোদিনী। আচ্ছা, না হয় ভুলই বুঝিয়ো। মহেন্দ্র আমাকে ভালবাসে।

বিহারী। সে খবর ত নূতন নয়, এবং এমন খবর নয়, যাহা দ্বিতীয়বার শুনিতে ইচ্ছা করে।

বিনোদিনী। বারবার শুনাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। সেইজন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দাও!

বিহারী। ইচ্ছা তোমার নাই? এ বিপত্তি কে ঘটাইল? মহেন্দ্র যে পথে চলিয়াছিল, সে পথ হইতে তাহাকে কে ভ্রষ্ট করিয়াছে?

বিনোদিনী। আমি করিয়াছি। তোমার কাছে লুকাইব না, এ সমস্তই আমারই কাজ। কেন করিয়াছি, তাও খুলিয়া বলি। পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, কোন রূপ, কোন গুণ যে ছিল না, তাহা নয়—কিন্তু তবুও সবাই যে আমাকে কোণে ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখিবে, কেহই যে একবার আমার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না, এ আমি সহ্য করিতে পারি নাই। অন্যে যে আদর পায়, আমি তার চেয়ে বেশি আদর পাইবার যোগ্য,—এ আমার মিথ্যা গর্ব্ব নহে, যিনি আমাকে গড়িয়াছেন, তিনি তাহা জানেন—তবে তিনি আমাকে কেন বঞ্চিত করিলেন?

বিহারী। অযোগ্যকে বঞ্চিত করিলে অধিক নির্দ্দয়তা করা হয়—যে যোগ্য, সে যোগ্যতার গৌরবে সব সহ্য করিতে পারে।

বিনোদিনী। বিহারি-ঠাকুরপো, ও সব তোমার বইপড়া কথা—ও রাখিয়া দাও। আমি মন্দ হই যা হই, একবার আমার মত হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা কর। আমার বুকের জ্বালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালবাসি, কিন্তু তাহা ভুল।

বিহারী। ভালবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে?

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, এও তোমার শাস্ত্রের কথা! এখনো ও সব কথা শুনিবার মত মতি আমার হয় নাই। ঠাকুরপো, তোমার পুঁথি রাখিয়া একবার অন্তর্যামীর মত আমার হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত কর! আমার ভালমন্দ সব আজ আমি তোমার কাছে বলিতে চাই।

বিহারী। পুঁথি সাধে খুলিয়া রাখি বোঠা'ণ! হৃদয়কে হৃদয়েরই নিয়মে বুঝিবার ভার অন্তর্যামীরই উপরে থাক্, আমরা পুঁথির বিধান মিলাইয়া না চলিলে শেষকালে যে ঠেকাইতে পারি না।

বিনোদিনী। ঠেকাইবার চেষ্টা পরে করিয়ো—এখন যাহা বলিতেছি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। আমি সত্য বলিতেছি, উপেক্ষিত নারীর ক্ষমতা জাহির করিবার জন্য তোমার বন্ধুর ঘরে আমি এই অগ্নিকাণ্ড

রস্ত করিয়াছিলাম। সে অগ্নি তুমি নির্বাণ করিতে পারিতে—কিন্তু না করিয়া তুমি আরো দ্বিগুণ জ্বালাইয়াছ।

বিহারী। আমি জ্বালাইয়াছি? আমার যে কোনপ্রকার দাহিকা শক্তি আছে, তাহা জানিতাম না, জানিলে সাবধান হইতাম।

বিনোদিনী। না ঠাকুরপো, ঠাট্টা করিয়ো না, বরঞ্চ রাগ কর, সে ভাল। কিন্তু রাগই কর আর যাই কর, আজ যখন তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আজ আমাকে তোমার বুঝিতেই হইবে! এখন আমার আর অপেক্ষা করিবার, সুযোগ খুঁজিবার সময় নাই—এখন শেষ ঠেলা খাইয়া জলের মধ্যে পড়িয়াছি, হয় ডাঙায় উঠিব, নয় ডুবিব। এখন ঢাকিয়া কিছু বলিব না, তুমিও দয়া করিয়া সমস্তটা বুঝিয়া লও।

বিহারী। যাহা বলিতে চাও, তাহা শুনিব, বুঝা না বুঝা আমার হাত নহে। মহেন্দ্রের ঘরে তুমি যে আগুন লাগাইয়াছ, আমি তাহা উস্কাইয়া দিয়াছি, এ কথা বুঝিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে।

বিনোদিনী। শুন ঠাকুরপো, আমি নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিতে। মহেন্দ্র আমাকে ভালবাসে বটে, কিন্তু সে নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে যেন বুঝিয়াছ—একবার তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে—সত্য করিয়া বল—সে কথা আজ চাপা দিতে চেষ্টা করিয়ো না।

বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুরপো, কিন্তু বুঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন? আমাকে ভালবাসিতে তোমার কি বাধা ছিল? আমি আজ নির্লজ্জ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি আজ নির্লজ্জ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি—তুমিও আমাকে ভালবাসিলে না কেন? আমার পোড়াকপাল! তুমিও কি না আশার ভালবাসায় মজিলে! না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না! বস ঠাকুরপো, আমি কোন কথা ঢাকিয়া বলিব না! তুমি যে আশাকে ভালবাস, সে কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনো আমি জানিতাম। কিন্তু আশার মধ্যে তোমরা কি দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না! ভালই বল, আর মন্দই বল, তাহার আছে কি! বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই? তোমরা কী দেখিয়া—কতটুকু দেখিয়া ভোল! নির্ব্বোধ! অন্ধ!

বিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আজ তুমি আমাকে যাহা শুনাইবে, সমস্তই আমি শুনিব—কিন্তু যে কথা বলিবার নহে, সে কথা বলিয়ো না, তোমার কাছে আমার এই একান্ত মিনতি!"

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, কোথায় তোমার ব্যথা লাগিতেছে, তাহা আমি জানি—কিন্তু যাহার শ্রদ্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার ভালবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়, লজ্জা, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কত বড় বেদনায়, তাহা মনে করিয়া একটু

ধৈর্য্য ধর! আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আশাকে ভাল না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আশার আজ এমন সর্ব্বনাশ হইত না।

বিহারী বিবর্ণ হইয়া কহিল—"আশার কি হইয়াছে? তুমি তাহার কি করিয়াছ?"

বিনোদিনী। মহেন্দ্র তাহার সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাল আমাকে লইয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিহারী হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"এ কিছুতেই হইতে পারে না! কোনমতেই না!"

বিনোদিনী। কোনমতেই না? মহেন্দ্রকে আজ কে ঠেকাইতে পারে?

বিহারী। তুমি পার।

বিনোদিনী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—তাহার পরে বিহারীর মুখের দিকে দুই চক্ষু স্থির রাখিয়া কহিল—"ঠেকাইব কাহার জন্য? তোমার আশার জন্য? আমার নিজের সুখদুঃখ কিছুই নাই? তোমার আশার ভাল হউক্, মহেন্দ্রের সংসারের ভাল হউক্, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবী মুছিয়া ফেলিব, এত ভাল আমি নই—ধর্ম্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই! আমি যাহা ছাড়িব, তাহার বদলে আমি কি পাইব?"

বিহারীর মুখের ভাব ক্রমশ অত্যন্ত কঠিন হইয়া আসিল—কহিল, "তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে, এবং যে কথাগুলা বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই, তুমি যে সাহিত্য পড়িয়াছ—তাহা হইতে চুরি! ইহার বারো-আনাই নাটক এবং নভেল!"

বিনোদিনী। নাটক! নভেল!

বিহারী। হাঁ, নাটক, নভেল! ব খুব উঁচুদরের নয়। তুমি মনে করিতে এ সমস্ত তোমার নিজের—তাহা নহে! সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি! যদি তু নিতান্ত নির্ব্বোধ মূর্খ সরলা বালিকা হইতে তাহা হইলেও সংসারে ভালবাসা হই বঞ্চিত হইতে না—কিন্তু নাটকের নায়ি ষ্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহা লইয়া চলে না!

কোথায় বিনোদিনীর সেই তীব্র তে দুঃসহ দর্প! মন্ত্রাহত ফণিনীর মত সে স্ত হইয়া—নত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর বিহারীর মুখের দিকে না চাহিয়া, শান্তনম্র স্বরে কহিল—"তুমি আমাকে কি করিতে বল?"

বিহারী কহিল, "অসাধারণ কিছু করিতে চাহিয়ো না। সাধারণ স্ত্রীলোকের শুভবুদ্ধি যাহা বলে, তাই কর! দেশে চলিয়া যাও!"

বিনোদিনী। কেমন করিয়া যাইব?

বিহারী। মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমি তোমাকে তোমাদের ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিব।

বিনোদিনী। আজ রাত্রে তবে আমি এইখানেই থাকি।

বিহারী। না, এত বিশ্বাস আমার নিজের 'পরে নাই।

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"ঐটুকু দুর্ব্বলতা রাখ ঠাকুরপো!

একেবারে পাথরের দেবতার মত পবিত্র হইয়ো না! মন্দকে ভাল বাসিয়া একটুখানি মন্দ হও!”

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদযুগ বারবার চুম্বন করিল। বিহারী বিনোদিনীর এই আকস্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার শরীর-মনের সমস্ত গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া আসিল। বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধ বিহ্বলভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দুই হাঁটুর উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, “জীবনসর্ব্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ একমুহূর্ত্তের জন্য আমাকে ভালবাস! তার পরে আমি আমাদের সেই বনে-জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না। মরণপর্য্যন্ত মনে রাখিবার মত আমাকে একটা কিছু দাও!”—বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মুহূর্ত্তকালের জন্য দুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিহারী ধীরে ধীরে বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্য চৌকিতে গিয়া বসিল এবং রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল—“আজ রাত্রি একটার সময় একটা প্যাসেঞ্জার্ ট্রেণ আছে।”

বিনোদিনী একটুখানি স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পরে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল—“সেই ট্রেণেই যাইব।”

এমন সময়—পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই—বসন্ত তাহার পরিপুষ্ট গৌরসুন্দর দেহ লইয়া বিহারীর চৌকির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরমুখে বিনোদিনীকে দেখিতে লাগিল।

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল—“শুতে যাস্ নি যে!”—বসন্ত কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী দুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত প্রথমে একটু দ্বিধা করিয়া ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৩৮)

যাহা অসম্ভব, তাহাও সম্ভব, যাহা অসহ্য, তাহাও সহ্য হয়, নহিলে মহেন্দ্রের সংসারে সে রাত্রি সেদিন কাটিত না। বিনোদিনীকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া মহেন্দ্র রাত্রেই একটা পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্র ডাকযোগে সকালে মহেন্দ্রের বাড়ীতে পৌঁছিল।

আশা তখন শয্যাগত। বেহারা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া কহিল—“মাজি, চিঠ্‌ঠি!”

আশার হৃৎপিণ্ডে রক্ত ধক্ করিয়া ঘা দিল। এক পলকের মধ্যে সহস্র আশ্বাস ও আশঙ্কা একসঙ্গে তাহার বক্ষে বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া চিঠিখানা লইয়া দেখিল, মহেন্দ্রের হাতের অক্ষরে বিনোদিনীর নাম। তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা বালিশের উপরে পড়িয়া গেল—কোন কথা না বলিয়া আশা সে চিঠি বেহারার হাতে

ফিরাইয়া দিল। বেহারা জিজ্ঞাসা করিল—"চিঠি কাহাকে দিতে হইবে?"

আশা কহিল—"জানি না!"

রাত্রি তখন আটটা হইবে, মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি ঝড়ের মত বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, ঘরে আলো নাই—সমস্ত অন্ধকার। পকেট হইতে একটা দেশালাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া দেশালাই ধরাইল—দেখিল, ঘর শূন্য। বিনোদিনী নাই, তাহার জিনিষপত্রও নাই। দক্ষিণের বারান্দায় গিয়া দেখিল, বারান্দা নির্জ্জন। ডাকিল—"বিনোদ!"—কোন উত্তর আসিল না।

"নির্ব্বোধ! আমি নির্ব্বোধ! তখনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত ছিল! নিশ্চয়ই মা বিনোদিনীকে এমন গঞ্জনা দিয়াছে যে, সে ঘরে টিঁকিতে পারে নাই।"

সেই কল্পনামাত্র মনে উদয় হইতেই তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইল। মহেন্দ্র অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ মার ঘরে গেল। সে ঘরেও আলো নাই,—কিন্তু রাজলক্ষ্মী বিছানায় শুইয়া আছেন, তাহা অন্ধকারেও লক্ষ্য হইল। মহেন্দ্র একেবারেই রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিল—"মা, তোমরা বিনোদিনীকে কি বলিয়াছ?

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"কিছুই বলি নাই।"

মহেন্দ্র। তবে সে কোথায় গেছে?

রাজলক্ষ্মী। আমি কি জানি?

মহেন্দ্র অবিশ্বাসের স্বরে কহিল—"তুমি জান না? আচ্ছা, আমি তাহার সন্ধানে চলিলাম—সে যেখানেই থাক্‌, আমি তাহাকে বাহির করিবই!"

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন—"মহিন্, যাস্‌নে মহিন্, ফিরিয়া আয়, আমার একটা কথা শুনিয়া যা!"

মহেন্দ্র একনিশ্বাসে ছুটিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—"বহুঠাকুরাণী কোথায় গিয়াছেন?"

দরোয়ান কহিল, "আমাদের বলিয়া যান নাই, আমরা কিছুই জানি না!"

মহেন্দ্র গর্জ্জিত ভর্ৎসনার স্বরে কহিল—"জান না!"

দরোয়ান করজোড়ে কহিল—"না মহারাজ জানি না!"

মহেন্দ্র মনে মনে স্থির করিল—"মা ইহাদের শিখাইয়া দিয়াছেন।" কহিল—"আচ্ছা, তা হউক্!"

মহানগরীর রাজপথে গ্যাসালোকবিদ্ধ সন্ধ্যান্ধকারে বরফওয়ালা তখন বরফ ও তপ্‌সীমাছওয়ালা তপ্‌সীমাছ হাঁকিতেছিল। কলরবক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে মহেন্দ্র প্রবেশ করিল এবং অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্রমশ।

যাত্রা।

এত কষ্টে—এত দুখে, তোমারই অভিমুখে,
বাহিয়া চ'লেছি আমি জীবন-তরণী ;
নাহি জানি কোথা কূল, দিক্ হ'য়ে যায় ভুল,
নাহি জানি কত জন্ম যাইবে এমনি !

জন্ম-জন্ম অন্ধকারে, জীবনের কোন পারে,
দিবে না কি—দিবে না কি দেখা একদিন ?
জীব-যাত্রা-অবসানে, দাঁড়াইব কোন্ খানে,
পা'ব না কি, পুণ্যময়, তোমার পুলিন ?

এ জীবন-রাত্রি, নাথ, হ'বে না কি সুপ্রভাত,
অচির-রজনী-পরে চির-জাগরণ ?
ধরণীর দুখ-তাপ, জীবনের অভিশাপ,
বল বল, হবে নাথ, কোথা সমাপন !

মায়ার বন্ধন-ডোর, জীবনের মোহ-ঘোর,
বুকের বাড়ব দাহ, রিপুর তাড়ন ;—
জীবনের কোন্ তীরে, বিলীন হইবে ধীরে,
আশা-উৎসাহের এই ভাঙিবে স্বপন !

তোমারে রাখিয়া দূরে, কত জন্ম গেছে ঘুরে,
কত জন্ম যা'বে পুন তাও নাহি জানি !
দুর্জ্ঞেয় রহস্য-বন্ধ, নাহি সুর—নাহি ছন্দ,
তুমি পথ—তুমি লক্ষ্য, তাই শুধু মানি !

জীবনে যা' বুঝিয়াছি, তাই শুধু ধ'রে আছি,
সত্য যাহা পাইয়াছি, ক'রেছি সঞ্চয়।
তাহাই পাথের করি, বহি'ছি জীবন-তরী,
সুখে-দুখে করি নাই তোমারে সংশয়।

সুখ-দুখ, হাহাকার, দিবালোক, অন্ধকার,
মহামারী—মহাভয়, বজ্র-বাত্যা ঘোর ;—
তোমারি করুণা স্থির, যে বুঝেছে সেই বীর,
হোক্ না জীবন-যাত্রা কঠিন, কঠোর।

ভেসে যাব স্থির নীরে, সন্ধ্যা আসিবে না ফিরে,
সুখ হোক্—দুখ হোক্ ল'ব না আস্বাদ !
ঠেলি বিঘ্ন দুই হাতে, ধরি উল্কা-বজ্র মাথে,
মানুষের মত চাই সহিতে প্রমাদ !

মধ্য-পথে যদি বায়ু, নিবাইয়া দেয় আয়ু,
নিরাশ্রয়ে সেই দিন ল'বে না কি কাছে ?
অন্য-জগতের তীরে, স্মৃতি যেন নাহি ফিরে,
শত বন্ধনের ফের ফেলিয়াছে পাছে !

তোমার প্রশান্ত কূলে— সব যেন যাই ভুলে,
শুধু যেন মনে থাকে তুমি আর আমি !
আঁখি হ'তে আলো নিও, জগৎ সরায়ে দিও,
তখন চাহিব শুধু তোমারেই, স্বামি !

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক আলোচনা-সমিতিতে পঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিষয়ক অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ শুনিয়া যে দুইচারিটি কথা মনে হইয়াছে, বঙ্গদর্শনে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইলে অনুগৃহীত হইব।

প্রবন্ধের সমালোচনাকালে একটা কথা উঠিয়াছিল, একালে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা পূর্ব্বের মত অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে কি না। কথাটা সে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল; কিন্তু ইহার উত্তর বোধ করি দুষ্প্রাপ্য নহে। কোন সামাজিক ব্যবস্থাই চিরকাল সমানভাবে চলিতে পারে না ও চলেও না। সমাজ যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন সমাজস্থিতির ব্যবস্থাও পরিবর্ত্তনশীল হইবে, ইহা স্বীকার্য্য। বস্তুতই মনুর সময়ের ব্যবস্থা এ সময়ে সর্ব্বতোভাবে প্রচলিত নাই। ইংরাজির প্রভাব সমাজে প্রবেশের পূর্ব্বেই সমাজ আপনা হইতে শাস্ত্রকারদের সম্মতিক্রমে বা নিয়োগক্রমে আপনার ব্যবস্থা আপনিই পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছে। মনুর সময়ে চারিটি মুখ্য বর্ণ ও বোধ করি বহুতর সঙ্করবর্ণ বিদ্যমান ছিল। সেই চারিটি মুখ্যবর্ণের মধ্যে এখন কেবল ব্রাহ্মণই বিদ্যমান। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের লোপ হইয়াছে। শূদ্রের নাম আছে, কিন্তু সামাজিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শূদ্রের এই সামাজিক উন্নতি ইংরাজিশিক্ষার বহু-পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। চারিটি আশ্রমের মধ্যে কেবল গৃহস্থাশ্রমটাই বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থের বিলোপ হইয়াছে। ভিক্ষু আছে, কিন্তু সে মনুর ভিক্ষু নহে। সে বোধ করি, বৌদ্ধ ভিক্ষুর রূপান্তর।

শুনিতে পাই, সংহিতাকারেরাই কলিকালে ভিক্ষুর আশ্রম নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সেটা বোধ হয় ভিক্ষুগণের উৎপাতেরই ফল। ভিক্ষুর আশ্রম অতি কঠিন আশ্রম। ভিক্ষু সমাজের আশ্রয়ে বাস করেন ও সমাজের নিকট আপনার অন্নবস্ত্র যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আদায় করেন; কিন্তু সমাজ তাঁহার নিকট বিনিময়ে কিছু দাবী করিতে পায় না। এরূপ স্থলে ভিক্ষুর জীবন দায়িত্বহীন নীতিবর্জ্জিত জীবনে পরিণত হইবার অত্যন্ত আশঙ্কা থাকে। কিন্তু সেকালের অর্থাৎ মনুর সময়ের ভিক্ষুকে অত্যন্ত কঠিন এপ্রেন্টিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত।

বার্দ্ধক্যেই প্রব্রজ্যাগ্রহণ বিহিত ছিল। জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিয়া যখন অবসর লইবার সময়, তখনই বৃদ্ধেরা পুত্রপৌত্রাদির স্কন্ধে সংসারভার সমর্পণ করিয়া ক্লান্তদেহে জরাজীর্ণ শরীর ও অবসন্ন মন লইয়া সংসারের নিকট ছুটি লইতেন। সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারের উপর আপনার বোঝা সমর্পণ তাঁহারা কতকটা

অন্যায় মনে করিতেন; সংসারও তাঁহাদিগকে আর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত রাখিয়া কষ্ট দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিতেন। উভয়-পক্ষের সম্মতিক্রমে তাঁহারা ছুটি লইতেন; আপনার কৃতকার্য্যের পেন্‌শন্‌স্বরূপ যৎ-কিঞ্চিৎমাত্র অর্থাৎ প্রাণরক্ষার উপায়মাত্র সংসারের নিকট দাবী করিতেন। সংসার তাঁহাদের নিকট বিনিময়ে কিছু দাবী করিত না।

কিন্তু এই বন্দোবস্তে ভিক্ষুর আশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে বিষম পরীক্ষা দিতে হইত। ঐ পরীক্ষা বানপ্রস্থাশ্রম। বনবাসীর জীবন অতি কঠোর জীবন; তাঁহাকে বনে বসিয়া সংসারের জন্য যৎপরোনাস্তি সহিতে হইত। অথচ সংসারের নিকট বিশেষ কিছু পাই-তেন না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ভিক্ষুর পেন্‌শনে অধিকার—ইহাই বোধ করি সাধারণ নিয়ম ছিল।

ভিক্ষুর আশ্রম প্রবেশে এইরূপ কঠোর নিয়মের বাঁধাবাঁধি থাকায় নীতিহীন ও দায়িত্বহীন ভিক্ষুর উৎপাত ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক ছিল, বোধ হয় না। বানপ্রস্থের কঠোর পরীক্ষার পর ভিক্ষুকের জীবন গ্রহণে সক-লের সাহসে কুলাইত, তাহা বোধ হয় না। দ্বিজাতিমাত্রই বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষুক হইতেন, এইরূপ মনে করিবার সম্যক্ কারণ নাই। দ্বিজাতি ভিন্ন শূদ্রগণের অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ লোকের ভিক্ষুক হইবার অধি-কারই ছিল না। কাজেই সমাজে কোনও কালে ভিক্ষুকের সংখ্যা যে খুব বাড়িয়াছিল, তাহা বোধ হয় না।

কিন্তু বেদে না-কি একটা বিধি আছে, বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র যে কেহ যে কোন বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে। যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখা দায়—বুদ্ধদেব বা শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্য, কাহাকেই কেহ কোন উপায়ে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে নাই। জোর করিয়া আট্‌-কাইয়াও লাভ নাই। কিন্তু আশঙ্কা থাকে ভণ্ড বৈরাগ্যের। কৃত্রিম বৈরাগ্যের আক্রমণ হইতে গৃহস্থাশ্রমকে রক্ষা করিবার জন্য মন্বাদি শাস্ত্রকার যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গতই মনে হয়।

ফলে বৃদ্ধবয়সে কঠোর বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, এই সাধারণ নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও, সেকালেও অনেকেই বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অকালে প্রব্রজিত হইত, সংশয় নাই। এবং প্রকৃত বৈরাগীর অনুকরণে বৈরাগীর দলের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাও সম্ভব। বুদ্ধদেবের সময়ে অথবা কিছু পূর্ব্বে এইরূপ অকালবিরাগীর দল অনেক হইয়াছিল, এবং বৈরাগ্য-আশ্রয়টা একরকম ফ্যাশন হইয়াছিল, এইরকম মনে সন্দেহ হয়।

বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহার সন্ন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কর্ম্মত্যাগ না করিয়া কর্ম্মই জীবনের অব-লম্বন করিয়াছিলেন। এত বড় কর্ম্মী সন্ন্যাসী ভূপৃষ্ঠকে আর কখনও পবিত্র করে নাই।

কিন্তু তিনি শাস্ত্রের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের দ্বার অবারিতভাবে মুক্ত করিয়া দিলেন। দ্বিজশূদ্রনির্ব্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সন্ন্যাসী হইতে থাকিল। পুত্রের প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর অনুতপ্ত হইয়া

বয়সের একটা নিয়ম করিয়াছিলেন; অন্তত পিতামাতার অসম্মতিতে কেহ সংসার ত্যাগ করিবে না, এইরূপ একটা নিয়ম করিয়াছিলেন। এবং স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসপ্রবেশের অনুমতি দিয়াও শেষে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, মৎপ্রচারিত সদ্ধর্ম্মের আয়ুঃকাল এইবার কমিয়া গেল।

তাঁহার অনুতাপ অনুচিত হয় নাই। কেন না, দেশটা কিছুদিনেই কপট সন্ন্যাসীর দলে ভরিয়া গেল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাধু মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, অনেক পণ্ডিত, পবিত্রচিত্ত মহাত্মা বসুধা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সত্য বটে; কিন্তু কপট সন্ন্যাসীর উৎপাত হইতে গৃহস্থকে রক্ষা করিবার সম্যক্ উপায় বুদ্ধদেব কিছুই করিয়া যান নাই। যাহা করিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলে যে সমাজবিপ্লব ঘটে, তাহাতে সনাতন ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হয়। স্বেচ্ছাচারী মঠধারী মহান্ত ও ভিক্ষুকের উৎপাতে দেশ হইতে সদাচার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়।

সাধারণ মনুষ্য পৌরুষ শক্তির অপেক্ষা অপৌরুষেয় শক্তিতে অধিক আস্থাবান্। বুদ্ধদেব অপৌরুষেয় শ্রুতিকে অতিক্রম করিয়া পৌরুষ যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রাচীন পরীক্ষিত ঐতিহাসিক আদর্শকে ঠেলিয়া দিয়া নূতন অপরীক্ষিত আদর্শকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই এই সমাজবিপ্লব ও স্বেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব। যদি কাহারও দ্বিধা থাকে, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ইতিহাসটা পড়িয়া দেখিবেন। শঙ্করবিজয়গ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপে মঠধারী মহান্তের ও ভিক্ষুকের উপদ্রব রাজশাসন দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে রাজশাসন এ সকল স্থলে হস্তক্ষেপে সাহস করে না। কিন্তু সমাজ শেষে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধনাম দেশের মধ্যে হেয় হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের বৌদ্ধগণকে কেহ হিমালয়পারে রাখিয়া আসে নাই; কিন্তু তাহারা আর সমাজে স্বনামে পরিচিত হইতে সাহস করে নাই। ভিক্ষুর আশ্রমগ্রহণ বোধ হয় এই কারণেই শাস্ত্রকারগণকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এই বিপ্লব হইতে সমাজরক্ষার জন্য শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ শ্রুতির ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া সদাচার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেইজন্য সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কালে আমরা আচারের বন্ধনের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হই ও স্মৃতিগ্রন্থকারদিগকে গালি দিই। তাঁহারা ধর্ম্মনীতির অপেক্ষা আচারনীতির অধিক আদর করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে নানাবিধ কুবাক্য বলি। আমরা ভুলিয়া যাই, নীতির প্রতিষ্ঠা কোন দেশেই কোন কালেই ব্যবস্থাপকের (legislator এর) কাজ নহে; আইনের দ্বারা সন্নীতির প্রতিষ্ঠা কোন কালেই হয় না, তবে সদাচারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এবং সদাচার—ইংরাজিতে যাহাকে decency, propriety প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া যায়—তাহা সমাজস্থিতির জন্য একান্ত আবশ্যক; এবং তাহার জন্যই রাজশাসনের ও শাস্ত্রের শাসনের

আবশ্যকতা ; নীতি (morality)-প্রতিষ্ঠা-পক্ষে; রাজশাসনের ও শাস্ত্রের শাসনের কোনই মূল্য নাই। আধুনিক কালে যে সকল নিবন্ধকার ও সংগ্রহকার আচার-বন্ধনে সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই রাজাশ্রয়ে প্রতিপালিত। তাঁহারা স্বয়ং ঋষি ছিলেন না, তবে ঋষিবাক্যের দোহাই দিতেন, ও রাজাকে পরামর্শ দিয়া রাজশাসন নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাজবিধিদ্বারা সদাচারপ্রতিষ্ঠায় সফল হইয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যক্রমে এ কালের ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলের প্রবর্ত্তকগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ঠিক্ বুঝেন নাই। এমন কি, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতির সেই প্রাচীন বচনের দোহাই দিয়া বৈরাগ্যের দ্বার অবারিত রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকেরা স্ত্রীশূদ্রাদিকেও বৈরাগ্যগ্রহণে নিবারণ করেন নাই। ফলে আমরা শাক্ত মঠে ও বৈষ্ণব আখ্ড়ায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে নামমাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বিরাজিত দেখিতে পাইতেছি। যতি শঙ্করাচার্য্য যে দিন গৃহস্থ মণ্ডনমিশ্রকে পরাজয় করিয়া গৃহস্থাশ্রমের উপর সন্ন্যাসাশ্রমের প্রাধান্ত সপ্রমাণ করেন, সেই দিন ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুর্দ্দিন বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত।

এ কালে যে মনুর সময়ের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা কেহ আশা করেন না। বোধ করি ইচ্ছাও করেন না। সে দিন নাই, হইবেও না। কিন্তু বিপ্লব কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নহে। পুরাতন আদর্শ পুরাতন ভিত্তির উপর বজায় থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয় ; সেই আদর্শ কালানুযায়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই।

বিপ্লব বোধ করি কেহই চাহেন না। আধুনিক সমাজসংস্কারকেরাও চাহেন না। পরিবর্ত্তন আবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তবে একপক্ষ যতটা পরিবর্ত্তন চান, অন্যপক্ষ ততটা চান না ;—স্থিতিশীল ও উন্নতিশীলে বোধ করি এইমাত্র প্রভেদ। এই প্রভেদ সর্ব্বত্রই আছে ; এ দেশেও আছে ; থাকাও প্রার্থনীয়।

তবে এ কালে সমাজব্যবস্থায় রাজ-শক্তির সাহায্য পাইবার আশা নাই ; পাওয়া প্রার্থনীয়ও নহে। যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন যে পরিবর্ত্তন শাস্ত্রজ্ঞগণের পরামর্শে রাজসাহায্যে অবাধে সম্পাদিত হইত, এ কালে তাহা হইবার উপায় নাই। কেন না, রাজশক্তি সমাজশক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইহা অস্বাভাবিক ; কিন্তু উপায় নাই। ইহার ফলভোগে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা সমাজের চেষ্টায় ধীরেধীরেই ঘটিবে। অনেকে শ্রুতির দোহাই দেওয়া, শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া অনাবশ্যক মনে করেন ; আমরা উহা অনাবশ্যক বোধ করি না। সভ্যতম দেশেও—বিলাতে বা আমেরিকায়—শ্রুতির দোহাই না দিলে কোন রাজব্যবস্থা টেকে না। সেখানে শ্রুতির নাম constitution ; উহা অপৌরুষেয় ; কেন না, উহা অনাদি—উহার মূল কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ও উহা ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠিত নহে। অপৌরুষেয়ের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র।

রাজা দেখিছেন চেয়ে নগরী সে, দূর চারিধার,
দৈর্ঘ্য ও বিস্তার,
শৈলে-শৈলে দেবগৃহ, স্থানে-স্থানে অরণ্য বিদারি'
স্তম্ভ সারিসারি,
কত সেই জলপথ, স্থলপথ, সেতুবন্ধ আর
জনতা-প্রসার!—

আমি যবে উতরিব, দাঁড়াইবে বালা বাক্য ভুলি',
দুটি হাত তুলি'
মোর স্কন্ধ-দুটি-'পরে, মুখ মোর প্রেমদৃষ্টি দিয়া
ল'বে আলিঙ্গিয়া—
সহসা মিশিব দোঁহে নিভাইরা দরশে বচনে—
ঘন আলিঙ্গনে।

করে তারা একদিন লক্ষসৈন্য পাঠাল সংগ্রামে,
দক্ষিণে ও বামে,—
সমুচ্চ পিত্তলস্তম্ভে দেবমঞ্চ রচিল মহান্
গগনসমান,—
সে ঐশ্বর্য্য সে প্রতাপ, কোথা তার হৃদয়সম্বল?
শুধু ধনবল।

হায় হায়! রক্ত শুবে, জাগে মনে জ্বলন্ত ধিক্কার—
এই ত সংসার!
এই শুধু, শতাব্দীর গণ্ডগোল-পাপ-বিনিময়ে!
থাক্, যাক্ বয়ে—
রেখে দাও তাহাদের বিজয়ের গৌরবের ভার!
প্রেম সর্ব্বসার!

শ্রী:—

গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য।

উপক্রমণিকা।

ধ্বংসাবশেষ।

আধুনিক মালদহ জেলার প্রধান নগর ইংলিশ-বাজারের অনতিদূরে, মহানন্দা-নদীর উভয় তীরে, এখনও অনেকদূর পর্য্যন্ত পুরাতন গৌড়জনপদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহানন্দার বামতীরে পুরাতন মালদহ ও পাণ্ডুয়া নামক স্থানে দুইটি প্রাচীন নগরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এবং দক্ষিণতীরে ইতিহাসবিখ্যাত গৌড়ীয় রাজধানীর অবস্থানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই রাজধানীকে উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলে, বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। এখন উভয় ভাগই রাজমহলের ক্রোড়বাহিনী ভাগীরথী হইতে দূরে অবস্থিত হইয়া পড়িয়াছে। মহানন্দার উভয়তীরেই কৌতূহলোদ্দীপক ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান;—সে সমস্তই গৌড়-জনপদের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু স্থানীয় লোকে দক্ষিণতীরকে গৌড় ও বামতীরকে পাণ্ডুয়া নামে অভিহিত করিয়া, অখণ্ড পুরাকীর্ত্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তুলিয়াছে। ধ্বংসাবশেষ এখনও প্রত্যক্ষ-গোচর; কিন্তু গৌড়-রাজধানীর জন্মকথা বিস্মৃতি-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে! এখন আর তাহার তথ্যাবিষ্কারের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইবার সম্ভাবনা নাই!

গৌড়োৎপত্তি।

গৌড়-শব্দ সংস্কৃত-মূলক। তজ্জন্য কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহাকে "গুড়"-শব্দ হইতে প্রসূত মনে করিয়া গৌড়কে "ইক্ষুদেশ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন! এই ব্যাখ্যা ব্যাকরণ-সম্মত হইলেও, সংস্কৃত-সাহিত্যে অপরিচিত। গৌড় কোন নগর-বিশেষের নাম থাকার কথা প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চ প্রদেশ গৌড়-নামে পরিচিত থাকার কথা স্কন্দ-পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা:—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"

বিন্ধ্যাচলের উত্তরাবস্থিত এই পঞ্চ প্রদেশই তুল্যরূপে ইক্ষু-উৎপাদনের উপযোগী নহে। সুতরাং ইক্ষুর সহিত গৌড়ের কোন ঘনিষ্ঠ সংস্রব থাকা নিতান্তই আনুমানিক কথা। কে কবে এই গৌড়রাজ্য ও গৌড়নগর বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এতকাল পরে তাহার রহস্যভেদ করা অসম্ভব। গৌড়-কীর্ত্তির স্থানীয় অনুসন্ধান-নিপুণ লেখকবর্গের শেষ ব্যক্তি সৈয়দ এলাহিবক্স-অল হুসেনি-আঙ্গরেজাবাদী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করায়, তাঁহার সুললিত পারস্যভাষানিবদ্ধ "খুরশিদ জাঁহা" নামক সুবিস্তৃত হস্তলিখিত ইতিহাস এক্ষণে মালদহের উকিল শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল আজিজ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। তাহাতে কিংবদন্তীমূলক গৌড়োৎপত্তির কাহিনী লিখিত আছে।

তাহাকে আখ্যায়িকা অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাহাতে দেখা যায়,—খৃষ্টাবির্ভাবের ৩৯৫ বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহারের সিংহলদীপনামক নরপতি বঙ্গ-বিহার পরাজয় করিয়া গৌড়নগর প্রতিষ্ঠিত করেন।

গৌড়োৎপত্তির কথা এইরূপ নানা অবিশ্বাস্য উপকথার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িলেও, গৌড় নানাসময়ে নানা-

গৌড়-নামাবলী।

নামে অভিহিত হইবার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ ও হিন্দু নরপালবর্গের শাসনসময়ে "গৌড়"নামই প্রচলিত ছিল। লক্ষ্মণসেন দেব তাহাকে বহুসৌধবিভূষিত করিয়া "লক্ষ্মণাবতী" নাম প্রদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। গৌড় এই নামই মুসলমানদিগের নিকট বহুকাল পরিচিত ছিল। বাবরের পুত্র হুমায়ুঁ-বাদশাহ বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া ইহাকে "জন্নতাবাদ" নাম প্রদান করেন। সে নাম অধিকদিন জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইবার অবসর লাভ করিল না। খৃষ্টীয় ১৫৭৫ অব্দে আকবার-বাদশাহের শাসনসময়ে, খাঁন খাঁনান্ মনাইম খাঁনের নবাবী আমলে, এক আকস্মিক মহামারীতে এই ইতিহাস-বিশ্রুত মহানগর একেবারে বিজনবনে পরিণত হইয়া গেল! তাহাই উত্তরকালে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

গৌড় বহুপুরাতন হইলেও, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাহা অপেক্ষাও পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান পাণ্ডুয়ার পুরাতন নামই যে পৌণ্ড্র-

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

বর্দ্ধন ছিল, তাহা এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধননামে একটি "ভুক্তি" ও একটি প্রধাননগর থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রধাননগর ও ভুক্তি গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া একদা বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ জনপদেই অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-নামের সঙ্গে "পুণ্ড্র" বা "পুণ্ড্রক" দিগের কিছু সংস্রব থাকা সম্ভব। তাহারা বলবান্, বুদ্ধিমান, কৃষিকৌশলসম্পন্ন প্রবল জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল; অদ্যাপি তাহাদের বংশধরগণ মালদহের প্রত্যেক জনসংখ্যানির্ণয়সময়ে বহুসহস্র বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। ইহারা যে প্রাচীন জাতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতেও ইহাদের উল্লেখ আছে। মনুর মতে পুণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ছিল, ভ্রষ্টাচারদোষে পতিত ও ব্রাত্য হইয়া চতুর্ব্বর্ণের অধম হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদে মধ্যে পুণ্ড্রকেরা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিপ... হইয়াছিল; একদা সমগ্র উত্তরবঙ্গ তাহাদের করতলগত ছিল। অধ্যাপক উইল্‌সন্ বলেন,—নদীয়া, বীরভূমি, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, জঙ্গলমহাল, রামগড়,পঞ্চকোট, পালামো এবং চুনারের কিয়দংশ পর্য্যন্তও কখন-কখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। পুরাকালে কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান প্রাচ্য প্রদেশ বলিয়া সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তখন করতোয়ার খরস্রোত এই উভয় প্রদেশের নৈসর্গিক-রাজ্যসীমারূপে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। পশ্চিমে মহানন্দাও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও মিথিলার রাজ্যসীমারূপে পরিণত

ছিল। তখন মিথিলা তীরভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত ছিল। "তীরভুক্তি" এখন "ত্রিহুত" নাম ধারণ করিয়াছে। গৌড় তীরভুক্তির অন্তর্গত এবং পাণ্ডুয়া পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত থাকা সম্ভব। এই উভয় ভুক্তিই পুরাকালে সংস্কৃতবিদ্যালোচনার জন্য সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের খ্যাতির কথা অবগত হইয়া, হিয়ঙ্গথ্সঙ্গ তাঁহার ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দব্যাপী সুদীর্ঘ তীর্থভ্রমণকালে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনেও উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার

হিয়ঙ্গথ্সঙ্গের তীর্থভ্রমণ।

"পুন্-ন-ফ-তন্" যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেরই চৈনিক নাম, তাহা এখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল বিদেশীয় লিখিত প্রমাণের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনসম্বন্ধে হিয়ঙ্গের গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এই সময়ে গৌড়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, হিয়ঙ্গ গৌড় অতি-ক্রম করিয়াই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপনীত হইয়া-ছিলেন; অথচ তাঁহার "সি-ইউ কি"নামক বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনীর কোনও স্থানেই গৌড়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে ৪০০০লি-পরিমিত একটি রাজ্য ও ৩০লি পরিমিত রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধননামে উল্লিখিত রহিয়াছে। এই রাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা, জনসংখ্যা বিপুল ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট ছিল; বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও একটি অশোকস্তূপও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই রাজ্যের লোকে শিক্ষার সমাদর করিত। রাজধানীর প্রায় ২০লি পশ্চিমে একটি সংঘারাম ও তাহার অদূরেই অশোকস্তূপ এবং একটি বিহার বর্ত্তমান ছিল। এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে ৯০০লি গমন করিয়া একটি প্রবল নদী উত্তীর্ণ হইয়া, হিয়ঙ্গ কামরূপ-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনানুসারে বোধ হয় তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-রাজ্য নদীবেষ্টিত প্রাকৃতিক সীমা অতিক্রম করে নাই। কারণ, ইহার দক্ষিণে ৩০০০লি-পরিমিত সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ "সমতট"নামক একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ও রাজ-ধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

হিয়ঙ্গথ্সঙ্গ যাহাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থাননির্ণয়কালে কেহ কেহ রং-পুরের অন্তর্গত বর্দ্ধনকোট এবং কেহ কেহ বগুড়ার অন্তর্গত

স্থাননির্ণয়।

মহাস্থানের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেকে আবার মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়া-কেই পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পাণ্ডুয়া এবং মহাস্থানের ভগ্না-বশেষ দেখিয়া আসিয়াছি; সুতরাং মহাস্থান বা বর্দ্ধনকোট যে হিয়ঙ্গবর্ণিত রাজধানী নহে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই দুই স্থানের মধ্যে একটিও নদী হইতে ৯০০লি পশ্চিমে নহে; উভয় স্থানই করতোয়া-তীরে অবস্থিত। সুতরাং হিয়ঙ্গথ্সঙ্গ বর্দ্ধনকোট বা মহাস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। করতোয়া হইতে ৯০০লি পশ্চিমে আসিলে পাণ্ডুয়ার নিকটেই উপনীত হইতে হয়। কিন্তু পাণ্ডুয়ায় বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এখন আর কোন বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসা-বশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-

ভুক্তির অন্তর্গত বর্ত্তমান রাজসাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার নানাস্থানে নানা বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা স্মরণ করিলে, তথায় কেবল পাঠানকীর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না কেন, তাহার মীমাংসা করা সহজ হইয়া পড়ে। পাঠানগণ তাঁহাদের ভোগবিলাস বা ঐশ্বর্য্যলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নানা-নূতনপ্রাসাদ-নির্ম্মাণকালে পুরাতন অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। তথাপি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এখনও পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশিষ্ট পাঠান মসজেদে মুসলমানাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তরাদির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

কোন সুন্দরীর প্রতি।

(Victor Hugo হইতে)

রমণীয় করিতেই রমণী এ ভবে;
—সুন্দর করিয়া তোলে তারাই তো সবে
প্রকাণ্ড রহস্য-এক এ বিশ্ব-ভুবন,
—সুবিশদ ভাষা—তার নারীর চুম্বন।

প্রেমেরি যে কটিবন্ধ আকাশ-পাথার
সমস্ত প্রকৃতি তার দিব্য অলঙ্কার।
আত্মারে সে দেয় নিজ সৌরভ অতুল।
নারী না গড়িলে বিধি গড়িত না ফুল!

নীলকান্ত! কোথা তব থাকিত স্ফুরণ
—যদি না থাকিত সেই মধুর নয়ন।
সুন্দরী-বিহনে বল হীরা বা কোথায়?
—সে [illegible] দীপ্তের প্রায়।

শ্যামল-নিকুঞ্জ-মাঝে সুন্দরী বিহরে ;
থাকে গোলাপের কলি নিভৃত বিজনে ;
ঘুমায় খুলিয়া তার রাঙা ঠোঁটখানি ;
একটিও মুখে তার নাহি সরে বাণী ।

যাহা কিছু মোহময় স্বপ্নময় দেখা,
রমণী হইতে তাহা লভে উজ্জ্বলতা,
হে গরবি, মুক্তারাজি তোমা বিনা ছার !
মোর প্রেম তোমা ছাড়ি পশুর বিকার !

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্ব্বের বঙ্গের সামাজিক অবস্থা। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

অনেক বাঙ্গলা উপন্যাসের মলাটের উপর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' লেখা থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস অতি অল্পই আছে! সেই অল্পের মধ্যে সমালোচ্য গ্রন্থের বিশেষ করিয়া উল্লেখ [illegible]। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের [illegible] যাহা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার যে চিত্র চণ্ডীচরণবাবু চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা যে যথাযথ, সুতরাং উপাদেয়, হইয়াছে, এ কথা আমরা বলিতে পারি। তখনকার ইংরেজ রাজাদিগের অত্যাচারের বিবরণ পড়িয়া স্থানে স্থানে আমরা চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারি নাই। ইহার অপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর কি করিব? রচনায় বিশেষত্ব না থাকিলেও তাহা সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। এই পুস্তকের যখন তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে, তখন যে ইহা সাধারণের আদৃত হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। এরূপ আদর পাইবার ইহা যোগ্যও বটে।

সচিত্র কোমল পাঠ। প্রথম ভাগ। অসংযুক্ত বর্ণ। তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ৴৹ এক আনা।

শিশুদিগের বর্ণ [illegible] ও নিতান্ত সহজ বাক্য শিক্ষার বেশ উপযোগী। বিদ্যালয়ে চলিলে মন্দ হয় না, বরং ভালই হয়—অত চলিবার উপযুক্ত বটে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়